হুমায়ূন আহমেদের হাতে

পাঁচটি নীল পদ্ম

হুমায়ূন আহমেদের হাতে পাঁচটি নীল পদ্ম

অন্যপ্রকাশ

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স | লিটিল এম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৬৬৪২৬০ ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ ঢাকা

মূল্য | ৪০০ টাকা

Humayun Ahmeder Hate Panchti Neil Padmo | By Humayun Ahmed
Published by Mazharul Islam Anyaprokash
Cover Design Dhruba Eash
Price Tk 400 only

ISBN 984 8160 151 8

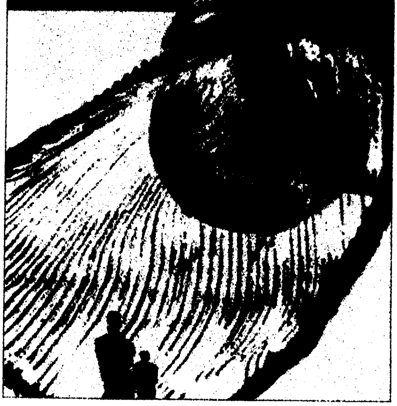
এক দুয়ারী ঘরের ভেতর
দুই দুয়ারী ঘর
সেই ঘরে শুয়ে থাকেন
অশ্রু কারিগর

উৎসর্গ অশ্রু কারিগর-কে

অন্যপ্রকাশ প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

তেতুল বনে জোছনা
মৃন্ময়ী
আমিই মিসির আলি
বৃষ্টি বিলাস
শুভ্র
রুপার পালঙ্ক
জোছনাত্রয়ী
অদ্ভুত সব উপন্যাস
নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস
কানী ডাইনি
নির্বাচিত গল্প
নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস

সূচি




একজন মায়াবতী

দরজার কড়া নড়ছে।

মনজুর লেপের ভেতর থেকে মাথা বের করে শব্দ শুনল— আবার লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল। এর মধ্যেই মাথার পাশে রাখা ঘড়ি দেখে নিয়েছে— সাতটা দশ। মনজুর নিজেকে একজন বুদ্ধিমান লোক মনে করে। কোনো বুদ্ধিমান লোক পৌষ মাসে ভোর সাতটা দশে লেপের ভেতর থেকে বেরুতে পারে না।

যে কড়া নাড়ছে সে যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে আরো কয়েকবার কড়া নেড়ে চলে যাবে। পাঁঠা শ্রেণীর হলে যাবে না। বিপুল উৎসাহে কড়া নাড়তেই থাকবে। নাড়ুক, ইচ্ছে হলে দরজা ভেঙে ফেলুক। হু কেয়ারস ? এখন লেপের ভেতর থেকে বের হওয়া যাবে না।

মনজুর গত রাতে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল। ঘুমাতে গেছে তিনটা কুড়িতে। ঘুম ভালো হয় নি, কারণ ঘুমাতে গেছে ক্ষিধে নিয়ে। রাত জাগলে ক্ষিধে পায়। শরীরের জন্যে বাড়তি কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হয়। সেই ব্যবস্থা ঘরে থাকে— দু তিন রকমের জেলী এবং পাউরুটি। কাল রাতে জেলী ছিল— পাউরুটি ছিল না। বিস্কিটের টিনে কিছু বিস্কিটের গুঁড়া পাওয়া গেল। এক চামচ মুখে দিয়ে মনে হলো সাবানের গুঁড়া খাচ্ছে। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। কতদিনকার বাসি কে জানে। পানি এবং চিনির কৌটার শেষ দু চামচ চিনি খেয়ে পেট ভরিয়ে ঘুমাতে গেছে. চোখ প্রায় ধরে এসেছে এমন সময় বাথরুম পেয়ে গেল। ভরপেট পানি খেয়ে ঘুমাতে যাবার এই হলো সমস্যা। বাথরুম পাচ্ছে তবে সেই তাগিদ জোরালো নয়, উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। শীতের রাতে লেপের ভেতর একবার ঢুকে পড়লে বেরুতে ইচ্ছা করে না।

এখনো খটখট শব্দ হচ্ছে।

গাধা নাকি ? গাধা তো বটেই— অতি নিম্নমানের গাধা। গাধা সমাজের কলঙ্ক। মনজুর লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে উঁচু গলায় বলল, 'ইউ স্টুপিড অ্যাস। ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।' এটি মনজুরের অতি প্রিয় গালি। সে শিখেছে বিন্দুবাসিনী স্কুলের হেড স্যারের কাছে। ক্লাস চলাকালীন সময়ে মনজুর কী কারণে জানি হেড স্যারের ঘরে ঢুকেছিল। তাকে দেখে স্যার হুঙ্কার দিলেন, 'ইউ স্টুপিড অ্যাস, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।' ইংরেজি গালি বাচ্চা ছেলে বুঝতে পারবে কিনা তাঁর হয়তো সন্দেহ হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ বাংলা তরজমাও করে দিলেন, 'ওহে বোকা গাধা, এখানে তোমার কোনো কর্ম নাই।'

মনজুর হেড স্যারের ইংরেজি গালি সাধারণত মনে মনে দেয়। তবে এখন উঁচু গলায় দেয়া যেতে পারে। শোবার ঘর থেকে যাই বলা হোক, বাইরে থেকে কিছু শোনা যায় না। সে হয়তো তার স্যারের মতো গালির বাংলা তরজমাও করত। কিন্তু সে বুঝতে পারছে তাকে বিছানা ছাড়তেই হবে, তলপেটে চাপ পড়ছে, বাথরুমে না গেলেই নয়। কাল রাতে বাথরুম পেয়েছিল, সে বাথরুমে না গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে দু গ্লাস পানি ঘুমাবার আগে খেয়েছিল তার পুরোটাই এখন একটি কিডনিতে জমা হয়েছে। সাধারণ নিয়মে দুটি কিডনিতে জমা হবার কথা— সে সাধারণ নিয়মের বাইরে— তাঁর একটি মাত্র কিডনি। ডান দিকের কিডনি সাত বছর আগে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। বাঁ দিকেরটাও সম্ভবত যাই-যাই করছে। মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা হয়। চোখে অন্ধকার দেখার মতো ব্যথা।

মিলিটারি ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার এস মালেক গত মাসে হাসি হাসি মুখে বললেন, Outlook not so good. মিলিটারি ডাক্তাররা বোধহয় সাধারণ ডাক্তারদের চেয়ে বোকা হয়। বোকা না হলে এই জাতীয় কথা হাসিমুখে বলে কী করে ?

একজন হাসিমুখে কিছু বললে অন্যজনকেও হাসিমুখে জবাব দিতে হয়। মনজুর হাসিমুখে বলল, Outlook not so good বলতে কী মিন করছেন ?

ডাক্তার সাহেবের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। তিনি বললেন, কিডনি যেটা আছে মনে হচ্ছে সেটাও ফেলে দিতে হবে। সিমটম্‌স ভালো না।

মনজুরের বুক শুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। তবু মুখে হাসি ধরে রাখল। হাসাহাসি দিয়ে যে বাক্যবিন্যাস শুরু হয়েছে তাকে বন্ধ করার কোনো মানে হয় না।

যেটা আছে সেটাও ফেলে দিতে হবে ? বলেন কী ? হা- হা- হা-হা।

মিলিটারি ডাক্তার এই পর্যায়ে হকচকিয়ে গেলেন। সরু গলায় বললেন, হাসছেন কেন ? আপনার শরীর থেকে একটা প্রত্যঙ্গ ফেলে দিতে হচ্ছে এর মধ্যে হাসির কী পেলেন ? What is so funny about it ?

মনজুরের গা জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কী ? আমি হাসছি তোর সঙ্গে তাল দিয়ে আর তুই বলছিস What is so funny about it ?

এখনো কড়া নড়ছে।

খুব কম হলেও ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধরে ধাক্কাধাক্কি চলছে। দুটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে—এক. ভিখিরি, যে ঠিক করেছে ভিক্ষার বউনি এই বাড়ি থেকে শুরু করবে। কিছু না নিয়ে যাবেই না। দুই. তাঁর শ্বশুরবাড়ির কেউ। মীরা হয়তো তার কোনো খালাতো, চাচাতো কিংবা মামাতো ভাইকে পাঠিয়েছে। বলে দিয়েছে— 'দেখা না করে আসবি না।' কাজ হচ্ছে সেইভাবেই। গাধাটা খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। মনজুর বিছানা থেকে নামতে নামতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল— এটা কেমন করে সম্ভব যে আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি লোক গাধা ধরনের ? শুধু যে স্বভাবের গাধা তাই না, চেহারাতেও গাধা। জহির নামে মীরার এক খালাতো ভাই আছে যার কান দুটি অস্বাভাবিক লম্বা। মুখও লম্বাটে। ঐ ব্যাটাই এসেছে নাকি ?

কে ?

জ্বি আমি।

আমিটা কে ?

স্যার আমি কুদ্দুস।

কুদ্দুস মনজুরের অফিসের পিওন। সাত সকালে সে এখানে কেন ? মনজুর কি তাকে আসতে বলেছিল ? মনে পড়ল না। আজকাল কিছুই মনে থাকে না। কিডনির সঙ্গে কি স্মৃতিশক্তির কোনো সম্পর্ক আছে ? মনজুর দরজা খুলল।

ব্যাপার কী কুদ্দুস ?

স্যার আমার ছোট বোনটা গত রাত্রে মারা গেছে।

মনজুর তাকিয়ে রইল।

ভোরবেলা কেউ মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এলে তাকে কী বলতে হয় ? সান্ত্বনার কথাগুলো কী ? বলার নিয়মটাই বা কী ? মনজুর খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কুদ্দুস ভিতরে আস। ভেরি স্যাড নিউজ। ইয়ে কী যেন বলে ... ক'টার সময় মারা গেছে ?

রাত আড়াইটার সময় স্যার।

মনজুরের নিজের উপরই রাগ লাগছে। ক'টার সময় মারা গেছে সেই খবরে তার দরকার কী ? আড়াইটার সময় সে কী করছিল ? বিস্কিটের গুঁড়া খাচ্ছিল বলে মনে হয়।

কুদ্দুস মাথা নিচু করে বলল, কিছু টাকা দরকার ছিল স্যার। হাত একেবারে খালি।

মনজুর স্বস্তি বোধ করল। সান্ত্বনা দেবার চেয়ে টাকা দেয়া অনেক সহজ। সান্ত্বনা দেয়ার অসংখ্য পথ আছে, টাকা দেয়ার একটাই পথ। মানিব্যাগ বের করে হাতে দিয়ে দেয়া।

কত টাকা দরকার ?

স্যার আমি তো জানি না। লাশের খরচপাতি আছে। দেশে নিয়া গোর দেয়ার ইচ্ছা ছিল; সেটা পারব না। সবই স্যার কপাল।

হাজার খানিক দিলে হয় ?

দেন স্যার।

আস, ভিতরে এসে বস। নাম কী ছিল তোমার বোনের ?

সাবিহা।

ও আচ্ছা, সাবিহা।

মনজুর আবার নিজের উপর বিরক্ত হলো। 'নাম কী' প্রশ্নটা সে শুধু শুধু কেন করল ? নাম দিয়ে তার দরকার কী ? মূল কথা হচ্ছে বেচারি মারা গেছে। তার নাম সাবিহা হলেও যা ময়ূরাক্ষী হলেও তা। অবিশ্যি ময়ূরাক্ষী নাম হলে এক পলকের জন্য হলেও মনে হত—"আহা, এত সুন্দর নামের একটা মেয়ে মারা গেল !"

তুমি এই চেয়ারটায় বস কুদ্দুস। জীবন-মৃত্যু হচ্ছে তোমার কী যেন বলে ... উইল অব গড, মানে ইয়ে ... দেখি টাকাটা নিয়ে আসি।

মানিব্যাগে আছে মাত্র একশ আশি টাকা। টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে আছে নব্বুই টাকা— এতো দেখি বিরাট বেকায়দা হয়ে গেল। বাড়িওয়ালার কাছে চাইলে কি পাওয়া যাবে ? সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাকে এই মাসের ভাড়াই দেওয়া হয় নি। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া দেওয়ার কথা, আজ বার তারিখ।

কুদ্দুস।

জ্বি স্যার।

মানে একটা সমস্যা হয়ে গেল। ঘরে এত টাকা নেই। এখানে অল্প কিছু আছে। সরি, আমি ভেবেছিলাম... কুদ্দুস তুমি চা-টা কিছু খেয়েছ ?

জ্বি না স্যার।

বস, চা খেয়ে যাও। শুধু চা— একা থাকি। ঘরে নাশতার কোনো ব্যবস্থা নেই।

রেস্টুরেন্টে নাশতা খাই। বরং তুমি এক কাজ কর— চল আমার সঙ্গে চা-নাশতা খাও।

লাগবে না স্যার। আমি যাই।

মনটাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা কর। জীবন-মৃত্যুর উপর আমাদের কোনো ইয়ে নেই। মানে গডস উইল।

আমি স্যার যাই। দেরি হয়ে গেছে।

আচ্ছা যাও।

কুদ্দুস চলে যাবার পর মনজুর চায়ের পানি চড়াল। পানি না চড়ালেও হত। চিনি শেষ হয়ে গেছে, চিনির কৌটায় যা অবশিষ্ট ছিল তা কাল রাতে সে খেয়ে নিয়েছে। আর কোনো কৌটায় চিনি আছে কি ? সেদিন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা কৌটা বের হলো, যার গায়ে লেখা 'ইমার্জেন্সি চা পাতা'। মীরার কাণ্ড— সে চায়ের কৌটার বাইরেও একটা ইমার্জেন্সি কৌটা রেখেছে। এই কৌটায় সে নিশ্চয় কখনো হাত দেয় না। সেরকম ইমার্জেন্সি চিনি লেখা কোনো কৌটা কি আছে ? চিনির কৌটা পাওয়া গেল না, তবে একটা কৌটা পাওয়া গেল যার গায়ে লেখা— 'সমুদ্র'। কৌটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখার মানে কী ?

মনজুর রাতে ক্ষিধে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। সেই ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। আরেক চামচ বিস্কিটের গুঁড়া কি খেয়ে নেবে ? কুদ্দুসকে টাকা দিতে না পারার অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছু সান্ত্বনার কথা তো তাকে অবশ্যই বলা উচিত ছিল। এইসব পরিস্থিতিতে কী বলতে হয় বা বলতে হয় না তার উপর বই-টই থাকা উচিত ছিল। বিদেশে নিশ্চয়ই আছে—

"মৃত্যুশোকে কাতর মানুষকে সান্ত্বনা দেবার একশটি উপায়"

আধুনিক মানুষদের জন্যে এ জাতীয় বই খুবই প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় বই-এ বাজার ভর্তি, প্রয়োজনীয় বই খুঁজলে পাওয়া যায় না। কথা বলার আর্টের উপরও একটা বই থাকা দরকার। কেউ কেউ এত সুন্দর করে কথা বলে, কেউ কথাই বলতে পারে না। যখন মজার কোনো গল্প বলে তখন ইচ্ছা করে একটা চড় বসিয়ে দিতে।

বর্তমানে সময়টা হলো কথা-নির্ভর। অথচ সেই কথাই লোকজন গুছিয়ে বলতে পারছে না। কথা বলার উপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটা কোর্স থাকলে ভালো হত। ইনস্ট্রাকটারদের কোনো ডিগ্রি থাকতে হবে না, তবে কথা বলার ব্যাপারে তাদের হতে হবে এক একজন এক্সপার্ট। যেমন মীরা। মনজুরের ধারণা, মীরার মতো গুছিয়ে এবং সুন্দর করে কোনো মেয়ে কথা বলতে পারে না। প্রথম দিনে খানিকক্ষণ কথা বলার পর মীরা বলল, আপনার নামের প্রথম অক্ষর এবং শেষ অক্ষর দিয়ে আমার নাম— এটা কি আপনি লক্ষ করেছেন ? মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, এখন লক্ষ করলাম। আগে করি নি।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, নামের এই মিল কী প্রকাশ করে বলতে পারেন ?

জ্বি না।

চিন্তা করে দেখুন তো বের করতে পারেন কিনা। যদি বের করতে পারেন তাহলে টেলিফোন করে জানাবেন। যদি বের করতে না পারেন তা হলে টেলিফোন করবেন না।

মনজুর তৃতীয় দিনে টেলিফোন করল। সে কে, তার কী নাম কিছুই বলতে হলো না। হ্যালো বলতেই মীরা বলল, ও আপনি ? রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছেন ? জানতাম আপনি পারবেন।

মনজুর কাঁচুমাচু গলায় বলল, জ্বি না, পারি নি।

পারেন নি তাহলে টেলিফোন করলেন যে ?

আপনার কাছ থেকে জানার জন্যে।

আচ্ছা, আপনাকে আরো সাতদিন সময় দিচ্ছি। সাতদিন পরেও যদি না পারেন তাহলে বলে দেব। রাখি, কেমন ?

মনজুর অনেক কিছু ভাবল— নামের মিল কী বুঝাচ্ছে ? চার অক্ষরের দুটি মিলে যাচ্ছে। প্রথমটি এবং শেষটি। তাতে কী হয় ? আদৌ কি কিছু হয় ?

সাতদিন পর মীরার সঙ্গে আবার কথা হলো। সে হাসতে হাসতে বলল, এখনো পারেন নি ? এত সহজ আর আপনি পারছেন না।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিম্ন পর্যায়ের। আমার মেজ মামার ধারণা আমি গাঁধা-মানব।

তাই তো দেখছি।

মিলটা কী দয়া করে যদি বলেন...

মীরা হাসতে হাসতে বলল, ঠিক করে বলুন তো আপনার আগ্রহ কি মিল জানার জন্যে না আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ?

মনজুর গুছিয়ে কথা বলতে পারলেও তৎক্ষণাৎ তার মাথায় হঠাৎ করে কোনো জবাব এল না। মীরা বলল, হ্যালো, কথা বলছেন না কেন ? আপনি অ্যামবারাসড্ বোধ করছেন ?

জ্বি না।

মনে হচ্ছে আপনি অ্যামবারাসড্। সরি, আমি কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। রাখি, কেমন ? পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

মনজুর দুধ চিনিবিহীন চা নিয়ে বিছানায় বসল। আশ্চর্য, টেলিফোনে কুঁ-কুঁ-পিঁড়িং জাতীয় শব্দ হচ্ছে ! ব্যাপারটা কী ? মনজুর অবাক হয়ে তাকাল। গত দুমাস ধরে টেলিফোন ডেড। বিলের টাকা জমা না দেয়ায় লাইন সম্ভবত কেটে দিয়েছে। টেলিফোন অফিসে একবার যাওয়া দরকার। যেতে ইচ্ছা করছে না। টেলিফোন ছাড়া তার খুব যে অসুবিধা হচ্ছে তাও না। বরং এক রকম আরামই অনুভব করছে।

টেলিফোনে আবার কুঁ-কুঁ শব্দ। আপনা আপনি ঠিক হয়ে গেল নাকি ! এ দেশে সবই সম্ভব। যে নিয়মিত বিল দিয়ে যায় তার লাইন কাটা যায় আর তার মতো ডিফল্টারদের কাটা লাইন আপনা আপনি মেরামত হয়ে যায়।

মনজুর রিসিভার তুলে কোমল গলায় বলল, হ্যালো। হ্যালো।

ওপাশ থেকে আট ন বছর বয়সী বালকের গলা শোনা গেল।

হ্যালো বড় চাচু ?

আমি বড় চাচু না খোকা— তুমি কেমন আছ ?

আমি ভালো, আপনি কে ?

আমার নাম মনজুর।

মনজুর চাচু ?

তাও বলতে পার। তুমি স্কুলে যাও নি?

উঁহুঁ।

কেন বল তো?

আমার জ্বর।

বল কী, একটু আগে তো বললে— তুমি ভালো!

ছেলেটা হকচকিয়ে গেল। ভুল ধরিয়ে দিলে ছোটরা অসম্ভব লজ্জা পায়।

নাম কী তোমার খোকা?

ইমরুল।

ইমরুল? সর্বনাশ, তুমি যখন একটু বড় হবে সবাই তোমাকে কী বলে ক্ষ্যাপাবে জান? সবাই বলবে— ভিমরুল।

ভিমরুল কী?

ভিমরুল কী বলার আগেই টেলিফোন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একেবারেই ঠাণ্ডা। শোঁ-শোঁ-পি-পি কোনো আওয়াজ নেই। টেলিফোনটা ঠিক থাকলে মীরাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা যেত— কৌটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখা কেন? উত্তরে মীরা তার স্বভাব মতো বলতো—তুমি আন্দাজ কর তো কেন?

আমি পারছি না।

তবু চেষ্টা কর। তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।

আধুনিক জগতের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে আছে— রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ... অষ্টম আশ্চর্য (মনজুরের মতে) তার সঙ্গে মীরার বিয়ে। যাকে বলে হুলস্থুল বিবাহ। মীরার বাবা, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মনসুর উদ্দিন এক হাজার লোককে দাওয়াত করেছিলেন। দাওয়াতি লোকজনদের মধ্যে তিনজন ছিলেন মন্ত্রী। ফ্ল্যাগ দেয়া গাড়ি করে এসেছিলেন। তাঁরা কিছুই খেলেন না। তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন মনজুরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, হ্যালো ইয়াং ম্যান। বেস্ট অব ইওর লাক।

বাসর হলো মীরার বড় ভাইয়ের বাসায়। বিছানার উপর বেলি ফুলের যে চাদর বিছানো তার দামই নাকি দুহাজার টাকা।

মীরা বাসর রাতে প্রথম যে কথাটি বলল, তা হচ্ছে— এই বিছানার বিশেষত্ব কী বল তো?

মনজুর কিছু বলতে পারল না।

কী— বলতে পারলে না? এটা হচ্ছে ওয়াটার বেড। বাংলায় জল-তোশক বলতে পার। এখানে ঘুমালে মনে হবে পানির মধ্যে ঘুমিয়ে আছ।

বল কী!

ভাইয়া আমেরিকা থেকে আনিয়েছে। সে খুবই শৌখিন। বেচারা নিজে অবশ্যি এই বিছানায় ঘুমাতে পারে না। ওর পিঠে ব্যথা। ডাক্তার নরম বিছানায় শোয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বেচারা ঘুমায় মেঝেতে পাটি পেতে। বাধ্য হয়ে ভাবিকেও তাই করতে হয়। একে বলে পোয়েটিক জাসটিস। আচ্ছা, তুমি এমন মুখ ভোঁতা করে বসে আছ কেন? কথা বল।

কী কথা বলব?

কী কথা বলবে সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? ইন্টারেস্টিং কোনো কথা বল। বাসর রাতের কথা বাকি জীবনে অসংখ্যবার মনে করা হবে— কাজেই কথাগুলি খুব সুন্দর হওয়া উচিত।

মনজুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের বাথরুমটা কোন দিকে?

মীরা হেসে ফেলে বলল, তোমার প্রথম কথা আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথাটা কী?

ফুলের গন্ধে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ফুলগুলোকে অন্য কোথাও রাখা যায় না?

না। আর কিছু বলবে?

ইন্টারেস্টিং আর কিছু তো মনে আসছে না। তুমি বল, আমি শুনি। বলতে বলতে মনজুর হাই তুলল।

মীরা বলল, তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ। গত দুই রাত এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। আমার ছোট্ট বাসা আত্মীয়স্বজনে গিজগিজ করছে— শোব কী, দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই।

খুব বেশি ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়। বাসর রাতে যে বকবক করতেই হবে এমন কথা নেই।

মশারি ফেলবে না?

দরজা-জানালায় নেট লাগানো— মশা আসবে না, তাছাড়া ঘরে ফুল থাকলে মশা আসে না। ফুলের গন্ধ মশারা সহ্য করতে পারে না।

তাই নাকি? জানতাম না তো!

ঘুম পেলে শুয়ে পড়।

মনজুর শুয়ে পড়ল। এক ঘুমে রাত কাবার। মনজুরের ধারণা, সবচে' আরামের ঘুম সে ঘুমিয়েছে বাসর রাতে।

কাফে লবঙ্গ চা খেতে খেতে মনজুর আজ সারাদিনে কী কী করবে ঠিক করে ফেলল। তার ভিজিটিং কার্ডের উল্টো পিঠে এক দুই করে লিখল,

(১) অফিস, সকাল দশটা।

(২) বড়মামার সঙ্গে কথাবার্তা এবং তার অফিসে দুপুরের খাওয়া।

(৩) খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা।

(৪) ইদরিসের সঙ্গে ঝগড়া। [সন্ধ্যায়, তাকে তার বাসায় ধরতে হবে।]

(৫) মীরার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা। [রাত দশটার পর।]

এই জাতীয় একটা লিস্ট মনজুর প্রতিদিন ভোরেই করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে—লিস্ট অনুযায়ী কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত করা হয় না। তবু লিস্টটা করলে মনে এক ধরনের শান্তি পাওয়া যায়।

লিস্টের পাঁচ নম্বরে মীরার সঙ্গে কথা বলা। রাত দশটার পরে তাকে সব সময় পাওয়া যায় না। এগারটার পর হলে মোটামুটি নিশ্চিত যে পাওয়া যাবে। শীতের রাতে এগারটার পর টেলিফোন জোগাড় করাই এক সমস্যা। সব দোকানপাট বন্ধ। বাড়িওয়ালার বাসা থেকে করা যায় তবে তার জন্যে বাড়ির ভাড়া ক্লিয়ার করা দরকার। আজ রাতে বাড়িভাড়া নিয়ে যদি যাওয়া যায় তাহলে উঠে আসার সময় হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, ভাই সাহেব! টেলিফোনটা ঠিক আছে?

উনার টেলিফোন অবশ্যি বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকে। নিজেই খারাপ করে রাখে কিনা কে জানে!

তারচে' এখন চলে গেলে কেমন হয়? মীরাকে ভোরবেলার দিকে সব সময় পাওয়া যায়। মনজুর ভিজিটিং কার্ড বের করে পাঁচ নম্বর আইটেমে টিক চিহ্ন দিল।

মীরা সহজ স্বরে বলল, তুমি এত ভোরে!

মনজুর বলল, ভোর কোথায়। আটটা চল্লিশ বাজে।

কোনো কাজে এসেছ?

ভাবলাম সেপারেশনের টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্‌গুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করি।

মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্ মানে? ঠাট্টা করছ নাকি? তোমার কাছে আমি কি কিছু চাচ্ছি? তোমার এমন কোনো রাজত্ব নেই অর্ধেক আমাকে দিয়ে দিবে।

তা ঠিক, তবু আইনের কিছু ব্যাপারস্যাপার আছে।

তার জন্যে তো গত মাসের সাতাশ তারিখে ভাইয়া সুপ্রিম কোর্টের লইয়ার এম. জামানকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন। তোমার আসার কথা ছিল, তুমি আস নি।

সেটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি। হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে গেল।

কী তোমার অফিস আর কী তার জরুরি কাজ! একটা কথা পরিষ্কার করে বল তো—সেপারেশনে তোমার কি ইচ্ছা নেই?

আরে কী বলে! ইচ্ছা থাকবে না কেন? দুজন মিলেই তো ঠিক করলাম। চা খাওয়াতে পার?

মীরা চা আনতে উঠে গেল। তাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। বিয়ের সময় এতটা সুন্দর ছিল না। আলাদা হবার পর থেকে সুন্দর হতে শুরু করেছে। খানিকটা রোগাও হয়েছে। রোগার জন্যেই লম্বা লম্বা লাগছে নাকি? চেহারায় চাপা আনন্দের আভা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মীরা এখন সুখে আছে। সমস্ত চেহারায় মায়াবতী মায়াবতী ভাব। নীল শাড়ির জন্যেও হতে পারে। ধবধবে সাদা ব্লাউজের সঙ্গে নীল শাড়ি পরলে মেয়েদের মধ্যে একটা আকাশ আকাশ ভাব চলে আসে। শাড়িটা আকাশ, ব্লাউজ হলো পূর্ণিমার চাঁদ। উপমা নিখুঁত হলো না। রাতের আকাশ নীল হয় না। হয় ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

নাও, চা নাও। চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেব ?

না।

নাশতা খেয়ে এসেছ ?

হুঁ।

কোথায় খেলে ? তোমার সেই কাফে লবঙ্গ ?

হুঁ।

এক অক্ষরে জবাব দিচ্ছ কেন ? আমরা আলাদা থাকছি বলে কথা বলা যাবে না তা তো না। কী কথা ছিল ? সেপারেশনের পরে আমাদের যদি পথেঘাটে দেখা হয় তাহলে আমরা সিভিলাইজড্ মানুষের মতো বিহেভ করব।

তা অবশ্যই করব।

এক ধরনের সাধারণ বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে থাকবে। তুমি চা খাচ্ছ না কেন ? চিনি বেশি হয়েছে ?

না। চিনি ঠিক আছে।

তোমাকে অসুস্থ অসুস্থ লাগছে। তোমার শরীরে অসুখ অসুখ গন্ধ।

মনজুর কিছু না বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেটের কড়া ধোঁয়ায় অসুখ অসুখ গন্ধটা যদি তাড়ানো যায়। মীরার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়েও প্রবল। যখন অসুখ অসুখ গন্ধ বলছে তখন বুঝতে হবে ঠিকই বলছে।

কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ? অসুখ নাকি ?

আরে না। বিনা পেস্টে দাঁত মেজেছি— গন্ধ যা পাচ্ছ আমার মনে হয় মুখ থেকে পাচ্ছ।

মুখের গন্ধ আমি চিনি। তোমার গা থেকে জ্বর জ্বর গন্ধ আসছে। সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছ।

হেভি টেনশানে থাকি। সিগারেটের ধোঁয়ার উপর দিয়ে টেনশানটা পার করার চেষ্টা করি।

কীসের এত টেনশান ?

আছে অনেক। আচ্ছা তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করি, ধর একজন লোকের খুব নিকট কোনো আত্মীয় মারা গেছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কী বলে সান্ত্বনা দিবে ?

কে মারা গেছে ?

কে মারা গেছে সেটা জরুরি না । কী কথা বললে সে সান্ত্বনা পাবে সেটা বল।

কোনো কথাতেই সে সান্ত্বনা পাবে না। তুমি যদি তার গায়ে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাক তাহলে খানিকটা সান্ত্বনা পেতে পারে।

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠল না। বসে রইল। মনজুর বলল, আজ উঠি।

মীরা বলল, তুমি না টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্ নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলে ? এখন চলে যাচ্ছ যে ?

আরেকদিন আলাপ করব। অফিসের সময় হয়ে গেল।

এ মাসের কুড়ি তারিখে কি তুমি আসতে পারবে? কুড়ি তারিখ বুধবার। সন্ধ্যা সাতটার পর। পারবে আসতে?

পারব।

তাহলে ঐ দিন জামান সাহেবকে আসতে বলব।

জামান সাহেবটা কে?

এর মধ্যে ভুলে গেলে? লইয়ার।

ও আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্যই আসব। অফিসে গিয়েই ডায়েরিতে লিখে রাখব। এবার আর ভুল হবে না। তবে সেইফ গাইড থাকার জন্যে তুমি বুধবার সকালেই একটা টেলিফোন করে দিও। পারবে না? টেলিফোন নাম্বার আছে না?

আছে।

মনজুর বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজার চৌকাঠে একটা ধাক্কা খেল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার— এ বাড়ির বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় প্রতিবার চৌকাঠে ধাক্কা খায়। এর কারণটা কী কে জানে? এই ঘর তাকে পছন্দ করে না— নাকি দরজা তাকে পছন্দ করে না?

এই জগতে জড় বস্তুর কি পছন্দ-অপছন্দ আছে?

রাস্তায় নেমে মনজুরের মনে হলো, আসল জিনিসটাই মীরাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। কৌটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখা কেন? আবার কি ফিরে যাবে? না— থাক।

দিলকুশা এলাকায় মনজুরের অফিস। এগার তলার ছটি কামরা। ফ্লোর স্পেস আট হাজার স্কয়ার ফিট। অফিসের নাম থ্রি-পি কনস্ট্রাকশনস্। কোম্পানির মালিক নুরুল আফসার মনজুরের স্কুলজীবনের বন্ধু। স্কুলে নুরুল আফসারের নাম ছিল— মিডা কাচামরিচ। ছেলেবেলাতেই লক্ষ করা গেছে নুরুল আফসার চট করে রেগে যায়, তবে রেগে গেলেও অতি মিষ্টি ব্যবহার করে। মিডা কাচামরিচ নামকরণের এই হলো রহস্য।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর মনজুর ভর্তি হলো জগন্নাথ কলেজে। নুরুল আফসার চলে গেল আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ক্রিয়েটিভ লিটারেচর পড়তে। সায়েন্স পড়তে তার নাকি আর ভালো লাগছে না। ক্রিয়েটিভ লিটারেচরের ক্লাসগুলি তার খুবই পছন্দ হলো। প্রথম সেমিস্টারে খুব খেটেখুটে সে একটা অ্যাসাইনমেন্টও জমা দিল। অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে তিন হাজার শব্দে সেইন্ট জোসেফ সেমিটিয়ারির একটি বর্ণনা দিতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার দিন পাঁচেক পর কোর্স কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ক্লার্ক ব্লেইস তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার রচনা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। It is interesting.

তোমার পছন্দ হয়েছে?

ইন এ ওয়ে হয়েছে। তুমি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছ। মোট ক'টি কবর আছে লিখেছ। কে কবে মারা গেছে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করেছ। কবরখানা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কত তা দিয়েছ— যাকে বলা যায় পারফেক্ট ফটোগ্রাফিক ডেসক্রিপশন।

থ্যাংক ইউ।

কিন্তু সমস্যা কি জান— এই রচনা প্রমাণ করেছে তোমার কোনো ক্রিয়েটিভিটি নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দেব অন্য কিছু পড়তে। যেমন ধর ইনজিনিয়ারিং।

তোমার ধারণা ইনজিনিয়ারদের ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন নেই ?

অবশ্যই আছে। তাদের যতটুকু ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন তোমার তা আছে।

নুরুল আফসার ছ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে সিভিল ইনজিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি, আমেরিকান স্ত্রী পলিন এবং দুই যমজ কন্যা পেত্রিসিয়া ও পেরিনিয়াকে নিয়ে দেশে ফিরল। চাকরির চেষ্টা করল বেশ কিছুদিন— লাভ হলো না। শেষ চেষ্টা হিসেবে খুলল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। স্ত্রী এবং দুই কন্যার আদ্যক্ষর নিয়ে কোম্পানির নাম হলো Three P.

মনজুর জন্মলগ্ন থেকেই এই কোম্পানির সঙ্গে আছে। নুরুল আফসার শুরুতে বলেছিল, বেতন দিতে পারব না— পেটেভাতে থাকবি, রাজি থাকলে আয়। যদি কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায় তুই তোর শেয়ার পাবি। আমি তোকে ঠকাব না। বিশ্বাস কর ঠকাব না।

কোম্পানি বড় হয়েছে। ফুলে-ফেঁপে একাকার। গত বছর দু কোটি টাকার ব্যবসা করেছে— এ বছর আরো করবে। অফিস শুরু হয়েছিল তিনজনকে নিয়ে, আজ সেখানে একশ এগারজন কর্মচারী। মনজুরের হাতে নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব নেই। চিঠিপত্রের যোগাযোগের ব্যাপারটা সে দেখে। পি.আর.ও. বলা যেতে পারে। প্রতি মাসে তার একাউন্টে আট হাজার টাকা জমা হয়। তার চাকরির শর্ত কী, দায়িত্ব কী এই নিয়ে নুরুল আফসারের সঙ্গে তার কখনো কথা হয় না।

অফিসঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে মনজুরের ঘর। কামরাটা ছোট তবে মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেয়ালে পালতোলা নৌকার একটি পেইন্টিং আছে। ঘরের এক প্রান্তে ডিভানের মতো আছে। ডিভানের পাশেই বুক শেলফে বেশ কিছু বাংলা বই যার বেশিরভাগই কবিতা। তার কোনো কাব্যপ্রীতি নেই। কবিতার বইগুলো মীরা কিনে দিয়েছে। ডিভানে শুয়ে শুয়ে আজকাল সে মাঝে মাঝে বইগুলোর পাতা উল্টায় এবং ভ্রু কুঁচকে ভাবে— লোকজন কি সত্যি আগ্রহ করে কবিতা পড়ে ? যদি পড়ে তাহলে কেন পড়ে ?

মনজুরের ঘরে গত পনের দিন ধরে বসছে জাহানারা। জাহানারা টাইপিস্ট হিসেবে তিন মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। বসার কোনো জায়গা নেই। একেক সময় একেক জায়গায় বসছে। বড় সাহেব নুরুল আফসারের পাশেই হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে নতুন ঘর তার জন্যে তৈরি হবার কথা। যতদিন হচ্ছে না, ততদিন জাহানারা মনজুরের ঘরে বসবে এই ঠিক হয়েছে। ব্যবস্থাটা মনজুরের পছন্দ হয় নি। একটি অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ে ঘরে থাকলে এক ধরনের অস্বস্তি লেগেই থাকে। সহজ হওয়া যায় না। ডিভানে গা এলিয়ে কবিতার বইয়ের পাতা উল্টানোও সম্ভব না। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মুখে কিছুই বলে না তবে মনজুর লক্ষ করেছে সিগারেট ধরালেই জাহানারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

মনজুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কী খবর জাহানারা ?

জ্বি স্যার, খবর ভালো।

মুখ এত গম্ভীর কেন ?

জাহানারা হাসল। সে এখনো দাঁড়িয়ে। বসতে না বলা পর্যন্ত সে বসবে না।

বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? তোমার ঘর আজ তৈরি হয়ে যাবার কথা না ?

ঘর তৈরি হয়েছে স্যার।

তাহলে আর এখানে কেন, নতুন ঘরে যাও। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক।

আপনাকে বলে তারপর যাব, এই জন্যে বসে আছি।

ভেরি গুড। বড় সাহেব কি এসেছেন নাকি ?

জ্বি না স্যার। উনি আজ আসবেন না। চিটাগাং যাবেন।

জাহানারা হ্যান্ডব্যাগ খুলে মুখবন্ধ খাম বের করল। নিচু গলায় বলল, স্যার আপনার টাকাটা। বলতে বলতে জাহানারার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মনজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল— মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের লাজুক। এই ধরনের মেয়েদের কপালে দুঃখ আছে। এরা নিজেরা সমস্যা তৈরি করে এবং অন্যের তৈরি সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে।

টাকা ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি এত দ্রুত করার দরকার ছিল না। নিশ্চয়ই নানান ঝামেলা করে তাকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। মনজুর বলল, তোমার এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, তুমি আরো পরে দিও। আর পুরো টাকাটা একসঙ্গে দেবারও দরকার নেই। তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিও।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

আর শোন, মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকেই টাকাপয়সা ধার করতে হয়। এত লজ্জা পাওয়ার তো এর মধ্যে কিছু নেই। আমাদের যে বড় সাহেব, তিনিও ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ধার নিয়েছেন।

জাহানারা হেসে ফেলল।

মনজুর বলল, তুমি একটা কাজ করতে পারবে ?

অবশ্যই পারব। কী কাজ স্যার ?

আমি এই মাসের বেতন তুলি নি। একটা চেক দিচ্ছি, ক্যাশিয়ার সাহেবকে বল ভাঙিয়ে দিতে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

আর বরুণ বাবুকে বল, আমাদের অফিসের একজন পিওন আছে— আব্দুল কুদ্দুস নাম, জেনারেল ফাইল দেখে তার ঠিকানা বের করতে। ও আজ সকালে কিছু টাকার জন্যে এসেছিল। দিতে পারি নি। ওর একটা বোন মারা গেছে।

জাহানারা চলে গেল।

মনজুরের টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অর্থাৎ করার কিছুই নেই। মনজুর দুমাস ধরেই লক্ষ করছে, তার টেবিলে কোনো ফাইল আসছে না। বড় সাহেব কি তার টেবিলে ফাইল না পাঠানোর কোনো নির্দেশ দিয়েছেন ? এমন না যে অফিসে কোনো কাজকর্ম নেই। বরং উল্টো। কাজকর্মের চাপ অনেক বেশি। শুধু তার টেবিলেই কিছু নেই। এটা নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার, কিন্তু নিজ থেকে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। শরীরে এক ধরনের আলস্য এসে গেছে। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে ইচ্ছা করে না।

যা হবার হবে এরকম একটা ভাব চলে এসেছে এবং তা এসেছে খুব সম্ভব মীরার কারণে। মীরা চলে না গেলে হয়তোবা এ ধরনের আলস্য আসত না।

মনজুর মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বের করল। আজ দিনে করণীয় কাজের পাঁচটির মধ্যে দুটি করা হয়ে গেছে। অবশ্যি এর মধ্যে আরেকটি যুক্ত হয়েছে।— কুদ্দুসকে টাকা দেয়া। কাউকে দিয়ে টাকাটা পাঠাতে হবে; নাকি নিজেই চলে যাবে ? কুদ্দুসের গায়ে হাত রেখে কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসবে ? সন্ধ্যার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আপাতত তিন নম্বর আইটেমটির ব্যবস্থা করা যাক। তিন নম্বর আইটেম হচ্ছে— খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা (যেহেতু আগের দুটি চিঠি পান নি)। মনজুর কাগজ-কলম নিয়ে বসল। একটা দীর্ঘ চিঠি লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বসা। হবে অবশ্য উল্টোটা— ছোট্ট চিঠি লেখা হবে। কয়েক লাইন লেখার পরই মনে হবে— আর কিছু লেখার নেই।

শ্রদ্ধেয়া খালা

আমার সালাম জানবেন। আমি নিয়মিত আপনার চিঠি পাচ্ছি। মনে হয় আপনি আমার চিঠি পাচ্ছেন না।

আমি ভালোই আছি বলা চলে। তবে যে কিডনিটি এখনো অবশিষ্ট আছে তাতে বোধহয় কিছু সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার মনগড়াও হতে পারে। যেহেতু একটিমাত্র কিডনি অবশিষ্ট সেহেতু কিছু হলেই মনে হয় কিডনি বুঝি গেল। আপনি শুধু শুধু চিন্তা করবেন না। আপনার আবার অকারণ চিন্তা করার অভ্যাস। খালুজানকে আমার সালাম দিবেন।

ইতি

আপনার মনজু

চিঠি ছোট হবে আগেই বোঝা গিয়েছিল, এতটা ছোট হবে তা বোঝা যায় নি। পুরো পাতাটা খালি খালি লাগছে। পুনশ্চ দিয়ে আরো কয়েকটা লাইন না ঢুকালেই না। কী লেখা যায় সেটাই সমস্যা।

পুনশ্চ : ঢাকায় এবার অসম্ভব শীত পড়েছে। আপনাদের এদিকে শীত কেমন ? নীতু কেমন আছে ? তার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে ?

নীতুকে একটা আলাদা চিঠি দেয়া উচিত ছিল। বেচারা প্রতি সপ্তাহে একটা চিঠি দেয়— কখনো সেইসব চিঠির জবাব দেয়া হয় না। তাতে নীতুর উৎসাহে ভাটা পড়ে না। শিশুদের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তারা প্রতিদান আশা করে কিছু করে না। কখনো না। বড়রাই সবসময় প্রতিদান চায়।

মনজুরের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এই টেলিফোন সেটে কোনো গণ্ডগোল আছে। তীক্ষ্ণ শব্দ হয়। মাথা ধরে যায়।

হ্যালো।

মনজুর কেমন আছিস তুই ?

মনজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বড় সাহেবের গলা। একই সঙ্গে তার ছেলেবেলার বন্ধু এবং বস। টেলিফোনে নুরুল আফসারের গলা— ইমরুল নামের ঐ ছেলেটির গলার

মতোই লাগছে। কেমন যেন অভিমান মেশা।

কী-রে কথা বলছিস না কেন ? কেমন আছিস ?

ভালো।

তোর বাসার টেলিফোন নষ্ট নাকি ? কয়েকবার টেলিফোন করেছিলাম, ভোঁ-ভোঁ শব্দ হয়।

টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে।

ঠিক করা। চারপাশে মৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে বাস করার কোনো মানে হয় ? মানুষ মরে গেলে কিছু করা যায় না— যন্ত্রপাতি মরে গেলে তাদের বাঁচানো যায়।

এইকথা বলার জন্যেই টেলিফোন করেছিস— না আরো কিছু বলবি ?

হ্যাঁ বলব। মীরা নাকি তোকে ছেড়ে চলে গেছে ?

হুঁ।

ব্যাপারটা ঘটল কবে ?

এই ধর দিন বিশেক।

আমি তো কিছুই জানতাম না। আজ জালাল সাহেব আমাকে বললেন— মীরার বড় ভাই। চিনতে পারছিস ?

হ্যাঁ পারছি।

তাঁকে খুব খুশি দেখলাম। তাঁর সঙ্গে তোর কোনো গণ্ডগোল ছিল নাকি ?

না।

এত চমৎকার একটা মেয়ে ধরে রাখতে পারলি না ? তুই তো বিরাট গাধা।

মীরাও আমাকে ধরে রাখতে পারল না— তাকেও কি মহিলা গাধা বলা যায় না ?

তোর সঙ্গে পরে কথা বলব। গাড়ি হর্ন দিচ্ছে।

নুরুল আফসার লাইন কেটে দিলেন।

মীরার সঙ্গে মনজুরের পরিচয় নুরুল আফসারের মাধ্যমে। মীরার বাবা মনসুরউদ্দিন, নুরুল আফসারের আপন ফুপা। সে-ই মনসুরউদ্দিনের কাছে মনজুর একটা চিঠি নিয়ে গিয়েছিল।

ক্ষমতাবান মানুষরা সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাৎ দেন না। তিনি বলে পাঠালেন— অপেক্ষা করতে। সে ঘণ্টাখানিক বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে লাগল। মনসুরউদ্দিন সাহেব এই সময় বের হয়ে এলেন এবং কঠিন গলায় বললেন— এই যে ছেলে, তুমি কী মনে করে আমার ফ্লাওয়ার বেডের উপর হাঁটছ ? কটা গাছ তুমি নষ্ট করেছ জান ? ফ্লাওয়ার বেড কাকে বলে সেটা জান ? তুমি কোথাকার মূর্খ ?

মনজুর পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল। একী সমস্যা !

কথা বলছ না কেন ? তুমি কোথাকার মূর্খ সেটা জানতে চাই।— Speak out loud.

মীরা হৈচৈ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে হাসিমুখে মনজুরকে বলল, আপনি কাইন্ডলি আমার সঙ্গে আসুন তো। প্লিজ আসুন। প্লিজ।

মীরা তাকে বারান্দার এক কোণায় নিয়ে নিচু গলায় বলল, বাবার ব্যবহারে আমি খুবই দুঃখিত, খুবই লজ্জিত। বাবার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। বাবাকে প্রথম দেখছেন বলে এ রকম মনে হচ্ছে। আপনাকে বাবা যেভাবে ধমক দিলেন ফুলের গাছগুলোকেও তিনি ঠিক সেইভাবে ধমক দেন। মাঝে মাঝে কিছু কিছু গাছকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আশা করি বাবার মানসিকতা কিছুটা বুঝতে পারছেন। আপনি এখানে চুপ করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসি। বাবা যদি কিছু বলেন— কোনো উত্তর দেবেন না। তবে আমার মনে হয় না তিনি কিছু বলবেন। একবার রেগে যাবার পর ঘণ্টা দু'এক তিনি খুব ভালো থাকেন।

মীরার কথা দেখা গেল সত্যি। কিছুক্ষণ পরই মনসুর উদ্দিন বারান্দায় উঠে এলেন এবং কোমল গলায় মনজুরকে বললেন— আপনাকে তো চিনতে পারলাম না! আপনার পরিচয় ? আপনাকে কি চা-নাশতা কিছু দেয়া হয়েছে ?

কুদ্দুসের বাসা যাত্রাবাড়িতে।

হাফ বিল্ডিং। পাকা মেঝে, উপরে টিন। বাঁশের বেড়া দিয়ে বাড়ি ঘেরা। বেড়ার আড়াল থেকে কলাগাছের নধর পাতা উঁকি দিচ্ছে।

মনজুর খানিকটা বিস্ময় নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। এটা কুদ্দুসের বাড়ি তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ শ্রীমন্ত চেহারা। বাড়ির ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। সব কেমন ঝিম মেরে আছে। তাই অবশ্যি থাকার কথা। মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে সবাই বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্যে চুপ করে যায়। আবার কান্নাকাটি শুরু হয় দিন দুএক পর।

মনজুর কড়া নাড়তেই বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতেও তাঁর গায়ে পাতলা জামা। তবে গলায় মাফলার আছে। পায়ে মোজা। চোখে চশমা। শিক্ষক শিক্ষক চেহারা।

এটা কুদ্দুসের বাসা ?

জ্বি।

কুদ্দুস আছে বাসায় ?

না।

আমি কুদ্দুসের জন্যে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম।

আমার কাছে দিতে পারেন। আমি তার পিতা। কত টাকা ?

আটশ' টাকা। কবর দিতে মোট কত খরচ হয়েছে ?

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে বললেন, কীসের কবর ?

মনজুর হকচকিয়ে গেল।

সাবিহা নামের একটা মেয়ে মারা গেছে না এই বাড়িতে ?

সাবিহা আমার ছোট মেয়ের নাম। সে মারা গেছে দশ বছর আগে। আপনে কে ?

আমি তেমন কেউ না। নাম বললে চিনবেন না।

টাকাটা আমার কাছে দিয়ে যান। আমি দিয়ে দিব।

কুদ্দুসকেই দিতে চাই। আমি অন্য একসময় আসব।

আমার কাছে দিতে না চাইলে অপেক্ষা করেন। কুদ্দুস দশটার মধ্যে আসে। চা

খান। চায়ের অভ্যাস আছে ?

আরেক দিন এসে চা খেয়ে যাব।

মনজুর রাস্তায় নেমে এল। তাড়াতাড়ি কোনো একটা রিকশায় উঠে হুড তুলে দিতে হবে। এখন কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। বুকে ঠাণ্ডা বসে না গেলে হয়।

২

ঘুমাবার আগে আয়নায় নিজেকে দেখার যে বাসনা সব তরুণীর মনেই থাকে সে বাসনা মীরার ভেতর অনুপস্থিত। ওই কাজটি সে কখনো করে না। চুল বাঁধে হাঁটতে হাঁটতে। সেই সময় সে গুনগুন করে গানও গায়। সে কখনো গান শেখে নি, তবে দু একটা সহজ সুর ভালোই তুলতে পারে।

আজ সে আয়নার সামনে বসে আছে।

বিশাল আয়না। এক ইঞ্চি পুরো বেলজিয়াম গ্লাস। সামনে দাঁড়ালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। মনসুরউদ্দিন, মেয়ের ষোল নম্বর জন্মদিনে এই আয়না তাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন— রোজ এক বার আয়নার সামনে দাঁড়াবি এবং নিজের সঙ্গে কথা বলবি।

মীরা বিস্মিত হয়ে বলেছিল— কী কথা বলব ?

নিজেকে প্রশ্ন করবি।

নিজেকে প্রশ্ন করার জন্যে আয়না লাগবে কেন ?

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— তোর সঙ্গে কথা বলাই এক যন্ত্রণা। তুই আমার সামনে থেকে যা।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, জন্মদিনে তুমি আমাকে ধমক দিয়ে কথা বলছ। এটা কি বাবা ঠিক হচ্ছে ? এখনো সময় আছে। ধমক ফিরিয়ে নাও।

ধমক ফিরিয়ে নেব কীভাবে ?

মুখে বল ধমক ফিরিয়ে নিলাম— তাহলেই হলো।

তাকে তাই করতে হলো।

মীরা তার জন্মদিনের উপহার এই বিশাল আয়নার সামনে অনেকবার দাঁড়িয়েছে কিন্তু কখনো নিজেকে প্রশ্ন করে নি। আয়নার ছবিকে প্রশ্ন করার পুরো ব্যাপারটা তার কাছে সব সময়ই হাস্যকর মনে হয়েছে। আজ অবশ্যি সে একটা প্রশ্ন করল। নিজের ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মীরা দেবী, আপনি কেমন আছেন ?

আয়নার মীরা দেবী সেই প্রশ্নের উত্তরে হেসে ফেলে বলল, ভালোই।

ভালোর পর ইকার লাগাচ্ছেন কেন ? তার মানে কি এই যে আপনি বিশেষ ভালো নেই।

আচ্ছা ইকার তুলে দিলাম। আমি ভালো আছি।

খুব ভালো ?

হ্যাঁ খুব ভালো।

খুব ভালো থাকলে গান গাচ্ছেন না কেন? আপনার মন খুব ভালো থাকলে আপনি উল্টাপাল্টা সুরে গান গেয়ে থাকেন। দেখি এখন একটা গান তো।

মীরা গুনগুন করে গাইল—

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না
সরায়ে জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।

গান দুলাইনের বেশি এগুলো না। কাজের মেয়ে এসে বলল, বড় সাব আপনেরে যাইতে বলছে। মীরা গান বন্ধ করে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। কয়েকদিন থেকেই এই ভয় সে করছিল। না জানি কখন বাবা তাকে ডেকে পাঠান। সে চব্বিশ দিন ধরে এই বাড়িতে আছে। এই চব্বিশ দিনে বাবার সঙ্গে তেমন কোনো কথা হয় নি। মনে হচ্ছে আজ হবে। বাবার মাথা এখন ঠিক আছে। লজিক পরিষ্কার। তবে শুধু একদিকের লজিক। এক-চক্ষু হরিণের মতো। সমস্যাটা এইখানে।

বাবা ডেকেছ?

মনসুরউদ্দিন সাহেবের ঘরের বাতি নেভানো। জিরো পাওয়ারের নীল একটা বাল্ব জ্বলছে। সে আলোয় তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তিনি মশারির ভিতর কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছেন। তিনি খাটের পাশে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, মীরা বোস।

মীরা বসতে বসতে বলল, রাত এগারটা বাজে। তোমার তো দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, এখনো জেগে আছ যে! ডাক্তার শুনলে খুব রাগ করবে।

শুয়ে ছিলাম। ঘুম আসছিল না।

ঘুমের ওষুধ খেয়েছ?

হুঁ।

এখন কতটুকু করে খাও? ফ্রিজিয়াম ফাইভ মিলিগ্রাম না দশ মিলিগ্রাম?

দশ।

মীরা আর কী বলবে ভেবে পেল না। সে নিজের ভেতর চাপা উদ্বেগ অনুভব করছে। মনসুরউদ্দিন বললেন— মীরা, তুই কি আমাকে কিছু বলতে চাস?

না।

বলতে চাইলে আমি শুনতে রাজি আছি। ভালো না লাগলেও শুনব।

আমার কিছু বলার নেই বাবা। তুমি ঘুমাও।

বাইরের কিছু কথাবার্তা আমার কানে আসছে— শুনলাম মনজুরকে ছেড়ে তুই চলে এসেছিস। সত্যি না মিথ্যা?

সত্যি।

কারণ কী?

ওকে আমার আর পছন্দ হচ্ছিল না।

পছন্দ না হবারই কথা— গোড়াতেই তো বোঝা উচিত ছিল।

তখন বুঝতে পারি নি।

অপছন্দটা হচ্ছে কেন?

অনেক কারণেই হচ্ছে। স্পেসিফিকেলি বলার মতো কিছু না। ছোটখাটো ব্যাপার।

ছোটখাটো ব্যাপারগুলোই আমি শুনতে চাই ...।

মীরা চুপ করে রইল। সব কথা কি বাবার কাছে বলা যায় ? বাবা কেন এই সাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না ?

তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, কথা বলছিস না কেন ? কী করে সে— হাঁ করে ঘুমায় ? নাক ডাকে ? শব্দ করে চা খায় ? সবার সামনে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়ে ?

মীরা হেসে ফেলল।

মনসুরউদ্দিন কড়া গলায় বললেন, হাসির কোনো ব্যাপার না। তুই পছন্দ করে আগ্রহ করে সবার মতামত অগ্রাহ্য করে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছিস, এখন তাকে ছেড়ে চলে এসেছিস— কী কারণে চলে এসেছিস তাও বলতে পারছিস না। অপছন্দ ? কেন অপছন্দ ?

মনের মিল হচ্ছে না বাবা।

মনের মিলের সময় কি শেষ হয়ে গেছে ? একটা মানুষকে বুঝতে সময় লাগে না ? সেই সময় তুই দিয়েছিস ?

হ্যাঁ দিয়েছি। তিন বছর অনেক সময়। বাবা শোন, সবকিছু তো আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তার সঙ্গে থাকতে হলে আমাকে প্রচণ্ড মানসিক কষ্টে থাকতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। সে ভালোবাসতে জানে না। সে খানিকটা রোবটের মতো।

আর তুই ভালোবাসার সমুদ্র নিয়ে বসে আছিস ?

এমন করে কথা বলছ কেন বাবা ?

কী অদ্ভুত কথা— ভালোবাসতে জানে না! দিনের মধ্যে সে যদি একশবার বলে, ভালোবাসি ভালোবাসি তাহলে ভালোবাসা হয়ে গেল ? আমি তোর মার সঙ্গে বাইশ বছর কাটিয়েছি। এই বাইশ বছরে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' জাতীয় ন্যাকামি কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না।

মুখে না বললেও মনে মনে বলেছ। লক্ষবার বলেছ— মনজুরের মুখে এই কথা নেই, মনেও নেই।

তুই মনের কথাও বুঝে ফেললি ? তুই এখন তাহলে মনবিশারদ ?

মনের কথা খুব সহজেই বোঝা যায় বাবা। যে মানুষটা আমাকে ভালোবাসে না, ভালোবাসার ক্ষমতাই যার নেই তার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি কাটাব কী করে ?

ভালোবাসার ক্ষমতাই তার নেই ?

না। এই যে আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছি— তাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না বা মন খারাপ হচ্ছে না। সে বেশ খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, অফিস করছে। আমি যদি এখন ফিরেও যাই— তার জীবনযাপন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সে খুশিও হবে না, অখুশিও হবে না।

মনসুরউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই ফিরে যাবি না— এরকম কোনো মতলব করেছিস নাকি ?

হ্যাঁ করছি।

তুই আমার সামনে থেকে যা। ভোরবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। তোকে দেখলেই

আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাবে। সেটা হতে দেয়া উচিত হবে না। সবচে' ভালো হয় যদি এখন চলে যাস। ড্রাইভার তোকে জালালের বাসায় দিয়ে আসুক। ভাইয়ের সঙ্গে থাক— আমার সঙ্গে না। যাদের দেখলে আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায় তাদের আমি আমার আশপাশে দেখতে চাই না।

তুমি অকারণে এতটা রাগছ।

মনসুরউদ্দিন ঘর কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিলেন, গেট আউট ! গেট আউট !

মীরা বের হয়ে এল। রাতে কোথাও গেল না। ভোরবেলা জালালউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হলো। এই বাড়িতে একটি ঘর সব সময় তার জন্যে আছে। ঘরের নাম 'মীরা মহল'।

মীরা তার ভাই এবং ভাবির খুব ভক্ত। তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। মীরা অনেকটাই তাঁদের সন্তানের মতো।

সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমেই ভাবির সঙ্গে দেখা হলো। মীরা বলল, কেমন আছ ভাবি ? আমি মীরা মহলে কিছুদিন থাকতে এসেছি। মীরা মহলের চাবি তোমার কাছে না ভাইয়ার কাছে ?

৩

খবরের কাগজে লিখেছে 'শৈত্যপ্রবাহ'।

'শৈত্যপ্রবাহ' মানে যে ঠাণ্ডা কে জানত ?

মীরা ফুলহাতা স্যুয়েটার পরেছে। স্যুয়েটারের উপর গরম শাল— তবু শীত যাচ্ছে না। আজ বারান্দায় রোদও আসে নি। আকাশ শ্রাবণ মাসের মেঘলা আকাশের মতো। সবকিছু যেন ঝিম ধরে আছে।

মীরার বড় ভাই জালালউদ্দিন বারান্দায় মোড়ার উপর বসে আছেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। এই বয়সেই চুলটুল পাকিয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন। বুড়োদের মতো অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে বাতে কষ্ট পান। এইসব দিনে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করতে থাকে। আজ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা কোনোটাই না, তবু তাঁর পিঠে ব্যথা উঠেছে। ব্যথার কারণে বাইরে বের হন নি। ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ার কথা। পঁচিশ মিনিট পার হয়েছে— ডাক্তার এখনো আসে নি।

জালালউদ্দিনের পায়ের কাছে কম্বল ভাঁজ করে বিছানো। তিনি প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর কম্বলে এসে চিৎ হয়ে শুচ্ছেন। ব্যথার তাতে কোনো হেরফের হচ্ছে না। তাঁর মেজাজ অসম্ভব খারাপ। যাকেই দেখছেন তাকেই ধমক দিচ্ছেন। মীরা এর মধ্যে দুবার ধমক খেয়েছে। তৃতীয়বার ধমক খাওয়ার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে আছে। ভাইয়ার কাছে বকা খেতে তার তেমন খারাপ লাগে না।

মীরা শোন তো— হট ওয়াটার ব্যাগে পানি ভরে দিতে বলেছি চল্লিশ মিনিট আগে। পানি গরম করতে চল্লিশ মিনিট লাগে ?

মীরা সহজ গলায় বলল, পানি গরম হয়ে গেছে। হট ওয়াটার ব্যাগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রাইভার গেছে আরেকটা কিনে আনতে।

এখন একটা কিনতে গেছে ? আগেরটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? এই বাড়ির সব ক'টা

মানুষ ইডিয়ট নাকি ?

শুধু শুধু চিল্লাচিল্লি করছ কেন ?

দরকারের সময় একটা জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না— তাহলে বাড়িতে এতগুলো মানুষ থাকার প্রয়োজন কী ?

চুপ করে শুয়ে থাক তো ভাইয়া। আমি বরং পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।

খবরদার— পিঠে হাত দিবি না। অসহ্য ব্যথা।

কাত হয় শুয়ে দেখ তো আরাম হয় কিনা।

তোর উপদেশ দেবার দরকার নেই। তুই ডাক্তার না।

মীরাকে এই কথা বললেও তিনি কাত হয়ে শুলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে গেল।

ভাইয়া ব্যথা কমেছে ?

একটু কম লাগছে।

তাহলে এইভাবে শুয়ে থাক।

কাত হয়ে কতক্ষণ শুয়ে থাকব ? তুই এমন পাগলের মতো কথা বলিস কেন ?

ব্যথা তো কমেছে তবু এমন চেঁচামেচি করছ কেন ? চা খাবে, চা দিতে বলব ?

কাত হয়ে চা খাব ?

মীরা হেসে ফেলল। মীরার হাসি দেখে জালালউদ্দিন নিজেও হেসে ফেললেন। যদিও খুব ভালো করে জানেন এখন হাসাটা ঠিক হচ্ছে না। রাগ ভাবটা ধরে রাখা উচিত। মীরাকে কিছু কঠিন কথা বলা প্রয়োজন। সমস্যা হলো পিঠের ব্যথা কমার সঙ্গে সঙ্গে রাগটাও দ্রুত কমে যাচ্ছে।

মীরা।

বলো কী বলবে।

তোর ভাবি বলছিল তুই নাকি আলাদা বাসা ভাড়া করার কথা চিন্তা করছিস ?

ঠিকই বলেছে। ভাবির স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। সে পুরো কনভারসেসন, দাঁড়ি-কমাসহ রিপ্রডিউস করতে পারে। তুমি যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ।

এখানে অসুবিধাটা কী ?

কোনো অসুবিধা নেই। তোমার এখানে আমি মহা সুখে আছি। এক হাজার করে টাকা হাত খরচও পাচ্ছি।

এই এক হাজার টাকা দিয়ে তুই বাসা ভাড়া করে থাকবি ?

আমার নিজের কাছে কিছু টাকা আছে। চার পাঁচ মাস ঐ টাকায় চালাব, এর মধ্যে চাকরি-বাকরি কিছু একটা জোগাড় করে নেব।

চাকরি নিয়ে সবাই তোমার জন্যে বসে আছে ?

ভাইয়া শোন, ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি আমার আছে। অনেকের সঙ্গে চেনা-জানা আছে। আমার পক্ষে একটা চাকুরি জোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না। তুমি নিজেও এটা ভালো জান। তা ছাড়া একজন রূপবতী ডিভোর্সিকে সাহায্য করার জন্যে সবাই খুব উৎসাহ বোধ করে।

জালালউদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মেয়েটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? নিজের বড় ভাইয়ের সঙ্গে এটা কী ধরনের কথাবার্তা ? পিঠের ব্যথা চলেই গিয়েছিল— উল্টাপাল্টা কথার কারণেই বোধহয় ফিরে আসছে।

তুই নিজেকে বেশি চালাক মনে করিস ?

মীরা সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ করি। এতে কোনো দোষ নেই। বোকারা নিজেদের চালাক মনে করলে দোষ। বুদ্ধিমানরা মনে করলে দোষ নেই।

বুদ্ধির দোকান খুলে বসেছিস মনে হয়।

রেগে যাচ্ছ কেন ? আবার ব্যথা শুরু হয়েছে ? এখন চিৎ হয়ে শুয়ে দেখ। এখন চিৎ হয়ে ঘুমালে হয়তো ব্যথা করবে না।

জালালউদ্দিন নিজের অজান্তেই চিৎ হয়ে শুলেন। না, ব্যথা লাগছে না। তাঁর গলার স্বর থেকে রাগ ভাবটা এই কারণেই অনেকখানি কমে গেল। তবু কঠিন গলায় কথা বলার চেষ্টা করলেন, তোর কি ধারণা, ফড়ফড় করে কথা বলা বুদ্ধিমানের লক্ষণ ?

না, এটা বোকার লক্ষণ। বোকারাই ফড়ফড় করে কথা বলে। বুদ্ধিমান লোকদের লক্ষ করলে দেখবে এরা কিছুক্ষণ কথা বলার পর চুপ করে অপেক্ষা করে। আবার কথা বলে, তারপর আবার অপেক্ষা। এই অপেক্ষার সময়টায় তারা চিন্তা করে। অতি দ্রুত চিন্তা করে।

আমার সম্পর্কে তোর কী ধারণা ? আমি বোকা, না বুদ্ধিমান ?

তুমি বোকাও না, বুদ্ধিমানও না— মাঝামাঝি।

তোর নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি।

হুঁ।

এই বুদ্ধির জন্যে তোর জীবনটা কোথায় এসে থেমেছে এটা দেখেছিস ? হাতের কাছে এতগুলো ছেলে থাকতে বিয়ে করলি একটা অগা-বগাকে।

তা করেছি। তবে— সে অগা-বগা কিন্তু না। তাকে আমার পছন্দ হয় নি। ভবিষ্যতেও যে হবে না এটা বুঝতে পেরেছি এবং খুব সম্মানজনকভাবে আলাদা হবার ব্যবস্থা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না।

তুই আমার সামনে থেকে যা।

যাচ্ছি।

যাবার আগে একটা টেলিফোন করে দেখ— ডাক্তারের কী হয়েছে ?

ভাইয়া, আমার মনে হয় তুমি যদি একটা হট শাওয়ার নাও তাহলে আরাম হবে।

হট শাওয়ারের চিকিৎসা ডাক্তারের কাছে শুনে তারপর করতে চাই। তোর ডাক্তারি তুই তোর নিজের জন্যে রেখে দে।

ডাক্তারকে টেলিফোন করার দরকার পড়ল না। গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

মীরা মনজুরের অফিসে টেলিফোন করল। আজ মঙ্গলবার। বুধবারের কথা মনে করিয়ে দেয়া দরকার।

'হ্যালো' বলতেই মনজুরের গলা শোনা গেল— মনজুর ভারি গলায় বলল, কে বলছেন ?

আমি, আমি মীরা।

ও আচ্ছা মীরা। কেমন আছ ?

ভালো আছি। আমি হ্যালো বললাম তারপরেও আমাকে চিনতে পারলে না !

চিনব না কেন, চিনেছি।

চিনেছ তা হলে বললে কেন— কে বলছেন ?

অভ্যাস। হ্যালো বলতেই— 'কে বলছেন' ? বলি তো ...

থাক এত এক্সপ্লানেশনের দরকার নেই। তোমাকে খুব জরুরি কারণে টেলিফোন করেছি।

মনজুর উদ্বিগ্ন গলায় বলল, জরুরি কারণটা কী ?

তুমি আন্দাজ কর তো।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আজ মঙ্গলবার। তোমাকে বুধবারে আসতে বলেছিলাম।

ও আচ্ছা— মনে আছে। আমি এপয়েন্টমেন্ট বইয়ে লিখে রেখেছি।

তোমার আবার এপয়েন্টমেন্ট বুক আছে নাকি ?

ঠিক এপয়েন্টমেন্ট বুক না— ডেস্ক ক্যালেন্ডার। কাল সকালে পাতা উল্টাব। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।

দয়া করে এখনি উল্টাও। ডেস্ক ক্যালেণ্ডারের পাতা তুমি কখনো উল্টাও না।

আচ্ছা উল্টালাম।

কী লেখা পড়ে শোনাও তো। যা লেখা হুবহু তাই তুমি পড়বে।

বেশি কিছু না— শুধু মীরা লিখে রেখেছি। নাম দেখলেই মনে পড়বে।

আমি টেলিফোন করার আগে কী করছিলে ?

ডিভানে শুয়ে ছিলাম।

শুয়ে ছিলে কেন ? শরীর খারাপ নাকি ?

একটু খারাপ। কিডনি বিষয়ক জটিলতা।

পরিষ্কার করে বল। কিডনি বিষয়ক জটিলতা মানে ?

সবেধন নীলমণি যেটা আছে সেটা নন-কোঅপারেশন করছে।

এটা কি তোমার নিজের ধারণা না ডাক্তাদের ধারণা ?

ডাক্তারদের।

ভালোমতো চিকিৎসা করাও।

করাচ্ছি।

আচ্ছা। তাহলে বুধবারে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আচ্ছা। তুমি ভালো তো ?

ভালো।

মীরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। মনজুরের সঙ্গে কথা বলার পর তার কিছুক্ষণের জন্যে খারাপ লাগে। লজ্জা এবং অপরাধবোধের মিশ্র অনুভূতি হয়। নিজের উপর তার

খানিকটা রাগও লাগে। শেষের দিকে মনজুরের সঙ্গে সে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছে। এতটা খারাপ ব্যবহার মনজুরের প্রাপ্য ছিল না। তার চরিত্রে কিছু ইন্টারেস্টিং দিক অবশ্যই আছে : যেমন— সে ভালোমানুষ। অসাধারণ কিছু না, সাধারণ ভালো মানুষদের একজন। শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন মানুষ এই পর্যায়ের।

আজ বুধবার।

জামান সাহেব এসে পড়েছেন। জালালউদ্দিনের সঙ্গে চা খেতে খেতে মাথা দুলিয়ে গল্প করছেন। বিলেতের গল্প। বিলেতে ক্রিসমাসের সময়ে এক তরুণীকে রাস্তা পার করাতে গিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিলেন তার গল্প।

বুঝলেন জালাল সাহেব, পকেট থেকে সিক্সটি পাউন্ড খসে গেল। আজ থেকে পনের বছর আগের ঘটনা। পনের বছর আগের সিক্সটি পাউন্ড মানে সিক্সটি ইনটু ফিফটিন অর্থাৎ প্রায় নয় শ পাউন্ড।

জালালউদ্দিন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছেন। মীরার হাসি পাচ্ছে না। হাসি পাওয়ার মতো কোনো গল্প না। মাঝে মাঝে লোকজনদের অকারণেই হাসতে ইচ্ছা করে; তখন একটা উপলক্ষ ধরে হাসে। এখানেও তাই হচ্ছে।

জামান সাহেব মীরার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের ক্লায়েন্ট তো এখনো আসছে না। মীরা বলল, এসে পড়বে।

আমার অবশ্য কোনো তাড়া নেই। আরেক প্রস্থ চা হোক।

জালালউদ্দিন বললেন, অন্য কোনো পানীয় খাবেন ? ভালো স্কচ আছে।

ঝামেলা চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে। স্কচের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। আটলান্টিক সিটিতে একবার কী হয়েছিল শুনুন। একটা নাইট ক্লাবে গিয়েছি— এলাদিনস ক্যাসেল। ওখানকার খাবারটা সস্তা এবং ভালো। ভাবলাম খেতে খেতে একটা শো দেখে ফেলি। একটা ড্রিংকস নিয়ে বসেছি— অমনি প্রসটিটিউট ধরনের এক তরুণী বলল, বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, তুমি কি আমাকে একটা ড্রিংক অফার করবে ? আমি বললাম, অবশ্যই। তুমি ওয়েটারকে বল কী খেতে চাও।

মেয়েটা নিচু গলায় ওয়েটারকে কী যেন বলল, সে তৎক্ষণাৎ একটা গ্লাস এবং বোতল এনে টেবিলে রাখল। মেয়েটা অতি দ্রুত বোতল শেষ করে আমাকে থ্যাংক দিয়ে চলে গেল। বিল দিতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দুশ চল্লিশ ডলার ! মেয়েটা নাকি দুশ ডলার দামের ফরাসি শ্যাম্পেন চেয়েছিল। তাকে তাই দেয়া হয়েছে। হা-হা-হা।

জালালউদ্দিন ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মীরা ভেবে পেল না, এর মধ্যে হাসির কী আছে। সব মানুষ এত বোকা কেন ? পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা এত অল্প!

কলিং বেলের শব্দ হচ্ছে।

মীরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। চাদর গায়ে মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কালো একটা ব্যাগ। তার চাদর ভেজা-ভেজা। মীরা বলল, বৃষ্টি হচ্ছে নাকি ?

হুঁ। এইবারের শীতকালটা অদ্ভুত— দুদিন পরপর বৃষ্টি। আমি কি দেরি করে ফেললাম ?

হ্যাঁ দেরি করেছ।

জামান সাহেব এসেছেন ?

দু ঘণ্টা আগে এসেছেন।

সরি, ডাক্তারের কাছে গিয়ে এই যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম। স্লিপে লেখা এগার। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, আসলে লেখা উনিশ।

ডাক্তার কী বলল ?

বলে নি কিছু। টেস্ট-ফেস্ট করতে দিয়েছে।

এস আমার সঙ্গে। তাঁরা বারান্দায় বসেছেন। তোমার ব্যাগে কী ?

কিছু না। ব্যাগটা এখানে রেখে যাই ?

সঙ্গে থাক। অসুবিধা কিছু নেই। চাদর খুলে ফেল। ভেজা চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখার মানে কী ? দাও আমার কাছে দাও।

জামান সাহেব মনজুরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুর বিনীত ভঙ্গিতে বলল, সরি আপনাদের দেরি করিয়ে দিয়েছি।

জামান সাহেব কিছু বললেন না। মনজুরকে তাঁর চেনা চেনা মনে হচ্ছে— কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না। তিনি ইতস্তত করে বললেন, আপনাকে কি আমি আগে দেখেছি ? বা আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন ?

মনজুর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মনে করতে পারছি না। আমার স্মৃতিশক্তি বিশেষ ভালো না।

আমার যথেষ্টই ভালো; কিন্তু আমিও মনে করতে পারছি না। যদিও খুব চেনা চেনা লাগছে।

জালালউদ্দিন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি। তিনি বললেন, কাজের কথা শুরু করলে কেমন হয় ? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

জামান সাহেব বললেন, কাজের কথা আর কী ? দুজনের পুরোপুরি সম্মতিতেই ব্যাপারটা ঘটছে। আমি সব কাগজপত্র তৈরি করে এনেছি। কয়েকটা সই হলেই হবে। মনজুর সাহেব আপনি বরং ডকুমেন্টগুলো পড়ুন।

মনজুর নরম গলায় বলল, পড়তে হবে না। কোথায় সই করব বলুন।

দেখুন ক্রস দেয়া আছে। সই করবার সময় পুরো নাম লিখবেন।

জ্বি আচ্ছা।

একবার আপনাকে কোর্টেও আসতে হবে। পারবেন না ?

পারব। কবে ?

সোমবার ঠিক এগারটায়। আপনি আমার চেম্বারে চলে আসুন। সেখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাব। এই কার্ডটা রাখুন। এখানে ঠিকানা দেয়া আছে।

মনজুর হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মীরা এল তার পেছনে পেছনে। তবে সে কিছু বলল না। এই প্রথম ঘর থেকে বেরুবার সময় সে চৌকাঠে ধাক্কা খেল না।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। চাদরটা ফেলে আসায় মাথা ভিজে যাচ্ছে। জ্বর-জ্বারি না হলে হয়।

৪

'উড কিং'-এর মালিক বদরুল আলম, মনজুরের মেজো মামা। 'উড কিং' ছাড়াও ঢাকা শহরে তাঁর আরো দুটি ফার্নিচারের দোকান আছে। মূল কারখানা মালিবাগে। কারখানার সঙ্গে তাঁর হেড অফিস।

এই মুহূর্তে তিনি মালিবাগের হেড অফিসে বসে আছেন। চায়ের কাপে মুড়ি ভিজিয়ে চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাচ্ছেন। তাঁর সামনে কারখানার ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা। ইয়াসিন মোল্লার হাতে গোটা দশেক রসিদ। একটু দূরে কান ধরে 'উড কিং' ফার্নিচারের সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী নসু মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স এগার। সে এক টিন তার্পিন তেল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বদরুল আলম চা-পর্ব শেষ করেই নসুর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। নসুকে আসন্ন শাস্তির আশঙ্কাতে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না।

বদরুল আলমের বয়স একষট্টি। শক্ত-সমর্থ চেহারার বেঁটেখাটো মানুষ। তিনি ধমক না দিয়ে কোনো কথা বলতে পারেন না। কিছুদিন হলো আলসার ধরা পড়েছে। আলসারের চিকিৎসা হিসাবে সারাক্ষণ কিছু না কিছু খাচ্ছেন। চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়া সেই চিকিৎসারই অঙ্গ।

মনজুর ঘরে ঢুকে মামার দিকে তাকিয়ে হাসল। বদরুল আলম সেই হাসির দিকে কোনোরকম গুরুত্ব দিলেন না। এটাও তাঁর স্বভাবের অংশ। যে-কোনো আগন্তুককে প্রথমে কিছুক্ষণ তিনি অগ্রাহ্য করেন। ভাব করেন যেন দেখতে পান নি।

মনজুর পাশের চেয়ারে বসল। মামার দৃষ্টি আকর্ষণের কোনো চেষ্টা করল না। কারণ সে জানে চেষ্টা করে লাভ হবে না।

ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার, নসুর শাস্তির ব্যাপারটা শেষ করে দেন।

বদরুল আলম কড়া গলায় বললেন, শেষ করাকরি আবার কী? তার্পিন তেলের টিনটা উদ্ধার হয়েছে?

জ্বি স্যার।

তাহলে ঐ টিন থেকে বড় চামচে দুই চামচ তেল খাইয়ে দাও। এটাই ওর শাস্তি।

শাস্তির এই ব্যবস্থায় নসুকে খুব আনন্দিত মনে হলো। সে ফিক করে হেসেও ফেলল। ইয়াসিন মোল্লাকে দেখে মনে হচ্ছে শাস্তির এই ধারাটি তার পছন্দ না। সে বিরস গলায় বলল, স্যার রসিদগুলো একটু দেখবেন? দুই হাজার সিএফটি কাঠ ...

বদরুল আলম শুকনো গলায় বললেন, সব কিছু যদি আমি দেখি তাহলে আপনি আছেন কী জন্যে? এখন যান। নসুকে নিয়ে যান। শাস্তি দেন।

তেল সত্যি সত্যি খাওয়াব?

অবশ্যই খাওয়াবেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান।

ঘর খালি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বদরুল আলম বললেন, আমার এই ম্যানেজার বিরাট চোর। থিফ নাম্বার ওয়ান।

মনজুর বলল, থিফ নাম্বার ওয়ান হলে বিদায় করে দেন না কেন? চোর পোষার দরকার কী?

দরকার আছে। পোষা চোর কী করে চুরি করে সেই কায়দা-কানুন জানা থাকে। ম্যানেজার ব্যাটা চুরি করামাত্র ধরে ফেলি। নতুন একজনকে নিলে তার চুরির কায়দা-কানুন ধরতে ধরতে এক বৎসর চলে যাবে। এক বৎসরে সে দোকান ফাঁক করে দেবে, বুঝলি ?

হ্যাঁ বুঝলাম।

কিছুই বুঝিস নাই। ম্যানেজার রসিদগুলো নিয়ে ঘুরঘুর করছে। কেন করছে ? কারণ চুরি আছে ওর মধ্যে। বিরাট ঘাপলা। আমি তাকে কী বললাম ? বললাম— আমি কিছু দেখতে পারব না— সে নিজে যেন দেখে। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে চুরি করবে। আগের মতো সাবধান থাকবে না। ধরা পড়ে যাবে, ক্যাঁক করে ঘাড় চেপে ধরব। বুঝলি ?

বুঝলাম।

কিছুই বুঝিস নাই। আমার কাছে কী ব্যাপার ?

তোমাকে দেখতে এলাম।

ঠাট্টা করছিস নাকি ?

ঠাট্টা করব কেন ? মাসে এক বার তোমাকে দেখতে আসি না ?

বদরুল আলম চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। মনজুর সত্যি কথাই বলছে। সে মাসে একবার আসে। প্রতি মাসের শেষের দিকে। ঘণ্টা খানেক থাকে।

কেন আসিস আমার কাছে ?

তোমাকে দেখতে আসি।

কেন ?

কী যন্ত্রণা, এত জেরা করছ কেন ?

বদরুল আলম চোখ থেকে চশমা খুলে খানিকক্ষণ মনজুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চশমা খুলে তিনি প্রায় কিছুই দেখেন না। তবু কাউকে বিশেষভাবে দেখার প্রয়োজন হলে চশমা খুলে ফেলেন।

তোর কি শরীর খারাপ নাকি ?

হুঁ।

সমস্যা কী ?

শরীরের রক্ত ঠিকমতো পরিষ্কার হচ্ছে না।

কালোজাম খা। কালোজামে রক্ত পরিষ্কার হয়।

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, শীতকালে কালোজাম পাব কোথায় ? তাছাড়া কালোজামের স্টেজ পার হয়ে গেছে। কিডনি যেটা ছিল সেটাও যাই-যাই করছে।

কী বলছিস তুই !

সত্যি। আমি এখন কিডনির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ইয়ারকি করছিস নাকি ?

ইয়ারকি করছি না। দুজন বড় ডাক্তার তাই বললেন।

বড় ডাক্তাররা কিছুই জানে না। ছোট ডাক্তারদের কাছে যা।

ছোট ডাক্তারদের কাছে যাব ?

হ্যাঁ। ওরা যত্ন কর দেখবে। এই পাড়ায় একজন এল.এম.এফ ডাক্তার আছে। ভূপতি বাবু। খুব ভালো। তার কাছে যাবি ? আমি নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে খুব ভালো খাতির। যাবি ?

না।

ছোট বলে অবহেলা করিস না। ছোট কাঁচামরিচের ঝাল বেশি।

ঝাল পচা আদারও বেশি। তাই বলে পচা আদা কোনো কাজের জিনিস না।

বদরুল আলম দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন, পচা আদার কোনো ব্যবহার মনে পড়ে কিনা। মনে পড়ল না।

তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি মামা।

টাকা-পয়সার কোনো ব্যাপার না হলে বল। টাকা-পয়সা ছাড়া সব পাবি।

টাকা-পয়সা কি তোমার নেই ?

আছে। দেয়া যাবে না। টাকা ব্যবসায় খাটে। ব্যাংকে ফেলে রাখি না।

ব্যাংকে কিছু তো আছে ?

তা আছে।

সেখান থেকে এক লাখ দেয়া যাবে ?

এত লাগবে কেন ?

কিডনি কিনতে হবে। লাখ খানিক টাকা লাগবে কিনতে। অপারেশন করাতে দেশের বাইরে যেতে হবে। সব মিলিয়ে দরকার তিন থেকে চার লাখ টাকা।

বদরুল আলম টেবিলে রাখা চশমা চোখে পরলেন। সহজ স্বভাবিক গলায় বললেন, তুই কি জনে জনে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিস ?

হ্যাঁ।

কোনো লাভ নাই— অন্য পথ ধর।

অন্য কী পথ ধরব ?

তা আমি কী বলব। ভেবে-চিন্তে বার কর। তুই গরিব মানুষ, বাঁধাবি গরিবের অসুখ— দাস্ত, খোস-পাঁচড়া, হাম, জলবসন্ত, তা না... চা খাবি ?

না।

খা চা খা। ফ্রেশ মুড়ি আছে, খেজুর গুড় দিয়ে খা।

মনজুর উঠে দাঁড়াল।

বদরুল আলম বললেন, তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস নাকি ? রাগ নিয়ে যাওয়া ঠিক না। তুই ঝগড়া কর আমার সঙ্গে। চিৎকার, চেঁচামেচি কর। তাহলে তোর মনটা হালকা হবে। তুই রোগী মানুষ, মনটা হালকা থাকা দরকার।

আমার মন হালকাই আছে।

আরে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছিস ?

হ্যাঁ।

বোস বোস। চা খেয়ে তারপর যা। সিগারেটখোররা বিনা সিগারেটে চা খেতে পারে

না। এই জন্যে মুরুব্বিদের সামনে তারা চা খায় না। যা, তোকে সিগারেটের অনুমতি দিলাম। এখন চা খাবি তো ? নাকি এখনো না !

মনজুর বসল।

বদরুল আলম গলার স্বর নিচু করে বললেন, মনটা খুবই খারাপ। তোর অসুখ-বিসুখের জন্যে না। অসুখ-বিসুখ তো মানুষের জীবনে আছেই। এই দেখ না বুড়ো বয়সে আমার হয়ে গেল আলসার।

মন খারাপ কী জন্যে ?

আমার ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে মনটা খারাপ। তারা এখন লায়েক হয়ে গেছে। সমাজে পজিশন হয়েছে। আমি যে একজন কাঠমিস্ত্রি এই জন্যে তারা লজ্জিত। আমাকে লোকজনের সামনে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় জানিস ? বলে— ইনি আমার ফাদার। ব্যবসা করেন। টিম্বার মার্চেন্ট। আমি তখন কী করি জানিস ? আমি গম্ভীর হয়ে বলি— না রে ভাই। আমি কোনো টিম্বার মার্চেন্ট না। আমি একজন কাঠমিস্ত্রি।

তুমি তো সত্যি কাঠমিস্ত্রি না।

না তোকে বলল কে ? কাঠের কাজ আমি করি না ? এখনো করি।

চা এসে গেছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়েছে। বদরুল আলম খেজুর গুড় দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছেন। ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা একটু আগে এসে বলে গেছে— নসু মিয়ার শাস্তি দেয়া হয়েছে। তার্পিন তেল খাওয়ানো হয়েছে। সে এখন বমি করছে। বদরুল আলম বলেছেন— করুক। তুমি ফট করে ঘরে ঢুকবে না। কথা বলছি। এর মধ্যে একবার টেলিফোন এসেছে। বদরুল আলম রিসিভার তুলে রেখেছেন। এখন তাঁর টেলিফোনে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতে ভালো লাগছে। ছেলেটা ভালো। কোনো কথা বললে মন দিয়ে শোনে— দশজনের কাছে গিয়ে বলে না।

মনজুর।

জ্বি।

আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের কাণ্ডকারখানা শুনবি ?

বল।

বিয়ে করার পর মনে করছে— আহা কী করলাম। রাজকন্যা পেয়ে গেলাম। চোখে-মুখে সব সময় 'সখী ধর ধর' ভাব। মুখে হাসি লেগেই আছে। কী মধুর হাসি। এখন কথা বলে শান্তিনিকেতনী ভাষায়— এলুম, গেলুম এইসব। ব্যাটা রবিঠাকুর হয়ে গেছে !

অসুবিধা কী ?

অসুবিধা আছে। সবটা না শুনলে বুঝবি না।— গত বৃহস্পতিবার সকালে বারান্দায় এসে দেখি মতিন নেইল কাটার দিয়ে তার বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। আমি না-দেখার ভান করে ঘরে ঢুকে গেলাম। তোর মামিকে বললাম— এই কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না। লাথি দিয়ে একে ঘর থেকে বের করে দাও। একে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম।

নখ কাটা এমন কী অপরাধ ?

বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দেয়া অপরাধ না ? তুই কখনো বৌমার পায়ের নখ কেটে দিয়েছিস ?

না।

তাহলে?

আমি কি আদর্শ মানব? আমি যা করব সেটাই ঠিক, অন্যেরটা ঠিক না?

বদরুল আলম বিরক্ত গলায় বললেন, তুই আদর্শ মানব হবি কেন? তুই হচ্ছিস গাধা-মানব। এখন কথা হলো, গাধা-মানব হয়ে তুই যে কাজটা করছিস না সেই কাজটা আমার কুলাঙ্গার করছে— বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। তাও কোনো রাখঢাক নেই। বারান্দায় বসে কাটছে। হারামজাদা।

মতিনের বৌকে তো তুমি পছন্দ কর। কর না?

অবশ্যই করি। ও ভালো মেয়ে। ভেরি গুড গার্ল। আমার কুলাঙ্গারটা মেয়েটার মাথা খাচ্ছে। একদিন কী হবে জানিস? এই মেয়ে নেইল কাটার নিয়ে আমার কাছে এসে বলবে, বাবা আমার পায়ের নখগুলি একটু কেটে দিন তো।

মনজুর হেসে ফেলল। বদরুল আলম রাগী গলায় বললেন, হাসছিস কেন? হাসবি না। হাসি-তামাশা এখন আমার সহ্য হয় না। হাসি শুনলেই ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়।

উঠি মামা?

আচ্ছা যা। কোনো চিন্তা করিস না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। গড অলমাইটি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

মনজুর রাস্তায় এসেই রিকশা নিয়ে নিল। আগে হাঁটতে ভালো লাগত। এখন আর লাগে না। কয়েক পা এগোলেই ক্লান্তিতে হাত-পা এলিয়ে আসে। কয়েকবার সে রিকশাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ যে রকম ক্লান্ত লাগছে তাতে মনে হয়— রিকশায় উঠা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাইবেন সাব?

মনজুর কিছু বলল না। কোথায় যাবে এখনো সে ঠিক করে নি। অফিসে যাওয়া যেত কিন্তু আজ অফিস বন্ধ। তাদের অফিস হচ্ছে একমাত্র অফিস যা সপ্তাহে দুদিন বন্ধ থাকে— শুক্রবার এবং রোববার। আফসার সাহেব তাঁর সব কর্মচারীকে বলে দিয়েছেন— দুদিন বন্ধ দিচ্ছি এই কারণে যাতে বাকি পাঁচদিন আপনারা দশটা-পাঁচটা অফিস করেন এবং মন দিয়ে করেন।

আজ রোববার।

সব জায়গায় কাজকর্ম হচ্ছে। তাদের অফিস বন্ধ। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকা যেত। শরীরের ক্লান্তি তাতে হয়তো খানিকটা কাটত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, অফিস যেদিন থাকে সেদিনই শুধু ঘরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। অফিস বন্ধের দিন ইচ্ছে করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে। আজ যেমন করছে। অবশ্যি যাবার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেনে করে গ্রামের দিকে গেলে কেমন হয়? পছন্দ হয় এমন কোনো স্টেশনে নেমে পড়া। বিকেলের দিকে ফিরে আসা।

সাব যাইবেন কই?

সামনে।

রিকশাওয়ালা রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে।

স্যারের শইল কি খারাপ ?

হুঁ।

কী হইছে ?

কিডনি নষ্ট— বেশিদিন বাঁচব না।

না বাঁচাই ভালো। বাঁইচ্যা লাভ কী কন ? চাউলের কেজি হইল তের টাকা। গরিবের খানা যে আটা হেইডাও এগার টেকা কেজি।

খুবই সত্যি কথা— দেখি তুমি কমলাপুরের দিকে যাও তো।

রেল ইস্টিশন ?

হুঁ।

ঘুম আসছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনজুর শক্ত করে রিকশার হুড চেপে ধরল। ঘুম হচ্ছে অনেকটা মৃত্যুর মতো। মৃত মানুষের শরীর যেমন শক্ত হয়ে যায়— ঘুমন্ত মানুষদের বেলায়ও তাই হয়। শরীর খানিকটা হলেও শক্ত হয়। ঘুমিয়ে পড়লেও হুড ধরা থাকবে। ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা কমে যাবে। অক্ষত অবস্থায় কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছানো যেতেও পারে।

অবশ্যি পৌঁছলেও যে শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে তা মনে হয় না। ইচ্ছা মরে যাবে। মানুষের কোনো ইচ্ছাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কিছুদিন ধরে মনজুরের ইচ্ছা করছে অচেনা একজনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় গল্প করা; যে তাকে চেনে না কিন্তু না চিনলেও যে গল্প শুনবে আগ্রহ নিয়ে। প্রয়োজনে আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনার জন্যে কিছু টাকা-পয়সাও দেয়া যেতে পারে। সমস্যা হলো, কেউ গল্প শুনতে চায় না। সবাই বলতে চায়। সবার পেটে অসংখ্য গল্প।

মেজো মামার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ থাকলে তিনি মতিনের নতুন কিছু গল্প শুনাতেন। গল্প বলতে পারার আনন্দের জন্যে মেজো মামার মতো মানুষও তাকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

স্যার নামেন। কমলাপুর আসছে।

মনজুরের নামতে ইচ্ছা করল না। কেমন যেন মাথাটা ঘুরাচ্ছে। বমি-বমি লাগছে। ঝকঝকে রোদ। সেই রোদ এমন কড়া যে চোখে লাগছে। খুবই তীক্ষ্ণ কোনো সুচ দিয়ে রোদের ছবি কেউ যেন চোখের ভেতর আঁকছে।

সাব নামেন।

ভাই শোন, এখানে নামব না। তুমি আমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ভাড়া নিয়ে চিন্তা করবে না। যা ভাড়া হয় তার সঙ্গে পাঁচ টাকা ধরে দেব বকশিশ।

বাসা কোনহানে ?

বলছি— তুমি চালাতে শুরু কর, তারপর বলছি।

টাইট হইয়া বহেন।

বসেছি। টাইট হয়ে বসেছি। তুমি আস্তে চালাও।

রিকশাওয়ালা খুবই ধীরগতিতে রিকশা চালাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে রিকশার প্যাসেঞ্জার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়লে ভালো কথা— অজ্ঞান না হয়ে পড়লেই হয়।

রিকশাওয়ালা পথের পাশে গজিয়ে-ওঠা একটা চায়ের স্টলের কাছে এনে রিকশা থামাল। প্যাসেঞ্জার খানিকক্ষণ ঘুমাক। এই ফাঁকে সে টোস্ট দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিবে। ভাড়া হিসাবে বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া যাবে। একটা টাকা চা-টোস্টের জন্যে খরচ করা যায়। সে চায়ের কাপ নিয়ে উবু হয়ে বসেছে, এমন সময় হৈহৈ শব্দ উঠল। ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার গড়িয়ে রিকশা থেকে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়েও তার ঘুম ভাঙছে না। তার মানে ঘুম না— লোকটা হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয় মারা গেছে।

লোকজন লোকটাকে ধরাধরি করে তুলছে। তুলতে থাকুক, এই ফাঁকে সে দ্রুত চা-টা শেষ করতে চায়। চা-টা মজা হয়েছে। দ্রুত চা খেতে গিয়ে রিকশাওয়ালা মুখ পুড়িয়ে ফেলল।

৫

স্যার আপনি কেমন আছেন ?

মনজুর জবাব দিল না। জবাব না দেয়ার দুটি কারণের একটি হচ্ছে প্রশ্নকর্তার গলার স্বর সে চিনতে পারছে না। অচেনা একজনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার তেমন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় কারণ— কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য। তন্দ্রা ভাব। প্রচণ্ড ঘুম আসার আগের অবস্থা। একটা কোলবালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে ঘুমাতে পারলে হত। শীত শীত লাগছে। গায়ের উপর কম্বল দেয়া আছে কি ? সম্ভবত আছে। তবে সেই কম্বল খুব ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে রাবারের কম্বল।

স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি জাহানারা। এখন আপনার শরীর কেমন ?

চোখ না মেলেই বলল, শরীর ভালো।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ?

মনজুর বিরক্ত হচ্ছে। এটা কী ধরনের প্রশ্ন ? তাকে চিনতে পারা না-পারায় কী যায় আসে ? কিছুই যায় আসে না। তবে সে চিনতে পারছে। মনজুর তাকাল। না তাকানোই ভালো ছিল। তীব্র আলো ধক করে চোখে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা শুরু হলো। ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হাতে কি স্যালাইন দেয়া হচ্ছে ? এটা হাসপাতাল, না ক্লিনিক ? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। হাসপাতাল না হওয়ারই কথা।

স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ?

কেমন আছ জাহানারা ?

জ্বি স্যার ভালো।

এটা কি কোনো ক্লিনিক ?

জ্বি না— মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

ও আচ্ছা।

আপনি যে হাসপাতালে সেটা জানতাম না। বারটার সময় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করল অফিসে। আপনার মানিব্যাগে ভিজিটিং কার্ড ছিল। আপনি স্যার পুরো একুশ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন।

ও আচ্ছা।

টেলিফোন ধরেছিলেন চিত্ত বাবু। তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আমাকে বললেন, জাহানারা, হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এসেছে। কী বলছে কিছুই বুঝতেছি না। তুমি ম্যাসেজটা রেখে দাও তো, আমি তখন ...

জাহানারা হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে।

মনজুর স্বপ্নেও ভাবে নি, এই মেয়ে এত কথা বলতে পারে। এতদিন পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, এই মেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেই জবাব দেয়। নিজ থেকে কথা বলে না। এখন মনে হচ্ছে মেইল ট্রেন। দাঁড়ি-কমা ছাড়া কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটা বোধহয় ভয় পেয়েছে। যেসব মানুষ এমনিতে কম কথা বলে তারা ভয় পেলে প্রচুর কথা বলে।

স্যার, আপনার এখন কেমন লাগছে ?

ঘুম পাচ্ছে।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। ডায়ালাইসিস করা হবে। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেশি হয়ে গেছে। এগুলো ডায়ালাইসিস করে সরাবে। তখন ভালো লাগবে।

আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন যাও। আমি খানিকক্ষণ ঘুমাব।

আমার স্যার এখন যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। আপনার আত্মীয়স্বজন কাকে কাকে খবর দিতে হবে, বলুন, আমি খবর দিয়ে দিব।

কাউকে খবর দিতে হবে না।

ভাবি ? ভাবিকে খবর দিব না ?

দাও— টেলিটোন নাম্বার হলো ...

উনার টেলিফোন নাম্বার আমি জানি। গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার আপনার খোঁজে টেলিফোন করেছিলেন— তখন উনি তাঁর নাম্বার বললেন। আমি আমার নোট বইয়ে উনার নাম্বার লিখে রেখেছি ...

মনজুর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে।

এত কথা বলছে কেন এই মেয়ে ? কে তাকে এখানে আসতে বলেছে ? মনজুর মনে মনে বলল, 'মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।' কেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বকবক করছ ? কে তোমার বকবকানি শুনতে চাচ্ছে ? তুমি দয়া করে বিদেয় হও। আমাকে ঘুমাতে দাও। ঘুম পাচ্ছে।

আরাম করে একটা ঘুম দিতে পারলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত। এই মেয়ে তা হতে দেবে না। মানুষ ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। অফিসে এই মেয়ে একটা কথাও বলে না। হাসপাতালে দাঁড়ি-কমা ছাড়া কথা বলে। বাসায় সে কী করে ?

স্যার, ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

মনজুর জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। যাতে ঘুমিয়ে পড়ছে মনে করে মেয়েটা তাকে মুক্তি দেয়।

স্যার, এখন ঘুমাবেন না। ডাক্তার সাহেব আসছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে তারপর ঘুমান। আপনাকে কি আরেকটা বালিশ দিতে বলব ? এদের বালিশগুলো খুব পাতলা।

ডাক্তার সাহেব বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনজুরের টেম্পারেচার চার্ট দেখছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক খুব রোগা। তাঁকে সরলরেখার মতো লাগছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি বেশ গোলগাল। মনজুরের মনে হলো— নার্সটিকে '০'এর মতো দেখাচ্ছে। ডাক্তার যদি ইংরেজি এক হয় তাহলে এই দুজনে মিলে হল দশ।... এইসব কী সে ভাবছে ? তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল ? ডাক্তার নিচু হয়ে মনজুরের কপালে হাত রাখলেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, কেমন আছেন ?

ভালো।

শরীর কি খুব দুর্বল লাগছে ? বমি ভাব আছে ?

আছে।

মাথা ঘুরছে ?

না— তবে মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

এ ছাড়া আর কোনো অসুবিধা আছে ?

আছে। আপনাকে গোপনে বলতে চাই। অন্যদের যেতে বলুন।

ডাক্তারকে কিছু বলতে হলো না। সবাই দূরে সরে গেল। মনজুর গলার স্বর নিচু করে বলল, ঐ যে প্রিন্টের শাড়ি-পরা মেয়েটাকে দেখছেন— তাকে যেতে বলুন। সে আমাকে বড় বিরক্ত করছে। ঘুমাতে দিচ্ছে না।

তাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। এটাই কি আপনার গোপন কথা না আরো কিছু বলবেন ?

না, আর কিছু বলব না। আমার অবস্থাটা কী— জানতে পারি ?

টেস্ট প্রায় সবই করা হয়েছে। আপনার কিডনি ভালো কাজ করছে না। তবে এই মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই। ডায়ালাইসিস করলেই আরাম বোধ করবেন। ইতিমধ্যে কিডনি ট্রান্সপ্লেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করে দেখুন কোনো ডোনার পাওয়া যায় কিনা। আপন ভাইবোন হলে ভালো হয়। না পাওয়া গেলে রক্ত-সম্পর্ক আছে এমন কেউ। সন্ধ্যাবেলা ডক্টর ইমতিয়াজ আসবেন। উনি সব বুঝিয়ে বলবেন। আপনি এখন রেস্ট নিন। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ঘুমাবার চেষ্টা করুন। যে-কোনো অসুখেই বিশ্রাম চমৎকার মেডিসিন।

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই মনজুর ঘুমিয়ে পড়ল। এমন ঘুম যা মানুষকে আরো ক্লান্ত করে দেয়। কারণ সে ঘুমাচ্ছে অথচ আশপাশের সমস্ত শব্দ শুনছে। পাশের বেডের রোগী কাশছে। এই শব্দও ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে। নার্স এসে কাকে যেন ধমকাচ্ছে— সেই ধমকের প্রতিটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের ঘ্রাণশক্তি কাজ করে না— তার কাজ করছে। ঘর মুছে যখন ফিনাইল দেয়া হলো— সে ঘুমের মধ্যে ফিনাইলের কড়া গন্ধ পেল।

মনজুরের ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। বিছানার কাছে দুটি ডাব হাতে কুদ্দুস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরাধী-অপরাধী ভাব। কুদ্দুস অস্পষ্ট স্বরে বলল, স্যারের শরীরটা এখন কেমন ?

শরীর ভালো।

দুইডা ডাব আনলাম স্যার। আমার নিজের গাছের ডাব।

বেডের নিচে রেখে দাও।

কেটে দেই স্যার ? এখন একটা খান ?

এখন খেতে ইচ্ছা করছে না।

না খেলে তো স্যার শরীরে বল হবে না।

বল না হলেও কিছু করার নাই। তুমি এখন আমার সামনে থেকে যাও। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

ঐ দিনের ঘটনার জন্যে আমি মাফ চাই স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আপনি মাফ না দিলে ...

মাফ না দিলে কী ?

কুদ্দুস মাথা চুলকাচ্ছে— কথা পাচ্ছে না। আগে ভালোমতো রিহার্সেল দিয়ে আসে নি। কুদ্দুসের উচিত ছিল কী কথাবার্তা বলবে সব ঠিক করে আসা। তা করে নি। অবশ্যি অনেক সময় ঠিক করে এলেও বলার সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা তার বেলায় অসংখ্যবার ঘটেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে রাখা কথা একটাও সে কোনো দিন বলতে পারে নি।

কুদ্দুস তুমি এখন যাও। কথা বলা আমার নিষেধ আছে।

জ্বি আচ্ছা।

অফিসেও সবাইকে বলবে— তারা যেন না আসে।

আচ্ছা স্যার বলব।

থ্যাংকস। তোমার ডাব আমি এক সময় খাব।

কুদ্দুস মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, স্যার শুনলাম আপনার একটা কিডনি দরকার ?

ঠিকই শুনেছ। তুমি কি দিতে চাও ?

কুদ্দুস হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

মনজুর সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, দিতে চাইলে পরে এ নিয়ে কথা বলব। এখন যাও।

ডাব দুইটা মনে করে খাবেন স্যার।

বললাম তো খাব।

নিজের গাছের ডাব। বাবা নিজ হাতে গাছ পুঁতেছিলেন।

মনজুর মৃদু গলায় বলল, যাত্রাবাড়ির ঐ বাড়ি কি তোমাব নিজের ?

জ্বি না, ভাড়া বাড়ি।

কবে এসেছ ঐ বাড়িতে ?

দুই বছর আগে। শ্রাবণ মাসে।

দুই বছর আগে পোঁতা গাছে ডাব হয়ে গেল ?

কুদ্দুস ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মনজুর বড়ই বিরক্ত বোধ করছে। এ ভালোমতো

মিথ্যা বলাও শিখে নি। জেরায় টিকতে পারে না। সামান্য বুদ্ধি থাকলে বলত— দেশের বাড়ির ডাব। বাবা দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন। তা না বলে কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মনজুর চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। কুদ্দুস ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার আমি যাই ?

আচ্ছা যাও।

কুদ্দুস যাই বলেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

মনজুর চোখ বন্ধ করেও তা বুঝতে পারছে। অসুখের সময় মানুষের ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়। মনজুর চোখ মেলল কুদ্দুস চলে যাবার পর। প্রথমেই চোখে পড়ল বিছানার পাশের একগাদা ম্যাগাজিন। কয়েকটা কবিতার বই। কবিতার বইগুলোতে মীরার নাম লেখা। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড। অফিসে তার ঘরের শেল্‌ফ থেকে নিয়ে এসেছে। জাহানারার হয়তো ধারণা মনজুর কবিতার পোকা। মনে করাই স্বাভাবিক। সে অনেক বার মনজুরের হাতে কবিতার বই দেখেছে। সে জানেও না মনজুর এইসব বই মুখের সামনে ধরে পাতা ওল্টানো ছাড়া কিছুই করে না। দু একবার যে পড়ার চেষ্টা করে নি তা না। চেষ্টা করেছে— ভালো লাগে নি।

ডান হাতে এখনো স্যালাইনের সুচ বিঁধে আছে। মনজুর বাঁ হাতে একটা কবিতার বই টেনে নিল।

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখে নি, কেউ টের পায় নি
প্রবল ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
সমুদ্রের অভিশাপ।

মনজুর খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তার নিজের সঙ্গে কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মীরাকে নিয়ে সে-কক্সবাজার গিয়েছিল। সমুদ্রের মতো এত সুন্দর জিনিস অথচ সে কিনা থুতু ফেলল সমুদ্রে। মীরা ভ্রূ কুঁচকে বলল, আশ্চর্য! তুমি সমুদ্রে থুতু ফেললে। ছিঃ! সে নিজেও হকচকিয়ে গেল। মীরা বলল, এত বিশাল একটা জিনিসের গায়ে তুমি থুতু ফেলতে পারলে ?

মনজুর হালকা গলায় বলল, সমুদ্র তো আমাদের দেবতা না মীরা। ওর গায়ে থুতু ফেললে কিছু যায় আসে না।

অবশ্যই সমুদ্রের কিছু যায় আসে না। সমুদ্রের কথা আমি ভাবছি না। আমি তোমার কথা ভাবছি। তুমি কোন মানসিকতায় এটা পারলে ?

মুখে থুতু এসেছিল— ফেলে দিয়েছি। এর বেশি কিছু না।

মীরা পুরো বিকেলটা কাটাল চুপচাপ। যেন বড় ধরনের আঘাত পেয়েছে।

তলপেটে ব্যথা হচ্ছে।

তীব্র ব্যথা না— এক ধরনের আরামদায়ক ব্যথা। যে ব্যথায় শরীরে ঝিমঝিম ভাব হয়। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পর শরীরে যেমন আবেশের সৃষ্টি হয়— ব্যথাটা ঠিক সে

রকম আবেশ তৈরি করছে। কবিতার বইয়ের পাতা ওল্টাতে ভালো লাগছে না। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে— বমি বমি ভাবটা যাচ্ছে না।

রাতের খাবার নিয়ে এল সন্ধ্যা মিলানোর আগেই। ভাত, মাছ, সবজি। তবে কিছু কিছু রোগীর জন্যে অন্য ধরনের খাবারও আছে। যেমন তার জন্যে এসেছে দু স্লাইস রুটি, এক বাটি দুধ এবং একটা কলা।

মনজুর আধখান কলা খেল। তার পাশের বেডের রোগী বলল, ভাইজান কলাডা ফালাইয়েন না। রাইখ্যা দেন। রাইতে ক্ষিধা চাপলে খাইবেন। এরা রাইতে কোনো খাওন দেয় না। ক্ষিধায় কষ্ট হয়।

মনজুর বলল, আপনার নাম কী ?

রোগী এই প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশ ফিরে কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। যেন একটা জরুরি খবর দেয়ার প্রয়োজন ছিল, সে দিয়েছে। তার আর কিছু বলার নেই।

স্যার আপনার জন্য খাবার এনেছি।

ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ার হাতে জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার পাশে রোগা পনের-ষোল বছরের একটা ছেলে। সে দেখতে অবিকল জাহানারার মতো। তবে মনে হচ্ছে খুব লাজুক। একবারও মুখ তুলে তাকায় নি।

স্যার ও আমার ছোট ভাই— ফরিদ। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। ওকে নিয়ে এসেছি। ও আপনার সঙ্গে থাকবে।

আমার সঙ্গে থাকবে কেন ?

যদি কখনো কিছু দরকার হয়।

কোনো কিছু দরকার হবে না। আর দরকার হলে কত লোকজন আছে।

স্যার, ও বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করবে। মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে যাবে।

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, জাহানারা তুমি যন্ত্রণা করছ কেন ? ওকে নিয়ে তুমি যাও তো। আর শোন, রাতের খাবার আমি খেয়ে নিয়েছি। খাবারও নিয়ে যাও। এক্ষুণি।

জাহানারার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার ভাই ভীত চোখে তাকাচ্ছে বোনের দিকে। জাহানারার চোখ তখন জলে ভিজে উঠল। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, ফরিদ আয়।

দুই ভাইবোন ক্লান্ত পায়ে এগোচ্ছে বারান্দার দিকে। ফরিদ ফিসফিস করে বলল, আপা এত লোকজনের সামনে কাঁদছ ? সবাই তাকিয়ে আছে তোমার দিকে ! জাহানারা বলল, থাকুক।

ফরিদ বলল, আপা চল বাসায় চলে যাই।

জাহানারা বলল, না।

আমরা তাহলে কী করব ?

এখানে থাকব। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করব।

ফরিদ তার বোনের দিকে তাকাল. কিছু বলল না। বড় বোনকে সে খুব ভয় পায়।

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘর থেকে যেতে পারছে না। এই মানুষটা তার জন্যে যা করেছে তার কিছুই

সে ফেরত দিতে পারছে না। কিন্তু সে ফেরত দিতে চাচ্ছে। সে ইচ্ছাটাও এই মানুষটা জানতে পারছে না।

এই মানুষটা তাকে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে সময় কী ভয়াবহ অবস্থা! খবরের কাগজে যেখানে যা দেখেছে সে অ্যাপ্লিকেশন করে দিচ্ছে। ফ্যামিল প্ল্যানিং-এর কর্মী, সেলসম্যান, টেলিফোন অপারেটর, ফুলের দোকানের কর্মচারী, বিউটি পার্লারের বিউটিশিয়ান। যোগ্যতা আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। অ্যাপ্লিকেশন করা এবং সন্ধ্যায় মন খারাপ করে মার সঙ্গে বসে থাকা এই ছিল কাজ। মা কাঁদতেন নিঃশব্দে এবং এক সময় বলতেন, এখন কী হবে রে?

জাহানারা বলত, জানি না মা।

দেশের বাড়িতে যাবি? তোর এক চাচা আছেন। উনি কি আর ফেলে দেবেন? যাবি দেশের বাড়িতে?

জানি না মা।

তুই বল— এখন কী করব?

আল্লাহ্ আল্লাহ্ কর। এ ছাড়া কী আর করবে।

এই রকম অবস্থায় সে ইন্টারভ্যু দিতে এল থ্রী পি-তে। থ্রী পি-র মালিক নিজেই আছেন ইন্টারভ্যু বোর্ডে। তাঁর সঙ্গে আরো তিনজন। সেই তিনজনের একজন মনজুর সাহেব।

বড় সাহেব বললে, আপনার টাইপিং স্পিড কত?

জাহানারা ক্ষীণ স্বরে বলল, টাইপ জানি না স্যার।

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বললেন, চাওয়া হয়েছে টাইপিস্ট আর আপনি টাইপ না জেনেই দরখাস্ত করেছেন?

স্যার আমি শিখে নেব।

ডিয়ার ইয়াং লেডি, এটা তো টাইপ শেখার স্কুল নয়। আচ্ছা আপনি যান। নেক্সট।

তেতাল্লিশ জন ইন্টারভ্যু দিচ্ছে। তাদের সবারই নিশ্চয়ই চাকরি প্রয়োজন কিন্তু তার মতো কি প্রয়োজন? না, তার মতো প্রয়োজন কারোরই নেই। জাহানারা বাড়ি চলে গেল না। সারাদিন বসে রইল। ইন্টারভ্যু শেষ হবার পর আরেকবার সে যাবে। দরকার হলে চিৎকার করে কাঁদবে।

তার প্রয়োজন হলো না। মনজুর বের হয়ে এসে তাকে দেখে বলল, আপনার তো ইন্টারভ্যু হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? জাহানারা প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, স্যার আপনার সঙ্গে কি আমি একটু কথা বলতে পারি?

বলুন।

স্যার আমি এক রাতের মধ্যে টাইপ শিখব।

আপনার কি চাকরিটা খুব বেশি দরকার?

জ্বি।

বসুন এখানে। দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

জাহানারা জবাব দিল না।

মনজুর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কনফারেনস্‌ রুমে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এল আধঘণ্টা পর। হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। বাড়ি ভাড়া, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স সব মিলিয়ে তিন হাজার দু'শ টাকা। অকল্পনীয় ব্যাপার।

মনজুর বলল, তোমার বয়স খুবই কম। আমি তুমি করে বললে আশা করি রাগ করবে না। এই নাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এস আমার সঙ্গে চা খাও।

জাহানারা কোনো কথা না বলে পেছনে পেছনে এল। তার খুব ইচ্ছা করছে চিৎকার করে বলে— থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। সে বলতে পারল না। তার গলা ভার ভার হয়ে আসছে। চোখ জ্বালা করছে।

বস জাহানারা।

জাহানারা বসল। মনজুর বলল, আমি ধার হিসেবে তোমাকে এখন কিছু টাকা দেব যা তুমি মাসে মাসে আমাকে শোধ করবে। দেব ?

জাহানারা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

জাহানারার মা মানত করেছিলেন— মেয়ের চাকরি হলে একশ রাকাত নামাজ পড়বেন। সেই একশ রাকাত নামাজ শেষ হতে রাত চারটা বেজে গেল। জাহানারা তখনো জেগে। বারান্দায় অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে।

মা বারান্দায় এসে বললেন, পৃথিবীতে মানুষ এখনো আছে। এই রকম মানুষ বেশি থাকার দরকার নেই। কিছু থাকলেই হয়। একবার কি তুই উনাকে এই বাসায় নিয়ে আসবি ? শুধু দেখব। উনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

জাহানারা কিছু বলল না।

তার তখনো পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে স্বপ্ন। পুরোটাই স্বপ্ন। এসব জিনিস বাস্তবে কখনো ঘটে না। স্বপ্নেই ঘটে।

৬

জার্মান কালচারাল সেন্টারে ছবির এক্সিবিশন।

সুভেনিয়ারে লেখা— "Sunrise 71"। পঞ্চাশটি নানা মাপের ছবি। মীরা সুভেনিয়ার হাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। মীরার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই— মইন তার সঙ্গে আছে। লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে, মইনের দিকে। তাকে পুরোপুরি বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। মইন প্রায় ছ ফুটের মতো লম্বা। মাথার বেশিরভাগ চুল সাদা হওয়ায়— চুলে লালচে কালো রং দিয়েছে। লাল চুলের ধবধবে ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির উপর কাজ করা গাঢ় লাল রঙের চাদর। এমন চাদর পরতে যথেষ্ট সাহস লাগে। মইনের সাহসের কোনো অভাব নেই। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে। চোখের কোল ঈষৎ ফোলা, এ ছাড়া চেহারায় বয়সের কোনো ছাপ নেই। মীরার সঙ্গে মইনের দেখা এগার বছর পর। এগার বছর আগে এক মেঘলা দুপুরে মীরার মনে হয়েছিল, এই মানুষটিকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এই মানুষটি আছে বলেই পৃথিবী আছে, চন্দ্র-সূর্য আছে। এই মানুষটি পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর।

মইন বেশ উঁচু গলায় বলল, ইন্টারেস্টিং !

তার আশপাশে যারা ছিল সবাই তাকাল। মইন মীরার চোখে চোখ রেখে বলল, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ছবি অথচ সব ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। মজার ব্যাপার না মীরা ?

মীরা কিছু বলল না।

মইন আগের মতোই উঁচু গলায় বলল, আমি এই এক মাসে তিনটা ছবির এক্সিবিশন দেখলাম। তিনটাতেই দেখি ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। সম্ভবত আর্টিস্টরা তাদের ছবির জন্যে বাংলা ভাষাকে যোগ্য মনে করে না।

মীরা বলল, চুপ করুন তো। আপনাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াই মুশকিল। আর্টিস্টদের নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে।

সেই যুক্তিটা শুনতে চাচ্ছি। তুমি কি জান ?

না, আমি জানি না। চলুন যাই বেরিয়ে পড়ি। আর ভাল্লাগছে না।

আমার তা ভালোই লাগছে। একটা ছবি কিনব বলে ভাবছি। ছবি কেনার কায়দা-কানুন তুমি জানো ? কার সঙ্গে কথা বলব ?

আমি জানি না কার সঙ্গে কথা বলবেন। ঐ যে ডেস্কের কাছে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন— উনাকে জিজ্ঞেস করুন। উনিই আর্টিস্ট।

বুঝলে কী করে ?

সুভেনিয়ারে উনার ছবি আছে।

মইন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। ইংরেজিতে নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণে যা বলল তার বঙ্গানুবাদ হলো, স্বাধীনতা বিষয়ক আপনার ছবিগুলো দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে। এ দেশের শিল্পীরা যে স্বাধীনতা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে তা বোঝা যায়। আপনার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে একটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে— ছবির নাম দ্যা বায়োনেট। আমি ছবিটি কিনতে চাই। ইউএস ডলারে আমাকে কত দিতে হবে ?

আর্টিস্ট ভদ্রলোক খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। কী বলবেন তা ইংরেজিতে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারলেন না। শুধু বললেন— জাস্ট এ মিনিট। তিনি ব্যাকুল হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সম্ভবত ইংরেজি জানা পরিচিত কাউকে খুঁজছেন যিনি বাঙালি পোশাক-পরা এই বিদেশীর সঙ্গে ছবির দরদাম নিয়ে কথা চালাতে পারবেন।

মইন আবার আগের মতোই ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, Is there any problem sir ?

আর্টিস্ট অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, Just a minite. My English very bad.

মইন আবার বাংলায় বলল, আপনার ইংরেজির জ্ঞান অল্প তাহলে ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে দিয়েছেন কেন ? আপনি রাগ করবেন না। কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করছি। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম, দেশের নিয়ম-কানুন জানার চেষ্টা করছি।

মইন ভেবেছিল আর্টিস্ট রেগে যাবে। রেগে গেলেই লজিকবিহীন উল্টাপাল্টা কথা শুরু করবে। তখন মোটামুটি একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশান হতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, আর্টিস্ট একেবারেই রাগ করল না, বরং হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, আপনাকে দেখে আমেরিকান ভেবেছিলাম। আজকাল আমেরিকানরা খুব পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। শাল গায়ে দিয়ে ভাবে— এ দেশের সংস্কৃতি শিখে ফেলছে। আমি ভাই

আপনার ইংরেজি শুনে ভড়কে গিয়েছিলোম। আমি সরাসরি ইংরেজি বলতে পারি না। প্রথমে বাংলায় চিন্তা করি তারপর মনে মনে ট্রানস্লেশন করি। মেট্রিকে ইংরেজিতে কত পেয়েছিলাম জানেন ? চৌত্রিশ। একেবারে জানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে।

আপনি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।

দিচ্ছিরে ভাই দিচ্ছি। আমার সাথে বারান্দায় আসেন। বারান্দায় চা খেতে খেতে আপনাকে বুঝিয়ে দেই।

মইন বারান্দায় চলে এল। আর্টিস্ট হাসিমুখে বললেন, আর্ট কলেজ থেকে বের হয়েছি চার বছর আগে। কোনো চাকরি-বাকরি নেই। ছবির এক্সিবিশন করি, কিছু ছবি বিক্রি হয়, তা দিয়ে দিন চলে। ঐসব ছবি কারা কিনে— বিদেশীরা। আমাদের মানুষরা ভাত খেতে পারে না— ছবি কিনবে কী ? ঐ বিদেশীদের জন্যেই ক্যাপশনগুলো ইংরেজিতে লেখা।

আপনার যুক্তি গ্রহণ করা যায়।

তাহলে আরেকটা কথা শুনে যান— সুভেনিয়ারে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায়ও ছবির নাম দেয়া আছে। আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে আপনি এতই উল্লসিত ছিলেন যে ব্যাপারটা লক্ষ করেন নি।

সরি।

আপনাদের মতো লোকজন যারা সারাজীবন বাইরে থাকে— মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে দেশে আসে এবং দেশের প্রতি বাংলা ভাষার প্রতি, মমতায় অসম্ভব কাতর হয়ে পড়ে— তাদেরকে আমি কী মনে করি জানতে চান ?

না জানতে চাই না। এই জানাটা আমার জন্যে খুব আনন্দজনক হবে না তা বুঝতে পারছি।

জানতে না চাইলে বলব না। ছবি কি সত্যি সত্যি কিনবেন না চাল দেখালেন ?

কিনব। সত্যি সত্যি কিনব।

ছবির দাম দশ হাজার টাকা। ইউ.এস. ডলারে আপনি দুশ ডলার দিলেই হবে। বন্ধু হিসেবে এটা হলো আমার কমিশন।

মইন দুটি একশ ডলারের নোট বের করল।

আর্টিস্ট নির্লিপ্ত গলায় বলল, এক্সিবিশন আরো তিনদিন চলবে। থার্ড ডে-তে বিকেলে যদি আসেন ছবি নিয়ে যেতে পারবেন। কিংবা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলে ছবি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

আমি নিজেই আসব। চা খাবার কথা বলে বারান্দায় এনেছিলেন। চা কোথায় ?

চা আসছে। একটু অপেক্ষা করুন।

কাউকে চায়ের কথা বলেছেন— এমন শুনি নি কিন্তু।

কাউকে বলি নি তবে ব্যবস্থা করা আছে। রাস্তার ওপাশে ঐ যে চায়ের দোকান দেখছেন ওদের বলা আছে যখনই আমাকে বারান্দায় দেখবে— চা নিয়ে আসবে।

মইন লক্ষ করল, একটা বাচ্চা ছেলে দুকাপ চা নিয়ে সত্যি সত্যি আসছে।

মইন জার্মান কালচারাল সেন্টারে গাড়ি নিয়ে এসেছিল।

মীরাকে বলল, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলে কেমন হয়? রিকশা নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরি, কেমন? ক্ষিধেটা ভালোমতো জমুক, তারপর কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে। এখন বাজে মাত্র বারটা দশ। একটা-দেড়টার দিকে খাওয়া-দাওয়া করব, কেমন?

আজ বাদ দিলে কেমন হয়। কেন জানি ভালো লাগছে না, খুব ক্লান্ত লাগছে—।

ভালো না লাগলে অবশ্যি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে হবে। তবে দ্বিতীয়বার আর এই প্রোগ্রাম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। নয় তারিখ আমি চলে যাচ্ছি।

টিকিট পেয়ে গেছেন?

ইয়েস মাই ফেয়ার লেডি।

বেশ, তাহলে চলুন রিকশা করে খানিকক্ষণ ঘুরি।

রিকশায় উঠতে উঠতে মইন বলল, তুমি খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে যাচ্ছ— কোনো অসুবিধা নেই। অনিচ্ছা দূর হয়ে যাবে। আমি একজন ভালো কোম্পেনিয়ন, আশা করি তা স্বীকার কর।

জ্বি স্বীকার করি।

এক সময় আমার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে— এটাও বোধহয় ভুল না।

না ভুল না। অপেক্ষা করতাম। যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন আপনাকে দেবতার মতো মনে হত।

এখন মনে হয় না?

না।

এখন কী মনে হয়?

এখন সাধারণ একজন মানুষ বলে মনে হয়।

সাধারণ?

হ্যাঁ সাধারণ এবং একটু বোকা।

মইন বিস্মিত হয়ে বলল, বোকা! এই প্রথম কেউ আমাকে বোকা বলল!

মীরা সহজভাবে বলল, আমিই বুঝি প্রথম বললাম? আমার ধারণা ছিল আমার আগেও আরো কেউ বলেছে।

না বলে নি। তুমি কী কারণে আমাকে বোকা বলেছ একটু ব্যাখ্যা কর তো।

আপনার মধ্যে একটা লোক-দেখানো ব্যাপার আছে। প্রবলভাবেই আছে। আপনার মেধার একটি বড় অংশ আপনি ব্যয় করেন কীভাবে লোকদের ইমপ্রেস করবেন তার কায়দা-কানুন বের করার জন্যে। এই যে আর্ট গ্যালারিতে নাটকটা করার চেষ্টা করলেন তার পেছনে একই জিনিস কাজ করেছে। এই যে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলেন তার পেছনেও আমাকে ইমপ্রেস করার ব্যাপার আছে। আছে না? আপনি নিশ্চয় ভাবছেন— এই কাণ্ডটা করার ফলে আমি ভাবব— মানুষটা সাধারণ আর দশটা মানুষের মতো না।

মইন বলল, আমি কি সিগারেট ধরাতে পারি?

পারেন।

আশা করি ধোঁয়ায় তোমার অসুবিধা হবে না।

না, হবে না।

মইন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তুমি অসম্ভব স্মার্ট হয়েছ। ভেরি ভেরি স্মার্ট।

আপনি কি ভেবেছিলেন এখানো আমি ক্লাস টেনের ছাত্রী ?

তা ভাবি নি। তবে ...

তবে কী ?

এ রকম স্মার্টনেসও আশা করি নি। স্মার্টনেসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কাঠিন্যও চরিত্রে চলে এসেছে— আই লাইক ইট। হাসছ কেন মীরা ?

'আই লাইক ইট' শুনে হাসলাম। মনে আছে আপনি প্রায়ই আই লাইক ইট বলতেন ?

বলতাম নাকি ? আমার মনে নেই। রিকশায় ঘুরতে ভালো লাগছে না, চল কোথাও গিয়ে বসি। রিকশায় কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। মুখ দেখা যায় না। তাকিয়ে থাকতে হয় রিকশাওয়ালার পিঠের দিকে।

মীরা বলল, আমার কিন্তু রিকশায় ঘুরতে ভালোই লাগছে। মাথা ধরেছিল। মাথাধরাটা এখন গেছে।

তাহলে চল খানিকক্ষণ ঘুরি। এক কাজ করি— রিকশা করেই গুলশানে যাই। গুলশানে সি ফুডের ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। লবস্টার খাওয়া যাবে।

মীরা কিছু বলল না।

মইন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মীরার হাঁটুতে হাত রেখেছে। তার মনে কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ নেই। মীরাও কোনোরকম অস্বস্তি বোধ করছে না।

মীরা।

জ্বি।

আমার রিকশা নেবার পেছনে যে যুক্তি তুমি দিয়েছ তা পুরোপুরি ঠিক না। রিকশার সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে— ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার সুযোগ পাওয়া যায়। এই যে আমি আমার বাঁ হাত তোমার হাঁটুতে রাখলাম— এটাও খুব অস্বাভাবিক লাগছে না তোমার কাছে। কারণ, আমার এইহাত রাখার জায়গা নেই— হা-হা-হা।

মীরা বলল, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার কোনো বাসনা কি কখনো আপনার মধ্যে ছিল ?

মইন বলল, ছিল না। যখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন তুমি ছিলে নিতান্তই বালিকা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা-ভাবনায় তোমার মাথাটা ছিল ঠাসা। তাছাড়া আমার প্রতি তোমার আগ্রহ ছিল এতই প্রবল, এতই তীব্র যে আমার আগ্রহ অপ্রয়োজনীয় ছিল।

এতদিন পর আপনারই বা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার ইচ্ছা হলো কেন ?

জানি না। বয়স হয়েছে বলেই হয়তো। অবশ্যি তুমি অনেক সুন্দর হয়েছ। বালিকা বয়সে তোমার চেহারায় দিশাহারা দিশাহারা ব্যাপার ছিল— তাতে তোমাকে খানিকটা হলেও পাগলের মতো দেখাত।

এখন দেখাচ্ছে না?

না।

মীরা হালকা গলায় বলল, বালিকা বয়সে আমি দিশাহারা ছিলাম না। আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার জন্যে আপনি ছিলেন। এখন আমি দিশাহারা।

দিশাহারা হলেও চেহারায় কিন্তু তার ছাপ নেই। এখন তোমার কথা বল। আমি সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট টানব। তুমি কথা বলতে থাকবে, আমি শুনব। এক সময় আমি কথা বলতাম— তুমি হাঁ করে শুনতে; এখন তুমি বলবে— আমি শুনব।

রিকশাওয়ালাও শুনবে।

শুনুক, ক্ষতি কী? তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। হলেও কিছু যায় আসে না। অবশ্যি তুমি ইংরেজিতেও বলতে পার।

আমার বলার মতো কিছু নেই।

বিয়ে করছ সেই খবর পেয়েছিলাম।

পাওয়ারই তো কথা। আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম।

তোমার একটা বাচ্চা মারা গেছে এই খবর কিন্তু জানাও নি। দেশে এসে শুনলাম। মাই ডিপেস্ট সিমপ্যাথি।

মীরা কিছু বলল না। মুখের উপর সরাসরি রোদ এসে পড়েছে। কপাল বিড়বিড় করছে।

মীরা।

জ্বি।

তোমার ম্যারেজ ব্রেকডাউন করল কেন বল তো? আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ স্পেসিফিক্যালি কিছু বলতে পারে না। তোমার বড় ভাই জালাল সাহেবকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনিও কিছু বলতে পারেন নি। শুধু বলেছেন— লোকটা গাধা টাইপের। তাকে মানুষ বলা যায় না। সে হচ্ছে ফার্নিচারের মতো। সত্যি?

খানিকটা সত্যি।

তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনেশুনে একটা ফার্নিচার বিয়ে করবে!

আমি বুদ্ধিমতী না। বুদ্ধিমতী হলে— আপনার জন্যে এমন পাগল হতাম না।

এক সময় আমার জন্যে পাগল হয়েছিলে তার জন্যে এখন কি তুমি রিপেনটেড?

না, রিপেনটেড না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ঐটা। আর আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি এখন চুপ করে থাকব।

মীরা সত্যি সত্যি চুপ করে গেল। রেস্টুরেন্টেও তেমন কিছু বলল না। মইন হড়বড় করে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। মীরার কেন জানি মনে হয়েছিল মইনের গল্প এখন আর তাকে আকর্ষণ করবে না। দেখা গেল— তা নয়। এগার বছর পরেও মইনের গল্প শুনতে তার ভালো লাগছে। শুধু ভালো না, অসম্ভব ভালো লাগছে। তার কারণ কী? বালিকা বয়সের তীব্র আবেগের স্মৃতির কারণে? এই আবেগের একটি অংশ কি এখনো রয়ে গেছে?

বুঝলে মীরা, যদিও তুমি আমাকে আধঘণ্টা আগে বোকা বলেছ— আমি বোকা নই।

কারণ আমি যুক্তি দিয়ে চারপাশের জগৎ বুঝতে চেষ্টা করি। একজন বোকা তা পারে না। আমি যদি আবেগ দিয়ে সবকিছু বিচার করতাম তাহলে হয়তো এগার বছর আগে তোমাকে বিয়ে করতাম। তার ফল খুব শুভ হত না। আমরা কমপেটেবল না। তেল এবং জলের মতো ঝাঁকিয়ে মেশানো যায়। কিছুক্ষণ রাখলেই আলাদা হয়ে যায়।

আমি অনেক ভেবেচিন্তে এক আমেরিকান তরুণীকে বিয়ে করেছি। আমেরিকান তরুণীরা এশিয়ান পুরুষদের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ তারা জানে এশিয়ানরা বিবাহবিচ্ছেদ জিনিসটা খারাপ চোখে দেখে। সহজে বিবাহবিচ্ছেদে যেতে চায় না। আমেরিকান তরুণীরা সঙ্গত কারণেই স্থায়ী সম্পর্কে যেতে চায়।

আমার স্ত্রী মিশেলের হোমটাউন হচ্ছে— নিউ অরলিন্স। বাবা কোটিপতি। ফার্মিং করে মিলিওনিয়ার হয়েছে। তার বিপুল অর্থের একটা অংশ আমার স্ত্রী পাবে। বিয়ের সময় এটিও আমার হিসেবে ছিল।

ধনী স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অনেকাংশে ক্ষমা করার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, দোষত্রুটি তার কিছুই নেই। চমৎকার একটি মেয়ে, A loving and caring wife. এখন আমার তিনটি বাচ্চা। মিশেল তার বাচ্চাগুলোকে পাগলের মতো ভালবাসে। আমাকে দেবতা মনে না করলেও দেবতার কাছাকাছি মনে করে এবং আমাকে খুশি করার জন্যে যা করে তাকেও পাগলামির পর্যায়ে ফেলা চলে। একটা উদাহরণ তোমাকে দেই। তোমার বোরিং লাগছে না তো মীরা ?

না, বোরিং লাগছে না। ঝগড়াঝাটির গল্প হলে বোরিং লাগত।

একবার মিশেল বলল, তোমার আসছে জন্মদিনে তোমাকে আমি চমৎকার একটা উপহার দেব। এত চমৎকার যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমি বললাম খুব এক্সপেনসিভ গিফট ? সে বলল, মোটেই এক্সপেনসিভ নয়— তবে অসাধারণ। আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। জন্মদিন এসে গেল। মিশেল বলল, তোমার জন্মদিনের উপহার হলো, আমি এখন বাংলায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারি। তোমাকে খুশি করার জন্যে আমি একটি বাঙালি পরিবারের কাছে গত আট মাস ধরে বাংলা শিখছি। তুমি এখন বাংলায় আমার সঙ্গে কথা বলতে পার। এই বলেই সে পরিষ্কার বাংলায় বলল— মইন, আমি ভালবাসি, তোমাকে। অল্প নয়। বেশি পরিমাণে ভালবাসি।

মীরা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মইন ভাই। আপনার স্ত্রীর ছবি কি আপনার কাছে আছে ? একটু দেখান না।

মিশেলের ছবি আমার কাছে নেই। থাকলে দেখাতাম। She is quite pretty. তুমি তো কিছুই খাও নি মীরা !

কেন জানি খেতে ভালো লাগছে না।

তুমি খুব ডিসটার্বড ?

না।

তোমার বড়ভাই বলছিলেন তুমি নাকি খুব ব্যস্ত হয়ে চাকরি খুঁজছ ?

হ্যাঁ খুঁজছি।

আমি যদি তোমার জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দেই তাহলে কেমন হয় ?

ভালোই হয়।

সব মিলিয়ে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার পাবে।

অনেক টাকা।

বড় একটা কোম্পানির পিআরও— জনসংযোগ। এইসব কাজ মেয়েরা খুব ভালো পারে।

আমিও ভালোই পারব। চলুন আজ তাহলে উঠি ?

আরেকটু বস। আইসক্রিম খাও। আইসক্রিম খাবে ?

না।

আমি তোমাকে ছোটখাটো একটা সারপ্রাইজ দেবার ব্যবস্থা করেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তুমি টার্মস এন্ড কন্ডিশন্‌স্‌ দেখো।

মীরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চিঠিটা নিল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল। রেখে দিল তার হ্যান্ডব্যাগে। হালকা গলায় বলল, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

মইন নিচু গলায় বলল, তোমার বিষয়ে আমার মনে বড় ধরনের অপরাধবোধ আছে। তোমার জন্যে সামান্য কিছু করতে চাচ্ছি অপরাধবোধ খানিকটা হলেও কমানোর জন্যে।

মীরা শীতল গলায় বলল, অপরাধবোধ কেন ?

মইন চুপ করে রইল।

মীরা আবার বলল, অপরাধবোধ কী জন্যে পরিষ্কার করে বলুন।

থাক বাদ দাও। চল ওঠা যাক।

মীরা উঠল না। চেয়ারে বসেই রইল। তার চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ভুরুর কাছে ঈষৎ ঘাম। হাতের পাতলা আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। এগার বছর আগের এক দুপুরে এই পৃথিবী হঠাৎ তার কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে মারা যাচ্ছে। এক ধরনের অদ্ভুত কষ্ট, অদ্ভুত আনন্দ। সে চুপি চুপি তাদের কলাবাগানে ফ্ল্যাটের তিনতলায় উঠে গেল। সেই ফ্ল্যাটের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। মীরা ঘরে ঢুকে দেখল, ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে মইন ভাইয়ের মা শুয়ে আছেন। মীরাকে ঢুকতে দেখে বললেন, আয় মা আয়। কী গরম পড়েছে দেখেছিস। শরীরের সব চর্বি ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মীরা কোনোমতে বলল, মইন ভাই কোথায় খালা ?

তিনি ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, আছে বোধহয় তার ঘরে। ঠাণ্ডা পানি চাচ্ছিল। মা, ফ্রিজ থেকে একটা পানির বোতল দিয়ে আয় তো।

মীরা পানির বোতল ছাড়াই ঘরে ঢুকেছিল।

সেই নির্জন ঘুমকাতর দুপুর। বারান্দায় রেলিঙে কা-কা করে একঘেয়ে স্বরে কাক ডাকছে। মাথার উপর কর্কশ শব্দে ঘুরছে ফ্যান। মইন ভাই উবু হয়ে কী যেন লিখছেন।

মইন ভাই পায়ের শব্দে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! কী ব্যাপার মীরা!

মীরা কোনো মতে চাপা গলায় বলল, আপনাকে দেখতে এসেছি।

এগার বছর আগে ঐ ঘরে যা ঘটেছিল তার জন্যে মীরার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে অনেকবার ভেবেছে। নানাভাবে ভেবেছে। প্রতিবারই মনে হয়েছে— তাকে যদি

আবার এই জীবন নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেয়া হয় সে এই ভুল আবারো করবে। আগ্রহ ও আনন্দ নিয়েই করবে।

মীরা বাসায় ফিরল সন্ধ্যায়।

মীরার ভাবি বললেন, জাহানারা নামে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছিল। বলল, মনজুর খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে।

মীরা বলল, ও আচ্ছা।

দেখতে যেতে চাও ?

আজ আর যাব না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

জাহানারা মেয়েটা কে ? তিন বার টেলিফোন করেছে।

ওর অফিসে কাজ করে— টাইপিস্ট।

বলেছে রাত আটটার পর আবার টেলিফোন করবে।

আমাকে চাইলে বলবে আমি বাসায় নেই।

মীরা তার ঘরে ঢুকে সুইচে হাত দিয়ে শক খেল।

সুইচ ঠিক করা হয় নি। গত দুদিন ধরে তার ঘরের সুইচ নষ্ট। বাতি জ্বলছে না। দিনের বেলা সমস্যা হয় না। রাতে অন্ধকার ঘরে ঢুকতে হয়। মশারি ফেলতে হয় অন্ধকারে। দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় ওঠার পর চারপাশের অন্ধকার ভয়াবহ লাগে। এক বিন্দু আলোর জন্যে প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে চোখ বন্ধ করে কল্পনায় আলো-ঝলমল দিন দেখা। ভাগ্যিস কল্পনা করার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছিল।

মীরা !

মীরা চমকে পেছনে তাকাল। অন্ধকারে মানুষ খুব সহজেই চমকায়। তা ছাড়া কাপড়ের অদ্ভুত এক জোড়া স্যান্ডেল পরে জালালউদ্দিন আজকাল নিঃশব্দে হাঁটা শুরু করেছেন। আচমকা উপস্থিত হন, চিকন গলায় 'মীরা' বলে এমনভাবে ডাকেন যে কেঁপে উঠতে হয়।

তোর ঘরের সুইচ আজো ঠিক করা হয় নি। দোষ আমার। আমি ইলেকট্রিশিয়ানকে খবর দিতে ভুলে গেছি।

মীরা বলল, নো প্রবলেম।

একটা টেবিল ল্যাম্প লাগিয়ে দিয়ে গেছি। দেখ তো জ্বলে কিনা।

টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা তা দেখার জন্যে এত রাতে ভাইয়া তার ঘরে আসবে এটা মীরা আশা করে না। নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে। এমন কোনো বিষয় যা সহজভাবে বলা যায় না। যার জন্যে অজুহাত তৈরি করে ঘরে আসতে হয়।

মীরা, ল্যাম্পটা কি জ্বলছে ? এটার সুইচটাও খারাপ, খুব জোরে চাপ দে। জ্বলছে ?

হুঁ। ভাইয়া এস ঘরে এস।

জালালউদ্দিন বললেন, রাত সাড়ে দশটা বাজে— এখন তোর ঘরে ঢুকে কী করব।

তুই ঘুমাতে যা। আমিও ঘুমাব।

তোমার যদি কিছু বলার থাকে বল।

জালালউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার আবার কী বলার থাকবে? তুই কি কিছু বলতে চাস?

না।

তাহলে ঘুমিয়ে পড়। ও আরেকটা কথা, চাকরির জন্যে তোর ছোটাছুটি করার কোনো দরকার নেই। মাসে মাসে তোকে যে হাতখরচ দেই সেটা সামনের মাস থেকে ডাবল করে দেব।

কোনো দরকার নেই ভাইয়া। চাকরি একটা পেয়েছি।

সে কী!

তোমাকে বলেছিলাম না, একজন স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট তরুণীর চাকরি পাওয়া খুবই সহজ।

বেতন কত?

বেতন কত— কী চাকরি, সবই বলব, আগে জয়েন করে নেই। তোমার পিঠের ব্যথার অবস্থা কী?

ব্যথা এখন নেই। স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার কি জানিস, ব্যথাটা দিনে থাকে— রাতে থাকে না। তুই তো সব কিছুতেই একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলিস, এই ব্যাপারে তোর যুক্তি কী?

কোনো যুক্তি নেই। তুমি ঘুমাতে যাও। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তবে তোমার যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে তাহলে ভেতরে আস। আমার ধারণা তুমি কিছু বলতে চাও। আমার ঘরের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে কিনা সেই খোঁজে তুমি আসবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জালালউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, তোর সবচে' বড় সমস্যা কি জানিস? সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে তোর ধারণা তুই সবকিছু বুঝে ফেলিস। যেখানে বোঝার কিছু নেই সেখানেও তুই A থেকে Z পর্যন্ত বুঝে ফেলেছিস।

রাগ করছ কেন?

রাগ করছি না। সত্যি সত্যি টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা দেখতে এসেছিলাম, তুই তাও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললি!

তুমি যে প্রচণ্ড রাগ করছ তা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমার ব্যাখ্যা ঠিক আছ। ব্যাখ্যা ভুল হলে মোটেই রাগ করতে না।

তুই তোর ব্যাখ্যা নিয়ে থাক। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।

যে কাপড়ের স্যান্ডেলে তিনি নিঃশব্দে হাঁটেন সেই স্যান্ডেলেই তিনি শব্দ করে হেঁটে নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। রাগে তাঁর গা জ্বলে যাচ্ছে, কারণ মীরার কথা সত্যি। তিনি আসলেই মীরার সঙ্গে জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলেন।

তিনি বলতে এসেছিলেন মীরা যেন মনজুরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হাসপাতালে না যায়। অসুখ অবস্থায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। মনজুরেরও মাথার ঠিক নেই। সে আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলে ফেলতে পারে। এইসব শুনে মীরার যদি মনে হয়—

ডিভোর্স নেয়া ঠিক হয় নি তাহলেই সর্বনাশ। সম্পর্ক ছেদের পরের এক মাস খুবই সর্বনেশে মাস। এই এক মাস কেটে যাওয়া সম্পর্কের জন্যে মন হা-হা করতে থাকে। তিনি নিজের চোখে বন্ধু ফজলুকে দেখেছেন। স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত ঝগড়া, কিছুতেই বনিবনা হয় না। ফজলু উত্তরে গেলে তার স্ত্রী যায় দক্ষিণে। ফজলু যদি কোনো ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বলে তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পরপর তিন বার বলবে 'না'। এক সময় ফজলু বলল, তোমার সঙ্গে বাস করা সম্ভব হচ্ছে না। এই এক বারই দেখা গেল তার স্ত্রীরও একই অভিমত। ডিভোর্স হয়ে গেল। ফজলু হাসতে হাসতে জালালউদ্দিনকে বলল, ভাই বাঁচলাম। জীবন প্রায় যেতে বসেছিল। এখন নিজেকে মনে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

সেই মুক্ত বিহঙ্গকে দেখা গেল ডিভোর্সের দশদিন পর তার স্ত্রীর বাবার বাড়ির সামনের রাস্তায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে। মাথার চুল এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। হাতে সিগারেটের প্যাকেট। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে, কয়েকটা টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা। তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং কঠিন গলায় বলল, কী চাও তুমি ? ফজলু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, বাসায় চল।

বাসায় যাব মানে ? কী বলছ তুমি ?

ফজলু আবারো বলল, বাসায় চল।

তোমার মাথা আগেই খারাপ ছিল, এখন তো মনে হয় আরো খারাপ হয়েছে। বাসায় কী করে যাব ? পাগলের মতো কথা বলছ কেন ?

ফজলু একটা রিকশা দাঁড় করাল এবং তৃতীয়বার বলল, বাসায় চল।

তার স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, শাড়িটা বদলে আসি। এই শাড়ি পরে যাব নাকি ?

এখনো তারা এক সঙ্গেই আছে। দুটি বাচ্চা হয়েছে। মনের মিলের ছিটেফোঁটাও নেই। ঝগড়াঝাটি দশগুণ বেড়েছে। তা নিয়ে ফজলুর মাথাব্যথা নেই। জালালউদ্দিনের ধারণা, মীরার ব্যাপারেও তাই হবে। যদিও মীরা আর দশটা মেয়ের মতো না। বেশ খানিকটা অন্য রকম, তবু শেষ পর্যন্ত তাই হবে। বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মনজুর কিছু একটা বলতেই মীরার চোখে পানি এসে যাবে। সে আর হাসপাতাল থেকে নড়বে না। সেটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে।

তিনি একেবারে গোড়া থেকেই এই ছেলেটাকে বিয়ে না করার জন্যে মীরাকে বলেছিলেন। মীরা তাঁর কথা শোনে নি। কোনোরকম যুক্তিতে কান দেয় নি। আজ তার ফল মীরা কি হাতে হাতে দেখছে না ? বেশি বুঝলে তার ফল এই হয়। জালালউদ্দিনের মতিঝিলের অফিসে একদিন মীরা এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, ব্যাপার কী রে ?

মীরা বলল, তুমি কি খুব ব্যস্ত ?

ব্যস্ত তো বটেই। তুই চাস কী ?

পনের মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলব।

জরুরি কিছু ?

অবশ্যই জরুরি। বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি।

জালালউদ্দিন অসম্ভব খুশি হলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো ? চিরকুমারী থাকব, নিজের মতো থাকব ঐ পোকাগুলো মাথা থেকে নেমেছে ?

হ্যাঁ নেমেছে।

ছেলেটা কে ? আমি চিনি ?

না তুমি চেন না— আমি নিজেও চিনি না।

আমি নিজেও চিনি না মানে ? তোর সঙ্গে পরিচয় নেই ?

পরিচয় আছে। পরিচয় থাকলেও তো সবাইকে চেনা যায় না। ও এই রকম।

ছেলেটা সম্পর্কে বল তো শুনি।

নাম হচ্ছে মনজুর।

নাম যাই হোক— ছেলেটা কী। কী করে ? পড়াশোনা কী ?

মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি করে— প্রাইভেট ফার্মে। পড়াশুনো কী জিজ্ঞেস করি নি। বি.এ. পাস নিশ্চয়ই।

পরিচয় কত দিনের ?

খুব বেশি হলে দুমাস।

ফ্যামিলির অবস্থা কী ?

ফ্যামিলিই নেই— আর ফ্যামিলির অবস্থা।

ফ্যামিলি নেই মানে ?

বাবা-মা ভাই-বোন কিছুই নেই। মা মারা গেছেন দুবছর বয়সে, বাবা ষোল বছর বয়সে।

সে-কী !

মীরা খুব শান্ত গলায় বলল, এই ব্যাপারটাই আমাকে খুব আকর্ষণ করেছে। ভালবাসাহীন পৃথিবীতে সে মানুষ হয়েছে। অতি প্রিয়জন সে কাউকে কখনো পায় নি। এই প্রথম পাবে। প্রবল আবেগ ও ভালোবাসায় সে বাকি জীবনটা আচ্ছন্ন থাকবে।

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, উল্টোটাও তো হতে পারে— ভালোবাসা কী এই ছেলে জানেই না। ভালোবাসবে কী ?

না জানলে তো ভাইয়া আরো ভালো। আমি তাকে ভালোবাসা শেখাব।

জালালউদ্দিন চিন্তিত মুখে বললেন, তোর ব্যাপার কোনোটাই আমার কখনো পছন্দ হয় নি; এটিও হচ্ছে না। আরো ভালোমতো আলোচনা করব। তুই চা খাবি ?

খাব। চা খেতে খেতে তুমি কি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে ? ওকে নিয়ে এসেছি।

নিয়ে এসেছিস !

হুঁ। বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ঠিক করে রেখেছি চা খাবার সময় তাকে ডাকব। চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র বিদায় করে দেব। তোমার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথা বলব। তুমি ছেলেটিকে দেখার পর কী মনে করছ তা শুনব।

দেখার আগেই বলছি আমার পছন্দ না।

মীরা মানিব্যাগ থেকে মুখ-বন্ধ একটা খাম বের করে ভাইয়ের হাতে দিয়ে হালকা গলায় বলল, ছেলেটিকে দেখার পর তার সঙ্গে কথা বলার পর তুমি যা বলবে তা আমি লিখে এনেছি। তুমি দেখবে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। খামটা এখন খুলবে না ভাইয়া।

জালালউদ্দিন খাম হাতে বসে রইলেন। মীরা বারান্দা থেকে মনজুরকে নিয়ে এল। তিনি ছেলেটির মধ্যে এমন কিছুই পেলেন না যা দেখে খুব উৎসাহিত বোধ করা যায়। গায়ে চকলেট রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট, ধবধবে সাদা প্যান্টের উপর ভালোই দেখাচ্ছে। চুল আঁচড়ানো, চেহারা মোটামুটি। চোখ-মুখে এক ধরনের অনাগ্রহ যা এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

জালালউদ্দিন লক্ষ করলেন, ছেলেটি তাকে ঠিক পাত্তা দিচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সে যে তা করছে তা হয়তো না। তার স্বভাবই হয়তো এরকম। তিনি বসতে বলার আগেই সে চেয়ার টেনে বসল।

তিনি যখন বললেন, চা, না কফি ?

সে বলল, কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

জালালউদ্দিন সিগারেট বের করে বললেন, চলবে ?

সে কোনো কথা না বলে সিগারেট নিল। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম সহজভাবে সিগারেট নেয়া যায় না। সামাজিক কিছু ব্যাপার আছে।

মীরা বলল, ভাইয়া এর নাম মনজুর।

তিনি শুকনো গলায় বললেন, শুধু মনজুর ? আগে-পেছনে কিছু নেই ? আহম্মদ বা মোহাম্মদ ?

মনজুর বলল, জ্বি না।

সে-কী !

মনজুর বলল, বাবা ডাকনাম রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, ভালো নাম রাখার সুযোগ পান নি। আমার ডাকনাম মঞ্জু। স্কুলের খাতাতে আমার নাম ছিল মঞ্জু। এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় হেড স্যার বললেন, মঞ্জু নাম তো দেয়া যায় না; এটাকে মনজুর করে দেই। মনজুর হোসেন। হোসেন আমার খুবই অপছন্দ কিন্তু তা বলতে পারলাম না কারণ হেড স্যারকে খুব ভয় পেতাম।

তাহলে তো আপনার নাম মনজুর হোসেন। মনজুর বলছেন কেন ?

এডমিট কার্ড যখন আসল তখন দেখা গেল হেড স্যার আমার নামের শেষে হোসেন দিতে ভুলে গেছেন। আমার আগে যে ছিল, জহির আহাম্মদ, তার নামের শেষে হোসেন লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই বেচারার নাম এখন জহির আহাম্মদ হোসেন।

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। গল্পটা তাঁর খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না।

একদল মানুষ আছে যাদের ভাণ্ডারে এরকম গোটা পাঁচেক গল্প থাকে। গল্পগুলো বলে তারা প্রথম আলাপে লোকজনদের মুগ্ধ করে। সবাই ভাবে বাহ্ বেশ, এই লোকটা রসিক তো। কিন্তু রস যে এই পাঁচটিতেই সীমাবদ্ধ তা তারা জানতে পারে না।

তাঁর মনে হলো— ছেলেটা কথাও বেশি বলে। নাম জিজ্ঞেস করলে যে লম্বা গল্প ফেঁদে বসে, সে তো সারাক্ষণই বকবক করবে। শেষ পর্যন্ত মীরা এমন একজনকে পছন্দ করল ! আশ্চর্য ! জালালউদ্দিনের ইচ্ছা ছিল আরো দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করার— যেমন, বাড়ি কোথায়, পড়াশোনা কী পরিমাণ করেছেন; কিন্তু এখন আর আগ্রহ বোধ করছেন

না।

মীরা বলল, আচ্ছা তুমি এখন যাও। ভাইয়ার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আগামীকাল এগারটার দিকে তোমার অফিসে যাব।

মনজুর চলে গেল। যাবার আগে সাধারণ ভদ্রতার 'স্লামালিকুম' বলার কথাও তার মনে হলো না। জালালউদ্দিনের মনটাই কালো হয়ে গেল। তিনি দুঃখিত হয়ে ভাবলেন— এই ছেলে? শেষ পর্যন্ত এই ছেলে?

মীরা বলল, ভাইয়া এখন তোমার মতামত বল। তোমার মতামত আমার কাগজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।

জালালউদ্দিন বললেন, তোর পছন্দ হয়েছে তুই বিয়ে কর, অসুবিধা কী। এটা তোর ব্যাপার। আমার তো কিছু না।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, তুমি এটা বলছ যাতে কাগজের লেখার সাথে তোমার কথা না মেলে। তুমি ইচ্ছা করেই উল্টো কথা বলছ। তাই না?

জালালউদ্দিন বিরক্ত হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন— মীরার কথা সত্যি।

মীরা বলল, উঠি ভাইয়া। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

মীরা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর জালালউদ্দিন খাম খুললেন। মীরা গোটা গোটা করে লিখেছে—

> "ভাইয়া, তুমি মত দেবে। তুমি বলবে— হ্যাঁ।
> তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলবে। দেখলে
> আমার কেমন বুদ্ধি? এরকম একজন বুদ্ধিমতী
> মেয়ে কখনো ভুল করবে না। আমি যা করছি
> ঠিকই করছি। তুমি ভয় পেয়ো না। ছেলেটা ভালো।"

বুদ্ধিমতী মেয়ে ভুল করে না তার নমুনা এখন দেখা যাচ্ছে। তিন বছরের মাথায় তাকে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হতে হয়েছে।

৭

বদরুল আলম ভাগ্নেকে দেখতে এসেছেন।

শুধু হাতে আসেন নি। দু ডজন কমলা, এক ডজন কলা এবং চারটা ডাব এনেছেন। একটা হরলিক্সের কৌটাও সঙ্গে আছে। তিনি বিছানার পাশে বসতে বসতে বললেন, তুই আছিস কেমন?

মনজুর বলল, ভালো।

ভালো সেটা বুঝতেই পারছি। ভালো না হলে এইভাবে বিছানায় বসে কেউ চা খায়? তোকে চা খেতে দিচ্ছে?

হ্যাঁ দিচ্ছে। শুধু তাই না— ডাক্তার বলেছে ইচ্ছা করলে আমি বাসায় চলে যেতে পারি।

বলিস কী!

গতকাল ডায়ালিসিস হলো। তারপর থেকে শরীর ইমপ্রুভ করছে। এখন বেশ

ভালো। যে কিডনিটা কাজ করছিল না সেটাও কাজ করা শুরু করেছে বলে আমার ধারণা।

তোর কিডনি প্রবলেম তাহলে সলভড্। বাঁচলাম। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম প্রয়োজনে একটা তোকে দেব।

মনজুর দরাজ গলায় বলল, সেই সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না মামা। সুযোগ এখনো আছে। একশ ভাগ আছে। কিডনি বদলাতে হবে।

বদরুল আলম চুপ করে গেলেন।

মনজুর বলল, শুনে মনে হচ্ছে চুপসে গেলে !

বদরুল আলম বললেন, চুপসে যাব না তো কী ? এই বয়সে কিডনি দিলে কি আর বাঁচব ? অপারেশনের ধকলই সইবে না। তুই ঠিকই বেঁচে থাকবি, মাঝখান থেকে আমি শেষ।

তোমার আর বাঁচার দরকার কী ? অনেক দিন তো বাঁচলে।

এই বাঁচা কি কোনো বাঁচা ? পরিশ্রম করতে করতে জীবন গেল। সুখের মুখ দেখলাম না— এখন একটু দেখতে শুরু করেছি, এখন যদি মরে যাই তাহলে লাভটা কী ?

তাও ঠিক।

বদরুল আলম বললেন, নে কলা খা।

কলা খাব না মামা, তুমি খাও।

কলা হলো ফ্রুটসের রাজা। একটা কলায় কতটুকু আয়রন থাকে জানিস ?

কতটুক থাকে ?

অনেক— বলতে গেলে পুরোটাই আয়রন।

তুমি বসে বসে আয়রন খাও। আমার ইচ্ছা করছে না। আর কিডনি নিয়েও তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এমনি বললাম।

কিডনি লাগবে না ?

লাগবে হয়তো। লাগলেও তোমারটা না।

বদরুল আলম বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। দুটা কলা এবং একটা কমলা খেলেন। হৃষ্ট গলায় বললেন, তোর এখানে কোনো লোকটোক নেই ? একটা দা পেলে ডাব কেটে খাওয়া যেত।

এখানে কোনো লোক নেই মামা। ডাব সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমার অফিসের লোকজন কেটে দেবে।

ডাবের শাঁসেও কিন্তু আয়রন আছে।

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, তুমি আয়রনের এত খোঁজ কোথায় পেলে বল তো মামা ?

কাঠের মিস্ত্রি বলে তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না ?

বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করছি।

বদরুল আলম বললেন, এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হত না।

মনজুর বলল, এখানের চা মুখে দিতে পারবে না মামা। ভয়াবহ চা। প্রচুর চিনি,

প্রচুর দুধ এবং প্রচুর জীবাণু।

প্রচুর জীবাণু মানে ?

হাসপাতাল হচ্ছে অসুখের গুদাম। এখানকার চায়ে জীবাণু থাকবে না তো কোথায় থাকবে ? কিলবিল করছে জীবাণু। তুমি বরং চলে যাও।

তুই আমাকে বিদায় করে দিতে চাচ্ছিস কেন ?

বিদায় করতে চাচ্ছি কারণ তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। তোমার গা থেকে তার্পিন তেলের গন্ধ আসছে— গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে।

বদরুল আলম দুঃখিত গলায় বললেন, তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছিস ? রেগে থাকলে সেটা খোলাখুলি বল। খামাখা তার্পিন তেলের কথা আনলি কেন ? আমি কি গায়ে তার্পিন তেল মাখি, নাকি আমি একটা ফার্নিচার যে আমার গায়ে দুবেলা তার্পিন তেল দিয়ে বার্নিশ করা হয় ? তোর রাগটা কী জন্যে, শুনি ?

আমার কোনো রাগ নেই।

অবশ্যই আছে। এবং কারণটাও জানি। কাঠমিস্ত্রি হয়েছি বলেই কি আমার বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে না ?

ঠিক আছে, কী কারণ তুমি বল।

আমি তোকে বলেছিলাম তোর বিয়েতে একটা খাট বানিয়ে দেব। এমন খাট যে যেই দেখবে ট্যারা হয়ে যাবে। সেই খাট দেয়া হয় নি— তোর রাগটা এই কারণে। কাঠ এখন কেনা হয়েছে। বার্মা টিক খুঁজেছিলাম, পাই নি। চিটাগাং টিক কিনেছি। সিজন করা কাঠ। খুব ভালো জিনিস। ছমাসের মধ্যে তোর খাট আমি দেব— যা কথা দিলাম।

ছমাস আমি টিকব না মামা।

পাগলের মতো কথা বলিস না।

সত্যি বলছি ছমাস টিকব না।

ডাক্তার বলছে এই কথা ?

ডাক্তাররা কি আর সরাসরি এই কথা বলে ?

তাহলে কি স্বপ্ন দেখেছিস ?

হ্যাঁ।

কী স্বপ্ন ?

মনজুর হাসল, কিছু বলল না। বদরুল আলম উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, স্বপ্নটা কখন দেখেছিস ? মাঝরাতে, না শেষরাতে ? মাঝরাতের স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব নেই। শেষরাতের স্বপ্ন হলে চিন্তার কথা।

শেষরাতেই দেখেছি। ঘুম ভেঙে দেখি সকাল।

বদরুল আলম আরো উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, পেট ঠিক ছিল তো ? বদহজম অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে— ভুলে যা।

বদহজম-টজম কিছু না। পেট ঠিকই ছিল।

স্বপ্নে কী দেখলি ?

দেখলাম আমি এই বিছানায় শুয়ে আছি। একটা ধবধবে চাদরে আমার সারা শরীর

ঢাকা। আমি বুঝতে পারছি আমি মারা গেছি। একজন ডাক্তার এসে বললেন, ডেডবডি এখনো সরানো হয় নি? কোনো মানে হয়? খামাখা একটা বেড দখল করে আছে। সবাই তখন ধরাধরি করে আমাকে নিচে নামিয়ে দিল। আমার বিছানায় নতুন একজন রোগী চলে এল। তার কিছুক্ষণ পর জাহানারা হাসপাতালে ঢুকল। সে অবাক হয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, স্যার কোথায়? কেউ বলতে পারছে না। অথচ আমি মেঝেতেই পড়ে আছি।

জাহানারাটা কে?

আমাদের অফিসে কাজ করে।

স্বপ্নটা এখানেই শেষ, না আরো আছে?

আর নেই। তার পরপরই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

এই স্বপ্ন দেখে তোর ধারণা হলো তুই আর ছমাস বাঁচবি?

হুঁ।

তুই তো দেখছি বিরাট গাধা। তোকে আমি খাবনামা বই দিয়ে যাব। পড়ে দেখিস— পরিষ্কার লেখা আছে— স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখলে দীর্ঘায়ু হয়। তুই বাঁচবি অনেক দিন।

বাঁচলে তো ভালোই। তুমি কি এখন যাবে; না বসবে আরো খানিকক্ষণ?

বসি কিছুক্ষণ। আমার তো আর অফিস না যে ঘড়ির কাঁটা ধরে যেতে হবে। আমার হলো স্বাধীন ব্যবসা। ইচ্ছা হলে যাব, ইচ্ছা না হলে যাব না। সারাদিন তোর সঙ্গে বসে থাকতে পারি। কোনো সমস্যা না।

মনজুর আঁতকে উঠে বলল, তুমি কি সারাদিন থাকার প্ল্যান করছ?

বদরুল আলম বললেন, কোন প্ল্যান-ট্যান নেই। এককাপ চা খেতে পারলে হত।

তোমার চায়ের ব্যবস্থা করছি। দয়া করে চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও।

মনজুর বিছানা থেকে নামল। শরীর বেশ ভালো লাগছে। মাথা ঘুরছে না বা দুর্বল-দুর্বল লাগছে না। বাসায় চলে গেলে কেমন হয়? গরম পানিতে ভালো করে গোসল করে একটা লম্বা ঘুম দিলে শরীর অনেকখানি ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

মনজুর গেল চায়ের খোঁজে।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল জাহানারা। অবিকল স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটা ব্যাপার হল। সে চোখ বড় বড় করে বলল, স্যার কোথায়? স্যার?

বদরুল আলম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা সুন্দর। শুধু সুন্দর না, বেশ সুন্দর। সবচে' সুন্দর তার গলার স্বর। কানে এসে গানের মতো বাজে।

জাহানারা আবার বলল, স্যার কোথায়? স্যার?

বদরুল আলম বললেন, তোমার নাম কি জাহানারা?

জাহানারা সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রায় কাঁদোকাঁদো গলায় পাশের বেডের রোগীকে বলল, স্যার কেথায়?

জাহানারা আজ অফিসে যায় নি। বাসা থেকে সরাসরি চলে এসেছে। ঘর থেকে বের হবার সময় ধাক্কা লেগে পানির একটা গ্লাস ভেঙেছে। তখনই তার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে।

যে বাসে আসছিল মাঝপথে সেই বাসের চাকা বসে গেল। খারাপ সংবাদ, খারাপ সংবাদ, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ সংবাদ। কখনো বাসের চাকা বসে না— আজ বসল কেন ?

বদরুল আলম আবার বললেন, মা, তোমার নাম কি জাহানারা ?

জাহানারা বলল, এই বিছানায় যে রোগী ছিলেন উনি কোথায় ?

মনজুর আমার জন্যে চা আনতে গেছে। তুমি বস এখানে। আমি মনজুরের মামা হই। জাহানারা তোমার নাম তাই না ?

জ্বি।

কী করে বললাম বল তো ?

জাহানারা তাকিয়ে রইল। সে সত্যি বুঝতে পারছে না।

কলা খাবে ? খেয়ে দেখ। মনজুর খাবে বলে মনে হয় না। নাও একটা খাও। প্রচুর আয়রন আছে।

ফরিদও জাহানারার সঙ্গে এসেছে। সে দরজার ওপাশ থেকে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার।

মনজুর চা নিয়ে ফিরে এল। তার হাতে ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক, সঙ্গে দশ-বার বছরের একটি ছেলে যার এক হাতে দুটা খালি কাপ, অন্য হাতে কয়েকটা নোনতা বিস্কিট। সে বিস্কিটগুলো বদরুল আলমের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

তিনি বললেন, মারব এক থাপ্পড়, হাতে করে বিস্কিট নিয়ে আসছে !

ছেলেটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ইচ্ছা হইলে খাইবেন, ইচ্ছা না হইলে নাই। থাপ্পড় মারমারি ক্যান ?

মনজুর বলল, খেয়ে ফেলেন মামা। হাত যেমন নোংরা প্লেটও সেরকম নোংরা। বরং হাতে দেয়ার মধ্যে এক ধরনের আন্তরিকতা আছে।

জাহানারা হাসছে। তার খুব ভালো লাগছে। যে মানুষটা মর-মর হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল তাকে এমন সুস্থ স্বাভাবিক দেখবে সে ভাবেই নি। চোখের নিচের কালিও অনেক কম। গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কেটে ফেললেই কেউ বুঝবে না এই মানুষটা বড় ধরনের অসুখে ভুগছে।

জাহানারা, কখন এসেছ ?

কিছুক্ষণ আগে।

চা-বিস্কিট কিছু খাবে ?

জ্বি না।

কলা খেতে পার। প্রচুর আয়রন আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মামাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

বদরুল আলম চা খাচ্ছেন। নোনতা বিস্কিটও খাচ্ছেন। দোকানের ছেলেটি কাপ ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার হাতে এখনো দুটা বিস্কিট ধরা আছে।

জাহানারা বলল, আপনার শরীর তো সেরে গেছে বলে মনে হয়।

মনজুর বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। দশটার দিকে ডাক্তার এসে দেখবে। তাকে বলব, আমাকে রিলিজ করে দিতে। আবার যখন শরীর খারাপ হবে, ভর্তি হব। ইতিমধ্যে কিডনি জোগাড়ের চেষ্টা চালাব। পাওয়া গেল তো ভালোই। না পাওয়া গেলে নাই।

জাহানারা বলল, স্যার আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার কিছুই লাগবে না।

না লাগলে তোই ভালোই।

বদরুল আলম বললেন, আমি তোকে একজন পীর সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। অত্যন্ত পাওয়ারফুল পীর। ক্ষমতা অসাধারণ। পান-বিড়ির একটা দোকান চালায়। বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নাই। গভীর রাতে, মিনিস্টার, সেক্রেটারি, এরা আসে।

মনজুর বলল, দিনে আসে না কেন ?

দিনে আসলে তো লাভ নাই। দিনের বেলা পীর সাহেব হচ্ছে দোকানদার। রাতে পীর।

পীর সাহেবকে গিয়ে আমার অসুখের কথা বলবে ?

হুঁ। এরা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে ? আজ যাবি ?

না।

তোকে যদি রিলিজ করে দেয় তাহলে চল না আমার সাথে। ক্ষতি তো কিছু নাই।

জাহানারা বলল, স্যার যান না। পীর ফকির সাধু সন্ন্যাসী এদের অনেক রকম ক্ষমতা থাকে।

মনজুর বলল, এদের একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে লোকজনদের ধোঁকা দেয়া। এর বাইরে এদের কোনো ক্ষমতা নেই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না বলেই তুই বুঝে ফেললি ? আগে কথা বল— তারপর ডিসিশান নে। পীর সাহেবের তাবিজ যে গলায় বাঁধতেই হবে, এমন তো কথা নেই।

উনি কি তাবিজও দেন নাকি ?

না। মাঝে মাঝে গলায় হাত বুলিয়ে দেন।

গলায় কেন ?

আমি কী করে বলব কেন ! তুই যাবি কিনা বল ! আমি ফল পেয়েছি। হাতে হাতে ফল পেয়েছি।

আচ্ছা যাও যাব। তোমাকে খুশি করবার জন্যে যাব। যদি হাসপাতাল থেকে ছাড়ে তাহলে সরাসরি চলে যাব তোমার ওখানে। এখন দয়া করে তুমি বিদায় হও। জাহানারা তুমিও যাও। আমি এখন খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুম পাচ্ছে।

জাহানারা বলল, স্যার আপনি ঘুমান। আমি এই চেয়ারে বসে থাকি। আমি স্যার তিনদিনের ছুটি নিয়েছি।

তিনদিনের ছুটি নেয়ার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই কাল অফিসে জয়েন করছি।

স্যার এই শরীরে আপনি অফিসে জয়েন করবেন ?

হুঁ।

যে দুটি বিস্কিট নিয়ে ছেলেটি বসে ছিল, বদরুল আলম সেই দুটিও নিয়ে নিলেন এবং নিচু গলায় বললেন, বাবা চট করে আরেক কাপ চা আনতে পারবি ?

গলির ভেতর গলি, তার ভেতর আরেক গলি।

মনজুর বলল, তোমার পীর সাহেব তো মামা ভালো আস্তানা বের করেছেন !

বদরুল আলম বললেন, পীর-ফকির মানুষ, এরা কি ধানমণ্ডি গুলশান এলাকায় থাকবে ? এরা থাকবে চিপা গলিতে বস্তিতে।

তুমি একে খুঁজে বের করলে কীভাবে ?

সে বিস্তর ইতিহাস। তোকে একদিন বলব। হাঁটতে পারছিস ?

হুঁ।

শরীরটা ঠিক আছে তো ?

এখনো আছে। চোখে এখন কিছুই দেখছি না, নর্দমায়-টর্দমায় পড়ব না তো ?

তুই আমার হাত ধরে ধরে আয়।

তুমি কি এখানে প্রায়ই আস ?

সপ্তাহে একদিন আসি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।

যেরকম নির্জন রাস্তা, আমার তো মনে হচ্ছে ফেরার পথে হাইজ্যাক হয়ে যাব। তোমার কাছে টাকা-পয়সা বিশেষ নাই তো ?

কিছু আছে, অসুবিধা নাই— বাবার কাছে যারা আসে তারা কখনো হাইজ্যাকড় হয় না।

উনাকে বাবা ডাক নাকি ?

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মনজুর বলল, তুমি বাবা ডাকলে তো আমাকে দাদাজান বলতে হয়।

বদরুল আলম বিরক্ত গলায় বললেন, উনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করিস না। এরা ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করে না।

বাবা, দাকানের ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ধাক্কাধাক্কির পর উঠে বসলেন। মধ্য বয়েসী একজন ভদ্রলোক— যাকে বাবা ডাকা বেশ কঠিন। স্বাস্থ্যবান মানুষ। গায়ে হলুদ রঙের গলাবন্ধ, নোংরা সুয়েটার। মাথার চুল লম্বা, চোখ লাল। ঘুমাবার আগে বাবা হয়তো মুখ ভর্তি করে পান খেয়েছিলেন। পানের রসে কালো ঠোঁট লালচে হয়ে আছে। ঘুম ভাঙানোয় বাবাকে বেশ বিরক্ত মনে হলো। কঠিন গলায় বললেন, কী চাই ?

আমাকে চিনেছেন ? আমি উড কিং-এর মালিক। বদরুল আলম। আর এ আমার ভাগ্নে। এর নাম মনজুর।

চাই কী ?

কিছু চাই না। একে একটু দোয়া করে দেন— এর শরীরটা ভালো না।

নিজের দোয়া নিজের করা লাগে। অন্যে কী দোয়া করব। এখন যান বাড়িতে গিয়া

ঘুমান।

একটু গলায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন।

বললাম তো বাড়িতে গিয়া ঘুমান। ঘুমের মধ্যেও দোয়া আছে। ঘুমের সময় শইল আরাম পায়। শইল দোয়া করে। হেই দোয়া কামে লাগে।

মনজুর হাই তুলে বলল, মামা চলুন যাই। আমার সত্যি সত্যি ঘুম পাচ্ছে।

বদরুল আলম যেতে চাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে দোয়া না করিয়ে তিনি যাবেন না।

আমার ভাগ্নের শরীরটা খুবই খারাপ। একটু যদি দোয়া করেন।

বাবার মন মনে হয় গলল, বাঁ হাত উঠিয়ে আচমকা মনজুরের কণ্ঠার উপর রাখলেন। মনজুরের মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে ওঠার ঠিক আগে আগে হাত সরিয়ে নেয়া হলো। তখনো মনজুরের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয় নি।

শইল তো খারাপ, খুবই খারাপ।

বদরুল আলম বললেন, আপনি কি দোয়া করেছেন ?

না। দোয়ায় কিছু হওনের নাই। আইচ্ছা শুনেন, আফনের কি কোনো সন্তান মারা গেছে ?

কয়েক মুহূর্ত হকচকিত থেকে মনজুর বলল, জ্বি।

কন্যা সন্তান ?

জ্বি। কীভাবে বললেন ?

অনুমানে বলছি। অনুমান। আইচ্ছা অখন যান। পরে একদিন আইস্যেন। দেখি কিছু করা গেলে করমু।

বাবা দোকানের ভিতর ঢুকে ঝাঁপ ফেলে দিলেন। উৎকট বিড়ির গন্ধ পাওয়া গেল। বাবা সম্ভবত ঘুমাবার আগে বিড়ি খান।

বদরুল আলম বললেন, উনার পাওয়ার দেখলি ? কীভাবে বলে দিল !

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বলল, তুমি এসে আগে বলে গেছ। খুব অন্যায় কাজ করেছ মামা।

বদরুল আলম হতভম্ব গলায় বললেন, আমি আগে এসে বলে গেছি ?

হুঁ।

আমার স্বার্থ কী ?

আমাকে চমকে দিবে। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবব— পীরবাবার কী ক্ষমতা ! ভাগ্যিস মামা আমাকে ইনার কাছে এনেছেন। তোমার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হব। তুমি তা দেখে খুশি হবে— এটাই তোমার স্বার্থ। চল যাই।

দুজনে হাঁটছে।

মনজুর খুবই ক্লান্ত বোধ করছে। মামার সঙ্গে তার আসাই ঠিক হয় নি। উচিত ছিল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা। ডাক্তাররা তাকে ছাড়তে রাজি হয় নি। মনজুর যখন বলল, আমি তো এখানে শুয়ে থাকি, বাসায় গিয়েও শুয়েই থাকব। নিজের পরিষ্কার বিছানায় আরাম করে ঘুমাব। আর আপনাদেরও তো খালি বেড দরকার। দরকার না ?

এতেই ডাক্তাররা রাজি হলেন। ডাক্তারদের একজন বললেন, প্রিয় মানুষের সঙ্গে

থাকলে মন ভালো থাকবে। মন ভালো থাকলে তার প্রভাব পড়বে শরীরে— ঠিক আছে যান।

মনজুর চলে এসেছে— এবং তার একজন প্রিয় মানুষ মেজো মামার সঙ্গে ঘুরছে। উচিত হয় নি; একেবারেই উচিত হয় নি।

মনজুর।

জ্বি।

তুই কি আমার উপর রাগ করলি নাকি?

রাগ করব কেন?

পীর সাহেবকে তোর বাচ্চা মারা যাবার খবরটা আগে দেয়া ঠিক হয় নি।

তুমি তাহলে আগে-ভাগে খবর দিয়ে রেখেছ?

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মাফলার দিয়ে কান ঢেকে দিলেন। ভাবটা এরকম যেন কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। কাজে ব্যস্ত।

বমি-বমি লাগছে মামা।

বলিস কী, শরীর কি আবার খারাপ করেছে?

মনে হচ্ছে সে রকম।

মনজুর রাস্তার পাশে বসে হড়হড় করে বমি করতে লাগল। বদরুল আলম দোয়া কুনুত পড়ে মনজুরের মাথায় ফুঁ দিতে লাগলেন।

এত বমি করছিস— ব্যাপারটা কী? তুই দেখি নাড়িভুঁড়ি সব বের করে ফেলবি।

মনজুর এক সময় উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগেই তার চোখ স্বাভাবিক ছিল। এখন টকটকে লাল। যদিও অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছে না।

মামা, হাত ধরে ধরে তুমি আমাকে একটা রিকশায় নিয়ে তোল তো।

মনজুর তুই কি আমার উপর খুব বেশি রাগ করেছিস?

হুঁ করেছি— আমার বাচ্চার মৃত্যুর খবর আমি কাউকে বলি না। তুমি সেটা তৃতীয় শ্রেণীর এক ভণ্ডকে বলেছ। উচিত হয় নি।

তৃতীয় শ্রেণীর বলছিস কেন? উনি খুব কামেল মানুষ। মানুষের চেহারা ছবি দিয়ে তো সব কিছু বিচার করা ঠিক না।

আমি চেহারা-ছবি দিয়ে কাউকে বিচার করি না। এই লোকটা ভণ্ড। তুমি প্রতি সপ্তাহে এক বার তার কাছে আস। তোমাকে সে খুব ভালো করেই চেনে। অথচ আজ না চেনার ভান করল। না চেনার ভান করলে তার জন্যে সুবিধা।

সুবিধা কী?

সে যখন আমার অতীত বলল, তখন আমি আর সন্দেহ করলাম না যে তুমি আগেই সব বলে বসে আছ। আর কী কী বলেছ? ডিভোর্সের কথাটা বল নি?

বদরুল আলম কিছু বলার আগেই মনজুর আবার বসে পড়ল। হড়হড় করে দ্বিতীয় দফায় বমি করল।

৮

ছদিন পর মনজুর অফিসে এসেছে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে অসুস্থ। বরং চকলেট রঙের শার্টে তাকে অন্যদিনের চেয়ে হাসিখুশি লাগছে। অনেকদিন পর ক্লিন শেভ করলে গালে এক ধরনের আভা দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে।

কুদ্দুস বিস্মিত হয় বলল, স্যার আপনে অফিসে আইলেন ?

মনজুর বলল, আসা কি নিষেধ নাকি ?

কুদ্দুস দাঁত বের করে হাসল। অফিসের অন্য কেউ হাসল না। কনসট্রাকশন সাইডের ম্যানেজার পরিমল বাবু বললেন, শুনেছিলাম আপনি গুরুতর অসুস্থ, তা বোধহয় মিথ্যা।

মনজুর হ্যাঁ-না কিছু বলল না। পরিমল বাবু মানুষটিকে সে পছন্দ করে না। কেন করে না তাও জানে না। এমনিতে পরিমল বাবু নিতান্তই ভদ্রলোক, পরোপকারী। অফিসের কাজেও অত্যন্ত দক্ষ। তিনি খুব অল্প সংখ্যক কর্মচারীদের একজন যিনি দশটা-পাঁচটা অফিস করেন এবং চেয়ারের পেছনে কোট ঝুলিয়ে বাড়ি চলে যান না।

পরিমল বাবু বললেন, মনজুর সাহেব অফিসে আপনার সমস্যা কী বলুন তো ?

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, আমি তো কোনো সমস্যার কথা জানি না।

না, মানে পে-স্লিপ দেখছিলাম, লক্ষ করলাম পে-স্লিপে আপনার নাম নেই। এ মাসে বেতন হয় নি।

ও আচ্ছা।

আপনি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখুন তো ব্যাপারটা কী ? আমি নিজেই জিজ্ঞেস করতাম, তারপর ভাবলাম, আমি বাইরের লোক, আই মিন আমি ইন্‌ভল্‌ভড নই। যাঁর সমস্যা তাঁকেই প্রথমে খোঁজ নিতে হবে। আপনি ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করুন।

মনজুর বলল, মনে হয় চাকরি চলে গেছে।

চাকরি চলে গেছে মানে ? এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি জন্মলগ্ন থেকে আছেন। বলতে গেলে এই প্রতিষ্ঠান আপনার নিজের হাতে তৈরি। সেখানে বিনা নোটিশে চাকুরি চলে যাবে ? আপনি এক্ষুণি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন।

আচ্ছা বলব।

স্যারও অফিসে আছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে দেখুন কী ব্যাপার। আপনার মতো মানুষের হুট করে চাকরি চলে যাওয়া তো ভয়াবহ কথা। আপনারই যদি এই ব্যাপার হয় তাহলে আমাদের কী হবে ?

মনজুর ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেল না। ক্যাশিয়ার সাহেব নিজেই এলেন। বেশ খানিকক্ষণ শরীরের খোঁজখবর নিয়ে বললেন, আপনি কি খবর কিছু শুনেছেন ?

কোন খবরের কথা বলছেন ?

আপনার পে-স্লিপের ব্যাপার।

শুনলাম।

আমি যথারীতি সব পে-স্লিপ বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়েছি। বড় সাহেব সব পে-স্লিপেই সই করলেন, আপনারটায় করলেন না।

মনজুর উদাস গলায় বলল, না করলে কী আর করা।

আপনি স্যারের সঙ্গে দেখা করুন। আমরা সবাই এই ব্যাপারে আপসেট। আমার তো মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। আপনি অসুস্থ মানুষ। এখন টাকা দরকার। আমি বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন...

ক্যাশিয়ার সাহেব কথা শেষ করলেন না। অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে গেলেন। মনজুরও কিছু জিজ্ঞেস করল না। বেশি জানা ভালো না। জানলে মন খারাপ হবে।

মনজুরকে বড় সাহেবের ঘরে নিজ থেকে যেতে হলো না। বড় সাহেবই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মনজুর ঘরে ঢোকামাত্র নুরুল আফসার বললেন, তোর শরীর কেমন?

মনজুর বলল, ভালো না। মারা যাচ্ছি বলে মনে হয়।

কবে নাগাদ মারা যাচ্ছিস?

সম্ভবত মাস ছয়েক টিকব।

কিডনি বদলে ফেল।

চেষ্টা করছি।

পাচ্ছিস না?

না।

এই দরিদ্র দেশে কিডনি পাবি না একটা কথা হলো? পাঁচশ টাকা দিয়ে এই দেশে মানুষ খুন করা যায়। তুই কিডনি চেয়ে বিজ্ঞাপন দে, লিখে দে কুড়ি হাজার টাকা নগদ দেয়া হবে; দেখবি পাঁচশ এপ্লিকেশন পড়ে গেছে। নে সিগারেট নে।

মনজুর সিগারেট ধরাল।

চা খাবি মনজুর?

না।

খা এক কাপ আমার সঙ্গে। মুখ অন্ধকার করে বসে আছিস কেন? ইজ এনিথিং রং?

না।

ভালো করে চিন্তাভাবনা কর; তারপর বল— ইজ এনিথিং রং?

না।

ভেরি গুড। তোর বেতন এ মাসে হয় নি সেটা দেখেছিস?

শুনলাম।

কিছু বলতে চাস?

না।

এক অক্ষরে সব কথার উত্তর দিচ্ছিস— ব্যাপার কী? তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছিস?

না। রেগে নেই।

তাহলে এমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন ? একটা রসিকতা শুনবি— শোন, রিডার্স ডাইজেস্টে পড়লাম। এক ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় বললেন, সবাই বলে পরকালে টাকাপয়সা কোনো কাজে লাগে না। কথাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। আমি মৃত্যুর পর সঙ্গে করে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে যেতে চাই। ভদ্রলোক নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, আমার কফিনে এই টাকাটা দিয়ে দিও। ভুল হয় না যেন। তাঁর স্ত্রী করলেন কী— নগদ ডলার রেখে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেক দিয়ে দিলেন। হা-হা-হা।

নুরুল আফসার সমস্ত শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, তুই হাসলি না, ব্যাপার কী ? যাকে বলছি সেই হাসছে। হা-হা-হা। শুধু পলিন হাসে নি। সে চোখ গোল গোল করে বলেছে— What is so funny about it ? ভালো কথা, পলিন তার তিন কন্যা নিয়ে আমেরিকা চলে যাবে বলে কথা হচ্ছে। যাকে বলে পুরোপুরি চলে যাওয়া।

তুই ? তুই একা থাকবি ?

না। আমিও চলে যাব।

মনজুর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা রসিকতা কিনা। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না। নুরুল আফসার বললেন, পলিন কিছুতেই নিজেকে এডজাস্ট করতে পারছে না। বাচ্চাগুলোও পারছে না। গত চার মাস ধরে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। ঝগড়া চলছে, মনকষাকষি চলছে। এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

ফার্মের কী হবে ?

একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। নে আরেকটা সিগারেট নে। সিগারেটের সঙ্গে এক ঢোঁক হুইস্কি খাবি ? আছে এখানে। সমানে হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। বাসায় খাই। অফিসে এসেও খাই।

নূরুল আফসার ড্রয়ার খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন, গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, খাবি ?

না।

আমি পুরোপুরি এলকোহলিক হয়ে গেছি। আমার আগে এলকোহলিক হয়েছে পলিন। আমেরিকায় পৌঁছেই এর চিকিৎসা করাতে হবে। পলিন এলকোহল ছাড়া কোনো তরল পদার্থই খাচ্ছে না। গত দুমাসে সে এক চামচ বিশুদ্ধ পানি খেয়েছে কিনা আমি জানি না।

আগে তো কিছু বলিস নি।

কেন বলব ? মীরা যে তোকে লাথি মেরে চলে গেল তুই কি আমাকে বলেছিস ?

লাথি মেরে চলে যায় নি।

ঐ একই হলো।

নুরুল আফসার গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢাললেন। পানি মেশালেন না। ঢেলে দিলেন গলায়। তাঁর মুখ বিকৃত হলো না। তবে মুহূর্তের মধ্যেই চোখ টকটকে লাল হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, মনজুর তোকে একটা কথা বলব, মন দিয়ে শোন।

শুনছি।

এই ফার্ম ছেড়ে যাওয়া আমার জন্যে কী রকম কষ্টের তা নিশ্চয়ই তুই জানিস। জানিস না?

জানি।

পলিনকে ছেড়ে দেয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ওকে পাগলের মতো ভালবাসি। তাছাড়া ও গেলে আমার বাচ্চাগুলোও যাবে। যাবে না?

হ্যাঁ যাবে।

কাজেই ওকে খুন করার একটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আমার আছে। ওর হুইস্কির সঙ্গে খানিকটা আর্সেনিক মিশিয়ে দিলেই হলো। আর্সেনিক জোগাড় করেছি। একটা শুভদিন দেখে জিনিসটা মেশানো হবে। বারই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে খুব শুভদিন— ওর জন্মদিন।

তোর নেশা হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।

নেশা হয় নি। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আজই তো বার তারিখ, তাই না?

হ্যাঁ।

তুই কি সত্যি খাবি না? খা একটু আমার সঙ্গে। মদ হচ্ছে এমন এক তরল পদার্থ যা কখনো একা খাওয়া যায় না। তাছাড়া জিনিসটা কিডনির জন্যে ভালো। সত্যি ভালো।

মনজুর চুপ করে রইল।

নুরুল আফসার বললেন, না খেলে চুপচাপ বসে থাকবি না। চলে যা। আর পলিনকে খুন করা সম্পর্কে যা বললাম সবই রসিকতা। নেশা হলেই বলি। নেশা হয়েছে— তোকে বলেছি। নেশা কেটে গেলে সব ভুলে যাব। তবে মনটা খারাপ। খুবই খারাপ। এত কষ্ট করে ফার্মটা তৈরি করেছি— সব জলে ভেসে যাবে। কাঁদতে ইচ্ছা হয়। নেশা খুব বেশি হলে কাঁদি। মুশকিল হচ্ছে নেশা আগের মতো হয় না। আমি পুরো বোতল শেষ করে ফেলব কিন্তু তেমন নেশা হবে না। যা তুই যা। Leave me alone.

মনজুর বেরিয়ে এল।

জাহানারা হাতে টাইপ করা একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অসম্ভব মলিন। মনে হচ্ছে টাইপ করতে করতে সে খানিকটা কেঁদেছে। তার চোখের কাজল লেপ্টে গেছে। আজকালকার মেয়েরা চোখে কাজল দেয় বলে মনজুরের ধারণা ছিল না। এই মেয়েটা দেয়। মীরাও দিত। মীরার সঙ্গে কি এই মেয়েটির কোনো মিল আছে? না কোনো মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ দুরকম।

জাহানারা বলল, স্যার আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

মনজুর বলল, টাইপ হয়ে গেছে?

জ্বি।

ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দাও। বল পরপর তিনদিন ছাপাতে।

আপনি কি দেখে দেবেন না?

না।

স্যার একটু দেখে দেন।

মনজুর দ্রুত চোখ বুলাল—

কিডনি প্রয়োজন

একটি কিডনি কিনতে চাই। কেউ আগ্রহী হলে
অতি সত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঠিকানা দেয়া আছে উড কিং-এর। কেয়ার অফ বদরুল আলম। মনজুরের মনে পড়ল— মামাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয় নি। বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবার আগেই জানানো উচিত।

জাহানারা বলল, স্যার আপনি কি কিছুক্ষণ অফিসে থাকবেন না চলে যাবেন ?

আছি কিছুক্ষণ।

আপনার শরীর কেমন ?

ভালো। বেশ ভালো।

জাহানারা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, স্যার আপনি কি একদিন আমাদের বাসায় আসবেন ?

আসব। অবশ্যই আসব।

জাহানারা মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এর আগেও এই মানুষটিকে সে কয়েকবার তাদের বাসায় যেতে বলেছে। প্রতিবারেই মনজুরের উত্তর ছিল— যাব। অবশ্যই যাব। কেন যাব না ? অথচ কোনো বারই জিজ্ঞেস করে নি— ঠিকানা কী ? এবারো জিজ্ঞেস করলেন না। আসলে উনি যাবেন না। কোনোদিনও না।

জাহানারা ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

জিজ্ঞেস কর।

অফিসে সবাই বলাবলি করছে আপনার চাকরি নেই। কথাটা কি সত্যি ?

জানি না। সত্যি হতেও পারে।

আপনি বড় সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি ?

না। তবে সত্যি হওয়া সম্ভব— অনেকদিন ধরেই দেখছি আমার টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অফিসে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছি। আমাকে ছাড়াই সব কাজ চলছে এবং খুব ভালোভাবে চলছে। আমাদের বড় সাহেবকে আমি খুব ভালা করে চিনি। সে কখনো অপ্রয়োজনীয় মানুষজন রাখবে না। তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও না। ফার্মকে বড় করতে হলে কিছু কঠিন নিয়মকানুনের দরকার হয়।

মনজুর নিজের অফিসে ঢুকে গেল।

খুব ক্লান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। টেবিলে কোনো ফাইলপত্র নেই। ইজিচেয়ারে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায়। মনজুর ইজিচেয়ারে কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

জাহানারা পেছনে পেছনে আসছিল। ঘুমন্ত মনজুরকে দেখে তার মনটা অসম্ভব খারাপ হলো। কী অসুস্থ একটা মানুষ ! শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথা কাত হয়ে আছে। কেমন অসহায় ভঙ্গি ! একটা বালিশ থাকলে মাথার নিচে দিয়ে দেয়া যেত।

৯

জাহানারা মাছ কুটছিল।

ঘরে ছাই নেই। ছোট ছোট মাছ, কুটতে এমন অসুবিধা হচ্ছে পিছলে পিছলে যাচ্ছে। একটা ঠিকা-ঝি আছে; সে মাসের গোড়ায় পলিথিনের ব্যাগে এক ব্যাগ ছাই দিয়ে যায়। এক ব্যাগ ছাইয়ের দাম দুটাকা। এই মাসে তার ছাই রাখা হয় নি। এক ব্যাগ ছাইয়ের জন্যে সে চাইল পাঁচ টাকা। জাহানারা বলল, এক ধাক্কায় আড়াইগুণ দাম বেড়ে গেল, ব্যাপারটা কী ?

ঠিকা-ঝি গম্ভীর গলায় বলল— সব জিনিসের দাম বাড়তাছে আফা। আর এই ছাই হইল আসল। আমার কাছে নকলের কারবার নাই।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, ছাইয়ের আবার আসল-নকল কী ? যাও নিয়ে যাও— ছাই লাগবে না।

না লাগলে নাই— ধমক দেন ক্যান ?

ধমক দিলাম কোথায় ? খামাখা তর্ক না করে কাজ শেষ কর।

হিসাব মিটাইয়া দেন আফা— আফনাগো বাড়ি কাম করুম না। আফনেরা মানুষ বালা না।

ঝি চলে গেলে মহা সমস্যা জেনেও জাহানারা হিসাব মিটিয়ে দিল। বুড়ি ছাইয়ের ব্যাগ হাতে মুখ অন্ধকার করে চলে গেল। এখন মনে হচ্ছে পাঁচ টাকা দিয়ে এক ব্যাগ আসল ছাই কেনাই ভালো ছিল। ছাই থাকত, কাজের লোকও থাকত।

দরজার কড়া নড়ছে। জাহানারাকেই উঠতে হবে। ঘরে আর কেউ নেই। মার দাঁতে যন্ত্রণা, ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে মেডিক্যাল কলেজে। দুপুরের আগে ফিরতে পারবে না। এর মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখতে হবে। তারা ফিরে এলে তবেই জাহানারা অফিসে যাবে। সমস্যা হবে না সে বলে এসেছে। তবু খারাপ লাগে।

জাহানারা দরজা খুলে হকচকিয়ে গেল। মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার ইচ্ছা করল আনন্দে চিৎকার করে উঠতে। এরকম অদ্ভুত ইচ্ছার জন্যে পরমুহূর্তেই লজ্জায় প্রায় নীল হয়ে গেল।

মনজুর বলল, তোমাদের বাসা খুঁজতে খুব যন্ত্রণা হয়েছে। এখানে বাসার নাম্বারের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কেমন আছ জাহানারা ?

জ্বি স্যার ভালো।

আসতে বলেছিলে— আসলাম। তোমার মা ভালো আছেন ?

জ্বি স্যার আসুন— ভেতরে আসুন।

জাহানারা লক্ষ করল সে ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। তার শরীর কাঁপছে। কেন এরকম হচ্ছে ? এরকম হচ্ছে কেন ?

কোনো সাড়াশব্দ নেই, তুমি কি বাসায় একা ?

জ্বি স্যার। আমার মা গেছেন দাঁত তুলতে। ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে। আপনি বসুন।

তোমার মার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি অফিসে থাকবে, আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা করে চলে যাব।

মা এসে পড়বেন। আপনি বসুন।

মনজুর বসল। জাহানারার কান্না পাচ্ছে। বসার ঘরটা ফরিদ কী করে রেখেছে! এলোমেলো হয়ে আছে বিছানার চাদর। বসার ঘরে ফরিদের খাট না রাখাই উচিত ছিল। বসার ঘরটা থাকবে সুন্দর, গোছানো।

জাহানারা বিছানার চাদর ঠিক করতে গিয়ে হাতের ময়লায় মাখামাখি করে ফেলল। মাছ কুটতে কুটতে সে উঠে এসেছে, তার মনেই নেই। হাত ধোয়া হয় নি।

জাহানারা!

জ্বি।

আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিতে পারবে ?

স্যার, এক্ষুণি আনছি।

ঘরের গ্লাসগুলো এত বাজে! কী ক্ষতি ছিল একটা সুন্দর গ্লাস যদি ঘরে থাকত ? রমিজদের বাসা থেকে একটা গ্লাস নিয়ে আসবে ? তার সঙ্গে ফ্রিজের এক বোতল ঠাণ্ডা পানি ? ওরা আবার কিছু মনে করবে না তো ? করুক মনে। কিছু যায় আসে না। ভালো চায়ের কাপও একটা আনতে হবে। জাহানারা ঠিক করে ফেলল, এবারের বেতন পেয়ে সে আর কিছু করুক বা না করুক, চমৎকার একটা গ্লাস কিনবে, একটা চায়ের কাপ কিনবে। আচ্ছা, স্যারকে কি সে দুপুরে খেতে বলবে ? বললেই কি উনি খাবেন ? যদি খেতে রাজি হন— কী দিয়ে সে খাওয়াবে ?

জাহানারা বারান্দায় এসে দেখল বিড়াল মহানন্দে মাছ খাচ্ছে। খাক, যা ইচ্ছে করুক। তার ভালো লাগছে না। জ্বর-জ্বর লাগছে। জাহানারা পাশের বাসা থেকে পানির বোতল এবং গ্লাস আনতে গেল।

ঘরে কিচ্ছু নেই। শুধু এক গ্লাস পানি কি কাউকে দেয়া যায় ? পানির গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে জাহানারা নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, স্যার আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খাবেন ?

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, ভাত ?

খেলে খুব খুশি হব স্যার। আর এর মধ্যে মা এসে যাবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। ভাত খাব। কী রান্না ?

জাহানারার মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুই তো রান্না নেই। সে কী খাওয়াবে ? কেন সে ভাত খাওয়ার কথা বলতে গেল ? কেন সে এতবড় বোকামি করল ? ফরিদ এলে তাকে রিকশা করে কাঁচাবাজারে পাঠালে সে কি মাছ-মাংস কিছু আনতে পারবে না ? না হয় আজ একটু দেরি করেই খাওয়া হবে।

কী রান্না তা তো বললে না ?

এখনো কিছু রান্না হয় নি স্যার।

তাহলে বরং এক কাজ করি। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ থাক। শরীরটাও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।

জাহানারার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে, স্যার আপনি যেতে পারবেন না। আপনাকে

থাকতে হবে। আমি নিজের হাতে রান্না করে আপনাকে খাওয়াব। শুধু একদিন, শুধু এক বার। মানুষ হবার অনেক যন্ত্রণার একটি হচ্ছে— যা বলতে প্রাণ কাঁদে তা কখনো বলা হয় না।

মনজুর বলল, উঠি কেমন ? আরেকদিন এসে তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করব।

১০

টেলিফোনের শব্দে মনজুরের ঘুম ভেঙে গেল।

সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। সে কোথায় ? অফিসে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা মনে আছে। এখনো কি অফিসেই ঘুমাচ্ছে ? তাকে রেখে অফিস বন্ধ করে সবাই চলে গেছে ? না, তা কেমন করে হয় ? চারদিক অন্ধকার। অফিস এত অন্ধকার হবে না। আরে এ তো তার নিজের বিছানা ! সে বাসায় কখন ফিরল ? টেলিফোন বেজেই চলছে। টেলিফোন ঠিক হয়ে গেল নাকি ? নিশ্চয়ই ভৌতিক কোনো ব্যাপার। ঐ ছেলেটিই বোধহয় টেলিফোন করছে— 'ভিমরুল'। একমাত্র ঐ ছেলেটিই টেলিফোন করে তাকে পায়। আর কেউ পায় না।

মনজুর আধো ঘুম আধো জাগরণে রিসিভার কানে লাগিয়ে বলল, হ্যালো ভিমরুল ?

ওপাশ থেকে অভিমানী গলা শোনা গেল— আপনি আমাকে ভিমরুল বলছেন কেন ?

ঠাট্টা করছি। তোমাকে খ্যাপাচ্ছি।

আমার কিন্তু খুব রাগ লাগছে।

খুব বেশি রাগ লাগছে ?

হ্যাঁ।

খুব বেশি রাগ হলে তুমি কী কর ?

কিছু করি না।

কাঁদো না ?

না। আমি তো ছেলে। ছেলেদের কাঁদতে নেই।

তা তো বটেই— আমি যখন তোমার মতো ছিলাম তখন ছেলে হয়েও খুব কাঁদতাম। তারপর হঠাৎ একদিন কান্না বন্ধ করে দিলাম।

কেন ?

সেটা এক মজার গল্প। তখন আমার মা মারা গেছেন। বাবা, আমি আর একটা কাজের ছেলে— এই তিনজন থাকি। বাবা খুব কঠিন মানুষ। কথায় কথায় শাস্তি দেন। একবার কী অন্যায় যেন করেছি বাবা আমাকে শাস্তি দিলেন— বাথরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর কী হলো জান ? তিনি আমার কথা ভুলে গেলেন। চলে গেলেন বাইরে। সেই রাতে আর ফিরলেন না। আমি সারারাত অন্ধকার বাথরুমে আটকা পড়ে রইলাম।

কাজের ছেলে আপনার খোঁজ করল না ?

না। সে ভেবেছিল আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছি।

আপনি কান্নাকাটি করলেন না ? চিৎকার করলেন না ?

প্রথম কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলাম তারপর কান্না বন্ধ করে দিলাম। পরদিন ভোরে বাবা এসে বাথরুমের দরজা খুলে আমাকে বের করলেন।

উনি তখন কী করলেন ?

সেটা আমি তোমাকে বলব না— এ-কী ভিমরুল তুমি কাঁদছ নাকি ?

না।

আমি যেন ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ শুনলাম।

কাঁদলে কী ?

কিছুই না— নাথিং ...

ওপাশের কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

টেলিফোন পুরোপুরি ডেড। মনজুর উঠে বাতি জ্বালাল। ঘড়ি দেখল— রাত দুটো। রাত দুটার সময় ইমরুল নিশ্চয় তাকে টেলিফোন করে নি। পুরো ব্যাপারটিই কি তার কল্পনা ? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ?

মনজুর বাথরুমের দিকে রওনা হলো।

বাথরুম সেরে গরম এক কাপ চা খাবে। চিনি, দুধ সবই কেনা আছে। চিনি সে রেখেছে 'সমুদ্র' নামের কৌটায়। এটা ঠিক হয় নি। সমুদ্র নামের কৌটায় রাখা উচিত ছিল লবণ— চিনি নয়। আমরা সব সময় যাকে যেখানে রাখার কথা সেখানে না রেখে ভুল জায়গায় রাখি।

আপনার কিছু লাগবে ?

মনজুর চমকে তাকাল। পনের-ষোল বছরের লাজুক ছেলেটিকে সে চিনতে পারল না। সে কে ? এখানে এলইবা কোত্থেকে ?

তুমি কে ?

স্যার আমার নাম ফরিদ।

ফরিদ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

আমি জাহানারা আপার ছোট ভাই।

ও আচ্ছা আচ্ছা। জাহানারা তোমাকে এখানে পোস্টিং দিয়ে গেছে ?

জ্বি।

মেয়েটা তো বড় যন্ত্রণা করছে।

ফরিদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মনজুর বলল, আমার এই কথায় তুমি কি মন খারাপ করলে ?

জ্বি না স্যার।

স্যার বলছ কেন ? আমি তো তোমার স্যার না। তুমি কী পড় ?

এইবার এসএসসি দেব।

সায়েন্স না আর্টস ?

কমার্স। আমি পড়াশোনায় খুব খারাপ।

তুমি কি চা বানাতে পার ?

জ্বি না।

শুধু পড়াশোনায় না, তুমি তো মনে হচ্ছে কাজকর্মেও খারাপ। পানি গরম করতে পার?

জ্বি পারি।

ভেরি গুড। পানি গরম কর। আমি বাথরুম থেকে এসেই চা বানাব এবং তোমাকে চা বানানো শিখিয়ে দেব।

ফরিদ হেসে ফেলল।

রাত আড়াইটা।

দুজন নিঃশব্দে চা খাচ্ছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়ে সহজ গলায় বলল, ফরিদ সিগারেট খাবে নাকি?

ফরিদ চমকে উঠল।

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, অল্পবয়স্কদের সিগারেট সাধা হচ্ছে আমার সস্তা ধরনের রসিকতার একটি। এই রসিকতা করে একবার কী বিপদে পড়েছিলাম শোন। ক্লাস টুতে পড়ে একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—খোকা সিগারেট খাবে? সে গম্ভীর গলায় বলল, জ্বি খাব। দিন একটা।

মনজুর খুব হাসতে লাগল।

হাসছে ফরিদও। প্রথম দিন এই মানুষটিকে খুব খারাপ লেগেছিল। আজ লাগছে না। আজ ভালো লাগছে।

ফরিদ।

জ্বি।

আমি একটা ছেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলাম। তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছ?

জ্বি না।

তুমি কি জেগে ছিলে?

জ্বি জেগে ছিলাম। নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

তুমি যদি জেগে থেকে কিছু না শুনে থাক তাহলে ধরে নিতে হবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি একটা কাজ কর— আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস কর। দেখি বলতে পারি কিনা। পাগলেরা ধাঁধার উত্তর পারে না।

ফরিদ বলল, আপনি শুয়ে থাকুন। আপনার বিশ্রাম দরকার।

এখন আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে। বিশ্রামের কোনোই দরকার নেই। এস দুজন বারান্দায় বসে থাকি।

আপনার ঠাণ্ডা লাগবে।

তা লাগবে। লাগুক না। চল— ভোর হওয়া দেখি।

ভোর হতে এখনো অনেক দেরি।

মোটেই দেরি নয় ফরিদ সাহেব। সময় অত্যন্ত দ্রুত যায়। আমরা জীবন শুরু করি, তারপর হঠাৎ একদিন দেখি— সময় শেষ— দুয়ারে পাল্কি এসে দাঁড়িয়েছে।

১১

আজ মীরার নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কথা।

জালালউদ্দিন গাড়ি রেখে গেছেন। প্রথম দিন সে গাড়ি করে যাক। মীরা বলেছে গাড়ি লাগবে না তবু খুশিই হয়েছে। গাড়ি সে ছেড়ে দেবে না। শুরুর দিনটিতে তারা নিশ্চয়ই তাকে সারাদিনের জন্যে রেখে দেবে না। কাজটাজ খানিকটা বুঝিয়ে দিয়ে বলবে— বাসায় চলে যান। প্রথম দিনেই এত কাজের দরকার নেই। সে তখন গাড়ি নিয়ে খুব ঘুরবে। বিশেষ কোথাও যাবে না। এমনি ঘুরবে। গুলশান মার্কেট যেতে পারে। সুন্দর সুন্দর কিছু বিছানার চাদর কেনা যেতে পারে। বিছানার চাদর কেনা মীরার হবি বিশেষ। কত ধরনের চাদর যে তার আছে— তারপরেও কেনা চাই।

কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকে বলল, আফা আপনার কাছে আইছে।

কে এসেছে ?

কাজের মেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। যার মানে যে এসেছে তার পরিচয় দিতে লজ্জা লাগছে এবং কিঞ্চিৎ হাসি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই মনজুর। মীরা কঠিন গলায় বলল, হাসছ কেন ?

হাসি থেমে গেল। কাজের মেয়েটি এখন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। মীরা এমন কঠিন করে কথা বলবে তা হয়তো সে ভাবে নি। মীরা শীতল গলায় বলল, উনি যদি আসেন কখনো এমন করে হাসবে না, যাও দুকাপ চা দিতে বল।

আটটা চল্লিশ বাজে। এখনো অনেক সময় আছে। দশটা বাজার পনের মিনিট আগে রওনা হলেই হবে। মীরা আয়নার দিকে তাকাল। চুল বাঁধা হয় নি। এইভাবেই কি যাবে, না চুল বাঁধবে ? শাড়িটাও গুছিয়ে পরা নেই। একটু কি গুছিয়ে পরা উচিত না ? সে চিরুনি হাতে নিয়ে দ্রুত চুলের উপর টানতে লাগল।

আশ্চর্য ! মীরাকে ঢুকতে দেখে মনজুর উঠে দাঁড়াল। বাইরের একজন মহিলাকে সে যেন সম্মান দেখাচ্ছে। কোনো মানে হয় ? মীরা বলল, কেমন আছ ?

ভালো।

কী রকম ভালো সেটা শুনি।

মোটামুটি ভালো। চলাফেরা করতে পারছি। কতদিন পারব জানি না।

তোমার হাসপাতালে ভর্তি হবার খবর শুনেছি। সরি, দেখতে যেতে পারি নি। হাসপাতাল আমার ভালো লাগে না। বাবা একবার অসুখ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। দশ দিন ছিলেন। আমি দেখতে যাই নি। হাসপাতালের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

মনজুর হেসে বলল, কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন ? আমি কি কৈফিয়ত তলব করতে এসেছি ?

কী জন্যে এসেছ ?

তোমার অনেক জিনিসপত্র আমার কাছে রয়ে গেছে— ঐসব কী করবে তাই জানতে এসেছি।

থাকুক তোমার ওখানে। এক সময় নিয়ে আসব।

আমি এখন কিছুদিন মেজো মামার সঙ্গে থাকব। তোমার জিনিসপত্র আবার নষ্ট না হয়।

নষ্ট হলে হবে, কী-বা আছে!

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা বলল, বস চা আসছে। তুমি যাবে কোথায়— অফিসে?

হ্যাঁ।

আমি নামিয়ে দেব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। সাড়ে নটার সময় আমি বের হব। চলবে তো?

চলবে।

কাজের মেয়েটি চা নিয়ে ঢুকেছে। শুধুই দুকাপ চা, সঙ্গে কিছুই নেই। সামান্য ভদ্রতাটুকুও কি এরা এই মানুষটাকে দেখাবে না?

নাও চা খাও। চিনি হয়েছে?

হয়েছে।

আমি এর মধ্যে তোমার খোঁজ নেয়ার জন্য তোমাদের অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। তুমি ছিলে না। অফিসের এক ভদ্রলোক বললেন, তুমি আজকাল অফিসে খুব কম আস। তোমার শরীর কি বেশি খারাপ?

শরীর খুব বেশি খারাপ না। অফিসে যাই না কারণ মনে হচ্ছে আমার চাকরিটা নেই।

কী বলছ তুমি!

এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না তবে এদের ভাবভঙ্গিতে তাই মনে হচ্ছে।

তুমি ভালোমতো জানতেও চাও নি?

না।

কেন না— সেটা আমাকে গুছিয়ে বল।

আমার ইচ্ছা করছিল না। যা হবার হবে।

তুমি গা এলিয়ে পড়ে থাকবে?

সব সময় তো তাই করেছি।

এটা কি কোনো বাহাদুরি?

মনজুর কিছু বলল না। মনে হয় একটু হাসল। মীরা রাগী গলায় বলল, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন গা এলিয়ে পড়ে থাকা খুব অহঙ্কারের ব্যাপার। যেন তুমি মস্ত কাজ করে ফেলছ।

রেগে যাচ্ছ কেন মীরা?

রাগের কাণ্ড করছ তাই রেগে যাচ্ছি। এই ফার্ম দাঁড় করাবার পেছনে তোমার কনট্রিবিউশন আমি কি জানি না? তুমি কখনো বল নি, তোমার বস বলেছে। আর সে তোমাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলবে— তুমি কোনো কথা বলবে না?

মনজুর সিগারেট ধরিয়ে বলল, একেকজন মানুষ একেক রকম হয়। আমি ছোটবেলা থেকেই এরকম। কত বড় বড় ঘটনা ঘটে, প্রথমে খুব হকচকিয়ে যাই, তারপর মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে। কী আর করা।

তুমি তাহলে একজন সাধুপুরুষ? মহামানব?

আরে কী যে বল! তুমি এতদিন পর আজ হঠাৎ এত রাগ করছ কেন?

জানি না। তোমাকে দেখে কেন জানি খুব রাগ লাগছে। যাও আর রাগ করব না। তুমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আরেক কাপ চা খাও। আমি কাপড় বদলে আসি।

আচ্ছা।

তোমাকে বলা হয় নি আজ আমি একটা চাকরিতে জয়েন করছি।

বাহ্ ভালো তো।

সামনের মাসেই নতুন বাসা নেব।

ভেরি গুড। তোমার নতুন বাসার জন্যে কোনো ফার্নিচার দরকার হলে আমাকে বলবে। আমি মামাকে বলে ভালো ফার্নিচারের ব্যবস্থা করে দেব।

থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে এখন কাপড় বদলাতে যাই। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

মীরার এত সময়ও লাগল না। ত্রিশ মিনিটের মাথায় ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখল মনজুর সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুবার ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল। লজ্জিত গলায় বলল, আমার এখন প্রধান সমস্যাই হচ্ছে ক্লান্তি। হেঁটে হেঁটে তোমার এখানে এসেছি তো, ক্লান্ত হয়েছি— ঘুম এসে গেছে। সরি এবাউট ইট।

হেঁটে হেঁটে এলে কেন?

রিকশায় ওঠা আমার জন্যে বিরাট সমস্যা, দুলুনিতে ঘুম পেয়ে যায়। রিকশায় ঘুমিয়ে পড়া বিরাট রিস্কি ব্যাপার।

তোমার শরীর তো খুবই খারাপ।

মনজুর সহজ গলায় বলল, কিডনি ট্রান্সফার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিডনি সত্যি সত্যি ট্রান্সফার করতে হচ্ছে?

হুঁ।

কে দিচ্ছে কিডনি?

এখনো ঠিক হয় নি। ডোনার চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

কবে দিয়েছ?

তিনদিন হলো। এখানো কেউ আসে নি।

কত টাকা দিচ্ছ ডোনারকে?

একলাখ।

এত টাকা!

একজন তার শরীরের মূল্যবান অংশ দিয়ে দেবে আর তাকে এক লাখ টাকাও দেব না?

আছে তোমার কাছে এত টাকা?

না। আমার খালা কিছু দিয়েছেন— আর মামাও দিচ্ছেন।

ট্রান্সপ্লেন্টটা হবে কোথায়?

মাদ্রাজে। ভ্যালোর। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

যোগাযোগটা করছে কে ? তুমি নিশ্চয়ই না।

মামাই সব দেখাশোনা করছেন।

তোমার তো অনেক টাকা লাগবে।

তা লাগবে।

আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি কিছু দিতে পারি। পরে ফেরত দিয়ে দিও।

মনজুর কথা বলল না।

গাড়িতে সে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে গেল। মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ওখানে বসছ কেন ? পেছনে আস। মনজুর বিনা বাক্যব্যয়ে পেছনে মীরার সঙ্গে বসল।

মীরা বলল, আমার সঙ্গে বসতে অস্বস্তি বোধ করছ নাকি ?

না— অস্বস্তি বোধ করার কী আছে ?

কিছুই নেই কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে। আরাম করে বস। আবার যেন ঘুমিয়ে যেও না।

না এখন আর ঘুমাব না— তোমাদের বাসায় সোফায় ভালো ঘুম হয়েছে।

তুমি এখন তাহলে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছ ?

হুঁ। অসুখটা মনে হয় আমাকে কাবু করে ফেলছে।

অসুখ ছাড়াও তো তুমি ভালো ঘুমাতে। বাসর রাতে কী ঘুমটাই ঘুমিয়েছিলে মনে আছে ?

মনে আছে। এক ঘুমে রাত কাবার।

দ্বিতীয়বার যদি বিয়ে কর— তাহলে এই ভুল করবে না।

না— তা করব না।

মীরা মনজুরকে তার অফিসের সামনে নামিয়ে দিল।

মনজুর কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। মানুষটা এত অসুস্থ !

মনজুর লিফটে করে উঠার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করল।

অফিসের দুজন কর্মচারীও তার সঙ্গে উঠছে। তারা সালাম দিল না। এমন কোনো বড় ব্যাপার না কিন্তু চোখে লাগে। মনজুর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, কী ভালো ? ওরা দুজনেই লজ্জা পেল বলে মনে হলো। একজন বলল, জ্বি ভালো। তবে সে স্যার বলল না। মনে হচ্ছে এখন কেউ আর তাকে স্যার বলায় আগ্রহী নয়। নিচের অফিসারদের কেউই উঠে দাঁড়ায় না। তাকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে।

চিফ অ্যাকাউনটেন্ট সেদিন হঠাৎ কী মনে করে তার ঘরে এসেছিলেন। প্রথমদিকে মনজুর তার উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারল না। মনে হলো গল্প-গুজব করতেই এসেছেন। চা খেলেন, সিগারেট খেলেন। শরীরের খোঁজখবর করলেন। এক সময় বললেন, মনজুর সাহেব, আপনার এই ঘরের সাইজ কত ? তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। ভদ্রলোক মনজুরের ছেড়ে যাওয়া কামরায় এসে উঠতে চান। ঘরের মাপে কার্পেট কিনতে হবে। মনজুর বলল, ঘরের মাপ তো জানি না। একটা গজ-ফিতা দিয়ে মেপে ফেললে হয়।

মাপব ?

না থাক।

জানতে চাচ্ছেন কেন ?

এমনি প্রশ্নটা মনে আসল। আমার ঘর আবার সাইজে খুবই ছোট। আপনার ঘরে ক্রস ভেন্টিলেশনের সুবিধা আছে।

এই ঘরে আসতে চান ?

সরাসরি প্রশ্নে চীফ অ্যাকাউনটেন্ট নার্ভাস হয়ে গেলেন। থতমত খাওয়া গলায় বললেন, আরে না। আপনার ঘরে আপনি আছেন। আমি আসব কী করে ?

আমি তো নাও থাকতে পারি।

যখন থাকবেন না তখন দেখা যাবে। আচ্ছা যাই মনজুর সাহেব। শরীরের দিকে লক্ষ রাখবেন এবং মনে সাহস রাখবেন। সব ওষুধের সেরা ওষুধ হলো মনের জোর।

ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই কুদ্দুসকে ডাকিয়ে মনজুর কামরা মাপাল। কাগজে সেই মাপ লিখে পাঠিয়ে দিল চিফ অ্যাকাউনটেন্টকে। ভদ্রলোককে খানিকটা লজ্জায় ফেলা হলো। মাঝে মাঝে মানুষকে লজ্জা দিতে খারাপ লাগে না। অবশ্যি একদল মানুষ আছেন যারা কখনো লজ্জা পান না। চিফ অ্যাকাউনটেন্ট সেই রকম একজন মানুষ।

মনজুর নিজের ঘরে ঢুকল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে। আজকাল অতি অল্পতেই শরীর ভেঙে আসে। মনে হচ্ছে আরেকবার ডায়ালাইসিস করিয়ে রক্তের ভেতর থেকে দূষিত জিনিসগুলি বের করে দিতে হবে। হাঁটাহাঁটি, ঘোরাফেরা বন্ধ করে হাসপাতালের বিছানায় ফিরে যেতে হবে।

মনজুর ডিভানে বসল। ডিভানের এক মাথায় ছোট্ট একটা বালিশ। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড। মেয়েটা তার সেবাযত্নের নানান চেষ্টা করছে। কোনো কিছুতেই তার মন ভরছে না। গতকাল তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, স্যার কয়েকটা দিন আমাদের বাসায় এসে থাকবেন ? বলেই সে এমন লজ্জা পেল যে মনজুর এই প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। মনে হলো প্রসঙ্গ পাল্টানোয় জাহানারা স্বস্তি পেয়েছে।

আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে কুদ্দুস মাথা ঢুকিয়ে বলল, বড় সাব আফনেরে ডাকে। বিশেষ দরকার।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের ইচ্ছে করছে বলতে— বড় সাহেবকে এইখানে আসতে বল। আমার নড়াচড়ার শক্তি নেই। তা বলা সম্ভব নয়।

নুরুল আফসার এই ভোরেই মদ্যপান করেছেন।

ঘরময় এলকোহল এবং সিগারেটের কটু গন্ধ। এয়ারকুলার চলছে। এয়ারকুলার থেকে পাতলা ধাতব আওয়াজ আসছে যা সূক্ষ্মভাবে মাথার উপর চাপ ফেলে। এক সময় মাথায় যন্ত্রণা হতে শুরু করে।

নুরুল আফসার টেবিলে পা তুলে আধশোয়া হয়ে আছেন। মনজুরের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুই আছিস কেমন ?

ভালো।

তোকে একটা কমপ্লিমেন্ট দেয়ার জন্যে ডাকিয়েছি।

কী কমপ্লিমেন্ট ?

পৃথিবীতে নির্লোভ মানুষ আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। তুই প্রমাণ করেছিস যে আছে। তুই কি ছোটবেলা থেকেই এমন, না বড় হয়ে হয়েছিস ?

ছোটবেলায় আমি বিরাট চোর ছিলাম।

নুরুল আফসার আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুরের কথায় তিনি বেশ মজা পাচ্ছেন।

তুই ছোটবেলায় চোর ছিলি ?

হুঁ।

কী চুরি করতি ?

খালার বিছানার নিচ থেকে ভাংতি পয়সা সরাতাম।

রেগুলার সরাতি ?

হুঁ। পরে জানতে পারলাম আমি যাতে পয়সা চুরি করতে পারি সে জন্যেই খালা সব সময় তোশকের নিচে ভাংতি পয়সা রাখতেন ; কারণ এমনিতে আমি কখনো টাকাপয়সা নিতাম না। হাজার সাধাসাধিতেও না।

তোর খালাও মনে হচ্ছে তোর মতোই ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।

খালা একজন চমৎকার মানুষ। তোর কথা কি শেষ হয়েছে ? আমি এখন ডিভানে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কথা শেষ হয় নি। আসল কথা, এবং সবচে' ইম্পর্টেন্ট কথাটাই বাকি।

যদি সম্ভব হয় তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

নুরুল আফসার টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এই ফার্মটা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। তুই আমার পাশে দাঁড়িয়ে গাধার মতো খেটেছিস। মনে আছে ?

আছে।

তোকে অনেকবার বলেছিলাম আমাকে তুই দাঁড় করিয়ে দে; তোকে আমি ঠকাব না। কি মনে আছে ?

আছে।

তুই তোর কথা রেখেছিস— আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিস। আমি আমার কথা রাখতে চাই। তুই কি লক্ষ করেছিস পে-স্লিপে তোর নাম নেই ?

লক্ষ করেছি।

কেন নেই এ নিয়ে তোর মনে প্রশ্ন ওঠে নি ?

উঠলেও খুব মাথা ঘামাই নি।

আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসতে পারি আবার নাও আসতে পারি। এই ফার্মের মালিকানার একান্ন ভাগ তোকে দিয়ে যাচ্ছি। বাকি উনপঞ্চাশ ভাগ থাকবে আমার। পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা থাকবে তোর হাতে। তের হাজার মাইল দূর থেকে আমি সুতা নাড়ব না। অনেস্ট।

মনজুর হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

সে খুশি হলো না অখুশি হলো তাও বোঝা গেল না। বড় বড় ঘটনা তার উপর কোনোই প্রভাব ফেলে না। তার চোখ ছোট ছোট। তাকে দেখে মনে হচ্ছে জেগে থাকার জন্যে তাকে কষ্ট করতে হচ্ছে।

নুরুল আফসার বললেন, মনজুর, কোম্পানির এসেটস যেমন আছে— লায়াবিলিটিসও আছে। আমাদের ব্যাংক-লোন আছে দু কোটি টাকার উপর। সব কিছু মাথায় রাখতে হবে। কিছু ডিসঅনেস্ট কর্মচারী আমাদের আছে। ডিসঅনেস্ট হলেও তারা খুব এফিসিয়েন্ট। এদের কখনো হাতছাড়া করবি না আবার কখনো এদের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবি না। তুই কি ঘুমিয়ে পড়ছিস নাকি ?

না।

তুই তোর ঘরে গিয়ে বস। কাগজপত্র পাঠাচ্ছি। অনেক কাগজে সিগনেচার করতে হবে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকল। তার মনে হচ্ছে খবরটা ছড়িয়ে গেছে, অফিসের সবাই এখন জানে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই কেমন অন্যরকম করে তাকাচ্ছে। মনজুরের ঘরে যাবার পথ মূল অফিস ঘরের ভেতর দিয়ে। মূল অফিসে পা দেয়ামাত্র সবার কাজকর্ম থেমে গেল। তাদেরকে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকে ডিভানে গা এলিয়ে দিল। খুব তৃষ্ণা লাগছে। অথচ উঠে পানির বোতলের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা একগাদা কাগজ হাতে ঢুকেছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, বড় সাহেব পাঠিয়েছেন— সই করতে হবে স্যার।

কলম আছে তোমার কাছে ?

জ্বি আছে।

দস্তখত করতে করতে মনজুর বলল, তুমি কাঁদছ কেন জাহানারা ?

জাহানারা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খবরটা শোনার পর থেকে একটু পরপর তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে কিছুতেই চোখের পানি আটকাতে পারছে না। কী যে আনন্দ হচ্ছে! কেন এত আনন্দ ? কেন ?

জাহানারা আজ বাড়ি ফেরার পথে কয়েকটা জিনিস কিনল। একটা গ্লাস, সুন্দর একটা চায়ের কাপ, ভালো একটা চিনামাটির প্লেট। জাহানারার মা অবাক হয়ে বললেন, সব জিনিস একটা একটা করে কেন রে মা ?

জাহানারা বিব্রত গলায় বলল, আমার কি টাকা আছে ? ধীরে ধীরে কিনব। জিনিসগুলো সুন্দর হয়েছে না মা ?

হ্যাঁ সুন্দর। পরে কি তুই সেট মিলিয়ে কিনতে পারবি ?

পারব।

জাহানারা মুখে বলল— পারবে, কিন্তু সে ঠিক করে রেখেছে সেট মিলিয়ে সে কিনবে না। এই জিনিসগুলো তার কাছে একটা করেই থাকবে।

১২

দরজার কড়া নড়ছে।

মনজুর বড় বিরক্ত হলো। এত ভোরে কে এল? ইদানীং সবাই মিলে তাকে খুব বিরক্ত করছে। অফিসের লোকজন আসছে— কখনো একা, কখনো দল বেঁধে। একবার এলে আর যেতে চাচ্ছে না। সেদিন করিম সাহেব এলেন, সঙ্গে নীল রঙের একটা বোতল। এই বোতলে হালুয়াঘাটের এক পীর সাহেবের পানি-পড়া আছে। এই বস্তু জোগাড় করতে তাঁকে যে কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে সে গল্প এক ঘণ্টা ধরে করলেন। গল্প শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই পানি-পড়া জোগাড় করার চেয়ে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘিনীর কোল থেকে বাচ্চা নিয়ে আসা অনেক সহজ।

গতকাল এসেছিলেন বাসারত সাহেব, একা আসেন নি— নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামে একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন। ছোটখাটো মানুষ হলেও নিত্যানন্দবাবু একাধারে কাব্যতীর্থ, আয়ুর্বেদাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, জ্ঞানশ্রী এবং বিদ্যাশ্রী। ভদ্রলোক মনজুরের নাড়ি ধরে ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর মনজুর বলল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভাই?

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বললেন এবং আরো দশ মিনিট এভাবেই কেটে গেল। মনজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, একী যন্ত্রণা!

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী চোখ মেলে বললেন, আপনাকে একটা ওষুধ তৈরি করে দেব। ওষুধটার নাম 'নলাদি ক্বাথ।' নল, কুশ, কাশ এবং ইক্ষু এই চার উপাদানে নির্মিত। ওষুধটা এক মাস ব্যবহার করুন। তারপর এই যুগের বড় বড় ডাক্তারদের কাছে যান। তারা বলবে— কিডনি ঠিক আছে। যদি তা না বলে আমি আমার সংগ্রহে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যে শতাধিক পুস্তক আছে সব পুড়িয়ে ছাই বানাব। সেই ছাই মুখে লেপন করে আপনাকে দেখিয়ে যাব।

মনজুর বলল, কত লাগবে ওষুধ তৈরি করতে?

বাসারত সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, এটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। কী লাগবে না-লাগবে তা আমি দেখব।

বেশ দেখুন।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী তখন তাঁর চিকিৎসার গল্প শুরু করলেন। এক এমআরসিপি ডাক্তার কীভাবে তাঁর কাছে ছুটে এসে করজোড়ে বলেছিলেন— নিত্যবাবু, আপনার মতো চিকিৎসক আমার জীবনে দেখি নি। আপনি বয়োকনিষ্ঠ, নয়তো আপনার পায়ের ধুলা নিতাম।

মনজুর তাদেরকে জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল। নিত্যবাবু এবং বাসারত দুজনের কেউই যাবার নামটি মুখে আনছিল না।

আজ সেই নিত্যবাবুই এসেছেন মনে হচ্ছে। চারদিন পর তাঁর ওষুধ দিয়ে যাবার কথা— 'নলাদি ক্বাথ।' চারদিন পার হয়েছে। আজ পঞ্চম দিন।

মনজুর উঠে দরজা খুলল।

এই ভোরবেলায় জাহানারা চলে এসেছে। তার শরীর হলুদ রঙের চাদরে ঢাকা।

চাদরে পুরোপুরি শীত মানছে বলে মনে হচ্ছে না। অল্প অল্প কাঁপছে। জাহানারার হাতে টিফিন ক্যারিয়ারের একটি বাটি।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। সূর্য ওঠার আগে চলে এসেছ, ব্যাপার কী?

আপনি কেমন আছেন?

ভালোই আছি। কিছুক্ষণের মধ্যে— নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামের এক লোক আমাকে 'নলাদি ক্বাথ' দিয়ে যাবে। ঐ বস্তু খাওয়ার পর শরীর আরো ভালো হয়ে যাবে। কিডনি যেটা নষ্ট সেটা তো ঠিক হবেই— অন্য যেটা কেটে বাদ দেয়া হয়েছে সেটাও সম্ভবত গজাবে। এস ভেতরে এস। টিফিন বক্সে কী?

ভাপা পিঠা। মা করে দিয়েছেন স্যার।

ভেরি গুড। চল ভাপা পিঠা খাওয়া যাক। আমি হাত মুখ ধুয়ে আসি— তুমি ততক্ষণে চায়ের পানি বসিয়ে দাও। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। নয়তো নিত্যবাবুর জালে আটকা পড়ে যেতে হবে।

জাহানারা রান্নাঘরে চলে গেল।

তার মুখ মলিন। রাতে সে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারে নি। পুরো রাত ছটফট করেছে। শেষরাতের দিকে বারান্দায় এসে বসেছে। বারান্দার কোনায় জাহানারার মাও বসে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ডাকলেন, এদিকে আয় মা। জাহানারা মা'র কাছে গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

তিনি বললেন, তোর কী হয়েছে তুই আমাকে বল তো মা।

জাহানারা বলল, কিছুই হয় নি।

অনেক দিন থেকেই দেখছি— তুই ছটফট করছিস। আমাকে বল তো মা, তোর কী হয়েছে?

জাহানারা তীব্র গলায় বলল, বললাম তো কিছু হয় নি।

সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। জাহানারার মা তার পেছনে পেছনে ঢুকলেন এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তাঁর মেয়ে বিছানায় শুয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না। বাকি রাতটা বিছানার পাশে চুপচাপ বসে কাটালেন। মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার সাহসও তাঁর হলো না।

স্যার দেখুন তো চায়ে চিনি ঠিক আছে কিনা?

মনজুর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে। তুমি চা খাচ্ছ না?

জ্বি না। আমি খালিপেটে চা খেতে পারি না।

খালিপেটে খেতে হবে কেন? পিঠা তো আছে। পিঠা নাও।

এখন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মৃদু গলায় বলল, আপনাকে একটা কথা বলার জন্যে আমি এত ভোরে এসেছি। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

বল।

স্যার আপনি কিডনি চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা কিডনি দিতে চাই।

মনজুর বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটি একেক সময় একেকভাবে কথা বলে। আজ সম্পূর্ণ অন্য রকমভাবে কথা বলছে।

তুমি কিডনি দিতে চাও?

জ্বি।

কেন বল তো?

জাহানারা জবাব দিল না। তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটা যে আজ কথা অন্যভাবে বলছে তাই না— তাকে দেখাচ্ছেও অন্য রকম। মনজুর বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।

জাহানারা বসল না। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনজুর বলল, তুমি কিডনি দিতে চাইলেই তো হবে না। ক্রস ম্যাচিঙের ব্যাপার আছে।

ক্রস ম্যাচিঙের অসুবিধা হবে না। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম আপনার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। তিনি বলেছেন— ঠিক আছে।

মনজুর অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমি একবার তোমাকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। তুমি কি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছ?

না। সেসব কিছু না।

তাহলে কী?

জাহানারা জবাব দিল না তবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

মনজুর বলল, দেখ জাহানারা, আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি । নগদ টাকা দিয়ে আমি কিডনি কিনব।

আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে না স্যার।

আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। যাও, তুমি বাসায় যাও।

জাহানারা একটি কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সে একটা রিকশা নিয়েছে। চাদরে মুখ ঢেকে সারাপথ ফুঁপাতে ফুঁপাতে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারছে না। রিকশাওয়ালা এক সময় বলল, আম্মা কাইন্দেন না। মনডা শান্ত করেন।

১৩

বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে পাঁচটি।

বদরুল আলম সাহেব পাঁচ জনের ভেতর থেকে চারজনকে ইন্টারভ্যুতে ডেকেছেন। পঞ্চম জন বাদ পড়েছে। বাদ পড়ার কারণ তার নাম ডেরেন কুইয়া। ডেরেন কুইয়া নামের কাউকে ইন্টারভ্যু নেয়ার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। নিশ্চয়ই খ্রিষ্টান। মুসলমান বডিতে অন্য ধর্মের মানুষের শরীরের অংশ ফিট করবে না বলেই তাঁর

ধারণা। ইন্টারভ্যুতে একজন বাদ পড়ল। কারণ তাকে খুনির মতো দেখাচ্ছিল। যে তিনজন টিকে গেল তাদের ভেতর থেকে ডাক্তাররা একজনকে বেছে নিলেন। ক্রস ম্যাচিঙে তারটাই নাকি সবচে' ভালো মেলে। ছেলেটির নাম আমানুল্লাহ্ খান। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। রোগা, শ্যামলা এবং বেশ লম্বা। শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে শুনে সে মনে হলো খানিকটা ঘাবড়ে গেল। হাসপাতালেই বদরুল আলম সাহেবকে বলল, স্যার, ভয়-ভয় লাগছে।

বদরুল আলম ধমকে উঠলেন, ভয়ের কী ?

অপারেশনে মরে টরে যদি যাই !

এইসব অপারেশনে কেউ মরে না। কিডনি কেটে বাদ দেয়া হলো ডাল-ভাত অপারেশন। ডাক্তার লাগে না, এক্সপেরিয়েনস্ড নার্সও করে ফেলতে পারে। তোমারটা তো নার্স করবে না। ভ্যালোরের বড় বড় ডাক্তাররা করবেন।

তবু ভয় লাগছে।

বদরুল আলম গম্ভীর মুখে বললেন, তার মানে কী দাঁড়ায় ? তুমি রাজি না ? রাজি না থাকলে বল, আমাদের হাতে অন্য ক্যানডিডেট আছে। ওরা এক পায়ে খাড়া।

তাঁর হাতে অন্য কেউই নেই। এইসব বলার কারণ আমানুল্লাহকে জানিয়ে দেয়া যে সে সবেধন নীলমণি নয়। এতে টাকা পয়সা নিয়ে দরদাম করারও সুযোগ থাকে। নয়তো আকাশছোঁয়া টাকা হেঁকে বসবে।

বদরুল আলম বললেন, কথা পাকাপাকি হওয়ার আগে টাকা পয়সার ব্যাপারটা সেটল হওয়া উচিত। কত চাও তুমি ?

আমানুল্লাহ্ মাথা নিচু করে বসে রইল।

বদরুল আলম বললেন, তোমার ডিমান্ড কী আগে শুনি, তারপর আমাদেব কথা আমরা বলব। পছন্দ হলে ভালো কথা। পছন্দ না হলে কিছু করার নাই। আসসালামু আলায়কুম বলে বিদায় করে দিতে হবে। বল কী তোমার দাবি ?

আমানুল্লাহ বলল, আপনারটাই আগে শুনি। আপনি কত দিতে চান ?

আমার নিজের হলে বিশ হাজারের বেশি একটা পয়সা দিতাম না। দশ হাজারে আস্ত মানুষ পাওয়া যায়— সেখানে কুড়ি। ডাবল দেয়া। তবে আমার ভাগ্নে বলে দিয়েছে— এক লাখ। এক লাখই দেয়া হবে। এক পয়সা কমও না। এক পয়সা বেশিও না।

টাকাটা দেবেন কীভাবে ?

কীভাবে মানে ? ক্যাশ পেমেন্ট হবে, তবে একটা কিন্তু আছে।

কিন্তুটা কী ?

পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে আগে দেয়া হবে। এটাকে তুমি বুকিং মানি বলতে পার। বাকি পঁচানব্বুই দেয়া হবে কার্য সমাধা হবার পর।

পুরো টাকাটা আগে দেবেন না ?

না।

না কেন ? যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই ?

হ্যাঁ। অসম্ভব কিছু না। এতগুলো টাকা।

আমানুল্লাহ্ বলল, উল্টাও তো হতে পারে। আমি কিডনি দিয়ে দিলাম তারপর আপনারা আর টাকা দিলেন না।

কী যে তুমি বল। স্ট্যাম্পের উপর দলিল করা থাকবে।

টাকা না দিলে কে আর কোর্ট-কাছারি করবে বলুন ! তাছাড়া অপারেশন টেবিলে মরেও তো যেতে পারি। তখন টাকাটা দেবেন কাকে ?

খোদা না খাস্তা সে রকম কিছু হলে তোমার আত্মীয়স্বজন পাবে।

আত্মীয়স্বজনদের জন্যে তো আমার টাকাটা দরকার নেই। আত্মীয়স্বজনদের আমি কিছু জানাতে চাই না। তারা কিছু জানবেও না।

কাউকে জানাতে চাও না ?

জ্বি না। শুধু একটা জিনিসই আমি চাই— পুরো টাকাটা এডভান্স চাই। আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। টাকা নিয়ে পালিয়ে যাব না।

আমানুল্লাহ যে ভদ্রলোকের ছেলে সে খোঁজও বদরুল আলম নিলেন। তার বাবা একটা স্কুলের হেডমাস্টার। চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমানুল্লাহ সর্বকনিষ্ঠ। বড় এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো ভাই টাঙ্গাইল কৃষি ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার। আমানুল্লাহ নিজেও এ বছর বি.এ পরীক্ষা দিয়েছে।

বদরুল আলম বললেন, টাকাটা তুমি কাকে দেবে ?

আমানুল্লাহ্ ঠাণ্ডা গলায় বলল, তা দিয়ে আপনার দরকার কী ? আপনার যে জিনিসটা দরকার তা হলো আমার একটা কিডনি। আর কিছু না। আপনি যদি নগদ টাকা দেন— কিডনি আপনি পাবেন।

বদরুল আলম চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটাকে যতটা সরল সাদাসিধা মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ততটা সে না, ত্যাঁদড় আছে।

আমানুল্লাহ বলল, আপনি যদি মনস্থির করতে পারেন তাহলে আমাকে খবর দেবেন। তবে আমার বাড়িতে আপনি কিছু বলবেন না। আরেকটা কথা, ভ্যালোর যেতে হলে আমাকে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট কীভাবে করতে হয় তাও আমি জানি না। ঐ ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

বদরুল আলম বললেন, পাসপোর্ট কোনো ব্যাপারই না। এক ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। আসল সমস্যা টাকাটা। আমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারি। সে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

আপনি উনার ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি নিজেই কথা বলব।

তোমার কথা বলার কোনো দরকার নেই। আমরা মনজুরকে এর বাইরে রাখতে চাই। সে রোগী মানুষ।

উনার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। তাকে আমি আমার শরীরের একটা অংশ দেব আর তাঁর সঙ্গে আগে কথা বলব না তা তো হয় না। আগে তাঁকে আমার পছন্দ হতে হবে।

পছন্দ না হলে কিডনি দেবে না ?

দেব। পছন্দ না হলেও দেব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।

বদরুল আলম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনজুরের ঠিকানা লেখা একটা কাগজ তার হাতে দিলেন। দিয়েই বুঝলেন বিরাট ভুল করা হয়েছে। মনজুর এক কথায় টাকা দিবে। একটা হাতে লেখা রসিদও রাখবে না। মনজুর হচ্ছে তার ভাষায় বুদ্ধিমান গাধা-মানব। যথেষ্ট বুদ্ধি, যথেষ্ট চিন্তাশক্তি; কিন্তু কাজকর্ম গাধার মতো। ছেলেটিকে ঠিকানা দেয়া উচিত হয় নি। না দিয়েই বা কী করা ?

১৪

থ্রি পি কনস্ট্রাকশনের মালিকানা বদলে তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না। তবে সবাইকে খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে হলো। প্রধান ব্যক্তির প্রতি আস্থার অভাব থাকলে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সেই ধরনের নিরাপত্তাহীনতা। উড়া-উড়া খবর পাওয়া গেল অনেকের চাকরি চলে যাবে। নতুন স্টাফ আসবে। কোম্পানির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছেন। কিছু গুজব নিয়ে কানাঘুষা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচে' আতঙ্কজনক গুজব হচ্ছে— বেতন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় সাহেব তিন কোটি টাকা নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। কোম্পানির লিকুইড প্রপার্টি বলতে কিছুই নেই। ঈদ বোনাস তো দূরের কথা, বেতনই হবে না। এই গুজব বিশ্বাসযোগ্যভাবে ছড়িয়েছে। উপরের মহলের অফিসারও বিশ্বাস করেছেন।

আজ সেই গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সবার বেতন হলো, যাদের ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট ডিউ হয়েছিল, তারা তা পেল। ঈদের বোনাস পাওয়া না গেলেও বলা হলো ঈদের ছুটির আগের দিন দেয়া হবে। যে চাপা উদ্বেগ ও অস্বস্তি সবার মধ্যেই ছিল তা অনেকাংশেই কেটে গেল। দুপুরের দিকে মনজুর ডেকে পাঠাল চিফ অ্যাকাউনট্যান্ট করিম সাহেবকে।

করিম সাহেব ঘরে ঢুকলেন চিন্তিত মুখে। তাঁকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এ রকম একটি গুজবও খুব ছড়িয়েছে। গুজব অবশ্যি শুরু করেছেন তিনি নিজেই।

মনজুর হাসিমুখে বলল, কেমন আছেন করিম সাহেব ?

জ্বি স্যার ভালো।

বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।

করিম সাহেব বসলেন। মনজুর নিজেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। করিম সাহেব চায়ে চুমুক দিলেন, সিগারেট নিলেন না।

কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা তো আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। সবার বেতন হবে, ঈদ বোনাস হবে— এগুলো আপনি জানেন— তারপরেও কী করে গুজব ছড়াল যে বেতন বন্ধ ?

গুজবের কি স্যার কোনো মা-বাবা আছে ?

অবশ্যই আছে। গুজবের মা থাকে, বাবা থাকে এবং গুজবের পেছনে একটা উদ্দেশ্যও থাকে। গুজবটা আপনার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটাই দুঃখজনক।

আমার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটা কে বলল ?

আমি অনুমান করছি। করিম সাহেব, আমার অনুমান খুব ভালো।

করিম সাহেব আর কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ঠাণ্ডা

ঘর, তবু তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তাঁর সামনে বসা মানুষটিকে আজ এত অন্যরকম মনে হচ্ছে কেন? কেমন কঠিন চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ক্ষমতা মানুষকে বদলে দেয় তা ঠিক, কিন্তু এত দ্রুত বদলাতে পারে? এই লোকটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বদলে গেছে।

করিম সাহেব।

জ্বি স্যার।

আমি যে ঘরে বসতাম এ ঘরটা আপনার বেশ পছন্দ— আপনি ঐ ঘরে বসুন। নিজের মতো করে ঘরটা সাজিয়ে নিন।

করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর হঠাৎ পানির পিপাসা পেয়ে গেল। আগের বড় সাহেবের বেলায় এ রকম কখনো হয় নি। আজ কেন হচ্ছে? ব্যাপারটা কী? তিনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

করিম সাহেব।

জ্বি স্যার।

আমাদের বেশ বড় একটা সরকারি বিল দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নুরুল আফসার সাহেব দেশ ছাড়ার আগে ঐ বিল ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন— কোন বিলটির কথা বলছি বুঝতে পারছেন?

পারছি।

আমি ঐ বিলের টাকার অর্ধেকটা একটা বিশেষ কাজে ব্যবহার করতে চাই।

বলুন স্যার কী কাজ।

আমাদের এত বড় কনস্ট্রাকশন ফার্ম— বাড়িঘর সমানে তৈরি করে যাচ্ছি। যাচ্ছি না?

যাচ্ছি।

অথচ আমাদের কর্মচারীদের কোনো কোয়ার্টার নেই। ভাড়া বাসায় তারা থাকে। তাদের বেতনের একটা বড় অংশ চলে যায় বাড়িভাড়ায়। আমি চাই থ্রি পি কনস্ট্রাকশনের প্রতিটি কর্মচারীর জন্যে ফ্ল্যাট হবে। কাউকেই ভাড়া করা বাড়িতে থাকতে হবে না।

অনেকগুলো টাকা ব্লক্‌ড হয়ে যাবে স্যার।

হোক। কত দ্রুত কাজটা করা যাবে বলুন তো? মালিবাগে আমাদের কিছু রিয়েল এস্টেট আছে না?

আছে।

ঐখানেই ফ্ল্যাট উঠুক। তিন ধরনের ফ্ল্যাট হবে। প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের জন্যে এক ধরনের, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে এক ধরনের, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য এক ধরনের। আমি চাই কাজটা যেন দ্রুত শেষ হয়। দ্রুত। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

সময় বেশি নেই বলছেন কেন?

আমি অসুস্থ এটা আপনার চোখে পড়ছে না?

চিকিৎসা তো স্যার হচ্ছে। কিডনি ট্র্যান্সপ্লেন্ট হবে, তখন আর সমস্যা থাকার কথা না।

তা ঠিক। আচ্ছা আপনি এখন উঠুন। বিকেলের দিকে একটা মিটিং ডাকুন। সেখানে ঠিক করব কীভাবে কী করা যায়।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

করিম সাহেব চলে যাবার পরপরই কুদ্দুস ঢুকল হাসিমুখে। তার হাতে কাঁঠাল আকৃতির দুটি পাকা পেঁপে। সে স্যারের জন্যে নিয়ে এসেছে। কুদ্দুস মাথা চুলকে বলল, গাছের পেঁপে স্যার।

তাই নাকি ?

বাবার নিজের হাতে পোঁতা গাছ।

ভালো, খুবই ভালো— দাম পড়ল কত ?

চল্লিশ টাকা। পঞ্চাশ টাকা জোড়া চায়— চল্লিশে দিল।

মনজুর হেসে ফেলল। কুদ্দুসের মুখ অসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে গেল। জেরার মুখে সে এক সেকেন্ডও টিকতে পারে না। তাছাড়া এই মানুষটাকে সে আগে থেকেই ভয় পায়। এখন যেন সেই ভয় সাতগুণ বেড়েছে। ছায়া দেখলেই ভয় লাগে। মূল মানুষটাকে দেখতে হয় না।

কুদ্দুস।

জ্বি স্যার।

ওয়েটিং রুমে আমানুল্লাহ নামে একটা ছেলে বসে আছে। তাকে নিয়ে আস।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

কুদ্দুস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, আগামী এক মাস এই মানুষটার ত্রিসীমানায় সে থাকবে না। নগদ টাকা সাধলেও না।

আমানুল্লাহর সঙ্গে মনজুরের আগে একবার দেখা হয়েছে। এটা দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আজ সে আমানুল্লাহকে আসতে বলেছে। আজ তাকে টাকা দেয়ার কথা। মনজুর রাজি আছে আমানুল্লাহর শর্তে। নগদ এক লক্ষ টাকা আগেই দেয়া হবে।

আমানুল্লাহ আজ সুন্দর একটা শার্ট পরেছে। চুল আঁচড়ানো। ইস্ত্রি করা প্যান্ট। সকালবেলাতেই গোসল করেছে বলে বোধহয় তাকে সুন্দর লাগছে। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ ভাব।

কেমন আছ আমানুল্লাহ ?

জ্বি স্যার ভালো।

মনজুর ব্রাউন রঙের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, তোমার টাকা এখানেই আছে। পাঁচশ টাকার নোট দিয়েছে। তুমি গুণে নাও।

আমানুল্লাহ টাকা গুনছে।

মনজুর বলল, তুমি কিছু খাবে ?

জ্বি না।

চা-টাও খাবে না ?

না।

টাকা গোনা শেষ হয়েছে। প্যাকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে আমানুল্লাহ বলল, আমি

একজনকে টাকাটা দেয়ার জন্যে তিন চারদিনের জন্যে বাইরে যাব। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন আমি পালিয়ে গেছি এই জন্যে বললাম।

মনজুর বলল, আমি এ রকম কিছুই ভাবব না।

আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে। যেদিন যেতে বলবেন আমি যাব। শুধু ...

শুধু কী?

না কিছু না।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

ভয়? হ্যাঁ একটু পাচ্ছি।

কেন?

মনে হচ্ছে অপারেশনে আমি মারা যাব।

তাই যদি মনে হয় তাহলে রাজি হলে কেন?

টাকাটা আমার খুবই দরকার।

মরে যাবে জেনেও টাকার জন্যে তুমি রাজি হচ্ছ?

জ্বি। অবশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মানুষতো আর সারাজীবন বেঁচে থাকে না। এক সময় না এক সময় মরতে হয়। আগে আর পরে— এই আর কী। আচ্ছা আমি যাই।

তোমার সঙ্গে একটা গাড়ি দিয়ে দি। গাড়ি নিয়ে যাও— এতগুলো টাকা সঙ্গে নেবে!

অসুবিধা নেই। কেউ বুঝবে না আমার কাছে এত টাকা— স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

মনজুর চুপচাপ বসে আছে। তার খুব খারাপ লাগছে। মন খারাপ শুধু না, শরীরও খারাপ। বমি ভাব হচ্ছে। মাথায় যন্ত্রণা। কুদ্দুস দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢোকাল। মনজুর বলল, কিছু বলবে কুদ্দুস?

স্যার পেঁপে কেটে দিব?

না। তোমার দেশের বাড়ির পেঁপে পরে খাব।

আপনার কি স্যার শরীর খারাপ লাগছে?

হুঁ।

বাসায় চলে যাবেন?

তাই ভাবছি।

গাড়ি বের করতে বলব স্যার?

মনজুরের মনে পড়ল এখন তার দখলে একটা গাড়ি আছে যে গাড়িতে চড়ে সে এখন সারা শহর ঘুরতে পারে।

১৫

অফিসের কাজ মীরার মনে ধরেছে।

তেমন কিছু করার নেই। সেজেগুজে বসে থাকাই মনে হচ্ছে কাজের প্রধান অংশ। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে অফিস পলিটিক্স। দুটি প্রধান দল আছে অফিসে। জি.এম. সাহেবের

দল, এন্টি জি.এম. দল। দুদলই চেষ্টা করছে মীরার মন ফেরাতে। এন্টি জি.এম. দলের প্রধান— মোসাদ্দেক সাহেব একদিন মীরাকে অফিস কেন্টিনে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন এবং নানান কথার ফাঁকে এক সময় নিচু গলায় বললেন, আপনার বয়স অল্প, আপনাকে একটা কথা বলছি শুনে রাখুন, জি.এম. সাহেব যদি গাড়িতে লিফট দিতে চান— এভয়েড করবেন। কী জন্যে এভয়েড করতে বলছি জিজ্ঞেস করবেন না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না।

মীরা হেসে বলল, ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব না।

মোসাদ্দেক সাহেব খানিকটা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন মীরা শোনার জন্যে অনুরোধ করবে, তখন রসিয়ে গল্পটা বলা যাবে।

মিস মীরা, আপনি আছেন যখন সবই শুনবেন। এইসব হচ্ছে ঘরের কথা। কাউকে বলাও যায় না— সহ্য করাও যায় না।

জি.এম. সাহেবকে মীরার বেশ পছন্দ হলো। ভদ্রলোক হাসিখুশি। মহিলা কর্মচারী আশপাশে থাকলে তাঁর হাসিখুশির পরিমাণটা বেড়ে যায়। এছাড়া অন্য কোনো দোষ মীরার চোখে পড়ল না।

জি.এম. সাহেব মীরাকে বললেন, আপনি কি রিকশায় যাওয়া-আসা করেন ?

জ্বি সার, তবে মাঝেমধ্যে ভাইয়ের গাড়িতে আসি।

ভবিষ্যতে আর রিকশায় যাওয়া-আসা করবেন না। অফিসারদের আনা-নেয়ার জন্যে গাড়ি আছে। ঐ গাড়িতে যাবেন-আসবেন। মাঝে মধ্যে আমার গাড়িতেও যেতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই। বললেই হবে। আমি ঐদিক দিয়েই যাই।

থ্যাংক ইউ স্যার।

কাজকর্ম কেমন লাগছে ?

ভালো। অবশ্যি কাজকর্ম তেমন কিছু তো নেই।

হবে। ধীরে ধীরে হবে। আপনার পোস্টটা নতুন ক্রিয়েট করা হয়েছে। এই পোস্ট আগে ছিল না। মইন সাহেবের জন্যেই ক্রিয়েট করা। ইনি আপনার কে হন ?

দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

খুব চমৎকার মানুষ। তাই না মিস মীরা ?

জ্বি চমৎকার মানুষ।

শুনলাম তিনি বিদেশে ফিরে যাচ্ছেন না। দেশে সেটেল করবেন। শুনে ভালো লাগল। তাঁর মতো একটিভ, ইনোভেটিভ মানুষ হচ্ছে দেশের সম্পদ। দেশ গড়ার কাজে এদের মতো লোক দরকার— তাই না ?

মীরা কিছু বলল না।

মইন ফিরে যাচ্ছে না, দেশেই থাকছে— এই খবর তার জানা ছিল না। মীরার সঙ্গে শেষ দেখা জার্মান কালচারাল সেন্টারে। মীরার ধারণা ছিল উনি চলে গেছেন। মীরা অবশ্যি খোঁজ নেয় নি। একবার খোঁজ নেয়া উচিত ছিল। কেন জানি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে নি।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে কিছু সময় আসে যখন কোনো কিছুই ভালো লাগে না।

মীরার এখন এই সময় যাচ্ছে। ভালো লাগার একটা ভঙ্গি করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার কিছু ভালো লাগছে না। কখনো কখনো তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়— আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কিচ্ছু না। সে অনেক চিন্তা করেছে, এরকম হচ্ছে কেন ? মনজুরের অভাব কি সে বোধ করছে ? তা তো না। তার জীবনের শূন্য অংশ মনজুর ভরাট করতে পারে নি। কাজেই তার অভাবে কাতর হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অন্য কোনো ব্যাপার। কী ব্যাপার তা সে ধরতে পারছে না। নিজেকে সে যতটা বুদ্ধিমান ভাবত এখন মনে হচ্ছে সে ততটা নয়। তার সমস্যাটা কেউ ধরে দিতে পারলে চমৎকার হত। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে কেমন হয়। আছে এমন কেউ ? তাকে গিয়ে সে কী বলবে ? ছোট বাচ্চাদের মতো বলবে— 'আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না' রোগ হয়েছে। আপনি সারিয়ে দিন।

মীরার অফিস ছুটি হয় চারটায়।

ছুটির পরপর তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করে না— বাসায় ফিরে সে কী করবে ? *নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবে ?*

বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না। তার বন্ধুবান্ধব নেই। যারা আছে তাদের সঙ্গে গল্প বেশিদূর চালানো যায় না। মেয়েলি গল্পের বাইরে তারা যায় না কিংবা যেতে পারে না।

আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সে সব সময় দূরে দূরে থেকেছে। এখন আরো বেশি দূরে থাকতে ইচ্ছা করে। তাঁদের কারো সঙ্গে দেখা হলেই অস্বস্তি, চট করে বিয়ে ভাঙা সমস্যায় চলে আসেন। সমস্ত চোখে-মুখে বিষাদের ভঙ্গি এনে বলেন— বুঝলি মীরা সবই কপাল। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে জীবন শুরু কর। কী আর করবি ? বেঁচে তো থাকতে হবে।

নতুন সংসার যাতে শুরু করতে পারে সেই দুশ্চিন্তাতেও তার আত্মীয়স্বজন অস্থির। প্রায়ই খোঁজ আনছেন, ছেলের ছবি নিয়ে আসছেন। যে ছেলে আগে বিয়ে হয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী।

মীরার ছোট ফুপু এক ছেলের খোঁজ আনলেন— খুব নাকি চমৎকার ছেলে। ভালো বংশ, ভালো টাকাপয়সা, ভালো চেহারা। ছেলের আগে বিয়ে হয় নি, এখন বিয়ে করতে চায়। তবে কুমারী মেয়ে নয়, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।

মীরা বলল, এই ছেলে তো পাগল। আপনি শেষ পর্যন্ত একটা পাগল ছেলের খোঁজ আমার জন্যে নিয়ে এলেন ?

ফুপু চোখ কপালে তুলে বললেন, পাগল বলছিস কী ? স্মার্ট ইয়াং ছেলে, সুন্দর চেহারা।

স্মার্ট ইয়াং ছেলে বিধবা ছাড়া বিয়ে করতে চায় না— এর মানে কী ? ছেলে কি বিদ্যাসাগরের চ্যালা ?

এখনই এত রেগে যাচ্ছিস কেন ? আগে ছেলের সঙ্গে কথা বল। তারপর রাগারাগি করবি।

আমি ঐ ছেলের সঙ্গে কথা বলব না। তোমার সঙ্গেও না। তুমি আর এ বাড়িতে এস না

তোর নিজেরই মাথাটা খারাপ হয়েছে মীরা।

তা ঠিক। মাথা আমার নিজেরই খারাপ।

এই সন্দেহ আজকাল মীরার হচ্ছে। তার কি মাথা খারাপ? এমন কিছু কি তার মধ্যে আছে যার জন্যে তার লজিক মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়? আছে। নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্কের সেই অংশটা কি ঠিক করা যায় না?

জি.এম. সাহেব বললেন, মিস মীরা আজ আমি সাড়ে তিনটার দিকে অফিস থেকে বেরুব। একটা বিয়ের পার্টি আছে। গিফ্‌ট কিনতে হবে। ভলো গিফ্‌ট কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো?

মীরা বলল, ভালো বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

ভালো মানে, যা দেখে তারা এপ্রিসিয়েট করবে। আমার রুচির প্রশংসা করবে।

মীরা বলল, আজকাল রুচিটুচি কেউ দেখে না। উপহারটার দাম কত তাই দেখে। *আপনি দামি একটা কিছু কিনে দিন তাহলেই হবে।*

কী দেব বলুন তো?

আপনার বাজেট কত স্যার?

হাজার খানিক। এরচে' কম হলেই ভালো।

শাড়ি দিয়ে দিন।

আপনি কি আমাকে পছন্দ করে দিতে পারেন? অবশ্যি আপনার যদি সময় থাকে। আমার আবার রুচি বলে কিছু নেই। একবার আমার স্ত্রীর জন্যে একটা শাড়ি কিনেছিলাম। শাড়ি দেখে সে বলল— এটা লুঙ্গির কাপড়। আমি নাকি থান থেকে সাড়ে তিন গজ লুঙ্গির কাপড় কিনে এনেছি।

মীরা হাসল।

পুরনো রসিকতা। সব স্বামীই স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনা নিয়ে এই একটি রসিকতাই করে। এবং মনে করে খুব উচ্চ শ্রেণীর রসিকতা করা হলো।

মিস মীরা।

জ্বি স্যার।

আমার স্ত্রী, অন্য দশজন মানুষের স্ত্রীর মতো না। অন্য দশজন শাড়িটাকে লুঙ্গির কাপড় বলে খানিকক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করবে, তারপর অনুতপ্ত হয়ে সেই শাড়ি পরে বলবে— পরার পর তো ভালোই দেখাচ্ছে! তোমার রুচি খুব খারাপ না।

আপনার স্ত্রী কী করলেন?

সে ঐ শাড়ি কেটে আমার জন্যে তিনটা লুঙ্গি বানিয়ে দিল। সে লুঙ্গি আমাকেই পরতে হলো।

মীরা কিছু বলল না। সাধারণ রসিকতার গল্প এখন সেনসেটিভ পর্যায়ে চলে গেছে। এখন কিছু না বলাই ভালো।

আপনার কি সময় হবে মিস মীরা ?

জ্বি স্যার হবে।

তাহলে চলুন যাই। শাড়ি কোথায় পাওয়া যায় তাও তো জানি না— শাড়িটাড়ি অবশ্যি আমার স্ত্রী কেনে। খুব আগ্রহ নিয়ে কেনে। তবে আজকেরটা কিনবে না। কারণ কি জানেন ?

জ্বি না।

অনুমান করতে পারেন ?

না— তাও পারছি না।

যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে সে আমার দিকের আত্মীয়। আমার দিকের আত্মীয়ের কোনো কর্মকাণ্ডে সে থাকবে না। বিয়েতেও সে যাবে না— সাজগোজ সে করবে ঠিকই। গাড়িতে উঠার আগ মুহূর্তে বলবে— মাথা ধরেছে, বমি বমি লাগছে। বলেই ছুটে বাথরুমে ঢুকে গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হবে— থাক যেতে হবে না। এই হচ্ছে আমার জীবন। অনেক কথা আপনাকে বলে ফেললাম, চলুন যাওয়া যাক।

শাড়ি কেনা হয়ে গেল পনের মিনিটে। দোকানদার কয়েকটা শাড়ি মেলে ধরল। মীরা সাদা জামদানির উপর নীল লতাপাতা আঁকা একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বলল— এইটা নিন স্যার। চমৎকার।

জি.এম. সাহেব বললেন, আরেকটু ঘুরেফিরে দেখলে হয় না ?

শুধু শুধু হাঁটহাঁটি করে কোনো লাভ নেই— এটা ভালো শাড়ি। আপনি আমার রুচির উপর ভরসা করেছেন— এটাই নিন। আমি এখান থেকে বিদায় নেব। বইয়ের দোকানে খানিকক্ষণ ঘুরব।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি— তারপর আপনাকে নামিয়ে দেব।

স্যার কোনো দরকার নেই।

মীরা বইয়ের দোকানগুলাতে বেশ কিছু সময় কাটাল। তিনটা বই কিনল— তিনটিই কবিতার। বই তিনটিই তার আছে তবু কিনল কেন কে জানে ? মানুষের কিছু কাজকর্ম আছে চট করে যার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। অবচেতন মনে কোনো ব্যাখ্যা হয়তো আছে যা এই মুহূর্তে মীরা নিজেও জানে না।

মীরা ঘড়ি দেখল। মোটে চারটা বাজে। কী করা যায় ? মনজুরের খোঁজে কি একবার যাবে ? অফিস ছুটি হয়ে গেছে। তাকে এখন অফিসে পাওয়া যাবে না। আগের বাসায় গেলেও তাকে পাওয়া যাবে না। বাসা বদলে সে তার মেজো মামার কাছে গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। সেখানে যাওয়া যেতে পারে তবে ঐ লোকটিকে তার নিতান্তই অপছন্দ। অশিক্ষিত, অশালীন গ্রাম্য ধরনের মানুষ। মনজুরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে মীরা যখন তার বাবার বাড়িতে চলে এসেছে তখনকার ঘটনা। বদরুল আলম এক সন্ধ্যাবেলায় দুই কেজি মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। অতি নম্র গলায় বললেন, মা'র কাছে ছেলের একটা আবদার। আবদার রক্ষা না করলে ছেলে এই বাড়ি থেকে যাবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। হাতি দিয়ে টেনেও ছেলেকে নড়াতে পারবে না মা।

মীরা শুকনো গলায় বলেছে— বলুন কী আবদার।

মনজুরের কাছে শুনলাম— তুমি ওকে ছেড়ে এই বাড়িতে চলে এসেছ। এখন মা জননী তুমি আমার সঙ্গে চল। বাইরে একটা বেবীট্যাক্সি আছে। দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

বাইরে বেবীট্যাক্সি আছে ?

হ্যাঁ মা।

দেখুন মামা, আমি রাগের মাথায় হুট করে চলে আসি নি। আমি পুরো এক বছর এটা নিয়ে চিন্তা করেছি। ভেবেছি। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুরের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুর কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে ?

না— আমি নিজেই এসেছি। মনজুর যদি শোনে সে রাগ করবে। তাকে তুমি এই বিষয়ে কিছু বোলো না।

আমি কিছুই বলব না। আপনি চা খান। চা খেয়ে চলে যান।

বদরুল আলম সাহেবের নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলার ছিল। সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। মীরার শীতল চোখের সামনে সব এলোমেলো হয়ে গেল। চা না খেয়েই চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবার এলেন সঙ্গে দু কেজি মিষ্টি। তৃতীয় দিন আবার সঙ্গে সেই মিষ্টি।

মীরা বাধ্য হয়ে মনজুরকে বলল সে যেন তার মামাকে সামলায়। নির্বোধ ধরনের মানুষকে সামলানো বড়ই কঠিন কাজ।

সেই মামার কাছে মনজুরের খোঁজে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করবেন। ভেবে বসবেন— সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ; আবারো হয়তো লোক পাঠিয়ে দু কেজি মিষ্টি আনাবেন। কোনো দরকার নেই। তারচে' মইনের কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এই চাকরিটি তাঁর কারণেই হয়েছে। সেই হিসেবে ধন্যবাদ তো তাঁর প্রাপ্য।

নিউ মার্কেট থেকে বের হয়ে মীরা রিকশা নিল। রিকশায় উঠতে উঠতে মনে হলো— ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। বেঁচে থাকা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো — সব অর্থহীন মনে হচ্ছে— কী যেন সেই কবিতাটা ?

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয় ...

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাইবেন আম্মা ?

মীরা চমকে উঠল। এত মিষ্টি গলায় অনেক দিন তাকে কেউ আম্মা ডাকে নি। অজানা অচেনা অপুষ্টিতে জড়োজড়ো বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা এত মিষ্টি করে তাকে আম্মা ডাকল ? এত মমতা ছিল তার গলায় ?

মীরা বলল, আপনি সোজা যেতে থাকুন। আমি আপনাকে বলব।

জ্বি আচ্ছা আম্মা।

মীরার মন ভালো হতে শুরু করেছে। কেন ?

মীরা জানে না। মইনের বাসায় যাবার আগে একবার কি মনজুরের অফিস দেখে যাবে ? এত বড় কোম্পানির মালিক সে, নিশ্চয়ই পাঁচটা বাজতেই বাসায় চলে যায় না।

তাকে নিশ্চয়ই অনেক কাগজপত্র সই করতে হয়।

আসব ?

মনজুর হাসিমুখে বলল, এস।

তোমার বসগিরি দেখতে এলাম।

খুব ভালো করেছ।

শরীর কেমন ?

ভালো। মাঝখানে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডায়ালিসিস করার পর ঠিক আছে। সেই সঙ্গে চলছে আয়ুর্বেদী চিকিৎসা— 'নলাদি ক্বাথ' খাচ্ছি।

'নলাদি ক্বাথ'টা কী জিনিস ?

গোবর পানিতে গুললে যে বস্তু হয় তার নাম নলাদি ক্বাথ, কিডনির মহৌষধ বলতে পার।

এখন তাহলে আয়ুর্বেদী চিকিৎসাও চলছে ?

যে যা বলছে তাই করছি। একজন হালুয়া ঘাট থেকে পীর সাহেবের পানি পড়া এনে দিলেন— তাও খেলাম।

কেন করছ এসব ?

আগ্রহ করে তারা নানান চিকিৎসার কথা বলে। তাদের খুশি করার জন্যে কোনোকিছুতেই না করি না। মানুষকে খুশি করতে আমার ভালো লাগে। তুমি কিছু খাবে মীরা ?

না।

পেঁপে খেতে পার। কুদ্দুস নামে আমার এখানে একজন কর্মচারী আছে— সে রোজ নিউ মার্কেট থেকে পেঁপে কিনে এনে বলছে, নিজের গাছের পেঁপে স্যার। বাবার হাতে পোঁতা গাছ। কুদ্দুস খুব পিতৃভক্ত। তার সব গাছই থাকে বাবার হাতে পোঁতা।

মীরা তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, রসিকতা করার চেষ্টা করছ বলে মনে হয়।

রসিকতা পছন্দ হচ্ছে না ?

না। আজ তাহলে উঠি।

মীরা উঠে দাঁড়াল। মনজুর দুঃখিত গলায় বলল, সত্যি সত্যি উঠছ ? বস না একটু। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাও।

এক জায়গায় যাব। দেরি হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পর রিকশায় যেতে ভয় ভয় লাগে।

আমার সঙ্গে গাড়ি আছে— যেখানে যেতে চাও নিয়ে যাবে।

ও আচ্ছা, তোমার তো এখন গাড়ি আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে খানিকক্ষণ বসা যায়। বল, চা আনতে বল। ভালো কথা, ডোনার পাওয়া গেছে ?

হ্যাঁ। নাম আমানুল্লাহ।

মীরা অতি দ্রুত চা শেষ করে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল। মনজুর বলল, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। তুমি যাবে কোথায়— মইন সাহেবের কাছে ?

মীরা খানিকটা হকচকিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। তুমি উনাকে চেন ?

উনি একদিন আমার কাছে এসেছিলেন।

কী জন্যে ?

এমনি বোধহয় এসেছিলেন। কথাবার্তা বলার জন্যে।

মীরা নরম গলায় বলল, তাঁর প্রতি এক সময় আমার ভয়ঙ্কর রকম টান ছিল তা কি উনি বলেছেন ?

মনজুর হেসে বলল, সবই বলেছেন। কিছুই বাদ দেন নি। আমার কি মনে হয় জান ? আমার মনে হয় ভদ্রলোক তোমাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চান। তোমাকে কী করে বলবেন বুঝতে পারছেন না।

তুমি তোমার উর্বর মাথা থেকে এটা বের করলে ?

হ্যাঁ। আমার কিডনি ফেল করতে পারে, ব্রেইন ফেল করে নি।

করেছে। কারণ তুমি জান যে মইন ভাই তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে খুব সুখে আছেন।

মনজুর সহজ গলায় বলল, আমি যতদূর জানি তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে লুসিয়ানায় চলে যাবার পরই তিনি দেশে এসেছেন। ফিরে যাবেন না বলেই এসেছেন।

উনি নিজে তোমাকে বললেন ?

হ্যাঁ। এবং আমার কি মনে হয় জান মীরা, আমার মনে হয় তোমার উচিত তাঁকে বিয়ে করা। এই ভদ্রলোকের প্রতি তোমার যে প্রচণ্ড মোহ ছিল তার সবটাই এখনো আছে। আছে বলেই আমার সঙ্গে থাকতে পারলে না। আমার মধ্যে তুমি মইন সাহেবের ছায়া দেখতে চেয়েছিলে। তা কি সম্ভব ? আমি হচ্ছি আমি।

মীরা কিছু বলল না।

গাড়িতে উঠেও চুপ করে রইল। মনজুর বলল, মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ করিয়ে দিয়েছি। সরি।

মীরা বলল, সরি হবার কিছু নেই।

মনজুর বলল, তোমার মোহ প্রসঙ্গে যা বললাম তা কি ভুল ?

না, ভুল না।

ভুল না হলে তুমি এত লজ্জিত বোধ করছ কেন?

লজ্জিত বোধ করছি না তো !

করছ। খুব মন খারাপ করেছ। প্লিজ মন খারাপ করবে না। আমার সঙ্গে তিনটি বছর তোমার খুব খারাপ কেটেছে। খারাপের পর ভালো আসে। সামনের দিনগুলো তোমার ভালো যাবে। আমি একশ ভাগ নিশ্চিত।

মনজুর মীরাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

১৬

মইন বারান্দায় কাগজ, কেঁচি এবং গাম নিয়ে এসেছে। তৈরি করছে কাগজের এরোপ্লেন মডেল। তার সামনে একটা বই খোলা। বইয়ে লেখা মাপমতো প্রতিটি মডেল তৈরি হচ্ছে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাকে ঘিরে নানান বয়সী কিছু বাচ্চাকাচ্চা বসে আছে। তাদের বিস্ময় এবং মুগ্ধতা সীমাহীন।

মইন মীরাকে দেখে সহজ গলায় বলল, এস মীরা, এস। প্লেন বানাচ্ছি। মইনের গলায় কোনো বিস্ময় নেই। মনে হতে পারে সে এই মুহূর্তে মীরার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বিস্মিত না হবার অভিনয় দুরূহ অভিনয়। এই মানুষটি সেই অভিনয় এত চমৎকার করছে কী করে? নাকি সে আসলেই বিস্মিত হয় নি। ধরেই নিয়েছিল মীরা যে-কোনোদিন আসবে। মইন কাগজ কাটতে কাটতে বলল, এই মোড়াটায় আরাম করে বস। আমার চারপাশে যারা বসে আছে তারা আমার নেফিউ এবং নিস। এদেরকে আমি এই মুহূর্তে এরোডায়নামিক্স শিখাচ্ছি। সামান্য কাগজের তৈরি প্লেন বাতাসে ভর করে কুড়ি থেকে পঁচিশ গজ যেতে পারে যদি ঠিক ডিজাইনে তাদের তৈরি করা হয়। এই দেখ এটাকে দেখ— ফড়িঙের মতো স্লিম বডি, আকাশে ভেসে থাকার ক্ষমতা দেখলে তুমি হকচকিয়ে যাবে।

মইন কাগজের প্লেন আকাশে ছুড়ে মারল। সেই প্লেন সত্যি সত্যি উড়তে উড়তে বাড়ির কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে রওনা হলো। পেছনে পেছনে ছুটে গেল শিশুর দল। মইন মীরার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, কেমন আছ?

ভালো।

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ না এমনি এসেছ?

এমনি এসেছি। আপনার না চলে যাবার কথা ছিল?

যাওয়া হয় নি। আরো মাসখানিক থাকব।

আমাদের জি.এম. বলছিলেন, পুরোপুরি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাও নাকি আছে।

না। কথার কথা বলছিলাম। সেটাকেই ভদ্রলোক বিশ্বাস করে বসে আছেন। বর্তমান বাংলাদেশের সমস্যা কি জান? সিরিয়াসলি যেসব কথা তুমি বলবে সেসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রসিকতা করে তুমি যদি কিছু কথা বল, যদি casual remarks কিছু কর সবাই বিশ্বাস করবে। চল ভেতরে বসে কথা বলি।

প্লেন বানানো শেষ?

আজকের মতো শেষ। তুমি কি অফিস থেকে আসছ?

না। নিউ মার্কেট থেকে। আমাদের জি.এম. সাহেবের সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি শাড়ি কিনলেন। আমাকে পছন্দ করে দিতে হলো।

মইন হাসিমুখে বলল, উনি নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাকে বলেছেন যে তাঁর পারিবারিক জীবন কী রকম বিষময়। বলেন নি?

বলেছেন।

ঐ গল্পটি কি করেছেন— তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্যে শখ করে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা সেই শাড়ি কেটে তিনটি লুঙ্গি বানিয়ে তাঁকে প্রেজেন্ট করলেন। এই

গল্প কি শোনা হয়েছে, না শোনা হয় নি ?

মীরা বলল, শোনা হয়েছে।

মইন বলল, এইসব গল্প এক বর্ণও বিশ্বাস করবে না। সুন্দরী মহিলাদের সহানুভূতি আদায়ের জন্যে এই গল্প তিনি করেন। ভদ্রলোক হার্মলেস। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সঙ্গে ঘুরতে পার। কোনোদিন ভুলেও সে তোমার হাত ধরবে না। সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে গল্প করার আনন্দই তাঁর একমাত্র আনন্দ। তাঁর পারিবারিক জীবনও খুব ভালো। ভদ্রলোকের স্ত্রী একজন রূপবতী মহিলা এবং অত্যন্ত ভালো মহিলা। মীরা তুমি মনে হয় আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেছ।

কিছুটা হকচকিয়ে গেছি তা ঠিক।

বুঝলে মীরা, পৃথিবীটা আসলে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। এখন বল তোমার পরিকল্পনা কী ?

আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। আপনার কল্যাণে চাকরি হয়েছে আমি তার জন্যে আপনাকে থ্যাংকস্ দিতে এসেছি। এর বেশি কিছু না।

তুমি এমনভাবে 'না' বললে, যাতে মনে হচ্ছে এর বেশি কিছু হলে তোমার আপত্তি আছে। বস, আমার সঙ্গে চা খাও। চা খেয়ে চল ঘুরতে বের হই। রাতে ডিনারের পর তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসব। ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমাদের জি.এম. সাহেবের মতো হার্মলেস। ভালো কথা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মনটা খুব খারাপ। কী হয়েছে বল তো ?

মীরা বলল, কিছু হয় নি, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। চা খাব তারপর বাসায় চলে যাব। কাজ আছে।

কাজ পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কাজেই আর কোনো কথা নয়। আমার পরিকল্পনা কী ছিল জান ? পরিকল্পনা ছিল সন্ধ্যার পর তোমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও খেতে যাব। তোমাদের বাসায় আই মিন তোমার ভাইয়ের বাসায় খবর দিয়ে রেখেছিলাম। তুমি যখন এলে তখন ভাবলাম খবর পেয়ে নিজেই এসেছ। তুমি হয়তো লক্ষ কর নি যে তোমাকে দেখে আমি মোটেও অবাক হই নি। পরে অবশ্যি বুঝলাম যে নিজ থেকেই এসেছ। খবর পাও নি। এর পরেও যদি যেতে না চাও তাহলে আমার হাতে আরেকটি কঠিন অস্ত্র আছে।

কী অস্ত্র ?

আজ আমার জন্মদিন। তুমি এই দিনটাও ভুলে গেলে এটা খুবই দুঃখের কথা। আমার ধারণা ছিল আমার জন্যে অনেকখানি আবেগ তুমি সব সময় ধরে রাখবে। ধারণা দেখা যাচ্ছে ঠিক না। তুমি সব ভুলেটুলে বসে আছ।

তাই কি ভালো না ?

জানি না, হয়তো ভালো। এখন বল তুমি যাবে, না যাবে না।

চলুন যাই।

তুমি খুব অনাগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে রওনা হচ্ছ। আমি হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি এই অনাগ্রহ তোমার থাকবে না।

বাজিতে আপনি হারবেন। আজকাল কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করি না।

কেন কর না তাও জানতে চাই।

জানতে চান কেন ?

আজকের অনাগ্রহের পেছনে— অনেকদিন আগে আমার ঘরে যা ঘটেছিল তার কোনো যোগ আছে কিনা জানতে চাই। আমি নিজে অত্যন্ত সুখী মানুষ। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।

দুজন হাঁটতে হাঁটতে রওনা হলো। মইনের ইচ্ছা অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর তারা রিকশা নেবে। রিকশায় করে ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন কোনো চাইনিজ রেস্তোরাঁয় আধো আলো আধো আঁধারে রাতের খাবার শেষ করবে।

মীরা লক্ষ করল মইনকে অসম্ভব খুশি খুশি লাগছে। মনে হচ্ছে সে তার আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। মীরাকে সে কোনো কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে—

মীরা, জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউটে একটা ছবি কিনেছিলাম তোমার মনে আছে ? নগদ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। এক্সিবিশন শেষে ছবি নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি আর ছবি আনতে যাই নি। ঐ আর্টিস্ট যেহেতু আমার ঠিকানা জানে না— ছবি দিয়ে যেতেও পারছে না। হা-হা-হা।

এতে খুশি হচ্ছেন, কারণটা কী ?

খুশি হচ্ছি কারণ আর্টিস্ট সাহেবকে এক ধরনের মানসিক কষ্ট দিতে পারছি। সে ঐদিন আমাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করেছিল। কঠিন অপমান। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম শোধ নেব। এখন নিচ্ছি। বেচারা এখন ছবিটা নিয়ে পড়েছে বিপদে। নিজের কাছে ছবিটা রাখতে হচ্ছে। যতবার তাকাচ্ছে ছবিটার দিকে ততবার আমার কথা মনে হচ্ছে। মনটা খারাপ হচ্ছে— টাকা দিল অথচ ছবি নিল না। কঠিন মানসিক চাপ। হা-হা-হা।

আপনি মানুষটা বেশ অদ্ভুত।

অদ্ভুত না— ক্রুয়েল। নিষ্ঠুর। শুধু সদ্‌গুণ নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয় না— এইসবও কিছু কিছু লাগে। যাদের ভেতর শুধু সদ্‌গুণ, মানুষ হিসেবে অনেক নিচের দিকে তাদের অবস্থান।

কী পাগলের মতো কথা বলছেন ?

পাগলের মতো কথা বলছি না। ভেবেচিন্তে বলছি। তোমাকে এই কথাগুলো বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্যও আছে। কী বলছি মন দিয়ে শোন। খুব মন দিয়ে। একজন মানুষ যার ভেতরে মহৎ গুণাবলি ছাড়া কিছুই নেই, রাগ নেই, হিংসা নেই, ঘৃণা নেই সে কী করে জান ? সে আশপাশের মানুষদের অসম্ভব কষ্ট দেয়। আমরা তাকে এড়িয়ে চলি। ক্ষেত্রবিশেষে পরিত্যাগ করি। কারণ আমরা তাকে সহ্য করতে পারি না।

মীরা থমথমে গলায় বলল, আমাকে এসব কেন বলছেন ?

মইন হাঁটা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে রইল মীরার দিকে। সন্ধ্যার শেষ আলোয় মীরার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত।

মইন হালকা গলায় বলল, বুঝলে মীরা, আমি কয়েকদিন আগে মনজুর নামের ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এক ধরনের কৌতূহল থেকেই গিয়েছিলাম। তোমার মতো একটা মেয়ে সবার মতের বিরুদ্ধে এমন সাদামাঠা একজন মানুষকে কেন বিয়ে করল আবার ছাড়াছাড়িই বা কেন হলো খুব জানার ইচ্ছা ছিল। আমার সঙ্গে এই লোকটি প্রতিযোগিতা করেছে এবং এক অর্থে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, কাজেই তার সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, তাই না? কাজেই দেখা করলাম।

কেমন দেখলেন?

অন্য দশজন যা বলেছে তাই— নিতান্তই সাধারণ একজন মানুষ।

মীরা চাপা গলায় বলল, আপনার ধারণা ঠিক না। ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ না।

মইন হেসে ফেলে বলল, প্রথম দর্শনে আমার যা মনে হলো তা বললাম— সাধারণ মানুষ, খুবই সাধারণ। তারপর অবাক হয়ে দেখি হিসেবে কী যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কী একটা জিনিস যেন মিলছে না। লোকটি পূরিপূর্ণ মানুষ না। তার মধ্যে মানুষের ত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। আমার ধারণা এই যে তার সঙ্গে তোমার বনল না তার কারণ এই।

আপনি তো অদ্ভুত কথা বলছেন মইন ভাই। একজন মানুষের ভেতর ত্রুটি নেই বলেই তাকে আমার পছন্দ হবে না?

হ্যাঁ তুমিই তার ত্রুটিগুলো বল। তার সবচে' বড় ত্রুটি কী যা তোমাকে সবচে' বেশি আহত করেছে?

ভালোবাসা বলে কিছু তার মধ্যে ছিল না। তার মধ্যে যা ছিল তা হলো আশপাশের সবার সম্পর্কে অনাগ্রহ।

ভালোবাসার বাস হচ্ছে হৃদয়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। আমরা করি কি, নানান কাণ্ডকারখানা করে তা দেখাতে চাই যেমন ফুল কিনে আনি, উপহার দেই। এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে এক ধরনের ভান আছে— ভানটা হচ্ছে আমাদের ত্রুটি। যে মানুষের মধ্যে এই ত্রুটি নেই সে ভালোবাসা দেখানোর চেষ্টা করবে না।

ভালোবাসা যদি থাকে তা দেখানোয় দোষ কী?

কোনোই দোষ নেই। দেখানোই উচিত। কিন্তু খুব ক্ষুদ্র একদল মানুষ আছে যাদের কাছে এই অংশটি অপ্রয়োজনীয় মনে হবে। এদেরকে আমরা যখন বিচার করব তখন মানুষ হিসেবে এদের স্থান হবে অনেক পেছনে। কারণ এরা দুর্বোধ্য।

মীরা শীতল গলায় বলল, ওর সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলে ওকে আপনি মহাপুরুষদের দলে ফেলে দিয়েছেন?

সামান্য কিছুক্ষণ কথা হয়েছে তা ঠিক না। প্রচুর কথা হয়েছে। আমি তাঁকে খোলাখুলি অনেক কথাই বলেছি। কেন জানি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করল। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ পাওয়া যায় যাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। করে না?

হ্যাঁ করে।

মীরা আমি তোমাকে কিছু মিথ্যা কথাও বলেছি। আমি কনফেশন করতে চাই এবং...

মইন থেমে গেল। মীরা বলল, থামলেন কেন, কথা শেষ করুন।

মইন খুবই নিচু গলায় বলল, অনেক আগে তুমি প্রচণ্ড ঘোর এবং প্রচণ্ড মোহ নিয়ে

আমার কাছে ছুটে এসেছিলে। আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেই নি। আজ যদি আমি ঠিক সেই রকম মোহ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসি, তুমি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবে ?

মীরা জবাব দিল না। তার সমস্ত হৃদয় হাহাকারে পূর্ণ হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওঠে— আমার ভালো লাগছে না। আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

১৭

ডাক্তার সাহেবের নাম শাহেদ মজুমদার।

ডাক্তাররা কখনো পুরো নামে পরিচিত হন না।

শাহেদ মজুমদার সেই কারণেই এস. মজুমদার নামে পরিচিত। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। এই বয়সেই প্রচুর খ্যাতি এবং অখ্যাতি কুড়িয়েছেন। ডাক্তার সাহেবকে মনজুরের পছন্দ। মানুষটি রসিক। রস ব্যাপারটা ডাক্তারদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। প্রথম দিন মনজুর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, ভাই আমি কি মারা যাচ্ছি নাকি ?

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছেন, হ্যাঁ যাচ্ছেন।

মনজুর যখন পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে তখন তিনি বলেছেন, ভয় পাবেন না। আমরা সবাই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় ষাট বছর পার করে মারা যাচ্ছি— এই অর্থে বলেছি। নির্দিষ্ট সময়টুকু আপনি যাতে পান সে চেষ্টা আমি করব এই আশ্বাস দিচ্ছি।

আজ মনজুরকে তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দেখা শেষ করে বললেন, আপনাকে কমপ্লিট রেস্টে চলে যেতে হবে। আগেও তো বলেছি। আপনি কথা শোনেন নি।

মনজুর বলল, কিছু ঝামেলা ছিল, শেষ করেছি। এখন লম্বা হয়ে বিছনায় শুয়ে পড়ব।

কবে শোবেন ? আজ থেকেই শুরু করুন।

আপনি বললে আজই শুয়ে পড়ব। ভালো কথা ডাক্তার সাহেব, আমার এই সমস্যায় কি মাথায় গণ্ডগোল হয় ?

আপনার কথা বুঝতে পারছি না— মাথায় গণ্ডগোল মানে ?

মনজুর লাজুক গলায় বলল, আমার ঘরে একটা টেলিফোন আছে। হঠাৎ হঠাৎ সেই টেলিফোন বেজে ওঠে। বেজে উঠার কথা না। টেলিফোনটা অনেকদিন ধরেই ডেড। একটা ছেলের নাম ইমরুল, সে রাত দুটা আড়াইটার দিকে টেলিফোন করে। মজার মজার কথা বলে। আমি জানি এটা অসম্ভব না। আমার এক ধরনের হেলুসিনেশন হচ্ছে। আমি কি ঠিক বলছি ডাক্তার সাহেব ?

ঠিকই বলছেন। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেড়ে গেলে হেলুসিনেশন হতে পারে। এরকম ঘটনার নজির আছে। ছেলেটার সঙ্গে কী কথা হয় ?

ছেলেমানুষি ধরনের কথা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

হয়তো পুরো ব্যাপারটা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন।

তাও হতে পারে।

শেষ কবে টেলিফোন পেলেন ?

গতকাল রাত তিনটার দিকে। সে বলল, যে ছেলেটি আপনাকে কিডনি দিচ্ছে তার

একমাত্র কিডনিটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন সে কী করবে ?

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেলে বললেন, আপনার কথা শুনে তো মনে হয় না ঐ ছেলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে না। সে তো বেশ সিরিয়াস ধরনের কথা বলেছে। এই কথাগুলো নিশ্চয় আপনার মনেও আছে। আছে না ?

জ্বি আছে।

এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবেন না। আপনার সাব-কনশাস মাইন্ড আপনাকে নিয়ে খেলছে। এটাকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তা দিচ্ছি। গুরুত্ব দেয়ার কারণও আছে। আমি কি কারণটা আপনাকে বলব ?

বলুন।

কারণটা কোনো একজনকে বলা দরকার। আমি বলার মতো কাউকে পাচ্ছি না। সবাই কথা বলতে চায়। কেউ শুনতে চায় না।

ডাক্তার সাহেব নরম গলায় বললেন, আমি আপনার কথা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি। আপনি ধীরেসুস্থে বলুন।

আমি আমানুল্লাহ ছেলেটির সঙ্গে নিজের খুব মিল দেখতে পাচ্ছি। সে একটি কিডনি বিক্রি করেছে। আমিও তাই করেছিলাম। আপনাকে এই তথ্য আগেই দিয়েছি। বাবার চিকিৎসার জন্যে এটা করতে হয়েছিল। তাঁর থ্রোট ক্যানসার হয়েছিল। ক্যানসার হয়েছে জানার পর থেকে তিনি বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হলো বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করলেই তিনি সেরে উঠবেন। টাকা টাকা করে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন। সারাক্ষণ বলতেন, এক লাখ টাকা হলেই বিদেশে গিয়ে জীবনটা রক্ষা করতাম। এই সময় আমি বাবাকে এক লাখ টাকা দেই। টাকা হাতে নেয়ার দু'দিনের মাথায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তখনো আপনার কিডনি কেটে বাদ দেয়া হয় নি ?

জ্বি না। আমি ইচ্ছা করলে টাকাটা ফেরত দিতে পারতাম, বলতে পারতাম আমি কিডনি বিক্রি করতে চাই না। তা করি নি। যথাসময়ে কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হয়। যাক ঐ প্রসঙ্গ। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমানুল্লাহ্ নামের ছেলেটিরও একই ব্যাপার ঘটছে। সে একটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং একসময় দেখা যাবে আমার মতো সমস্যা হয়েছে।

তেমন সম্ভাবনা খুবই কম।

কম হলেও তো আছে। আছে না ?

ডাক্তার জবাব দিলেন না।

মনজুর বলল, আপনার এখানে কি একটা সিগারেট খেতে পারি। প্রচণ্ড তৃষ্ণা হচ্ছে। যদি অনুমতি দেন।

অনুমতি দিলাম।

মনজুর সিগারেট ধরিয়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডাক্তার সাহেব— আমি ঐ ছেলেটির কিডনি নেব না। যে ক'দিন বাঁচব নিজের যা আছে তা নিয়েই বাঁচব।

এই সিদ্ধান্ত কি এখন নিলেন?

না। যেদিন আমানুল্লাহকে নগদ এক লাখ টাকা গুনে গুনে দিলাম সেদিনই নিয়েছি। ডাক্তার সাহেব, আমার শরীরটা এখন বেশ খারাপ লাগছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিন আমি আজ রাতেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পড়তে চাই— অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। জ্বর আসছে বলেও মনে হচ্ছে। প্লিজ একটু দেখবেন আমার গায়ে টেম্পারেচার আছে কিনা?

মনজুর ডাক্তারের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার সাহেব সেই হাত ধরলেন না। তিনি তাকিয়ে রইলেন মনজুরের দিকে। সেই চোখ কোমল ও শান্ত। অস্থিরতার কোনো ছাপ চোখের মণিতে নেই।

১৮

মনজুর অপারেশন করতে রাজি নয়।

এই খবর জাহানারা পেয়েছে গতকাল রাতে। ফরিদ এসে খবর দিয়েছে। জাহানারা তৎক্ষণাৎ ফরিদকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে— ফরিদ এসব কী বলছে স্যার?

মনজুর বলল, ও যা বলছে ঠিকই বলেছে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ডিসিশান নিয়েছি। এর নড়চড় হবে না। তুমি আমাকে অনুরোধ করো না বা কান্নাকাটিও করো না।

জাহানারা হতভম্ব হয়ে গেল। এ রকম হতে পারে সে কল্পনাও করে নি। জাহানারা থাকতে থাকতেই বদরুল সাহেব এলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি রাগী গলায় বললেন, তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ।

ঐ এক লাখ টাকার কী হবে? ঐ টাকা তো আর উদ্ধার হবে না।

তা হবে না। মামা, টাকাটা আমি দান করেছি।

তুই পাগল, ষোল আনা পাগল।

মনজুর ক্লান্ত গলায় বলল, মামা আমার শরীরটা খুবই খারাপ। তোমার চিৎকারে আরো খারাপ হচ্ছে। দয়া করে বিদেয় হও।

বদরুল আলম নড়লেন না। জাহানারা বের হয়ে এল। ফরিদকে হাসপাতালে রেখে একা এল মীরার কাছে।

জাহানারা মীরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। সারা পথই সে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। তার চোখ ফোলা। মুখ অসম্ভব বিষণ্ন।

মীরা বলল, আমি বললেই কি মনজুর আমার কথা শুনবে?

জাহানারা ধরা গলায় বলল, হ্যাঁ আপনি বললে শুনবে।

আপনি কী করে জানেন?

আমি জানি। আপনি স্যারের হাত ধরে যদি একবার বলেন, স্যার রাজি হবেন। কিডনি আমি দেব। সেটা কোনো সমস্যাই না। আপনি শুধু স্যারকে রাজি করাবেন।

বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।

সেটা আপনি জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও জানে না। ওর কিছু নিজস্ব বিচিত্র লজিক আছে। সে ঐ লজিকে চলে। অন্য কারো কথাই শোনে না। আমার কথাও শুনবে না।

আপনার কথা শুনবেন। আপনার কথা না শুনে স্যারের উপায় নেই।

এত নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছেন ?

স্যারের রাইটিং প্যাডের একটা পাতা আমি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। ঐটা দেখলেই আপনি বুঝবেন তিনি আপনার কথা ফেলবেন না।

জাহানারা রাইটিং প্যাডের একটা পাতা মীরার দিকে বাড়িয়ে ধরল। সেখানে গুটি গুটি করে অসংখ্যবার লেখা— মীরা, মীরা, মীরা।

জাহানারা বলল, মোট তিনশ ছ'বার লেখা আছে।

আপনি বসে বসে গুনেছেন ?

জ্বি।

মীরা জাহানারার দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল। মীরার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। এই হাসি সে তৎক্ষণাৎ মুছে ফেলে স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনার স্যারকে আপনার খুব পছন্দ তাই না ?

জাহানারা সহজ গলায় বলল হ্যাঁ।

কেন পছন্দ সেটা কি জানেন ?

জানি।

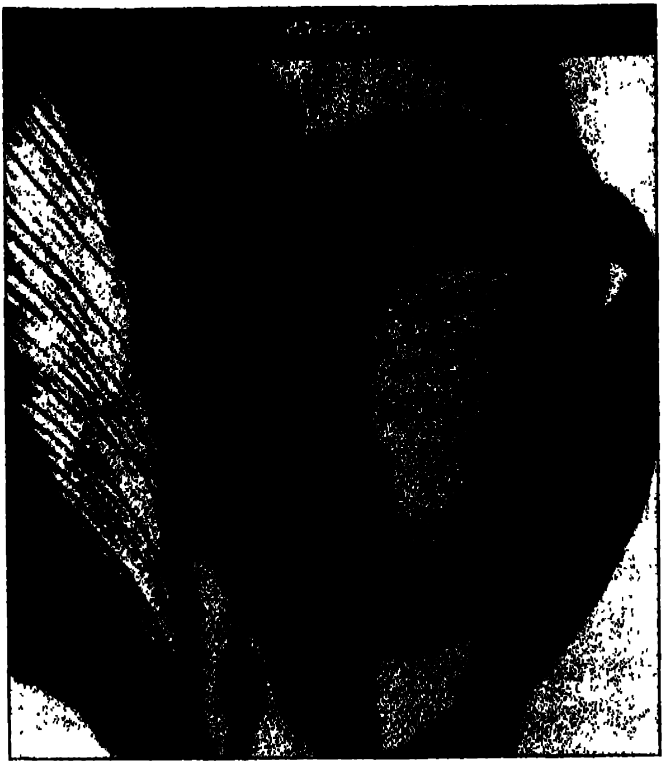
আমাকে বলবেন ?

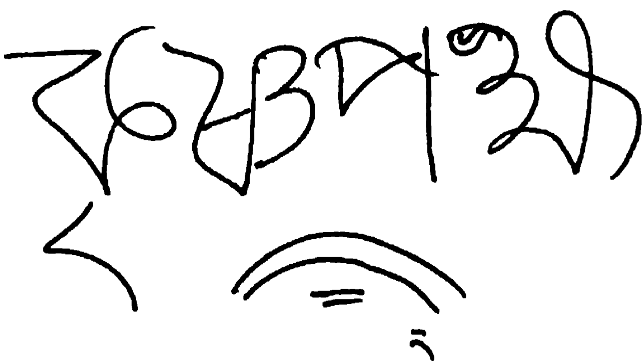
জাহানারা স্পষ্ট স্বরে বলল, না।

মীরা বলল, আচ্ছা থাক বলতে হবে না। সবকিছু বলতে নেই। চলুন আপনার স্যারের কাছে যাই। দেখি তাকে রাজি করানো যায় কিনা। ওর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয় তখন আমার পরনে আসমানি রঙের একটা শাড়ি ছিল। ঐ শাড়িটা পরে গেলে কেমন হয় ?

খুব ভালো হয়।

আপনি তাহলে অপেক্ষা করুন, আমি শাড়ি বদলে আসছি। আর শুনুন, এত কাঁদবেন না। আপনার কান্না দেখে আমারই কান্না পেয়ে যাচ্ছে। দেখি, কাছে আসুন তো আপনাকে একটু আদর করে দিই।





নোটটা বদলাইয়া দেন আফা, ছিঁড়া নোট।

অরুর গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কুড়ি টাকার একটা নোটই তার কাছে আছে। ছেঁড়া নোট বদলাবে কোত্থেকে? অরু গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলল, কই দেখি নোটটা?

রিকশাওয়ালার মুখে অহংকার মেশানো বিজয়ীর হাসি। ছেঁড়া নোট আবিষ্কার করে সে খুব খুশি। যেন সে ক্রিস্টোফার কলম্বাস। আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

অরু বলল, কই আমি তো ছেঁড়া দেখছি না।

রিকশাওয়ালা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, নজর দিয়া দেহেন।

অরু 'নজর' দিয়ে দেখল। হ্যাঁ ছেঁড়া। ছিঁড়ে দু'খণ্ড করা। স্কচ টেপ দিয়ে এত সাবধানে জোড়া লাগানো যে রিকশাওয়ালা ছাড়া অন্য কারো বোঝার উপায় নেই।

কি আফা বিশ্বাস হইল?

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, শোন, আমার কাছে আর কোনো টাকা নেই। এই একটাই নোট। তুমি এক কাজ কর— পুরোটাই নিয়ে যাও।

ছিঁড়া নোট নিয়া ফায়দা কী?

ফায়দা আছে। গুলিস্তানে ছেঁড়া নোট বদলে দেয়। দু'টাকা বাটা রাখবে। কুড়ি টাকার বদলে তুমি পাবে আঠারো টাকা। দশ টাকা লাভ।

আমার লাভের দরকার নাই।

এখন আমি টাকা পাব কোথায়? বলেছি না আমার কাছে একটাই নোট'

টাকা-পয়সা না নিয়া রিকশাতে উঠেন ক্যান?

ভুল করে উঠি। তুমি ভুল কর না? মাঝে মাঝে বৃষ্টির দিনে প্লাস্টিকের পর্দা ছাড়া চলে আস না?

যুক্তি রিকশাওয়ালাকে কাবু করল না। সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। অরু বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি মিনিট দশেক অপেক্ষা কর। তোমাকে ভালো নোট দেব। রিকশার সিটে বসে আরাম করে চা খাও।

ফ্লাস্কে করে এক ছেলে ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করছে। অরু তাকে ডেকে বলল, তুমি এই রিকশাওয়ালাকে এক কাপ চা দাও।

রিকশাওয়ালা খানিকটা হকচকিয়ে গেল। এই জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি সে এর আগে হয় নি।

অরু ঘড়ি দেখল— চারটা সাত।

কাঁটায় কাঁটায় চারটার সময় তার আসার কথা, সে তাই এসেছে। মুহিবের খোঁজ নেই। সে মনে হয় আজও দেরি করবে। আজকের দিনটিতেও সে কি সময় মতো আসবে না?

কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ের পক্ষে একা একা অপেক্ষা করা যে কী যন্ত্রণা তা ক'জন জানে? সেজেগুজে একা দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের দিকে সবাই খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা করুণা এবং খানিকটা তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকায়। বড়রা এমন ভঙ্গি করে যেন দেশ রসাতলে যাচ্ছে। সংসদ ভবনের এই রাস্তাটা এখন বলতে গেলে বুড়োদের দখলে। সকাল

বিকাল এদের দেখা যায় হাঁটাহাঁটি করছে। স্বাস্থ্য রক্ষা। যে করেই হোক আরো কিছুদিন বাঁচতে হবে। সমাজের অনাচার দেখে নাক সিঁটকাতে হবে। কিছুতেই মরা চলবে না।

রিকশাওয়ালা চা খেতে খেতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুকে দেখছে। এও এক যন্ত্রণা! একজন কেউ তাকিয়ে থাকলে কিছুতেই স্বাভাবিক হওয়া যায় না। অরু আবার ঘড়ি দেখল— মাত্র পাঁচ মিনিট পার হয়েছে। সময় কি পুরোপুরি থেমে আছে? না ঘড়ি বন্ধ?

মুহিবকে এতক্ষণে দেখা গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটতে ছুটতে আসছে। কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। অরু ডাকল, এ্যাই। মুহিব থমকে দাঁড়াল। যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে না তাকিয়ে সে অন্য দিকে তাকাচ্ছে। কী যে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! রাগে অরুর গা জ্বলে যাচ্ছে। আজকের দিনে সে এমন বিশ্রী পোশাক পরে এল কী করে? কে বলেছে তাকে পাঞ্জাবি পরতে? কটকটে হলুদ রঙের সিল্কের পাঞ্জাবিতে তাকে যে কী বিশ্রী দেখাচ্ছে তা বোধহয় সে নিজেও জানে না। আয়না দিয়ে নিশ্চয়ই নিজেকে দেখে নি। অরু গলা উঁচিয়ে ডাকল, এ্যাই এ্যাই।

মুহিব তাকাল। এবং হেসে ফেলল। সেই হাসি এতই সুন্দর যে অরু তার দেরি করে উপস্থিত হবার অপরাধ অর্ধেক ক্ষমা করে দিল। কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি পরার অপরাধ অবশ্যি এখনো ক্ষমা করা যাচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ভেবে রেখেছিলাম আজ অন্তত এক ঘণ্টা আগে উপস্থিত হব। গাড়ি জোগাড় করতে গিয়ে...

কে তোমাকে গাড়ি জোগাড় করতে বলেছে?

কেউ বলে নি। ভাবলাম...

কোথায় তোমার গাড়ি?

তেল নেবার জন্যে পেট্রল পাম্পে থেমেছিল— তারপরে আর স্টার্ট নিচ্ছে না।

ঐখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ?

হুঁ। খুব দূর না। আসাদ গেট পেট্রল পাম্প।

ভাংতি টাকা আছে তোমার কাছে?

আছে।

দেখি আমাকে দশটা টাকা দাও। আর ঐ চাওয়ালা ছেলেটাকে এক কাপ চায়ের দাম দাও।

অরু টাকা নিয়ে রিকশাওয়ালার দিকে এগিয়ে গেল। হাসিমুখে বলল, এই নাও দশ টাকা। আট টাকা রিকশা ভাড়া। দু'টাকা ওয়েটিং চার্জ।

তার ইচ্ছা ছিল কিছু কঠিন কথা রিকশাওয়ালাকে বলে। বলা হলো না। আজ একটা শুভ দিন। আজ তাদের বিয়ে। এই দিনে কঠিন কথা বলা সম্ভব না। তার একুশ বছর জীবনের অনেক কথাই সে পরবর্তী সময়ে মনে করতে পারবে না। কিন্তু আজকের দিনের সব কথা মনে থাকবে। কী দরকার আজ ঝগড়া করার? বরং রিকশাওয়ালার নাম জিজ্ঞেস করা যাক। এই রিকশায় করেই না হয় কাজি অফিসে যাওয়া যাবে। যে রিকশায় করে তারা বিয়ে করতে গেল সেই রিকশাওয়ালার নাম জানা রইল। এটা মন্দ কী?

তোমার নাম কী?

আমারে জিগান ?

হ্যাঁ।

আমার নাম সুরুজ মিয়া।

সুরুজ মিয়া, আমরা খিলগাঁও কাজি অফিসে যাব। আজ আমাদের বিয়ে। তুমি কি নিয়ে যাবে আমাদের ?

রিকশাওয়ালা হ্যাঁ-না কিছুই বলছে না। মনে হচ্ছে সে গভীর সমস্যায় পড়ে গেছে। এতক্ষণ যাকে তুমি তুমি করে বলছিল এখন অরু তাকে কি মনে করে যেন আপনি বলল, আপনি চিন্তা করে একটা ডিসিশানে আসুন। বেশি সময় নেবেন না। আমরা দেরি করতে পারব না।

অরু মুহিবের দিকে এগিয়ে গেল। মুহিব সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনছে। সে কখনো একটার বেশি কিনে না। আজ এক প্যাকেট কিনে ফেলল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, অরু, তুমি কি তোমাদের বাড়ির কাউকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলেছ ?

অরু বলল, না। তবে রাত দশটা নাগাদ সবাই জেনে যাবে। একটা চিঠি লিখে খামের মুখ বন্ধ করে বড় আপার টেবিলে রেখে এসেছি। আপা বিয়েবাড়িতে গেছে। দশটা নাগাদ ফিরবে। তারপর হৈচৈ বেঁধে যাবে। বাবার স্ট্রোক না হলেই হয়!

কী লিখেছ চিঠিতে ?

তিন লাইনের চিঠি— আজ বিয়ে করছি তাই লেখা—

কীভাবে লেখা— ল্যাংগুয়েজটা কী ?

তিন লাইনে তো খুব কাব্যিক ল্যাংগুয়েজ হয় না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

কাকে বিয়ে করছ এই সব কিছু লেখ নি তো ?

না। শুধু লিখলাম— একটি বেকার এবং আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ যুবককে বিয়ে করছি। আমার মনে হচ্ছে না আমি কোনো অপরাধ করছি। তারপরেও ক্ষমা প্রার্থনা করছি— আপা, তুমি বাবা-মা'কে শান্ত করবে এবং বুঝিয়ে বলবে।

মুহিব শুকনো গলায় বলল, তোমার বাবা-মা'র রিঅ্যাকশান কী হবে ?

কী করে বলব কী হবে ! তাঁদের কোনো মেয়ে তো এর আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে নি। এই প্রথম এবং এই শেষ। চল, রওয়ানা হওয়া যাক।

তারা রিকশায় উঠল। মুহিব বলল, হুড তুলে দেব ?

না।

খারাপ লাগছে অরু ?

খারাপও লাগছে না আবার ভালোও লাগছে না। মনে হচ্ছে একটা ঘোরের মধ্যে আছি। জ্বরজ্বর লাগছে। দেখ তো জ্বর কি-না ?

না জ্বর নেই।

অরু হাসতে হাসতে বলল, জ্বর নেই বলে হাত সরিয়ে নিলে কেন ? লজ্জা লাগছে ?

হুঁ, আজ কেন জানি অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি লজ্জা লাগছে। আজ মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

তাকিয়ে আছে তো বটেই। তাকিয়ে আছে তোমার হলুদ পাঞ্জাবির জন্যে। তুমি দয়া করে আজ রাতেই এই পাঞ্জাবি পুড়িয়ে ফেলবে।

আচ্ছা।

অরু হালকা গলায় বলল, বিয়ের পর আমরা যাব কোথায়?

বাসর কোথায় হবে এই কথা জিজ্ঞেস করছ?

অরু অস্পষ্ট স্বরে বলল, হুঁ।

বজলুর বাসায়।

বজলু কে?

আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, অতি ভালো ছেলে। গত বৎসর বিয়ে করেছে। তার বৌটা তার চেয়েও ভালো। ওরা একটা ঘর আমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে হুলস্থুল করেছে।

অপরিচিত কারোর বাসায় উঠতে আমার ইচ্ছে করছে না।

ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার মনে হবে এরা অপরিচিত না। খুবই পরিচিত। তাছাড়া আমার আর কোনো জায়গাও নেই যেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

তুমি তোমার আপাকে সব খুলে বলবে বলেছিলে— বলেছ?

না।

বল নি কেন?

কাল বলব। আপাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

উনি রাগ করবেন না?

পাগল, আপার রাগ করার ক্ষমতাই নেই।

আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছ, একটু আগেই না একটা খেলে!

টেনশান বোধ করছি।

অরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই যে তোমার পাশে বসেছি— শেষবারের মতো বন্ধুর পাশে বসেছি। এরপর বসব— স্বামীর পাশে।

স্বামী কি বন্ধু না?

গল্প-উপন্যাসে বন্ধু। বাস্তবে না। বাস্তবের স্বামীরা যতটা না বন্ধু তার চেয়েও বেশি অভিভাবক।

মুহিব গম্ভীর গলায় বলল, তুমি ভুল করছ অরু। আমি তোমার বন্ধুই থাকব।

অরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, থাকলে তো ভালোই।

তোমার মনে কোনো সন্দেহ আছে?

আছে। হুডটা তুলে দাও। আসলেই সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সবচে' বেশি তাকাচ্ছে আমাদের রিকশাওয়ালা। যেভাবে সে পিছন ফিরে ফিরে রিকশা চালাচ্ছে মনে হয় অ্যাকসিডেন্ট করবে।

মুহিব হুড তুলে দিল। অরু বলল, আজ কত তারিখ বলতো?

এগারোই ডিসেম্বর।

বাংলা কত ?

জানি না বাংলা কত।

অরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আজ আমাদের বিয়ে আর আজকের বাংলা তারিখটা তোমার জানার ইচ্ছা হলো না ? আজ ২৬ অগ্রহায়ণ।

ও আচ্ছা, ২৬ অগ্রহায়ণ।

আর আমাদের রিকশাওয়ালার নাম হচ্ছে সুরুজ মিয়া। তার নামটাও মনে রাখা দরকার। তার রিকশায় করে বিয়ে করতে যাচ্ছি।

মুহিব কিছু বলল না। অরু বলল, ভালো করে দেখ তো জ্বর কি-না। এত খারাপ লাগছে কেন ? মাথা ঘুরছে। ভুলে জর্দা দিয়ে পান খেলে যেমন লাগে তেমন লাগছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ধর আর আধ ঘণ্টা।

অরু ঘড়িতে দেখল তাদের বিয়ের পুরো অনুষ্ঠান শেষ হতে মাত্র ১৬ মিনিট লাগল। কাজি সাহেবের কাছে অনুষ্ঠানটা হয়তো খুব 'বোরিং' লাগছে। তিনি কয়েকবার হাই তুললেন এবং যন্ত্রের মতো বললেন, এইখানে সই করেন। তারিখ দেন। অরু গোটা গোটা করে লিখল, অরুণা চৌধুরী। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ। কী আশ্চর্য! কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা এখন তার স্বামী। এই জীবনে সবচে' কাছের মানুষ। কোনো ভুল হয় নি তো ? প্রচণ্ড বড় কোনো ভুল! যে ভুল এই জীবনে আর শোধরানো যাবে না। অরুর পানির পিপাসা পেয়ে গেল। কাজি সাহেবকে সে কি বলবে পানির কথা ? না-কি মুহিবকে বলবে ? মুহিবের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা লাগছে। মুখের দিকে তাকাতেও লজ্জা লাগছে। মুহিবকেও অন্য রকম লাগছে। ও আচ্ছা এখন বোঝা গেল— বাবু চুল কেটেছেন। নতুন হেয়ার স্টাইল।

বজলু এগিয়ে এসে বলল, ভাবি, চলুন যাওয়া যাক। ভাবি ডাকটা কী অদ্ভুত শোনাচ্ছে! গা শিরশির করে। অরু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুল। মুহিবের অন্য বন্ধুরা কেউ এখনো তাকে কিছু বলে নি। একজন শুধু তাকে বলেছে— কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্ ভাবি। বলে হাতে একটা গোলাপ ফুল দিয়েছে। ফুলটার দিকে তাকাতেও কেন জানি লজ্জা লাগছে।

গোলাপ ফুল দেয়া মানুষটা বলল, কোথাও বসে এক কাপ চা কিংবা কোল্ড ড্রিংকস খাওয়া যাক। কাছেই একটা ভালো কনফেকশনারী দোকান আছে। যাবে ?

বজলু বলল, না না— স্ট্রেইট আমার বাসায় চল। কেক কেনা আছে। কেক কাটা হবে। রেনুকে চা রেডি রাখতে বলেছি। গাড়িতে উঠ সবাই। গাড়িতে উঠ। মুহিব তুই ভাবিকে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বস। আমরা সবাই পেছনে আছি।

অরুর প্রচণ্ড পানির পিপাসা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে এক গ্লাস পানি খেতে না পারলে সে মরে যাবে। বজলু নামের মানুষটার বাসায় তার যেতে একেবারেই ইচ্ছা করছে না। এমন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে যেখানে একটা মানুষও নেই। খুব নির্জন কোনো জায়গা, যেখানে শুধু সে এবং মুহিব থাকবে। আর কেউ থাকবে না। কেউ না।

বজলুর স্ত্রী রওশন আরাকেও অরুর পছন্দ হলো না। মেয়েটা এক সেকেন্ডের জন্যে না থেমে কথা বলে যাচ্ছে। ক্রমাগত কথা। ছোটাছুটিও করছে অকারণে। এই সামান্য সময়ে

একটা গ্লাস ভেঙেছে, টেবিল ক্লথের ওপর পায়েস ফেলে দিয়েছে। সামান্য চা দেয়া নিয়ে সে যে কথাগুলি বলল তা হচ্ছে—

ও মা। এখনো চা দিলাম না। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধহয়। ঠাণ্ডা হলে ঠণ্ডা চা খেতে হবে। আমি আবার গরম করতে পারব না। সারাক্ষণ চুলার পাশে বসে থাকলে গল্প করব কখন ? চায়ে কিন্তু চিনি দেই নাই। যার যার দরকার নিয়ে নেবেন। সরি সরি, চিনি বোধহয় দেয়া হয়েছে। আগে চেখে দেখবেন। এখানে ডায়াবেটিসওয়ালা কেউ আছে ? থাকলে আওয়াজ দিন। আর শুনুন, চায়ের কাপে সিগারেট ফেলবেন না। চায়ের কাপে সিগারেট ফেললে ঐ চা জোর করে খাইয়ে দেব। মাই গড, চামচ দেয়া হয় নি।

মুহিব অরুকে বলল, একটু বারান্দায় এসো তো।

অরু বারান্দায় এসে ক্লান্ত গলায় বলল, সবাই এত কথা বলছে— আমার একেবারে মাথা ধরে গেছে।

এরা বেশিক্ষণ থাকবে না, চলে যাবে। তুমি কি কিছুক্ষণ রেস্ট নেবে ? রেস্ট নিতে চাইলে পাশের ঘরে চলে যাও— তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে শরীর খারাপ করেছে।

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আর শুধু পানির পিপাসা হচ্ছে। তিন গ্লাস পানি খেয়েছি তবু পিপাসা মিটছে না।

মাথা ধরা কি খুব বেশি ?

হুঁ।

দাঁড়াও, প্যারাসিটামল এনে দিচ্ছি। শোন অরু, আমাকে ঘণ্টা খানিকের জন্যে একটু বাইরে যেতে হবে।

অরু হকচকিয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, কেন ?

আমার দুলাভাই বলে রেখেছেন যেন ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর কথা তো তোমাকে বলেছি— দেখা না করলে— স্ট্রেইট বলবে, বের হয়ে যাও।

অরু দুঃখিত গলায় বলল, আজকের দিনটা তুমি আলাদা রাখতে পারলে না ? বলতে পারলে না যে তোমার কাজ আছে ?

মুহিব অস্পষ্ট স্বরে বলল, না অরু, বলতে পারি নি। দুলাভাইকে এটা বলা সম্ভব না। তাছাড়া আমার ক্ষীণ সন্দেহ কি জান ? চাকরির কোনো ব্যাপার। উনি হয়তো কিছু ব্যবস্থা করেছেন ! ইচ্ছা করলে তো তিনি পারেন। তুমি ঘণ্টা খানিক থাক, আমি চলে আসব।

এই বাড়িতে আমার এক সেকেন্ডও থাকতে ইচ্ছা করে না। তোমার বন্ধুপত্নীকে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

ও কিন্তু খুব ভালো মেয়ে অরু। কথা বেশি বলে। কিন্তু মেয়ে চমৎকার। আমার একটা জেনারেল অবজারভেশন কি জান ? যারা কথা বেশি বলে তারা মানুষ ভালো হয়। যাও, তুমি ভেতরে গিয়ে বস। এক ঘণ্টার বেশি আমি এক সেকেন্ডও দেরি করব না। অনেস্ট।

এক ঘণ্টার বেশি আমাকে যদি এ বাড়িতে থাকতে হয়— আমি দমবন্ধ হয়ে মারা যাব— ঐ মহিলাটিকে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

কথা শেষ হবার আগেই বারান্দায় রওশন আরাকে দেখা গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, কাজ-কারবার এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ? সারা রাত তো ভাই পড়েই আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভালো বাসাবাসি না করলে হয় না ?

অরুর অসহ্য বোধ হলেও সে হাসার ভঙ্গি করল। এই মহিলা কিছুক্ষণ আগে তাকে ভয়ংকর গা-জ্বালা ধরানোর মতো কিছু কথা বলেছেন। অরুর ইচ্ছা করছিল গলা চেপে ধরতে। রওশন আরা ভালো মানুষের মতো তাকে ডেকে পাশের ঘরে নিয়ে গেছে। গায়ে হাত রেখে কথা বলা শুরু করেছে—

এই দেখ ভাই তোমাদের বাসর ঘর। পছন্দ হয় কি না দেখ।

অরুর পছন্দ হলো। ঘরটা আসলেই সুন্দর করে সাজানো। বালিশের ওয়্যার এবং বিছানার চাদর হালকা গোলাপি। গোলাপি চাদরে বেলী ফুল এবং গোলপ দিয়ে নানান রকমের নক্‌শা করা। খাটের পাশে সাইড টেবিলে ফুলদানী ভর্তি গোলাপ। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা টেবিলে পানির জগ এবং গ্লাস। একটা ফ্লাক্স এবং চায়ের কাপও দেখা যাচ্ছে। ঘরের চার কোণায় চারটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে।

অরু ভাই শোন, প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছি। বাসররাতে ঘর কখনো অন্ধকার করতে নেই। এই জন্যেই প্রদীপ। প্রদীপ নেভাবে না। ভয়ের কিছু নেই, তোমারা কী করছ বা করছ না আমরা দেখতে আসব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে— ফ্লাস্কে চা আছে, টিফিন বক্সে কেক, বিসকিট এবং লাড্ডু আছে। গল্প করতে করতে রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ক্ষিধে পেয়ে যাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমাদের কী হয়েছে শোন— এমন ক্ষিধে পেয়ে গেল। হি-হি-হি। পেটের ক্ষিধে কি আর চুমু খেলে মিটে ? কি ভাই ঠিক না ? তোমাদের জন্যে এই কারণেই সব খাবার-দাবার দিয়ে দিয়েছি। সবচে' ইম্পর্টেন্ট জিনিস রেখেছি তোমাদের তোষকের নিচে। ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কী বল তো ?

জানি না।

বিয়ের রাতেই তুমি নিশ্চয়ই প্রেগনেন্ট হতে চাও না ? যাতে না হতে হয় সেই ব্যবস্থা। এটাও ভাই আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। এখন তুমি আমাকে অসভ্য ভাবছ। পরে আমাকে থ্যাংকস দেবে। বুঝলে ?

অরু কোনো কথা বলে নি। কথা বলতে ইচ্ছে করে নি। মুহিব যে একটা ঘণ্টা থাকবে না সেই এক ঘণ্টা তার কী করে কাটাবে ভেবেই অস্থির লাগছে। তাছাড়া মাথা ধরাটা বাড়ছে। নির্ঘাৎ জ্বর এসে গেছে। বমি বমি ভাবও হচ্ছে।

মুহিব তার দুলাভাই ইস্ট এশিয়াটিক লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার শফিকুর রহমান সাহেবের ঘরের দরজা ফাঁক করে মাথা ঢোকাল।

শফিকুর রহমান বললেন, অপেক্ষা কর। আমি তোমাকে ডাকব। বলেই তিনি হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাতটা পাঁচ বাজে। মুহিবকে সাতটায় আসতে বলেছিলেন। সে পাঁচ মিনিট দেরি করে এসেছে।

শফিকুর রহমান সাহেবের এই অফিস ঘরটি বেশ জমকালো। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। বিশাল আকৃতির সেক্রেটারিয়েট টেবিলে তিনটা টেলিফোন। একটা টেলিফোনের রঙ লাল। মনে হয় কোনো মিনিস্টারের ঘর। এয়ার কুলার আছে। এই

শীতেও এয়ার কুলার চালু করা। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে। মাথার ওপর খুব আস্তে ফ্যান ঘুরছে। শফিকুর রহমান মাঝে মাঝেই রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত অফিস ঘরে থাকেন।

তিনি মানুষটা ছোটখাট তবে তাঁকে দেখলেই মনে হয় ঈশ্বর এ-জাতীয় মানুষদের একজিকিউটিভ বস বানানোর জন্যে বিশেষ করে তৈরি করেছেন। তাঁদের গলার স্বর এয়ার কুলারের হাওয়ার মতই শীতল। মেজাজও শীতল, তবে সেই শীতল মেজাজের সামনে এসে দাঁড়ালে বুকের রক্তও শীতল হয়ে যায়।

ঠিক সাতটা কুড়ি মিনিটের সময় শফিকুর রহমান বেল টিপলেন। মুহিব দরজা খুলে ঢুকল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, তোমাকে ডাকি নি, তুমি বস। যথাসময়ে ডাকব। বেয়ারাকে ডেকেছি চা দেবার জন্যে।

একটা কাজ ছিল দুলাভাই।

আমিও তোমাকে কাজেই ডেকেছি। অকাজে ডাকি নি। অপেক্ষা কর।

মুহিব ঘর থেকে বের হয়ে ওয়েটিং রুমে বসল।

শফিকুর রহমান তাঁকে কফি দেয়ার নির্দেশ দিয়ে টেলিফোন নিয়ে বসলেন। বিদেশের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের জন্যে এই সময়টাই উত্তম। কিছু জরুরি ট্রানজেকশন টেলিফোনের মাধ্যমেই হবে। এলসি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে।

রাত আটটায় মুহিব আবার উঁকি দিল। ক্ষীণ গলায় ডাকল, দুলাভাই। শফিকুর রহমান ফাইল দেখছিলেন। ফাইল থেকে চোখ তুললেন না। মুহিব বলল, আমার খুব জরুরি একটা কাজ ছিল।

শফিকুর রহমান শীতল গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে বলেই তোমাকে আসতে বলেছি। গসিপ করার জন্যে ডাকি নি। তারপরেও তুমি যদি মনে কর তোমার কাজ অসম্ভব জরুরি তাহলে চলে যেতে পার। তোমাকে বেঁধে রাখা হয় নি।

তিনি টেলিফোন তুলে ডায়াল করা শুরু করলেন। মুহিব ফিরে গেল আগের জায়গায়। তার মুখে থুথু জমতে শুরু করেছে, অসম্ভব রাগ লাগছে। ইচ্ছা করছে পুরো অফিসটা পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে দিতে। তার সামনেই এসট্রে তবু সে ইচ্ছে করে কার্পেটে সিগারেটের ছাই ফেলছে।

অফিস অ্যাটেনডেন্ট রফিক মিয়ার অবস্থাও তার মতো। সাহেব অফিসে আছে বলে সেও যেতে পারছে না। শুকনো মুখে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে। কিছু করার নেই বলেই বোধহয় মুহিবকে এসে জিজ্ঞেস করল, এই বৎসর শীত কেমন বুঝতেছেন স্যার ? মুহিব কোনো কথা বলল না। যদিও তার বলতে ইচ্ছা করছে— কাছে আস রফিক মিয়া, তোমার গালে একটা চড় দেই। চড় খেলে বুঝবে শীত কত প্রকার ও কী কী ?

মুহিবের ডাক পড়ল রাত দশটায়। শফিকুর রহমান হাই তুলতে তুলতে বললেন, সরি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। তোমাকে কি কফি দেয়া হয়েছে ?

জ্বি।

দাঁড়িয়ে আছ কেন বোস।

মুহিব বসল। মনে মনে বলল, আপনাকে আমি কোনো কালেই পছন্দ করি নি। ভবিষ্যতে কখনো করব, সেই সম্ভবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। আপনি অতি কুৎসিত একটি প্রাণী।

মাকড়সা দেখলে মানুষের যেমন গা ঘিনঘিন করে— আপনাকে দেখলেও আমার অবিকল সেই রকম গা ঘিনঘিন করে। এখন আপনাকে দেখাচ্ছে একটা মাকড়সার মতো। মেয়ে মাকড়সা। যে পেটে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মুহিব।

জ্বি।

তোমাকে চিটাগাং যেতে হবে।

মুহিবের গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বুক ধক ধক করতে লাগল। মনে হচ্ছে মাকড়সাটা এখন বলবে— আজ রাতেই যেতে হবে। তূর্ণা নিশীথায়।

মুহিব চাপা গলায় বলল, কখন যেতে হবে ?

দি আর্লিয়ার, দি বেটার। ভোরের ট্রেনে যেতে পার। কিংবা দুপুরের দিকে যেতে পার। দুপুরে অফিসের একটা গাড়ি চিটাগাং যাবে। যেটা তুমি প্রেফার কর। তোমার জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কী চাকরি বেতন কত সব চিটাগাং গেলেই জানবে। টেলিফোনে কথা বলে রেখেছি। আজ দুপুরেই কনফার্ম করা হয়েছে। ছয় সাত হাজার টাকা বেতন হবার কথা। তারচে' বেশিও হতে পারে। সবচে' যেটা ভালো সেটা হচ্ছে— কোয়ার্টার আছে। যতদূর শুনেছি ভালো কোয়ার্টার। বিদেশে ট্রেনিং-এর সুযোগ পাবে। সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অল্প সময়ে ভালো উন্নতি করবে।

মুহিবের হৃৎপিণ্ড এমন লাফাচ্ছে যে মনে হচ্ছে গলা দিয়ে বের হয়ে আসবে। গলার ফুটো ছোট বলে বেরুতে পারছে না। এটা স্বপ্ন দৃশ্য নয়তো ? চেয়ারে বসে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দৃশ্য খুব বাস্তব হয়। দুলাভাই তার দিকে তাকিয়ে আছেন। স্বপ্ন দৃশ্য হলেও এই মানুষটাকে ধন্যবাদসূচক কিছু বলা উচিত। মুহিব ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, থ্যাংকস দুলাভাই!

আমাকে থ্যাংকস দেবার দরকার নেই। তুমি আমাকে পছন্দ কর না তা আমি জানি। আমিও যে তোমাকে পছন্দ করি তাও না। যাই হোক, কাজকর্ম ঠিকমতো করবে। রেসপনসিবিলিটি নামক ব্যাপারটি আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, এখন তাহলে যাও।

মানুষটাকে এখন আর মাকড়সার মতো লাগছে না— বরং সুন্দর লাগছে। সুন্দর!

ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা খেয়ে কপালের একটা অংশ ফুলে গেল। ব্যথা লাগছে। এটা তাহলে স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে শারীরিক ব্যথা বোধ থাকে না।

মুহিব আশঙ্কা করছিল রাত এগারোটায় সে যখন উপস্থিত হবে অরু অসম্ভব রাগ করবে। কেঁদে-টেঁদে একাকার করবে। সে-রকম কিছু হলো না। অরু হাসিমুখে বলল, আমি ভাবলাম তুমি পালিয়ে গেছ, প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। এসো খেতে বসি। আদর্শ বাঙালি স্ত্রীদের মতো না খেয়ে বসে আছি।

মুহিব বলল, ওরা কোথায় ?

অরু হাসতে হাসতে বলল, তুমি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই তোমার অন্য বন্ধুরা চলে গেল। তারপর মজার একটা ব্যাপার হলো— তোমার প্রিয় বন্ধু বজলু এবং রওশন আরা

ভাবি অকারণে তুমুল ঝগড়া শুরু করলেন। সে এক দেখার মতো দৃশ্য! আমি হতভম্ব। এত অল্প সময়ে ঝগড়া ক্লাইমেক্সে চলে যেতে পারে তা আমার জানা ছিল না। রওশন আরা ভাবি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি থাকব না তোমার সঙ্গে। তোমার বন্ধু বললেন, আমি কি নাইলনের দড়ি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রেখেছি ? গো এওয়ে। তুমি চলে গেলে আমি প্রাণে বেঁচে যাই। তুমি আমার লাইফ হেল করে দিয়েছ। তারপরই ভাবি উল্কার বেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি তোমার বন্ধুকে বললাম, আপনি দেখছেন কী— উনাকে আটকান।

বজলু সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, আমি আটকাব কেন ? আমার কীসের দায় ? আপদ বিদেয় হয়েছে ভালো হয়েছে। তার আধ ঘণ্টা পরই বজলু সাহেবের মাথা ঠাণ্ডা হলো। উনি নরম গলায় বললেন, আমার মিসটেক হয়েছে। খুই খারাপ লাগছে। কী করা যায় বলুন তো ? ও গেছে তার ভাইয়ের বাড়ি, নিয়ে আসি— কী বলেন ? আমি কিছু বলার আগেই উনিও উল্কার মতো বের হয়ে গেলেন। সেই থেকে আমি একা বসে আছি।

সে-কী! আর কেউ নেই ?

একটা কাজের মেয়ে আছে। সে বলল, সপ্তাহে এই ঘটনা দু' থেকে তিনবার হয়। সাধারণত হয় সন্ধ্যার দিকে। বেগম সাহেব তার ভাইয়ের বাসায় চলে যান। সাহেব যান তাঁর পিছু পিছু। রাত বারোটা-একটার দিকে ভাই গাড়ি করে দুজনকে পৌছে দিয়ে যান।

তার মানে কি এই যে এ-বাড়িতে আমরা এখন মাত্র দু'জন ?

কাজের মেয়েটি আছে।

সে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। কোনো কাজকর্ম না থাকলে এরা অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

অরু হাসতে হাসতে বলল, ও ঘুমুচ্ছে। দাঁড়াও ওকে ডেকে দিচ্ছি, খাবার গরম করুক।

ডাকতে হবে না। খাবার যা গরম করার তুমি কর। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ডিরেকশন দেব। তোমার মাথা ধরা সেরেছে ?

হুঁ। ঘর ফাঁকা হওয়া মাত্র মাথা ধরা চলে গেল।

অরু রান্নাঘরে ঢুকল। অরুর পেছনে পেছনে গেল মুহিব। অরু থালা-বাসন, হাঁড়ি-কুড়ি এমনভাবে নাড়ছে যেন এই রান্নাঘর তার দীর্ঘদিনের চেনা। তার নিজেরই যেন বাড়িঘর। মুহিব বলল, একটা থালায় খাবার গরম করে দাও— রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই খেয়ে ফেলি।

অরু বলল, একসেলেন্ট আইডিয়া!

মেনু কী ?

পোলাও-টোলাও করে হুলস্থুল করেছেন।

মুহিব বলল, নিজেরা বোধহয় না খেয়ে আছে।

অরু প্লেটে খাবার বাড়তে বাড়তে বলল, বিয়ের রাতে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। শুধু জানতে চাচ্ছি কী মনে করে তুমি এত দেরি করলে ?

ইচ্ছা করে করি নি।

ইচ্ছা করে যে কর নি তা অনুমান করতে পারছি। তোমার দুলাভাই তোমাকে আটকে ফেলেছিলেন, এই তো ব্যাপার ? তুমি তার হাত থেকে বের হয়ে আসতে পারলে না। একটি রাতের জন্যে কি এই সাহস দেখানো যেত না ?

মুহিব বলল, তুমি কিন্তু ঝগড়ার সুরে কথা বলা শুরু করেছ। আজ ঝগড়া করলে সারাজীবন ঝগড়া হবে। এসো— আজ রাতটা হেসে হেসে পার করে দি। আমি এগারোটা হাসির গল্প রেডি করে রেখেছি। শুনবে আর হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়বে। এগারোটা গল্পের মধ্যে পাঁচটা ভদ্র গল্প আর ছ'টা হচ্ছে মিড নাইট স্পেশাল। রাত বারোটার পর বলা যায়।

অরু বলল, খবরদার কোনো অশ্লীল গল্প চলবে না। অশ্লীল গল্প বললে আমি কিন্তু খুব রাগ করব।

পৃথিবীর সবচে' মজার গল্পগুলি হচ্ছে অশ্লীল গল্প।

আমি পৃথিবীর সবচে' মজার গল্পগুলি শুনতে চাচ্ছি না। তুমি বরং কম মজার গল্পগুলি বলো। এখনি শুরু কর। তার আগে জানতে চাচ্ছি কপাল ফাটালে কী করে ?

মুহিব বলল, দুঃখে মানুষের কপাল ফাটে, আমারটা ফেটেছে আনন্দে। পরে তোমাকে গুছিয়ে বলব, এখন শোন স্টোরি নাম্বার ওয়ান। স্যার ক্লাসে পড়াচ্ছেন। শের শাহ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। এক ছাত্র তাই শুনে অবাক হয়ে বলল, সে-কী স্যার! শের শাহ্‌র আগে কি ঘোড়া ডাকতে পারত না ?

অরু হাসতে হাসতে বিষম খেল। হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে কাজের মেয়েটি উঠে এসেছে। সে দুজনকে রান্নাঘরে দেখে বেশ অবাক হলো। অরু বলল, এ্যাই শোন, তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে। তোমার ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়। থালা-বাসন কিছু ধুতে হবে না। আমি দরজা-টরজা খুব ভালোমতো বন্ধ করে ঘুমুতে যাব।

মুহিব বলল, সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না— দ্বিতীয় গল্পটি শোন। রোগশয্যায় শায়িতা স্ত্রী কাঁদো কাঁদো গলায় স্বামীকে বলেছে, আমি জানি আমি মারা গেলেই তুমি বাঁচ, তাই না ?

স্বামী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, এমন নির্মম সত্য কথা এভাবে বলতে নেই লক্ষ্মী সোনা। একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর।

অরু এই গল্পে হাসল না। বিরক্ত স্বরে বলল, মেয়েদের ছোট করা হয় যেসব গল্পে সেসব শুনতে আমার ভালো লাগে না।

এই গল্পে কোথায় মেয়েদের ছোট করা হলো ?

ছোট করা হয়েছে। তুমি বুঝবে না।

কোথায় ছোট করা হয়েছে বুঝিয়ে বল। আমি একটা সহজ রসিকতা করলাম। এখানে মেয়েদের কোথায় ছোট করা হলো— ?

অরু বলল, আলাপ-আলোচনা আবার কিন্তু ঝগড়ার দিকে টার্ন নিচ্ছে।

আমি মজার কিছু গল্প বলার চেষ্টা করছি। তুমি যদি সেগুলি ঝগড়ায় নিয়ে যাও আমি কী করব ?

গল্প বলা বন্ধ করে চল ঘুমুতে যাই। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

মুহিব বলল, আজ তো ঘুমানোর কথা না। পৃথিবীতে এমন কোনো স্বামী-স্ত্রী পাবে না যারা বাসর রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে।

অরু বলল, আমরা তাহলে হব ব্যতিক্রম। আমরা বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ব। এক ঘুমে রাত কাবার করে দেব।

আমি তোমাকে এক সেকেন্ডের জন্যেও ঘুমুতে দেব না। দরকার হলে গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেব।

দ্যাট রিমাইন্ডস মি। শোবার ঘরে তুমি কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারবে না। ফুলের গন্ধে ঘর ম ম করছে। তুমি সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর দুর্গন্ধ করে ফেলবে তা হতে দেব না। দয়া করে সিগারেট যা খাওয়ার এই রান্নাঘরে খেয়ে যাও। আর গা থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে দাও। আমি এখন এটা পোড়াব।

সত্যি পোড়াবে ?

হ্যাঁ, সত্যি। খোল। এক্ষুণি খোল।

কী পাগলামি করছ !

কোনো পাগলামি করছি না। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আমি তোমার পাঞ্জাবি পোড়াবই। এটা হবে আমাদের জীবনের একটা ইন্টারিস্টিং ঘটনা। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে— বাসর রাতে কী করেছ ? আমি বলব, স্বামীর পাঞ্জাবি পুড়িয়ে ছাই বানিয়েছি।

যে পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করেছি সে পাঞ্জাবি আমি পোড়াতে দেব না। যত্ন করে তুলে রাখব। আমার ছেলে এই পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করতে যাবে।

পাঞ্জাবি পোড়ানো হলো না। তারা এক সঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকল। অরু বলল, তুমি শুয়ে পড়, আমি শাড়ি পাল্টে আসছি। সিল্কের শাড়ি পরে আমি ঘুমুতে পারব না। রওশন আরা ভাবির কাছ থেকে আমি একটা সুতির শাড়ি রেখে দিয়েছি।

মুহিব বলল, শাড়ি পাল্টে আসতে চাচ্ছ আস, কিন্তু খবরদার ঘুমের নাম মুখে আনবে না। সারারাত জেগে থাকতে হবে।

আচ্ছা যাও সারারাত জেগে থাকব।

হাই তুলতে পারবে না এবং বলতে পারবে না যে ঘুম পাচ্ছে।

আচ্ছা বাবা যাও বলব না।

শাড়ি পাল্টে এসে অরু দেখে মুহিব ঘুমুচ্ছে। গাঢ় ঘুম। অরু তাকে জাগাল না। মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অসংখ্যবার বলল, আমি তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি তা তুমি কোনো দিনও জানবে না। তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে আজ এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী মেয়ে কেউ নেই। তার চোখে পানি এসে গেল।

ঘরের চার কোণায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। ফুলের গন্ধে বাতাস সুরভিত। শেষ রাতে আকাশে চাঁদও উঠল। প্রদীপের আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে নতুন এক ধরনের আলো তৈরি হলো। অরুর ইচ্ছা করছে ঘুম ভাঙিয়ে মুহিবকে এই অদ্ভুত আলো দেখায়। কিন্তু বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আহা ! বেচারা ঘুমাক। অরুর জেগে থাকার কথা, সে জেগে থাকবে।

২

শফিকুর রহমান বাড়ি ফিরলেন রাত সাড়ে দশটায়।

সাড়ে দশটা হচ্ছে তাঁর বাড়ি ফেরার শেষ লিমিট। এপার্টমেন্ট হাউস। এগারোটার সময় কলাপসেবল গেট বন্ধ হয়ে যায়। যারা গভীর রাতে বাড়ি ফেরে তাদের স্ত্রীদের চাবি হাতে বসে থাকতে হয়। শফিকুর রহমান তাঁর স্ত্রী জেবাকে এই ঝামেলা পোহাতে দেন না। তিনি আরো কিছু কাজ করেন যা স্ত্রীরা পছন্দ করেন, যেমন উঁচু গলায় কখনো জেবার সঙ্গে কথা বলেন না। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তাঁর কোনো খুঁতখুঁতানি নেই। রান্না কেমন হলো, ভালো না মন্দ তা নিয়ে কথা বলা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। রাতে শোবার আগে একটা সিগারেট খান, তাও বারান্দায়। ঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার করেন না।

শফিকুর রহমান ঘরে ঢোকা মাত্র জেবা বলল, মুহিব সেই যে সকালে বাসা থেকে বের হয়েছে এখানো ফেরে নি। খুব চিন্তা লাগছে।

তিনি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন, চিন্তা লাগার কী আছে। ও তো কচি খোকা নয়।

কোনো খোঁজ না দিয়ে সারাদিন বাইরে। আমার খুব অস্থির লাগছে।

শফিকুর রহমান বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। তিনি স্ত্রীর অস্থিরতা কমাতে বলতে পারতেন— মুহিব ভালোই আছে। দেখা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তা বললেন না। অকারণ অস্থিরতা তার ভালো লাগে না। জেবার অনেক কিছুই তাঁর ভালো লাগে না। তা তিনি প্রকাশ করেন না। তিনি ঝামেলাবিহীন সংসার পছন্দ করেন। অফিসে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়। সংসার ঝামেলাশূন্য হওয়া সে জন্যেই এত দরকার। নিজের বিরাট বাড়ি ছেড়ে তিনি এপার্টমেন্ট হাউসে উঠে এসেছেন ঝামেলা কমানোর জন্যে। ছোট্ট সংসার, ছবির মতো গোছানো এপার্টমেন্ট থাকবে। কাজের লোক বা বাড়তি লোকের যন্ত্রণা থাকবে না। বাড়তি মানুষের যন্ত্রণা তাঁকে বলতে গেলে প্রায় সারাজীবন সহ্য করতে হয়েছে। মুহিব আছে তাঁর বিয়ের পর থেকেই। নিজের বাড়িতে যখন ছিলেন মুহিবের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ে নি। এখানে চোখে পড়ছে। তার মেয়ে 'সারা'-কে নিয়ে সে যেসব আহ্লাদী করে তাও তাঁর পছন্দ নয়। পরশু রাতে অফিস থেকে ফিরে দেখেন বারান্দায় মুহিব লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার সমস্ত শরীরে সাদা চাদর পেঁচানো। সারা বারান্দায় টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে কাঁপছে।

তিনি বললেন, কী ব্যাপার সারা ?

সারা বলল, মামা কুমীর সেজেছে। কী ভয়ংকর তাই না বাবা ?

একজন বয়স্ক মানুষ বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে— এই ধারণাটাই তাঁর কাছে রুচিকর মনে হয় নি। তার ওপর দশ বছরের একটা বাচ্চাকে ভয় দেখানোরও কোনো মানে হয় না।

শফিকুর রহমান বাথরুম থেকে বের হয়ে সরাসরি খাবার টেবিলে চলে গেলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বলরেন, সারা খেয়েছে ?

হ্যাঁ।

তিনি লক্ষ করলেন শুধু তাকেই প্লেট দেয়া হয়েছে। জেবা খেতে বসে নি। ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা। দুপুরে তিনি বাসায় খান না। রাতে একবেলা খান। সঙ্গত কারণেই আশা

করেন রাতে জেবা তাঁর সঙ্গে খেতে বসবে।

জেবা বলল, কী যে দুশ্চিন্তা লাগছে! সকালে হঠাৎ আমাকে বলল, আপা আমাকে তুমি...

জেবা কথা শেষ করল না। কারণ তার মনে হলো মানুষটা কিছু শুনছে না। জেবা বলল, আর এক চামচ ভাত দেই ?

শফিকুর রহমান বললেন, আরেক চামচ ভাত লাগলে আমি নিয়ে নেব। তোমাকে দিতে হবে না।

খাওয়া শেষ করে তিনি মেয়েকে দেখতে গেলেন। মেয়েটার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলে ভালো লাগত। কথা বলা যাবে না। সারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। দশটার পর সে এক সেকেন্ডও জেগে থাকতে পারে না।

শফিকুর রহমান ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাতেই সারা বিছানায় উঠে বসল। কোমল গলায় বলল, কেমন আছ বাবা ?

ভালো আছি মা। তুমি ঘুমাও নি ?

উহুঁ। ঘুম আসছে না।

দুপুরে ঘুমিয়েছিলে ?

না।

মশারি তুলে শফিকুর রহমান বিছানায় বসলেন। সারা কেমন গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে আছে। মেয়েটা দেখতে তাঁর মা'র মতো সুন্দর হয় নি। তাঁর মতো হয়েছে। চিবুক, চোখ সবই তার মতো। গায়ের রঙও শ্যামলা। কী ক্ষতি ছিল মেয়েটা যদি তার মা'র গায়ের রঙের খানিকটা পেত।

বাবা !

কী মা ?

তুমি এত গম্ভীর কেন ?

আমি তো সব সময়ই গম্ভীর। তুমি গম্ভীর কেন ?

মামার জন্যে আমার মন খারাপ। মামা আসছে না কেন ?

তোমার মামা একজন বয়স্ক মানুষ। সে যদি সারাদিন নাও আসে তা নিয়ে এত চিন্তার কিছু নেই। আসবে। তাছাড়া আজ রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

ও।

ঘুমুতে যাও মা।

শফিকুর রহমান নিজের ঘরে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ কাগজ পড়লেন। রাতে বারোটার দিকে ঘুমুতে যাবার আগে শেষ সিগারেট খাবার জন্যে বারান্দায় এসে দেখেন জেবা বসে আছে। হাতে কলাপসিবেল গেটের চাবি। ভাইয়ের জন্যে প্রতীক্ষা। এখনো সে না খেয়ে অপেক্ষা করছে। শফিকুর রহমান স্ত্রীকে কিছুই বললেন না।

জেবা একা একা বসে আছে। বারান্দার আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। আধো আলো, আধো আঁধারে একা একা বসে থাকতে অদ্ভুত লাগে। মুহিব আজ সকালে তার কাছে চারশ টাকা চেয়েছিল। সে দিতে পারে নি। সংসারের টাকা তার কাছে থাকে না। বেচারা

কোনোদিন তার কাছে টাকা-পয়সা কিছু চায় নি। আজই চেয়েছিল— সে দিতে পারে নি। জেবার চোখ ভিজে উঠেছে। এই ভাইটি তার বড়ই আদরের।

৩

রাগে 'হাত কামড়াতে' ইচ্ছা করছে। এই বাগ্‌ধারা কার সৃষ্টি কে জানে! মুহিবের এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এরচে' সঠিক বাগধারা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। সত্যি সত্যি তার হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। চিটাগাং যাবার জন্যে তৈরি হয়ে সে ভোর আটটায় চলে এসেছে। কারণ তার দুলাভাই মানুষটি অফিসে আসেন কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। অফিসে এসে তিনি যেন দেখেন মুহিব উপস্থিত আছে। এই কারণেই মুহিব ছুটে এসেছে অরুর কাছ থেকে। ঠিকমতো বিদায়ও নেয়া হয় নি। কেন সে চিটাগাং যাচ্ছে, কবে ফিরবে কিছুই বলা হয় নি। তার চেয়েও বড় কথা সে অরুকে বাসায় একা ফেলে এসেছে। বজলু এবং তার স্ত্রী ফেরে নি। ওদের ব্যাপারটা কী সেই খোঁজও নেয়া হয় নি। চলে আসবার সময় গরম চায়ের কাপে ফুঁ দিতে দিতে শুধু বলেছে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে দু'দিন পরে। এই দু'দিন আমি কোথায় যাচ্ছি কী করছি কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

অরু বলেছে, জিজ্ঞেস করব না। ফর গডস সেক এইভাবে চা খেও না। মুখ পুড়বে।

মুখ অলরেডি পুড়ে গেছে। উপায় নেই। সকাল আটটার আগে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। শোন অরু, আমি যদি পিরিচে ঢেলে চা-টা খাই তাহলে কি তোমার সূক্ষ্ম রুচিবোধ খুব আহত হবে?

হবে। তবে আজকের জন্যে অনুমতি দেয়া গেল। পিরিচে ঢেলেই খাও।

মুহিব পিরিচে চা ঢালতে ঢালতে বলল, কাল রাতের ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত।

কোন ব্যাপার?

এত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেও শেষটায় শুয়ে লম্বা ঘুম। বুঝলে অরু, এত আরামের ঘুম আমি কোনোদিন ঘুমাই নি। সরি, ভুল বললাম। আরেকবার ঘুমিয়েছিলাম। এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের পর। অংক খুব খারাপ হয়েছিল। ধরেই নিয়েছিলাম পাস করব না। রেজাল্ট হবার পর দেখি সেকেন্ড ডিভিশন। এমন ঘুম দিলাম! ঘুম ভেঙেছে পরদিন সকাল দশটায়। আনন্দে এবং দুঃখে মানুষের নাকি ঘুম হয় না। আমার মেকানিজম সম্পূর্ণ উল্টো। আনন্দ ও দুঃখ এই দুই ব্যাপারেই আমার ঘুম বেড়ে যায়। বাবার মৃত্যুর কথা কি তোমাকে বলেছি? বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হবার পর বাবাকে হাসপাতালে নেয়া হলো। ভয়াবহ অবস্থা! সবাই ছোটাছুটি করছে। মৃত্যুর আগে আগে বাবা কী মনে করে জানি আমাকে দেখতে চাইলেন। কান্নাকাটি... হুলস্থুল। আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ আবিষ্কার করা হলো— আমি হাসপাতালের বারান্দার বেঞ্চিতে শুয়ে মরার মতো ঘুমুচ্ছি।

অরু বলল, ঘুমের মধ্যে তোমার কি কথা বলার অভ্যাস আছে?

আছে। কথা বলার অভ্যাস আছে, নাক ডাকার অভ্যাস আছে, বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবার অভ্যাস আছে। আরেকটা অভ্যাস খুব ছোটবেলায় ছিল— তোমার সূক্ষ্ম রুচির কারণে বলতে পাচ্ছি না। অভয় দিলে বলি...

বলার দরকার নেই।

বুঝতে পারছ বোধহয় জলঘটিত ব্যাপার।

আহ্ চুপ কর তো। সাতটা একুশ কিন্তু বাজে।

কী সর্বনাশ!

এরকম ছটফট করবে না তো। চুপ করে বস। জলে ভেসে যাক তোমার এপয়েন্টমেন্ট। আই ডোন্ট কেয়ার।

আচ্ছা যাও বসলাম।

এখন বল আমাকে বিয়ে করে তুমি কি সুখী হয়েছ ?

মুহিব হাসতে হাসতে বলল, বিয়ে যে করেছি তাই বুঝতে পারছি না। এখনো তোমাকে প্রেমিকার মতো লাগছে। স্ত্রীর মতো লাগছে না।

কী করলে স্ত্রীর মতো লাগবে ?

একটু ঝগড়া কর তো।

মুহিব হাসছে। শব্দ করে হাসছে। অরুর মনে হলো— এত সুন্দর করে একটা মানুষ কীভাবে হাসে ?

খুব যেদিন তাড়া থাকে সেদিন বেবীটেক্সী পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায় সেই বেবীটেক্সীর স্টার্ট কিছুক্ষণ পর পর বন্ধ হয়ে যায় এবং সেদিন রাস্তায় সবচে' বেশি জাম থাকে।

মুহিবের বেলায় কোনোটাই ঘটল না। সে কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় অফিসে উপস্থিত হলো। সে বেবীটেক্সী থেকে নামার কিছুক্ষণ পরে এলেন শফিকুর রহমান। মুহিবকে যথাসময়ে উপস্থিত দেখে তিনি আনন্দিত হলেন কি-না বোঝা গেল না। শুকনো মুখে বললেন, আমার পি.এ-কে চিঠি টাইপ করতে দিয়েছি। ওর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাও।

জ্বি আচ্ছা।

একটা পিক-আপ যাবে চিটাগাং। ড্রাইভার এলেই রওনা হয়ে যাবে।

জ্বি আচ্ছা।

কাল রাতে কোথায় ছিলে ? বাসায় ফের নি কেন ? তোমার আপা দুশ্চিন্তা করছিল। যেদিন বাসায় ফিরবে না বলে আসবে।

মুহিব তৃতীয়বারের মতো বলল, জ্বি আচ্ছা।

তাকে একটা টেলিফোন করে জানাও যে তুমি ভালো আছ এবং চিটাগাং যাচ্ছ। কী কারণে যাচ্ছ তাও জানাতে পার। সে খুশি হবে।

মুহিব বাসায় টেলিফোন করল না। সবাই খানিকটা দুশ্চিন্তা ভোগ করুক। চাকরি হবার পর সে দেখা করবে। আপাকে সালাম করে বলবে— আপা, তুমি হচ্ছ এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তোমার মতো ভালো মেয়ে এই পৃথিবীতে আগে জন্মায় নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

এই কথাগুলি আপাকে অনেকবার বলতে ইচ্ছা হয়েছে— কখনো বলা হয় নি। এই ধরনের নাটুকে কথা বলা মুশকিল। তাছাড়া নাটুকে কথা শুনে আপা হেসে ফেলে বলতে পারে— এক চড় খাবি।

পিক-আপের ড্রাইভার সকাল দশটায় এসে উপস্থিত হলো। বিরস মুখে বলল, গাড়ির ব্রেকে গণ্ডগোল আছে। ব্রেক ঠিক না করে গাড়ি বের করা যাবে না।

মুহিব বলল, ব্রেক সারাতে কতক্ষণ লাগবে ?

এই ধরেন এক ঘণ্টা। ওয়ার্কশপে না নিলে বুঝব না।

সে যদি বলত ঘণ্টা দুই লাগবে তাহলে বজলুর বাসা থেকে ঘুরে আসা যেত। অরু নিশ্চয়ই এখনো যায় নি। মুহিব বলল, আমরা তাহলে এগারোটার দিকে রওনা হচ্ছি ?

জ্বি।

এক ঘণ্টা সময় কাটানোই সমস্যা। আপাকে একটা টেলিফোন করলে অবশ্যি অনেকটা সময় কাটবে। আপা আধ ঘণ্টার আগে টেলিফোন ছাড়বে না। মুহিব শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্যেই টেলিফোন করল।

আপা ?

জেবা টেলিফোনেই প্রচণ্ড ধমক দিল— কাল রাতে তুই কোথায় ছিলি ? নিচে কলাপসিবল গেট আটকে দেয়, আমি রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চাবি হাতে বসা...

একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

কীসের তোর এত রাজকার্য ? তোর কাজ তো একটাই— টো টো করে শহরে ঘোরা। কাল রাতে না এসে ভালো করেছিস। এলে শক্ত করে গালে চড় বসিয়ে দিতাম। কোথায় রাত কাটিয়েছিস ?

আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায়।

একটা টেলিফোন কি সেখান থেকে করা যেত না ?

গরীব ফ্রেন্ড আপা, ওর টেলিফোন নেই।

ওর নেই, অন্যদের তো আছে। যে-কোনো দোকানে গিয়ে দু'টা টাকা দিলে টেলিফোন করতে দেয়।

একটা ফার্মেসী থেকে টেলিফোন করেছিলাম আপা। লাইন ছিল এনগেজড।

খবর্দার মিথ্যা বলবি না। তুই মিথ্যা কথা বললে আমি টের পাই।

আচ্ছা আপা যাও আর মিথ্যা বলব না। সত্যি কথাই বলছি— কাল বিয়ে করেছি আপা। মেয়ের নাম অরু। হ্যালো আপা, শুনতে পাচ্ছ ? হ্যালো ?

অনেকক্ষণ পর জেবা বলল, তোর কথার ধরনে মনে হচ্ছে সত্যি বিয়ে করেছিস ! আসলে কি করেছিস ?

হুঁ।

আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।

তোমার গায়ে হাত দেব কী করে ? তুমি পাঁচ মাইল দূরে বসে আছ।

বিয়ে তাহলে সত্যি করেছিস ?

হুঁ।

কোর্টে ?

কোর্টে না— কাজির অফিসে।

আমাকে বললে কি আমি ব্যবস্থা করে দিতাম না ?

অবশ্যই দিতে, তবে দুলাভাই তাতে রাগ করতেন। আমি তাঁকে রাগাতে চাই নি।

আর আমি যে রাগ করলাম সেটা কিছু না ?

আমার ওপর তুমি রাগ করতে পারবে না। তোমার পক্ষে তা সম্ভব না।

সম্ভব না কেন ?

কারণ এই পৃথিবীতে যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে তুমি তাদের সবার ওপরে।

আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছিস ?

তা করছি তবে সেই সঙ্গে সত্যি কথা বলছি।

আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তুই বিয়ে করেছিস।

আমার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না।

মেয়েটা দেখতে কেমন ?

মোটামুটি।

মোটামুটি মানে ?

মোটামুটি মানে অসম্ভব সুন্দর।

কালো না ফর্সা ?

মুখটা খুব ফর্সা কিন্তু হাত দু'টি সেই তুলনায় কালো। হাতে মনে হয় ক্রীম-ট্রিম ঘসে না।

হাইট কত ?

কে জানে কত ?

পাশপাশি যখন দাঁড়াস তখন সে-কি তোর কান পর্যন্ত আসে ?

আসে বোধহয়।

তাহলে পাঁচ ফুট তিন। ওজন কত ?

আরে কী মুশকিল! আমি কি তাকে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মেপেছি ?

মেয়েটা আছে কোথায় এখন ?

কেন ?

আমি দেখা করব। বাসায় নিয়ে আসব।

অসম্ভব আপা। মেয়ে গোপনে আমাকে বিয়ে করেছে। এটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে জানাজানি হয়েছে। ওদের বাড়িতে এখন কেয়ামত হচ্ছে।

হোক কেয়ামত। তুই ঠিকানা বল।

ঠিকানা বলতে পারব না আপা। টেলিফোন নাম্বার দিতে পারি। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ছি, ওকে সামলে নিতে সুযোগ দাও। আজ টেলিফোন করবে না।

বেশ করব না। তুই বাসায় চলে আয়।

না আমি এখন বিদেয় হচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবে পরশু। রাখি আপা।

রাখি মানে ? টেলিফোন নাম্বার দে।

মুহিব টেলিফোন নাম্বার দিল। জেবা বলল, মেয়েটার মুখ লম্বা না গোল ?

মুহিব বিরক্ত হয়ে বলল, মুখ লম্বা না গোল তা দিয়ে কী হবে ?

দরকার আছে। গোলমুখের মেয়েরা ভাগ্যবতী হয়।

তোমার মুখ তো গোল। তুমি কি ভাগ্যবতী ?

জেবা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গোলমুখের মেয়েরা ভাগ্যবতী হয়। মাঝে মাঝে একসেপশন হয়। যখন একসেপশন হয় তখনকার অবস্থা ভয়াবহ ...

আপা, আমি আর কথা বলতে পারব না। ড্রাইভার এসে গেছে। আমরা এক্ষুণি রওনা হব।

মেয়েটার গালে কি তিল আছে ? ডান গালে ?

বড় যন্ত্রণা করছ তুমি আপা।

যন্ত্রণা করছি কেন জানিস ? আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম তোর বিয়ে হয়েছে গোল মুখের একটা মেয়ের সঙ্গে। সেই মেয়েটার ডানদিকের গালে তিল।

অরুর ডানদিনের গালে তিল আছে।

সত্যি বলছিস ?

হ্যাঁ সত্যি। আপা এখন আমি যাই। ড্রাইভার ব্যাটা দুলাভায়ের মতো কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

জেবা খিল খিল করে হেসে ফেলল।

মুহিব ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা এখন রওনা হব না-কি ভাই ?

ড্রাইভার বলল, না।

না কেন ?

খাওয়া-দাওয়া করে স্টার্ট করব। চিন্তার কিছু নাই। উড়াইয়া নিয়া যাব।

ভাই আপনার নাম কী ?

মহসিন।

মহসিন সাহেব, উড়ায়ে নেয়ার দরকার নেই। ধীরে-সুস্থে যাবেন।

যে-রকম বলবেন সে-রকম যাব। আপনারে একটা কথা বলি ভাই সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন।

না কিছু মনে করব না, বলে ফেলুন।

আমার কয়েকজন আত্মীয় যাবে চিটাগাং। যদি অনুমতি দেন এরারে গাড়ির পিছনে সিটে বসায়ে নিয়ে যাই।

আমার দিক থেকে কোনে অনুবিধা নেই। শুধু সত্যি কথাটা বলুন এরা আপনার আত্মীয় না-কি ভাড়ার বিনিময়ে কিছু প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছেন ?

মহসিন উত্তর দিল না। হাই তুলল। মুহিব বলল, প্যাসেঞ্জার কোথা থেকে তুলবেন ?

সায়েদাবাদ। বাস স্টেশনের কাছে।

গাড়ি ভর্তি করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে নিন, শুধু লক্ষ রাখবেন আমার বসার জন্য যেন

জায়গা থাকে। গাড়িতে উঠেই ঘুম দেব। সারারাত ঘুমুই নি। ঘুমাতে ঘুমাতে এবং স্বপ্ন দেখতে দেখতে যাব।

ড্রাইভার হেসে ফেলল।

গাড়ি রওনা হলো দুপুর একটায়। মুহিব বসেছে ড্রাইভারের পাশের সিটে। সিটটা ঢালু, বসে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ি ভর্তি মানুষ। দুটি পরিবার মালামাল নিয়ে উঠেছে। হৈ-চৈ, চেঁচামেচি হচ্ছে। সবার জায়গাও হচ্ছে না। ছ'সাত বছরের একটা বালিকা ক্রমাগত বলছে, সামনে বসব, সামনে বসব। বাধ্য হয়ে মুহিবকে বলতে হলো, আস সামনে আস। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে মুহিবকে বসতে হয়েছে। মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে বসেছে। কথাবার্তা এমনভাবে বলছে যেন মুহিব দীর্ঘদিনের পরিচিত।

কী নাম তোমার খুকী ?

আমার নাম লীনা। আমি ক্লাস টুতে পড়ি।

বাহ্!

আমরা এই রকম একটা গাড়ি কিনব।

এত বড় গাড়ি কিনবে ?

এর চেয়েও বড় কিনব। লাল রঙয়ের।

খুব ভালো।

আব্বু কিনে দিবে। আব্বুর অনেক টাকা আছে।

পেছনের সিটে বসা লীনার আব্বু বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, চুপ কর লীনা। বেশি কথা বলে। আব্বু টাকার গাছ পুঁতেছে।

লীনা সাময়িকভাবে চুপ করল। লীনার বাবা মুহিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার একটা সিগারেট খাবেন ? বেনসন আছে।

মুহিব বলল, এখন ইচ্ছা করছে না।

যখন ইচ্ছা করে আমাকে বলবেন। লম্বা জার্নি, সিগারেট ছাড়া হয় না। আমি দশটা বেনসন কিনেছি হা-হা-হা। আর স্যার মেয়ে যদি বেশি বিরক্ত করে চড় দেবেন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বিচ্ছু মেয়ে। সাথে নিয়ে বের হই না। বাধ্য হয়ে ঢাকায় গিয়েছিলাম। আমার ছোট শ্যালকের বিবাহ ছিল। পরিবার নিয়ে যেতে হলো। তিন হাজার টাকা গচ্চা। হাত একেবারে খালি। স্যারের গাড়ি পাওয়ায় রক্ষা হয়েছে।

মুহিব লক্ষ করল লীনার বাবার কথা বলার রোগ আছে। মেয়ে সম্ভবত বাবার কাছ থেকেই কথা বলার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে।

আমার শ্যালক ব্যাংকে কাজ করে। আরব বাংলাদেশ ব্যাংক।

তাই না-কি ?

জ্বি স্যার। আর মেয়ের বাড়ি মেহেরপুর। অবশ্যি এখন তারা ঢাকায় সেটলড্। মেয়ে আপনার এম.এ.পাস।

খুবই ভালো।

লীনা ঘুমিয়ে পড়েছে না-কি একটু দেখেন তো স্যার। ঘুমিয়ে পড়লে মুখের লালায় শার্ট ভিজিয়ে দেবে। একটু কেয়ারফুল থাকবেন স্যার।

গাড়ি প্রায় উড়ে চলছে। মহসিন একের পর এক গাড়ি ওভারটেক করছে। এখন পাল্লাপাল্লি চলছে একটা ট্রাকের সঙ্গে। ট্রাক কিছুতেই সাইড দিচ্ছে না। ট্রাকের পেছনে লেখা 'মায়ের দোয়া'।

৪

অরুদের বাড়ির নাম 'রূপ নিলয়'।

দশ কাঠা জায়গা নিয়ে বেশ বড় বাড়ি। সামনে বাগান আছে। উল্লসিত হবার মতো বাগান না, বরং বিরক্ত হবার মতো বাগান। যে কেউ এই বাগান দেখে ভুরু কুঁচকে বলবে এত সুন্দর জায়গাটাকে গর্ত-টর্ত খুঁড়ে এসব কী করেছে ? আপাতদৃষ্টিতে যেগুলোকে গর্ত বলে মনে হচ্ছে তার কোনোটাই গর্ত নয়— জলাধার। অরুর বাবা জামিল সাহেব এইসব জলাধারের পরিকল্পনা করেছেন, যেখানে ফুটে থাকবে জলপদ্ম। একেকটা জলাধার ঘিরে থাকবে মিনি ফুল বাগান। বাড়ি ঢেকে রাখবে নীল পাতার বাগান বিলাসে। বিশেষ ধরনের আকাশী নীল রঙের বাগান বিলাসের চারা আনানো হলো শ্রীলংকা থেকে। চার বছরের মাথায় পাতা বেরুলে দেখা গেল পাতার রঙ নীল নয় গোলাপি। জামিল সাহেব মালীকে ডেকে বললেন, গাছ তিনটা কেটে ফেল। অরু বলল, সে-কী বাবা! এত বড় গাছ কেটে ফেলবে ? এখন নীল না, পরে হয়তো নীল হবে।

জামিল সাহেব আগের চেয়েও ভারী গলায় বললেন, হয়তো শব্দটা আমি অপছন্দ করি। হয়তো বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। ইয়েস অথবা নো। তুমি যদি বল এই গাছের পাতা অবশ্যই নীল হবে, আমি মালীকে কাটতে নিষেধ করব।

অরু চুপ করে গেল। তিনটা গাছই কেটে ফেলা হলো।

জলপদ্মের বেলাতেও এই ব্যাপার। জলাধারে জলপদ্ম ফুটল না। বিশেষজ্ঞ হর্টিকালচারিস্ট বললেন, পানির গভীরতা কম বলে পদ্ম ফুটছে না। আরো দু'ফুট গভীর করে দিন। তাহলেই হবে।

জামিল সাহেব জলাধার আরো দু'ফুট গভীর করলেন। পদ্ম ফুটল না। হর্টিকালচারিস্টকে আবার ডেকে আনা হলো। তিনি বললেন, বেশি গভীর হয়ে গেছে।

বেশি গভীর হয়েছে ?

জ্বি, অবশ্যই বেশি হয়েছে।

জলপদ্মের বিষয়ে আপনি জানেন তো ?

জানব না মানে ? কী বলছেন আপনি !

আমার ধারণা আপনি একজন মহামূর্খ। জলপদ্ম কেন কোনো পদ্ম সম্পর্কেই আপনি কিছু জানেন না। যেহেতু এটা মূর্খের দেশ সেহেতু করে খাচ্ছেন। আপনি দয়া করে বিদেয় হোন।

জলপদ্ম প্রজেক্ট বাতিল হয়ে গেল। জলাধারের চারপাশে মিনি বাগানের প্রজেক্টও বাতিল। জামিল সাহেব এখন পুরো বাগান নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করছেন। চিন্তা-ভাবনা শেষ হয় নি বলে বাগান শুরু হয় নি। যেহেতু মালী একজন আছে— নিয়মিত বেতন নিচ্ছে, সেহেতু সে এলোমেলোভাবে কিছু গাছ লাগিয়েছে। বেশির ভাগই গোলাপ।

গোলাপ জামিল সাহেবের অপছন্দের ফুল। কিন্তু তাঁর ছোট মেয়ে গোলাপ-পাগল বলে তিনি গাছগুলো এখন পর্যন্ত সহ্য করে যাচ্ছেন।

জামিল সাহেবের বয়স পঁয়ষট্টি। স্বাস্থ্য শুধু যে ভালো তা না অতিরিক্ত রকমের ভালো। দারোগা হয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন, ডিআইজি হয়ে রিটায়ার করেছেন। সারদা পুলিশ একাডেমিতে ট্রেনিং নিতে যাবার আগের দিন তাঁর বাবা নবীগঞ্জ হাইস্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার মুত্তালেব হোসেন তাঁকে নিয়ে বাড়ির পেছনে চলে গেলেন। সেখানে জামিল সাহেবের মায়ের কবর।

মুত্তালেব সাহেব বললেন, তুমি তোমার মায়ের কবর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে চাকরি জীবন সৎ পথে কাটাবে। এমন চাকরিতে ঢুকছ যেখানে সৎ থাকা খুবই কঠিন। প্রতিজ্ঞা কর।

জামিল সাহেব বললেন, প্রতিজ্ঞা করার প্রয়োজন নেই।

জানি প্রয়োজন নেই। তবু কর।

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন। এই প্রতিজ্ঞা রিটায়ার করার দিন পর্যন্ত বহাল রেখেছেন। বেতনের প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করেছেন। রিটায়ার করার পর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে বাড়ি করলেন। দোতলা করার ইচ্ছা ছিল। একতলা করতেই সব শেষ হয়ে গেল। ভাগ্যিস সস্তার সময়ে দশ কাঠা জায়গা কেনা ছিল!

জামিল সাহেবের আর্থিক অবস্থা এখন মোটেই সুবিধার না। সঞ্চয় কিছু নেই। পেনশনের অর্ধেক বিক্রি করে দিয়েছেন বলে প্রতি মাসে যা পান তার পরিমাণ নগণ্য। জামিল সাহেবের স্ত্রী রাহেলা একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই টাকাটা সংসারে লাগে।

মোটামুটি অভিজাত এলাকায় একটি চমৎকার বাড়ি। বাড়ির সামনের বাগান এবং চব্বিশ ঘণ্টা একজন মালী দেখে এই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে-কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে। বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। পরিবারটির অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। জামিল সাহেবের ছোট মেয়ে অরুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। সেই বিয়ে কীভাবে দেয়া যাবে তা জামিল সাহেব ভেবে পাচ্ছেন না। তাঁর মেজাজ খুব খারাপ যাচ্ছে। তাঁর ভয়ঙ্কর মেজাজে বাড়ির সবাই আতংকগ্রস্ত। কারণ মানুষটির এর আগে দু'বার স্ট্রোক হয়েছে। তৃতীয়বারের ধাক্কা সইতে না পারবারই কথা।

অরু রিকশা থেকে খুব ভয়ে ভয়ে নামল।

বাসায় কী হচ্ছে কে জানে! ভয়ংকর কিছু নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিংবা হয়ে গেছে। বাবা খুব সম্ভব হাসপাতালে। মীরু তার ছোট বোনের গোপনে বিয়ে করার খবর বাবাকে দেবে আর তিনি স্বাভাবিক থাকবেন এই আশা দুরাশা মাত্র।

বাড়িতে কাল রাতে কী ঘটেছে তা অরু খুব ভালো কল্পনা করতে পারছে। আপা বিয়েবাড়ি থেকে ফিরল রাত ন'টায়। মা'র সঙ্গে গল্প-টল্প করে রাত দশটায় ঘুমুতে গেল। তখন তার হাতে চিঠি পড়ল। চিঠি পড়ার পর খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকার পর সে একটা বিকট চিৎকার দিল। মা ছুটে এসে বললেন, কী হয়েছে ? সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কিছু না মা— ঘুমাও। মা বললেন, হাতে কার চিঠি ?

মা চিঠি পড়লেন। বাবা পড়লেন। বাবার স্ট্রোক হলো। তাঁকে নিয়ে দুপুর রাতে

সবাই গেল হাসপাতালে। এখানো সবাই হাসপাতালে, কেউ ফেরে নি। এই কারণেই বাড়ি খালি। মালী মতি ভাইকেও দেখা যাচ্ছে না। সকালবেলা খুড়পি হাতে মতি ভাই সব সময়ই বাগানে থাকে। আজ কেন থাকবে না ?

অরু গেট খুলে বাগানে ঢুকল। মতি ভাইকে দেখা যাচ্ছে। ঝাঁঝরি করে পানি নিয়ে আসছে। অরু ভয়ে ভয়ে বলল, মতি ভাই বাসার খবর সব ভালো ?

মতি বলল, হ।

তার মানে সে কিছুই জানে না। মতিকে কিছু জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। বাগান ছাড়া সে অন্য কিছু জানে না। জানার আগ্রহও নেই। এ-বাড়ির একটা মানুষ মরে গেলে সে যতটা কষ্ট পাবে তারচে' অনেক বেশি কষ্ট পাবে একটা গোলাপ গাছ মরে গেলে।

মতি ভাই বাসায় কি কেউ নেই ?

আছে। খালি আম্মা গেছে কলেজে।

বাবা আছেন ?

হ।

তার মানে কী ? চিঠি পড়েও বাবা নিজেকে সামলে নিয়েছেন ? অপেক্ষা করছেন তার জন্যে ? বিশ্রী অবস্থাটা এড়াবার জন্যে মা চলে গেছেন বাইরে ?

অরু কলিং বেল টিপল। আজ কলিং বেলটাও যেন অন্য রকম করে বাজছে। কান্নার মতো শব্দ হচ্ছে।

দরজা খুললেন জামিল সাহেব। তাঁর হাতে খবরের কাগজ। তিনি মেয়েকে কিছু না বলে আগের জায়গায় ফিরে গেলেন। অরু ভয়ে ভয়ে বলল, কেমন আছ বাবা ?

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, যেমন সব সময় থাকি তেমন আছি। ভালো থাকার মতো কিছু ঘটে নি, আবার খারাপ থাকার মতো কিছু ঘটে নি। আজকের কাগজ পড়েছিস ?

না বাবা।

মন দিয়ে পড়।

কী আছে কাগজে ?

কী আছে সেটা জানার জন্যেই তো পড়তে বলছি। নে কাগজটা হাতে করে নিয়ে যা।

কাগজ হাতে অরু বাড়ির ভেতর ঢুকল। বোঝাই যাচ্ছে বাবা এখানো কিছুই জানেন না। আপা তাকে বলে নি। বুদ্ধিমতীর মতো চেপে গেছে। মীরু বারান্দায় মোড়ায় বসে ছেলেকে ডিমপোচ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার ফল হয়েছে ভয়াবহ। সারা মুখে, গায়ে, মেঝেতে ডিমের ছড়াছড়ি। মীরু বলল, তুই না বললি দুপুরের দিকে আসবি, এখন চলে এলি যে ?

ভালো লাগছিল না। আপা তুমি কি চিঠিটা পড়েছ ?

কোন্ চিঠি ?

তোমার টেবিলের ওপর একটা চিঠি ছিল না ?

ছিল না-কি ? কই দেখি নি তো। কার চিঠি ?

জবাব না দিয়ে অরু মীরুর ঘরে ঢুকে গেল। চিঠি সরিয়ে ফেলতে হবে। দু'এক দিন

পরে জানালেও কোনো ক্ষতি নেই। ঘুমে তার শরীর ভেঙে আসছে। অরু ঠিক করল গরম পানি দিয়ে সে দীর্ঘ একটা শাওয়ার নেবে। তারপর পর পর দু'কাপ চা খেয়ে টানা ঘুম দেবে। তার আগে অবশ্যি খবরের কাগজটা পড়ে ফেলা দরকার। বাবা জেরা করবেন।

কলম্বোয় একদিনের সার্ক শীর্ষ বৈঠক।

বাকেরগঞ্জ ৫ আসনে আজ ভোট। ত্রিমুখী লড়াই।

সোভিয়েত ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি ইয়েলৎসিনের দখলে।

৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করুন : স্কপ নেতৃবৃন্দ।

বগি লাইনচ্যুত। সাতজন যাত্রী আহত।

হেডিং পড়ার পর আর কিছু পড়তে ইচ্ছা করে না। হেডিং পড়তে গেলেই হাই ওঠে, খবর পড়বে কী !

অরু ময়নার মা'কে গরম পানি করতে বলে আবার বারান্দায় এল। আপা ডিম খাওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন আরেকটা ডিম পোচ দেখা যাচ্ছে। আবীরের মুখের সামনে চামচ ধরে মীরু বলছে— একটু হা কর বাবু। একটু হা কর। আম্মু তোমার লাল টুক টুক ছোট্ট জিভটা দেখতে চায়। আমার বাবুর মতো সুন্দর জিভ এই পৃথিবীতে আর কারোরই নেই।

অরু বলল, কেন যন্ত্রণা করছ আপা ? ছেড়ে দাও না।

নিজের চোখে দেখছিস না স্বাস্থ্যের হাল, তারপরেও বলছিস ছেড়ে দিতে ?

জোর করে খাওয়াবে, তারপর বমি করে সবটা ফেলে দেবে।

ফেলুক। তোর বাচ্চাকে তুই তোর থিওরি মতো মানুষ করিস।

খেতে চাচ্ছে না তবু তুমি জোর করে খাওয়াবে। তোমাকে কেউ জোর করে খাওয়ালে ভালো লাগত ?

তুই আমার সামনে থেকে যা তো।

চিঠির ব্যাপারটা মীরু উল্লেখ করল না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বানিয়ে বানিয়ে একগাদা কথা বলতে হতো। অল্প কথায় মিথ্যা বলা যায় না। সামান্য মিথ্যাও অনেক ফেনিয়ে ফানিয়ে বলতে হয়।

মীরু বলল, কাল বিয়ে বাড়িতে দারুণ মজার একটা ব্যাপার হয়েছে— আমি হাসতে হাসতে...

কী হয়েছে ?

মীরু 'কী হয়েছে' তা বলা বন্ধ রেখে বাবুকে ডিম খাওয়ানোয় ব্যস্ত হয়ে গেল। খাও লক্ষ্মীসোনা, খাও। হা কর। দেখি আমার বাবুর লাল টুকটুকে জিভটা ।

অরু বলল, কাল বিয়ে বাড়িতে কী হয়েছিল ? ওমাগো কী সুন্দর আমার বাবুর ...

দেখছিস না বাবুকে খাওয়াচ্ছি, কেন বিরক্ত করছিস ?

আচ্ছা আচ্ছা আর বিরক্ত করব না।

তুই বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আয় তো। আমার কাছে চা চেয়েছিলেন, আমি বাবুর খাওয়া নিয়ে আটকা পড়ে গেলাম।

ছাড়া পাবে কখন ?

কী জানি কখন! এ তো হা করছে না।

ঠাশ করে একটা চড় দাও। চড় খেলে হা করবে। তখন মুখে ডিম ঢুকিয়ে আরেকটা চড় দাও। ভয় পেয়ে ডিম গিলে ফেলবে।

মীরু কঠিন চোখে তাকাল। অরু চলে গেল রান্নাঘরে বাবার জন্যে চা বানাতে। ময়নার মা চা বানানোর কাজটা ভালোই পারে কিন্তু তার চা বাবা মুখে দেবেন না। তার রান্না করা খাবার খেতে কোনো অসুবিধা নেই, শুধু চা খাওয়া যাবে না।

অরু বাবার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, বাবা চা। জামিল সাহেব চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে আছেন। তিনি চোখ খুললেন না। চোখ বন্ধ রেখেই বললেন— বোস মীরু।

মীরু না বাবা, আমি অরু।

তোকে তো চা বানাতে বলি নি। মীরুকে বলেছিলাম। দায়িত্ব ট্রান্সফার করে দেবার যে বদঅভ্যাস মীরুর হয়েছে তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। তাকে যখন যা করতে বলি তখনি সে তা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এক সেকেন্ড দেরি করে না। কাল তাকে বললাম শার্ট ইস্ত্রি করে দিতে। সে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, মা বাবার শার্ট ইস্ত্রি করে দাও।

বাবুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

তাই দেখছি। তুই বোস।

আমি এখন গোসল করব বাবা। পানি গরম করা হয়েছে, দেরি করলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

গোসল ঠাণ্ডা পানি দিয়েই করতে হয়। শীতকালে গোসল করতে হয় বরফ শীতল পানি দিয়ে।

গরমকালে ফুটন্ত প্যানি দিয়ে ?

গরমকালে লিউকওয়র্ম পানি দিয়ে। খবরের কাগজ পড়তে বলেছিলাম, পড়েছিস ?

হুঁ।

চোখে পড়ার মতো কী পেয়েছিস ?

তেমন কিছু পাই নি।

তোদের সমস্যা কি জানিস ? তোদের সমস্যা হচ্ছে তোরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আশে-পাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে কোনো লক্ষ্য নেই। উৎসাহও নেই। আজকের খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজে একজন কুষ্ঠরোগীর কথা ছাপা হয়েছে। সে আসলে কুষ্ঠরোগী নয়। মেকাপ নিয়ে রোগী সাজত। ফার্মগেটের ওভার ব্রীজে শুয়ে ভিক্ষা করত। সে ধরা পড়েছে। সমস্ত কাগজের ফ্রন্ট পেজে তার ছবি, বিশাল নিউজ।

অরু ক্ষীণ স্বরে বলল, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

জামিল সাহেব কড়া গলায় বললেন, মোটেই ইন্টারেস্টিং নয়। একজন অসহায় মানুষ রোগী সেজে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে সেই খবর দেশের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ হতে পারে না।

তা তো বটেই।

তুই কোনো কিছু না বুঝেই বললি, তা তো বটেই।

গোসল করতে যাই বাবা। পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

জামিল সাহেব জবাব দিলেন না। বিরক্ত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

অরু গোসল শেষ করে এসে দেখল, বাবুর ডিম ভক্ষণ পর্ব শেষ হয়েছে। এখন চলছে দুধপান পর্ব। দুধও ডিমের মতো চামচে করে খাওয়ান হচ্ছে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অরু বলল, আপা একটা কাজ কর, ফুটবলের পাম্পার কিনে আন। তারপর সেই ফুটবল পাম্পারে দুধ ভরে বাবুর মুখে পাম্প করে দাও।

মীরু বলল, এইসব রসিকতা আমার ভালো লাগে না।

তোমার তো এখন পৃথিবীর কোনো কিছুই ভালো লাগে না।

মীরু বলল, তুই সব সময় আমার পেছনে লাগিস না তো অরু, আমার অসহ্য লাগে। আর শোন আজ বিকেলে বাসায় থাকবি— আবরার সাহেব টেলিফোন করেছিলেন। কথার ভঙ্গি দেখে মনে হলো বিকেলে আসবেন।

আসবেন বলেছেন ?

সরাসরি বলেন নি। জিজ্ঞেস করছিলেন তোর কথা। আমি বললাম, বন্ধুর বাড়িতে গেছে। রাতে থাকবে। সেই বন্ধুর টেলিফোন আছে কি-না জিজ্ঞেস করছিলেন।

ও।

তুই আজ বিকেলে বাসায় থাকবি কি-না জানতে চাচ্ছিল। আমি বলেছি থাকবে। আপনি আসতে চাইলে আসুন।

কী বললেন, আসবেন ?

কিছু বলেন নি। আসবেন তো বটেই। তুই বিকেলে বাসায় থাকিস।

আমি বাসায়ই থাকব। যাব আর কোথায় ?

গোসল করে এক কাপ গরম চা খাবার পর অরুর ঘুম কেটে গেল। একটু আগে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল— এখন ঘুম নেই। শরীরে কোনো ক্লান্তিবোধও নেই। সে ঠিক করল, আবরারকে লেখা চিঠিটা শেষ করে ফেলবে। আজ যদি আসনে তাঁকে হাতে হাতে দেবে। না এলে বাসায় গিয়ে দিয়ে আসবে। সে বিয়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বিয়ে হয়ে গেছে আর অপেক্ষা করার কিছু নেই।

অরু দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারে না। অনেক কিছু লেখার জন্যে সে কাগজ-কলম নিয়ে বসে, খানিকটা লেখার পর মনে হয় সব লেখা হয়ে গেল। সেই অর্থে আবরারকে লেখা তার চিঠিটা বেশ দীর্ঘ বলা যেতে পারে। চিঠিতে সম্বোধন নেই। কী সম্বোধন দেয়া যায় অনেক ভেবেও সে বের করতে পারে নি— সুজনেষু, প্রিয়জনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু... কোনোটাই মানায় না। তাছাড়া চিঠি যতটুকু লিখে রেখেছে তার কাছে ভালো লাগে নি। মনে হয় পুরো ব্যাপারটা আরো সুন্দর করে আরো গুছিয়ে লেখা যেত।

> 'আপনি নিশ্চয়ই আমার এই দীর্ঘ চিঠি দেখে আঁৎকে উঠে ভাবছেন, ব্যাপারটা কী ? হাতের লেখা দেখেও নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন। ভাবছেন এই মেয়েটার হাতের লেখা এত বাজে কেন ? এ

জীবনে আমি যত বকা খেয়েছি তার শতকরা ৬০ ভাগ হচ্ছে খারাপ হাতের লেখার জন্যে। এসএসসি এবং এইচএসসি-তে আমি কোনোমতে টেনেটুনে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি। আমার ধারণা, আমি আরো ভালো করতাম। একজামিনাররা হয়তো আমার হাতের লেখা পড়তেই পারে নি। আপনিও পড়তে পারছেন কি-না জানি না। পুরো চিঠি যদি না পড়েন তাহলে একজামিনারদের মতো আপনিও আমাকে অনেক কম নম্বর দেবেন। দয়া করে পড়ুন।

বুধবার আমার বিয়ে হবার কথা। আজ সোমবার। বিয়ের এখনো দু'দিন দেরি। আমি ঠিক করে রেখেছি চিঠি শেষ করে রাখব, আপনাকে দেব না। আপনাকে দেয়া হবে বিয়ের এক দিন পর। যেহেতু আপনি এখন চিঠি পড়ছেন আপনি ধরে নিতে পারেন যেদিন বিয়ে হবার কথা ছিল সেদিনই হয়েছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আপনার তুলনায় সে অতি নগণ্য মানুষ। এম.এ. পাস করেছে— কোনোমতে একটা সেকেন্ড ক্লাস জোগাড় করেছে। চাকরির সন্ধানে ঘুরছে শিকারী কুকুরের মতো। যেখানেই তার মনে হয়েছে চাকরির সম্ভাবনা আছে সেখানেই সে উপস্থিত হয়েছে। আপনি শুনলে নিশ্চয়ই হাসবেন চাকরির জন্যে সে ময়মনসিংহের মদনের এক পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করে এসেছে। এখনো কিছু হয় নি। চট করে যে হবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। দেশের চাকরি-বাকরি এখন পীর-ফকিরদের হাতে না। যাদের হাতে তারা মুহিবকে চাকরি দেবে না।

বুঝতেই পারছেন ওর নাম মুহিব। যেসব জিনিস মেয়েরা পছন্দ করে না তার সবই মুহিবের মধ্যে আছে। রুচি এক বস্তু তার নেই। এমন সব কুৎসিত রঙের শার্ট পরে সে আসে যা সুস্থ মাথায় কোনো মানুষ কিনতে পারে না। একবার সে গোলাপি রঙের এক হাওয়াই শার্ট পরে উপস্থিত হয়েছিল। সিল্কের শার্ট। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে তেত্রিশ টাকায় কিনেছে এবং তার ধারণা হয়েছে এত সুন্দর সার্ট সে তার জীবনে আগে কখনো পরে নি। সে অসম্ভব ভীরু। একদিন তাকে নিয়ে আমি পাবলিক লাইব্রেরির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি হঠাৎ বদ টাইপের এক আধবুড়ো লোক ইচ্ছা করে আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, ঐ বুড়োটাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর তো সে এটা কেন করল। মুহিব বলল, আহা বাদ দাও না! পথ চলতে ধাক্কা লাগে না?

আমি কঠিন গলায় বললাম, পথ চলতে ধাক্কা এটা নয়। তুমি এক্ষুণি গিয়ে বুড়োকে ধরে আন।

মুহিব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি নাটক করতে পারব না। বুড়ো যদি ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়েই থাকে তাহলে আমি এখন বললে তো ধাক্কা ফেরত চলে যাবে না।

তা যাবে না— তবে সে সাবধান হবে।

তাকে সাবধান করার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছা করছে না। তুমি পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাও তো। তুচ্ছ জিনিস মনে ধরে রাখলে চলে না।

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। তার কাছে সবই তুচ্ছ জিনিস। সে থাকে তার বোনের সঙ্গে। তার দুলাভাই তাকে দিনরাত অপমানিত করে। অপমানের দু'একটা নমুনা শুনে আমার মাথায় আগুন ধরে গেছে। সে নির্বিকার— তার কাছে এসব হচ্ছে তুচ্ছ জিনিস।

তার টাইপ সম্পর্কে বোঝবার জন্যে একটা ঘটনার শুধু উল্লেখ করি। আপনি অসম্ভব বুদ্ধিমান। একটি ঘটনা থেকে তার চরিত্র ধরে ফেলতে পারবেন। বেশি দিন আগের কথা না, মাস তিনেক হবে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছি। সে হঠাৎ বলল, এক সেকেন্ড দাঁড়াও বাথরুম সেরে আসি।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, কোথায় বাথরুম সারবে ?

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, রাস্তার পাশে। ড্রেন আছে তো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব। নো প্রবলেম।

আমি বললাম, রাস্তায় শত শত লোক যাচ্ছে এর মধ্যে তুমি বাথরুম সারবে ?

হ্যাঁ।

তুমি কি প্রায়ই এরকম কর ?

আমার মতো যুবক, যাদের কাজই হচ্ছে সারাদিন শহরে ঘুরে বেড়ান— বাথরুম সারার কাজ তাদের এভাবেই করতে হয়। এটা তো সানফ্রানসিসকো শহর নয় যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাবলিক টয়লেট থাকবে!

তুমি যদি সত্যি এরকম কর তাহলে আমি কিন্তু চলে যাব। আর কখনো আমার দেখা পাবে না।

তুমি চাও আমি ব্লাডার ফেটে মারা যাই ?

এই বলে সে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাস্তার পাশের একটা আম গাছের দিকে এগিয়ে গেল। এ থেকে আপনি নিশ্চয় ওর মানসিক গঠন বুঝতে পারছেন... আপনার সঙ্গে ওর কোনোই মিল নেই...'

চিঠি এই পর্যন্ত পড়েই অরুর ঘুম পেয়ে গেল। ময়নার মা ঘরে ঢুকে বলল, আফা আপনারে বড় আফা ডাকে।

অরু বিরক্ত মুখে বলল, কেন ?

বাবু বমি করতেছে।

বমি করবে তা তো জানা কথাই— এতক্ষণ কেন যে করে নি তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। আপাকে গিয়ে বল আমি যেতে পারব না। আমি এখন ঘুমুব। খবরদার দুপুরে

আমাকে ডাকতে পারবে না। ভাত খাওয়ার জন্যেও ডাকবে না। যদি টেলিফোন আসে বলবে আমি বাসায় নেই।

ময়নার মা চলে যাবার পর পর মীরু দরজা ধরে দাঁড়াল। রাগী গলায় বলল, বাবু বমি করছে আর তুই আসছিস না। তুই তো দিন দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছিস অরু !

অরু বলল, আমি ঘুমুচ্ছি আপা। আমাকে ডিসটার্ব করো না। বমি করে বাবুর পেট খালি হয়ে গেছে। ওকে আবার ডিম দুধ খাওয়াও।

তুই এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন ?

কেমন হয়ে যাচ্ছি ?

একজন ইনসেনসেটিভ মানুষ। দয়ামায়া নেই...।

আমার দয়ামায়া দেখানো ঠিক হবে না আপা। আমি দয়ামায়া দেখাতে গেলেই সবাই বলবে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। এটা ঠিক হবে না।

তোর দুলাভাই গত মাসে তোকে চিঠি লিখেছে। তুই জবাব দিয়েছিস ?

না।

না কেন ?

সবাইকে কি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে ? চিঠি লেখা যায় খুব সিলেকটেড ক'জনকে। দুলাভাই তার মধ্যে পড়েন না।

মীরু রাগ করে চলে গেল। অরু আবরারকে লেখা চিঠিটা আবার পড়ল। পছন্দ হলো না। আরো গুছিয়ে লিখতে হবে। হাতের লেখাও ভালো হয় নি। লাইন টানা কাগজে লিখতে হবে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমঘুম অবস্থায় লেখা চিঠিগুলি সুন্দর হয়। কেমন করে যেন চিঠিতে কিছু স্বপ্ন ভাব চলে আসে।

অরু খাতা নিয়ে উপুড় হলো। পায়ের ওপরে চাদর ছড়িয়ে দিল। জানালা দিয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। খুব আরাম লাগছে। অরু লিখতে শুরু করল। প্রথমেই সম্বোধন। সম্বোধনটাই কঠিন। সম্বোধনে অনেকখানি বলা হয়ে যায়। অরু লিখল 'প্রিয়তমেষু'। এই সম্বোধনে চিঠি আবরার সাহেবকে পাঠান যায় না। এই চিঠি মুহিবের জন্যে। এটা মন্দ না। মুহিব ফিরে এলে সে অনেকদিন দেখা করবে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, কিংবা চলে যাবে মামার বাড়ি— কেন্দুয়ায়। মুহিব যখন চিন্তায় চিন্তায় অস্থির তখন হঠাৎ চিঠি পাবে।

> প্রিয়তমেষু,
>
> তুমি ভোরবেলা হুট করে চলে গেলে। এটা একদিকে ভালোই হয়েছে। আমি নিজেকে গুছিয়ে নেবার সময় পেয়েছি। বিরহে কাতর হই নি। গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা সম্ভবত বিরহে কাতর হয়ে কাঁদতে বসত। আমি কী করেছি জান ? আমি খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজে নিজেই আরেক কাপ চা বানিয়ে খেলাম। চা শেষ করার আগেই তোমার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী এসে উপস্থিত। রাতে আমাদের ফেলে রেখে দুজনই চলে গিয়েছিল এই দুঃখে তারা কাতর। তোমার বন্ধু, বজলু সাহেব, একটু পর পর বলছেন— ভাবি,

আমি একটা ছাগল। শুধু ছাগল না, রামছাগল। আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিন। বেচারার ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি দেখে মায়া লাগছিল। তিনি অবশ্যি তোমাকেও একটু পর পর রামছাগল বলছেন কারণ তুমি আমাকে ফেলে চলে গেছ। বজলু সাহেবের স্ত্রী আমাকে আড়ালে নিয়ে একগাদা প্রশ্ন করলেন। সেই সব প্রশ্নের সত্তর ভাগ চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। এই মহিলার অশ্লীল কথাবার্তার দিকে মনে হয় খুব ঝোঁক আছে। শুরুতে তাঁর কথাবার্তা শুনে রাগ লাগছিল। তারপর অবশ্যি রাগ দূর করে হেসে হেসে আমিও বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলেছি।

বাসায় ফেরার সময় খুব টেনশান হচ্ছিল। ভেবেছিলাম বাসায় ভয়াবহ কিছু হয়ে গেছে। বাবার হার্টের অসুখ। তাঁর মাইল্ড স্ট্রোক জাতীয় কিছু হওয়া বিচিত্র না। হবার সম্ভাবনাও অনেকখানি। কারণ বাবা তাঁর পছন্দের একটি ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছেন। বাবা হচ্ছেন সেই জাতের মানুষ যাঁরা মনে করেন এই পৃথিবীতে তাঁদের মতামতই প্রধান। অন্য কারো কোনো মতামত থাকতে পারে না। থাকা উচিত না। ঐ ছেলের সঙ্গে বাবার পরিচয় কী করে হলো শোন। একদিন বাবার খুব মাথাব্যথা। তিনি প্যারাসিটামল কেনার জন্যে একটা ফার্মেসীতে গেলেন। দশ টাকার প্যারাসিটামল কিনে মানিব্যাগের জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন মানিব্যাগ আনেন নি। বাবা বললেন, টাকা আনতে ভুলে গেছি। পরে এসে টাকা দিয়ে নিয়ে যাব। দোকানদার বলল, আচ্ছা। সে অষুধ তুলে রাখল। দোকানে বসা অল্প বয়স্ক একটা ছেলে বলল, রমিজ মিয়া অষুধ দিয়ে দিন। ছেলেটা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আবার যখন এদিকে আসবেন তখন টাকা দেবেন।

বাবা বললেন, তার প্রয়োজন নেই। আমি টাকা দিয়েই অষুধ নেব। আপনার ভদ্রতার জন্যে ধন্যবাদ। এই ভদ্রতা কি আপনি সবার সঙ্গে করেন?

জ্বি না। আপনি দশ টাকার অষুধ কিনেছেন বলে ভদ্রতাটুকু করতে পারছি। এক হাজার টাকার অষুধ কিনলে করতে পারতাম না। তার কারণও আছে, একবার একটা লোক দু'শ টাকার অষুধ কিনে বলল, টাকা আনতে ভুলে গেছি। এক্ষুণি টাকা এনে দিচ্ছি। সেই এক্ষুণি এখনো শেষ হয় নি। তিন মাস হয়ে গেল।

বাবা বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে গেলেন। অষুধ কিনলেন। ছেলেটির সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা হলো, জানা গেল সে ডাক্তার। গত বছর পাস করেছে। কথা বলে বাবা মুগ্ধ।

বাবা সহজে মুগ্ধ হন না। তিনি সহজে যা হন তা হলো বিরক্ত। তিনি যখন মুগ্ধ তখন ধরে নিতে হবে মানুষটার মধ্যে মুগ্ধ হবার মতো কিছু আছে।

ভদ্রলোক কয়েকবার এলেন আমাদের বাসায়। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। বাবা কেন মুগ্ধ হলেন তা জানাই ছিল আমার আগ্রহের প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বাবার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম। মিলিয়ে মন খারাপই হলো। আবরার সাহেবকে একশতে নব্বুই দিলে তুমি পাও চল্লিশ। মানুষটা অসম্ভব ভদ্র। মেকি ভদ্রতা না— আসল জিনিস। বাবা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, কী-রে, ছেলেটা কেমন ?

আমি বললাম, ভালো।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, বি স্পেসিফিক। কেন ভালো ?

তাঁর সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান মানুষ।

আর কিছু ?

উনি খুব ভদ্র।

আর কিছু আছে ?

আর মনে পড়ছে না বাবা।

তার খারাপ কোনো দিক চোখে পড়েছে ?

উনি খানিকটা ফর্মাল।

ইনফরম্যাল হবার মতো পরিচয় তো হয় নি যে ইনফরম্যাল হবে। এ ছাড়া আর কোনো পয়েন্ট আছে ?

উনার মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য আছে।

কাঠিন্য মানে ?

উনার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন উনাকে আমার কেন জানি মাস্টার মাস্টার মনে হয়।

এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না ?

জ্বি-না।

ভালো কথা। আমি এই ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার কথা চিন্তা করছি। প্রাথমিক আলোচনা ছেলের বাবার সঙ্গে করেছি। তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহী। আমি ছেলের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আরো কিছু খোঁজ নেব। তারপর ফাইনাল কথা বলব। তোকে খবরটা দেয়া দরকার বলেই দিচ্ছি। তোর মতামত চাচ্ছি না। বুঝতে পারছিস ?

পারছি।

একটা কথা তোকে বলা দরকার— এই ছেলে এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষায় গত পনর বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা গাধা টাইপ ছেলের সঙ্গে মহাসুখে জীবন যাপন করার চেয়ে ব্রাইট ছেলের সঙ্গে মোটামুটি সুখে জীবন যাপনও আনন্দের— এই কথাটা মনে রাখবি। আচ্ছা এখন যা।

তুমি তো বাবাকে চেন না। কাজেই বুঝতে পারছ না যে বাবার মুখের ওপর কথা বলা সম্ভব না। আমি কিছুই বললাম না। তার চারদিন পর ছেলের মা আমাকে দেখতে এলেন। মহিলার মনটা মায়ায় ভর্তি। তিনি এসে কী করলেন জান ? আমাকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ খুব কাঁদলেন। তারপর একটা মুক্ত বসানো আঙটি আমার হাতে পরিয়ে দিলেন। সেই আঙটি আমি সারাক্ষণ হাতে পরে থাকি। এখনো আমার হাতে আছে। শুধু বিয়ের দিন খুলে ভ্যানিটি ব্যাগে রেখেছিলাম। আঙটি পরে থাকতে হয় বাবার ভয়ে। বুঝলেন সাহেব ? আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কী সমস্যায় আছি ? না, পারছেন না। শুধু রাগ করছেন এত ঘটা করে ঐ ছেলের কথা লিখলাম বলে। এখন যে কথাটি লিখব তা পড়লে তোমার সব রাগ চলে যাবে। কথাটা হচ্ছে— আমি আমার সমগ্র জীবনের বিনিময়ে তোমাকে চেয়েছিলাম। তোমাকে পেয়েছি। পৃথিবীর কাছে আমার আর কিছুই চাইবার নেই।'

অরুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে খাতা বন্ধ করে বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যে বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখল— মুহিব বেড়াতে এসেছে তাদের বাসায়। খালি গায়ে এসেছে। মুহিব গম্ভীর মুখে বলল, অরু তুমি তোমার বাবা-মাকে ডেকে আন। আমি উনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। খালি হাতে আসি নি। মিষ্টি নিয়ে এসেছি। দু'কেজি স্পঞ্জ রসগোল্লা।

অরু বলল, তুমি খালি গায়ে এলে ?

খালি গায়ে না এসে কী করব ? তুমি আমার পাঞ্জাবিটা পুড়িয়ে ফেললে না ? পাঞ্জাবিটা পরে আসব বলে ভেবেছিলাম।

এইভাবে তো তুমি বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।

তাহলে কী করব, চলে যাব ?

না, চলে যাবে কেন ? আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাক। আমি তোমার জন্যে চট করে একটা পাঞ্জাবি বানিয়ে দি।

পারবে ?

অবশ্যই পারব। কাপড় কেনা আছে।

সময় লাগবে না তো ?

না, সময় লাগবে না। সিম্পল পাঞ্জাবি বানাব। গলায় একটু হালকা সুতার কাজ করে দেব।

দেরি হবে তো ?

না, দেরি হবে না।

স্বপ্নের পরবর্তী অংশে দেখা গেল অরুর বিছানায় শুয়ে মুহিব ঘুমুচ্ছে। তার গায়ে সাদা চাদর। অরু মেঝেতে বসে পাঞ্জাবির গলায় সুতার কাজ করছে। কাজটা খুব দ্রুত করতে হচ্ছে বলে সূঁচ বারবার আঙুলে ফুটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্ত লেগে যাচ্ছে পাঞ্জাবিতে। অরু যতই তাড়াহুড়া করছে ততই পাঞ্জাবির গায়ে রক্ত মেখে যাচ্ছে।

৫

মহসিন বলল, শালা হারামি।

এই জাতীয় গালি সে কিছুক্ষণ পর পর দিচ্ছে। যাকে দেয়া হচ্ছে সে অবশ্যি শুনছে না। সে দশ টনি ট্রাক নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। যার পেছনের বাম্পারে লেখা— মায়ের দোয়া।

এই ট্রাক ড্রাইভার মহসিনকে সাইড দিচ্ছে না। অন্যদের দিচ্ছে কিন্তু মহসিনের পিক-আপকে দিচ্ছে না।

ট্রাক ভর্তি করোগেটেড টিনের শীট। টিনের শীটের ওপর দুজন কুলী মাথায় গামছা বেঁধে বসে আছে। দুজনের হাতেই বিড়ি। তারা খুব মজা পাচ্ছে। সাইড চেয়ে যে-কোনো গাড়ি হর্ন দেয়া মাত্র ট্রাক তাকে সাইড দিয়ে দিচ্ছে। শুধু যখন মহসিন হর্ন দিচ্ছে তখন ট্রাক চলে যাচ্ছে মাঝ রাস্তায়। ট্রাকে বসে থাকা কুলী দুজন দাঁত বের করে হাসছে। তারা খুব মজা পাচ্ছে।

মুহিব বলল, পাল্লা দিয়ে লাভ নেই ড্রাইভার সাহেব। ও সাইড দেবে না।

মহসিন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, সবেরে দিতেছে, আমারে দিব না কেন ?

কে জানে কেন ? কোনো-একটা তামাশা করছে। আমাদের আগে যবার দরকার নেই, আমরা পেছনে পেছনেই যাই।

ট্রাকের পেছনে থাকলে রাস্তা দেখা যায় না। চালাতে অসুবিধা।

তাহলে আসুন এক কাজ করি। চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামান। আমরা চা খাই। ট্রাক এর মধ্যে চলে যাক।

এই হারামজাদাকে ওভারটেক না করতে পারলে আমি বাপের ঘরের না।

কোনোই দরকার নেই ভাই। আপনি গাড়িটা থামান, আমরা চা খাই। চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে।

মহসিন নিতান্ত অনিচ্ছায় গাড়ি থামাল। মুহিব প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে চা খেল। লীনাও মুহিবের সঙ্গে নেমেছে। সেও চা খাবে। তাকে পিরিচে করে চা দেয়া হয়েছে। সে চা খাচ্ছে। লম্বা ঘুম দেয়ায় তার নিজস্ব ব্যাটারি চার্জ হয়ে গেছে। সে ক্লাস টু'র বাংলা বইয়ের সব ছড়া একের পর এক শুনিয়ে যাচ্ছে; ছড়া বলছে হাত-পা নেড়ে। ছড়া বলার ফাঁকে ফাঁকে পিরিচে চা ঢেলে তার মুখে ধরে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। মুহিবকে লীনা এখন ডাকছে— ছোট মামা। ছোট মামা কেন ডাকছে সেই জানে।

ছোট মামা ?

কী ?

রং তুলি কবিতা শুনবে ?

বল।

রং তুলিতে ছোপ ছাপ
মাঠের পাশে ঝোপ ঝাপ।
ঝোপের পাশে সোনারগাঁও
একটুখানি বসে যাও।

মহসিন গম্ভীর মুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মেজাজ ভয়ংকর খারাপ। কেন জানি তার ধারণা হয়েছে যে তাদের পেছনে না দেখে ট্রাকটাও থেমেছে। অপেক্ষা করছে কখন আবার আসে। যেই সে পিক-আপ নিয়ে দেখা দেবে ওমনি ট্রাক ড্রাইভার আগের ফাজলামি শুরু করবে। হারামজাদা।

লীনা চা শেষ করে বলল, নাচ দেখবে ছোট মামা?

এখানে নাচবে?

হুঁ। আমি সব জায়গায় নাচতে পারি।

এখন তো আমরা রওনা হব। আমরা বরং চিটাগাং পৌঁছে নাচ দেখব।

তাহলে কবিতা বলি?

বল।

খোকন খোকন ময়না
পরিয়ে দেব গয়না
খোকন যাবে মামার বাড়ি
আর যে দেরি সয় না...

মহসিন যা ভেবেছিল তাই।

তারা রওয়ানা হয়েছে পনেরো মিনিট পর। এই পনেরো মিনিটে ট্রাকের অনেক দূর চলে যাওয়ার কথা। তা যায় নি। মহসিন পিক আপ নিয়ে কিছু দূরে এগোতেই দেখল ট্রাক। কুলী দুজন পিক-আপের দেখা পাওয়া মাত্র আনন্দে হেসে ফেলল। মহসিন বলল, হারামজাদা, কুত্তা।

মুহিব বলল, ড্রাইভার সাহেব আপনি ওদিকে লক্ষ করবেন না, নিজের মতো চালান।

মহসিনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। চোখ লালচে। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। ট্রাকে বসে থাকা কুলী দু'জন দাঁত বের করে হাসছে। একজন আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। মহসিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শুয়োরের বাচ্চা। আর ঠিক তখনি ট্রাক সাইড দিল। ট্রাক ড্রাইভার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারা করল চলে যেতে। মহসিন তাই করল। নিমিষে ট্রাকের পাশাপাশি চলে এল। ভুল যা করার তা এর মধ্যে করা হয়ে গেছে। মহসিনের সামনে কোকাকোলা কোম্পানির মাইক্রোবাস। পেছনে যাবার উপায় নেই। পেছনে ঢাকা-চিটাগাং লাইনের বিরাট একটা হিনো বাস। বাস ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ট্রাক ড্রাইভার কি ইচ্ছে করে তাকে এই বিপদে ফেলেছে? না রসিকতা? মহসিনের ত্রিশ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা কোনো কাজে লাগছে না। মাথা কাজ করছে না। চোখের দৃষ্টিও ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে— স্টিয়ারিং হুইল হয়ে গেছে পাথরের মতো শক্ত। মহসিন চোখ বন্ধ করে ফেলল।

লীনা শক্ত করে মুহিবের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

মাইক্রোবাস মুখোমুখি ধাক্কা দিয়ে মুহিবদের পিক-আপকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল।

মীরুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আবীর দুপুর থেকে কিছু মুখে দিচ্ছে না। ঠোঁট শক্ত করে বন্ধ করে আছে। গা একটু গরম। সেই উত্তাপ অবশ্য থার্মোমিটারে ধরা পড়ছে না। মীরুর ধারণা জ্বর আছে। সে খানিকক্ষণ পর পর ছেলের কপালে এবং বুকে হাত রাখছে।

মীরুর মা বেশ বিরক্ত হচ্ছেন। সেই বিরক্তি প্রকাশ করছেন না। মেয়ের আহ্লাদি প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। সহ্য করার চেষ্টা করছেন। মীরু মা'র ঘরে ঢুকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কী করি মা বল তো ?

রাহেলা আবেগশূন্য গলায় বললেন, আবার কী হয়েছে ?

বাবুর গা গরম।

জ্বর-জ্বারি হয়েছে বোধহয়। বাচ্চাদের তো জ্বর-টর হবেই।

শ্বাস নেবার সময় কেমন যেন শাঁ শাঁ শব্দ হয়। বুকে বোধহয় ঠাণ্ডা বসে গেছে।

আবরার আসবে বলেছে। ও এলে ওকে দেখা—

সে তো আর চাইল্ড স্পেশালিস্ট না।

চাইল্ড স্পেশালিস্ট খোঁজার মতো কিছু হয় নি মীরু।

দুপুর থেকে কিছু মুখে দিচ্ছে না।

ক্ষিধে হচ্ছে না তাই মুখে দিচ্ছে না। তুই শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিস।

আবীরের বাবাকে একটা ট্রাংক কল করব মা ?

করতে চাইলে কর। তবে ছেলের অসুখের কথা না বলাই ভালো। চিন্তা করবে।

মীরুর চোখ-মুখ মুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাসিমুখে বলল, টেলিফোনটা তোমার ঘরে নিয়ে আসি মা।

রাহেলা বললেন, নিয়ে আয়।

বাবার ঘর থেকে টেলিফোন করা বিরাট যন্ত্রণা। তিন মিনিটের বেশি কথা বললেই তিনি রেগে যান। পৃথিবীর কোনো স্বামী-স্ত্রী কি পারে তিন মিনিটে তাদের কথা শেষ করতে ?

রাহেলার দাঁত ব্যথা করছে। তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে আছেন। মীরু আবীরকে তাঁর পাশে বসিয়ে টেলিফোন আনতে গেছে। রাহেলা হাত বাড়িয়ে আবীরকে কোলে নিতে নিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই মাসে মীরুর এটা দ্বিতীয় দফায় লং ডিসটেন্স কল। এক একটা কলে হাজার বার শ' করে বিল হয়। আজ এই মেয়ে কতক্ষণ কথা বলবে কে জানে ! গত মাসে টেলিফোন বিল এসেছে ছয় হাজার টাকা। ছ' হাজার টাকা টেলিফোন বিল দেয়ার মতো অবস্থা সংসারে নেই। তা এই মেয়ে বুঝবে না। তাঁর মেয়ে এত বোকা কখনো ছিল না। বিয়ের পর বোকা হয়ে গেছে। মনে হয় আরো হবে। মানুষ নষ্ট হয় সঙ্গদোষে। মীরুর স্বামী মুখলেসুর রহমানই মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে দিচ্ছে।

মুখলেসুর রহমান স্বভাব-কৃপণ। চালিয়াত ধরনের ছেলে। এক বছরের মতো বাইরে আছে, একবারও টেলিফোন করে নি। ডলার নষ্ট হবে। স্ত্রীর হাতখরচের টাকাও আসছে

না। চিঠি লিখেছে— কষ্ট-টষ্ট করে চালিয়ে নাও। ডলার জমাচ্ছি। পরে কাজে লাগবে। তোমার বাবার কাছ থেকে কিছু ধার নাও। আমি দেশে এসে শোধ করব।

আবীরের জন্মের সময়ও এই ব্যাপার। ক্লিনিকে বাচ্চা হলো। নরম্যাল ডেলিভারী নয়, সিজারিয়ান। সতেরো হাজার টাকা বিল। সেই টাকা তাঁদেরকে দিতে হয়েছে। কারণ বড় জামাই হাসিমুখে বলেছে— টাকাটা কি আপনারা দেবেন, না আমি দেব ? আপনার মেয়ে বলছিল, আমি দিলে আপনারা মাইন্ড করবেন। এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি।

রাহেলা বললেন, আমিই দেব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

ভাবছি না তো মা। মোটেও ভাবছি না। তবে এই সব পুরনো নিয়ম-কানুন বদলানো উচিত। বিয়ের পর মেয়ের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর। বাবা-মা'র এই সব নিয়ে ভাবা উচিত না।

এক বছর ধরে স্ত্রী, পুত্র ফেলে সে নিউজার্সিতে আছে। ইচ্ছা করলেই দুজনকে নিয়ে যেতে পারে। তা নেবে না। তাতে ডলার 'সেভ' হবে না।

মীরু বাবার ঘরে ঢুকল। বাবা চোখ বন্ধ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। মীরু ভয়ে ভয়ে টেলিফোনের প্ল্যাগ খুলল। জামিল সাহেব কড়া গলা বললেন, টেলিফোন নিচ্ছিস কোথায় ?

মীরু ক্ষীণস্বরে বলল, মা জানি কোথায় টেলিফোন করবে।

সেটা আমার ঘর থেকে করতে পারে না ? গোপনে করতে হবে ? সব জিনিসের একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে। আলনা থাকবে আলনার জায়গায়। টেলিফোন থাকবে টেলিফোনের জায়গায়। টেলিফোন তো মানুষ না যে একেক সময় একেক জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। যা তোর মা'কে আসতে বল।

আচ্ছা।

মীরু এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি টেলিফোনটা এ ঘরে এনে দাও মা। বাবা আনতে দিচ্ছে না।

রাহেলা টেলিফোন এনে দিলেন। মীরু তৎক্ষণাৎ নিউজার্সিতে কল বুক করল।

রাহেলা লক্ষ করলেন মীরু টেলিফোন সেটের পাশে মূর্তির মতো বসে আছে। আগ্রহ এবং আনন্দে তার চেহারাই অন্য রকম হয়ে গেছে। রাহেলার খুব মায়া লাগছে। তাঁর কাছে টাকা থাকলে তিনি টিকিট কেটে মেয়েকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

মীরু বলল, মা আজ কিন্তু একটু বেশিক্ষণ কথা বলব।

আচ্ছা।

তুমি আবীরকে নিয়ে একটু অন্য ঘরে যাও তো মা।

রাহেলা আবীরকে নিয়ে উঠে গেলেন আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বাজল। না নিউজার্সি থেকে কোনো কল না। মগবাজার থেকে বজলু নামের একটা লোক টেলিফোন করছে। অরুকে চাচ্ছে।

মীরু বলল, ওকে তো এখন দেয়া যাবে না। আপনার যা বলার আমাকে বলুন।

তাকেই দরকার। জরুরি একটা খবর দেব।

বললাম তো তাকে দেয়া যাবে না। সে ঘুমুচ্ছে। শরীর ভালো না। আপনি পরে

টেলিফোন করুন। আমি এখন আমেরিকা থেকে একটা কল এক্সপেক্ট করছি।

আপনি কি দয়া করে উনাকে বলবেন যে মুহিব এক্সিডেন্ট করেছে। অবস্থা খুব খারাপ। ঢাকা মেডিক্যালে ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে।

মুহিবটা কে?

উনাকে বললেই চিনবেন।

আচ্ছা বলব। আপনি লাইনটা ছাড়ুন। আমিও খুব জরুরি একটা কল এক্সপেক্ট করছি।

আপনি দয়া করে খবরটা দেবেন। বলবেন, বজলু টেলিফোন করেছিল।

বলব।

বজলু নামের অপরিচিত এই মানুষটা টেলিফোন রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিউজার্সির কল পাওয়া গেল। মীরু দশ মিনিট কথা বলল। এই দশ মিনিটে তিনবার কাঁদল। দু'বার ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বুঝতে পারছি তুমি আমাকে ভালোবাস না।

অরুকে যে খবরটা দেয়ার কথা মীরু সেই খবর দিল না। কারণ তার কিছুই মনে নেই। প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে কথা বললে তার এরকম হয়— সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। শরীর ঝন ঝন করতে থাকে। সেই রাতে এক ফোঁটা ঘুম আসে না। গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে থাকে!

অরুর ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে শীতের হাওয়া আসছে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। শীতের সময় আকাশে মেঘ করলে কেন জানি খুব বিষণ্ন লাগে। অরু বিছানা থেকে নামল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় খুব হাওয়া। গায়ে কাঁপন লাগছে।

মীরু বাটি ভর্তি দুধ নিয়ে রান্নাঘর থেকে আসছে। অরুকে দেখে কিশোরীর মতো পরিষ্কার গলায় বলল, তোর দুলাভাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো। দশ মিনিট কথা বললাম।

অরু হাই তুলতে তুলতে বলল, দুলাভাই টেলিফোন করলেন, না তুমি করলে?

আমি করলাম। আমেরিকা থেকে কল করা খুব খরচান্ত ব্যাপার। তাছাড়া লাইনও সহজে পাওয়া যায় না।

দুলাভাই শুধু লাইন পান না। আর সবাই পায়।

এই সব কী ধরনের কথা অরু?

ঠাট্টার কথা আপা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করব না?

তোর কথা টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিল।

বল কী? কী সৌভাগ্য!

তোর বিয়ের তারিখ হয়েছে কি-না জানতে চাইল। আমি বললাম, পৌষ মাসের মাঝামাঝি হবে।

অরু হাসতে হাসতে বলল, দুলাভাই বড় বাঁচা বেঁচে গেলেন। যেহেতু বাইরে আছে গিফট-টিফট কিছু দিতে হবে না। সুন্দর একটা কার্ড পাঠালেই হবে।

মীরু কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। অরু বলল, তুমি রাগ করছ না-কি ? দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করব না ?

এই জাতীয় ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। তোদের জন্যে দুলাভাইয়ের যে দরদ তার শতাংশের এক অংশ দরদও তোদের নেই।

তাই না-কি ?

এক বছর ধরে বেচারা বাইরে পড়ে আছে। আমি ছাড়া একবার কেউ কি তার সঙ্গে কথা বলেছে ? বাবার জন্মদিনে সে কার্ড পাঠিয়েছে। বেচারার জন্মদিন গেল। বাবা কি তাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছেন, না এক লাইনের একটা চিঠি লিখেছেন ?

বাবা জানতেন না কবে জন্মদিন।

কেন জানবে না ? আমি বাবাকে গিয়ে বললাম, বাবা পঁচিশে অক্টোবর আবীরের বাবার জন্মদিন। বাবা বললেন, বুড়ো ধাড়ির আবার জন্মদিন কী ? এইভাবে কেউ কথা বলে ? বলা উচিত ?

মোটেই বলা উচিত না।

মীরুর চোখে পানি এসে গেল। অরু বলল, এইসব কথা বাদ দাও আপা। দুলাভাই কেমন আছে বল।

ভালো আছে। একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, এখন ভালো।

আপা শোন, খুব সিনসিয়ারলি একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। খুব সিনসিয়ারলি— তোমার সবচে' প্রিয় মানুষটি কে ?

তোর দুলাভাই, আবার কে ?

আচ্ছা আপা, পৃথিবীর সব মেয়েরাই কি তাদের স্বামীকে তোমার মতো ভালোবাসে ?

মীরু বিরক্ত হয়ে বলল, স্বামীকে ভালোবাসবে না তো কি রাস্তার মানুষকে ভালোবাসবে ? মাঝে মাঝে তুই এমন পাগলের মতো কথা বলিস !

অরু অস্পষ্ট স্বরে বলল, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তাদের ভালোবাসাও কি আলাদা ? একজনের ভালোবাসা নিশ্চয়ই অন্য একজনের ভালোবাসার মতো নয়।

মীরু বলল, বিড় বিড় করে কী বলছিস ?

অরু বলল, কিছু বলছি না।

বলতে বলতেই সে লক্ষ করল তার কেমন যেন লাগছে। মুহিবের পাশে থাকার জন্যে এক ধরনের তীব্র ব্যাকুলতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। চিটাগাং-এ মুহিব কোথায় উঠেছে এটা কি খোঁজ নিয়ে জানা যায় না ? সে যদি রাতের ট্রেনে চিটাগাং চলে যায়, ভোরবেলা মুহিবকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলে, 'তুমি কেমন আছ ? ...

মুহিব কী করবে ? খানিকক্ষণ তোতলাবে। বেশি রকম চমকালে সে তোতলাতে শুরু করে। কুৎসিত লাগে। বয়স্ক একজন মানুষ তো তো তো করছে ... জঘন্য!

কেমন হয় চিটাগাং চলে গেলে ? ট্রেনে করে একা একা চলে যাওয়া খুব কি সাহসের কাজ ? গোপনে বিয়ে করে এরচে' অনেক বেশি সাহস কি সে দেখায় নি ? আচ্ছা ধরা যাক, একা যাওয়া সম্ভব না। সে তো অনায়াসে বজলুকে বলতে পারে—ভাই, আপনি

আমাকে চিটাগাং নিয়ে চলুন। আমার খুব যেতে ইচ্ছা করছে। উনি নিশ্চয় রাজি হবেন।

ময়নার মা এসে বলল, আফা, আম্মা আপনারে ডাকে। অরু মা'র ঘরের দিকে রওনা হলো।

রাহেলার দাঁতে ব্যথা তীব্র হয়েছে। অষুধপত্র এখনো কিছু খাচ্ছে না। আবরার আসবে। তাকে জিজ্ঞেস করে খাবেন। অরু ঘরে ঢুকে বলল, মা ডেকেছ ?

হুঁ।

দাঁত ব্যথা কি খুব বেশি ?

হুঁ।

কী জন্যে ডেকেছ মা ?

বাতি নিভিয়ে আমার পাশে বোস।

অরু তাই করল। রাহেলা মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, তোর কি কোনো সমস্যা আছে মা ?

অরু বিস্মিত হয়ে বলল, এই কথা কেন বলছ ?

কোনো কারণ নাই। হঠাৎ মনে হলো। আছে কোনো সমস্যা ?

না।

আজ কলেজ থেকে ফিরে শুনি তুই ঘুমাচ্ছিস। বলে দিয়েছিস তোর ঘুম যেন ভাঙান না হয়। আমি ভাবলাম, অসুখ-বিসুখ হয়েছে। তোর কাছে খানিকক্ষণ বসলাম। দেখি, ঘুমের মধ্যে তুই খুব কাঁদছিস।

দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম মা।

কী দুঃস্বপ্ন ?

আমি একটা পাঞ্জাবিতে সুতার কাজ করছি। সূঁচ বারবার আমার আঙুলে ফুটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্তে পাঞ্জাবিটা মাখামাখি হয়ে গেল।

পাঞ্জাবিটা কার জন্যে বানাচ্ছিস ?

রাহেলা শান্ত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। অরু চোখ ফিরিয়ে নিল। রাহেলা বললেন, ঠিক করে বল তো দেখি মা— আবরার ছেলেটিকে কি তোর পছন্দ না ?

উনি চমৎকার একজন মানুষ।

অনেক সময় চমৎকার মানুষও মনে ধরে না। আমি লক্ষ করেছি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর থেকে তোর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা। ঘুমের মধ্যে তোকে যে আজই কাঁদতে দেখলাম তা না— আগেও দেখেছি।

অরু কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন মীরু এসে বলল, আবরার সাহেব এসেছেন। একগাদা খাবার-দাবার নিয়ে এসেছেন। রাহেলা বললেন, ওকে এইখানেই নিয়ে আয়। তিনি অরুর চোখের দিকে তাকালেন। অরুর চোখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত হলেন— যা আশংকা করছিলেন তা নয়।

সাদা রঙের পিক-আপ ধানক্ষেতে পড়ে আছে। ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়েতে গাড়ির ভিড়। এরা কেউ থামছে না, বরং এ্যাকসিডেন্টের কাছাকাছি তাদের গাড়ির গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে। এখন গাড়ি থামানোই সমস্যা। আহত মানুষদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার দায়িত্ব এসে পড়তে পারে। কেউ মারা গিয়ে থাকলে সমস্যা আরো বেশি। রাস্তা ব্লক হয়ে যাবে। দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টার মতো গাড়ি চলবে না। মানুষজন জমবে, পুলিশ আসবে। গাড়ি ভাংচুরও হতে পারে। গাড়ি ভাংচুর হওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, কিছু একটা হলেই গাড়ি ভাঙা হয়। কাজেই এ্যাকসিডেন্ট হলে হবে। বড় বোকামি হবে গাড়ি থামিয়ে কী হয়েছে খোঁজ নিতে যাওয়া। গাড়ি চালক বা যাত্রী কারো হাতে সময় নেই। ফেরী ধরতে হবে। ফেরীর লম্বা লাইনে যেন পড়তে না হয়।

গ্রামের কিছু লোকজন পিক-আপ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বাচ্চা এবং মহিলাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। উল্টে যাওয়া পিক-আপ থেকে প্রথম বের হয়ে এল লীনা। তার চোখে ভয়ের চেয়ে বিস্ময় বেশি। সে ডাকল, আব্বু ও আব্বু।

লীনার বাবা বের হয়ে এলেন। বেরুল ড্রাইভার মহসিন। মহসিনের বাঁ হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তে শার্টের অনেকখানি ভিজে গেছে। তবে তার কাছে এই আঘাত খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, দাঁড়িয়ে তামশা দেখতেছেন? এদের গাড়ি থেকে বের করেন। আশেপাশে ডাক্তারখানা কোথায় আছে?

গ্রামের মানুষগুলি কোনো জবাব দিল না। একজন বুড়ো শুধু বলল, কয়জনের মৃত্যু হয়েছে?

এতবড় এ্যাকসিডেন্ট সেই তুলনায় ক্ষতি অল্প— গুরুতর আঘাত পেয়েছে শুধুমাত্র মুহিব। একমাত্র তারই জ্ঞান নেই। মাথার পেছন দিকের খানিকটা অংশ থেতলে গেছে।

মহসিন বলল, ইনারে খুব তাড়াতাড়ি কোনো বড় হাসপাতালে নিতে হবে। আপনারা একটা ব্যবস্থা করেন। ঢাকার দিকে যে গাড়িগুলি যাচ্ছে তার একটারে থামান।

মুহিবের মাথা কোলে নিয়ে একজন মহিলা বসে আছেন। ইনি লীনার মা। তাঁর আকাশী রঙের শাড়ি রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা একমনে দোয়া ইউনুস পাঠ করছেন।

গ্রামের মানুষের এই দৃশ্য দেখার দিকেই বেশি আগ্রহ। আহত মানুষটিকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যাপারে তাদের তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। ঐ বুড়ো লোকটা লীনার মা-কে বলল, মানুষটা আফনের কে হয়? লীনার মা বললেন, আপনারা কেউ একটু পানি আনবেন? উনারে পানি খাওয়াব। পানি আনার ব্যাপারে সবার খুব উৎসহ দেখা গেল। এক সঙ্গে চার-পাঁচ জন ছুটে গেল।

লীনার বাবা ঢাকার দিকে যাচ্ছে এমন কোনো একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করছেন। হাত তুলে চিৎকার করছেন, কেউ থামছে না। তিনি উপায় না দেখে হাত তুলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালেন, তবু কেউ থামছে না। তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সময় ছোট্ট লীনা একটা অসীম সাহসী কাজ করল, সেও বাবার মতো দু'হাত তুলে রাস্তার একটা

অংশ আড়াল করে দাঁড়াল। ঢাকাগামী একটা চেয়ারকোচকে যে কারণে বাধ্য হয়ে থামতে হলো।

৮

ডাক্তার সাহেব বললেন, এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের যা করার আমরা করছি। আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। হৈচৈ, কান্নাকাটিতে সমস্যা হয়।

জেবা শান্ত স্বরে বলল, আমি তো কান্নাকাটি করছি না।

তবু বাইরে থাকুন। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আমরা রুগীর আত্মীয়-স্বজন রাখি না। অবশ্যি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার থাকবে, চিন্তার কিছু নেই।

জেবা শেষবারের মতো তাকাল। মুহিব চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার পুরো মাথায় ব্যান্ডেজ। সেই ব্যান্ডেজ ভিজে উঠেছে রক্তে। চোখ বন্ধ, নাকের ভেতের নল ঢুকে গেছে। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। মুখ খানিকটা হা করা। দুটি হাতেই স্ট্রাইপ দিয়ে বিছানার সঙ্গে বাঁধা। মুহিবের বুক ওঠানাম, করছে। জীবনের চিহ্ন বলতে এইটুকুই। ঘরটা ছোট। ছোট ঘরের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন সিলিন্ডার। ঘরময় মাথা ধরে যাবার মতো কড়া ফিনাইলের গন্ধ। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে। ছাদ থেকে ইলেকট্রিকের তার ঝুলছে। দেখলেই কেন জানি মনে হয় ফাঁসির দড়ি। ঘরে আলোও কম। মৃত্যুর সময় এই ঘরের রুগীরা পৃথিবীর অসুন্দর একটি অংশ দেখে যাবে।

জেবার মনে হলো, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটগুলো খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা উচিত। এই ঘরটা থাকবে আলো-বাতাসে ভরপুর। ফুলদানি ভর্তি থাকবে গোলাপের গুচ্ছ। বড় বড় জানালা থাকবে, যে জানালা দিয়ে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়।

জেবা বারান্দায় চলে এলেন। বারান্দায় অনেকেই আছে। মুহিবের বন্ধুরা এক কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বজলুকে ছাড়া জেবা অন্য কাউকেই চেনে না। এরা কেউ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে না। দূরে দূরে আছে। এই ভালো। জেবার এখন সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই। বজলুকে দেখা যাচ্ছে বাচ্চা ছেলেদের মতো মাটিতে বসে আছে। কিছুক্ষণ পরপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। তার স্ত্রী একটা হাত রেখেছে স্বামীর পিঠে। সেও কাঁদছে।

শফিকুর রহমান সাহেব তাঁর মেয়ের হাত ধরে মুহিবের বন্ধুদের থেকে অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। অপরিচিত একজন ডাক্তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কী মনে করে যেন থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, নাম কী তোমার খুকী? সারা বলল, আমার নাম 'প্রিয়দর্শিনী'। শফিকুর রহমান মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। 'প্রিয়দর্শিনী' নাম মুহিবের দেয়া। মেয়ের জন্মের পরপর মুহিব বলল, আপা, তোমার মেয়েটা তোমার মত সুন্দর হয় নি তবু আমি ওর নাম দিলাম 'প্রিয়দর্শিনী'। জেবা বলল, তুই নাম দিতে গিয়ে ঝামেলা করিস না তো। তোর দুলাভাই নাম ঠিকঠাক করে রেখেছে। তুই নাম দিচ্ছিস শুনলে বিরক্ত হবে।

মুহিব বলল, তোমাদের নামে তোমরা ডাকবে। আমি ডাকব প্রিয়দর্শিনী। এই যে, এই যে প্রিয়দর্শিনী, তাকান দেখি আমার দিকে। আমি আপনার মামা। দু'বার মা ডাকলে

মামা হয়। কাজেই মামা কোনো হেলাফেলা জিনিস না। দুজন মা সমান সমান এক মামা। এটা হচ্ছে এলজেব্রা। বড় হলে শিখিয়ে দেব। এখন দয়া করে একবার চোখ পিটপিট করুন যাতে আমি বুঝতে পারি, আপনি আমার কথা শুনেছেন। কী আশ্চর্য! আপা দেখ দেখ, চোখ পিটপিট করছে। প্রিয়দর্শিনী আমার কথা শুনেছে।

শফিকুর রহমান মুহিবের এই নামে যতটুকু বিরক্ত হওয়া সম্ভব ততটুকু বিরক্ত হলেন। তাঁর সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে আনুষ্ঠানিক। কাজেই তিনি মুহিবকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। বরফ-শীতল গলায় বললেন, আমি আমার মেয়ের নাম রেখেছি 'সারা'। তুমি এই নামেই তাকে ডাকবে।

জ্বি আচ্ছা দুলাভাই।

দিনের মধ্যে তুমি লক্ষ বার প্রিয়দর্শিনী বলে ডাক যা আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্ত করে। বুঝতে পারছ ?

পারছি। আপনার সামনে আর ডাকব না।

আমার আড়ালেও এই নামে ডাকবে না।

জ্বি আচ্ছা।

এটা বলার জন্যেই আমি তোমাকে খবর দিয়েছিলাম। এখন যাও। কফি খেয়ে যাও, কফি দিতে বলেছি।

শফিকুর রহমান সাহেবের কঠিন শাসনে মুহিবের কিছু হলো না। তাঁর অনুপস্থিতিতে সে একলক্ষ বারের জায়গায় দু'লক্ষ বার ডাকতে লাগল— প্রিয়দর্শিনী। প্রিয়দর্শিনী।

জেবাও এই নাম মাঝে মাঝে বলত, যেমন— এই মুহিব, শোন, তোর প্রিয়দর্শিনী আজ কী করেছে, সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেয় নি। আমার চোখের পাতা এক হতেই ওয়াঁ ওঁয়া করে কান্না। আমি চোখ মেলতেই তার কান্না বন্ধ। মুখে হাসি। এইভাবে রাত জাগলে তো আমি মারা যাব। কবে তোর প্রিয়দর্শিনী বড় হবে ?

প্রিয়দর্শিনী বড় হয়েছে। এখন তার বয়স দশ। সে গোলাপি রঙের একটা স্কার্ট পরে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা শুধু যে বাবার মতো দেখতে তাই না স্বভাবও বাবার মতো। খুবই গম্ভীর। প্রায় ঘণ্টা দুইয়ের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। এই দু'ঘণ্টায় সে একটিমাত্র প্রশ্ন করেছে। সেই প্রশ্নের সঙ্গে হাসপাতালের বা বর্তমান পরিস্থিতির কোনো সম্পর্ক নেই। সে জানতে চেয়েছে— ক্রিসেনথিমামের বানান কী ?

শফিকুর রহমান বিস্মিত হয়ে ফুলের বানান বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন— হঠাৎ এই বানানটা কেন মা ?

সারা বাবার প্রশ্নের উত্তর দেয় নি।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে বের হয়ে জেবা তার কন্যাকে বলল, আমরা এখন বাসায় চলে যাব। তুমি থাকবে তোমার বাবার সঙ্গে। আমি আবার ফিরে আসব। তোমার মামার অবস্থা ভালো না। তুমি কি বাসায় যাবার আগে তোমার মামাকে একবার দেখতে চাও ?

সারা বলল, না।

জেবা শান্ত গলায় বলল, যে মানুষটা তোমাকে এত আদর করত একবার তুমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে না ?

না।

আচ্ছা চল।

মুহিবের বন্ধুরা জেবার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথা জেবার নেই। তাছাড়া তারা সান্ত্বনা পেতেও চাচ্ছে না। দুঃখই পেতে চাচ্ছে। জেবা বজলুর কাছে গিয়ে বলল, এখন তো আমাদের আর কিছু করার নেই। বাসায় চলে যাও, বিশ্রাম কর।

বজলু বলল, আমি এখানেই আছি। আমরা সবাই থাকব।

জেবা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, ঐ মেয়েটিকে কি খবর দিয়েছ, 'অরু' ?

তাঁর সঙ্গে কথা হয় নি। কিন্তু বাসায় খবর দিয়েছি।

ও আচ্ছা। আমি চলে যাচ্ছি। সারাকে খাইয়ে আবার এসে পড়ব।

আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে আছেন। আমরা তো আছি। এক সেকেন্ডের জন্য এখান থেকে নড়ব না।

জেবা এগিয়ে যাচ্ছে। কারো কথাই সে পরিষ্কার শুনছে না, বুঝতে পারছে না। চিৎকার করে কাঁদা দরকার। কাঁদতে পারছে না। কান্না আসছে না।

শফিকুর রহমান গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, তোমার রেস্ট দরকার। যা ইনএভিটেবল তার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হবার প্রয়োজনেই রেস্ট দরকার। বাসায় গিয়ে একটা হট শাওয়ার নাও। সামান্য কিছু হলেও মুখে দাও। তারপর দু'টা সিডাকসিন খেয়ে ঘণ্টা দু'একের জন্যে রেস্ট নাও।

জেবা কিছু বলল না। সিটে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। পেট্রোলের গন্ধে তার শরীর গুলাচ্ছে। ভয়ংকার খারাপ লাগছে।

শফিকুর রহমান বললেন, এরকম করছ কেন ? খারাপ লাগছে ?

জেবা বলল, না খারাপ লাগছে না।

তুমি খুব শক্ত ভঙ্গিতে সিচুয়েশন হ্যান্ডল করছ। আমি ইমপ্রেসড। আমি ভেবেছিলাম, ভেঙে পড়বে, হৈচৈ কান্নাকাটি...।

জেবা বলল, হৈচৈ কি কখনো করেছি ?

শফিকুর রহমান চুপ করে গেলেন। জেবা যে স্বরে কথা বলল সেই স্বর তাঁর কানে অন্যরকম শোনাল। যেন সে কথা বলছে পর্দার আড়াল থেকে।

জেবা বাড়ি পৌঁছেই সারাকে গরম পানিতে গোসল করাল। অনেকক্ষণ হাসপাতালে কাটান হয়েছে— পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। কাজের মেয়েকে খাবার টেবিল সাজাতে বলে সে স্টাডি রুমে ঢুকল। তেমন কোনো কাজকর্ম না থাকলে শফিকুর রহমান এই রুমে ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করেন। জেবা বলল, তোমার গোসল হয়েছে ?

শফিকুর রহমান বললেন, হ্যাঁ।

মেয়েকে নিয়ে খেতে বসে যাও। রাত ন'টার মতো বাজে। সারার খিধে পেয়েছে। বিকেলে নাশতা করে নি।

তুমি খাবে না ?

আমার দেরি হবে।

দেরি হবে কেন ? আমাদের যেমন ক্ষিধে পেয়েছে তোমারও নিশ্চয়ই পেয়েছে।

জেবা শফিকুর রহমানের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, তোমার যেমন ক্ষিধে পেয়েছে আমার তেমন পায় নি। আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কে জানে হয়তো ইতিমধ্যে মারাও গেছে!

শফিক সাহেব নিজেকে সামলে নিলেন। এইভাবে তিনি চিন্তা করেন নি। তিনি নরম গলায় বললেন, তুমি বিরাট ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ তা তো বটেই। ক্রাইসিস ফেস করতে হবে। তার জন্যে শারীরিক শক্তি দরকার। হাসপাতলে যাবে, রাত জাগবে— এই জন্যেই বলছিলাম। এস, খেতে এস।

চল।

জেবা শান্ত ভঙ্গিতে খাওয়া শেষ করল। শফিক সাহেব চাপিলা মাছের ঝোল তরকারির বেশ প্রশংসা করলেন। খাবার শেষে আর সব দিনের মতো তাঁকে দুধ চিনি ছাড়া চা দেয়া হলো।

চায়ের কাপ নিয়ে তিনি স্টাডি রুমে চলে গেলেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফীতে তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের ঘর নিয়ে মজার একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। চা খাবার জন্যে জেবার তৈরি হতে সময় লাগবে। সারাকে ঘুম পাড়াতে হবে। আজ যে ধকল গিয়েছে জেবা চট করে ঘুমুবে বলেও মনে হয় না।

শফিক সাহেব ঠিক করলেন তিনি নিজেই জেবাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন। খানিকক্ষণ থাকবেন, খোঁজখবর নেবেন। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলবেন। যে দুজনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁরা রাতের মধ্যে কিছু ঘটে যাবে তা ভাবছেন না। পরিস্থিতি খারাপ হলে তিনি সারারাতই থাকবেন। জেবা খুশি হবে। সে এতটা নিশ্চয়ই আশা করছে না। দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর থেকে তিনি যা করেছেন তাতে জেবার খুশি হওয়া উচিত। খবর পাওয়া মাত্র হাসপাতালে ছুটে এসেছেন। অষুধপত্র, রক্ত সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ডাঃ রহমতুল্লাহকে নিয়ে এসেছেন। জেবার সামনে ডাঃ রহমতুল্লাহকে বলেছেন প্রয়োজনে তিনি মুহিবকে ব্যাংকক পাঠাতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর দিক থেকে আন্তরিকতার কোনো অভাব তিনি নিজে বোধ করছেন না। অবশ্যি তাঁর মধ্যে এক ধরনের ফর্মাল ভাব আছে। দুঃখে কাতর হবার ভঙ্গি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। এই জিনিস তাঁর চরিত্রে নেই। অভিনয় তার আসে না। অবশ্য তিনি দুঃখিত হয়েছেন। মর্মান্তিক ব্যাপার তো বটেই...

চা শেষ করে শফিক সাহেব কাপড় পরে তৈরি হলেন। তাঁর ঠাণ্ডার ধাত। প্রচুর শীত পড়েছে। মাফলার দিয়ে গলা ঢেকে যাওয়া উচিত. কিন্তু এই গ্রাম্য পোশাকটি তাঁর খুব অপছন্দের। তিনি জেবাকে বললেন, মাফলার বের করে দিতে।

জেবা মাফলার হাতে স্টাডি রুমে ঢুকে বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। খোঁজ নিয়ে আসি।

কেন ?

শফিক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন. কেন মানে ?

অপ্রয়োজনের কোনো কাজ তো কর না। এই কাজটা তোমার জন্যে অপ্রয়োজনীয়। কেন করতে চাচ্ছ ? আমাকে খুশি করবার জন্যে ?

শফিক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি ঝগড়ার একটা ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছ ?

না ঝগড়ার কোনো ইস্যু আমি তৈরি করছি না। কখনোই তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি নি।

শফিক সাহেব শীতল গলায় বললেন, সমস্ত দিনের উত্তেজনায় তোমার সিস্টেমে খানিকটা ওলটপালট হয়েছে। নয়তো এই অবস্থায় ঝগড়াটে মেয়ের মতো কথা বলতে না। আমার উপদেশ শোন, চল যাই খোঁজ নিয়ে আসি। তুমি যদি চাও না হয় রাতে আমি তোমার সঙ্গে থেকে যাব। মুহিবের জন্য যে ঘর নেয়া হয়েছে ঐ ঘর তো খালিই আছে— আমি সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। আমার শরীর ভালো না। বিশ্রাম দরকার।

তুমি তোমার নিজের ঘরেই বিশ্রাম নাও। আমাকে খুশি করবার জন্যে তোমাকে কিছুই করতে হবে না।

তোমাকে খুশি করবার জন্যে আমি কিছু করছি না। আমি যা করছি দায়িত্ববোধ থেকে করছি।

জেবা কঠিন গলায় বলল, দায়িত্ববোধ ? কীসের দায়িত্ববোধ ?

তুমি দেখি সত্যি সত্যি ঝগড়া শুরু করেছ। স্টপ ইট।

জেবা বলল, চেঁচিও না। এবং চোখ রাঙিও না। উনিশ বছর ধরে তোমার চোখ রাঙানো দেখছি। আর দেখব না।

আর দেখব না মানে ? কী বলতে চাচ্ছ তুমি ?

বোস, চেয়ারে শান্ত হয়ে বোস। আমি কী বলতে চাচ্ছি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। কারণ আমার ধারণা তোমার বুদ্ধিবৃত্তি খুব উঁচু পর্যায়ের না। উঁচু পর্যায়ের হলে বিয়ের প্রথম বছরেই বুঝতে পারতে মানুষ নর্দমার কৃমিকে যেমন ঘৃণা করে তোমাকেও আমি ঠিক সেই পরিমাণ ঘৃণা করি।

শফিকুর রহমান হতভম্ব হয়ে গেলেন। জেবার আচার-আচরণ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীর মতো। এ যুক্তি শুনবে না। যুক্তি শোনার মতো মানসিক অবস্থা তার নেই। শফিকুর রহমান নিজেকে সংযত করে বললেন, শোন জেবা, তুমি দয়া করে দশ মিলিগ্রাম সিডাকসিন খেয়ে নিজেকে শান্ত কর। আমি বুঝতে পারছি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সামনে এসে তুমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছ। এটা অস্বাভাবিক না। স্বাভাবিক।

আমি নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ হারাই নি। তবে তুমি নিয়ন্ত্রণ হারাবে। এখন যেসব কথা আমি তোমাকে বলব তা শুনেই নিয়ন্ত্রণ হারাবে। চিৎকার, চেঁচামেচি তুমি কিছুই করবে না। কারণ তুমি নিতান্তই ভদ্রলোক। তবে আমার কথাবার্তা শুনে তোমার ছোটখাট স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। তুমি বরং বিশ মিলিগ্রাম সিডাকসিন খেয়ে আমার সামনে বস। প্রেসারের অষুধটাও খাও, প্রেসারও বেড়ে যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, দামী স্যুটটা গা থেকে খোল। আমার কথাবার্তা শেষ হবার পর আমি তোমার গায়ে থুথু ফেলব। স্যুট নষ্ট হবে।

শফিকুর রহমান বিচলিত বোধ করলেন। জেবার চোখ লাল। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। চুলগুলিও কি আজ অন্য রকম করে বেঁধেছে ? উনিশ বছরের চেনা মানুষ তো এ নয়। এ অন্য কেউ। অন্য কোনো জেবা। তিনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন অনেক

দিন। আগে কখনো সিগারেটের তৃষ্ণা বোধ করেন নি। আজ করছেন।

জেবা শাড়ির আঁচল গায়ে তুলে দিল। চেয়ারের হাতল থেকে হাত তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল। সে তাকিয়ে আছে শফিকের দিকে। তার দৃষ্টি তীব্র, চোখের মণি ছোট হয়ে আছে। উজ্জ্বল আলোর দিকে মানুষ যেমন ভুরু কুঁচকে তাকায় তেমনি করে সে তাকিয়ে আছে। জেবা বলল, আমার পরম দুর্ভাগ্য যে আমি রূপবতী হয়ে জন্মেছিলাম। এমন রূপবতী যে স্কুলে পড়ার সময়ই আমার নামডাক ছড়িয়ে গেল। তোমরা কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখতে এলে। আমাকে দেখে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলে। এমন সুন্দর একটা মেয়েকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করে না। আবার বাপ-মা মরা হাভাতে ঘরের একটা মেয়েকে গ্রহণ করতেও ইচ্ছা করে না। মহাসমস্যা। মনে আছে?

এখন এই প্রলাপের মানে কী?

মানে আছে। প্রলাপগুলি মন দিয়ে শোন— তোমরা সুন্দরী মেয়ের লোভ সামলাতে পারলে না। আমাকে বউ হিসেবে ঘরে নেয়া সাব্যস্ত করলে। বড় মামার বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আমার সোজা সরল মামার ধারণা হলো— আমার বাবা-মা'র পরম পুণ্যে এমন একটা বিয়ের সম্বন্ধ হলো। আমি মুহিবকে নিয়ে তোমার প্রকাণ্ড বাড়িতে চলে এলাম। এটি তোমার পছন্দ হলো না। মুহিবকে মামার বাড়িতে রেখে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওর বয়স মাত্র পাঁচ। ওকে বড় করেছি আমি। আমাকে না দেখে সে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না। বিকেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যখন খেলতে যেত কিছুক্ষণ পর পর সে ছুটে এসে দেখে যেত আমি বাসায় আছি কি-না। এই পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চা ছেলের ওপর তুমি কি রকম মানসিক চাপ দিয়েছিলে তোমার মনে আছে?

শফিক কঠিন গলায় বলল, তুমি সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছ। জেবা বলল, গত উনিশ বছর তুমি একা সীমা অতিক্রম করেছ। আজ আমি করব।— মনে আছে কীভাবে তুমি বাচ্চা একটা ছেলেকে শাস্তি দিতে? তোমাদের বিরাট বাড়ি। তাকে একা একটা ঘরে থাকতে দিলে। সে ভয়ে অস্থির। আমি বললাম, কাজের একটা মানুষ তার ঘরে শুয়ে থাক। তুমি বললে, কাজের মানুষদের দোতলায় ওঠার নিয়ম নেই। প্রথম রাতে মুহিব ভয় পেয়ে আমাদের শোবার ঘরের দরজার সামানে এসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তুমি তাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিলে। মনে আছে?

হ্যাঁ, মনে আছে। আমি সেটাকে বড় অপরাধ বলে মনে করি নি। আমাদের এই বাড়ি ভূতের বাড়ি নয়। ভয় কাটানোর জন্যে সামান্য শাসন অন্যায় না।

এটাকে তুমি সামান্য শাসন বলছ? রাতের পর রাত তাকে তালবন্ধ রাখা সামান্য শাসন?

তোমার কথা শেষ হয়েছে, না আরো আছে?

এত চট করে আমার কথা শেষ হবার না। আমাকে মুহিবের কাছে যেতে হবে। কাজেই অল্পতেই শেষ করব। আমার যে দরিদ্র বড় মামার কাছ থেকে তুমি আমাকে তুলে এনছিলে সেই বেচারা কোনো দোষ করে নি। কিন্তু কী অপমান তুমি তাকে করেছ, তা কি মনে আছে?

না মনে নেই। আমার স্মৃতিশক্তি তোমার মতো প্রখর না।

তাহলে মনে করিয়ে দেই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব আগ্রহ করে মামা একদিন

আমাকে দেখতে এলেন। তুমি এমন ভঙ্গি করলে যে— এ-কী যন্ত্রণা! মামা সোজা মানুষ, তোমার এই ভঙ্গি ধরতে পারলেন না। মহানন্দে তিনি বাড়িঘর দেখতে লাগলেন। আনন্দে এবং বিস্ময়ে তিনি অভিভূত। বারবার বলছেন— আমার জেবা মা'র 'রাজকপাল'। আমি জানি আমার 'কী কপাল'। তবু মামার আনন্দ দেখে আমারও আনন্দ হলো। তাঁরা যখন চলে গেলেন তুমি আমাকে এসে বললে, আমার রোলেক্স ঘড়িটা পাচ্ছি না। ড্রেসিং টেবিলের ওপর ছিল। তুমি শুনলে আহত হতে পার। তবু বলছি, আমি নিশ্চিত তোমাদের বাড়ির কেউ কাণ্ডটা করেছে। আমি খোঁজ নেবার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।

মানুষ হিসেবে তোমার প্রতি আমার উঁচু ধারণা কখনোই ছিল না। তবুও এ ধরনের চিন্তা তুমি করতে পার, তা ভাবি নি। আমি পাথর হয়ে গেলাম! একবার ভাবলাম তোমার পা জড়িয়ে ধরে বলি— এটা করো না। এই দয়াটা তুমি আমার প্রতি কর। শেষ পর্যন্ত তাও করা হলো না। পা জড়িয়ে ধরতে ঘৃণা বোধ হলো। তুমি চিঠি দিয়ে মামার কাছে লোক পাঠালে। মামা ছুটে এলেন এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মনে আছে ?

ঘড়ি বিষয়ে খোঁজ নেয়া কি খুব অযৌক্তিক ছিল ? অলগোল্ড রোলেক্স ঘড়ি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম। তার চেয়ে বড় কথা এটা আমার দাদার দেয়া গিফট, স্মৃতিচিহ্ন। আমি খোঁজ করব না ? এতগুলি মানুষ ঐদিন এ-বাড়িতে এসেছে। দরিদ্র মানুষ। অভাবের তাড়নায় দরিদ্র মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তাদের পক্ষে ঘড়ি নিয়ে যাওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক ? আমি তো মনে করি, আমি ঐদিন যা করেছিলাম ঠিকই করেছিলাম। অযৌক্তিক কিছু করি নি।

তোমার সব কাজই যৌক্তিক। চমৎকার একজন যুক্তিবাদী মানুষ তুমি। উনিশ বছর ধরে তোমার যুক্তি শুনছি আর মুগ্ধ হচ্ছি। আর ইচ্ছা করছে না। এই যে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। এ-বাড়ি থেকে এটাই আমার বের হয়ে যাওয়া। আমি আর ফিরে আসব না।

কী বললে ?

যা বলেছি তুমি ভালোমতোই শুনেছ। তারপরেও যদি শুনতে চাও আবার বলতে পারি। শুনতে চাও ?

তোমার মেয়ে ?

এই মেয়ে আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি তোমার মতোই ওকে মানুষ কর। এর জন্ম আমাদের দুজনের ভালোবাসায় হয় নি। এর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই।

তুমি যেসব কথা বললে, তার জন্যে তোমার অনুতাপের কোনো সীমা থাকবে না।

না থাকলে কী আর করা ! অনুতাপ করব। তবে তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে থেকে করব। তোমার মুখ দেখতে হচ্ছে না এই আনন্দ অনুতাপের চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি হবে। এই কথাটি সত্যি।

জেবা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, তুমি হয়ত জান না, বুধবারে মুহিব গোপনে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। বিয়েটা তাকে গোপনে করতে হয়েছে। আমাকেও সে জানায় নি, কারণ— তুমি। তার জীবনের চরম আনন্দের ঘটনায় আমি পাশে ছিলাম না। তার কারণও হচ্ছে তুমি। বেচারা ভয়ে আমাকে পর্যন্ত বলতে পারে নি। আমাকে বললে যদি তুমি শুনে ফেল। তোমার কাছ থেকে শেষ একটা সুবিধা নেই। তুমি কি তোমার ড্রাইভারকে বলে দেবে যেন আমাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আসে ? আমি বললে তো

হবে না। ড্রাইভারকে তুমি বলে রেখেছ গাড়ি বের করতে হলে সব সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করে বের করতে হবে। ঠিক না ?

শফিকুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। জেবা বলল, সব মন্দ দিকেরও একটা ভালো দিক থাকে। মুহিবের জীবন সংশয় না হলে আজ যেভাবে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারছি তা পারতাম না। সারাজীবন থাকতে হতো তোমার সঙ্গে।

জেবা থু করে কার্পেটে থুথু ফেলল।

তুমি অসম্ভব উত্তেজিত। উত্তেজিত অবস্থায় তুমি কী বলছ নিজেও জান না।

আমি কী বলছি আমি খুব ভালো জানি। এখন তোমাকে যা বললাম তার প্রতিটি শব্দ আমি মনে মনে লক্ষবার করে বলেছি।

আমার সম্পর্কে বলা যায় এমন ভালো কিছু কি নেই ?

আছে, একটা আছে। বিয়ের পর তুমি আমাকে পড়াশোনা করিয়েছ। ইংরেজি সাহিত্যে আমি এম.এ. পাস করেছি, তোমার জন্যেই করেছি। সংসারে ছেলেমেয়ে এলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে, কাজেই আমাদের মেয়ে সারার জন্ম হলো বিয়ের ন'বছর পর। খুব সাবধানে এই সব বিষয়ও তুমি লক্ষ করেছ। ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছ। গায়িকা হিসেবে আমি মোটামুটি ধরনের। সেই মোটামুটি ধরনের গায়িকাকে আজ যে লোকে চেনে, উৎসাহী বালিকারা যে অটোগ্রাফ চায় তার কারণ তুমি। বিস্তর ধরাধরি করে আমাকে রেডিও, টিভিতে সুযোগ করে দিয়েছ। এটা অবশ্যই তোমার ভালো দিক। এই ভালো দিকেও কিন্তু ফাঁকি আছে। তুমি যা করেছ তা আমার জন্যে কর নি, তোমার নিজের জন্যে করেছ। লোকে বলবে তোমার স্ত্রী এম.এ. পাস, লোকে বলবে তোমার স্ত্রী বিখ্যাত গায়িকা... ভুল বললাম ?

শফিকুর রহমান জবাব দিলেন না। জেবার ঠোঁট হাসির ভঙ্গিমায় একটু উল্টে গেল। সে তার গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বলল, তুমি কি তোমার বিখ্যাত গায়িকা স্ত্রীর গান কখনো শুনতে চেয়েছ ? বর্ষার রাতে কখনো কি তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বলছে— 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে' এই গানটা একটু গাও তো শুনি ?

সবার সব বিষয়ে উৎসাহ থাকে না।

ঠিক বলেছ। সবার সব বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। তোমার একটি বিষয়েই উৎসাহ— স্ত্রীকে নগ্ন করে তার দিকে তাকিয়ে থাকা।

স্টপ ইট।

চেঁচিও না। চেঁচিয়ে কিছু হবে না।

জেবা আবার কার্পেটে থুথু ফেলল। পাশের ঘরে সারা কাঁদছে। সে হয়তো বাবা-মা'র চিৎকার বা হৈচৈ শুনছে কিংবা কোনো কারণে তার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে। দশ বছর বয়স হলেও এই মেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে খানিকক্ষণ কাঁদে। অন্য সময় হলে জেবা ছুটে যেত। আজ গেল না। কালো হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিতে নিতে বলল, মেয়ের কাছে যাও। আমি বিদায় হচ্ছি। গাড়ি নেব না। এমন কিছু রাত হয় নি। আমি একটা রিকশা নিয়ে চলে যাব।

অনেকক্ষণ দরজা নক করার পর সারা দরজা খুলল। শফিক সাহেব বললেন, কাঁদছ কেন মা ?

সারা চোখ মুছতে মুছতে বলল, মামার জন্য খুব খারাপ লাগছে।

খারাপ লাগাই তো স্বাভাবিক। কাঁদলে কি খারাপ লাগা দূর হবে?

কান্না এলে আমি কী করব?

নিজেকে সামলাতে হবে। যাও, বাথরুমে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে আস।

বাবা, আমি মামার কাছে যেতে চাই।

কী হবে সেখানে গিয়ে? তুমি তো ডাক্তার না। তুমি কোনোভাবেই তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

সাহায্য করার জন্য তো আমি যেতে চাচ্ছি না।

তাহলে কী জন্যে যেতে চাও?

আমি মামার বন্ধুদের মতো ক্লিনিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব। আমার যদি কাঁদতে ইচ্ছে করে, আমি কাঁদব। মামার যে বন্ধুটা চিৎকার করে কাঁদছিল আমি সে-রকম চিৎকার করে কাঁদব।

সারা, মা তুমি বোকা মেয়ের মতো কথা বলছ।

আমাকে সারা ডাকবে না বাবা। এই নাম আমার ভালো লাগে না। আমাকে প্রিয়দর্শিনী ডাকবে।

কে তোমাকে এসব বলতে শিখিয়েছে? তোমার মা?

যা শেখার আমি নিজে নিজে শিখি। কারো কাছ থেকে আমি কিছু শিখি না।

কোনোদিন শফিকুর রহমান যা করেন না আজ তাই করলেন। মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। প্রিয়দর্শিনী কার্পেটে ছিটকে পড়ল, তবে কেঁদে উঠল না। অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল বাবার দিকে।

৯

মুহিবের সব বন্ধুই এখানো আছে। চারজন ছিল, তার সঙ্গে আরো দুজন যুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের নাম তোফাজ্জল। সে হাসপাতালের ডাক্তারদের বড় বিরক্ত করছে। দশ মিনিট পর পর হাত কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করছে, স্যার অবস্থা কী রকম দেখছেন? ইমপ্রুভমেন্ট বোঝা যায়? ব্লাড লাগবে কি-না একটু কাইন্ডলি বলবেন? আমার আর মুহিবের সেম ব্লাড গ্রুপ— বি পজিটিভ।

শুরুতে ডাক্তাররা তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। এখন দিচ্ছেন না। তাকে দেখামাত্র বিরক্ত হচ্ছেন। তোফাজ্জল এইসব বিরক্তি গায়ে মাখছে না। সে যে শুধু ডাক্তারদের বিরক্ত করছে তাই না, নার্সদেরও বিরক্ত করছে। বিশেষ করে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের নার্সদের। দরজায় টোকা দিয়ে বলছে, সিস্টার, একটু বাইরে আসবেন? জাস্ট ফর এ সেকেন্ড। রুগীর অবস্থাটা একটু বলবেন? খুব টেনশান ফিল করছি। অবস্থা স্টেবল কি-না বলুন। ব্লাড লাগলে জানিয়ে দিলেই হবে। আমার বি পজিটিভ। আপা কি মনে করেন, অবস্থাটা এখন ভালোর দিকে না?

মুহিবের অবস্থা ভালোর দিকে নয়। জ্ঞান এখনো আসে নি। সে আছে কোমার ভেতর। হার্টবিট নেমে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা বিট মিস করা শুরু করেছে। পায়ের

পাতা হয়েছে হালকা নীল যার মানে ফুসফুস রক্ত তেমনভাবে পরিষ্কার করতে পারছে না। রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে অক্সিজেন দিয়েও সেই ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না। রিফ্লেক্স অ্যাকশান সর্বনিম্ন পর্যায়ে। চোখের মণিতে কড়া আলো ফেলার পরও মণি তেমনভাবে সংকুচিত হচ্ছে না।

রাত দশটায় রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান তোফাজ্জল হোসেনকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, রুগীর অবস্থা ভালো না।

তোফাজ্জল ক্ষীণ স্বরে বলল, একটু আগে একজন সিস্টার বললেন অবস্থা স্টেবল।

এখনো স্টেবল। স্টেবল মানেই ভালো তা তো না। অবস্থা খারাপ হওয়া শুরু করেছে।

ও!

আমাদের তেমন কিছু করণীয় নেই।

স্যার, পিজিতে কি ট্রান্সফার করব ?

তাতে কোনো উনিশ-বিশ হবে বলে মনে হয় না। পিজিতে যেসব ফেসিলিটি আছে আমাদেরও আছে। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না। একমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই। অপেক্ষা করুন এবং প্রার্থনা করুন।

ব্লাড কি লাগবে স্যার ?

একটু পর পর ব্লাডের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? লাগলে আপনাদের জানাতাম। রুগী আপনার কে হয় ?

ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড স্যার।

বলতে বলতে তোফাজ্জল কেঁদে ফেলল। মুহিব তার বিয়ের সময় তাকে খবর দেয় নি। এই দুঃখেও সে একবার কেঁদেছে। এখন কাঁদছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দুঃখে। বছর তিনেক আগে তোফাজ্জলের আলসার অপারেশন হলো। দু'ব্যাগ রক্ত লেগেছিল। সেই দু'ব্যাগ রক্ত মুহিব দিয়েছে। রক্তের ঋণ শোধ হয় নি।

ডাক্তার সাহেব অস্বাভাবিক কোমল গলায় বললেন, ভাই কাঁদবেন না। আপনি রুগীর আত্মীয়-স্বজন সবাইকে খবর দিন। খুব খারাপ কিছুর জন্যে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বলুন। আরেকটা কথা— আপনি ইনটেনসিভ ইউনিটের নার্সদের আর বিরক্ত করবেন না। প্লীজ। ওরা আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করেছে।

স্যার, আমি আর বিরক্ত করব না।

তোফাজ্জল ডাক্তারের ঘর থেকে বের হয়ে এল চোখ মুছতে মুছতে। তার বন্ধুরা তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। সেও কিছু বলল না। শুধু যখন জেবা এসে বারান্দায় দাঁড়াল তখন সে বলল, আপা, ডাক্তার সাহেব বললেন, মুহিবের অবস্থা ভালো না। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিতে বললেন।

জেবা ক্লান্ত গলায় বলল, খবর দেয়ার আর কেউ নেই। ঐ মেয়েটা কি এসেছিল, অরু ?

জ্বি-না।

ওর বাসার ঠিকানা কি তোমরা কেউ জান ? আমি মেয়েটিকে নিয়ে আসব।

রাহেলা বললেন, রাত তো অনেক হয়েছে, দশটা প্রায় বাজে— খেয়ে যাও না। আবরার লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জ্বি না। এখন উঠব। অনেক দেরি করে ফেললাম।

অরু বলল, উঠব বলে তো বসেই আছেন। উঠছেন তো না।

মীরু তাকাল শাসনের ভঙ্গিতে। চোখের ভাষায় বলার চেষ্টা— এসব কী হচ্ছে ?

রাহেলা বললেন, বাবা তুমি পা তুলে আরাম করে বস। ঘরে যা আছে তাই খাবে। আমি খাবার দিতে বলে আসি।

মীরু বলল, আমরা কিন্তু খুব ঝাল খাই। আপনি ঝাল খেতে পারবেন তো ?

চেষ্টা করে দেখি।

আবীরের বাবা আবার একেবারেই ঝাল খেতে পারে না। কাঁচা মরিচ কিনতে গিয়ে দোকানদারকে কী বলে জানেন ? বলে— এই ভাই, ঝাল নেই এমন কাঁচা মরিচ আছে ?

উনি আছেন কেমন ?

ভালো আছে। আজই কথা বললাম। অবশ্যি খুব ভালো বোধহয় নেই। আমার কাছে তার গলার স্বর একটু ভারি ভারি লাগল। মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। ঠাণ্ডা লাগলে গলার স্বর ভারি হয়ে যায় না ?

আবরার হাসিমুখে বলল, ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কথা পড়ি নি। তবে হতে পারে।

জানেন, মাঝে মাঝে ওর গলা আমি একদম চিনতে পারি না। একদিন কী হয়েছে জানেন, সে অফিস থেকে টেলিফোন করে আমাকে বলল, মীরু, কেউ কি আমার খোঁজ করেছিল ? আমি একদম গলা চিনতে পারলাম না। আমি বললাম, কে ? কে কথা বলছেন ? ইন্টারেস্টিং না ?

ইন্টারেস্টিং তো বটেই।

মীরু আরেকটা গল্প শুরু করতে যাচ্ছিল। রাহেলা তাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই ? ওকে অরুর সঙ্গে গল্প করতে দে। ও অরুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। তোর বকবকানি শোনার জন্যে আসে নি। তখন থেকে আঠার মতো লেগে আছিস।

মীরু আহত গলায় বলল, আঠার মতো কখন লেগে রইলাম ? বাবুর শরীর খারাপ। বাবুকে দেখাচ্ছিলাম।

দেখানো তো হয়েছে। এখন চুপচাপ আমার সামনে বস।

মীরু গম্ভীর মুখে বসল। তার মনটা খারাপ। আবীরের বাবা প্রসঙ্গে মজার একটা গল্প মনে হয়েছিল। গল্পটা বলা গেল না। খাবার টেবিলেও বলা যাবে না। বাবাও নিশ্চয়ই এক সঙ্গে খেতে বসবেন। এইসব হালকা ধরনের গল্প বাবার সঙ্গে করা যায় না।

রাহেলা চাকচাক করে আলু কাটছেন। ঘরে খাবার তেমন কিছু নেই। আলু ভাজি করে দেবেন। একটা পদ বাড়বে। দুপুরের মাছ আছে, রাতে ডিমের তরকারি করা হয়েছে। মাছ, ডিমের তরকারি, আলু ভাজা। ডাল রান্না হয় নি। অনেকে আবার ডাল ছাড়া খেতে পারে না। একটু ডাল কি বসিয়ে দেবেন ? আধ ঘণ্টার মতো লাগবে। আচ্ছা লাগুক। এক রাতে একটু দেরি করে খেলে কিছু হবে না। মীরু কেমন মুখ কালো করে

বসে আছে। রাহেলার মায়া লাগল, তিনি কোমল গলায় ডাকলেন, মীরু ?

কী ?

মুখ কালো করে বসে আছিস কেন ? তুই কি রাগ করেছিস আমার কথায় ?

না।

আচ্ছা তোর কাছে আবরার ছেলেটাকে কেমন লাগে ?

ভালো।

কী রকম ভালো ?

বেশ ভালো। ভদ্র। চেহারাও সুন্দর। অবশ্যি গায়ের রং শ্যামলা ধরনের। আবীরের বাবার পাশে দাঁড়ালে বেচারাকে রীতিমতো কালো লাগবে। আমেরিকায় থেকে এখন নিশ্চয় আরো ফর্সা হয়েছে।

রাহেলা বিরক্ত মুখে বললেন, ফর্সা হবারই কথা।

তুমি তোমার দুই জামাইয়ের মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ কর মা ?

দ্বিতীয় জন জামাই এখনো হয় নি। হোক, তারপর দেখা যাবে।

ধর হয়েছে। হতে বাকিও বেশি নেই।

বড় জামাইকেই বেশি পছন্দ করব। বড়র মর্যাদাই আলাদা।

তোমার বড় জামাই তোমাকে খুব পছন্দ করে। প্রতি চিঠিতে তোমার কথা থাকে। লাস্ট চিঠিতে লিখল— মা'র শরীরের দিকে লক্ষ করবে। ব্লাড প্রেসার এই বয়সে কন্ট্রোলে রাখতে হয়। তুমি খুব খেয়াল রাখবে। মা বুড়ো মানুষ— অষুধ খাবার কথা হয়তো মনেই থাকবে না...

রাহেলা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই কি চিঠি মুখস্থ করে ফেলেছিস না-কি ?

মীরু লাজুক গলায় বলল, অনেকবার করে পড়ি তো। মুখস্থ হয়ে যায়। এই যে ওর চিঠিটা তোমাকে পড়ে শুনালাম এর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ করেছ ?

না।

ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সব জামাইরা শাশুড়িকে আম্মা ডাকে। ও কিন্তু তোমাকে 'মা' ডাকে। মা ডাকটা অনেক আন্তরিক না ?

রাহেলা কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। তাঁর দাঁতব্যথা তীব্র হচ্ছে। বসে থাকতে পারছেন না।

অরু বলল, আপনি পা তুলে আরাম করে বসছেন না কেন ? পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে না ? পায়ের ওপর চাদর টেনে দিন।

আবরার বলল, তোমার মা'র বিছানায় পা তুলে বসতে সংকোচ লাগছে।

এটা মা'র বিছানা মোটেই না। এটা হচ্ছে গেস্ট বিছানা। বাবা-মা'র ঝগড়া হলে মা এখানে ঘুমুতে আসেন।

এখন কি উনাদের ঝগড়া চলছে ?

হ্যাঁ, চলছে। সপ্তাহে তাঁরা আটবার ঝগড়া করেন। এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া যে মাঝে মাঝে তাঁদেরকে খুব ছেলেমানুষ মনে হয়। আজ কী নিয়ে তাঁদের ঝগড়া হয়েছে জানেন?

কী নিয়ে?

দাঁতব্যথা নিয়ে। মা'র দাঁত ব্যথা করছিল। বাবা বললেন লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচা করতে। মা বললেন, এতে কিছু হয় না। বাবা রেগে গেলেন— তুমি কি করে দেখেছ যে হয় না? না করেই বললে, হয় না। যুক্তি এবং কাউন্টার যুক্তি চলতে লাগল। এক পর্যায়ে বাবা... থাক, সেটা আর আপনাকে বলব না।

অরু মিটিমিটি হাসতে লাগল। আবরার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। এই মেয়ের কথা বলার ভঙ্গি এত সুন্দর! চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মেয়েটা কী বলছে সেদিকে লক্ষ্য থাকে না— কী করে কথা বলছে তাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আবরার ঠিক করে রেখেছে সে বিয়ের পর অরুকে বলবে, তুমি প্রতি রাতে এক ঘণ্টা আমার সামনে বসবে এবং ননস্টপ কথা বলে যাবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে পারবে না।

অরু।

জ্বি।

তোমরা দু'বোন সম্পূর্ণ দু'রকম। চেহারায় মিল ছাড়াও জেনেটিক কারণে বোনে বোনে চরিত্রগত কিছু মিল থাকে। তোমাদের তাও নেই।

মিল আছে। দুজনের কাউকেই তো আপনি ভালোমতো জানেন না, তাই ধরতে পারছেন না।

মিলটা কী বল তো?

অরু শান্ত গলায় বলল, ভালোবাসার ক্ষমতা আমাদের দু'বোনেরই অসাধারণ। আমরা পাগলের মতো ভালোবাসতে পারি। আমার দুলাভাই প্রাণী হিসেবে খুবই নিম্নশ্রেণীর। তাকে যে কী পরিমাণ ভালো আপা বাসে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

এটা কি ভালো?

কেন ভালো না? ভালোকে তো সবাই ভালোবাসে। মন্দকে ক'জন ভালোবাসতে পারে?

আবরার আগের মতো মুগ্ধ চোখে আবার তাকাল। সে ভেবে পাচ্ছে না তার এই মুগ্ধতা বিয়ের পরেও থাকবে কি-না। এই মেয়েটি খুব সহজ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে। এটিও একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। যার সঙ্গে অল্প ক'দিন পর বিয়ে হবে তার সঙ্গে এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কি কথা বলা যায়? লজ্জা, দ্বিধা, সংকোচ খানিকটা হলেও তো আসবে। এই মেয়েটার মধ্যে তা আসছে না কেন?

অরু।

জ্বি।

প্রায়ই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, মনে থাকে না।

এখন নিশ্চয় মনে পড়েছে।

হ্যাঁ। তুমি খুব সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বল, আমার ভালো লাগে। আমি আবার কারো সঙ্গে খুব সহজ হতে পারি না। সহজ হতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারি না। আমি যখন আমার মা'র সঙ্গে কথা বলি তখনো খানিকটা আড়াল থাকে।

এই তো এখন সহজভাবে কথা বলছেন। এখন কি কোনো আড়াল বোধ করছেন?

না করছি না।

তাহলে বলুন।

আবরার ইতস্তত করে বলল, তোমার সঙ্গে কি মুহিব নামের কোনো ছেলের পরিচয় আছে? আমার দূর-সম্পর্কের এক ভাগ্নি দিন দশেক আগে হঠাৎ একগাদা কথা বলল...

আবরার থেমে গেল। অরু চুপ করে আছে। তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। আবরার অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমি অবশ্যি কিছুই মনে করি না। পরিচয় থাকাটাই স্বাভাবিক। ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। মেয়েদের শুধু মেয়ে-বন্ধু থাকবে ছেলে-বন্ধু থাকবে না তা কি হয়?

অরু আবরারকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ভাগ্নি ঠিকই বলেছে। মুহিব নামের একজনের সঙ্গে আমার খুব ভালো পরিচয় আছে।

আবরার চুপ করে আছে। প্রসঙ্গটা তোলায় সে নিজেই বিব্রত বোধ করছে। তবে অরুর মধ্যে বিব্রত বা অস্বস্তিবোধের তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অরু বলল, আর কিছু কি জানতে চান?

আবরার বলল, এই না না, কিছুই জানতে চাই না। যে সহপাঠি বন্ধুরা এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হৈচৈ করছে— বন্ধুর মতো সম্পর্ক। এটা আমার কাছে খুব হেলদি বলে মনে হয়। অরু, তুমি কখনো মনে করবে না যে বিয়ের পর আমি তোমাকে সবার কাছে থেকে আলাদা করে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বন্দি করে ফেলব। মনের এইটুক ঔদার্য আমার আছে।

অরু বলল, আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছি।

আবরার বিস্মিত হয়ে বলল, কী চিঠি?

আমি আপনার সঙ্গে খুব সহজ ভঙ্গিতে কথা বললেও আমার এমন কিছু কথা আছে যা সহজভাবে বলতে পারছি না। এই জন্যেই চিঠি লিখেছিলাম।

কোথায় সেই চিঠি?

চিঠিটা আমার পছন্দ হয় নি। আবার নতুন করে লিখব— আজ রাতেই লিখব। কাল আপনাকে আমি নিজের হাতে দিয়ে আসব।

বিষয়বস্তু কি জানতে পারি?

কাল জানবেন।

অরু, কোনো সমস্যা আছে কি?

অরু ক্ষীণ স্বরে বলল, আছে। সমস্যা আছে। বড় রকমের সমস্যা আছে।

আবরার তাকিয়ে আছে। অরুও তাকিয়ে আছে। তবে সে তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। বারান্দায় বাতি জ্বলছে বলেই বৃষ্টির ফোঁটা চোখে পড়ছে।

আলো পড়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি মুক্তার মতো ঝিকমিক করছে। অরুর কান্না পাচ্ছে। কান্না আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। মীরু এসে বলল, কী ব্যাপার, দুজন চুপচাপ কেন ? খাবার দেয়া হয়েছে।

আবরার লক্ষ করল, অরুর হাতে আংটি নেই। এমন কোনো বড় ব্যাপার নয় তবু কেন জানি এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। হাতে আংটি নেই— অরু নিজেও কি এ ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিচ্ছে ? হাত আড়াল করার চেষ্টা করছে কেন ?

অরু খেতে বসল না। শুকনো মুখে বলল, আমার ক্ষিধে নেই।

রাহেলা বললেন, দুপুরেও তো কিছু খাস নি। কী ব্যাপার, জ্বর না-কি ?

না জ্বর না।

দেখি, কাছে আয়। আশ্চর্য! জ্বর আছে তো!

অরু হাসতে হাসতে বলল, এত আশ্চর্য হবার কী আছে মা ? মানুষের জ্বর হয় না ?

অকারণে জ্বর হবে কেন ?

সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ? ডাক্তার সাহেব আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস কর।

আবরার নিঃশব্দে খাচ্ছে। মীরু তার প্লেটে খাবার উঠিয়ে দিচ্ছে। অরুদের খাবার টেবিলটা বেশ বড়। এত বড় টেবিলের এক কোণায় একজন মানুষ মাত্র খাচ্ছে। দৃশ্যটা চোখে পড়ার মতো। রাহেলা বললেন, তোমাকে একা খেতে হচ্ছে। তুমি কিছু মনে করো না বাবা। অরুর বাবা এখন খাবেন না। আমাকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আর মীরু সন্ধ্যাবেলা দু'টা রুটি খায়, রাতে আর কিছু খায় না।

আবরার বলল, আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। একা খেয়ে আমার অভ্যাস আছে। বাড়িতেও আমি একা খাই।

মীরু বলল, আমি সন্ধ্যাবেলা দু'টা রুটি খাই কেন জানেন ? আবীরের বাবার জন্যে। সে চিঠি লিখেছে— 'এ দেশের মেয়েদের বেশির ভাগ পেটুক। যা পায় গবগব করে খায়। বিয়ের পর এক-একজন ফুলে কোলবালিশ হয়ে যায়। তুমি খাবার-দাবারের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। তোমার মোটার ধাত।'

অরু বলল, আপা, চুপ কর তো। পুরো চিঠিটা মুখস্থ বলতে হবে না। এমনিতে আপার স্মরণশক্তি খুব খারাপ কিন্তু দুলাভাইয়ের প্রতিটি চিঠি দাড়ি, কমা, কাটাকুটিসহ মুখস্থ।

আবরার হাসল। রাহেলাও হেসে ফেললেন। হাসি গোপন করার চেষ্টা করেও গোপন করতে পারলেন না। মীরু কঠিন গলায় বলল, স্বামীর চিঠি মুখস্থ করা কি অপরাধ ?

না অপরাধ না। তবে সেই চিঠি কবিতার মতো আবৃত্তি করে সবাইকে শোনান একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মীরুর মুখ থমথম করছে। হয়তো সে কেঁদে ফেলবে। রাহেলা পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে বললেন, মীরু তুই আবরারের জন্য এক কাপ চা বানিয়ে আন। রাতে ভাত খাবার পর তুমি কি চা খাও বাবা ?

খাই না। তবে আজ খাব। বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে।

অরু বলল, মা, আমি আর বসে থাকতে পারছি না। তুমি তোমার গেস্টকে যত্ন করে

চা খাওয়াও। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। শরীর খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে খুব ভালোমতো জ্বর আসছে।

মুহিবের অবস্থা মনে হয় খারাপ। একজন ডাক্তার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ছুটে বের হলেন। দু'জন ডাক্তার নিয়ে ফিরলেন। জেবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করছে না।

বজলু এসে বলল, আপা ঘরে গিয়ে বসুন। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন।

জেবা একটু সরে দাঁড়াল। বৃষ্টির ছাঁটে শাড়ির অনেকখানি ভিজেছে, খেয়ালই হয় নি।

শীত লাগছে আপা ?

একটু লাগছে। তোমার স্ত্রী কোথায় ?

ওকে ওর ভাইয়ের বাসায় রেখে এসেছি। খুব কান্নাকাটি করছিল।

ভালো করেছ। সবাই মিলে কষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না।

আপা, আপনি কি কিছু খেয়েছেন ?

না। তোমরা খেয়েছ ?

জ্বি। লিয়াকত টিফিন ক্যারিয়ারে করে বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসেছিল। এমন ক্ষিধে লেগেছিল...

ক্ষিধে লাগাই স্বাভাবিক। ক্রাইসিসের সময় ক্ষিধে পায়।

লিয়াকত চা-ও নিয়ে এসেছে। আপনাকে একটু চা দেব আপা ?

জেবা স্বাভাবিক গলায় বলল, দাও। বজলু খুব অবাক হচ্ছে। কি শক্ত মেয়ে কত সহজভাবে সমস্যা গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত একবারও কাঁদে নি।

বজলু !

জ্বি আপা।

মৃত্যু দেখে আমার অভ্যাস আছে। মা মারা গেলেন, বাবা মারা গেলেন, আমার ছোট একটা বোন ছিল রেবা, সেও মারা গেল। এরা তিনজনই সারারাত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে ভোরবেলা মারা গেল। সবার প্রথমে মারা গেলেন মা। মা'র মৃত্যুতে কেঁদেছিলাম। তারপর আর কাঁদি নি। কান্না আসে নি।

জেবার চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে চা-টা ভালো লাগছে।

আমার কি মনে হয় জান বজলু ? আমার মনে হয় মা-বাবা মৃত্যুর পর পরকালে একটা সংসার পেতেছেন। এক এক করে আমাদের সব ভাইবোনদের নিয়ে যাচ্ছেন। সবার আগে নিলেন রেবাকে। কারণ রেবা ছিল বাবা-মা'র খুব পছন্দের মেয়ে। এখন অপেক্ষা করছেন মুহিবের জন্যে।

এই সব আলোচনা থাক আপা।

কেন ? তোমার কি শুনতে খারাপ লাগছে ? আমার বলতে কিন্তু খারাপ লাগছে না। রেবার মৃত্যুর সময় কি হলো শোন— খুব কষ্ট পাচ্ছিল। রাত দু'টার সময় হঠাৎ করে যেন

তার কষ্ট কমে গেল। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে লাগল। আমি তার মাথার কাছে বসে আছি। সে হঠাৎ শক্ত করে আমার দু'হাত ধরে উত্তেজিত গলায় বলল— আপা দেখ দেখ। আম্মু এসেছে। আম্মু ! সে আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখাতে লাগল।

জেবা চায়ের কাপ বজলুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমাকে আরেকটু চা দাও।

আপনি টুলটায় বসুন।

জেবা বসতে বসতে বলল, আমার কি ধারণা জান বজলু ? আমার ধারণা, আজও বাবা-মা, রেবা এসেছে। তারা মুহিবের খাটের পাশে বসে আছে।

এসব আলোচনা থাক আপা।

আচ্ছা থাক। বজলু একটা কথা বল— মুহিব তো তোমার অনেক দিনের বন্ধু।

জ্বি।

আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সে অনেক কিছু তোমাদের বলত। কি বলত বল তো ?

সবসময় বলত এই পৃথিবীতে আপনার মতো ভালো মেয়ে অতীতে কখনো জন্মায় নি। বর্তমানে নেই— ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

জেবার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমি জানতাম সে এই কথাই বলবে। তবু তোমার কাছে শুনতে চেয়েছি ভালোই করেছি। অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদতে চাচ্ছিলাম, পারছিলাম না। এখন পারছি। তুমি ভাগ্য বিশ্বাস কর বজলু ?

বজলু কিছু বলল না।

জেবা বলল, আমি বিশ্বাস করি। এত বড় এ্যাকসিডেন্ট হলো। এতগুলো মানুষ গাড়িতে, কারোর কিছুই হলো না— মারা যাচ্ছে শুধু একজন। সেই একজন মাত্র। একদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে। মৃত্যুটা দু'দিন আগে কেন হলো না বল তো ? ওর মৃত্যুর পর কী হবে জান ? —চারদিক থেকে শুধু সান্ত্বনার বাণী শুনব। সুন্দর সুন্দর সব বাণী, চমৎকার সব কথা। 'ইহকাল কিছুই না। ইহকাল হচ্ছে মায়া। আসল হচ্ছে পরকাল। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন মানুষের বোঝার উপায় নেই।' কী কী কথা শুনব সব আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি। আগেও তিনবার শুনেছি।

জেবা হয়তো আরো কিছু বলত— কথা থামিয়ে দিল। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে দু'জন ডাক্তার বেরুচ্ছেন। দু'জনের মুখই জ্যোতিহীন। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বলে দেয়া যায়— মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে এরা পরাজিত।

জেবা উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি ওকে দেখে আসি।

নার্স ছাড়াও একজন ডাক্তার মুহিবের পাশে আছেন। জেবা পায়ের কাছে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, ওর নিঃশ্বাসে এ-রকম শব্দ হচ্ছে কেন ? ডাক্তার সাহেব ওর কি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ?

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না।

জেবা বের হয়ে এল।

শফিকুর রহমান সাহেব এসেছেন। বাবার হাত ধরে প্রিয়দর্শিনী দাঁড়িয়ে আছে। দুজনই চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। জেবা তাদের দেখল, কিছু বলল না।

শফিকুর রহমান সাহেব বললেন, প্রিয়দর্শিনী তার মামাকে দেখার জন্যে খুব কান্নাকাটি করছিল। ওকে নিয়ে এসেছি।

এই প্রথম শফিকুর রহমান তাঁর মেয়েকে প্রিয়দর্শিনী নামে ডাকলেন। নাম উচ্চারণ করলেন স্পষ্ট করে, সুন্দর করে।

জেবা বলল, তোমার মামাকে এখন দেখে তোমার ভালো লাগবে না মা। না দেখাই ভালো।

প্রিয়দর্শিনী কঠিন স্বরে বলল, আমি দেখব।

এস আমার সঙ্গে।

আমি একা যাব।

প্রিয়দর্শিনী ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দরজায় হাত রেখে মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল, আমি কি দু'মিনিটের জন্যে ভেতরে আসতে পারি ?

শফিকুর রহমান ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করছেন। স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছেন না। স্বাভাবিক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, জেবা, ওর অবস্থা কেমন ?

জেবা বলল, অবস্থা ভালো না। ডাক্তাররা কিছু বলছেন না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। ওর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। প্রিয়দর্শিনী একা একা গিয়েছে। ও ভয় পাবে।

শফিকুর রহমান বললেন, ও শক্ত মেয়ে, এতটুকুও ভয় পাবে না। আরেকটা কথা জেবা, তুমি নাকি চাও যে মেয়েটার সঙ্গে মুহিবের বিয়ে হয়েছে তাকে এখানে নিয়ে আসতে ?

হ্যাঁ।

সেটা কি ঠিক হবে জেবা ? এই ভয়ংকর ঘটনাটা মেয়ের আড়ালেই হওয়া কি ভালো না ? মেয়েটাকে তো একটা নতুন জীবন শুরু করতে হবে। তাকে যদি এখন এখানে নিয়ে আস তাহলে নতুন করে জীবন শুরু করা তার জন্যে খুব সহজ হবে না। সবচে' ভালো হয় কি জান ? যদি কেউ কোনোদিন না জানে যে মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল। আমি খুব প্রাকটিক্যাল কথা বললাম জেবা। লিভ হার এলোন।

জেবা বলল, তুমি মুহিবের দিকটা দেখবে না ? তুমি কি মনে কর না মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে পাশে পাবার অধিকার আছে ?

শফিকুর রহমান জবাব দিলেন না। কোনো জবাব তাঁর মাথায় এল না।

অরু জেগেই ছিল।

সে জানত আবরার যাবার আগে তার ঘরে একবার উঁকি দেবে। জ্বর কেমন জানতে চাইবে। কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখবে। সেটাই তো স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক আবরার তা করল না। জ্বর দেখতে চাইল না। লাজুক মুখে বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি— আজ আমার জন্মদিন। খুব ইচ্ছা ছিল তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব।

অরু বলল, আগে বললেন না কেন ? বললেই হতো। কোথাও বেড়াতে যেতাম।

লজ্জা লাগল।

তখন লজ্জা লাগল তো এখন লাগছে না কেন ?

আবরার বলল, বুঝতে পারছি না। একটু বসি তোমার ঘরে ?

বসুন।

মীরু এসে বলল, অরু তোর টেলিফোন।

অরু বলল, কে ?

জানি না কে ? একজন মহিলা। বললাম তোর অসুখ। শুয়ে আছিস। তারপরেও চাচ্ছেন। খুব না-কি জরুরি!

অরু উঠে দাঁড়াল। আবরারকে বলল, আপনি কিন্তু নড়বেন না। আমি এক্ষুণি আসছি।

হ্যালো, কে ?

আমাকে তুমি চিনবে না। আমার নাম জেবা। আমি মুহিবের বড় বোন ?

অরু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, স্লামালিকুম আপা।

তুমি কি এক্ষুণি, এই মুহূর্তে আসতে পারবে ?

কোথায় ?

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

কী ব্যাপার আপা ?

মুহিব এ্যাকসিডেন্ট করেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অরু বলল, ওর কি জ্ঞান আছে ?

না, জ্ঞান নেই।

অরু ক্ষীণ স্বরে প্রায় অস্পষ্টভাবে বলল, ওর অবস্থা খুব খারাপ, তাই না আপা ?

হ্যাঁ।

আমি আসছি।

আমি কি আসব তোমাকে নিতে ?

আপনাকে আসতে হবে না।

জামিল সাহেব শোবার আয়োজন করছিলেন। অরু এসে দরজা ধরে দাঁড়াল। জামিল সাহেব বললেন, কী হয়েছে মা ? অরু ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে নিয়ে চল বাবা। আমি একা যেতে পারব না। আমি কিছুতেই একা যেতে পারব না।

অরু হাঁটু গেড়ে মুহিবের পাশে বসে আছে। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। সে চাপা গলায় বলল, ডাক্তার সাহেব, আমি কি ওর হাত একটু ধরতে পারি ?

বৃদ্ধ ডাক্তার কোমল গলায় বললেন, অবশ্যই ধরতে পার মা, অবশ্যই পার।

আমি যদি ওকে কোনো কথা বলি তাহলে ও কি তা শুনবে ?

জানি না মা। কোমার ভেতর আছে, তবে মস্তিষ্ক সচল, শুনতেও পারে। মৃত্যু এবং জীবনের মাঝামাঝি জায়গাটা খুব রহস্যময়। আমরা ডাক্তাররা এই জাগয়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

ডাক্তার সাহেব আমি ওকে কয়েকটা কথা বলব আপনি কি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ওর পাশে থাকতে দেবেন ?

ডাক্তার সাহবে ঘর ছড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে অরু একা। ছোট্ট ঘরটাকে তার সমুদ্রের মতো বড় মনে হচ্ছে। মুহিবের বিছানায় সাদা চাদরের জন্যে বিছানাটাকে মনে হচ্ছে সমুদ্রের ফেনা। সেই ফেনা অবিকল ঢেউয়ের মতো দুলছে।

অরু দু'হাতে মুহিবের ডান হাত ধরে আছে। সে খুব স্পষ্ট করে ডাকল, এই তুমি তাকাও। তোমাকে তাকাতেই হবে। আমি সব কিছুর বিনিময়ে তোমাকে চেয়েছিলাম। তোমাকে পেয়েছি, আমি তোমাকে চলে যেতে দেব না। তোমাকে তাকাতেই হবে। তাকাতেই হবে।

১১

পঁচিশ বছর পরের কথা।

অরুর বড় মেয়ে রুচিরার আজ বিয়ে। বিরাট আয়োজন। ছাদে প্যান্ডেল হয়েছে। পাঁচশ'র মতো মানুষ দাওয়াত করা হয়েছিল— ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হাজারের ওপর দাওয়াতী মেহমান এসে পড়েছে। সমস্যা হচ্ছে আকাশের অবস্থা ভালো না। সারাদিন ঝকঝকে রোদ গিয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই আকাশ মেঘলা। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অরুর স্বামী আবরার সাহেব চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। খাওয়া কম পড়ে গেলে সমস্যা হবে। হোটেলে লোক পাঠিয়েছেন। খবর দিয়ে রাখা— প্রয়োজনে যাতে খাবার চলে আসে।

কিছু মেহমান খাইয়ে দিলে ভিড় পাতলা হতো। খাওয়ান যাচ্ছে না। কারণ বর এখনো আসে নি। বড় দেরি করছে। সন্ধ্যা সাতটার সময় চলে আসার কথা— এখন বাজছে আটটা। আকাশের অবস্থা আরো খারাপ করেছে। বৈশাখ মাস, ঝড়বৃষ্টির কাল। তিরপল দেয়া আছে। ভারি বর্ষণ হলে তিরপলে কাজ হবে বলে মনে হয় না। এই নিয়েও আবরার সাহেব দুশ্চিন্তা করছেন। তাঁর প্রেসারের সমস্যা আছে। সামান্য দুশ্চিন্তাতেও তাঁর প্রেসার বেড়ে যায়। বর আসতে এত দেরি হবার কথা নয়। এত দেরি হচ্ছে কেন ?

বর এল রাত সাড়ে আটটায়।

অরুর মেজো মেয়ে কান্তা ছুটে এসে তার মা'কে বলল, বর এসেছে মা। কী কুৎসিত রুচি দেখলে তুমি বমি করে দেবে। কটকটে হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবি পরে এসেছে। গরম খুব, এই জন্যে না-কি সে আচকান পরে নি। পাঞ্জাবি দেখে আমার সব বন্ধুরা হাসাহাসি করছে।

অরু হাতের কাজ ফেলে বর দেখতে গেলেন। বরের মুখের দিকে তিনি তাকালেন না। তাকিয়ে রইলেন কটকটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবির দিকে। তাঁর গা ঝিমঝিম করতে লাগল। কান্তা বলল, কি হয়েছে মা, এ রকম করছ কেন ?

তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, শরীরটা ভালো লাগছে না মা। আমাকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দে তো।

বিয়েবাড়ির আনন্দ-কোলাহল থেকে তিনি দূরে সরে গেলেন। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন চুপচাপ। আবরার সাহেব খবর শুনে স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন। হাত রাখলেন মাথায়।

অরু বললেন, হাজারো কাজের সময় তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমি ভালো আছি। মাথাটা কেন জানি একটু ঘুরে উঠল।

আবরার সাহেব বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি না গেলে কাজ আটকে থাকবে না।

ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তিরপল না-কি ঝড়ে উড়ে গেছে! তুমি খোঁজখবর করবে না ?

খোঁজখবর করবার লোক আছে। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক তো।

এত সব সমস্যা আর তুমি বসে আছ আমার ঘরে। লোকে হাসাহাসি করবে তো।

করুক হাসাহাসি।

রাত একটার মত বাজে। বিয়েবাড়ি মোটামুটি শান্ত হয়েছে। বরযাত্রীরা চলে গেছে। শুধু বর আর তার কিছু বন্ধু-বান্ধব রয়ে গেছে। এই বাড়িতে বাসর হবে। অল্পবয়স্ক মেয়েদের উৎসাহের সীমা নেই। তারা অকারণে চিৎকার ছোটাছুটি করছে।

কান্তার উৎসাহই সবচে' বেশি। যেন বাসরের যাবতীয় খুঁটিনাটি সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে দেবার পুরা দায়িত্ব তার ওপর। তার বারো বছরের জীবনে এমন উত্তেজনার মুহূর্ত আসে নি। সে ছুটতে ছুটতে মা'র ঘরে এসে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এখন খুব মজা হচ্ছে মা। আপা করছে কি দুলভাইয়ের পাঞ্জাবি আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে। 'বন ফায়ার' হবে। সবার সামনে আগুন দিয়ে পোড়ান হবে।

অরুর চোখে জল এসে যাচ্ছে। তিনি সেই জল সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। আজ তাঁর মেয়ের বিয়ে। এমন আনন্দের দিনে কি আর চোখের জল ফেলতে আছে ?



পোশলে ওঁদের পরী

মোবারক সাহেবের গলার স্বর ভারি ও খসখসে।

কোমল করে কিছু বলতে গেলে স্বর আরো ভারি হয়ে যায়। তবু তিনি চেষ্টা করলেন কোমল করে কিছু বলতে। মেয়েটার সঙ্গে শুরুতে একটু ভাব করে নেয়া দরকার। অল্প বয়সী মেয়ে— গলা শুনেই যেন ঘাবড়ে না যায়। কী বলা যায় ? নাম জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। যে-কোনো কথোপকথন নাম জানার মাধ্যমে শুরু হতে পারে।

রাত এগারটা। মেয়েটি এবং তিনি বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছেন অথচ তিনি তার নাম জানেন না। বেশ মজার ব্যাপার। মেয়েটিও নিশ্চয়ই তার নাম জানে না। নাকি জানে ? এ জাতীয় মেয়েরা তলে তলে খুব চালাক চতুর হয়। নামধাম সব জেনে নিয়েছে হয়তো।

মোবারক সাহেব হাসির মতো ভঙ্গি করে বললেন, তোমার নাম কী ?

মেয়েটি রিনরিনে গলায় বলল, টেপী।

কী নাম বললে ?

টেপী। ট-একারে টে, প ঈ-কারে পী— টেপী।

মোবারক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ফাজলামি করছ নাকি ?

ফাজলামি করব কেন ? নাম জিজ্ঞেস করেছেন, নাম বললাম।

মেয়েটা হাসছে। ঝনঝন শব্দে হাসছে। মোবারক সাহেব উঁচু গলায় বললেন, সত্যি তোমার নাম টেপী ?

হুঁ। আমার বড় বোনের নাম হ্যাপী। তার সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম টেপী।

আবারো খিলখিল হাসি। মেয়েটার গলার ভেতর কি একগাদা কৃস্টালের টুকরা রেখে দেয়া ? হাসলেই ঝনঝন শব্দ। নাকি এই বয়সের মেয়েরা এ রকম করেই হাসে!

মোবারক সাহেবের ধারণা হলো, মেয়েটা তাঁর সঙ্গে ফাজলামি করছে। পুচকা একটা মেয়ে ফাজলামি করছে, ভাবাই যায় না। মেয়েটার বয়স কত ? কুড়ি-একুশ, নাকি তারচেয়েও কম ?

মেয়েটি ফাজলামি করছে কিনা নিশ্চিত হওয়া দরকার। কীভাবে নিশ্চিত হবেন মোবারক সাহেব বুঝতে পারছেন না। হ্যাপীর সঙ্গে মিলিয়ে টেপী নাম কেউ রাখলে রাখতেও পারে। লো-ক্লাস ফ্যামিলিতে নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। প্রথম বাচ্চাটার নাম ঠিকঠাক মতো রাখে; তারপর উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

তোমরা কি দুই বোন ?

না, তিন বোন।

তৃতীয় বোনের নাম কী ?

পেপী।

মোবারক সাহেব থমথমে গলায় বললেন, তৃতীয় বোনের নাম পেপী ?

জ্বি। বোনদের নাম মিলিয়ে রাখতে হয়। নাম মিলিয়ে না রাখলে বেহেশতে বোনে বোনে দেখা হয় না।

তুমি পড়াশুনো কতদূর করেছ ?

ক্লাস ফাইভ।

কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় ক্লাস ফাইভের চেয়ে বেশি পড়েছ এবং আমার ধারণা তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছ।

আপনি মুরব্বি মানুষ। আপনার সঙ্গে রসিকতা করব কেন?

তিনি বাতি জ্বালালেন।

বাতি জ্বলামাত্র মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, বাতি নেভান, বাতি নেভান। গায়ে কাপড় নাই। তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন। টেপী সঙ্গে সঙ্গে বলল, এখন জ্বালেন। কাপড় পরেছি।

তিনি বাতি জ্বালালেন না। হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পের কাছে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরালেন। লাইটারের আলোয় মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছা করছিল, সেই ইচ্ছা দমন করলেন। তিনি সূক্ষ্ম এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটির কোনো একটা ব্যাপার তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। সেটা যে কী তাও বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির চুল থেকে কোনো রিপালসিভ গন্ধ কি আসছে? কিংবা শাড়ি থেকে ন্যাপথলিনের ঘ্রাণ? এইসব মেয়েরা তাদের ভালো শাড়িগুলোর ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিয়ে রাখে। যেন পোকায় কেটে শাড়ি নষ্ট না করে।

সিগারেট টেনে তিনি আরাম পাচ্ছেন না। তামাকের গন্ধটা অনেক কড়া লাগছে। বমি বমি লাগছে। সিগারেট ফেলে দিতে হবে। টেবিল ল্যাম্পের কাছে অ্যাশট্রে থাকে, আজ নেই। হাউসকিপিং ঠিকমতো হচ্ছে না। তিনি খাট থেকে নামলেন। টেপী সঙ্গে সঙ্গে বলল, কোথায় যান?

তিনি জবাব দিলেন না। অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুমের বাতি জ্বালালেন। আয়নায় নিজেকে দেখলেন। যতটা না বয়স তারচেয়েও কি বেশি দেখাচ্ছে? তাঁর বয়স তিপ্পান্ন, আয়নায় একজন বুড়ো মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তিনি জ্বলন্ত সিগারেট কমোডে ফেলে দিলেন। ফ্লাশ টানলেন। পানির সঙ্গে সিগারেট চলে গেল না। ভাসতে থাকল। মুখে পানি ছিটিয়ে টাওয়েল হাতে শোবার ঘরে ঢুকলেন। শোবার ঘরের প্রধান সুইচটি টিপে দিলেন। একসঙ্গে তিনটি বাতি জ্বলে ঘরটাকে ঝলমলে করে ফেলল।

মেয়েটি তাকে মিথ্যা বলেছে। সে কাপড় পরে নি। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়ে আছে। কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। মেয়েটা দেখতে ভালো। বয়সের নিজস্ব সৌন্দর্য ছাড়াও বাড়তি কিছু তার মধ্যে আছে। রং শ্যামলা। রং শ্যামলা বলেই চোখের কাজল এত সুন্দর লাগছে। কাটা কাটা নাক-মুখ। মেয়েটির চুল বেণি করা ছিল, এখন নেই। এক ফাঁকে নিশ্চয়ই খুলেছে। কখন খুলল?

টেপী বলল, আপনার কি শরীর খারাপ করেছে?

তিনি জবাব দিলেন না, তবে প্রশ্নটা শোনার পর থেকে তাঁর শরীর একটু খারাপ লাগতে লাগল। মাথা ঝিম ধরে আছে। বমি ভাবটা যায় নি। তিনি শোবার ঘরের জানালার দিকে এগুলেন— একটা জানালা খুলে দিতে হবে। ঘরে বিশুদ্ধ কিছু বাতাস ঢুকুক। এয়ারকুলার চলছে বলে সব ক'টা জানালা বন্ধ। সিগারেটের ধোঁয়া ঘরে আটকে আছে। সিগারেটের ধোঁয়া যত বাসি হয় তার উৎকট ভাব ততই বাড়ে। জানালার পাশে তাঁর ফ্রিজার। শোবার ঘরে কেউ ফ্রিজার রাখে না। তিনি রেখেছেন। তাঁর খুব ঘনঘন পিপাসা হয়। তখন বরফশীতল পানি খেতে হয়। এই ফ্রিজারটা ভালো, পানি রাখামাত্র ঠাণ্ডা হয়। জানালা না খুলে তিনি তাঁর ফ্রিজারের দরজা খুললেন।

এখন তাঁর কোনো পিপাসা হয় নি। তবু ঠিক করলেন আধগ্লাস পানি খাবেন— এতে যদি অস্বস্তি ভাবটা কাটে। তিনি পানির বোতল বের করলেন। ফ্রিজারের উপর দু'টা পানির গ্লাস থাকার কথা— তাই আছে। তিনি গ্লাসে মেপে মেপে আধগ্লাস পানি ঢাললেন। বেশিও না, কমও না।

মেয়েটি বলল, কী খান ? মদ ?

মোবারক সাহেব সহজ গলায় বললেন, না, পানি খাই।

আমি ভাবছিলাম মদ।

মেয়েটি আবার হাসছে। না, হাসি সুন্দর। ঝনঝনে শব্দটা শুনে ভালো লাগছে।

মোবারক সাহেব কখনো এক চুমুকে পানি খান না। গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দেন। আজ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে বললেন, তোমার নাম হচ্ছে টেপী, তাই তো ?

জ্বি।

শোন টেপী, তুমি বাসায় চলে যাও।

টেপী অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তার ভুরু কুঁচকে গেছে। এতক্ষণ সে শুয়ে ছিল, এখন আধশোয়া হয়ে বসল।

বাসায় চলে যাব ?

হ্যাঁ।

আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন ?

রাগ করি নি। তুমি কাপড় পর, কাপড় পরে বাসায় চলে যাও।

এত রাতে বাসায় কীভাবে যাব ?

ড্রাইভার আছে। ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দেবে। অসুবিধা হবে না। তুমি থাক কোথায় ?

অনেক দূরে থাকি। জয়দেবপুর।

ড্রাইভারকে বললেই হবে।

মোবারক সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। সে চাদরের নিচেই ব্লাউজ পরার চেষ্টা করছে। ফুলতোলা চাদর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে। মেয়েটাকে ভালোমতো কাপড় পরার সুযোগ দেয়ার জন্যেই তার এ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তিনি গেলেন না। এদের প্রশ্রয় দেয়ার কোনো কারণ নেই। স্ট্রিটগার্লদের স্ট্রিটগার্লের মতোই 'ট্রিট' করা উচিত। মেয়েটাকে অবশ্যি স্ট্রিটগার্লের মতো দেখাচ্ছে না। ভদ্র পরিবারের আহ্লাদী মেয়ের মতো লাগছে। কে জানে মেয়েটা হয়তো এই জীবনেই সুখী।

তোমার ঐ জয়দেবপুরের বাসায় কে থাকেন ? তোমার বাবা-মা ?

মেয়েটি চাদর দাঁত দিয়ে চেপে ধরেই কথা বলছে। কথাগুলো অস্পষ্ট এবং জড়ানো শোনা যাচ্ছে। সে বলল, মা থাকে আর আমার ছোট মামা।

বাবা কি মারা গেছেন ?

না, বাবা আমাদের সঙ্গে থাকে না।

বোন দু'জন থাকে ? হ্যাপী এবং পেপী ?

হুঁ।

তোমার ভালো নাম কী?

আমার একটাই নাম। আচ্ছা আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

মোবারক সাহেব জবাব দিতে গিয়েও জবাব দিতে পারলেন না, একটু চমকে উঠলেন। কারণ মেয়েটি চাদর ফেলে দিয়েছে। ব্লাউজ সে ঠিকমতো পরে নি। বোতাম লাগানো হয় নি। ব্লাউজের নিচে কাঁচুলি নেই। গভীর আমন্ত্রণের ছবি। সে বলল, এত রাতে বাসায় গেলে আমার খুব অসুবিধা হবে। আমি বলে এসেছি সারারাত শুটিং।

মোবারক সাহেবের মনে পড়ল— এই মেয়ে ছবিতে কাজ করে। এক্সট্রা। মূল নায়িকার সঙ্গে নাচে কিংবা গান গায়। নায়িকা যখন পুকুরে নেমে জলকেলি করে তখন সেও সঙ্গে থাকে। নায়িকার ভেজা শরীরের সঙ্গে তার ভেজা শরীরও দেখা যায়। এই মেয়েটির ভেজা শরীর নিশ্চয়ই নায়িকার শরীরের চেয়ে অনেক সুন্দর।

তোমার হাতে এখন যে ছবি তার নাম কী?

প্রেম দেওয়ানা।

ছবিতে তুমি যে চরিত্রটা করছ সেটা কি নায়িকার সখী?

উঁহুঁ— আমি খারাপ লোকদের আস্তানার একজন বাইজী।

গান গাও, না নাচ?

নাচি।

নাচ জান?

না। ড্যান্সমাস্টার আছে, শিখিয়ে দেয়। ঐগুলা নাচ না— হাত-পা নাড়া।

মোবারক সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটার কথা শুনতে তার ভালো লাগছে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে এত কথা তিনি কারো সঙ্গে বলেন নি। আজ বলে ফেলেছেন। কথা বলতে ভালো লাগার কারণ কি? মেয়েটির গলার স্বর অস্বাভাবিক সুন্দর এটা একটা কারণ হতে পারে। দ্বিতীয় কারণটা স্থূল। খোলা ব্লাউজে মেয়েটি যে ভঙ্গিতে বসে আছে সে ভঙ্গিটা দেখতে ভালো লাগে। মোবারক সাহেবের মনে হলো পুরুষ প্রলুব্ধ করার এই ভঙ্গিটা মেয়েটি আগেও ব্যবহার করেছে। এটি তার বহু ব্যবহৃত কৌশল।

আপনি কি আমার নাচ দেখবেন?

নাচ?

আপনার ঘরে নাচের বাজনা আছে না? ইংরেজি বাজনা।

তুমি তো নাচ জান না। বাজনা থাকলে কী হবে? তাছাড়া নাচ দেখতে আমার ইচ্ছা করছে না। তুমি কাপড় পর। কাপড় পরে চলে যাও।

সারারাত শ্যুটিঙের কথা বাসায় বলে এসেছি।

বলবে শুটিং ক্যানসেল হয়ে গেছে। তোমাদের শুটিং ক্যানসেল হয় না?

হয়। আমরা বলি প্যাকআপ।

বাসায় গিয়ে তাই বলবে। বলবে শুটিং প্যাকআপ হয়েছে।

আচ্ছা আমি বলব। এখন আপনি অন্য ঘরে যান। আমি শাড়ি পরব।

অন্য ঘরে যেতে হবে না। আমার সামনেই পর।

আপনার সামনে আমি পরব কেন ? আপনি কি আমার স্বামী ?

মেয়েটি কঠিন গলায় কথাগুলো বললেও তার মুখ হাসি হাসি। মোবারক সাহেব ঘর ছেড়ে গেলেন না। ওয়ারড্রোব খুললেন। হ্যাণ্ডারে পাঞ্জাবি ঝুলানো আছে। পাঞ্জাবির পকেটে মানিব্যাগ। মেয়েটিকে টাকা-পয়সা আগেই দেয়া হয়েছে— আরো কিছু দেয়া যাক। তিনি চারটা পাঁচ শ টাকার নোট বের করলেন। এক্সট্রা অভিনেত্রী হিসেবে এই মেয়ে কত রোজগার করে কে জানে।

তুমি যে অভিনয় কর কত পাও ?

শিফট হিসাবে পাই। এক শিফটে দু'শ পঞ্চাশ টাকা।

কতক্ষণে এক শিফট ?

আট ঘণ্টায় এক শিফট।

নাও টাকাটা রাখ।

কেন ?

খুশি হয়ে দিচ্ছি।

খুশি তো আপনি হন নাই। আপনি বেজার হয়েছেন।

না আমি খুশি, নাও।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। মোবারক সাহেব পাশের ঘরে চলে এলেন। এই কামরা শোবার ঘরেরই এক্সটেনশান। ছোট্ট একটা বসার ঘর। চারটা গদি আঁটা নিচু চেয়ার। একটা লেখার টেবিল। টেবিলের পাশে আরেকটা তাকে পার্সোনাল কম্পিউটার— মেকেনটস এল সি থ্রি। এই কম্পিউটার তিনি শুধুমাত্র দাবা খেলার জন্যে ব্যবহার করেন। কম্পিউটারে দাবার উপর খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম আছে। ঘরের এক প্রান্তে বইয়ের সেলফ। একগাদা ইংরেজি ভূতের বইয়ে শেলফ ভর্তি। আসবাব বলতে এই।

মোবারক সাহেব লেখার টেবিলে বসলেন। টেবিলের উপর পেজ মার্ক লাগানো একটা বই— স্টিভেন ওয়াইনবার্গের— "The First 3 minutes". প্রথম চ্যাপ্টারে পেজ মার্ক দেয়া।. প্রথম চ্যাপ্টারের নাম— The Giant and the Cow. দৈত্য ও গরু। চ্যাপ্টারের শিরোনাম হিসেবে সুন্দর। তিনি পেজ মার্ক দিয়েছেন, পড়তে শুরু করেন নি।

টেবিলের উপর ইন্টারকমে ছোট্ট লালবাতি জ্বলছে। ইন্টারকমের বোতাম টেপামাত্র একতলা থেকে ইদরিস বলবে, স্যার স্লালামিকুম।

এখন রাত বেশি না— এগারটা চল্লিশ। রাত তিনটায় বোতাম টিপলেও সঙ্গে সঙ্গে ইদরিসের সাড়া পাওয়া যাবে।

তিনি ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইদরিস বলল, স্যার স্লামালিকুম।

ইদরিস তুমি মেয়েটিকে পৌছে দিয়ে এস।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

আজ আমার সাইড টেবিলে অ্যাশট্রে ছিল না কেন ইদরিস ?

ইদরিস জবাব দিল না। তিনি বুঝতে পারছেন ইদরিসের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে।

কেউ কি টেলিফোন করেছিল ?

আম্মা টেলিফোন করেছিলেন। আমি বলেছি আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঠিক আছে।

আম্মা বলেছেন খুব জরুরি।

মোবারক সাহেব ইন্টারকম নামিয়ে রাখতেই দরজা ধরে মেয়েটি দাঁড়াল। মেয়েটিকে এখন কেমন অসহায় লাগছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, আমি যাই?

আচ্ছা।

আপনি আমার উপর রাগ করেছেন কেন আমি বুঝলাম না।

রাগ করি নি। আমি আরেকদিন তোমার নাচ দেখব।

বের হব কোন দিক দিয়ে?

দরজা খুলে হলঘরে চলে যাও। সেখান থেকে নিচে নামার সিঁড়ি আছে। নিচে নামলেই দেখবে ইদরিস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

জ্বি আচ্ছা।

এত বড় বাড়ি কিন্তু কোনো শব্দ নেই। সুনসান নীরবতা। মোবারক সাহেব কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটির নেমে যাওয়ার শব্দ শুনলেন। কলাপসিবল গেট খোলার শব্দ শুনলেন। গাড়ি স্ট্যার্ট দিয়ে বের হবার শব্দ শুনলেন। তখন তাঁর মনে হলো, মেয়েটিকে রেখে দিলে পারতেন। টুকটাক করে সুন্দর কথা বলছিল। মাঝে মাঝে অতি তুচ্ছ কথা শুনতেও ভালো লাগে। তিনি আবারো কলিংবেলে হাত রাখলেন, ইদরিস বলল, স্যার স্লামালিকুম। ইদরিস তাহলে মেয়েটির সঙ্গে যায় নি। ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইদরিস তাকে একা রেখে যাবে না এটা ধরে নেয়া যায়।

ইসরিস!

জ্বি স্যার।

বাসার সঙ্গে টেলিফোন কানেকশন করে দাও, রেহানার সঙ্গে কথা বলব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

তিনি টেলিফোন ধরার জন্যে লবিতে চলে এলেন। তাঁর শোবার ঘরে কোনো টেলিফোন নেই।

কে রেহানা?

হ্যাঁ। ওমা একটু আগে ইদরিস বলল তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ভুল বলেছে। আমি জেগেই ছিলাম। বাতি নিভিয়ে শুয়ে ছিলাম, ইদরিস ভেবেছে ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমি টেলিফোন করেছিলে কেন?

নাজু অ্যাকসিডেন্ট করেছে।

নাজুটা কে মোবারক সাহেব চিনতে পারলেন না। তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের কেউ হবে। রেহানার দশ হাজার আত্মীয় আছে ঢাকা শহরে। তাদের সবাইকে চেনা সম্ভব নয়। চেনার কোনো প্রয়োজনও নেই।

ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট। কী হয়েছে শোন ...

মোবারক সাহেব দীর্ঘ গল্প শোনার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। রেহানা অল্প

কথায় কিছুই বলতে পারে না। 'সামারি এন্ড সাবসটেন্স' বলে তার কিছু নেই। সে ছোট্ট একটা গল্পকে রবারের মতো টেনে লম্বা করবে। মূল গল্প বলতে বলতে শাখা গল্পে চলে যাবে। সেখান থেকে যাবে প্রশাখায়...। এক সময় কোনটা আসল গল্প কোনটা প্রশাখা কিছুই বোঝা যাবে না।

নাজু নিউ এলিফ্যান্ট রোডে মোজা কিনতে গিয়েছিল। বাটা সিগন্যালের কাছে যে দোকানগুলো ছিল সেখান থেকে মোজা কিনে গাড়িতে উঠেছে। আজ আবার তার ড্রাইভার আসে নি। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। স্টার্ট নেবার সময় হঠাৎ অ্যাক্সিলেটরে পা দিয়ে ফেলেছে— সামনে এক লোক গ্যাস বেলুন বিক্রি করছিল, ওকে হিট করল...

মোবারক সাহেব ওয়াইনবার্গের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। পড়তে শুরু করবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। অ্যাকসিডেন্টের গল্প দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলার কথা। ক্লান্তিহীন কথা একজন মানুষ কী করে বলতে পারে? মোবারক সাহেব টেলিফোনের কথা শোনায় আবার মন দিলেন— মাঝখানে তিনি বোধহয় কিছু মিস করেছেন, এখন হচ্ছে জন্মদিনের কেকের কথা। অ্যাকসিডেন্ট থেকে জন্মদিনের কেকের গল্প কীভাবে চলে এল কে জানে।

সোনারগাঁয়ে গিয়েছে কেকের জন্যে— ওরা বলল, দু'কেজির কম হলে কালই দিতে পারবে। এক শ মানুষের জন্যে দু'কেজি কেক— এ কি হবে? আধ চামচ করেও তো হবে না। তুমিই বল, জন্মদিনে এক শ মানুষ হবে না?

কার জন্মদিনে এক শ মানুষ হবে মোবারক সাহেব কিছুই জানেন না। তারপরেও বললেন, আমার ধারণা এক শর বেশি হবে।

এই তো তুমি বললে এক শর বেশি হবে। আমিও তাই বলছি। রুনীর ধারণা কেউ আসবে না...

মোবারক সাহেব কথার মাঝখানে কথা বলার মতো অভদ্রতা শেষ পর্যন্ত করলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, রেহানা শোন, আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি বরং শুয়ে পড়ি।

কখন মাথা ধরল?

সন্ধ্যা থেকেই।

সে কী! কোনো ডাক্তার ডাক নি।

সামান্য মাথাধরা। তার জন্য আবার ডাক্তার।

মাথাধরা কখনো সমান্য ভাববে না। অনেক মেজর ডিজিজের ফার্স্ট ওয়ার্নিং হচ্ছে মাথাধরা। মাথাধরাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে।

আচ্ছা এখন থেকে সিরিয়াসলি নেব। রেহানা রাখি?

রেহানা কিছু বলার আগেই তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। ঘুম আসছে কিনা তিনি বুঝতে পারছেন না। ক্লান্তি লাগছে। ক্লান্তি এবং ঘুম পাওয়া এক জিনিস নয়। রাত জেগে খানিকক্ষণ ভূতের গল্প পড়া যেতে পারে। ঘুম আনার জন্যে ভূতের গল্প খুব কাজে আসে।

মোবারক সাহেব বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন পাঁচ শ টাকার নোট চারটি চাদরের উপর পড়ে আছে। মেয়েটি কি ভুল করে ফেলে গেছে, না ইচ্ছা করে ফেলে গেছে। অতি তুচ্ছ যে মানুষ, তারও খানিকটা অহঙ্কার থাকে। সেই অহঙ্কারের কারণে টাকা রেখে যাওয়া? তা বোধহয় না। মেয়েটি শুধু যে টাকা ফেলে গেছে তাই না— চুলের ফিতাও ফেলে গেছে। মেয়েরা চুলের ফিতা, খোঁপার কাঁটা এইসব ব্যাপারে খুব সাবধানী হয়।

এই মেয়েটি সম্ভবত ভুলো মনের। সে হয়তো ভেবেছে তার হ্যান্ডব্যাগে টাকাগুলো রেখেছে— আসলে রাখে নি।

তিনি ভূতের গল্পে মন দেবার চেষ্টা করলেন। এলিন নামের একটা মেয়ে একা একা তার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকে। সেভেন ইলিভেন শপে কাজ করে রাত দশটার দিকে ফেরে। শীতের রাত— ঘন কুয়াশা পড়েছে। ঘন কুয়াশার জন্যে এলিনের মনে হচ্ছে কে যেন তাকে ফলো করছে। সে যখন হাঁটে তখন পেছন থেকে জুতার শব্দ পাওয়া যায়। সে থেমে গেলেই জুতার শব্দ থেমে যায়। এলিন ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, কে ?

আমি।

যে আমি বলল তার গলার স্বর খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। অথচ এলিন সেই পরিচিত শব্দ চিনতে পারছে না। এলিন ভয়ে ভয়ে বলল, কুয়াশার জন্যে আমি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পারছি না। তুমি কি দয়া করে এগিয়ে আসবে ?

খটখট জুতার শব্দ করে যে এগিয়ে এল সে দেখতে অবিকল এলিনের মতো। পোশাকও পরেছে এলিনের মতো। গলায় লাল স্কার্ফ। হাতে হলুদ দস্তানা। গায়ে ছাইরঙা ব্লেজার।

মোটামুটি জমাট গল্প। খুব জমাট গল্পে মোবারক সাহেবের ঘুম ধরে যায়। মস্তিষ্কের একটি অংশ গল্পটা পড়তে চায়। অন্য অংশ বলে— শুয়ে পড়। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

গল্পটা পড়ার জন্যে উৎসাহ যত বাড়ে, ঘুমও ততই বাড়ে। আজ তা হচ্ছে না। আজ তিনি সূক্ষ্ম এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করছেন। যন্ত্রণাও ঠিক না— অস্বস্তি। মশারি খাটিয়ে ঘুমুতে যাবার পর কেউ যদি সেখানে ফুটো আবিষ্কার করে তখন যেমন অস্বস্তি লাগে, সে রকম অস্বস্তি। চোখে ঘুম না আসা পর্যন্ত মনে হয় এই বুঝি ফুটো দিয়ে মশা ঢুকে গেল।

তাঁর অস্বস্তির কারণটা কী ? মেয়েটা এই বিছানাতেই শুয়ে ছিল— চাদর বদলানো হয় নি। তার গায়ের গন্ধ চাদরে লেগে আছে— এই জন্যেই কি অস্বস্তি ?

মোবারক সাহেব বিছানার চাদর বদলালেন। বালিশের ওয়ার বদলালেন। লাভ হলো না। রাত সাড়ে চারটা পর্যন্ত তিনি অঘুমো বসে রইলেন। অথচ তাঁর ঘুম দরকার। কাল সন্ধ্যায় তিনি জাপান যাবেন। তাঁর একটা জাহাজ টেরিফ আইন ভঙ্গের দায়ে জাপানে আটকা পড়েছে। জাহাজের স্কিপারের লাইসেন্সেও নাকি কী সমস্যা আছে। তাঁকে যেতে হবে। দীর্ঘ ক্লান্তিকর ভ্রমণের আগে আরাম করে ঘুমানোর প্রয়োজন ছিল।

তিনি ভূতের বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। মেডিসিন বক্স থেকে ঘুমের ওষুধ বের করে খাবেন। একটা হিপনল তার সঙ্গে দু'টা প্যারাসিটামল। ওষুধ খাবার পর গরম এক কাপ কফি খেলে ভালো হতো। কফি খেলে সবার ঘুম চটে যায়। তার উল্টোটা হয়— ঘুম পায়।

মোবারক সাহেব ওষুধ খেয়ে পাশের ঘরে গেলেন। ইন্টারকম তোলামাত্র ইদরিস বলল, স্যার স্লামালিকুম। মোবারক সাহেবের ধারণা তিনি যে ক'দিন এ বাড়িতে থাকেন সে ক'দিন ইদরিস ঘুমায় না। ইন্টারকমের পাশে জেগে বসে থাকে।

ইদরিস।

জ্বি স্যার।

কড়া করে এক কাপ কফি খাওয়াও তো।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঐ মেয়েকে কি দিয়ে এসেছে ?

অনেক আগেই গাড়ি চলে এসেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

তিনি আবার শোবার ঘরে চলে এলেন। বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে গরম কফির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো— মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে জাপানে নিয়ে গেলে কেমন হয়। মেয়েটির জন্যে সেটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার হবে না! সে হয়তো জীবনের প্রথম প্লেনে চড়বে, জীবনের প্রথম দেশের বাইরে যাবে। পদে পদে বিস্মিত হবে। তিনি খুব কাছ থেকে সেই বিস্ময় দেখবেন। বিস্মিত মানুষকে দেখতে ভালো লাগে। তার আশপাশে যারা থাকে তারা কেউ বিস্মিত হয় না। তিনি নিজেও বিস্মিত হওয়া ভুলে গেছেন।

একদিনে মেয়েটির পাসপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থা করা সমস্যা নয় বলেই তিনি মনে করেন। লোকমানকে খবর দিলেই সে ব্যবস্থা করবে। লোকমান পারে না এমন কাজ নেই। যে-কোনো কাজ দিয়ে তিনি যদি লোকমানকে বলেন— লোকমান, পারবে না ? লোকমান তখন হতাশ তাকিয়ে থাকবে, মাথা চুলকাবে— ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলবে। তার ভাব দেখে মনে হবে সে গভীর সমুদ্রে পড়েছে কিন্তু বলবে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। অস্পষ্ট গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলবে— কেন পারব না ?

এ ধরনের কথা বলার লোক দ্রুত কমে যাচ্ছে। কোনো কাজ দিলে বেশিরভাগ লোক বলে, স্যার চেষ্টা করে দেখব। সেই চেষ্টাটাও করে না।

দরজায় টোকা পড়ছে। গরম কফি নিয়ে ইদরিস চলে এসেছে। লোকমানের মতো এই আরেকজন। কুকুরের মতো অনুগত।

ইদরিস ভেতরে আস।

ইদরিস ঢুকল। মোবারক সাহেবের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। কখনো তাকায় না। টেবিলে কফির কাপ নামিয়ে রাখল। মোবারক সাহেব কাপ হাতে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বললেন, কফি ভালো হয়েছে। শোন ইদরিস, আমি সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমুব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

লোকমানকে আমার একটু দরকার।

দশটার সময় আসতে বলব স্যার ?

তিনি জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। ইদরিস বলল, এখন কি স্যার টেলিফোনে ধরে দেব ? কথা বলবেন ?

মোবারক সাহেব একটু চমকে গেলেন। এই মুহূর্তে তিনি ঠিক টেলিফোনে কথা বলার কথাই ভাবছিলেন। খুব যারা অনুগত তাদের মধ্যে টেলিপ্যাথিক সেন্স কাজ করে। ব্যাপারটা তিনি আগেও লক্ষ করেছেন। কুকুর তার প্রভুর মুড বুঝতে পারে— কুকুরের মতো যারা অনুগত তারাও পারে।

দাও, টেলিফোনে ধরে দাও।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

তিনি হালকা চুমুকে কফি খাচ্ছেন। কফি খেতে তাঁর ভালো লাগছে। ইদরিস এখনো টেলিফোনের লাইন দেয় নি। এখন দেবেও না— স্যারের কফি খাওয়া কখন শেখ হবে তার জন্য অপেক্ষা করবে। তিনি কফি শেষ করে কাপ টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বাজল। এও কি টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ?

স্যার আমি লোকমান। আপনার শরীর ভালো স্যার ?

হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ লোকমান ?

আপনার দোয়া স্যার।

এত রাতে তোমাকে জাগালাম...

কোনো অসুবিধা নেই স্যার। আমি জেগেই ছিলাম।

জেগে ছিলে কেন ?

আমার স্যার একটা অসুখ আছে। রাতে ঘুম হয় না।

জানতাম না তো।

আমাকে খোঁজ করছিলেন কেন স্যার ?

শোন লোকমান, কাল দিনের ভেতর তুমি একটা পাসপোর্ট এবং জাপানের ভিসার ব্যবস্থা করতে পারবে ?

পাসপোর্ট কোনো ব্যাপার না স্যার।

ভিসা পাওয়া যাবে না ?

কাল তো স্যার রোববার—জাপান এম্বেসি বন্ধ। সব ফরেন এম্বেসিই বন্ধ।

ভিসা তাহলে সম্ভব না ?

সম্ভব না এমন কথা তো স্যার আমি বলি নি।

পারবে ?

কেন পারব না ?

মোবারক সাহেব তৃপ্তির হাসি হাসলেন। লোকমান বলল, স্যার যাবে কে ?

তুমি সকালে চলে এস, তখন বলব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

কত দিন ধরে তুমি রাতে ঘুমুতে পার না ?

অনেকদিন স্যার।

অনেকদিন মানে কত দিন ?

প্রায় চার বছর।

ও আচ্ছা। টেলিফোন তাহলে রাখি ?

জ্বি আচ্ছা স্যার। আমি সকালে চলে আসব।

মোবারক সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুলেন। অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করলেন। কফির মিষ্টি স্বাদ মুখে নিয়ে ঘুমুতে যাওয়া যায় না। একটু পান খেতে পারলে হতো। মৌরি দেয়া ছোট্ট এক খিলি পান।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। পর পর দু'বার হাই উঠল। শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। লোহিত রক্ত কণিকারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে— তারা এখন আর আগের মতো

অক্সিজেন নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারছে না।

তিনি জানালার ভিনিশিয়ান ব্লাইন্ডগুলো টেনে দিলেন। দিনের আলো যেন ঘরে না ঢোকে। পাঁচ ঘণ্টা তিনি একনাগাড়ে ঘুমুবেন। ফাইভ লং আওয়ার্স। থ্রি হানড্রেড মিনিটস।

পুরোপুরিভাবে বিছানায় যাবার আগে আবারো কী মনে করে ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন। ইদরিস সঙ্গে সঙ্গে বলল, স্লামালিকুম স্যার। তার বোধহয় লোকমানের মতো অনিদ্রা রোগ আছে।

ইদরিস !

জ্বি স্যার।

লোকমানের সকালে আসার দরকার নেই। ওকে নিষেধ করে দিও।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঘুমের ওষুধ, গরম কফি, সারাদিনের ক্লান্তি সব একসঙ্গে চেপে ধরেছে। তাঁর কেমন যেন একা লাগছে। একটু ভয় ভয়ও লাগছে। একজন কেউ পাশে থাকলে ভালো লাগত। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার সময় একজন কাউকে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। মোবারক সাহেব অস্বস্তি বোধ করছেন। কী একটা জিনিস যেন তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। টেপী নামের মেয়েটির শরীরে গন্ধ ? হতে পারে। মানুষ চলে যায় কিন্তু সে তার গায়ের গন্ধ রেখে যায়। এই গন্ধ মোবারক সাহেবের পরিচিত— খুবই পরিচিত। এই জন্যেই কি তাঁর অস্বস্তি লাগছে ?

কী বিশ্রী নাম মেয়েটার ! নাম বদলে দিতে বলতে হবে— মেয়েটার জন্যে সুন্দর একটা নাম দরকার— ময়ূরাক্ষী নামটা কেমন ? ময়ূরের মতো চোখ। ময়ূরের চোখ কি সুন্দর ? তিনি জানেন না। ময়ূর দেখেছেন কিন্তু ময়ূরের চোখের দিকে বিশেষ করে তাকিয়ে দেখেন নি। মানুষের চোখের তুলনা মানুষের চোখের সঙ্গেই হওয়া উচিত— পাখির চোখের সঙ্গে নয়। গন্ধটা নাকে লাগছে। মোবারক সাহেব পাশ ফিরলেন।

২

ন'টা থেকে মুখে মেকআপ নিয়ে রেশমা বসে আছে। ইন্টারকাটে তার একটা ক্লোজআপ যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এক্সট্রাদের ক্লোজআপ কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয় না। মূল শটগুলো ঠিকঠাক রাখার জন্যে এক্সট্রাদের দু'একটা ক্লোজআপ মাঝে মাঝে চলে আসে।

চোরাকারবারিদের আস্তানার সেট পড়েছে। নায়ক ফরহাদ চোরকারবারিদের হাতে ধরা পড়েছে। তাকে একটা খাম্বার সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে। এই উপলক্ষে চোরাকারবারিদের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে যাচ্ছে। মদ খাওয়া হচ্ছে। ফ্লোরে নাচের ব্যবস্থাও আছে। একদিকে ছবির হিরো আগুনে পুড়বে। অন্যদিকে নাচ চলবে। নায়ক ফরহাদের শট নেয়া হচ্ছে, চোরাকারবারিদের শট নেয়া হচ্ছে।

ফরহাদ সুপারহিট নায়ক। পরপর তিনটা ছবি তার হিট করেছে : বিজ্ঞাপনে তার সম্পর্কে লেখা হয়— গ্যালাক্সি হিট রোমান্টিক হিরো— ফরহাদ খান।

সবার নজর হিরোর দিকে। হিরোর হাত বাঁধা বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মিজান এখন তাকে সিগারেট খাওয়াচ্ছে। জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ধরছে এবং ঠোঁট থেকে সরিয়ে

নিচ্ছে। ক্যামেরা রেডি করা আছে। হিরোর সিগারেট খাওয়া শেষ হলেই শট নেয়া হবে। হিরো 'ডায়ালগ' বলবে। দীর্ঘ ডায়ালগ—

তোরা আমার শরীরকে ধরেছিস। আমার শরীর বন্দি, কিন্তু আমার মন? আমার মন মুক্ত বিহঙ্গীর মতো স্বাধীন। মনকে বন্দি করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই।

হিরো সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, ডায়ালগ কড়া, ক্ল্যাপ পড়বে। তবে বিহঙ্গী ফিহঙ্গী রিকশাওয়ালারা বুঝবে না— পাখি করতে হবে।

ডাইরেক্টর আজমল তরফদার হাসিমুখে বললেন, অবশ্যই। হারামজাদা স্ক্রিপ্ট রাইটারের মাথার মধ্যে ঘুরে ডিকশেনারি। বিহঙ্গ। বিহঙ্গ আবার কী? মিজান ডায়ালগ ঠিক করে খাতায় লিখে ফেল। ফরহাদ ভাই আপনি রেডি?

হুঁ।

একটা মনিটার দিবেন নাকি?

মনিটার লাগবে না। ডাইরেক্ট টেক।

ওকে লাইটস।

আলো জ্বলল। হিরো বলল, শটটা কী রকম, ক্লোজআপ?

হুঁ।

ক্লোজআপ ভালো হবে না। লং শট থেকে জুম করে ক্লোজে আসুন।

আজমল তরফদার মনে মনে বললেন— হারামজাদা এখন ডাইরেকশনে চলে আসছিস। শটের তুই বুঝস কী?

মনে মনে যা বলা হলো মুখে তা বলা হলো না। মুখে বলা হলো— ঠিক ধরেছেন ফরহাদ ভাই। আপনার শট সেন্স মারাত্মক। লাস্ট ডায়ালগে মুখের উপর জুম করে বিগ ক্লোজআপে চলে যাব— শুধু চোখ। কেমন হবে রে মিজান?

ভালো হবে ওস্তাদ। শটের মতো শট।

জুম লেন্স লাগা। ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ কর।

ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ করে জুম লেন্স লাগাতে সময় লাগল। জুম লেন্স ছিল না। বারি স্টুডিও থেকে ভাড়া করে আনতে হলো। এই ফাঁকে অন্য শট নেয়া যেত। তার জন্যে আবার নতুন করে লাইটিং। সেটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হলো— গ্যালাক্সি হিরো প্রতিটি শটে নাক গলাবেন। দরকার কী? তাঁর শট না নিয়ে অন্যের শট নিলে তিনি রাগও করতে পারেন। তাঁকে বলা হয়েছে একনাগাড়ে তাঁর কাজ শেষ করে অন্য কাজ ধরা হবে।

গ্যালাক্সি হিরো বললেন, জুম লেন্স আনতে দেরি হবে?

আজমল তরফদার হাই তুলতে তুলতে বললেন, না দেরি হবে না।

এইসব আপনারা আগে ব্যবস্থা রাখেন না— শেষ সময়ে দৌড়াদৌড়ি!

অপমানসূচক কথা। তবে গ্যালাক্সি হিরোর এ ধরনের অপমান গায়ে মাখতে নেই। দুধ দেবে গরু লাথি দেবে, গায়ের উপর পেচ্ছাব করে দেবে। জগতের এই হলো নিয়ম। তবে দিন আসবে— তখন এই হিরোকেই মুখে রং মেখে সারাদিন বসে থাকতে হবে— কখন শটের জন্যে ডাক পড়ে। খুব সহজে সেই ডাক আসবে না।

হাতের বাঁধন খুলে দিন, বিশ্রাম করি।

ডাইরেক্টর সাহেবের ইঙ্গিতে ফ্লোর-বয় হাতের বাঁধন খোলার জন্যে ছুটে গেল। হিরো বিরক্ত মুখে বললেন, কফি দিতে বলেন— নরম্যাল না, এক্সপ্রেসো। ইস্টার্ন প্লাজায় ভালো এক্সপ্রেসো পাওয়া যায়— একজন কাউকে পাঠিয়ে দিন, কাছেই তো।

ফ্লোর-বয় আরেকজন চলে গেল এক্সপ্রেসো কফির সন্ধানে।

হিরো চেয়ারে গা এলিয়ে বসতে বসতে বললেন, আজ আমাকে একটু সকাল সকাল ছাড়তে হবে— একটা জন্মদিন আছে, যেতেই হবে। আজমল ভাই, মাইন্ড করবেন না, পরে পুষিয়ে দেব।

আজমল তরফদার মনে মনে কুৎসিত একটা গালি দিলেন। মুখে কিছু বললেন না। তাঁর মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে। বিকেল চারটা পর্যন্ত শিফট। ব্যাটা এগারটার মধ্যে চলে গেলে কাজ কিছুই হবে না। শিফটের টাকা পুরোটাই যাবে।

আজমল ভাই মুখ বেজার করে বসে আছেন কেন ?

না, বেজার হব কেন ?

আজ একটু আর্লি যাব ঠিকই কিন্তু পুষিয়ে দেব। দেখবেন টপাটপ কাজ নামিয়ে দেব—'বার্নিং সিন' কি আজই হবে ?

আজমল তরফদার আবার হাই তুললেন। মনে মনে বললেন—ক অক্ষর শূকরমাংস কিন্তু ইংরেজি বুলি বের হচ্ছে— 'বার্নিং সিন'— বার্নিং সিন আমি তোর পাছা দিয়ে ...

রেশমার সকাল থেকেই মাথাধরা। কাল রাতে ঐ বুড়ো যখন চলে যেতে বলল, তখনই রাগে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। সেই মাথাধরা এখনো যায় নি। যতই সময় যাচ্ছে ততই বাড়ছে। এখন মনে হয় জ্বর আসছে। তার শট হয়ে গেলে সে বাড়ি চলে যেতে পারত। শট হবে না বলে মনে হয়। না হলেও রাত এগারটা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। গরম এক কাপ চা খেলে মাথাধরাটা কমত। প্রাডাকশনের কাছে চা চাইলে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এক্সট্রাদের ঘনঘন চা দেবার নিয়ম নেই। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। চায়ের দায়িত্বে যে ফ্লোর-বয় রেশমা তার কাছে গিয়ে মধুর গলায় বলল, সবুর ভাই, চা দেবেন ? খুব মাথা ধরেছে।

চা নাই।

চা আছে। না বলছেন কেন ? ছবির শুটিং চা ছাড়া চলে ?

সবুর বিরক্ত চোখে তাকল। ফ্লোর-বয়রা সাধারণত মেরুদণ্ড ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে। এক্সট্রারা আশপাশে থাকলে মেরুদণ্ড ফিরে পায়। দিন না এক কাপ চা, অসম্ভব মাথা ধরেছে।

ক্যান্টিনে গিয়া চা খাও।

তাহলে ক্যান্টিনে চা খাওয়ার পয়সা দিন।

ওরে বাপরে ! ম্যাডামের মতো কথা।

রেশমা ক্যান্টিনে যাওয়াই ঠিক করল। কাউকে বলে যাওয়া উচিত কিনা সে বুঝতে পারছে না। তার শট এখন নেয়া হবে না এ ব্যাপারে সে এক শ ভাগ নিশ্চিত। তারপরেও প্রডাকশানের কারোর যদি চোখে পড়ে সে আশপাশে নেই অমনি মাথায় আগুন ধরে যাবে। প্রডাকশান সব সময় রেগে থাকে— রাগ ঝাড়ার মানুষ দরকার। এক্সট্রারা সেই

মানুষ। রেশমা চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মিজানের কাছে গেল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার শটটা কখন হবে? মিজান ভুরু কুঁচকে তাকাল যেন এমন অসৌজন্যমূলক কথা সে তার জীবনে শোনে নি।

দেরি হবে?

জানি না।

ক্যান্টিন থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি মিজান ভাই? যাব আর আসব।

মিজান জবাব দিল না। সে মুখ ভর্তি করে পান খাচ্ছিল। ফ্লোরের ভেতরই পানের পিক ফেলল। এত কথা বলার তার সময় নেই।

যাব মিজান ভাই?

মিজান খেঁকিয়ে উঠল— সব সময় বিরক্ত করিস ক্যান? কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান না করলে ভালো লাগে না? কাজের সময় যন্ত্রণা!

রেশমা সরে এল। জুম লেন্স চলে এসেছে। ক্যামেরায় মাউন্ট করানো হচ্ছে। হিরোর হাত খাম্বার সঙ্গে বাঁধা হচ্ছে। মেকআপম্যান চুল ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। চোরাকারবারিদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ধরনের ধস্তাধস্তির পর সে ধরা পড়েছে। তাতে তার চুলের ভাঁজের কোনো ক্ষতি হয় নি। হিরোর শটে অনেক সময় লাগবে। এই ফাঁকে নিশ্চিন্ত মনে ক্যান্টিনে চা খেতে যাওয়া যায়।

ক্যান্টিনে গাদাগাদি ভিড়। কলিজির গরম সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে। দু'জন বয় সিঙ্গাড়া দিয়ে কূল পাচ্ছে না। রেশমা বসার জন্যে খালি চেয়ার খুঁজছে। দি রোজ মুভিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডাকশান ম্যানেজার দিলদার খাঁ হাত উঁচু করে আগ্রহের সঙ্গে ডাকল, এই যে ম্যাডাম, এদিকে আসেন।

দিলদার খাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডাকশান ম্যানেজার হলেও তার মূল কাজ মেয়ে মানুষের দালালি। ফিল্ম লাইনের মেয়েদের প্রতি বাইরের মানুষের আগ্রহ প্রচুর। ভালো অঙ্কের টাকা খরচেও এদের আপত্তি নেই। যোগাযোগটা সমস্যা। দিলদার খাঁ এই সমস্যার সমাধান করে। ভালোমতোই করে। দু'পক্ষ থেকেই তার কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

দিলদার বলল, ম্যাডাম, কী খাবেন বলেন?

কিছু না— চা।

শুধু চা খাবেন কেন ম্যাডাম? আমার উপর রাগ করেছেন?

ম্যাডাম ম্যাডাম বলবেন না তো দিলদার ভাই।

মেয়েছেলে মাত্রই আমার কাছে ম্যাডাম। তা সে চাকরানিই হোক কিংবা নায়িকাই হোক। ঐ দেখি ম্যাডামকে দু'টা সিঙ্গাড়া দে।

রেশমা সিঙ্গাড়া খাচ্ছে। খুব সাবধানে খেতে হচ্ছে যাতে ঠোঁটের লিপস্টিক উঠে না যায়। সিঙ্গাড়া খেতে গিয়ে সে টের পাচ্ছে তার খুব খিদে লেগেছে। প্রডাকশান থেকে সকালে ভালো নাশতা দেয়া হয়েছিল— কেক, চানাচুর, কলা, একটা মিষ্টি। তারপরেও এতটা খিদে থাকার কথা না।

দিলদার খাঁ রেশমার কাছে ঝুঁকে এসে বলল, 'প্রেম দেওয়ানা'র শুটিং হচ্ছে?

রোল কী ?

রোল কিছু না।

কোনো ডায়ালগ আছে ?

দু'টা ডায়ালগ আছে।

ফিল্ম লাইনে কতদিন হলো ?

দু'বছর।

তাহলে তো চিন্তার কথা।

চিন্তার কথা কেন ?

দিলদার খাঁ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার চেহারা সুন্দর, বয়স সুন্দর, কথাবার্তা সুন্দর, তিন সুন্দর নিয়েও দু'বছরে যদি কিছু না হয় তাহলে আর হবে না। এক্সট্রা থেকে নায়িকার ছোটবোন, নায়িকার ছোটবোন থেকে নায়িকা। হয় না যে তা নয়, হয়। তবে দু'বছরের মধ্যে হয়। দু'বছরে না হলে— নো হোপ। দু'বছর পার করে দেবার পর ধরে নিতে হবে— এক্সট্রা হিসেবে রাইট ইন, এক্সট্রা হিসেবে লেফট আউট। হা-হা-হা।

হাসছেন কেন ? এটা তো হাসির কোনো কথা না।

অবশ্যই হাসির কথা, শ্রীদেবীর মতো তোমার চেহারা। এই চেহারায় লাভ কী হলো ? এক্সট্রার পার্ট আর মাঝেমধ্যে ক্ষেপ মারা।

আস্তে কথা বলেন দিলদার ভাই।

আস্তেই তো বলছি। শোন ম্যাডাম— বাইরের ক্ষেপ কমায়ে দাও, শরীরের সর্বনাশ হয়ে যায়। ফিল্ম লাইনে শরীরই আসল। মনে ভেঙে গেলে কোনো ক্ষতি নাই, শরীর ভাঙলে সর্বনাশ।

উঠি দিলদার ভাই।

উঠবে কী বস না, চা খাও আরেক কাপ।

না, কাজ আছে।

খাও খাও, আরেক কাপ চা খাও। ঐ ম্যাডামকে আরেক কাপ গরম চা।

সে দ্বিতীয় কাপ চা নিল। দিলদার খাঁ আরো খানিকটা ঝুঁকে এল। রেশমা অস্বস্তি বোধ করছে। দিলদার খাঁর মূল কাজ যে দালালি এটা কারো অজানা নয়। তার কোনো মেয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলার একটাই অর্থ।

দিলদার খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমার বাসার ঠিকানা জান না ?

রেশমা ঠিকানা জানে না, তবু বলল জানে।

টেলিফোন নিয়েছি। টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রাখ। ইমার্জেন্সি টাকা-পয়সার দরকার হলে টেলিফোন করে দিও। আমার কাছে ভালো ভালো পার্টি আছে। সব ভদ্রলোক। একটাও দু'নম্বরী ভদ্রলোক না— আসল ভদ্রলোক। হাংকি পাংকি নাই।

এইসব কাজ এখন আমি করি না দিলদার ভাই।

দিলদার হাসল। পরক্ষণেই হাসি বন্ধ করে বলল, না করাটা তো ভালো। তারপরেও ধর হঠাৎ টাকা-পয়সার দরকার হয়ে গেল। টাকা তো আসমান থেকে পড়ে না। ব্যবস্থা

করা লাগে। বর্তমানের ব্যবস্থা ছাড়াও ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। আজ তোমার চেহারা আছে, স্বাস্থ্য আছে— দু'দিন পরে কি থাকবে? থাকবে না। হঠাৎ একটা বড় অসুখ হয়ে গেল। তখন? পানি পড়া মাগনা পাওয়া যায়, ওষুধ মাগনা পাওয়া যায় না। খরিদ করা লাগে। কাগজ-কলম তোমার কাছে আছে?

না।

কাগজ-কলম আমার কাছেই আছে। টেলিফোন নাম্বার লিখে দিচ্ছি। যত্ন করে রেখে দিও। কখন দরকার হয়— কিছুই বলা যায় না।

উঠি দিলদার ভাই?

আচ্ছা। আমাদের প্রডাকশানের কাজ শুরু হচ্ছে। দেখি সেখানে তোমার জন্যে ভালো কোনো সাইড রোল পাওয়া যায় কিনা।

৩

ফ্লোরে ফিরে রেশমা হতভম্ব হয়ে গেল। শুটিং প্যাকআপ হয়ে গেছে। আজমল তরফদার শুকনো মুখে বসে আছেন। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বলে ফ্যান ঘুরছে না। একজন ফ্লোর-বয় তাকে প্রবল বেগে তালের পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। তারপরেও আজমল তরফদার ঘামছেন। ইউনিটের সব লোকজন কেমন যেন গম্ভীর। তারা আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। শুটিং প্যাকআপ হওয়ার মূল কারণ হলো নায়ক ফরহাদের সঙ্গে ডাইরেক্টর সাহেবের খিটিমিটি হয়েছে। নায়ক এক পর্যায়ে বলেছেন, এই ছবির কাজ করব না। বলেই ফ্লোর থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠেছেন।

আজমল তরফদার ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ হোক কাল হোক, এই নখড়ামি যে সে আমাদের সঙ্গে করবে এটা জানতাম। আমার সঙ্গে তার কোনো খিটিমিটি হয় নি, সে যা বলেছে আমি শুনেছি। তার অন্যায় কথা শুনেও আমি বলেছি, ঠিক আছে— তারপরেও সে ফ্লোর থেকে চলে গেল। ঘটনাটা কী? ঘটনা তোমরা কেউ জান না, জানি আমি। ঘটনা বলি শোন— তার সাথে আমাদের ছবির কনট্রাক্ট হয় দু'বছর আগে। এক লাখ টাকায় কনট্রাক্ট। এক লাখ টাকা পেয়েই সে তখন হাতে আসমানের চাঁদ পেয়েছে। খুশিতে গুলগুলা। এর মধ্যে ঘটনা ঘটল— তার তিনটা ছবি হয়ে গেল সুপারহিট। এক লাখ টাকা থেকে বেড়ে তার রেমুনারেশন এক লাফে হয়ে গেল চার লাখ। আমাদের সঙ্গে আগের চুক্তি— এক লাখের চুক্তি। ব্যাটা গেছে ফেঁসে। এখন চাচ্ছে মোচড় দিয়ে আরো কিছু বের করে নিতে— এই হচ্ছে ব্যাপার। শুভঙ্করের অঙ্ক।

মিজান বলল, আমরা এখন স্যার করব কী? টাকা বাড়াব?

দেখি।

যদি বলেন সন্ধ্যার পর ফরহাদ ভাইয়ের বাসায় গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে ...।

কর যা ইচ্ছা।

আপনি সঙ্গে গেলে ভালো হয়— স্যার যাবেন?

আজমল তরফদার জবাব দিলেন না। ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। শুটিং প্যাকআপ হবার পরেও কেউ যাচ্ছে না। বসে আছে। বিকেল চারটা পর্যন্ত শিফট। এখন বাজছে মাত্র বারটা। সারাদিনের কাজ মাটি হবে— তা তো হয় না। নায়ক ছাড়াও তো অনেক

কাজ আছে। সেগুলো করা যায়।

ডাইরেক্টর সাহেব রাগের মাথায় প্যাকআপ বলার পরেও মিজান চোখের ইশারায় বলেছে— প্যাকআপ না, সাময়িক বিরতি। অবস্থা ঠাণ্ডা হলে কাজ আবার শুরু হবে। অবস্থা ঠাণ্ডা হলো না। মিজান যখন ডাইরেক্টর সাহেবের কানে কানে বলল, লাঞ্চ ব্রেকের পর কি স্যার ছোটখাটো দু'একটা কাজ করে ফেলব ?— তখন আজমল তফদার প্রচণ্ড ধমক দিলেন, গাধার বাচ্চা, প্যাকআপ হয়ে গেছে তুই দেখছিস না ? খালি বেশি কথা— সামনে থেকে যা। আমাকে কাজ শিখায়।

মিজান কুৎসিত ধমকে কিছু মনে করল না। কুৎসিত গালি, তুই তুকারি শুটিং ফ্লোরে চলবে না তো কোথায় চলবে ? শুটিং ফ্লোর তো আর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ না। মিজান একটু দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরাল। লাইটম্যানদের ইশারায় জানাল— শুটিং আসলেই প্যাকআপ। লাইট নামানো হচ্ছে। চারদিকে আনন্দময় ব্যস্ততা।

রেশমার বুক ধকধক করছে। তার মন বলছে আজ পেমেন্ট হবে না। গতকাল দু' শিফট কাজ হয়েছে। পেমেন্ট হয় নি— বলা হয়েছে আজকের কাজ শেষ হলে একসঙ্গে পেমেন্ট। আজ যে অবস্থা তাতে পেমেন্টের কোনো সম্ভাবনা সে দেখছে না। জয়দেবপুর ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নেই। দু'দিন হলো ঘরে চাল নেই। আশপাশের দোকান থেকে ধারে আনার উপায় নেই। সবাই টাকা পায়, ধার কেউ দেবে না। তারপরেও সে তিন কেজি চালের ব্যবস্থা করেছিল। আজ টাকা নিয়ে ফেরার পর এক সপ্তাহের চাল-ডালের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। রেশমা মিজানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মিজান বলল, কী চাস ?

পেমেন্ট হবে না মিজান ভাই ?

উঁ।

'উঁ' শব্দটা মানে কী রেশমা ধরতে পারছে না। 'হ্যাঁ' না 'না' ?

খুব অসুবিধায় আছি মিজান ভাই।

আমরা কি খুব সুবিধায় আছি! বেআক্কেলের মতো কথাবার্তা বলিস কী জন্যে ? ছবির বারটা বেজে গেছে আর তোর হলো পেমেন্ট ? টাকা দরকার ভালো কথা— তার সময়-অসময় আছে না ?

বড় অসুবিধার মধ্যে আছি মিজান ভাই।

অফিসে যা, অফিসে গিয়ে মুনশি সাহেবকে বল। এখানে কোনো পেমেন্ট হবে না। সব পেমেন্ট অফিসে।

ম্যানেজার সাহেবকে একটু বলে দেবেন ?

আচ্ছা।

মনে থাকবে মিজান ভাই ?

হুঁ।

রেশমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গত মাসে 'বিনাকা স্টোর' থেকে খুব কায়দা করে বাজার করেছে। বিনাকা স্টোরের মালিক ইসমাইল সাহেবকে বলেছে, চাচা আজ আমার একটা সুসংবাদ আছে। আমাদের লাস্ট ছবিটা হিট করেছে তো— এই জন্যে সবাইকে বোনাস দেয়া হয়েছে।

ইসমাইল হাই তুলতে তুলতে বলল, ভালোই তো।

আপনার দোকান থেকে তো শুধু ধারেই বাজার করি আজ নগদা-নগদি খরিদ। ভুটানের মরিচের আচার আছে না! আজ ভুটানের একটা মরিচের আচারও কিনব। আছে?

ইসমাইল আবারো হাই তুলে বলল, হুঁ। সে হাই না তুলে কোনো কথা বলতে পারে না।

চাল, ডাল, আটা, ভুটানের মরিচের আচার, সয়াবিন তেল, চা, চিনি সব মিলিয়ে পাঁচ শ তিয়াত্তর টাকা। রেশমা বাজারের সব প্যাকেট একত্র করে দাম দেয়ার জন্যে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে— হতভম্ব চোখে ভ্যানিটি ব্যাগের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইসমাইল সন্দেহজনক গলায় বলল, কি টাকা চুরি গেছে?

না। আনতে ভুলে গেছি। চাচা আমার সঙ্গে কাউকে দিয়ে দিন। বাসা থেকে নিয়ে আসবে। যাবে আর আসবে। আমি রিকশা ভাড়া দিয়ে দেব।

ইসমাইল খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বলল, কাল দিলেই হবে।

আমি স্টুডিওতে যাবার সময় দিয়ে যাব। আমি সকাল আটটার আগেই যাই— তখন দোকান খোলে না?

দশটার আগে দোকান খুলি না।

তাহলে ফেরার পথে দিয়ে যাব।

আচ্ছা।

রেশমা আর যায় নি। যাবে কীভাবে, হাত খালি। আল্লাহর অসীম মেহেরবানি ইসমাইল তার বাসা চেনে না। বাসা চিনলে লোক পাঠিয়ে দিত।

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। রেশমা শুকনো মুখে বসে আছে বাণী কথাচিত্রের অফিসে। মিজান ম্যানেজার সাহেবকে রেশমার পেমেন্টের ব্যাপারে কিছু বলে নি। বাণী কথাচিত্রের ম্যানেজার মুনশি শুকনো মুখে বলেছে— শুটিঙের পেমেন্ট এখন বন্ধ। স্যারের লিখিত অর্ডার ছাড়া পেমেন্ট হবে না। মুনশি কঠিন লোক— কাঁদতে কাঁদতে তার পা জড়িয়ে ধরলেও কিছু হবে না। তারপরেও রেশমা বসে আছে যদি মিজান ভাই চলে আসেন। ইউনিটের লোকেরা ফিল্ম অফিসে দিনের মধ্যে একবার আসেই।

মুনশি বলল, খামাখা বসে আছ কেন চলে যাও।

মিজান ভাই আমাকে থাকতে বলছেন।

তাহলে থাক।

রেশমা মনে মনে হাসল। অভাব তাকে আর কিছু শেখাক বা না শেখাক একটা জিনিস শিখিয়েছে। সুন্দর করে মিথ্যা বলা শিখিয়েছে। পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর করে মিথ্যা কারা বলে— অভাবী মানুষেরা। সবচে' সুন্দর অভিনয় কারা করে? অভাবী মানুষেরাই করে। সারাক্ষণ তাদের অভিনয় করতে হয়। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে রেশমা অপেক্ষা করছে অথচ সে তার মুখ হাসি হাসি করে রেখেছে। এই অভিনয় মোটেই সহজ অভিনয় না।

রাত আটটায় অফিস বন্ধ হয়ে যায়। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। মুনশি বলল, কই মিজান সাহেব তো এলেন না।

রেশমা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না। মিজান ভাই বললেন, সন্ধ্যার পর অফিসে চলে এস, জরুরি কথা আছে। ভুলে গেলেন কিনা কে

জানে। সম্ভবত ভুলে গেছেন।

সে উঠে দাঁড়াল। জয়দেবপুর ফিরে যাবার বাস ভাড়া তার কাছে নেই। সেটা সমস্যা না। তার মতো রূপবতী মেয়ে যদি কন্ডাক্টরকে নরম গলায় বলে— ভাড়া নাই— কন্ডাক্টর কিছু মনে করবে না। তবে এদের কাছে সত্য কথা বলতে হবে। এদের কাছে বানিয়ে কোনো গল্প বলা যাবে না। একজন অভাবী মানুষ অন্য একজন অভাবী মানুষের অভিনয় চট করে ধরে ফেলে। বাসের কন্ডাক্টরও অভাবী লোক।

আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে। রেশমাকে মগবাজার বাসস্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে। সে মনে মনে চাইছে বৃষ্টি নামুক। তবে এখন না। বাসে ওঠার পর ঝুম বৃষ্টি নামুক। সে বৃষ্টির পানিতে ভিজে জবজবা হয়ে বাসায় যেতে চায়। গরমে ঘামে গা ঘিনঘিন করছে।

মানুষের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা বোধহয় সব সময় পূরণ হয়। বাস থেকে নেমেই রেশমা বৃষ্টি পেয়ে গেল। ভালো বৃষ্টি। রিকশাওয়ালারা ঘণ্টা বাজিয়ে আসছে, আসুক, রিকশায় ওঠা যাবে না। প্রথমত টাকা নেই, দ্বিতীয়ত ইচ্ছা করছে না। বৃষ্টিতে ভিজতেও খুব যে আরাম লাগছে তা না। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ধারালো বলে মনে হচ্ছে। কেমন যেন গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। কিছু কিছু বৃষ্টি নরম করে গায়ে পড়ে, কিছু কিছু বৃষ্টি ধারালো বালির কণার মতো শরীরে বিঁধে যায়। এ রকম কেন হয় কে বলবে?

বাসার কাছাকাছি এসেই রেশমা তার শরীর থেকে ছবির নাম মুছে মিতু হয়ে গেল। এখন সে আর রেশমা না, এখন সে মিতু।

বাসার বারান্দায় মোড়ার উপর মবিন ভাই বসা। তাঁর পাশে মিতুর বোন ঝুমুর। গালে হাত দিয়ে গল্প শুনছে। ঝুমুর মিতুকে দেখে নি। মবিন প্রথম দেখল এবং আঙুল উঁচিয়ে ঝুমুরকে দেখাল। ঝুমুর উঠে দাঁড়াল, খুশি খুশি গলায় চেঁচাল— আপা চলে এসেছে, আপা। ঝুমুরের চিৎকার শুনে তার মা শাহেদা এসে দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁর মুখও আনন্দে উজ্জ্বল। তিনি এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরে নরম গলায় বললেন, ভিজে কী হয়েছিস? ভিজলি কেন? রিকশা নিয়ে চলে এলেই হত।

মিতু মবিনের দিকে তাকাল। মা'র সামনে এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে তার লজ্জা লাগে। আগে যখন আপনি করে বলত তখন লজ্জা লাগত না। এখন তুমি তুমি করে বলে বলেই লজ্জা লাগে। মিতু বলল, তুমি কখন এসেছ?

মবিন জবাব দিল না। মুখ টিপে হাসল। ঝুমুর বলল, মবিন ভাইয়া বিকেলে এসেছে। আমি বললাম, আপার আজ সেকেন্ড শিফট পর্যন্ত শুটিং, বারটার আগে আসবে না। মবিন ভাইয়া বলেছে অবশ্যই সে আটটার আগে চলে আসবে। উনার কথাই ঠিক হলো। আপা তুমি কাপড় বদলে আস। শীতে কাঁপছ।

মিতু কাপড় বদলাতে গেল। শাহেদা বাথরুমের পাশে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চাপা গলায় বললেন, মবিন আজ বাজার টাজার করে নিয়ে এসেছে।

কেন?

জানি না কেন? দু'কেজির মতো পোলাওয়ের চাল, খাসির মাংস, বাটারঅয়েল। আমাকে বলল, মা আপনার হাতে পোলাও-কোরমা খেতে ইচ্ছা করছে।

রেঁধেছ পোলাও-কোরমা ?

হুঁ। ঘরে আদা, গরম মসলা কিছুই নাই... তুই তো টাকা-পয়সাও দিয়ে যাস নি।

গরম মসলা ছাড়াই কোরমা রেঁধেছ ?

না। মবিন বলল, আর কী কী লাগবে আমি তো জানি না— একটা কাগজে লিস্ট করে দিন নিয়ে আসি। বুদ্ধিমান ছেলে, আমাদের অবস্থা যে জানে না তা তো না।

তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে দাও মা, প্রচণ্ড খিদে লেগেছে।

তুই কি টাকা-পয়সা কিছু এনেছিস ?

মিতু জবাব দিল না। টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলতে কিংবা টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে এই মুহূর্তে ভালো লাগছে না। শাহেদা চাপা গলায় বললেন, ও তোর জন্যে কী জানি এনেছে। হঠাৎ করে এইসব কী বুঝলাম না।

শাহেদা না বুঝলেও মিতু বুঝেছে। আজ ১৮ তারিখ, তার জন্মদিন। বাসায় কারোর মনে নেই— তার নিজেরও মনে নেই, কিন্তু মবিন ভাইয়ের ঠিকই মনে আছে। এই এক উপলক্ষ ধরে শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করার কোনো মানে হয় না। মিতু তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুল জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মবিন একা একা বসে আছে। তাকে কেমন রোগা রোগা লাগছে। মিতু হাসিমুখে বলল, তুমি নাকি আমার জন্যে কী উপহার এনেছ— মা বলল।

হুঁ।

কই উপহারটা দাও।

ঝুমুরের কাছে দিয়েছি।

জিনিসটা কী ? বই ?

উঁহুঁ। একটা শাড়ি। কমদামি জিনিস, সুতি শাড়ি। রঙটা খুব মনে ধরল।

কী রং ?

জমিনটা হালকা বেগুনি, পাড় সবুজ।

কালো মেয়েদের জন্যে কখনো বেগুনি রং কিনতে নেই। বেগুনি রঙে কালো মেয়েদের আরো কালো দেখায়। বেগুনি রং আশপাশ থেকে রং শুষে নেয়।

এতসব জান কীভাবে ?

আমাদের মেকআপম্যান, তার কাছে শুনেছি।

আজ তোমাদের শুটিং ক্যানসেল হলো কেন ?

নানান কারণ। অন্য কথা বল— তোমার সঙ্গে ছবির গল্প করতে ভালো লাগে না। চাকরি টাকরির কোনো খবর পেয়েছ ?

না।

বাজার, উপহার এইসব দেখে ভাবলাম হয়তো কিছু পেয়ে গেছ।

এখনো পাই নি।

তাহলে করছ কী ?

আগে যা করতাম, তাই করছি— জ্ঞানের ফেরিওয়ালা। বাড়ি বাড়ি জ্ঞান ফেরি করে বেড়াচ্ছি। প্রাইভেট টিউশ্যানি।

চাকরির ইন্টারভ্যু দেয়া কি বন্ধ করে দিয়েছ ?

না। এখনো দিচ্ছি। আমার ধৈর্য আমার দুর্ভাগ্যের মতোই সীমাহীন।

বইয়ের ভাষায় কথা বলবে না। আমার খুবই বিরক্তি লাগে। যা বলার সহজ সাধারণ ভাষায় বলবে।

আচ্ছা বলব।

মিতু মবিনের পাশে রাখা মোড়ায় বসতে বসতে বলল, তুমি জ্ঞানের ফেরিওয়ালা হয়ে যা রোজগার কর তাতে তোমার নিজেরই চলে না, তার উপর দেশে টাকা পাঠাতে হয়— এই অবস্থায় শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করা খুব অন্যায়।

মবিন হালকা গলায় বলল, ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে ...

তোমাকে না বললাম বইয়ের ভাষায় কথা বলবে না।

দিনরাত বই পড়তে পড়তে নিজে খানিকটা বইয়ের মতো হয়ে গেছি। শুষ্কং কাষ্ঠং।

এই যে এত ইন্টারভ্যু দিচ্ছ— কোথাও কিছু হচ্ছে না ?

প্রতিবারই হচ্ছে হচ্ছে একটা ভাব হয়, তারপর হয় না।

সেটা আবার কেমন ?

দিন কুড়ি আগে চাকরির একটা ইন্টারভ্যু দিলাম। বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, আপনার বাইরের পড়াশোনা তো বেশ ভালো। কোয়াইট ইম্প্রেসিভ। আপনার ইন্টারভ্যু নিয়ে ভালো লাগল। এই পর্যন্তই। চাকরি হয় নি।

একদিন নিশ্চয়ই হবে।

মবিন হাসল। সুন্দর করে হাসল। অন্ধকারে তার হাসিমুখ দেখা গেল না। মিতুর মনে হলো— দেখা না যাওয়াটাই ভালো। মানুষটার হাসিমুখ এত সুন্দর। দেখলেই বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

ঝুমুর এসে বলল, মবিন ভাই খেতে আসুন।

মবিন উঠে দাঁড়াল।

মেঝেতে পাটি বিছিয়ে খাবার আয়োজন। মবিনকে মাঝখানে রেখে দু'বোন দু'পাশে বসেছে। শাহেদা খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন। মবিন তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, মা আপনি খাবেন না ? সুন্দর করে মা ডাকল, কিন্তু শাহেদার সেই মা ডাক ভালো লাগল না। ছেলেটা ভালো। খুবই ভালো। তাঁর বড় ছেলে রফিকের প্রিয় বন্ধুদের একজন। তাকে দেখলেই রফিকের কথা মনে হয়। কিন্তু শাহেদার এই ছেলেকে পছন্দ না। অপছন্দের কারণও তিনি জানেন না।

মবিন বলল, মা আপনিও আমাদের সঙ্গে বসুন।

শাহেদা যন্ত্রের মতো বললেন, তোমরা খাও। রাতে আমি কিছু খাই না। অম্বল হয়।

ঝুমুর বলল, মবিন ভাই খেতে খেতে ঐ গল্পটা আবার বলুন না। সবাই শুনুক।

কোন গল্পটা ?

জ্ঞানী ভূতের গল্পটা— আপা, তুমিও শোন— ভয়ঙ্কর হাসির। হাসতে হাসতে বিষম খাবে। ভূতরা তো সাধারণত খুব বোকা হয়— ঐ ভূতটা ছিল বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রথম ছাব্বিশ পৃষ্ঠা তার মুখস্থ ছিল।

শাহেদা বিরক্ত গলায় বললেন, খাওয়ার সময় এত গল্প কী ? চুপচাপ খেয়ে যা। মবিন খেতে পারছ ? খেতে কেমন হয়েছে ?

খুব ভালো হয়েছে মা। হোটেলের কুৎসিত খাবার খাই। পোলাও-কোরমা অমৃতের মতো লাগছে।

ঝুমুর বলল, মবিন ভাই অমৃত খেতে কি পোলাও-কোরমার মতো ?

মবিন হাসিমুখে বলল, না। অমৃত খেতে মিষ্টি।

এমনভাবে বললেন যেন আপনি অমৃত খেয়ে দেখেছেন।

শাহেদা আবারো বিরক্ত গলায় বললেন, খাওয়ার সময় এত কথা কেন ?

খাওয়া শেষ করে মবিন বারান্দায় বসে আছে। খুব জোরেশোরে বৃষ্টি নেমেছে। মবিনের পাশে ঝুমুর বসে আছে। সে চোখ বড় বড় করে গল্প শুনছে।

শাহেদা শুয়ে পড়েছেন। তাঁর শরীর ভালো লাগছে না। মিতু রান্নাঘরে চায়ের পানি বসিয়েছে। চায়ের দুধ নেই। রং চা বানাতে হবে। মবিন রং চা খেতে পারে না। ঝুমুর এসে পাশে বসল— চাপা গলায় বলল, আপা, কী রকম ঝুম বৃষ্টি নেমেছে দেখেছ ?

হুঁ।

মবিন ভাই এ রকম ঝুম বৃষ্টির মধ্যে যাবে কীভাবে ?

ভিজতে ভিজতে যাবে, আর কীভাবে যাবে।

আজ আমাদের বাসায় থেকে যাক না। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা তিনজন মিলে গল্প করব।

থাকবে কোথায় ?

বসার ঘরে বিছানা করে দেব।

ও রাজি হবে না।

বললেই রাজি হবে। বলে দেখব আপা ?

দেখতে পারিস।

ঝুমুর ছুটে চলে গেল। উৎসাহে তার চোখ ঝলমল করছে। মিতু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে কাপে চা ঢালছে। সে জানে মবিন রাজি হবে না। এইসব ব্যাপারে সে ভয়ঙ্কর সাবধান।

মিতু চা নিয়ে বারান্দায় গেল। ঝুমুর করুণ গলায় বলল, আপা, মবিন ভাই থাকতে রাজি হচ্ছে না। তুমি একটু বলে দেখ না।

মবিন চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, তোমার আপা বললেও রাজি হব না।

বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ বাঁধাবেন ?

হুঁ, অনেক দিন অসুখ বিসুখ হচ্ছে না। একটা অসুখ বাঁধাতে ইচ্ছা করছে।

চা শেষ করে বৃষ্টির মধ্যেই মবিন নেমে গেল। ঘরে কোনো ছাতা নেই। মিতুর মনটা খারাপ লাগছে। একটা ছাতা থাকলে বেচারাকে দেয়া যেত।

দু'বোন বারান্দায় বসে আছে। ঝুমুর বলল, মবিন ভাই নামল আর কী বৃষ্টিটাই শুরু হলো— আপা দেখলে ?

হুঁ।

অসুখ অসুখ করছিল। এখন সে নির্ঘাত অসুখে পড়বে।

পড়ুক।

আপা উনি যে তোমার জন্যে শাড়িটা এনেছেন সেটা পরবে?

রাতদুপুরে নতুন শাড়ি পরব কেন?

পর না দেখি কেমন লাগে। প্লিজ।

শুধু শুধু বিরক্ত করিস না তো ঝুমুর। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি এখন শুয়ে পড়ব।

বেচারা শখ করে এনেছে পর না।

পরলে কী হবে? ও তো আর দেখবে না।

না দেখুক। তুমি তো জানবে— সে তোমার জন্যে কষ্টটষ্ট করে একটা শাড়ি এনেছে, তুমি সেটা পরেছ।

ওই শাড়ি আমাকে মানাবে না। বেগুনি রঙের শাড়ি, আমি কালো একটা মেয়ে।

প্লিজ আপা, প্লিজ।

ঝুমুর তোর খুব বিরক্ত করা স্বভাব হয়েছে। এক লক্ষবার প্লিজ বললেও আমি এখন শাড়ি পরব না।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি পরবে।

আয় শুয়ে পড়ি। রাতদুপুর পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

আরেকটু বসি আপা।

তুই বসে থাক। আমি শুয়ে পড়ি।

ও আপা, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বিকেলে এক ভদ্রলোক এসে তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।

মিতু বিস্মিত হয়ে বলল, কী চিঠি?

আমি কী করে বলব কী চিঠি? খামে বন্ধ। আমি খাম খুলি নি।

খাম খুলে মিতু চারটা চকচকে পাঁচ শ টাকার নোট পেল। কোনো চিঠি নেই, শুধুই টাকা। টাকাগুলো সে মোবারক সাহেবের বাড়িতে ফেলে এসেছিল।

ঝুমুর অবাক হয়ে বলল, এত টাকা কীসের আপা?

মিতু ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল।

৪

মোবারক সাহেবের হোটেলের ঘর আকাশের কাছাকাছি। একাশিতলার ৮৩৩ নম্বর রুম। জানালা খুললে রুমের ভেতর মেঘ ঢুকে পড়বে। তবে জানালা খোলার ব্যবস্থা নেই। রুমের সঙ্গে বারান্দার মতো আছে— বারান্দাও থাই এলুমিনিয়ামে ঢাকা। এখানে দাঁড়ালে টোকিও শহরের খানিকটা দেখা যায়। সবচে' ভালো দেখা যায় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়ে। প্রতি মিনিটে একটা করে প্লেন উঠছে-নামছে। প্লেন যে এমন রাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে ওড়ে মোবারক সাহেবের ধারণা ছিল না। বেশ খানিকক্ষণ তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্লেনের উঠানামা দেখে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, উড়ার সময় প্লেনগুলো রাজকীয় ভঙ্গিতে উড়লেও নামার সময় ভয়ে ভয়ে নামে।

হোটেলে বারান্দার এই অংশটির নাম বিজনেস কর্নার। পারসোনাল কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন, লেখার চেয়ার-টেবিল সবই আছে। লেখার টেবিলের এক কোণায় কফি পার্কোলেটরে আগুনগরম কফি। মূল লেখার টেবিলের এক কোণে ছোট্ট টিভিতে সিএনএন-এর খবর দেখাচ্ছে।

বারান্দার এই অংশে সিগারেট খাওয়া যাবে এ রকম একটা নোটিশ ঝুলছে। নো স্মোকিং সাইন ঝুললে সিগারেট খাবার ইচ্ছে হয় কিন্তু সিগারেট খাওয়া যায় এ জাতীয় নোটিশ দেখলে সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে না।

আজ রোববার। ছুটির দিন। মোবারক সাহেব কাজকর্ম যা নিয়ে এসেছেন তার কিছুই আজ করার নেই। শহরে ঘুরে বেড়ানো বা শপিং করার প্রশ্ন আসে না। একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এইসব ভালো লাগে— তারপর ভালো লাগে না। তাছাড়া জাপানে তাঁর দেখার নতুন কিছু নেই। তিনি আরো খানিকক্ষণ প্লেনের উড়াউড়ি দেখলেন। আজ সারাদিন কী করবেন তার একটা তালিকা মনে মনে করলেন।

রেহানার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা। কথা না বললেও হয়— বললে ক্ষতি নেই। জীবনে যতবার দেশের বাইরে এসেছেন ততবারই স্ত্রীর সঙ্গে অন্তত একবার হলেও টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ করেছেন। তিনি অসংখ্যবার দেশের বাইরে গেছেন— রেহানা কখনো তাঁর সঙ্গে আসে নি। রেহানার আকাশভীতি আছে। ছোটবেলায় তার হাত দেখে কে নাকি বলেছিল তার মৃত্যু হবে অ্যাকসিডেন্টে। রেহানার ধারণা সেই অ্যাকসিডেন্ট হবে আকাশে।

রেহানাকে টেলিফোনের পর চিঠি লেখা যেতে পারে। বাইরে এলেই তাঁর চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে কিন্তু চিঠি লিখবে কাকে ? তাঁর চিঠি লেখার কেউ নেই।

বই পড়া যায়। ভূতের বইটা সঙ্গে এনেছেন— প্রথম গল্পটা মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়া হয়েছে। গল্পের শেষটা কেমন দেখা যেতে পারে। সুন্দর করে শুরু করা গল্পের শেষটা সাধারণত খুব এলোমেলো থাকে।

মোবারক সাহেব কাপে কফি ঢাললেন। চা-কফি এইসব পানীয় নিজে ঢেলে খেতে ভালো লাগে না। অন্য কেউ বানিয়ে হাতে তুলে দিলে ভালো লাগে। টেপী মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভালোই হতো। এই মুহূর্তে কফির কাপ হাতে তুলে দিতে পারত। ছুটির দিন ছিল। ছুটির দিনে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। যা দেখত তাতেই বিস্ময়ে অভিভূত হত। সেই বিস্ময় দেখতে ভালো লাগত। নিজের বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে অন্যের বিস্মিত চোখ দেখতে ভালো লাগে। মেয়েটিকে অনায়াসে নিয়ে আসা যেত। শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বাদ দিলেন— তবে মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজখবর লোকমানকে পাঠাতে বলেছিলেন। লোকমান ফ্যাক্স গতকাল পাঠিয়েছে। তাঁর পড়ে দেখতে ইচ্ছা করে নি। এখনো করছে না। যখন করবে তখন পড়ে দেখবেন।

কফি খেতে ভালো হয় নি। কিংবা হয়তো ভালোই হয়েছে। তাঁর নিজের ভালো লাগছে না। ভালো লাগা এবং মন্দ লাগার ব্যাপারটা তাঁর খুব তীব্র। যা ভালো লাগে না, হাজার চেষ্টা করেও তাকে আর ভালো লাগাতে পারেন না। যখন বয়স কম ছিল তখন ভালো লাগাতে চেষ্টা করতেন। এখন তাও করেন না।

রেহানাকে বিয়ের রাতেই তাঁর ভালো লাগে নি। পুতুল পুতুল টাইপের একটা মেয়ে।

আয়নায় জবরজং হয়ে খাটের এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল। ঘরে ঢুকেই তাঁর গোলাপ ফুলের গন্ধে মাথা ঘুরে গেল। দুনিয়ার গোলাপ দিয়ে বাসরঘর সাজিয়েছে। একটা গোলাপের ঘ্রাণ সহ্য করা যায় কিন্তু এক লক্ষ গোলাপের ঘ্রাণ সহ্য করা যায় না। তাঁকে ঢুকতে দেখেই রেহানা মুখ তুলে তাকাল। সুন্দর মুখ। গোলগাল সুখী সুখী চেহারা, বড় বড় চোখ। তারপরেও মোবারক সাহেবের ভালো লাগল না। তিনি ভালো লাগার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললেন, কেমন আছ রেহানা ?

নববধূ নড়েচড়ে বসল, জবাব দিল না।

কী গরম পড়েছে দেখেছ ? গরমে ফুল পচে বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে তাই না ?

রেহানা বলল, জ্বি।

অথচ বাসরঘর মোটেই গরম ছিল না। শীতকালে বিয়ে হচ্ছে তারপরেও বাসরঘরের এয়ারকুলার চলছে। মাথার উপরে হালকাভাবে ফ্যান ঘুরছে। তিনি নববধূর পাশে বসে হাই তুললেন। বাসরঘরে নববধূর পাশে বসে খুব কম পুরুষই হাই তোলে। তিনি সেই কমসংখ্যক পুরুষদের দলে। রেহানা আশপাশে থাকলে এখনো তার হাই ওঠে। টেলিফোনে যখন তার সঙ্গে কথা বলেন তখনো হাই ওঠে।

মোবারক সাহেব হোটেলের বারান্দা থেকে শোবার ঘরে চলে এলেন। রেহানার সঙ্গে টেলিফোনে খানিকক্ষণ কথা বলবেন। দেশ থেকে আসা ফ্যাক্সগুলো দেখবেন। ভূতের বইটা পড়বেন। না, গোটা বই না, প্রথম গল্পের শেষটা। আজ দিনটা শুয়ে বসে কাটানো। কাল অনেক কাজ। কাজে সাহায্য করার জন্যে তিনি সঙ্গে কাউকে আনেন নি। যা করার তাকে একা করতে হবে। একজন কাউকে নিয়ে এলে হতো। কাজে সাহায্য না হোক কথা বলা যেত। মানুষ একা থাকতে পারে না। মানুষের সবচে' বড় শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না— সলিটারি কনফাইনমেন্ট। নিঃসঙ্গ নির্বাসন।

হ্যালো রেহানা ?

ওমা, তুমি!

কেমন আছ রেহানা ?

আশ্চর্য, তুমি ফট করে জাপান চলে গেলে। আগে তো কিছুই বল নি। আমি ইদরিসকে টেলিফোন করলাম— ইদরিস বলল, স্যার জাপানে। আমি বললাম— কোথায় আছে টেলিফোন নাম্বার দাও। ও দিল না। বলল, সে জানে না। আমি নিশ্চিত সে জানে, তবু দিল না। তুমি কি ওকে বলেছ আমাকে টেলিফোন নাম্বার না দিতে ?

না।

তাহলে দিল না কেন ?

বুঝতে পারছি না কেন দিল না।

তুমি অবশ্যই ওকে কঠিন ধমক দেবে। কী আশ্চর্য আমি টেলিফোন নাম্বার চাইলাম, ও দিল না। মিথ্যা কথা বলল...

রেহানা, তুমি কেমন আছ সেটা তো বললে না।

ভালো না। কাল সারারাত এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। রাত এগারটার সময় ঘুমুতে গেছি তখনি মনে হয়েছে ঘুম হবে না। কান্তাকে টেলিফোন করলাম— কান্তা বলল, মাথায় পানি ঢেলে, এক কাপ গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাকতে। মাথায় পানি ঢাললাম কিন্তু গরম দুধ আর

খুঁজে পাই না। চায়ের জন্যে কনডেন্সড মিল্ক ছাড়া ঘরে দুধ নেই। কল্পনা করতে পার? শেষে ডিপ ফ্রিজে এক প্যাকেট দুধ পাওয়া গেল— জমে পাথরের মতো হয়ে গেছে। কল্পনা করতে পার? মাইক্রোওয়েভে দুধের পাথর গলাতে দিয়েছি— ওমা সেটাও নষ্ট! ঐ দুধ গরম করে খেতে খেতে রাত বেজেছে দু'টা।

গরম দুধ খাবার পরেও লাভ হয় নি?

না। শেষ রাতের দিকে চোখের পাতা একটু বন্ধ হয়েছে— তখন শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

তোমার সেই অ্যাকসিডেন্টের দুঃস্বপ্ন?

না। আরো ভয়ংকর। স্বপ্নে দেখলাম আমার যে কাজের মেয়েটা করিমের মা, সে বাঁটি দিয়ে আমাকে কোপাচ্ছে।

বল কী?

আমি যতই বলি— এই করিমের মা, এই, ততই সে হাসে আর কোপ দেয়। যাই হোক সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিন মাসের অ্যাডভান্স বেতন দিয়ে ওকে বিদায় করেছি। যেতে চায় না— কান্নাকাটি করে— আমি পাত্তা দিই নি। এমনিতেই আমার রাতের ঘুম হয় না, তারপর যদি এরকম দুঃস্বপ্ন দেখার পরেও তাকে রেখে দেই, সেটা কি ঠিক হবে?

না, ঠিক হবে না।

তুমি জাপান থেকে আমার জন্যে একটা বই নিয়ে এস।

কী বই?

স্বপ্নের ইন্টারপ্রিটেশনের একটা বই। কোন স্বপ্ন দেখলে কী হয়— এই বই।

খাবনামা জাতীয় বই?

হুঁ।

এইসব বই আমাদের দেশের ফুটপাতে পাওয়া যাবার কথা। জাপানে কি পাওয়া যাবে?

অবশ্যই পাওয়া যাবে। স্বপ্ন নিয়ে সারা পৃথিবীতে রিসার্চ হচ্ছে। স্বপ্ন তো তুচ্ছ করার বিষয় না।

আচ্ছা আমি বই নিয়ে আসব। এখন টেলিফোনটা রাখি। জরুরি কোনো ফ্যাক্স এসেছে বলে মনে হচ্ছে। ফ্যাক্স মেশিনে শব্দ হচ্ছে।

রেহানাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে মোবারক সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি স্বস্তিবোধ করছেন— কারণ রেহানা তাঁর কাছে টেলিফোন নাম্বার চায় নি। চাইতে ভুলে গেছে।

টেপীর সম্পর্কে লোকমান খোঁজ যা পাঠিয়েছে তাতে মোবারক সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। মেয়েটির নাম টেপী নয়— মিতু। তার ছবির জগতের একটা নাম আছে— রেশমা। তারা তিন বোন না, দু'বোন এক ভাই। ভাই জেলে আছে। সাত বছরের সাজা হয়েছে। বাবা চা বাগানে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। মিতু ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় তিনি মারা যান। মেয়েটির আর পড়াশোনা হয় নি।

লোকমানের পাঠানো রিপোর্টটা সম্পূর্ণ না। মেয়েটি ছবির লাইনে কী করে এল রিপোর্টে এই তথ্য থাকা উচিত ছিল। মেয়েটির বাবা কীসের ব্যবসা করতেন? ভাইয়ের সাত বছরের সাজা হয়েছে— মামলাটা কীসের? খুনের মামলা? অস্ত্র মামলা?

মেয়েটি অভিনয় ভালোই জানে— শুরুতে তাঁর সামান্য সন্দেহ হচ্ছিল মেয়েটি রসিকতা করছে— শেষে তিনি মেয়েটির কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তিন বোন— হ্যাপী, টেপী, পেপী। এই হাস্যকর ব্যাপারটি যে-মেয়ে বিশ্বাস করিয়ে ফেলতে পারে তার অভিনয় ক্ষমতা তুচ্ছ করার মতো না।

মোবারক সাহেব দুপুরে কিছু খেলেন না। বরফের কুচি দেয়া এক গ্লাস টমেটোর রস খেয়ে শুয়ে পড়লেন। গল্পের বইটি পড়ার চেষ্টা করলেন। যতই এগুচ্ছেন গল্প ততই উদ্ভট হচ্ছে। ভূতের গল্প হিসেবে এইসব ছাইপাঁশ আজকাল লেখা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কোনো মানে হয়?

ভরাপেটে আরাম করে ঘুমানো যায় না। হাঁসফাঁস লাগে। ক্ষিধে নিয়ে শুয়েছেন বলেই বোধহয় তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুলেন। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। অফিস থেকে টেলিফোন। তিনি যতদিন বাইরে থাকবেন ততদিনই প্রতি সন্ধ্যায় টেলিফোনে তাঁর খোঁজখবর নেয়া হবে। ঢাকা অফিসের খবর তাঁকে দেয়া হবে।

টেলিফোন করেছে লোকমান। মোবারক সাহেব কোমল গলায় বললেন, কেমন আছ লোকমান?

স্যার ভালো আছি। একটা ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলাম স্যার, পেয়েছেন?

হ্যাঁ। ঢাকার খবর কী?

দেয়ার মতো কোনো খবর নেই স্যার। সব ঠিকঠাক আছে।

জুনের আঠার তারিখ মংলা পোর্টে আমাদের যে জাহাজ আসার কথা সেটা ঠিক আছে?

স্যার এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। এডেন হয়ে আসবে, এডেনে কোনো সমস্যা না হলে তারিখ মতোই আসবে।

সমস্যা হবার কি কোনো সম্ভাবনা আছে?

জ্বি স্যার আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। ভালো কথা, একটা ছবি বানাতে কী পরিমাণ টাকা লাগে তুমি জান?

স্যার আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ছবি বানাতে, টু মেক এ ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম, কী পরিমাণ টাকা লগ্নি করতে হয় তুমি কি জান?

স্যার আমি জানি না, তবে আপনি বললে খোঁজ নিতে পারি।

খোঁজ নিও তো।

আমি স্যার এখনি খোঁজ নেব। খোঁজ নিয়ে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আপনাকে জানাব।

তাড়া কিছু নেই— তুমি খোঁজ নিয়ে রাখ, এক সময় আমাকে জানালেই হবে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

লোকমান আমি তাহলে টেলিফোন রাখি ?

টেলিফোন রেখে মোবারক সাহেব রাতের কর্মকাণ্ড মনে মনে ঠিক করে ফেলেন। ক্যাব নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরবেন। বইয়ের দোকানে যেতে হবে— স্বপ্নতথ্য বিষয়ক বই কিনতে হবে। তারপর একটা মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করতে হবে। ডিনারের সঙ্গে মার্গারিটা খেতে ইচ্ছে করছে। মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট ছাড়া এই পানীয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। জাপানি ক্যাব ড্রাইভাররা ইংরেজি জানে না বললেই হয়। হোটেলের রিসিপশনিস্টদের সাহায্য নিতে হবে। বড় হোটেলের রিসিপশনিস্টদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগে না। এরা যন্ত্রের মতো কথা বলে। আজ পর্যন্ত তিনি পাঁচতারা হোটেলে এমন কোনো রিসিপশনিস্ট পান নি যে মানুষের মতো কথা বলছে।

এই হোটেলের রিসিপশনিস্ট মেয়েটি এমন সাজ সেজেছে যেন সে এক্ষুণি বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাবে। পাতলা ঠোঁটে যে লিপস্টিক দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে ঠোঁটে আগুন জ্বলছে। জাপানিরা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। কিন্তু মেয়েটি নিখুঁত আমেরিকান একসেন্টের ইংরেজিতে বলল, স্যার আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি ?

মোবারক সাহেব বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা নিয়ে মেয়েটিকে দেখছেন। যন্ত্র কথা বলছে— মানুষ না। কঠিন কিছু বলে মেয়েটির যন্ত্র ভাবকে নষ্ট করে দিলে সে হয়তো মানুষের মতো কথা বলত।

স্যার কিছু কি করতে পারি ?

মোবারক সাহেবের ইচ্ছা হলো বলেন— ইয়াং লেডি, আমি খুব একা বোধ করছি। তুমি কি তোমার ডিউটি শেষ হবার পর রাতে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসবে ? তোমাকে আমি হ্যান্ডসামলি পে করব।

এ জাতীয় কথা বললে সে একটা ধাক্কা খাবে। তার রোবট ভাব এতে কাটতে পারে।

মোবারক সাহেব তেমন কিছু বললেন না, মেক্সিকান রেস্টুরেন্টের ঠিকানা চাইলেন। মেয়েটি দ্রুত ঠিকানা বের করে ফেলল। হাসিমুখে বলল, আমি কি ক্যাব ঠিক করে তাকে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দেব ?

দিলে খুব ভালো হয়। ইউ আর সো কাইন্ড।

প্লিজ ডোন্ট মেনশান।

সব ধরাবাঁধা কথা। সব যন্ত্রের মতো কথা। যেন আগে থেকে প্রোগ্রাম করা।

রেহানাও তো এরকম। সে কোনো পাঁচতারা হোটেলের রিসিপশনিস্ট নয় কিন্তু সে যখন কথা বলে তখন সেও তো তার ধরাবাঁধা গৎ-এ চলে আসে। এর বাইরে যেতে পারে না। এর বাইরে কথা বলতে পারে না। আসলে সব মানুষই কি এ রকম নয় ? তিনি নিজেও কি একজন রোবট না ?

মানুষ রোবট কীভাবে হয় ? চট করে হয় না— খুব ধীরে ধীরে হয়। কাজেই এই প্রক্রিয়া বোঝা যায় না— এক ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে দেখে সে রোবট হয়ে গেছে। তখন সে আতংকে অস্থির হয়ে যায়। তিনি নিজে কি এখন আতংকে অস্থির হয়েছেন ? হ্যাঁ হয়েছেন। সারাক্ষণ তাঁর একা একা লাগে এবং মানুষের সঙ্গও অসহ্য বোধ হয়। এই অসহ্য বোধ হওয়া ব্যাধি বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। এর মধ্যে দু'বার তাঁর মনে হয়েছে বেঁচে থাকার তেমন কোনো অর্থ নেই। সাধারণভাবে মনে হয় নি, তীব্রভাবেই মনে

হয়েছে।

প্রথমবার মনে হলো তিন বছর আগে। রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমুতে গেছেন। রেহানা বলল, আজকের ভেজিটেবল কোপ্তা তোমার কেমন লেগেছে ? তিনি বললেন, ভালো।

একটু টক টক লাগছিল না ?

হুঁ।

তেঁতুল বেশি হয়ে গিয়েছিল। মাদ্রাজি রান্না তো— সব কিছুতেই তেঁতুল দেয়।

হুঁ।

আমি বাবুর্চিকে বলেছি— তেতুল ছাড়া একবার করতে।

ভালো করেছ।

কাল করতে বলব ?

বল।

তিনি কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। বাতি নিভিয়ে রেহানা ঘুমুতে এল এবং সে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁর ঘুম আসছিল না। তিনি এপাশ-ওপাশ করলেন না। নড়াচড়া করলে রেহানার ঘুম ভেঙে যাবে। চুপচাপ শুয়ে রইলেন। বাথরুমের ট্যাপ বোধহয় ভালোমতো বন্ধ করা হয় নি। কিছুক্ষণ পর পর 'টপ' করে পানির ফোঁটা পড়ার শব্দ আসতে লাগল। এক মিনিট নীরবতা— তারপর 'টপ' করে একটা শব্দ। আবার নীরবতা আবার শব্দ। তিনি সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। বাথরুমের ট্যাপ ভালো করে বন্ধ করলেন। তখন ঘড়ির শব্দ শোনা যেতে লাগল। টক টক করে সেকেন্ডের কাঁটা নড়ছে। তিনি আবার উঠলেন। দেয়াল থেকে চেয়ারে দাঁড়িয়ে ঘড়ি নামানোর কোনো অর্থ হয় না। তিনি খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনের রাস্তা ফাঁকা। কোনো লোক চলাচল নেই। শীতের রাতে এই সময় লোক চলাচল থাকেও না। সে রাতে শীত খুব তীব্র ছিল। কিন্তু তাঁর শীত লাগছিল না। তাঁর গায়ে ফ্লানেলের স্লিপিং স্যুট। বারান্দায় খোলা বাতাস দিচ্ছে। শীতে তাঁর জমে যাওয়ার কথা। তিনি রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। তার একটু গরম লাগতে লাগল। সেই সঙ্গে ক্ষীণ ইচ্ছা হতে লাগল লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যেতে। তাঁর মনে হলো পড়াটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। তিনতলা থেকে নিচে পড়ার সময় মাথাটা যদি আগে পড়ে তাহলে মাথা থ্যাতলানোর টাস করে একটা শব্দ হবে। সেই শব্দটাও ইন্টারেস্টিং হবার কথা। এই জাতীয় চিন্তা সব মানুষের ভেতর কখনো না কখনো আসে, কিন্তু চিন্তাটা স্থায়ী হয় না। মুহূর্তের মধ্যে আসে আবার মুহূর্তের মধ্যে চলে যায়। তাঁর গেল না। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে লাফিয়ে নিচে পড়বেন। পড়ার জন্যে ভালো জায়গা বের করতে হবে। নরম কোনো জায়গায় পড়লে হবে না। শানবাঁধানো জায়গায় পড়তে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবেন এই চিন্তাটা তাঁর এত ভালো লাগতে লাগল যে আনন্দে গায়ে কাঁটা দিল। তাঁর মনে হলো—অনেক অনেক দিন তিনি এই আনন্দ পান নি। তিনি রেলিঙের ওপর উঠতে যাচ্ছেন তখন শোবার ঘরের দরজা থেকে রেহানা বলল, এই তুমি একা একা এখানে কী করছ ?

তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন। এত বিরক্তি এবং এত রাগ নিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে এর আগে তাকান নি।

পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে আছ, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না? আমি তো শীতে মরে যাচ্ছি। ঘুম আসছে না?

না।

ঘুমের ওষুধ খাবে? না খাওয়াই ভালো— একবার খেলে অভ্যাস হয়ে যায়। আমাকে দেখ না। তিনটা সিডাকসিন না খেলে তন্দ্রা পর্যন্ত আসে না। এস, ভেতরে এস। ইস্‌রে কী ঠাণ্ডা!

তিনি ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় ঘুমুতে গেলেন এবং বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি বোকা নন, তিনি বুদ্ধিমান মানুষ, যা ঘটেছে তা যে আবারো ঘটবে তা তিনি জানেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতে চান সেই পথ তাঁকে খুঁজতে হবে। এখানে সাহায্য করার আসলে কেউ নেই।

বিলেতে তিনি এক নামি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন। এক এক সিটিঙে এই ভদ্রলোক পঁচাত্তর পাউন্ড করে নেন। রঙচঙে পোশাক পরা এক বুড়ো, যে ফুর্তিবাজের ভূমিকায় অভিনয় করার চেষ্টা করছে। অভিনয় ভালো হচ্ছে না। মোবারক সাহেব চট করে সেই অভিনয় ধরে ফেললেন এবং বুড়োর জন্যে একটু মায়াও লাগল।

বুড়ো বলল, তোমার সমস্যাটা কী?

মোবারক সাহেব বললেন, আমার কোনো সমস্যা নেই।

আমার কাছে এসেছ কেন?

গল্প করতে এসেছি।

বোস। বোস। আরাম করে বোস এবং গল্প কর। গল্প তুমি করবে, না আমি করব?

মোবারক সাহেব বললেন, দু'জনে মিলেই করব।

প্রথমে তুমি শুরু কর— দেখি তোমার গল্পটা ইন্টারেস্টিং কিনা। তুমি নিশ্চিত তোমার কোনো সমস্যা নেই?

আমি নিশ্চিত।

তাহলে তো তুমি মানুষ না, তুমি ফার্নিচার গোত্রীয়— টেবিল বা চেয়ার। মানুষ হলে সমস্যা থাকতেই হবে।

তোমাদের বিদ্যা তাই বলে?

হ্যাঁ, তাই বলে। প্রচুর সমস্যা থাকবে— তোমরা আমাদের কাছে আসবে। আমরা খেয়ে পরে বাঁচব, তোমরাও পাউন্ড খরচের একটা জায়গা পাবে— হা-হা-হা।

মোবারক সাহেব লক্ষ করলেন, বুড়ো নকল হাসি হাসছে। এদের কাছে আসা অর্থহীন। তারপরেও কিছু কথাবার্তা হলো। তিনি এক সময় জানতে চাইলেন— মানুষ মরতে চায় কেন?

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, অসংখ্য কারণে মানুষ মরতে চায়, তুমি কী জন্যে চাচ্ছ সেটা তুমি জান।

মোবারক সাহেব মনে মনে বুড়োর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। একটা সিটিঙে যে পঁচাত্তর পাউন্ড নেয় তার কিছু বুদ্ধি তো থাকতেই হবে। বুড়োর সঙ্গে আলাপ করে মোবারক সাহেবের কোনো লাভ হয় নি। তাঁর সমস্যা তিনি জানেন। তিনি বিস্মিত হবার

ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁকে বেঁচে থাকতে হলে বিস্মিত হবার ক্ষমতা ফিরে পেতে হবে। কিংবা এমন কাউকে পাশে লাগবে যার বিস্মিত হবার ক্ষমতা প্রবল।

বইয়ের দোকান থেকে তিনি স্বপ্নের উপর দুটা বই কিনলেন। সেলস গার্ল হাসিমুখে বলল, তুমি বুঝি খুব স্বপ্ন দেখ?

মেয়েটার কথা তাঁর ভালো লাগল। এই মেয়েটি রোবট হয়ে যায় নি। তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা আছে। দু'টি স্বপ্নের বই কিনতে দেখে সে বিস্মিত হয়েছে।

তুমি কি আর কোনো বই নেবে?

স্যুইসাইডের উপর কোনো বই আছে?

হ্যাঁ আছে। Anatomy of Suicide.

পাঁচ শ পৃষ্ঠার বিরাট একটা বই। তিনি ডলার দিচ্ছেন। মেয়েটা কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখছে।

৫

রেশমা ক্যান্টিনে চা খেতে ঢুকেছে। এফডিসির ক্যান্টিনে এই সময় জায়গা পাওয়া মুশকিল—আজ ফাঁকা। শুধু যে ক্যান্টিন ফাঁকা তাই না—পুরো এফডিসিই ফাঁকা। সবার শ্যুটিং প্যাকআপ হয়ে গেছে—ফাইটার গ্রুপের একটা ছেলে মারা গেছে। শ্যুটিং এই কারণে বন্ধ। ক্যান্টিনের ম্যানেজার বিরস মুখে বসে আছে। এক কোণায় দিলদার খাঁ বৃদ্ধা একজন এক্সট্রার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে—নানি নানি করে ডাকছে। নানির সঙ্গে ঝলমলে পোশাক পরা এক কিশোরী। চোখ বড় বড় করে সে গল্প শুনছে। দিলদারের দৃষ্টি কিশোরীর দিকে। রেশমাকে দেখে দিলদার খাঁ আনন্দিত গলায় বলল, এই যে ম্যাডামকে পাওয়া গেছে। আস আস। কিশোরী মেয়েটি প্রবল বিস্ময়ে তাকে দেখছে। সত্যি সত্যি রেশমাকে বোধহয় নায়িকা ভেবেছে। রেশমা এগিয়ে গেল। দিলদার খাঁ দরাজ গলায় বলল, ম্যাডামকে চা দাও। সিঙ্গাড়া দাও। তারপর ম্যাডাম, খবর কী?

কোনো খবর নাই।

শ্যুটিং নাকি আবার শুরু হয়েছে। খবর নাই বলছ কেন? এইটাই তো বড় খবর।

দিলদার ব্যস্ত হয়ে মানিব্যাগ বের করল। রঙচঙে একটা কার্ড বের করে বলল, নাও যত্ন করে রাখ।

এটা কী?

ভিজিটিং কার্ড। ছাপিয়ে ফেললাম। অ্যাড্রেস টেলিফোন নাম্বার সব লেখা আছে।

ভালো করেছেন।

ভালো মন্দ জানি না, যে ব্যবসায় যে চাল। এখনকার চাল হচ্ছে— দু'টা কথা বলার পরই হাতে ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দেয়া। কিছুদিন পর দেখব লোকজনের দেখা হবে কিন্তু কথাবার্তা হবে না। দু'জন দু'জনের হাতে ভিজিটিং কার্ড দিয়ে যে যার পথে চলে যাবে— হা-হা-হা।

বৃদ্ধার চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সে বলল, দিলদার ভাই উঠি?

দিলদার বলল, আরে না এখনই কী উঠবে ? কথাই তো হয় নি। এই মেয়ে কে ? তোমার নাতনি ?

হুঁ।

চেহারা ছবি তো ভালো— অভিনয় করবে ? নাম কী ?

জমিলা।

আগ্রহ থাকলে কোনো এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেব— অসুবিধা নাই। মেয়ের অবশ্য ঠোঁট মোটা, সেটা কোনো ব্যাপার না। কপালে থাকলে নায়িকা হওয়া কিছু না।

রেশমা লক্ষ করল জমিলার চোখ চকচক করছে। রেশমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। দিলদার রেশমার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, তোমাদের ছবির সমস্যা মিটমাট কীভাবে হলো ?

জানি না।

সবাই জানে। তুমি কিছু জান না— এটা কেমন কথা। সত্যি জান না ?

না।

তাহলে শোন আমার কাছে। সে এক ইতিহাস...

ইতিহাস শোনা হলো না। রেশমাদের একজন প্রডাকশান বয় ক্যান্টিনে ঢুকেছে। সে রেশমাকে দেখে রাগী গলায় বলল, ওস্তাদ তোমারে খুঁজে।

রেশমা চা রেখেই উঠতে যাচ্ছিল। দিলদার বলল, চা শেষ করে তারপর যাও। যত বড় ওস্তাদই হোক— খাওয়া ফেলে ছুটে যেতে হবে না। তাছাড়া শ্যুটিং তো আজ হচ্ছে না। পুরো এফডিসি প্যাকআপ।

চা আগুনগরম। দ্রুত খাওয়া যাচ্ছে না। দিলদার বলল, ম্যাডাম আস্তে আস্তে খান। জিভ পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। হা করলে দেখা যাবে কুচকুচে কালো জিভ।

জমিলা মেয়েটি এই রসিকতায় খুব হাসছে। মেয়েটা সুন্দর। সত্যিকার রূপবতী মেয়েদের লক্ষণ হলো হাসলেও এদের সুন্দর দেখা যায়। বেশিরভাগ রূপবতী মেয়ে হাসলে কুৎসিত হয়ে যায়। এই মেয়েটা হচ্ছে না। সে যতই হাসছে ততই সুন্দর হচ্ছে।

রেশমা চায়ের টাকা দিতে গেল। দিলদার হুংকার দিয়ে উঠল, খবরদার ম্যাডাম। তুমি দিলদারের গেস্ট। ভিজিটিং কার্ডটা যত্ন করে রেখে দিও—কখন দরকার হয় কে জানে। রাত ন'টার পর টেলিফোন করলে পাবে। অনেক সময় টেলিফোন লাইন নষ্ট থাকে—তখন সরাসরি চলে আসবে, অ্যাড্রেস লেখা আছে।

ন'নম্বর শ্যুটিং ফ্লোরে লোকজন নেই। এক ঘণ্টা আগে প্যাকআপ হয়েছে। এতক্ষণ লোক থাকার কথা না। লাইট সরানো হয় নি। সেকেন্ড শিফটে কাজ হবে—কাজেই যেটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আজমল তরফদার এখন বাড়ি যাবেন না। শট ডিভিশনের কিছু কাজ বাকি আছে। কাজ শেষ করবেন। ট্রলি শট যে ক'টা ছিল সব বদলাতে হচ্ছে। ফ্লোর উঁচুনিচু হয়েছে। ট্রলি স্মুথলি মুভ করছে না। ক্যামেরা কাঁপছে।

আজমল তরফদার চোখ বন্ধ করে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মাথা ধরেছে। একজন ফ্লোর-বয় তাঁর মাথা টিপে দিচ্ছে। তাঁর ঠিক দু'হাত পেছনে ফ্লোর ফ্যান বসানো হয়েছে। ফ্যান থেকে বাতাস যত না হচ্ছে শব্দ হচ্ছে তারচেয়েও বেশি।

রেশমা আজমল তরফদারের সামনে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে বলল, আজমল ভাই, আমাকে খবর দিয়েছেন? আজমল তরফদার চোখ মেললেন, চোখ টকটকে লাল। এটা কোনো অসুখ না বা রাত্রি জাগরণের ফলও না। সব সময় তাঁর চোখ এ রকম। প্রথমবার দেখলে মনে হয়— কিছুক্ষণ আগেই আলতা দিয়ে চোখ ধোয়া হয়েছে।

আজমল তরফদার চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। যে ফ্লোর-বয় মাথা বিলি দিয়ে দিচ্ছিল তাকে বললেন, ঠাণ্ডা এক গ্লাস লেবুর শরবত আমার জন্যে আন। চিনির শরবত না, লবণের শরবত।

রেশমা দাঁড়িয়ে আছে। এই মানুষটাকে তার ভয় ভয় লাগে। তবে মানুষটা ভালো। মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির কোনো বদনাম এই মানুষটার নেই।

রেশমা তোমার নাম?

জ্বি।

দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

বসার জন্যে চেয়ার বা টুল কিছুই নেই। বসতে হলে মেঝেতে বসতে হয়। রেশমা মেঝেতে বসে পড়বে কিনা বুঝতে পারছে না। আজমল তরফদার হুংকার দিলেন— এই কেউ নেই, এখানে চেয়ার দিয়ে যা।

ফ্লোর-বয় চেয়ার নিয়ে ছুটে এল। রেশমার অস্বস্তি লাগছে। এক্সট্রা মেয়ের জন্যে কোনো পরিচালক হুংকার দিয়ে চেয়ার আনায় না। রহস্যটা কী?

বোস। চা খাবে?

জ্বি না।

তাহলে ঠাণ্ডা কিছু খাও।

জ্বি না।

বার বার না বলবে না। বার বার না শুনতে ভালো লাগে না। ফ্লোরে কে আছে, ঠাণ্ডা কোক আন।

গ্লাসভর্তি কোক হাতে রেশমা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। তার মাথা ঘুরছে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আজমল তরফদার আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন। ফ্লোর-বয় তার মাথার চুল টেনে দিচ্ছে।

রেশমা।

জ্বি।

তুমি মোবারক সাহেবকে চেন?

জ্বি না।

আজমল তরফদার চোখ মেললেন। টকটকে লাল চোখ দেখলেই ভয় লাগে। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, মোবারক সাহেবকে চেন না?

জ্বি না।

জাহাজের ব্যবসা করেন যিনি সেই মোবারক। টেক্সটাইল মিল আছে— মোবারক টেক্সটাইলস— কোটিপতির ওপরে যদি কিছু থাকে সেই পতি।

জ্বি না, আমি চিনি না।

কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি ?

জ্বি না।

ও আচ্ছা। ঠিক আছে এইটা জানার জন্যে।

আমি চলে যাব আজমল ভাই ?

আচ্ছা যাও। শোন শোন তোমার পেমেন্ট হয়েছে ?

জ্বি না, মিজান ভাই বলেছেন কোনো কাজ হয় নাই সেজন্য পেমেন্ট হবে না।

তোমার পেমেন্ট হবে। অফিস থেকে পেমেন্ট নিয়ে যাও— আমি ম্যানেজারকে টেলিফোন করে দেব। আচ্ছা এখনি করছি।

আজমল তরফদার কর্ডের কোটের পকেট থেকে সেলুলার টেলিফোন বের করলেন। রেশমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ব্যাপারটা কী।

আজ ম্যানেজার মুনশি রেশমাকে দেখামাত্র ভাউচার বই বের করল। রেশমা সই করতে গিয়ে দেখে পাঁচ শ টাকা লেখা। তার পেমেন্ট দিন হিসেবে। এক দিনে তার প্রাপ্য হয় আড়াই শ। দেয়া হচ্ছে পাঁচ শ।

মুনশি টাকা বের করতে করতে বলল, চা খাবেন ?

এও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বাণী কথাচিত্রের ম্যানেজার মুনশি তাকে আপনি করে বলছে।

চা খাব না। আমার কাজ আছে। যাই ?

জ্বি আচ্ছা।

তার কোনো কাজ নেই। শুটিং প্যাকআপ হওয়ায় সারাটা দিন তার হাতে। সেকেন্ড শিফটে কাজ হবে। সেকেন্ড শিফট কাগজে-কলমে বিকেল চারটা থেকে শুরু হলেও ফ্লোর ম্যানেজার বলে দিয়েছে কাজ শুরু হবে মাগরেবের নামাযের পর। এই দীর্ঘ সময় এফডিসিতে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। মবিন ভাইয়ের মেসে হুট করে চলে যাবে নাকি ? অনেকদিন যাওয়া হয় না। এই সময় তাকে মেসেই পাওয়ার কথা। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা আর রাত এই সময়গুলোতে মবিন ভাই ব্যস্ত থাকেন— প্রাইভেট পড়ান। বিকেলের আগ পর্যন্ত সময়টা অবসর।

মবিন ভাইয়ের জন্যে একজোড়া স্যান্ডেলও কেনা দরকার। তার স্যান্ডেলের যে অবস্থা। বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া গেছে যখন...।

স্যান্ডেল কেনার ব্যাপারটায় সে মনস্থির করতে পারছে না। তার টাকা-পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে। চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল। ঐ দিনের দু'হাজার টাকা বাড়ি ভাড়ায় চলে গেছে। তারপরেও খালি হাতে মবিন ভাইয়ের কাছে যাওয়া যায় না।

কমদামি স্যান্ডেলও ছিল, সে ঝোঁকের মাথায় তিন শ পঁচিশ টাকা দিয়ে একজোড়া স্যান্ডেল কিনে ফেলল। মাপে হবে। এর আগের স্যান্ডেল জোড়াও তার কিনে দেয়া, সে মাপ জানে।

বাস প্রায় ফাঁকা। সে জানালার পাশে বসেছে। বাস দ্রুত চলছে। তার কেমন যেন শান্তি শান্তি লাগছে। অথচ শান্তি লাগার কিছু নেই। সে বুঝতে পারছে তার সামনে অনেক

অশান্তি— মোবারক সাহেব হঠাৎ উদয় হয়েছেন কেন? সে ধরেই নিয়েছে তার জীবনের কিছু আলাদা অংশ আছে। মূল জীবনের সঙ্গে সেই জীবনের কোনো মিল নেই। মূল জীবনের সঙ্গে তা যুক্তও নয়। ওই জীবন তার নয়— অন্য একটা মেয়ের জীবন, যার নাম টেপী। সে টেপী নয়— সে রেশমাও নয়; সে মিতু। মোবারক নামের লোকটিকে টেপী হয়তো চেনে, সে চেনে না।

জয়দেবপুর চৌরাস্তায় রেশমা বাস থেকে নামল। নেমেই সে মিতু হয়ে গেল। এক প্যাকেট ভালো সিগারেট কিনতে হবে। মানুষটার ভালো সিগারেটের এত শখ, টাকার অভাবে খেতে পারে না। পৃথিবীটা যদি এ রকম হতো— দোকান ভর্তি জিনিস থরে থরে সাজানো। যার যা প্রয়োজন উঠিয়ে নিয়ে যাবে, কাউকে কোনো টাকা দিতে হবে না। সিগারেট কেনার পর মিতুর মনে হলো— একটা কী যেন বাকি আছে। এর আগের বার মবিন ভাইয়ের কাছে যখন এসেছিল তখন ঠিক করে রেখেছিল পরের বার আসার সময় অবশ্যই কিনে আনবে। এখন মনে পড়ছে না।

দরজির দোকানের ওপরে একটা ঘর নিয়ে মবিন থাকে। এক শ টাকা ভাড়া। ঘরে প্লাস্টার হয় নি— জানালা লাগানো হয় নি। জানালার খোলা অংশ করোগেটেড টিন দিয়ে বন্ধ। মবিনের ঘরে ওঠার সিঁড়ি অসম্ভব সরু। রেলিং নেই। সাবধানে উঠতে হয়। বর্ষাকাল বলে সিঁড়ি ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। মিতু খুব সাবধানে উঠছে। তার হঠাৎ মনে হলো—এখন যদি দেখে মবিন ভাই নেই তখন কেমন লাগবে?

মবিন ঘরেই ছিল। সে দরজা খুলে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। মিতু বলল, দরজা ছাড়। দরজা ধরে থাকলে ভেতরে ঢুকব কীভাবে?

মবিন বলল, হাত ধরে তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাই?

সেটা আবার কী?

খুব সম্মানিত যারা তাদের হাত ধরে ঘরে ঢোকাতে হয়।

আমি কি খুব সম্মানিত?

অবশ্যই।

তাহলে হাত ধরে নিয়ে যাও।

মবিন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। হাত ধরল না। ধরবে না মিতু জানত। অশোভন কিছু কখনোই সে করবে না। মবিন বলল, পা তুলে আরাম করে বিছানায় বোস। তুমি কি দুপুরে খেয়ে এসেছ?

না।

তাহলে দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে।

হোটেলের কুৎসিত খাবার? রবারের গোশত আর টকে যাওয়া ডাল?

মবিন হাসিমুখে বলল, ভালো খাবার। টিফিন কেরিয়ারে করে আসবে।

কোত্থেকে আসবে?

এক কনট্রাকটর সাহেবের বাসা থেকে। উনার বড় মেয়ে এসএসসি দেবে। তাকে এখন ইংরেজি শিখাচ্ছি— বিনিময়ে মাসে সাত শ টাকা পাচ্ছি প্লাস দু' বেলা খাবার। রাতের খাবার ঐ বাসাতেই খাই— দুপুরেরটা তারা টিফিন কেরিয়ারে করে পাঠিয়ে দেয়।

তোমাকে এতে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ আনন্দিত। মহিলার রান্না অসম্ভব ভালো। যা রাঁধে তাই অমৃতের মতো লাগে। ঐদিন আলুভর্তা বানিয়ে পাঠিয়েছে। আলুভর্তার সঙ্গে সর্ষে বেটে দিয়েছে— আর দিয়েছে ধনেপাতা। এতগুলা ভাত খেয়ে ফেলেছি শুধু আলুভর্তা দিয়ে। আচ্ছা তুমি এ রকম শক্ত হয়ে বসেছ কেন ? আরাম করে বোস না।

আরাম করেই তো বসেছি।

আরো আরাম করে বোস। দেয়ালে হেলান দিয়ে বোস।

মিতু দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। মবিন বলল, তোমার খবর কী বল ?

মিতু হাসিমুখে বলল, বলার মতো কোনো খবর নেই। তোমার খবর কী ?

আমার দু'টা খবর আছে— একটা ভালো, একটা খারাপ। কোনটা আগে শুনতে চাও।

ভালোটাই আগে শুনি।

আমার ঘরের জানালা লাগানো হচ্ছে, এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি আকাশ দেখতে পারব।

খারাপ খবরটা কী ?

খারাপ খবর হলো— জানালা ফিট করায় ঘরের ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। কত বাড়ছে বলতে পারছি না, তবে বাড়ছে ...

মবিন হাসছে। মিতু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। এভাবে দীর্ঘ সময় কারো দিকে তাকিয়ে থাকতে নেই— এতে যার দিকে তাকিয়ে থাকা হয় তার অমঙ্গল হয়। নজর লেগে যায়। মিতু চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, আমি তোমার জন্যে উপহার এনেছি। বল তো কী ?

চিরুনি।

কী করে বুঝলে ?

শেষবার যখন এসেছিলে তখন আমার চিরুনি দেখে বলে গেছ আমাকে একটা চিরুনি উপহার দেবে। এই আশায় আমি চিরুনি কিনি নি। আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়াই।

সত্যি আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়াও ?

হুঁ।

আমি কিন্তু চিরুনি আনি নি। ভুলে গেছি। আমার মনে হচ্ছিল কী একটা জিনিস যেন ভুলে গেছি। তোমার জন্য একজোড়া স্যান্ডেল এনেছি।

সিগারেট ? সিগারেট আন নি ?

হুঁ।

দেখি দাও।

মিতু সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিল। মবিন প্যাকেট হাতে নিতে নিতে বলল, আমাদের বিয়ের পরেও কি তুমি আমাকে উপহার দেবে ?

আমি যতদিন বেঁচে থাকব, দেব।

কীসের শপথ ?

সূর্য এবং চন্দ্রের শপথ।

সূর্য এবং চন্দ্রের নামে তো মানুষ চিরকাল শপথ নিচ্ছে— তুমি নতুন কিছুর নামে নাও।

কার নামে শপথ নিতে হবে তুমি বলে দাও।

শপথ হওয়া উচিত তোমার সবচে' প্রিয় জিনিসের নামে। তোমার সবচে' প্রিয় কী ?

তুমিই আমার সবচে' প্রিয়।

ভালো করে ভেবেচিন্তে বল।

আমি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ভেবেছি। কাজেই আমি এখন শপথ করছি মবিনুর রহমানের নামে— আমি যত দিন বেঁচে থাকব ...

শপথ বাক্য শেষ করার আগেই দরজা ঠেলে টিফিন কেরিয়ার হাতে ন' দশ বছর বয়সী একটা ছেলে ঢুকল। মবিন ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠল— খাওয়া চলে এসেছে, খাওয়া। ছেলেটা বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে। মবিন বলল, এই ছেলের নাম বুড্ডা। নাম সুন্দর না ?

মিতু কিছু বলল না। মবিন কথা বলার জন্যেই কথা বলছে। আনন্দিত মানুষ অকারণে কথা বলে। অকারণে অজস্র প্রশ্ন করে। সেই সব প্রশ্নের জবাব তারা আশা করে না। মিতুর খারাপ লাগছে সে শপথের অংশটা শেষ করতে পারে নি। শপথটা শেষ করতে পারলে তার নিজের ভালো লাগত। বুড্ডা নামের ছেলেটা কোমরে হাত দিয়ে কেমন অভিভাবক অভিভাবক চোখে তাকাচ্ছে। দেখেই মনে হচ্ছে বাসায় গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলবে। মিতু বলল, তোমার বুড্ডা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

মবিন বলল, হ্যাঁ। খাওয়া শেষ হলে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে চলে যাবে।

ওকে চলে যেতে বল, ওর সামনে বসে আমি খাব না।

বুড্ডা তুমি চলে যাও, আমি সন্ধেবেলা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে যাব।

আইজ আফনেরে যাইতে নিষেধ করছে। আইজ আফার শইল খারাপ।

আচ্ছা যাব না। তুমি পরে এসে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে যাবে।

ছেলেটা নিতান্ত অনিচ্ছায় চলে যাচ্ছে। মিতু বলল, রাতে তোমাকে যেতে নিষেধ করল, রাতে তুমি খাবে কোথায় ?

ওরা খাবার পাঠিয়ে দেবে।

মিতু দেখল মবিন খুব আগ্রহ নিয়ে খবরের কাগজ বিছাচ্ছে, টিফিন কেরিয়ারের বাটি সাজাচ্ছে। ঘরে একটাই প্লেট। সেটা মিতুকে দেয়া হলো। মবিন বাটিতে খাবে। আয়োজন অনেক— বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, ঝাল ঝাল করে রান্না করা গুরুর গোশত, দু'রকমের ডাল। মবিন খুশি খুশি গলায় বলল, এদের ডাল রান্না অসাধারণ হয়। তোমাকে একদিন ঐ মহিলার কাছে নিয়ে যাব। ডাল রান্না শিখে আসবে। রেসিপি কাগজে-কলমে লিখে আনলে কিছু হয় না, এসব শিখতে হয় হাতে-কলমে। যাবে একদিন আমার সাথে ?

যাব।

ডালটা একটু চেখে দেখ-- অসাধারণ কিনা বল।

হুঁ অসাধারণ।

ডাল রান্নার ওপর এই মহিলাকে অনায়াসেই একটা পিএইচ.ডি. ডিগ্রি দিয়ে দেয়া যায়।

এই টিউশ্যানিটা পেয়ে তুমি মনে হয় সুখেই আছ।

খাওয়াদাওয়ার দিক দিয়ে আরামে আছি— তবে ছাত্রী পড়িয়ে কোনো আরাম পাই না।

কেন ?

যতক্ষণ পড়াই ততক্ষণ ছাত্রীর মা কাছেই একটা চেয়ারে কঠিন কঠিন চোখ করে বসে থাকেন। মেয়েকে পাহারা দেন। যেদিন তিনি থাকেন না সেদিন অন্য কেউ থাকে। নিজেকে খুব ছোট লাগে।

মিতু হালকা গলায় বলল, তারা জানে না তোমার চরিত্র সাধু-সন্ন্যাসীর মতো। জানলে মেয়ের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করত না।

আমার চরিত্র সাধু-সন্ন্যাসীর মতো! কী যে তুমি বল ! সাধু-সন্ন্যাসীদের বেশিরভাগই চরিত্রহীন। তুমি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো পড় নি, পড়লে বুঝতে ওদের ঋষিরা কী চীজ— হা-হা-হা।

খাওয়ার সময় এ রকম শব্দ করে হাসবে না। বিষম লাগবে।

ভাতে কি কম পড়বে ?

না, কম পড়বে না।

দেখেছ এরা কেমন চাল খায় ? এ চালের নাম হচ্ছে কাটারিভোগ। বিয়ের পর আমরা যখন সংসার পাতব তখন এই কাটারিভোগ চালই খাব। দু'জন মানুষ, চাল তো বেশি লগবে না, কী বল ?

মিতু জবাব দিল না। মবিন বলল, মাসে পনের কেজি চালের বেশি তো আমাদের লাগবে না। কাটারিভোগের কেজি কত করে তুমি জান ?

জানি না। আচ্ছা, খাওয়াদাওয়া ছাড়া অন্য কোনো গল্প করলে কেমন হয় ?

খুব ভালো হয়।

বেশ তাহলে অন্য গল্প বল।

অন্য গল্প তুমি বল— আমি শুনি।

আমার তো সব ছবির লাইনের গল্প। এসব গল্প শুনতে তোমার ভালো লাগবে না।

খুব ভালো লাগবে। তুমি যা বল তাই শুনতে ভালো লাগে। কারণ কি জান ?

না।

তোমার গলার স্বর অদ্ভুত সুন্দর। মনে হয় বাজনা বাজছে।

কী বাজনা— ঢোল ?

জলতরঙ্গ।

সেটা আবার কী বাজনা ?

চিনামাটির বাটিতে পানি ভর্তি করে কাঠি দিয়ে বাজায়। অনেকগুলো বাটি নেয়া হয়। বাটিতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করা হয়। মন্দ্র সপ্তক থেকে ...

উফ ! বক বক বন্ধ কর তো।

মবিন হেসে ফেলল। মিতু বলল, তোমার একটাই সমস্যা— কোনো কথা শুরু করলে সেটাকে জ্ঞানের কথায় নিয়ে ফেলবে। জ্ঞানের কথা কি আমার মতো সধারণ মানুষের ভলো লাগে ? হাত কোথায় ধোব ? তোমার বাথরুম কোথায় ?

বাথরুম নিচে— অনেক দূরে। তুমি বাটির মধ্যে হাত ধোও। পান খাবে ? মিষ্টি পান, নিয়ে আসি ?

কিছু আনতে হবে না। তুমি চুপ করে বোস আর ক্রমাগত কথা বলে যাও।

জ্ঞানের কথা ?

না, মজার মজার কথা।

আমার কোন কথাগুলো তোমার মজা লাগে তাও তো জানি না। বরং তুমি তোমার বিখ্যাত জলতরঙ্গ কণ্ঠে গল্প বল আমি শুনি।

ফিল্ম লাইনের গল্প ?

ফিল্ম লাইনের গল্পই তো সবচে' ইন্টারেস্টিং হওয়ার কথা।

ফিল্ম লাইনের ভয়ংকর সব গল্প আছে, শুনলে তোমার মনটন খারাপ হয়ে যাবে— যেমন ধর, একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, টেপী তার নাম। আমার মতোই ছোটখাটো পাঠ করে। তারা তিন বোন ...

ফিল্ম লাইনের মেয়ের নাম টেপী, অদ্ভুত তো। এই লাইনে নামের খুব বাহার থাকার কথা— নীলাঞ্জনা চৌধুরী টাইপ।

ও তো নায়িকা না যে নামের বাহার থাকবে। ও হচ্ছে অতি নগণ্য এক্সট্রা মেয়ে। পোস্টারে এদের নাম যায় না, পর্দায় টাইটেলেও নাম যায় না। কাজেই এদের নাম টেপী হোক বা নীলাঞ্জনা চৌধুরী হোক কিছুই যায় আসে না।

তারপর বল।

কী বলব ?

টেপী সম্পর্কে কী বলতে চাচ্ছিলে বল ...

ও আচ্ছা— ওরা তিন বোন— হ্যাপী টেপী, পেপী। টেপী মেজ। ফিল্মে কাজ করে সে তার সংসার চালায়, মাঝে মাঝে তাকে অন্য কিছুও করতে হয়। অন্য কিছুটা কী তুমি বুঝতে পারছ ?

মনে হয় পারছি।

যাক, তোমার বুদ্ধি তাহলে আমার চেয়ে বেশি। আমাকে প্রথম যখন টেপী বলল, মাঝে মাঝে আমি অন্য কিছু করি— তখন আমি বুঝতে পারি নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অন্য কিছু কী কর ? সে তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে এমন কান্না শুরু করল !

মেয়েটির সঙ্গে তোমার কি খুব ভাব ?

খুব ভাব না। মোটামুটি ভাব। ফিল্ম লাইনে কারো সঙ্গেই খুব ভাব হয় না। আজ হুট করে তোমার এখানে আসার কারণ কী জান ? কারণ হলো টেপী।

বুঝলাম না— বুঝিয়ে বল।

আজ মর্নিং শিফটের শুটিং হঠাৎ করে প্যাকআপ হয়ে গেল। টেপী বলল, আপা চল ক্যান্টিনে চা খাই।

তোমাকে আপা ডাকে ? বয়সে তোমার ছোট ?

সমানই হব তবু কেন জানি আপা ডাকে। যাই হোক ওর সঙ্গে চা খেতে গিয়েছি সেখানে হঠাৎ সে এমন কান্না শুরু করল...।

কেন ?

জানি না কেন ? আমি জিজ্ঞেস করি নি। আমার এত মন খারাপ হলো— ভাবলাম তোমার কাছে এলে হয়তো মন ভালো হবে।

মন ভালো হয়েছে ?

প্রথমে হয়েছিল। এখন আবার মন খারাপ লাগছে।

কেন ?

মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল এই জন্যে। আমি একবার ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।

আমার কাছে কেন ?

কোনো কারণ নেই, এমনি আনব। তোমার টিফিন কেরিয়ার, বাটি এইসব ধুয়ে দিচ্ছি— পানি কোথায় বল তো ? নিচে যেতে হবে ?

তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি চুপ করে এখানে বসে থাক।

আমি পা তুলে চুপচাপ বসে থাকব আর তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে থালাবাসন ধুবে— ভাবতেও ঘেন্না লাগছে।

ঘেন্না লাগার কিছু নেই— বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর; অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

থালাবাসন ধোয়া এমন কিছু মহান সৃষ্টি না।

বিশ্বে যা কিছু সাধারণ সৃষ্টি চিরকল্যাণকর; থ্রি-ফোর্থ তার করিয়াছে নারী ওয়ান-ফোর্থ তার নর।

মবিন হো-হো করে হাসছে। তার সারা শরীরে আনন্দ ঝলমল করছে। মিতুর চোখ ভিজে উঠছে। কেন ভিজে উঠছে সে নিজেও জানে না। মবিনকে এই চোখের পানি দেখতে দেয়া যাবে না। তাকে মুখ ঘুরিয়ে বসতে হবে। এই ঘরের কোনো জানালা নেই, জানালা থাকলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যেত। ভেজা চোখ নিয়ে আকাশ দেখতে ভালো লাগে।

৬

অফিসে মোবারক সাহেবের দু'টা খাস কামরা। একটা হলঘরের মতো বিশাল। ওয়াল টু ওয়াল ধবধবে সাদা কার্পেটে মোড়া। এক কোণায় দশ ফুট বাই ছ'ফুটের মেহগনি কাঠের কালো একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে মোবারক সাহেবের নিচু রোলিং চেয়ার। দেয়ালে বেশ কিছু পেইনটিং। পেইনটিঙের ফ্রেমগুলোও কালো মেহগনি কাঠের। ইন্টারন্যাল ডিজাইনার মেঝের সাদা কার্পেটের সঙ্গে কালো ফার্নিচারের একটা কম্বিনেশন করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন— কম্পোজিশান ইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। এই ঘরে যে চায়ের

কাপে চা দেয়া হয় তার রং পর্যন্ত কালো। পিরিচগুলো সাদা।

এই খাস কামরা মোবারক সাহেব সচরাচর ব্যবহার করেন না— তিনি ব্যবহার করেন বাড়ির চিলেকোঠার খাস কামরা। তুলানামূলকভাবে ঘরটা ছোট— তবে কোনো আসবাব নেই বলে ছোট ঘরও অনেক বড় মনে হয়। বসার জন্যে ঘরে ছোট ছোট কার্পেট পাতা আছে। ইটালিয়ান পার্লার মার্বেলের মেঝেতে হালকা নীল রঙের কার্পেট। ঘরে কোনো টেবিল নেই— শুধু মোবারক সাহেবের সামনে মারোয়াড়ি দোকানের ক্যাশ বাক্সের মতো ছোট্ট একটা মার্বেলের টেবিল। বড় বড় কাচের জানালায় পর্দা নেই বলেই ছাদের গোলাপ বাগান চোখে পড়ে। সেই বাগান দর্শনীয়।

আজমল তরফদার জুতা পায়ে মোবারক সাহেবের এই ঘরে ঢুকে দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মোবারক সাহেব হাসিমুখে বললেন, এত অপ্রস্তুত হবার কিছু নেই। জুতা পায়ে অনেকেই ঢুকে পড়ে। আমি নিজেও কতবার ঢুকেছি।

মেঝেতে ময়লা লেগে গেল।

লাগুক না। মেঝের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। আসুন, বসুন আমার সামনে। মেঝেতে বসে অভ্যাস আছে তো ? চেয়ার-টেবিল আসার পর থেকে বাঙালি মেঝেতে বসা ভুলে গেছে।

আজমল তরফদার এসে বসলেন। তিনি বসে আরাম পাচ্ছেন না। জিনসের প্যান্টে আঁটসাঁট লাগছে। মোবারক সাহেব বললেন, কী খাবেন বলুন ?

এক কাপ চা খেতে পারি।

দুপুরে লাঞ্চের আগে চা খেয়ে খিদে নষ্ট করবেন কেন ? শরবত খান। তেঁতুলের একটা শরবত আছে— আমার খুব প্রিয়। আপনার পছন্দ হলে রেসিপি দিয়ে দেব।

থ্যাংক য়্যু স্যার।

এখন ছবির বিষয়ে বলুন।

কী বলব স্যার ?

আপনাকে নিশ্চয়ই বলা হয়েছে আমি একটা ছবি বানাতে চাই।

জ্বি লোকমান সাহেব আমাকে বলেছেন।

সেই প্রসঙ্গে বলুন।

আজমল তরফদার কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর প্রচণ্ড সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে কিন্তু এই ঘরের যে অবস্থা তাতে মনে হয় না এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে। ভদ্রলোক শরবতের কথা বলেছেন অথচ কাউকে শরবত দিতে বলেন নি। ভুলে গেছেন বোধহয়। ঠাণ্ডা এক গ্লাস শরবত পেলে ভালোই হতো।

ছবির কোন ব্যাপার জানতে চান ?

সবই জানতে চাই।

কী পরিমাণ টাকা লাগবে তা দিয়ে শুরু করি ?

করুন।

ছবির জগতে আপার লিমিট বলে কিছু নেই। কেউ ইচ্ছা করলে একটা ছবি বানাতে পাঁচ কোটি টাকাও খরচ করতে পারে।

আপার লিমিট না থাকলেও লোয়ার লিমিট নিশ্চয়ই আছে ?

জ্বি তা আছে। জিনিসপত্রের দাম— আর্টিস্টদের পেমেন্ট যে হারে বেড়েছে তাতে স্যার একটা ছবির পেছেন প্রায় এক কোটি টাকা লগ্নি করতে হয়।

এক কোটি টাকায় ছবি হয়ে যাবে ?

জ্বি হবে। একটু টাইট বাজেটে করতে হবে। হাত-পা খেলিয়ে করা যাবে না।

হাত-পা খেলিয়ে করতে কত লাগবে ?

তার সঙ্গে আরো পঞ্চাশ লাখ যোগ দিন।

বেশ, আমি এক কোটি পঞ্চাশ লাখ খরচ করব।

আজমল তরফদার কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। কিছু কিছু মানুষের হাতে টাকা আছে তা তিনি জানেন। সেই টাকা কোন পর্যায়ে আছে তা জানেন না। কালো টাকাকে সাদা করার জন্যে অনেকে ছবি করে। এই ভদ্রলোকের কালো টাকার পরিমাণ কত ? ধনবান ব্যক্তিদের গা থেকে একটা আলগা চাকচিক্য ঝিলিক দেয়, ইনার তা নেই। সাদামাটা চেহারা— মুখের চামড়ায় ভাঁজ। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে থাকায় স্কুল টিচার স্কুল টিচার বলে মনে হচ্ছে।

স্যার আপনি কী ধরনের ছবি করতে চান ? কমার্শিয়াল ছবি, না আর্ট ছবি ?

পার্থক্য কী বুঝিয়ে বলুন।

মানিকদার ছবি হলো— আর্ট ছবি।

মানিকদাটা কে ?

সত্যজিত রায়। টালীগঞ্জে একটা ছবি করতে গিয়েছিলাম, তখন উনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

ও আচ্ছা।

'পথের পাঁচালী' টাইপ ছবি হলে নাম হবে, তবে হলে ছবি চলবে না। ইন্টারভ্যালের আগেই দর্শক বের হয়ে চলে আসবে। লগ্নি করা টাকা উঠে আসবে না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি যাবে, ছবির সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রযোজক হিসেবে আপনিও যাবেন। এই পর্যন্তই ...

আজমল তরফদারের কথার মাঝখানেই শরবত চলে এল। বড়ো সাইজের গ্লাস— ঈষৎ সবুজাভ রঙের পানীয়, উপরে বরফের টুকরা ভাসছে। শরবত এসেছে একজনের জন্যে। মোবারক সাহেব বললেন, নিন শরবত নিন।

আপনি খাবেন না স্যার ?

জ্বি না। আর্ট ছবি সম্পর্কে তো বললেন, এখন কমার্শিয়াল ছবি সম্পর্কে বলুন।

বলার কিছু নেই স্যার। ধুমধাড়াক্কা টাইপ ছবি। নাচ-গান-যৌনতা, যাত্রা ঢঙের অভিনয়, কিছু ভাঁড়ামি, কিছু চোখের পানি ... বারমিশালি খিচুড়ি।

লোকজন খিচুড়ি খাচ্ছে ?

না খেলে এত ছবি বানানো হবে কেন ? খিচুড়ি খাচ্ছে। যারা সিনেমা হলে যাচ্ছে তারা খিচুড়ি ছাড়া অন্য কিছুই খাবে না।

ছবি বানানো হচ্ছে কাদের জন্যে ?

রিকশাওয়ালা, গ্রামের চাষী, কুলি, মজুর এদের জন্যে— এদের বাড়িতে টিভি নেই, বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই— সারাদিন পরিশ্রম করে সিনেমা হলে এসে সিটি বাজিয়ে একটু আরাম পায়। ছবি বানিয়ে ব্যবসা করতে হলে এদের জন্যে ছবি বানাতে হবে। এখন স্যার ঠিক করতে হবে আপনি কাদের জন্যে ছবি বানাবেন ?

আমি ব্যবসায়ী মানুষ। দেড় কোটি টাকা যখন আমি ইনভেস্ট করব তখন আশা করব তিন কোটি টাকা প্রফিট।

অবশ্যহ করবেন।

এখন আপনি বলুন আমার এই ছবি পরিচালনা করতে আপনি কত টাকা নেবেন ?

আমার এখন পর্যন্ত কোনো ছবি নরম যায় নি। সব ছবি ব্যবসা করেছে। লাস্ট তিনটা ছবির তিনটাই সুপারহিট হয়েছে। আগে আমি তিন লাখ করে নিতাম। লাস্ট দু'টা ছবিতে সাত লাখ নিয়েছি। আপনিও তাই দেবেন।

শরবত খেতে কেমন লাগল ?

আজমল তরফদার একটু হকচকিয়ে গেলেন। হঠাৎ শরবতের প্রসঙ্গ চলে এল কেন বুঝতে পারলেন না।

শরবত খুব ভালো লেগেছে। ঝাঁজ আছে।

রেসিপিটা হচ্ছে— এক জগ পানিতে এক ছটাক তেঁতুল এবং এক টেবিল চামচ সৈন্ধব লবণ, কুচিকুচি করে কাটা দু'টা কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, কয়েক দানা জিরা চব্বিশ ঘণ্টা না নেড়ে রেখে দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা পর ছেঁকে আলাদা করতে হবে। তার সঙ্গে পরিমাণ মতো চিনি মিশিয়ে আধা পেগ ভদকা দিতে হবে।

এর মধ্যে ভদকা আছে ?

হ্যাঁ সামান্য আছে, আধা পেগেরও কম। আপনি মদ্যপান করেন না ?

তেমন অভ্যেস নেই। মাঝেমধ্যে হঠাৎ ... ছবির আলাপটা স্যার শেষ করি। আমার আরো কিছু জরুরি কাজ আছে।

মোবারক সাহেব শান্ত গলায় বললেন, ছবির আলাপ অবশ্যই শেষ করবেন— আমি একটু শুধু ইন্টারফেয়ার করব— আপনি যে বললেন সাত লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেন; শেষ দু'টি ছবিতে তাই নিয়েছেন তা তো ঠিক না। আমি খোঁজখবর নিয়েই কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। এখন পর্যন্ত কোনো ছবিতেই আপনি তিন লাখ টাকার বেশি পারিশ্রমিক পান নি। শেষ ছবিতেই চার লাখ টাকায় কনট্রাক্ট সাইন করেছেন। পেয়েছেন দু'লাখ। দু'লাখ এখনো পান নি। না পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। আমি একজন ব্যবসায়ী, দেড় কোটি টাকার একটা প্রজেক্টে হাত দেব— ভালোমতো খোঁজখবর না করেই এগুব তা ভাবলেন কীভাবে ? আপনি কি আরেক গ্লাস শরবত খাবেন ?

জ্বি স্যার খাব।

এখন বলুন ছবি শেষ করতে আপনার কতদিন লাগবে ?

আজমল তরফদারের চিন্তাভাবনা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। স্কুল টিচারের মতো দেখতে এই লোক সহজ লোক না। কঠিন লোক। কঠিন লোকের হয়ে কাজ করায় আনন্দ আছে। এরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়।

আজমল তরফদার আরেকটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছেন। দ্বিতীয়বার শরবতের কথা তাকে বলা হয়েছে কিন্তু খবরটা ভেতরে দেয়া হয় নি। তারপরেও আজমল তরফদারের ধারণা যথাসময়ে শরবতের গ্লাস চলে আসবে। যদি আসে তাহলে ধরে নিতে হবে মোবারক হোসেন নামের এই লোক শুধু কঠিন ব্যক্তি না— সূক্ষ্ম চালের ক্ষমতা আছে এমন এক ব্যক্তি।

মোবারক সাহেব বললেন, আপনার বোধহয় সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে। অভ্যাস থাকলে খেতে পারেন। আমিও মাঝেমধ্যে খাই।

তিনি তাঁর সামনে ছোট্ট ডেস্ক টাইপ টেবিলের ড্রয়ার খুলে অ্যাশট্রে বের করে সামনে রাখলেন। আজমল তরফদার ভুরু কুঁচকে ফেললেন। কথাবার্তার ঠিক এই পর্যায়ে ড্রয়ার থেকে অ্যাশট্রে বের করা হবে এটা কি আগেই ঠিক করা?

মোবারক সাহেব একটু ঝুঁকে এসে বললেন, আমি আপনাকে দিয়ে ছবি বানাব বলে ঠিক করে রেখেছি। আপনার রেমুনারেশন হিসেবে আমি পাঁচ লাখ টাকা ভেবে রেখেছি। এই অ্যামাউন্টের টাকার একটা চেক তৈরি করা আছে। আপনি রাজি থাকলে আজই আপনাকে দিয়ে দেব।

পুরোটা একসঙ্গে দিয়ে দেবেন?

হ্যাঁ। এবং ছবি যদি সুপারহিট হয় তাহলে আপনাকে আরো দু'লাখ দেয়া হবে। আপনি কি রাজি আছেন?

রাজি আছি।

কতদিনে ছবি তৈরি করে দেবেন?

আমি ছ'মাসে ছবির সেন্সরপ্রিন্ট দিয়ে দেব। এবং ইনশাআল্লাহ্ ছবি সুপারহিট করবে। তবে একটা শর্ত— ছবি আমার মতো করে বানাতে দিতে হবে।

তা দেব। শুধু টাকা-পয়সা আমার লোকজন হ্যান্ডেল করবে। এবং নায়িকা হিসেবে আমার পরিচিত একটি মেয়ে থাকবে। আপনি তাকে চেনেন। আপনার বর্তমান ছবিতে কাজ করছে। রেশমা।

রেশমা?

হ্যাঁ।

আপনি স্যার দেড় কোটি টাকা খরচ করছেন, ইচ্ছে করলে বর্তমানের সবচে' হিট নায়িকা নিতে পারেন।

আমি ঐ মেয়েটিকে নিতে চাচ্ছি।

স্যার কিছু মনে করবেন না। ওর চেহারায় গ্ল্যামার নেই। ছবির জগতটাই হলো গ্ল্যামারের।

ফিল্ম লাইনের মেকআপ দিনকে রাত করতে পারে। সামান্য গ্ল্যামার আনতে পারবেন না?

সে রকম মেকআপম্যান স্যার আমাদের নেই।

না থাকলে বাইরে থেকে নিয়ে আসুন। মাদ্রাজ থেকে আনুন, বোম্বে থেকে আনুন। প্রয়োজন মনে করলে হলিউড থেকে আনুন।

শরবত চলে এসেছে। আজমল তরফদার অস্বস্তির সঙ্গে শরবতের গ্লাস হাতে নিলেন। তাঁর কাছে মনে হলো— পাঞ্জাবি গায়ে বসে থাকা ছোটখাটো মানুষটা আসলে মাকড়সার মতো। সূক্ষ্ম জাল ফেলে রাখে। সে জাল চোখে দেখা যায় না। জালে জড়িয়ে পড়ার পরই শুধু জালটা স্পষ্ট হয়।

আজমল সাহেব।

জ্বি স্যার।

এই নিন আপনার চেক।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে চেক বের হলো। আজমল তরফদার হাত বাড়িয়ে যন্ত্রের মতো চেকটা নিলেন। চাপা গলায় বললেন, আপনার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?

আর দেখা হবে না। আমার লোক আপনার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে।

যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন পড়ে?

প্রয়োজন পড়লে আমি আছি। আমি তো দেশেই থাকি। তবে নানান কাজে ব্যস্ত থাকি।

ছবির গল্প কি আমিই সিলেক্ট করব?

অবশ্যই আপনি করবেন।

আপনাকে দেখানোর কোনো দরকার নেই?

না।

এফডিসির ক্যামেরা না নিয়ে প্রাইভেট পার্টির ক্যামেরা দিয়ে যদি কাজ করি আপনার আপত্তি আছে? জার্মানির এরি থ্রি ক্যামেরা। নতুন এসেছে। এরা টাকা একটু বেশি নেবে কিন্তু কাজ হবে খুব ভালো।

আপনি কাজ করবেন স্বাধীনভাবে। আমি বা আমার লোকজন কখনোই আপনার স্বাধীন কাজে বাধা দেবে না।

জ্বি আচ্ছা সার।

আজমল তরফদার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা সামান্য টলছে। সম্ভবত পর পর দু'পেগ ভদকার জন্যে এটা হয়েছে। ভদকা হঠাৎ করে 'কিক' দেয়। এটা কি ভদকার কিক, না অন্য কিছু? স্কুল টিচারের মতো দেখতে এই লোকটা তাকে নার্ভাস করে দিয়েছে।

স্যার।

বলুন।

আর্টিস্টদের সঙ্গে কি যোগাযোগ করব?

স্টোরি লাইন ঠিক হবার আগে আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কীভাবে?

এদিকের নিয়ম হচ্ছে স্যার— আগে আর্টিস্ট ঠিক করা হয় তারপর স্টোরি লাইন।

নিয়ম যা তাই করবেন। তবে রেশমা মেয়েটিকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি ডিসিশান বদলাতেও পারি।

যদি কিছু মনে না করেন স্যার তাহলে ডিসিশান বদলানো ভালো হবে। সম্পূর্ণ নতুন মেয়ে নেয়া এক কথা আর দিনের পর দিন এক্সট্রার রোল করছে এমন একজনকে নেয়া

সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নতুন একজন নায়িকার জন্যে দর্শকদের কৌতূহল আছে। এক্সট্রা মেয়েদের জন্যে দর্শকদের কৌতূহল নেই। স্যার যাই।

মোবারক সাহেব জবাব দিলেন না। আজমল তরফদারের পা সত্যি সত্যি টলছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি প্রয়োজনের চেয়েও বেশি বার 'স্যার' 'স্যার' করেছেন। এত 'স্যার' 'স্যার' করার কোনো দরকার ছিল না। এটা তো আর মিলিটারি একাডেমি না যে স্যারের উপর দুনিয়া চলবে।

মোবারক সাহেব ঘরে একা বসে আছেন। আজমল তরফদার নামের সিনেমার এই লোক তাকে খুব বিরক্ত করেছে। লোকটার চোখে কোনো অসুখ আছে। টকটকে লাল চোখ। তিনি লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হচ্ছিলেন। বিরক্তি অনেক বাড়ল যখন সে মিথ্যা কথা বলে তার পাওনা বাড়াতে চাইল। লোভীর মতো লোকটির চেক নেয়াটাও চোখে লেগেছে।

পৃথিবীর সবচে' অসুন্দর দৃশ্য হলো লোভে চকচক করা চোখ। আর সবচে' সুন্দর দৃশ্য গভীর মমতায় আর্দ্র প্রেমিকার চোখ। তিনি দীর্ঘদিন লোভে চকচক করা চোখ দেখছেন। দেখে দেখে তিনি খানিকটা ক্লান্ত। তবে লোভী মানুষদের একটা ভালো দিক আছে। কোনো লোভী মানুষই আত্মহত্যার কথা ভাবে না। লোভ তাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা জোগায়। তিনি লোভী হলে ভালো হতো, বেঁচে থেকে আনন্দ পেতেন। এখন বেঁচে থেকে কোনো আনন্দ পান না। আনন্দের জন্যে অতি নিম্নস্তরের কিছু কাণ্ড তিনি করছেন। তাতে তেমন লাভ হচ্ছে কি ?

লোকমান উঁকি দিল। তিনি সহজ গলায় বললেন, কিছু বলবে লোকমান ?

লোকমান বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আপনি ডাক্তার সাহেবকে আসতে বলেছেন, উনি এসেছেন।

এখানে নিয়ে এস।

দুপুরের খাবার কি স্যার এখানে দেব ?

দাও। ডাক্তারকেও আমার সঙ্গে খেতে বলেছিলাম।

জ্বি স্যার জানি।

ডাক্তার আবদুর রশীদ ইএনটি স্পেশালিস্ট। মোবারক সাহেবের নাক-কান-গলার কোনো সমস্যা নেই। তবু রশীদ সাহেবকে তিনি প্রায়ই খবর দিয়ে আনেন কথা বলার জন্যে। রশীদ সাহেব ভদ্রলোকের অনেক ক'টা বিলিতি ডিগ্রি আছে কিন্তু প্র্যাকটিস নেই। ইএনটি স্পেশালিস্টরা রোগী সামলাতে হিমশিম খান। রশীদ সাহেবের সেই সমস্যা নেই। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে খবরের কাগজ পড়ে। তিনি চারটা খবরের কাগজ রাখেন। চেম্বারে বসে চারটা খবরের কাগজ পড়ারই তাঁর সময় হয়।

এই মানুষটির বিস্মিত হবার ক্ষমতা অসাধারণ। মোবারক সাহেব মাঝেমধ্যে তাকে খবর দিয়ে আনেন। সামান্য ব্যাপারে ভদ্রলোককে বিস্মিত হতে দেখেন। তাঁর ভালো লাগে। মেডিকেল কলেজের একজন নামি অধ্যাপক— তাকে তো আর যখন তখন খবর দিয়ে আনা যায় না। অসুখের একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে খবর দিতে হয়। রোগ

দেখানোর পর অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা চেক তাঁর হাতে দেয়া হয়। তিনি চেকটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ খুব হৈচৈ করেন— করেছেন কী ! পত্রিকাওয়ালারা জানলে তো নিউজ করে ফেলবে। অসম্ভব, এই চেক আমি নিতে পারি না। আপনার যদি টাকা বেশি হয়ে থাকে এবং দান করতে যদি কষ্ট হয় তাহলে দয়া করে টাকাগুলো পুড়িয়ে ফেলুন। আমাকে নষ্ট করবেন না। আমি এমনিতেই নষ্ট।

ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত চেকটা নেন। এবং ছেলেমানুষের মতো বলে ফেলেন— চেকটা পেয়ে খুব উপকার হয়েছে, প্র্যাকটিস বলতে কিছুই নাই। চেম্বারে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখেছিলাম, তিন মাস বেতন না দেয়ায় চলে গেছে। শুধু হাতে যায় নি, আমার ইন্সট্রুমেন্ট বক্স নিয়ে পালিয়ে গেছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দামের ইন্সট্রুমেন্ট।

রশীদ সাহেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, মোবারক সাহেব, আবার আপনার কী হলো ?

ঢোক গিলতে ক'দিন ধরে সমস্যা হচ্ছে।

টনসিলাইটিস নাকি ? হাঁ করুন তো।

এক্ষুণি হাঁ করব না। খানিকক্ষণ গল্পগুজব করুন তারপর হাঁ করি।

আরে সর্বনাশ ! এগুলো কি গোলাপ নাকি। আপনি করেছেন কী— ছাদে দেখি একেবারে আগুন লাগিয়ে ফেলেছেন ! দু'টা মিনিট সময় দিন আমি একটু বাগানটা দেখে আসি।

রশীদ সাহেব গভীর আনন্দে গোলাপ দেখে বেড়ান। মোবারক সাহেব তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। রশীদ সাহেবকে তিনি ব্যবহার করেন। ঠিক একইভাবে তিনি আরো অনেককে ব্যবহার করেন। কিন্তু তারপরেও তাঁর কিছুই ভালো লাগে না। পর পর দু'বার তিনি তিনতলার বারান্দা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে পড়েন নি। আরো একবার একরকম কিছু হবে। সেই বার তিনি হয়তো সত্যি সত্যি লাফিয়ে পড়বেন।

জীবনের বৈচিত্র্যের জন্যে টেপীর মতো মেয়েদের তিনি মাঝে মাঝে নিয়ে আসেন। তাদের কেউ কেউ অদ্ভুত সব কাণ্ড করে। কিছুক্ষণের জন্যে জীবনটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়—তারপর আবার সেই ক্লান্তিকর দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী। একবার বাইশ-তেইশ বছর বয়সী একটি মেয়ে এসেছিল। সে ভয়ে এবং লজ্জায় মরে যাচ্ছে। বিছানার এক কোণায় বসেছিল। মোবারক সাহেবকে দেখেই চট করে উঠে দাঁড়াল। হড়বড় করে বলল, আমি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারি না। আমি কিন্তু কাপড় খুলব না।

সেদিন তিনি প্রাণ খুলে হেসেছিলেন। মেয়েটিকে কাপড় খুলতে হয় নি। তিনি তাকে কফি বানিয়ে খাইয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে তাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, তোমার যখনই টাকা-পয়সার সমস্যা হবে তুমি আমার কাছে আসবে, টাকা নিয়ে যাবে।

মেয়েটি আর আসে নি। তিনি খবর নিয়েছিলেন। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। সে স্বামীর সঙ্গে জামালপুরে থাকে। সে সুখেই আছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই সুখে থাকে। অল্প কিছু লোক থাকে অসুখী— তারা শুধু সুখী মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

ঝুমুর আজ স্কুলে যায় নি। বিকেল তিনটায় সে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে। সে সকাল থেকেই অস্বস্তি নিয়ে ঘুরছে। সেন্ট্রাল জেলের গেটে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কুৎসিত লাগে। চারপাশে থাকে গাদাগাদি ভিড়। দর্শনার্থীর চেয়ে বাইরের লোক বেশি। এরা এমন ভঙ্গিতে তাকায় যেন যারা দেখা করতে এসেছে তারাও অপরাধী।

সবচে' খারাপ লাগে যখন তারা গরাদ ধরে অপেক্ষা করতে থাকে এবং কয়েদির পোশাক পরা রফিক হাসিমুখে উপস্থিত হয়। পায়ে লোহার বালা। সেই বালা থেকে ঝনঝন শব্দ হয়। একটা বালা থেকে এমন শব্দ হয় কেন ঝুমুর জানে না। ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। প্রশ্নটা হাস্যকর হবে ভেবে কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না।

প্রতিবারই রফিককে অন্যরকম লাগে। শেষবার দেখা করতে গিয়ে ঝুমুর একটা ধাক্কা খেল— রফিকের মুখভর্তি দাড়ি। দেখে মনে হয় মাদ্রাসার বাচ্চা মওলানা। আজ গিয়ে কী দেখবে কে জানে। ঝুমুরের যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু সে যাবে। সে না গেলে আপাকে একা একা যেতে হবে। বেচারি সবকিছু একা করবে তা কি হয়? মা কখনো যাবে না। দু' বছরে একবারও যায় নি। মাসে একটা চিঠি লেখা যায়, সেই চিঠিও লিখবে না।

শাহেদা রান্নাঘরে থালাবাসন ধুচ্ছিলেন। ঝুমুর এসে তাঁর পাশে বসল। শাহেদা বললেন, কী হয়েছে?

ঝুমুর বলল, জ্বর জ্বর লাগছে মা।

শুয়ে থাক।

ঝুমুর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। তার ধারণা পৃথিবীর সব মা 'জ্বর জ্বর লাগছে' এই বাক্য শোনার পর সন্তানের কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে। শুধু তার মা শুকনো গলায় বলবে 'শুয়ে থাক'।

ভাইয়ার জন্যে কিছু রেঁধে টেঁধে দেবে?

কী রাঁধব?

পায়েস বা এই জাতীয় কিছু। সবাই খাবার টাবার নিয়ে যায়— আমরা শুধু যাই খালি হাতে।

তোদের কিছু নিতে ইচ্ছে হলে নিজেরা রেঁধে নিয়ে যা।

ঝুমুর আর কিছু বলল না। তবে সে উঠে গেল না, মা'র পাশে বসে রইল। ঘরে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। আপা শুটিঙে গেছে। সে বাসায় ফিরবে না। এফডিসির গেট থেকে আপাকে তুলে নিতে হবে। জয়দেবপুর থেকে তাকে একা একা যেতে হবে এফডিসি, এটাও তার জন্যে বিরাট সমস্যা। তার সাহস একেবারেই নেই। স্কুল থেকে সে বাসায়ও একা একা আসতে পারে না। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে আসে। সেই বান্ধবী তাকে তাদের বাসার গেট পর্যন্ত দিয়ে তারপর তার বাসায় যায়। আজ একা একা এফডিসি পর্যন্ত কী করে যাবে কে জানে। যাওয়া অবশ্য খুব সোজা। ফার্মগেটে বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিতে হবে। পাঁচ টাকা নেবে রিকশা ভাড়া। আপা কখনো রিকশা নেয় না। বাস থেকে নেমে সে হেঁটে হেঁটে যায়। তার পক্ষে সম্ভব না। তাকে উপায় না থাকলেও পাঁচ টাকা খরচ করতে হবে।

মা।

হুঁ।

একা একা এফডিসির গেট পর্যন্ত যাব কীভাবে ?

মিতু যেভাবে যায় তুইও সেইভাবে যাবি। তোর জন্যে চৌকিদার পাব কোথায় ?

মবিন ভাইকে বলব আমাকে পৌঁছে দিতে ?

না।

অসুবিধা তো কিছু নেই। উনার যদি কাজ না থাকে...

তোর যাবার দরকার নেই। তোর আপা একাই যাবে।

মবিন ভাইকে তুমি এত অপছন্দ কর কেন ?

পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার না, শুধু শুধু বাইরের একটা মানুষকে বিরক্ত করবি কেন ?

উনি বাইরের মানুষ না, দু'দিন পর বিয়ে হচ্ছে আপার সঙ্গে।

যখন হবে তখন দেখা যাবে।

ঝুমুরকে রান্নাঘরে রেখে তিনি উঠে গেলেন। বালতিতে কাপড় ভেজানো আছে। কাপড় ধুবেন। ঝুমুর একা একা বসে রইল। তার এখন ইচ্ছা করছে কলঘরে মা'র পাশে গিয়ে বসতে। সে একা একা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

হঠাৎ ঝুমুরের মনে হলো, তার যখন বিয়ে হবে তখন তার স্বামী বেচারা খুব ঝামেলায় পড়বে। সারাক্ষণ সে স্বামীর সঙ্গে থাকবে। কে জানে সে হয়তো অফিসেও চলে যাবে। স্বামী কাজ করছে— সে তার সামনের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। ঝুমুরের এইসব ভাবতে খুব লজ্জা লাগছে আবার না ভেবেও পারছে না। ইদানীং সে এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব ভাবে। সে যখন একা থাকে শুধু যে তখন ভাবে তা না, যখন অনেকের সঙ্গে থাকে তখনো ভাবে। সবচে' বেশি ভাবে ক্লাসে। আপা অঙ্ক করাচ্ছেন। সবাই বোর্ড থেকে অঙ্ক টুকছে আর সে ভাবছে অন্য কিছু। সেই অন্য কিছু মানে খারাপ কিছু না, আবার খারাপও। যেমন— আপা যখন অঙ্ক করাচ্ছিলেন তখন সে ভাবছে ... ভাবছে না, পরিষ্কার চোখের সামনে দেখছে লাল রঙের একটা গাড়ি স্কুলে ঢুকল। গাড়ি থেকে একজন নামল— তার পরনে ধবধবে সাদা প্যান্ট, গায়ে চকলেট রঙের হাওয়াই শার্ট। শার্টের রঙটা কটকট করে চোখে লাগছে। তাকে দেখেই সে বের হয়ে আসছে। অঙ্কআপা কঠিন গলায় বললেন, এই ঝুমুর কোথায় যাচ্ছ ?

সে লজ্জিত গলায় বলল, আমার হাসবেন্ড আমাকে নিতে এসেছে আপা।

ও আচ্ছা যাও। তুমি কিন্তু খুব ক্লাস মিস দিচ্ছ।

না গেলে ও খুব রাগ করবে।

আচ্ছা যাও। উনাকে বলবে স্ত্রীর পড়াশোনার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। শুধু সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে হবে না।

জ্বি আপা বলব।

সে বের হয়ে হনহন করে গাড়ির দিকে এগুল। তারপর বিরক্ত গলায় বলল, আচ্ছা তোমাকে কতবার না বলেছি চকলেট কালারের এই শার্টটা পরবে না। তারপরেও পরেছ ?

হাতের কাছে পেয়েছি, পরে চলে এসেছি।

তুমি এই শার্ট গায়ে দিয়ে থাকলে আমি কোথাও যাব না।

তাহলে শার্ট খুলে ফেলি, শার্টের নিচে স্যান্ডো গেঞ্জি আছে। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা থাকলে যাবে ?

আবার ঠাট্টা করছ ?

ঝুমুরের চোখে পানি এসে গেছে। সে সবার ঠাট্টা সহ্য করতে পারে, এই মানুষটার ঠাট্টা সহ্য করতে পারে না। ঝুমুরের চোখে পানি দেখে সে লজ্জিত ভঙ্গিতে এসে তার হাত ধরল। ঝুমুর ঝটকা মেরে সেই হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলল, ছিঃ এইভাবে হাত ধরলে— ক্লাসের সব মেয়েরা তাকিয়ে আছে, আপারা দেখছে।

দেখুক। তুমি কাঁদবে কেন ?

আমি এক শ বার কাঁদব।

আমিও এক শ বার হাত ধরব।

এইসব ভাবতে ঝুমুরের এত ভালো লাগে ! যা ভাবা হয় সত্যিকার জীবনে তা কখনো ঘটে না। ঝুমুরের নিশ্চিত ধারণা তার বিয়েই হবে না। আর হলেও পানের দোকানদার টাইপ কারো সঙ্গে হবে। যার গায়ে সবসময়ই ঘাম আর কড়া সিগারেটের গন্ধ থাকবে।

দুপুরে ঝুমুর কিছু খেতে পারল না। তাকে একা একা ঢাকা যেতে হবে এই টেনশানেই তার মুখে কিছু ভালো লাগছে না। কেমন যেন গা গুলাচ্ছে। ঝুমুর বলল, মা তুমি আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আস।

শাহেদা শান্ত গলায় বললেন, কোথাও তুলে দিতে পারব না। তুই নিজে নিজে বাস খুঁজে বের করবি। নিজে নিজে উঠবি।

আচ্ছা। ভাইয়াকে কিছু বলতে হবে ?

না।

আপাকে কিছু বলতে হবে ?

ঘরে চা নাই, চিনি নাই।

চা চিনি ছাড়া আর সব আছে ?

শাহেদা জবাব দিলেন না।

আমি কি এই কামিজটা পরেই যাব ?

তোর যা ইচ্ছা পর।

কামিজটা যা নোংরা হয়ে আছে। আপার একটা শাড়ি পরে ফেলব মা ?

শাহেদা জবাব দিলেন না। কথাবার্তা তিনি এমনিতেই কম বলেন— যত দিন যাচ্ছে কথাবার্তা আরো কমিয়ে দিচ্ছেন।

ঝুমুর ঘর থেকে বের হয়ে অসীম সাহসী এক কাণ্ড করল। মবিনের মেসে যাবার জন্যে একটা রিকশা ঠিক করে ফেলল। কাজটা অসীম সাহসিক এই কারণে যে মবিনকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে ঘোরতর সমস্যায় পড়বে। টাকায় টান পড়ে যাবে। ফার্মগেট থেকে নেমে এফডিসি যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। সে চিনে যেতে পারবে কিনা

তাও এক সমস্যা। বাইরে একা বেরোলেই তার শুধু সমস্যা হয়। হয়তো স্যান্ডেলের স্ট্যাপ ছিঁড়ে যাবে। তাকে যেতে হবে স্যান্ডেল হাতে নিয়ে। তারচে' বড়ো সমস্যাও হতে পারে— হয়তো ইতিমধ্যে মবিন ভাই তার ঘর বদলেছেন। সে দরজির দোকানের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় নক করল। দরজা খুলল— দেখা গেল ভয়ঙ্কর দর্শন কয়েকজন চৌকিতে বসে তাস খেলছে। সবার সামনে মদের গ্লাস। ঝুমুর কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, মবিন ভাই কি এখানে থাকেন না? একজন চাপা গলায় উত্তর দিল, জ্বি না খুকুমণি, উনি থাকেন না। তাতে কী হয়েছে আমরা তো থাকি?

সেই লোকটা তারপর মাথা ঘুরিয়ে কোণায় বসে থাকা এক লোককে বলল— ঐ যা তো মেয়েটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দে। মুখে রুমাল গুঁজে দে। নয়তো চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলবে।

ঝুমুর দরজার কড়া নাড়ল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মবিন বলল, ঝুমুর তুমি, ব্যাপার কি?

আমি ঢাকা যাব মবিন ভাই।

ঢাকা যাবে অতি উত্তম কথা। এটা তো ঢাকা যাবার দোতলা বাস না যে তুমি দোতলায় উঠে এলে।

আপনি আমাকে ঢাকার বাসে তুলে দেবেন।

অতি উত্তম তুলে দেয়া হবে।

শুধু তুলে দিলে হবে না আপনাকে আমার সঙ্গে এফডিসির গেট পর্যন্ত যেতে হবে।

ব্যাপার কী?

আজ ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করার ডেট। আপা আমাকে বলেছে আড়াইটার সময় এফডিসির গেটে থাকতে। একা একা আমি কোথাও যাই না তবু ...

কোনো সমস্যা নেই, তোমাকে একা একা যেতে হবে না।

আপনি কিন্তু আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবেন এবং আপনি যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন সেটা আপাকে বলবেন না।

এত গোপনীয়তা কেন?

আপাকে বললেই আপার কাছ থেকে মা জানবে। মা খুব রাগ করবে।

এই ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই শ্রেয়। আড়াইটার সময় পৌছতে হবে?

হুঁ।

তাহলে বোস কিছুক্ষণ, আমি ভাত খেয়ে নি।

আচ্ছা।

তুমি খেয়ে এসেছ?

হুঁ।

আমার সঙ্গে চারটা খাবে?

খেতে পারি।

আমি কি আপনার বিছানায় পা তুলে বসব মবিন ভাই?

অবশ্যই বসবে।

আপনার ঘরে ঢুকলেই কেমন শান্তি শান্তি ভাব হয়। কেন বলুন তো মবিন ভাই?

ঘরটা ফাঁকা তো— কোনো আসবাব নেই— একটা চৌকি, একটা চেয়ার। চৌকিতে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটি মানেই শান্তি, ফাঁকা ঘর মানেই শান্তি। এই জন্যে আমার ঘরে পা দিলেই শান্তি শান্তি ভাব হয়।

আপনি কি আপার সঙ্গেও এরকম করে কথা বলেন, না আপার সঙ্গে অন্যরকম করে কথা বলেন?

এরকম করেই কথা বলি।

সে কি আপনার কথা শুনে খুশি হয়?

জিজ্ঞেস করি নি কখনো।

জিজ্ঞেস করতে হবে! মুখ দেখেই তো বোঝা যায়।

আমি তোমার আপার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারি না।

আমিও পারি না।

মবিন খবরের কাগজ বিছাচ্ছে। টিফিন কেরিয়ারের বাটি বের করছে। ঝুমুর বলল, আমাকে কি আজ একটু অন্যরকম লাগছে না?

হুঁ লাগছে।

কেন অন্যরকম লাগছে বলুন তো ?

শাড়ি পরেছ এই জন্যেই অন্যরকম লাগছে।

ও আপনি তাহলে লক্ষ করেছেন। আমি ভাবলাম বোধহয় লক্ষ করেন নি।

লক্ষ করব না কেন, করেছি।

যারা দিনরাত বই পড়ে তারা বই ছাড়া আর কিছুই লক্ষ করে না।

আমি করি।

ঝুমুর বাসায় কিছু খেতে পারে নি। এখানে একগাদা ভাত খেয়ে ফেলল। হাসিমুখে বলল, মবিন ভাই, ঘুমে এখন আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। আপনার শীতলপাটিতে ঘুমুতে নিশ্চয় খুব আরাম।

আমার তো আরামই লাগে।

আমি একদিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে আপনার শীতলপাটিতে এসে আরাম করে ঘুমুব।

বাসায় আরাম করে ঘুমুতে পার না?

না, এতটুকু একটা বিছানা, আপা আর আমি দু'জন ঘুমাই। খুব চাপাচাপি হয়। মা'র বিছানাটা বড় কিন্তু মা'র সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। মা'র রাতে ঘুম হয় না তো— সারারাত এপাশ-ওপাশ করে। মাঝে মাঝে কাঁদে। তার গায়ের সঙ্গে গা লাগলে কী করে জানেন? ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

ঝুমুর চল, ওঠা যাক। এখন রওনা না হলে আড়াইটার সময় পৌঁছাতে পারবে না।

ঝুমুর অনিচ্ছার সঙ্গে উঠল। মবিন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার সব সময়ই ভালো লাগে। আজ অন্য দিনের চেয়েও ভালো লাগছে।

মবিন ভাই !

হুঁ।

আপনাদের বিয়ে কবে হবে ?

বুঝতে পারছি না। চাকরি বাকরি ছাড়া বিয়ে করা ঠিক হবে না।

চাকরির আশায় বসে থাকলে আপনার আর বিয়ে হবে না।

তোমার ধারণা আমার চাকরি বাকরি হবে না ?

হুঁ।

ভুল ধারণা। আমি বিরাট একটা চাকরি পাব। চা বাগানের ম্যানেজার। বাংলো টাইপ একটা বাড়ি থাকবে, মালী থাকবে, সুইপার থাকবে। চা বাগানে ঘোরার জন্যে ল্যান্ড রোভার জিপ থাকবে। বিকেলে আমাদের অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে হাফপ্যান্ট আর টি শার্ট পরে লং টেনিস খেলব। জোছনা রাতে বাংলোর বারান্দায় আমি আর তোমার আপা রকিং চেয়ারে বসে চুকচুক করে শেরী খাব এবং জোছনা দেখব।

শেরীটা কী ? মদ ?

মদ বলবে না। মদ বললে মনে হয় ধেনো মদ। শেরী হলো মিষ্টি মিষ্টি এক ধরনের পানীয় যার অল্প খানিকটা পেটে গেলে জোছনা অনেক সুন্দর মনে হয়। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

শেরী যারা খায় না তাদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না ?

বেঁচে থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। সব বেঁচে থাকা একরকম না।

ঝুমুর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এইসব চাকরি আপনাকে মানাবে না মবিন ভাই। আপনি যা আছেন, তাই আপনাকে মানাচ্ছে। ছোট্ট সুন্দর একটা ঘর। পাটি বিছানো চৌকি ...বাহ্।

মবিন হো-হো করে হেসে ফেলল। ঝুমুর অপ্রস্তুত হয়ে বলল, হাসলেন কেন ?

আছে একটা কারণ। তোমাকে বলা যাবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে বলতে না চাইলে বলবেন না— শুধু একটা সত্যি কথাই বলুন। আমাকে খুশি করার জন্যে মিথ্যা বলতে পারবেন না।

আচ্ছা যাও সত্যি কথাই বলব।

শাড়ি পরায় আমাকে কি খুব সুন্দর লাগছে ?

যে সুন্দর সে যাই পরুক তাকে সুন্দর লাগবে।

আমি কি সুন্দর মবিন ভাই ?

অবশ্যই সুন্দর।

আপা বেশি সুন্দর, না আমি ? সত্যি কথা বলতে হবে কিন্তু।

দু'জনের সৌন্দর্য দু'রকম। কোনো দু'জন রূপবতী মেয়ের ভেতর তুলনা চলে না। একেক জনের সৌন্দর্য একেক রকম। কেউ নদীর মতো, কেউ অরণ্যের মতো, আবার কেউ আকাশের মতো।

আমি কীসের মতো ?

ঝরনার মতো।

আর আপা ?

সে অরণ্যের মতো।

অরণ্য বেশি সুন্দর না ঝরনা?

কারো কারো কাছে অরণ্য সুন্দর, কারো কাছে ঝরনা।

ঝুমুর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনার কাছে অরণ্য সুন্দর তাই না? এই জন্যেই চা বাগানের চাকরি আপনার এত পছন্দ, ঠিক না?

মবিন জবাব দিল না। সে একটু অস্বস্তির সঙ্গে শাড়ি পরা মেয়েটির দিকে তাকাল।

ঝুমুর ঠিক আড়াইটার সময় এফডিসির গেটে এসেছে। তখন থেকেই সে অপেক্ষা করছে। আপার বেরুবার নাম নেই। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খুব অস্বস্তিকর। একগাদা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোনো একটা গাড়ি এফডিসির ভেতরে ঢুকলেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নায়ক-নায়িকা কাউকে এক ঝলক দেখা যায় কিনা।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নায়ক-নায়িকারা আসছে পর্দা ঢাকা গাড়িতে। অনেকের গাড়ির কাচ টিনটেড। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। একগাদা মানুষের ভেতর ঝুমুর একাই মেয়ে। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এসে জিজ্ঞেস করল সে এফডিসির ভেতর ঢুকতে চায় কিনা। ঝুমুর ভীত গলায় বলল, না।

ভিতরে যাইতে চাইলে সমস্যা নাই— নিয়া যাব।

জ্বি না, আমি যাব না।

লোকটা তবু তাকে ছাড়ছে না। তার আশপাশেই আছে। ভদ্রলোকের মতো চেহারা কিন্তু মতলববাজ তা বোঝাই যাচ্ছে— নয়তো ঝুমুরকে এফডিসির ভেতর নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার এত আগ্রহ হবে কেন? সময় কতক্ষণ গেছে ঝুমুর বুঝতে পারছে না। তার সঙ্গে ঘড়ি নেই। লোকটাকে অবশ্যি জিজ্ঞেস করা যায়। তার হাতে বাহারি ঘড়ি।

আচ্ছা আপা কোনো কারণে বাসায় চলে যায় নি তো? যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে তো সে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে। একা একা ফিরতে হবে জয়দেবপুর। এই বদলোক নিশ্চয়ই তার পেছনে পেছনে যাবে।

ঝুমুর।

ঝুমুর চমকে তাকাল। মিতু বের হয়েছে। তার মুখে মেকআপ। ঠোঁট টকটকে লাল। তাড়াতাড়ি আসার জন্যে মেকআপ তোলারও সময় পায় নি।

তুই কি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস?

হুঁ। তোমার শাড়ি পরে চলে এসেছি। রাগ কর নি তো?

না, শুধু শুধু রাগ করব কেন? চল যাই— আয় একটা রিকশা নিয়ে নিই। একা একা আসতে ভয় লাগে নি তো?

উঁহুঁ।

বাহ্। তোর তো সাহস বেড়েছে। কিছুক্ষণ হাঁটতে পারবি ঝুমুর?

হুঁ পারব।

তাহলে আয় একটু হাঁটি— বাংলামোটর পর্যন্ত গেলে টেম্পো পাওয়া যাবে।

তুমি ঢাকা শহরে সব রাস্তাঘাট চেন তাই না?

মোটামুটি চিনি।

আপা, বাসায় চিনি নাই, চা নাই।

মিতু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। সেই নিঃশ্বাস ফেলা দেখে ঝুমুর নিশ্চিত বুঝল আপার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই।

তোর কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ঝুমুর ?

উঁহুঁ।

হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো।

তুমি তো আর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে হাঁটছ না, দায়ে পড়ে হাঁটছ। গাড়ি থাকলে তুমি কি আর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে হাঁটতে ?

তাও ঠিক।

আপা, আজ খুব ভোরবেলা বাড়িওয়ালা এসেছিল দু'টা পেঁপে নিয়ে। তার বাগানের পেঁপে। মা'র সঙ্গে কথা বলল।

বাড়ি ছেড়ে দিতে বলল ?

হুঁ।

বেশি ভাড়ার ভাড়াটের কাছে ভাড়া দেবে ?

তা বলল না। তার নিজের জন্যেই বাড়ি দরকার। সংসার বড় হয়েছে, ছোট ছেলে হুট করে বিয়ে করে ফেলেছে— এইসব কথা।

মা কী বলল ?

মা কিছুই বলে নি, শুধু শুনেছে।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ঝুমুর ?

না।

এই তো এসে পড়েছি।

আমরা কি সত্যি সত্যি টেম্পোতে করে একদল পুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে যাব ? আমার তো ভাবতেই বমি আসছে।

তোকে এক কোণায় বসিয়ে দেব। তোর আর কারো সঙ্গে গা ঘেঁসে যেতে হবে না।

তোমার তো যেতে হবে।

আমার এইসব গা সহা হয়ে গেছে।

আমাদের মতো খারাপ অবস্থায় বোধহয় কেউ নেই, তাই না আপা ?

থাকবে না কেন, আমাদের চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় লোক আছে। আমার পরিচিত এক মেয়ে আছে— ওর নাম টেপী। ছবিতে ছোটখাটো রোল করে। বিরাট সংসার তাকে একা টানতে হয়। ছবির পয়সায় তো হয় না— কিছু জঘন্য কাজ তাকে করতে হয়।

জঘন্য কাজটা কী ?

মিতু জবাব দিল না। টেম্পোস্ট্যান্ড চলে এসেছে। সে বোনের হাত ধরে খালি টেম্পো খুঁজছে। সবার আগে উঠলে ঝুমুরকে কোণার দিকে নিরাপদ জায়গায় বসাতে পারবে।

রফিক দু'বোনকে দেখে হাসল। গতবার তার মুখভর্তি দাড়ি ছিল। এখন নেই। মাথার চুলও ছোট ছোট করে কাটা। তার গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। লম্বা হালকাপাতলা শরীর। জেলের বাইরে সাধারণ কোনো পোশাক পরিয়ে দিলেও তাকে দেখে সবাই বলবে, বাহ্ ছেলেটা সুন্দর তো ! আজ তাকে মোটেই সুন্দর লাগছে না। তার চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। ঠোঁট ফ্যাকাসে। ঠোঁটের দু'কোণায় ঘায়ের মতো হয়েছে। ঝুমুর কাঁপা গলায় বলল, কেমন আছ ভাইয়া ?

রফিক মাথা নাড়ল। কিছু বলল না। তার স্বভাবও শাহেদার মতো। সেও কথা কম বলে।

ভাইয়া, তোমার কি শরীর খারাপ ?

একটু খারাপ।

কী হয়েছে ?

রাতে ঘুম হয় না।

মিতু বলল, তোমাদের জেলে ডাক্তার নেই ?

আছে— ডাক্তার, হাসপাতাল সবই আছে।

ঘুম হচ্ছে না, সেটা তাহলে ডাক্তারকে বল। কতদিন ধরে ঘুম হচ্ছে না ?

রফিক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বলল, মা'র শরীর কেমন ?

ভালো।

আমাকে দেখার জন্যে আসতে চায় না ?

না।

এমনিতে শরীর ভালো ?

হুঁ।

তোরা চলে যা, আর কী, দেখা তো হলো।

মিতু বলল, ভাইয়া তোমার শরীর কিন্তু খুবই খারাপ করেছে। তুমি ডাক্তারকে তোমার অসুখের কথা বল।

বলব।

ভাইয়া। তোমার জন্যে দু'শ টাকা এনেছি। জেল গেটের জমাদার মোসাদ্দেক আলীর কাছে দিয়েছি। তোমার কাছে পৌঁছবে তো ?

অর্ধেক পৌঁছবে।

আর তোমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছি।

সঙ্গে ম্যাচ আছে ?

হ্যাঁ।

দে তাহলে একটা খাই।

রফিক সিগারেট ধরাল। নীরবে টানছে। ঝুমুর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। বলতে পারছে না। সে কোনোমতে বলল, জেলখানায় থাকতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না ভাইয়া ?

রফিক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, না, কষ্ট আর কী? মানুষ খুন করে জেলে আছি— ঠিকই তো আছে। অনেকে কোনো অপরাধ না করে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন জেল খাটছে। কষ্ট তাদের। তোরা চলে যা। মা'কে একবার ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসিস। উনার বয়স হয়েছে, হুট করে কোনোদিন মরে যাবেন, আর দেখা হবে না।

মিতু বলল, পরের বার যখন আসি নিয়ে আসব। ভাইয়া আমরা এখন যাই?

আচ্ছা যা। ঝুমুর ছয় মাসে এত বড় হয়ে গেল কীভাবে?

ঝুমুর লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আমি বেশি বড় হই নি ভাইয়া। শাড়ি পরেছি এই জন্যে বড় লাগছে।

মা যদি আমার কথা জানতে চায় তাহলে বলিস আমি ভালোই আছি। রাতে ঘুম হচ্ছে না এইসব বলার দরকার নেই।

ফেরার পথে তারা মোটামুটি ফাঁকা বাস পেয়ে গেল। ঝুমুর জানালার পাশে বসেছে। একটু পর পর চোখ মুছছে। ভাইয়াকে দেখে ফেরার পথে সব সময় সে এরকম কাঁদে। প্রতিবারই ভাবে সে মা'র মতো হয়ে যাবে— কখনো দেখতে যাবে না। কখনো না।

৮

আজমল তরফদার মোবারক হোসেনের চেক ক্ষীণ সন্দেহ নিয়ে ব্যাংকে জমা দিয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল চেক ক্যাশ হবে না। বড়লোকদের নানান খেয়াল হঠাৎ মাথায় চাপে আবার হঠাৎই মিলিয়ে যায়। হঠাৎ উদয় হওয়া শখ হঠাৎ মেটাই স্বাভাবিক। চেক দেবার পর পরই হয়তো উনার শখ মিটে গেছে। উনি ব্যাংকে টেলিফোন করে বলে দিয়েছেন এত নাম্বারের চেক ক্যাশ করবেন না।

বড় চেকের সঙ্গে চিঠি দিতে হয়। ব্যাংক ম্যানেজার চিঠি না পেলে চেক ক্যাশ করেন না। অনেকে আবার আরেক কাঠি সরস— কারেন্ট অ্যাকাউন্টে চেক না কেটে সেভিংস অ্যাকাউন্টে কাটে। আজমল তরফদার এইসব জটিলতার সঙ্গে পরিচিত। পরিচিত বলেই খানিকটা হলেও সন্দেহ নিয়ে তিনি ছিলেন। তিন দিনের ভেতরে চেক ক্যাশ হবার কথা, তারপরেও তিনি সাত দিন সময় দিলেন। সাত দিন পর ব্যাংকে টেলিফোন করে জানলেন চেক ক্যাশ হয়েছে।

তিনি তার পর পরই মোবারক সাহেবকে টেলিফোন করলেন। ছবি নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার। সামান্য বিয়ের মতো ব্যাপারে এক লাখ কথা খরচ হয়— আর এ হলো ছবি। কুড়িটা বিয়ে একসঙ্গে হবার মতো যন্ত্রণা— এখানে কথা বলতে হবে খুব কম করে হলেও কুড়ি লাখ।

টেলিফোন ধরলেন মোবারক সাহেবের পিএ। তিনি জানালেন, স্যার ব্যস্ত আছেন। কথা বলবেন না।

আজমল তরফদার বললেন, আপনি কি আমার নাম বলেছেন? বলেছেন যে ফিল্ম ডাইরেক্টর আজমল তরফদার। আমি স্যারের জন্যে ছবি বানাচ্ছি।

জ্বি আপনার নাম এবং পরিচয় বলা হয়েছে।

আমি কি পরে টেলিফোন করব?

করতে পারেন, তবে স্যার কথা বলবেন বলে মনে হয় না।

আমার সঙ্গে কথা বলবেন না এরকম মনে হবার কারণ কী?

কারণ স্যার বলেছেন ছবি নিয়ে যা কথা বলার তা বলা হয়েছে, নতুন কিছু বলার নেই।

আমার টেলিফোন নাম্বারটা রাখুন যদি স্যার কথা বলতে চান।

দিন, টেলিফোন নাম্বার দিন।

আজমল তরফদার টেলিফোন নাম্বার দিয়েছেন। কেউ সে নাম্বারে টেলিফোন করে নি। ছবি তৈরি কোনো সহজ ব্যাপার তো না। স্ক্রিপ্ট রাইটারকে দিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখাতে হবে, তাকে টাকা দিতে হবে; আর্টিস্ট ঠিক করতে হবে, তাদের শিডিউল নিতে হবে; এফডিসিতে চার লাখ টাকার মতো জমা দিতে হবে— এই কাজগুলো করবে কে? আজমল তরফদার আবার টেলিফোন করলেন। পিএ ধরল।

আমি ফিল্ম ডাইরেক্টর আজমল তরফদার...

কথা শেষ করার আগেই পিএ বলল, স্যার ব্যস্ত আছেন, কথা বলতে পারবেন না।

আজমল তরফদার বিরক্ত গলায় বললেন, কথা তো আমাকে বলতেই হবে, গল্প লাগবে, চিত্রনাট্য লাগবে, গান লাগবে — এর প্রতিটির জন্যে ...

আমি যতদূর জানি এইসব দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে বলা হয়েছে।

ভাইসাহেব, দায়িত্ব তো পালন করব কিন্তু এর প্রতিটির জন্যে টাকা লাগবে। টাকা দেবে কে?

টাকা স্যারের অফিস দেবে, স্যার তো দেবেন না। আপনি অফিসে চলে আসুন। কোন খাতে কত দরকার বলুন। ভাউচারে সই করে টাকা নিয়ে যান।

কখন আসব?

অফিস টাইমে আসবেন।

অফিস টাইম কখন?

দশটা থেকে চারটা।

এখন বাজছে তিনটা, এখন আসতে পারি?

অবশ্যই পারেন।

আজমল তরফদার তৎক্ষণাৎ অফিসে চলে গেলেন। তার ধারণা ছিল তিনি নিতান্তই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়বেন। এই টেবিল থেকে ঐ টেবিলে যেতে হবে। ম্যানেজার টাইপের একজন শেষ পর্যায়ে শুকনো মুখে বলবে, আপনার কী ডিমান্ড একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান আমরা ইনকোয়ারি করি— সপ্তাহখানেক পরে এসে খোঁজ নেবেন।

বাস্তবে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার দেখলেন। ছবির কাগজপত্র এবং টাকা-পয়সার ব্যাপারে দেখাশোনার জন্যে আলাদা একজন লোক রাখা হয়েছে। তার নাম বিমলচন্দ্র হাওলাদার। বাচ্চা ছেলে কিন্তু মনে হচ্ছে কাজকর্মে খুব সেয়ানা।

আজমল তরফদার ঘরে ঢুকতেই সে তাকে অত্যন্ত যত্ন করে বসাল। কফি খাবেন না চা খাবেন জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বিমল হাসিমুখে বলল, ছবির কাজ কি স্যার শুরু হচ্ছে?

হ্যাঁ হবে। তবে ছবি তো আর স্প্রিংের খেলনা না যে চাবি দিলেই চলবে। গল্প, চিত্রনাট্য— এইগুলো লেখাতে হবে না ?

স্যার অবশ্যই হবে।

এর জন্যে টাকা লাগবে না ?

চেক বই তো স্যার আমার কাছে। আপনি বলবেন, আমি চেক লিখব। আপনি যেদিন বলবেন আপনার সঙ্গে যাব— আর্টিস্টদের বাসায় চেক পৌঁছে দেব। স্যার, এখন বলুন কী খাবেন ? কফি দিতে বলি ?

বলুন।

আমাকে তুমি করে বলুন স্যার।

এফডিসিতে টাকা জমা দিতে হবে। পি টাইপ ছবির জন্যে সাড়ে চার লাখ টাকা জমা দিতে হয়।

ঐ টাকাটা স্যার জমা দেয়া হয়েছে।

বল কী ?

শুটিং শিডিউলও স্যার নেয়া আছে।

আজমল তরফদার বিস্মিত হলেন। বিমলচন্দ্র তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, স্যার, আমাদের অফিস হলো দশটা-চারটা কিন্তু আপনার জন্যে আমি সারাক্ষণই থাকব। যখন বলবেন তখন আপনার বাসায় উপস্থিত হব।

বাসার ঠিকানা জান ?

জানি। ফাইলে আছে।

কফি চলে এসেছে। কফির পেয়ালা হাতে নিতে নিতে আজমল তরফদার বললেন, কিছু মনে করবে না বিমল, ছবির ফান্ড কি আলাদা করা, নাকি মেইন ফান্ড থেকে খরচ হচ্ছে ?

স্যার, ছবির জন্যে আলাদা ফান্ড দেয়া হয়েছে।

মোট কত টাকা আছে সেই ফান্ডে ? বলতে যদি কোনো বাধা না থাকে।

বলতে কোনো বাধা নেই স্যার। মোট দেড় কোটি টাকা আলাদা করা হয়েছে। সেখান থেকে খরচ হয়েছে চার লাখ টাকা। ডাইরেক্টর হিসেবে আপনাকে টাকা দেয়া হয়েছে।

আজমল তরফদার বললেন, ছবির লাইনে তোমার কি কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে ?

বিমল হাসিমুখে বলল, স্যার, ছবির লাইনে কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই কিন্তু আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন। আমি খুব দ্রুত কাজ শিখতে পারি। বড় সাহেব এই কারণে আমাকে খুব পছন্দ করেন। তিনি যে-কোনো নতুন প্রজেক্ট আমাকে দিয়ে শুরু করেন।

ও আচ্ছা।

স্ক্রিপ্ট লেখার টাকাটা আজ স্যার আপনি নিয়ে যান। কত দেব ?

এক লাখ টাকা দাও।

একটা কথা বলব স্যার ?

বল।

পুরো টাকাটা একসঙ্গে দিলে কাজ আদায় হবে না। আমরা যদি শুরুতে দশ হাজার টাকা দেই এবং বলি যেদিন স্ক্রিপ্ট শেষ হবে সেদিনই পুরো টাকা একসঙ্গে দেয়া হবে তাহলে বোধহয় ভালো হবে।

কথাটা মন্দ বল নি।

আরেকটা কাজ স্যার করা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি— স্ক্রিপ্ট যদি খুব ভালো হয় এবং স্যারের যদি খুব পছন্দ হয় তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা বোনাস।

স্ক্রিপ্টের জন্যে কত টাকা ধরা আছে?

স্ক্রিপ্টের জন্যে দশ লাখ টাকা ধরা আছে।

এত টাকা!

স্ক্রিপ্ট তো স্যার একটা হবে না, বেশ কয়েকটা হবে। এর মধ্যে আমরা একটা বেছে নেব।

কে বাছবে?

আপনি বাছবেন। আবার কে? স্যার, আরেক কাপ কফি দেই?

দাও।

আপনার কি কোনো ট্রান্সপোর্ট আছে স্যার?

জ্বি না।

অফিস থেকে আপনি একটি গাড়ি রিকুইজিশন নিয়ে নিন। যতদিন কাজ করবেন ততদিন গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা আপনার সঙ্গে থাকবে।

ড্রাইভারসহ?

অবশ্যই ড্রাইভারসহ। আমি বলি কি স্যার আপনি বড়ো একটা গাড়ি নিন— মাইক্রোবাস বা পিকআপ, এতে আপনার কাজের সুবিধা হবে।

বিমল, তোমার এখানে কি সিগারেট খাওয়া যায়?

জ্বি স্যার, খাওয়া যায়।

আরেকটা কথা— মোবারক সাহেব নামের লোকটির কত টাকা আছে তুমি জান?

আমার কোনো ধারণা নেই স্যার।

কোনো আন্দাজ আছে?

আমি স্যার ছোট মানুষ, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আন্দাজ করি। বড় বিষয় নিয়ে আন্দাজ করে সময় নষ্ট করি না। স্যার, কী ধরনের গাড়ি নেবেন তা তো বললেন না?

দাঁড়াও একটা সিগারেট খেয়ে নিই। বিমল তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

বিমল হাসতে হাসতে বলল, আমাকে আপনার আরো পছন্দ হবে। যত দিন যাবে ততই আপনি আমাকে পছন্দ করবেন।

কেন বল তো?

স্যার, আমি যে-কোনো কাজ খুব সুন্দর করে করতে পারি।

আমার তো মনে হচ্ছে তুমি অহঙ্কারী।

কিছু অহঙ্কার তো স্যার থাকবেই। রাস্তার যে ভিখিরিটি অন্যদের চেয়ে বেশি ভিক্ষা পায় সেও অহঙ্কার করে, আমি কেন করব না ?

স্যার কি আরেক কাপ কফি খাবেন ? আগেরটা খান নি এই জন্যে বলছি।

দাও খাই আরেক কাপ।

আপনার বোধহয় সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সিগারেট আনিয়ে দেব ?

দাও।

আজমল তরফদারের জন্যে নতুন করে কফি আনতে গিয়েছে, কিন্তু তিনি মনের ভুলে ঠাণ্ডা, সরপড়া কফিতেই চুমুক দিয়ে ফেলেন।

বিমল !

জ্বি স্যার ?

তোমাদের এই বড় সাহেবের, আই মিন মোবারক সাহেবের ছবি বানানোর শখের পেছনের কারণটা কী ?

ব্যবসা। ছবির ব্যবসা তো ভালো ব্যবসা। বাংলাদেশে পাঁচ শ'র মতো সিনেমা হল—প্রতি হল থেকে গড়পড়তা দশ হাজার টাকা পেলেও প্রথম রানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উঠে আসে। তাছাড়া আমি যতদূর জানি উনি সিনেমা হলও বানাবেন।

সিনেমা হল বানাবেন ?

জায়গা নেয়া হয়েছে, আর্কিটেক্টকে ডিজাইন করতে বলা হয়েছে।

বল কী !

স্যার, উনি খুব গোছানো মানুষ।

তাই তো দেখছি। আমার ধারণা ছিল ছবি তৈরির ব্যাপারটা হুট করে মাথায় এসেছে।

নতুন কফি এসেছে। পিরিচে বেনসন এন্ড হেজেস-এর প্যাকেট এবং দেশলাই। আজমল তরফদার বললেন, বিমল তুমি সিগারেট খাও ?

জ্বি স্যার, খাই।

নাও সিগারেট নাও।

আপনার সামনে খাব না স্যার।

খাও খাও, ফিল্ম লাইনে সব সমান।

বিমল সিগারেট ধরাল না। আজমল তরফদাব সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে কফিতে চুমুক দিলেন। বিমল বলল, স্যার যারা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে তারা শুধু যে ভাগ্যের জোরে সেটা করে তা কিন্তু না। ভাগ্য থাকে তাদের হাতের মুঠোয়, ভাগ্য নিয়ে তারা খেলা করে। পৃথিবীতে যারা বিলিওনিয়ার আছে তারা কোনো কারণ ছাড়াই বিলিওনিয়ার হয় নি।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ বুঝতে পারছি না।

আমি বলতে চাচ্ছি— বড় সাহেব হুট করে কোনোদিনই কিছু করেন না। তিনি যখন ছবির জগতে এসেছেন তখন ধরে নিতে হবে এই জগৎ তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

আজমল তরফদার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি বিলিওনিয়ার না, সামান্য ফিল্ম মেকার— আইএ পাস বিদ্যা। আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, শুনে রাখ। ছবি বানানোর এই ঝোঁক তোমার বড় সাহেবের হঠাৎ করেই হয়েছে। আমাদের ছবি পাড়ার একটা মেয়ে—আজেবাজে টাইপের মেয়ের জন্যে এটা তার গিফট। তবে ঝানু ব্যবসায়ীরা গিফট থেকেও লাভ করে। যে কারণে এত আটঘাট বেঁধে ছবিতে নামা হচ্ছে। রেশমা নামের বলতে গেলে পথের-কুকুরি সুপারস্টার হিসেবে বের হয়ে আসবে। সে তার পুরস্কার পেয়ে গেল। একই সঙ্গে ছবির বাণিজ্যও হলো।

বিমল চুপ করে আছে। কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। আজমল তরফদার বললেন, বিমল তোমাকে আমার মনে ধরেছে বলে আমি এই কথাগুলো বললাম।

বিমল বলল, স্যার আপনাকেও আমার মনে ধরেছে। ছবি বানানোর ব্যাপারে আমাদের টিমওয়ার্ক খুব কাজে আসবে। আপনি গাড়ি রিকুইজিশন না করেই উঠে যাচ্ছেন। কী গাড়ি নেবেন তা তো বলেন নি। আরেকটু বসুন— কাজটা শেষ করি। আপনি কিন্তু দ্বিতীয়বারের কফিটাও খান নি— ঠাণ্ডা করে ফেলেছেন।

৯

ঝুমুর দরজা খুলে দেখে বাড়িওয়ালা চাচা নিজামউদ্দীন। আজো তাঁর হাতে দুটো পাকা পেঁপে। তার আগের বার দিয়ে যাওয়া পেঁপে দুটোর একটা এখনো পড়ে আছে। ফেলে দেয়াই উচিত। মিষ্টি-টিষ্টি কিছু নেই— তিতকুট স্বাদ। এত বড় একটা পাকা পেঁপে ফেলতে মায়া লাগে বলে ফেলা হয় নি।

নিজামউদ্দীন হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ গো মা?

ঝুমুর বলল, ভালো।

আপা আছে?

জ্বি না।

ফিরবে না?

আজ রাতে ফিরবে না।

ছবির শুটিং কি সারারাত ধরেই চলে?

সব সময় চলে না, মাঝে মাঝে চলে— যখন ছবির কাজ দ্রুত শেষ করতে হয় তখন সারারাত কাজ করতে হয়।

হতে পারে। ছবির লাইনের কাজকারবার তো জানি না। তোমার আপার সঙ্গে দরকার ছিল। যাই হোক মা আছে না?

আছে। উনার শরীর ভালো না— শুয়ে আছে।

আমার কথা একটু গিয়ে বল। দু'টা কথা বলে চলে যাব। নাও পেঁপে দু'টা নিয়ে যাও।

আপনি বসুন।

নিজামউদ্দীন বসতে বসতে বললেন. ঘরে পান থাকলে আমাকে একটু পান দিও তো মা। রাতে ভাত খেয়েই বের হয়েছি— মুখ মিষ্টি হয়ে আছে।

ঘরে পান নেই, মা পান খায় না।

তাহলে থাক। কিছু লাগবে না।

শাহেদা চাদর গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় এলেন। নিজামউদ্দীন মধুর গলায় বললেন, আপার শরীরটা নাকি খারাপ ?

না তেমন কিছু না। সামান্য গা গরম।

সামান্য বলে অবহেলা করবেন না। আপনার আমার যা বয়স— এই বয়সে সামান্য বলে কোনো কিছুকেই অবহেলা করতে নেই। নিজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যাই হোক আপা— মেয়ের সঙ্গে কি কথা বলেছিলেন ? ঐ যে বাড়ির বিষয়ে— বাড়িটা যে আমার লাগে।

এখানো বলি নি।

একটু যে তাড়াতাড়ি করতে হয় আপা। মাস শেষ হতে তো বাকি নেই।

ভাই সাহেব। আমাদের তো সময় দিতে হবে। বললেই তো বাসা পাওয়া যায় না। দু'টা মেয়ে নিয়ে যেখানে সেখানেও তো উঠতে পারি না।

আমি নাচার! সামনের মাসের ১ তারিখ থেকে বাড়ি আমার লাগবেই।

শাহেদা কিছু বললেন না। নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজামউদ্দীন বললেন, মানুষের সমস্যা মানুষ ছাড়া কে দেখবে ? মানুষই দেখবে। আমি তো আপনাদের সমস্যা অনেকদিন দেখলাম। এখন আপনারা আমার সমস্যা একটু দেখুন।

শাহেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমার কোন সমস্যা দেখেছেন ? আমি তো বিনা ভাড়ায় আপনার বাড়িতে থাকি নি। যথানিয়মে ভাড়া দিয়েছি। ভাড়া দিতে কখনো কখনো দেরি হয়েছে কিন্তু দেয়া হয়েছে।

ভাড়ার কথা তো আপা আসছে না। আপনাদের বাড়ি দেয়ার জন্যে কতরকম সমালোচনা সহ্য করেছি। দশজনের দশ রকম কথা।

কী কথা ?

বাদ দেন, সব কথা শুনতে নাই।

না না বলুন কী কথা শুনেছেন ?

এই যে ধরুন মিতু ছবিতে কাজ করে। এইসব কাজের ধরন-ধারণ তো আলাদা। রাত-বিরাত পার করতে হয়। এমনও হয়েছে— দু'দিন-তিনদিন মেয়ের খোঁজ নাই। যে কাজের যে দস্তুর। সাধারণ মানুষ তো এইসব বুঝে না। অকথা-কুকথা বলে।

শাহেদা কাঁপা গলায় বললেন, আমার মেয়েকে নিয়ে কুকথা বলে ? আমার মেয়েকে নিয়ে— যে মেয়ে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে দিনরাত খেটে মরছে সেই মেয়েকে নিয়ে কুকথা বলে ?

এই তো আপা আপনি মনটা খারাপ করলেন। মন খারাপ করার কিছু নাই। দুনিয়ার এই হলো হাল। মানুষের মুখ তো আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। এই পৃথিবীতে সবচে' খারাপ জায়গা হলো পায়খানা। মানুষের মুখ সেই পায়খানার চেয়েও খারাপ। পায়খানার দরজা বন্ধ করা যায়, তালা দেওয়া যায়— মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না।

শাহেদা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব। এক তারিখের আগেই ছাড়ব। আমার মেয়ের কারণে আপনাকে কথা শুনতে হচ্ছে এটা যদি আগে জানাতেন আগেই ছেড়ে দিতাম।

নিজামউদ্দীন খুশি খুশি গলায় বললেন, তুচ্ছ ব্যাপার আপনার কানে তুলব কেন? আমার একটা বিবেচনা আছে না। আমার তো চোখ আছে। আমি দেখছি না— একটা বাচ্চা মেয়ে সংসার টানছে? বড় ভাই মানুষ খুন করে জেলে বসে আছে। লোকে কী বলে না বলে সেটা শুনলে দুনিয়া চলত না। শোনেন একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা না শুনলে বুঝতে পারবেন না।

থাক ঘটনা শুনতে হবে না।

আপা শোনেন। শোনার দরকার আছে— গত জুম্মাবারে জুম্মা পড়ে বাসায় ফিরছি। ইসলাম সাহেব পথে আমাকে ধরলেন। ইসলাম সাহেব আমার ভাড়াটে— অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার। আমাকে বললেন...

আমার শরীরটা ভালো না। কিছু শুনতে ভালো লাগছে না।

থাক তাহলে। মানুষের কানকথা যত কম শোনা যায় ততই ভালো, শুনলেই বিপদ। আপা তাহলে উঠি?

জ্বি আচ্ছা।

তাহলে এই কথা রইল— মাসের এক তারিখ ইনশাল্লাহ্ ঘর খালি করে দিচ্ছেন।

বললাম তো দিব।

আলহামদুলিল্লাহ্। সত্যি কথা বলতে কি আপা একশ একটা পাপ করার পর লোকে ভাড়াটে হয়। টু লেট সাইন ঝুলালে ভাড়াটে পাবেন না। যখন ভাড়াটে তুলতে যাবেন এরা উঠবে না। যেন তাদের বাপের বাড়ি ...

শাহেদা বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। রাতের রান্না কিছু হয় নি। ঝুমুরকে বলেছেন একার জন্যে চারটা চাল ফুটিয়ে ডিম ভেজে খেয়ে নিতে। ঝুমুর এখনো চুলা ধরায় নি। শাহেদা ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, ঝুমুর।

ঝুমুর দরজা ধরে দাঁড়াল।

তোর নিজের জন্যে দু'টা ভাত রেঁধে ফেল, আমি খাব না।

আমিও খাব না।

রাতে না খেয়ে থাকবি?

হুঁ।

কর যা ইচ্ছা। তোর আপা কি বলেছে— রাতে ফিরবে না?

না, সারারাত শুটিং চলবে। তোমার কি মাথায় যন্ত্রণা?

হুঁ।

মাথা টিপে দেব?

কিছু করতে হবে না। তুই ঘরের বাতি নিভিয়ে চলে যা।

মশারি খাটিয়ে দেব? মশা আছে তো।

যেতে বললাম না!

ঝুমুর মা'র ঘর থেকে চলে এলো। তার টেস্ট পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ন'তারিখ থেকে। বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে না। এমনিতে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে কিন্তু বই নিয়ে বসলেই শুধু হাই ওঠে।

ঝুমুর খাটের উপর পা তুলে বসল। বই নিয়ে বসবে কি বসবে না ঠিক করতে পারল না। কারো সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে— গল্প করার মানুষ নেই। কথা শুনতে ভালবাসে এমন কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে সে বেঁচে যায়। সমস্ত পুরুষদেরকে ঝুমুর তিন ভাগে ভাগ করেছে—

এক. এরা কথা শুনতে ভালোবাসে। স্বামী হিসেবে এরা আদর্শ।

দুই. এরা কথা বলতে ভালোবাসে। স্বামী হিসেবে এরা মোটামুটি।

তিন. এরা কথা শুনতেও ভালবাসে না, বলতেও ভালোবাসে না। স্বামী হিসেবে এরা ভয়াবহ।

মবিন ভাই কোন শ্রেণীর? প্রথম শ্রেণীর? পুরোপুরি না। তিনি কথা শোনার চেয়ে বলতে বেশি পছন্দ করেন। স্বামী হিসেবে মবিন ভাইকে আদর্শ বলা যাবে না। উনার বেশি বুদ্ধি। স্বামীদের কম বুদ্ধি থাকা ভালো। বেশি বুদ্ধির মানুষরা নানান ধরনের চালাকি করে।

ঝুমুর।

জ্বি।

এক গ্লাস পানি দিয়ে যা।

ঝুমুর উঠে গিয়ে পানির গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে গেল। বাতি জ্বালাল।

শাহেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, বাতি নেভা। বাতি জ্বেলেছিস কেন?

অন্ধকারে পানি খাবে কীভাবে?

ঝুমুর লক্ষ করল পানির গ্লাস হাতে নিতে গিয়ে শাহেদার হাত কাঁপতে লাগল। ঝুমুর বলল, মা তোমার কি জ্বর বেড়েছে?

জানি না। বাতি নিভিয়ে চলে যা।

তুমি আমার সঙ্গে অকারণে এত রাগারাগি করছ কেন? বাড়িওয়ালা চাচার কথা শুনে তুমি রেগেছ— সেই রাগ ঝাড়ছ আমার উপর। মানুষ কত কথা বলবে— তাই শুনে রেগে যেতে হবে?

কুৎসিত কথা শুনব তার পরেও রাগব না?

কুৎসিত কথা তো আমি সারাক্ষণই শুনি— আমি কি রাগ করি? রাগ করি না। আমি থাকি আমার মতো।

তুই সারাক্ষণ কুৎসিত কথা শুনিস?

হ্যাঁ।

কে বলে?

স্কুলের মেয়েরা বলে। সেদিন জিওগ্রাফি আপা আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন...

কী জিজ্ঞেস করলেন?

হেনতেন নানান কথা, সংসার চলে কী করে? বড় বোন কী করে? এইসব হাবিজাবি।

কই আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলিস নি।

তোমাকে শুধু শুধু বলব কেন ? তাছাড়া আমি একজনের কথা আরেকজনকে বলি না।

ঝুমুর, তুই আমার কাছে এসে বোস।

কেন ?

বসতে বলছি বোস।

তুমি এমনভাবে বলছ যে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে মারবে।

মারব না, কাছে আয়। বোস এখানে— তোর আপার সঙ্গে তুই তো গুটগুট করে অনেক কথা বলিস। সে কি কখনো তোকে গোপন কিছু বলেছে ?

না। আপার স্বভাব হলো চুপচাপ থাকা। বকবক যা করার আমিই করি। আপা শুধু শুনে যায়। আপা পুরুষ মানুষ হলে খুব ভালো স্বামী হত।

শাহেদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ঝুমুর বিরক্ত গলায় বলল, তুমি এভাবে তাকিয়ো না—তোমাকে আমাদের জিওগ্রাফি আপার মতো লাগছে।

শাহেদা চাপা গলায় বললেন, তোর আপার সঙ্গে রাতে যখন ঘুমাস সে কিছুই বলে না ?

ঘুমের মধ্যে কথা বলবে কীভাবে! আপা ক্লান্ত হয়ে থাকে, মরার মতো ঘুমায়। মাঝে মাঝে ...

মাঝে মাঝে কী ?

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে। দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদে।

তুই তখন কী করিস ?

কিছুই করি না। ভান করি যেন মরার মতো ঘুমুচ্ছি।

ও কেন কাঁদে ?

আমি কী করে জানব কেন কাঁদে ? সে যেমন রাতে মাঝে মাঝে কাঁদে, তুমিও কাঁদ। তুমি কেন কাঁদ সেটা যেমন আমি জানি না, আপা কেন কাঁদে সেটাও জানি না— জানতে ইচ্ছাও করে না।

শাহেদা ক্লান্ত গলায় বললেন, সেই ইচ্ছা করবে কেন ? সংসারের কোনো কিছু নিয়ে তো তোকে ভাবতে হচ্ছে না। দিব্যি খাচ্ছিস, ঘুমুচ্ছিস— গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছিস।

তুমি আমার উপর শুধু শুধু রাগ করছ। রাগ করার মতো যখন কিছু করব তখন রাগ কোরো। তোমাকে বেশি দিন অপেক্ষাও করতে হবে না। রাগ করার মতো কিছু খুব শিগগিরই করব।

সেটা কী ?

টেস্ট পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে গোল্লা খাব।

শাহেদা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঝুমুর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, মা তোমাকে একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন— আপা কী করে সংসার চালাচ্ছে সেটা তুমি খুব ভালো করেই জান। তুমি ভান করছ তুমি কিছু জান না। আমিও ভান করছি আমি কিছু জানি না। এটা কি মা ঠিক হচ্ছে ?

শাহেদা তাকিয়ে আছেন। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। ঝুমুর উঠে দাঁড়াল। শান্ত ভঙ্গিতে ঘরের বাতি নিভিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। সেখান থেকে চলে গেল বারান্দায়। বারান্দায় দেয়াল ঘেঁসে মোড়া পাতা। দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝুমুর বসেছে।

বাইরে সুন্দর জোছনা। খানিকটা জোছনা বারান্দায় এসে পড়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জোছনা নেমেছে। বারান্দায় সুন্দর পাতার নকশা। বাতাসে পাতা কাঁপছে— জোছনার নকশাও কাঁপছে। ঝুমুর সেই অপূর্ব নকশার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে।

ভেতর থেকে শাহেদা ডাকলেন, ঝুমুর ঝুমুর।

ঝুমুর জবাব দিল না। সে চোখের পানি মুছে খালি চেয়ারটা নিজের পাশে টেনে আনল। তার কাছে এখন মনে হচ্ছে — খালি চেয়ারে তার স্বামী বসে আছে। সে তাঁর পায়ের কাছাকাছি বসেছে। ঝুমুর বলল, ঘুমাবে না ?

সে বলল, না।

ঘুমাবে না কেন ? রাত তিনটা বাজে।

তুমি বড্ড বিরক্ত কর ঝুমুর। দেখছ না জোছনা দেখছি।

তুমি কি কবি যে তোমাকে হাঁ করে জোছনা দেখতে হবে ?

হ্যাঁ আমি কবি।

কবিরা জোছনা দেখে না। তারা তাদের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কে বলেছে তোমাকে ?

আমি জানি। এখন তুমি আমার দিকে তাকাও।

উফ ! তুমি কী যে বিরক্ত কর !

আমার দিকে না তাকালে আমি আরো বিরক্ত করব।

সে ঝুমুরের দিকে তাকাল। তাকিয়েই হেসে ফেলল। এত সুন্দর করে সে হাসল যে হাসি দেখে ঝুমুরের চোখে পানি এসে গেল।

ভেতর থেকে শাহেদা আবারো ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, ঝুমুর।

ঝুমুর কঠিন স্বরে বলল, ডাকাডাকি করবে না মা, আমি আসব না।

না, ঝুমুর যাবে না। সে বারান্দায় বসে থাকবে— সারারাত বসে থাকবে। পাশে বসে থাকা মানুষটার সঙ্গে কথা বলবে। ওকে একা রেখে সে যেতে পারবে না। পাশে বসা মানুষটা বলল, পানি খাব ঝুমুর।

ঝুমুর বলল, না তুমি পানি খাবে না। পানি খাবার কথা বলে তুমি আমাকে ভেতরে পাঠাতে চাচ্ছ। ভেতরে গেলেই মা'র কাছে যেতে হবে। মা'র কাছে গেলে আমি আর আসতে পারব না। তোমার সঙ্গে গল্প করাও হবে না।

মা'কে তুমি ভালোবাস না ?

না, আমি কাউকেই ভালোবাসি না।

আমার ধারণা তুমি রাগ করে এ রকম কথা বলছ— আসলে তুমি সবাইকে ভালোবাস।

তোমার ধারণা নিয়ে তুমি বসে থাক।

কী ব্যাপার, তুমি দেখি আমার উপরও রাগ করছ।

আমি সবার উপরই রাগ করছি।

কিছুক্ষণের জন্যে কি রাগ বন্ধ করা যায়?

যায়।

বেশ, রাগটা খানিকক্ষণের জন্যে ধামাচাপা দাও। ধামাচাপা দিয়ে আমার হাত ধরে বস। গল্প কর।

কী গল্প?

যে-কোনো গল্প। তোমার বাবার গল্প বল।

বাবার কোনো গল্প নেই। ভালোমানুষ ছিলেন— হঠাৎ একদিন মরে গেলেন। ব্যাস।

তোমাদের ভালোবাসতেন না?

বাসতেন।

খুব ভালোবাসতেন, না মোটামুটি?

ভাইয়াকে খুব ভালোবাসতেন। ভাইয়াকে ডাকতেন ভোম্বল সিং। ছোটবেলায় গোব্দা গোব্দা ছিল তো— ভোম্বল সিং নাম দিয়েছিলেন— বড় হয়েও সেই নাম। ভাইয়া কত রাগ করেছে, কান্নাকাটি করেছে, লাভ হয় নি। বাবা ভোম্বল সিং ডাকবেই।

তোমার ভাইয়া বাবাকে কেমন ভালোবাসত?

ভাইয়া ভালোবাসত টাসত না, বাবাকে এড়িয়ে চলত। বাবার খুব চিড়িয়াখানা দেখার শখ। আমরা ঢাকায় থাকতাম, উনি থাকতেন সিলেটের জঙ্গলে। যতবার ঢাকায় আসতেন ঘ্যান ঘ্যান করতেন— ভোম্বল সিং, চল যাই চিড়িয়াখানা দেখে আসি। ভাইয়া যাবে না। কত সাধাসাধি। শেষটায় মন খারাপ করে আমাকে নিয়ে যেতেন। বাবা ঢাকা এসেছেন অথচ চিড়িয়াখানায় যান নি— এরকম কখনো হয় নি। বাবা কীভাবে মারা গেল সেটা শুনবেন?

বল।

গরমের সময় হঠাৎ ছুটি নিয়ে ঢাকা চলে এলেন। মা'কে বললেন, একা একা থাকতে অসহ্য লাগে। তোমরা এক জায়গায়— আমি অন্য জায়গায়। উপায়ও নেই, জঙ্গলের মধ্যে তোমাদের আমি কোথায় রাখব? বাচ্চাদের পড়াশোনা। মন মানে না বলে ছুটি নিয়ে চলে আসি। ভাবছি টাকা-পয়সা প্রভিডেন্ট ফান্ডে যা আছে তাই নিয়ে ব্যবসা করব। মা বলল, তাই কর। চাকরি যথেষ্ট হয়েছে।

এই বয়সে সিরিয়াস ব্যবসা তো পারব না। টাকা-পয়সা যা আছে তা দিয়ে একটা ফার্মেসি দেব। তার আয়ে সংসার চলবে। কেমন হবে বল তো?

ভালোই হবে।

ছেলেমেয়ের জন্যেই তো সংসার। সেই ছেলেমেয়েই যদি চোখের সামনে না থাকল তাহলে সংসার করে লাভ কী?

ঠিকই বলেছ।

এবার ফিরে গিয়েই চাকরি ছাড়ার ব্যবস্থা করব। যথেষ্ট হয়েছে। আর সহ্য হচ্ছে না।

চাকরি ছেড়ে দেবেন এই সিদ্ধান্ত নেবার পর বাবা খুব খুশি। সবাইকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবেন। মা-ও যাচ্ছেন। শুধু ভাইয়া যাবে না। জন্তু-জানোয়ার তার নাকি ভালো লাগে না। বাবা কত অনুরোধ করলেন। লাভ হলো না। শেষে মন খারাপ করে বাবা আমাদের নিয়েই গেলেন। বাঁদর দেখলেন, ময়ূর দেখলেন, হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পায়ে ব্যথা— বাবা নির্বিকার। বিকেলে চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে এসে বাবা বললেন, শাহেদা আমার শরীরটা যেন কেমন করছে।

মা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কেমন করছে মানে কী ?

বুঝতে পারছি না। কী রকম যেন লাগছে— ভোম্বল সিং কোথায় ?

ও গেছে বন্ধুদের বাসায়। ডাক্তার ডাকতে হবে ?

বুঝতে পারছি না। হঠাৎ প্রেসার বেড়ে গেল কিনা, সব কেমন যেন অন্ধকার লাগছে। ধোঁয়া ধোঁয়া।

এইসব কী বলছ ?

ভোম্বল সিং কোথায় ? ভোম্বল ?

আপা ছুটে গেল ডাক্তার ডাকতে। আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম, মা কাঁদতে লাগল। বাবা শুধু একটু পর পর বলতে লাগল— ভোম্বল কোথায় ? ভোম্বল সিং ?

ঠিক দু'ঘন্টার ভেতর বাবা মারা গেলেন। আমরা হাসপাতালে নেবারও সময় পেলাম না। ভাইয়া বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর। বাসায় তখন অনেক লোকজন। ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, ব্যাপার কী ? কী হয়েছে ?

তারপর ?

তারপর আবার কী ? কিছু না।

তোমার ভাইয়া বাবার মৃত্যু কীভাবে গ্রহণ করল ?

জানি না কীভাবে গ্রহণ করল। সে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ফিরে এল তিনদিন পর। বাবার এর মধ্যে কবর হয়ে গেছে। ঘরে লোকজনের ভিড় নেই। মা'র হার্টের অসুখের মতো হয়েছে— বিছানায় শোয়া। ডাক্তার তাঁকে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। ঘুমের ওষুধ খায়— ঘুমুতে পারে না— ঝিম মেরে পড়ে থাকে।

ভাইয়া ফিরে এসে সংসারে হাল ধরল। তার তখন কত বয়স ? বি এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। চাকরি বাকরির অনেক চেষ্টা করল, পেল না। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়ে ব্যবসার চেষ্টা করল। হেন ব্যবসা নেই যা সে করে নি। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পরিশ্রম। মানুষ যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে আপনি ভাইয়াকে সেই সময় না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এক সময় খবর পেল এফডিসিতে মালামাল সাপ্লাইয়ের ভালো ব্যবসা আছে। ইনভেস্টমেন্ট কম, লাভ বেশি। শুরু করল সেই ব্যবসা।

লাভ হলো ?

মোটামুটি হলো। ভাইয়ার ভাগ্য ছিল খারাপ। খারাপ ভাগ্যের মানুষ তো খুব ভালো কিছু করতে পারে না।

উনি মানুষ খুন করলেন কেন ?

সেটা আমি আপনাকে বলব না। সব কথা বলতে নেই। কিছু কিছু কথা না বলাই ভালো। হয়েছে কী জানেন ? ভাইয়া তো গভীর রাতে ফেরে, সেদিন হঠাৎ দুপুরে এসে

হাজির। আমাকে বলল, খুকি চিড়িয়াখানায় যাবি ? ভাইয়া আমাকে ঝুমুর ডাকত না, ডাকত খুকি। ভাইয়া আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চায় শুনে আমি অবাক হলাম না। কারণ আমি জানতাম বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়া প্রায়ই চিড়িয়াখানায় যায়। বানরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বললাম, হ্যাঁ ভাইয়া যাব। আমি কাপড় পরে তৈরি হয়েছি। ভাইয়া বলল— না থাক। তখন আমরা মগবাজারের একটা বাসায় থাকতাম। ছোট্ট একতলা বাসার একদিকে আমরা অন্যদিকে হাফিজ সাহেব বলে এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে। সেদিন ভাইয়া সেই যে দুপুরে এসেছে আর বেরুচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলায় মা বললেন— কী-রে তোর কি শরীরটা খারাপ ?

ভাইয়া বলল, হুঁ।

জ্বর-টর নাকি রে দেখি কাছে আয় তো।

ভাইয়া বলল, দেখতে হবে না। জ্বর টর কিছু হয় নি। রাতে ভাইয়া ভাত খেল না। ন' টার সময় ঘুমিয়ে পড়ল। সে বাইরের ঘরে ঘুমাল। আমি গিয়ে দেখি মশা ভনভন করছে—এর মধ্যেই ভাইয়া ঘুমাচ্ছে। আমি মশারি খাটিয়ে দিলাম। ভাইয়া রাত বারটার দিকে জেগে উঠল। নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেতলি বসাল। খটখট শব্দ শুনে মা জেগেছে। রান্নাঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বলল, তুই এখানে কী করছিস ? ভাইয়া হাসিমুখে বলল, চা বানাচ্ছি। তুমি খাবে মা ? মা বলল, না। ভাইয়া বলল, খাও না। দেখ আমি কী সুন্দর চা বানাই ! ভাইয়া চা বানাল। মা'কে নিয়ে দু'জনে মিলে চা খেল। তার কিছুক্ষণ পর দরজার কলিংবেল বাজতে লাগল। মা বললেন, কে ? পাশের ঘরের হাফিজ সাহেব বললেন, খালাম্মা দরজা খুলুন। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।

মা হতভম্ব হয়ে দরজা খুললেন। আমি তখন জেগেছি, আপা জেগেছে। আমরা বুঝতেই পারছি না কী হচ্ছে। আমরা দেখলাম, অনেকগুলো পুলিশ বাড়িতে ঢুকল। ওরা বিছানা, বালিশ, খাট, মিটসেফ ওলটপালট করতে লাগল। আপা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ভাইয়া কী ব্যাপার ? ভাইয়া জবাব দিল না। একজন পুলিশ অফিসার বললেন, ভয়ের কিছু নেই। রুটিন চেক। আমরা এক্ষুণি চলে যাব।

তারা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে গেল, তবে যাবার সময় ভাইয়াকে নিয়ে গেল। আপা বললেন, ভাইয়াকে কোথায় নিচ্ছেন ? পুলিশ অফিসার বললেন, থানায় দু'একটা প্রশ্ন ট্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেব। আজ রাতেই ছেড়ে দেব। ভয়ের কিচ্ছু নেই।

পুলিশ ভাইয়াকে ছাড়ল না। এই যে ভাইয়া গেল আর বাসায় ফিরল না। পরদিন ভোরবেলা আপা আমাকে নিয়ে থানায় গেছে। ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলো হাজতে। ভাইয়া আপার দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। বাসায় চলে যা। আমি একটা খুন করেছি। পুলিশের কাছে স্বীকার করেছি।

ঝুমুর।

ঝুমুর পেছন ফিরল। শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে বিস্ময় ও ভয়। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

ঝুমুর বলল, কারো সঙ্গে না। নিজের মনে কথা বলছি।

আয় ঘুমুতে আয়।

ঝুমুর বলল, আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকব।

দুপুররাতে একা একা বারান্দায় বসে থাকবি এটা কেমন কথা ?

আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে মা।

আয় লক্ষ্মীসোনা, ঘরে আয়।

শাহেদা বারান্দায় এসে ঝুমুরের হাত ধরলেন। ঝুমুর আপত্তি করল না, উঠে এলো। শাহেদা বললেন, রাতে তো কিছু খাস নি। খিদে হয়েছে, কিছু খাবি ? একটা পরোটা ভেজে দেব ?

দাও, তোমার শরীরটা এখন ভালো লাগছে মা ?

শাহেদা জবাব দিলেন না। রান্নাঘরে ঢুকলেন। পরোটা বানানো গেল না। ময়দা শেষ হয়ে গেছে তিনি ভুলে গেছেন। ময়দার কথা মিতুকে বলা হয়েছে— ভোরবেলা সে নিয়ে আসবে।

শাহেদা বললেন, চারটা চাল ফুটিয়ে দিই ?

ঝুমুর বলল, কোনো কিছু ফুটিয়ে দিতে হবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এক গ্লাস শরবত খেতে পারি। ঘরে কি চিনি আছে মা ?

শাহেদা দেখলেন চিনির কৌটাও খালি। ঝুমুর বলল, একেকটা দিন খুব অদ্ভুত হয়। কিছু পাওয়া যায় না। আবার কোনো কোনো দিন আছে— সব পাওয়া যায়। সেদিন তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

শাহেদা শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। রান্নাঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমুর। মেয়েটাকে আজ অনেক বড় বড় লাগছে। ঝুমুর বলল, মা শোন, আপার একটা কথা তোমাকে বলি— আপাকে নিয়ে মাঝে মাঝে তুমি দুশ্চিন্তা কর। আজেবাজে কথা ভাব। এইসব ভাবার কোনো কারণ নেই। আপা মরে যাবে তবুও অন্যায় কিছু করবে না।

শাহেদার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঝুমুর বলল, সিনেমার কাজ, শুটিঙের কাজ—রাত দিন বাইরে থাকতে হয় বলে লোকজন আজেবাজে কথা বলে। ওদের আজেবাজে কথা বলার কোনো কারণ নেই।

শাহেদা কাঁপা গলায় বললেন, সেইটাই তো আমি বলি মা। আমার নিজের মেয়ে আমি তাকে জানি না ?

লোকজনের আজেবাজে কথা বলার কোনো অধিকারও নেই। আপা কি সামান্য চাকরির জন্যে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যায় নি ? কেউ কি দিয়েছে তাকে কিছু জোগাড় করে ? আজ কেন বড় বড় কথা বলে ?

শাহেদার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখ মুছলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন—তুই যে বললি ও রাতে ঘুম থেকে উঠে কাঁদে। কাঁদে কেন ?

মনের দুঃখে কাঁদে। আমার মনে হয় বেশিরভাগ সময় মবিন ভাইয়ের জন্যে কাঁদে। প্রায়ই তো মবিন ভাইয়ের টিউশ্যানি চলে যায়। বেচারার প্রায় না খেয়ে থাকার মতো জোগাড় হয়। একবার কী হয়েছে জান মা ? প্রায় দশদিন মবিন ভাই ভাত খায় নি। যে হোটেলে বাকিতে খেত তারা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ...

থাক এসব শুনতে চাচ্ছি না।

শোন না মা— মবিন ভাই বাধ্য হয়ে চিড়া আর গুড় কিনে আনল। চিড়া পানিতে

ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খায়। আপা জানতে পেরে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে এসে খুব কাঁদছিল।

শাহেদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ঝুমুর এসে মায়ের পাশে বসল। কোমল গলায় বলল, তুমি মবিন ভাইয়ের সঙ্গে আপার বিয়ে দাও মা। ওরা কয়েকটা দিন আনন্দ করুক।

ও বউকে খাওয়াবে কী?

চিড়া আর গুড় খাওয়াবে। তাতে কী মা? ওরা দু'জন যখন বারান্দায় বসে গল্প করবে তখন দেখো তোমার কত ভালো লাগবে।

শাহেদা দেখলেন ঝুমুরের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

১০

আজমল তরফদারের ছবি 'প্রেম দেওয়ানা'র ডাবিং শুরু হয়েছে। ডাবিং স্টুডিওতে জমজমাট অবস্থা। ন'টা থেকে শিফট শুরু হলেও স্টার সুপারস্টাররা দশটা-এগারটার দিকে আসেন। যিনি যত বড়ো স্টার তিনি আসবেন তত দেরিতে। গ্যালাক্সি স্টার ফরহাদের সেই হিসেবে বারটার দিকে আসার কথা। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় তিনি সকাল ন'টার সময় চলে এসেছেন। তাঁর মুডও আজ খুব ভালো। গাড়ি থেকে নেমেই চেঁচিয়ে বললেন, আজমল ভাই জম্পেশ করে চা বানান দেখি। আপনার ব্যাটেলিয়ান রেডি?

হ্যাঁ রেডি।

দেখবেন ইনশাল্লাহ্ চল্লিশ লুপ এক শিফটে নামিয়ে দেব। ম্যাডাম এসেছেন?

এখনো আসেন নি।

ডায়ালগ দিতে বলুন। বসে বসে মুখস্থ করতে থাকি। চা তো এখনো দিল না— ফ্লোর বয়...

ফরহাদ সাহেব ডাবিং রুমে ঢুকে গেলেন।

আজমল তরফদারের সঙ্গে বিমল দাঁড়িয়ে আছে। সে এসেছে বিশেষ কারণে, রেশমাকে বড় সাহেবের অফিসে নিয়ে যেতে হবে। বড় সাহেব খবর পাঠিয়েছেন। রেশমা'র আজ ডাবিং আছে। সে ন'টার আগেই এসে পড়ে। আজই শুধু দেরি হচ্ছে।

বিমল ফরহাদকে দেখিয়ে নিচু গলায় বলল, উনি কি আপনার ছবির হিরো?

হুঁ। যা তা হিরো না গ্যালাক্সি হিট হিরো।

আমাদের ছবিতে কি উনি থাকছেন?

হুঁ। না থাকলেই ভালো হত।

কেন?

গাধা। অভিনয় জানে না।

তাহলে তাকে নিচ্ছেন কেন?

রিকশাওয়ালারা তাকে দেখতে চায়।

তাকে কি নতুন ছবির কথা বলা হয়েছে?

এখনো বলা হয় নি, তবে সে জেনে গেছে যে আমরা বড় বাজেটে নামছি। ছবি পাড়ায় খবর হয়ে গেছে। আজ যে ন'টার সময় উপস্থিত— এই কারণেই উপস্থিত।

আপনাকে খাতির করা শুরু করেছে ?

হুঁ।

লুপ লাগানো হয়েছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য বড় পর্দায় দেখানো হচ্ছে। ছবি দেখে দেখে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ডায়ালগ বলবেন, ম্যাগনেটিক ফিতায় সেই শব্দ ধরা হবে। পরে একসঙ্গে জোড়া লাগানো হবে।

বিমল বলল, ব্যাপারটা তো খুব ইন্টারেস্টিং।

কাগজে-কলমে খুব ইন্টারেস্টিং তবে কাজ শুরু হলে দেখবে কত ঝামেলা। ঠোঁট মেলানো যায় না। ডায়ালগ যায় একদিকে ঠোঁট নড়ে অন্যদিকে।

কাজ শুরু হবে কখন ?

ম্যাডাম এলেই শুরু হবে।

ফরহাদ সাহেব চায়ের কাপ এবং হাতে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আজমল তরফদারের কাছে চলে এলেন।

কাজ শুরু হবে কখন আজমল ভাই ?

এই তো অল্প কিছুক্ষণ।

আপনার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করি ? নতুন বই নাকি করছেন ? বিগ বাজেট মুভি।

হ্যাঁ।

স্টোরি লেখা হয়েছে ?

হচ্ছে।

নায়ক-নায়িকা কয় পেয়ার ? ওয়ান ওর টু ?

এখনো কিছুই ঠিক হয় নি।

আর্টিস্টের ব্যাপারে কিছু ভাবছেন ?

এখনো ভাবি নি।

আমার অবশ্য দম ফেলার সময় নেই। হেভি বুকিং। তারপরেও আপনার ব্যাপার অন্য।

থ্যাংক য়্যু।

আপনার 'প্রেম দেওয়ানা'ও হিট করবে। ডায়ালগ মারাত্মক। হিট ডায়ালগ। ডায়ালগের জন্যে উঠে যাবে...

কথাবার্তার এই পর্যায়ে ডাবিং স্টুডিওর দরজা ফাঁক করে রেশমা তাকাল। আজমল তরফদার ফরহাদ সাহেবের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, রেশমা এস এস।

রেশমা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। আজমল তরফদার এরকম অন্তরিক ভঙ্গিতে ডাকবেন ভাবাই যায় না। সে দেরি করে এসেছে বলেই কি রসিকতা করছেন ? এখনই কুৎসিত গালি শুরু হবে ? হলভর্তি মানুষের সামনে গালি শুনতে এত খারাপ লাগে। তার হাত-পা জমে যাবার মতো হলো।

দাঁড়িয়ে আছ কেন, আস ? পরিচয় করিয়ে দিই— এ হলো বিমল। বিমলচন্দ্র হাওলাদার। বিমল এর নাম রেশমা।

বিমল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিনীতভাবে সে সালাম দিল। ফরহাদ পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

রেশমা ইতস্তত করে বলল, বাসের চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিল। ঠিক করল। এই জন্যে দেরি হয়েছে।

আজমল তরফদার বললেন, নো প্রবলেম। এগারটার আগে ডাবিং শুরু হবে না। তোমার বোধহয় দু'টা লুপ। এক সময় করে ফেললেই হবে। বিমল তোমাকে নিতে এসেছে ওর সঙ্গে একটু যাও।

কোথায় যেতে হবে, কী ব্যাপার এইসব কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রেশমা'র মনে হলো সে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

আজমল তরফদার বললেন, রেশমা তুমি কি চা খেয়ে যেতে চাও ? চা হয়ে গেছে। এক কাপ চা খেয়ে যাও।

ডাইরেক্টর সাহেবের জন্যে আলাদা সুন্দর কাপে চা আসে। আজমল তরফদার নিজেই তাঁর চায়ের কাপ এগিয়ে ধরলেন।

রেশমা ক্ষীণ গলায় বলল, চা খাব না।

আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি ফিরে এসে চা খেয়ো, এখন বরং বিমলের সঙ্গে চলে যাও।

ডাবিং স্টুডিওর সামনে কালো রঙের বিরাট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির জানালার কাচে পর্দা দেয়া। বিমল এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আশপাশের লোকজন কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। তারচেয়েও বড় কথা আজমল তরফদার তাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন।

মোবারক সাহেবের চোখে রিডিং গ্লাস। অর্ধচন্দ্রাকৃতি চশমা। এই চশমার অসুবিধা এই যে, যার দিকে তাকানো হয় সে চোখ দেখতে পায়। তিনি কাউকে তার চোখ দেখাতে চান না। তাঁর ধারণা শরীরের যেমন পোশাকের প্রয়োজন, চোখের তেমন পোশাক দরকার। নগ্ন চোখ নগ্ন শরীরের মতো।

মোবারক সাহেব বললেন, বোস, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

রেশমা বসল। জড়োসড়ো হয়ে বসল। মেয়েটিকে তিনি আগে একবারই দেখেছেন। সে দেখা রাতের দেখা। দিনে কখনো দেখেন নি। এখন ঝকঝকে দিন। ঘড়িতে বাজছে বারটা একুশ। রাতের দেখা মানুষ দিনের আলোয় সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যায়। এই মেয়েটার ক্ষেত্রে সে রকম ঘটে কিনা তাঁর জানার ইচ্ছা।

মেয়েটি সাজগোজ করে নি। ঐ রাতে বেশ সেজেছিল। কপালে টিপ ছিল। ঠোঁটে লিপস্টিক ছিল। আজ কপাল শূন্য, ঠোঁটেও লিপস্টিক নেই। মেয়েটি কোলের উপর হাত রেখে বসেছে বলে তিনি তার হাত দেখতে পাচ্ছেন না। ঐ রাতে মেয়েটির হাতে সবুজ রঙের কাচের চুড়ি ছিল। আজ বোধ হয় চুড়ি পরে নি। চুড়ি পরলে চুড়ির টুংটাং আওয়াজ কানে আসত।

তোমার নাম টেপী তাই তো ?

রেশমা জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল। মোবারক সাহেব চোখ থেকে রিডিং গ্লাস পুরোপুরি খুলে ফেললেন। তাঁর যে শুধু কাছে দেখার সমস্যা তাই না— মায়োপিয়া

আছে বলে দূরের জিনিসও ভালো দেখতে পান না। মেয়েটিকে ভালোমতো দেখার জন্যে অন্য একটা চশমা দরকার। তিনি ড্রয়ার খুললেন। চশমা বের করে পরলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

ঐ দিন তুমি মিথ্যা করে কেন বললে তোমার নাম টেপী, বোনের নাম হ্যাপী? মিথ্যা বলার প্রয়োজন ছিল কি?

ছিল।

আসল নাম, পরিচয় কাউকে জানতে দিতে চাও না, এই তো ব্যাপার?

জ্বি।

যে তোমার সত্যিকার পরিচয় বের করতে চায় তার জন্যে তো খুব সমস্যা হবার কথা না?

কেউ সত্যিকার পরিচয় বের করতে চায় না।

তুমি চা বা কফি খাবে?

জ্বি না।

তুমি সিনেমার লাইনে, সেখান থেকে নতুন পেশায় কীভাবে চলে এলে?

আমি বলতে চাচ্ছি না।

বলতে চাচ্ছ না কেন?

বলতে ইচ্ছা করছে না। গল্প করার মতো মজার কোনো বিষয় এটা না।

আমি তো গল্প করছি না। জানতে চাচ্ছি।

জানতে চাচ্ছেন কেন?

কৌতূহল বলতে পার। তোমার এক ভাই তো জেলে আছে। ও জেলে গেল কেন?

ও জেলে আছে সেটা যখন জানেন তখন জেলে কেন সেটাও জানা আপনার জন্যে কোনো সমস্যা না।

তুমি বলতে চাচ্ছ না।

জ্বি না।

মোবারক সাহেব ইন্টারকমে বোতাম টিপে দু'গ্লাস পানি দিয়ে যেতে বললেন। পানি সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। তিনি নিজে এক গ্লাস পানি নিলেন। রেশমার দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন।

নাও পানি খাও।

আমার তৃষ্ণা পায় নি। আমি পানি খাব না।

ঐ রাতে তুমি তো বেশ হাসিখুশি ছিলে— গল্প করছিলে, আজ এমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন?

ঐ রাতে আপনি আমাকে কী জন্যে ডেকে এনেছিলেন আমি জানতাম। আজ কী জন্যে এনেছেন আমি জানি না।

তোমাকে কী জন্যে আনা হয়েছে তুমি জান না?

জ্বি না।

অনুমান করতে পারছ? না তাও পারছ না?

পারছি না।

ঐ দিন তোমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। টাকা ফেলে চলে গেলে কেন?

রাগ হয়েছিল। ঐ জন্যে ফেলে চলে গেছি।

তুমি যে জীবনযাপন করছ সে জীবনে কি টাকার উপর রাগ করা মানায়?

না মানায় না। আপনার টাকা আমি নিয়েছি। সংসারে খরচ করেছি।

তুমি তোমার একটা চুলের ফিতাও ফেলে রেখে গিয়েছিলে।

রেশমা চোখ তুলে তাকাল। লোকটির কাণ্ডকারখানা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। এই লোক তার কাছে কী চায়। খারাপ মেয়েদের নিয়ে নানান ধরনের মজা করতে লোকজন ভালবাসে। এও কি মজা করছে? লোকটা জানে না যে ইচ্ছে করলেই রেশমাও লোকটাকে নিয়ে মজা করতে পারে। না রেশমা পারে না। টেপী পারে। টেপী নানান ধরনের মজা করে। কিন্তু এখন সে টেপী না, সে এখন রেশমা। রেশমা মোটামুটিভাবে ভদ্র মেয়ে। আর মিতু কেমন মেয়ে? এই ভদ্রলোক জানেন না মিতু কেমন মেয়ে। শুধু মবিন ভাই জানেন।

এই লোকটার সামনে সে কি কিছুক্ষণের জন্যে মিতু হবে? লোকটা তাকে চমকে দেয়ার চেষ্টা করছে। নানান ধরনের চশমা পরে, নানানভাবে তাকাচ্ছে। চুলের ফিতার প্রসঙ্গ তুলেছে— তার মানে চুলের ফিতা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রেশমা সহজ হয়ে বসল। মিষ্টি করে হাসল, একটু ঝুঁকে এসে বলল, আপনি কি আমার চুলের ফিতা নিয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ।

চুলের ফিতা ফেরত দেবার দরকার ছিল না। চুলের ফিতা আমি ইচ্ছা করে রেখে এসেছিলাম।

কেন?

উপহার। একটা খারাপ মেয়েরও তো উপহার দেবার ইচ্ছা হতে পারে। পারে না?

হুঁ পারে। কাজেই তুমি বলতে চাচ্ছ যে আমি ঐ ফিতা রেখে দিতে পারি?

হ্যাঁ। পারেন।

তুমি কথা তো খুব গুছিয়ে বলছ।

নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশি। নানান রকমের কথা বলা শিখি।

আমার সঙ্গে তো বেশ কিছু সময় ছিলে। আমার কাছ থেকে কী শিখেছ?

আপনার কাছ থেকে শিখেছি মানুষকে কী করে ভয় দেখাতে হয়। আপনার কর্মচারীরা নিশ্চয়ই আপনাকে অসম্ভব ভয় পায়।

হ্যাঁ পায়।

আপনার স্ত্রীও খুব ভয় পান তাই না?

মনে হয় পায়। সে রাতে তুমি ভয় পেয়েছিলে, এখন তো মনে হয় পাচ্ছ না।

না এখন পাচ্ছি না।

পাচ্ছ না কেন?

আমার যা মনে আসছে সেটা যদি বলে ফেলি আপনি রাগ করবেন না তো?

বল, রাগ করব না।

আপনাকে ভয় পাওয়ার মতো প্রচুর লোকজন আপনি চারদিকে জড়ো করে রেখেছেন, কিন্তু আপনার কথা বলার লোক নেই। যে জন্যে আপনার লোকজন আমার মতো মেয়েদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসে।

আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ থেকে তোমার এই ধারণা হয়েছে ?

জ্বি। অনেকের সঙ্গে মিশেছি তো। মানুষের অনেক কিছু চট করে ধরে ফেলতে পারি।

তোমার জীবনের পরিকল্পনা কী ?

কোনো পরিকল্পনা নেই।

সে কী ! কোনো পরিকল্পনা নেই ?

না।

বিয়ে করে সংসারী হবার পরিকল্পনাও নেই ?

রেশমা চুপ করে রইল। মোবারক সাহেব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত আছ। তোমার কি ইচ্ছে করে না কোনো একটা ছবির নায়িকা হবে ? সুপারস্টার হবে ? ইচ্ছে করে ?

রেশমার খুব ইচ্ছা করে। মিতুর করে না।

বুঝতে পারছি না।

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন মিতু। আমার ছবির নাম রেশমা। আর রাতে যখন আপনাদের মতো মানুষদের কাছে যাই তখন আমি টেপী।

তোমাকে আমি কোন নামে ডাকব ?

টেপী নামে ডাকবেন। টেপী নামটা খুব খারাপ লাগলে রেশমা ডাকবেন।

মিতু ডাকা যাবে না ?

না আপনি টেপীকে চেনেন। মিতুকে চেনেন না।

চা খাবে ?

না।

খাও, চা খাও।

মোবারক সাহেব ইন্টারকমে চা দিতে বললেন। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন। বেশিক্ষণ তিনি চোখে চশমা রাখতে পারেন না। মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হয়। তিনি চোখের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন।

ডাক্তারের ধারণা— চশমার জন্যে চোখে যন্ত্রণা হবার কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে এক ফাঁকে কথা বলতে হবে।

মোবারক সাহেব চশমা ড্রয়ারে রাখলেন। সেখান থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। এটি দিনের প্রথম সিগারেট। প্রথম সিগারেট খেতে ভালো লাগে না। দ্বিতীয়টি ভালো লাগে। তিনি ঠিক করে ফেললেন, মেয়েটি থাকতে থাকতেই দ্বিতীয় সিগারেট ধরাবেন। কফির সঙ্গে সিগারেট— ভালো লাগবে। মোবারক সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাকে চমৎকার কোনো গিফট আমি দিতে চাই। কী গিফট পেলে তুমি খুশি হবে বল ?

যা চাই তাই দেবেন?

দিয়ে ফেলতেও পারি। পরীক্ষা করে দেখ।

রেশমা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি কারো কাছ থেকে গিফট নেই না।

তুমি তো ঠিক কথা বললে না টেপী। তুমিও গিফট নাও। মবিন বলে এক ভদ্রলোক তোমাকে গিফট দেন না?

রেশমা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি সব খবর জানেন?

হ্যাঁ।

কেন?

পরে এক সময় বলা যাবে।

আজ বলবেন না?

না। একটা বেজে গেছে। একটার সময় আমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

স্যার আমি যাই।

আচ্ছা যাও। কোথায় যাবে নিচে গিয়ে বল গাড়ি তোমাকে পৌছে দেবে।

গাড়ি লাগবে না।

মোবারক সাহেব সাধারণত আধকাপের বেশি কফি খান না। আজ পুরোকাপ শেষ করলেন। কয়েকটা জরুরি টেলিফোন কল সারলেন। তবে কোথাও খুব মন বসাতে পারলেন না। ইনকামট্যাক্স লইয়ারকে এগারটায় আসতে বলেছিলেন। সে এসেছে, নিচে অপেক্ষা করছে— তার সঙ্গে বসতে ইচ্ছা করছে না। তাকে চলে যেতে বলতেও মন সায় দিচ্ছে না। অস্থির ভাবটা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাব— ইনকামট্যাক্স লইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করবে। সে চলে গেলে হয় কী করে। অপেক্ষা করুক। টেবিলের উপর সেক্রেটারির হাতে লেখা নোট পড়ে আছে। তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে নোটগুলো লেখা। দু'টা পয়েন্টে লাল স্টার মার্ক দেয়া।

১. শিক্ষামন্ত্রী আফসারউদ্দিন খাঁ দু'বার টেলিফোন করেছেন। তিনি দু'টা পর্যন্ত দপ্তরে আছেন।

২. গুলশান থেকে আম্মা টেলিফোন করেছেন। খুব জরুরি খবর আছে।

৩. চেম্বার অব কমার্সের মিটিং সোনারগাঁ হোটেলের বলরুম— সন্ধ্যা ৭টায়।

৪. বিথোভেনের স্মরণে জার্মান দূতাবাসে ককটেল পার্টি— সন্ধ্যা ৭টায়।

এক এবং তিন নম্বর আইটেমে লাল স্টার মার্ক দেয়া।

দু' নম্বর আইটেম মোটেই জরুরি নয় তারপরেও মোবারক সাহেব পিএকে বললেন তার স্ত্রীকে লাইনে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাইন পাওয়া গেল।

হ্যালো রেহানা! জরুরি কী খবর যেন দেবে বলেছিলে।

তোমাকে তো টেলিফোন করে করে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। কখনোই লাইন দেয় না। তোমার সেক্রেটারির দল কি ইচ্ছা করে আমাকে এভয়েড করে?

ওদের দোষ নেই— মিটিঙে ছিলাম। জরুরি খবরটা কি বল ?

তুমি যে স্বপ্নতথ্যের দু'টা বই এনেছ, দু'টা বই সম্পূর্ণ দু'রকম। একটাতে লেখা হাতি স্বপ্নে দেখলে ধন লাভ হয়। আরেকটায় লেখা হাতি স্বপ্ন দেখা বিপদের পূর্বাভাস। সম্পূর্ণ উল্টা না ?

তা তো বটেই।

এখন আমি কোনটা বিশ্বাস করব ?

যেটা ভালো সেটা বিশ্বাস করাই তো নিরাপদ। তুমি কি হাতি স্বপ্নে দেখেছ ?

না।

তাহলে হাতি দেখা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ?

একটা বইয়ের সঙ্গে অন্যটা মিলিয়ে দেখছি— কিছু করার নেই তো ... যতই ঘাঁটছি ততই অবাক হচ্ছি। অবশ্যি কিছু কিছু জায়গায় দু'টা বইয়ের একই অর্থ, যেমন ধর— পানি স্বপ্নে দেখলে অসুখ বিসুখ হবে।

ও আচ্ছা।

আমি করছি কি যে সব স্বপ্নের অর্থ দু'টা বইয়ে একই লেখা সেগুলো সবুজ কালি দিয়ে দাগাচ্ছি।

দাগাদাগির কাজ তো সাধারণত লাল কালি দিয়ে করা হয়, তুমি সবুজ কালি ব্যবহার করছ কেন ?

আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও এক সেকেন্ড খুব একটা জরুরি কথা, পরে বলতে ভুলে যাব— সিমির যমজ মেয়ে হয়েছে। আমি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম— খুব সুন্দর হয়েছে।

সিমিকে মোবারক সাহেব চিনতে পারলেন না, তারপরেও যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, সিমি ভালো আছে তো ?

হ্যাঁ ভালো। যমজ মেয়ে দেখে একটু মন খারাপ করেছে।

মন খারাপের কী আছে ?

আগে আরো দু'টা মেয়ে আছে এই জন্যে একটু মন খারাপ।

ও আচ্ছা, আগেও তো দু'টা মেয়ে আছে— ভুলে গিয়েছিলাম। রেহানা শোন, একটু পরে তোমাকে আবার টেলিফোন করব। ইনকামট্যাক্সের এক উকিল এসেছে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

মোবারক সাহেব রেহানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রেখে লাল কালি দিয়ে তাঁর সামনে রাখা নোটের দু'নম্বর আইটেম কেটে দিলেন। পিএকে বললেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে।

শিক্ষামন্ত্রী আফসারউদ্দিন খাঁ অত্যন্ত আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, মোবারক সাহেব নাকি ? আরে ভাই আপনাকে তো পাওয়াই যায় না।

খুবই ব্যস্ততার ভেতর আছি স্যার।

ব্যস্ত মানুষ ব্যস্ততা থাকবে না ? তাই বলে একেবারে যোগাযোগ বাদ দিবেন এটা কেমন কথা!

এই তো স্যার যোগাযোগ করলাম— এখন বলুন কী করতে পারি।

খেদমত আপনি কী করবেন ? খেদমত করব আমরা। আমরা হলাম জনগণের খেদমতগার।

গরিবকে স্মরণ করেছেন কী জন্যে স্যার বলুন।

আমার মেজ মেয়ের বিয়ে।

বাহ্ বাহ্ খুব ভালো সংবাদ।

ভালো সংবাদ মন্দ সংবাদ জানি না। মেয়ে যখন আছে পার তো করতে হবে— আপনার ছেলেপুলে নাই— ঝাড়া হাত-পা মানুষ, ছেলেপুলের বিয়েশাদির যন্ত্রণা আপনাকে পোহাতে হচ্ছে না। You are a lucky man.

মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে যদি আপনার কোনো কাজে লাগি বলতে লজ্জা করবেন না।

আরে লজ্জা করব কেন ? আপনি তো বাইরের কেউ না। আপনার ভাবি কাল রাতেও বলছে— মোবারক সাহেবকে কিন্তু টেলিফোনে দাওয়াত দেবে না। নিজে গিয়ে দাওয়াত দেবে।

আপনি কিন্তু স্যার ভাবির কথা শোনেন নি, টেলিফোনে দাওয়াত সেরেছেন।

আরে ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন ! বিয়ের খবরটা ইন অ্যাডভান্স আপনাকে দিলাম— দাওয়াতের তো কার্ডই ছাপা হয় নি।

স্যার বিয়েটা কবে ?

এখানো দেরি আছে। ২৫ তারিখ শুক্রবার, সেনাকুঞ্জে।

আপনার মেয়েকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখবেন সে চাচার কাছ থেকে কী উপহার চায়। নাকি আমি নিজেই জিজ্ঞেস করব ?

সর্বনাশ ঐ কাজ করতে যাবেন না। সে গাড়ি চেয়ে বসবে। ঐ দিন সে তার মা'কে বলছিল মোবারক চাচার অভ্যাস উপহার দেয়ার আগে জিজ্ঞেস করা কী উপহার চাই। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আমি বলব— লাল রঙের টয়োটা সিভান।

লাল রঙের টয়োটা সিভানের শখ ?

আরে ভাই ছিঃ ছিঃ আমার এই পাগলি মেয়ের কথার কোনো গুরুত্ব দেবেন না। যদি কিছু দিতে হয় একটা কোরান শরিফ দেবেন। মোবারক সাহেব।

জ্বি।

মেয়ের লাল গাড়ির শখের কথা আপনাকে বলা উচিত হয় নি। আপনি তো আবার ছেলেমেয়ের শখের অত্যধিক গুরুত্ব দেন— ভাই শুনুন আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা— আল্লাহ্পাকের পাক কালামের চেয়ে ভালো গিফট কিছুই হয় না। এখন এর কারণে আপনারা আমাকে প্রাচীনপন্থী মনে করেন বা না করেন— কিছু যায় আসে না ...

আফসারউদ্দিন খাঁ সাহেবও রেহানার মতো দীর্ঘ সময় কথা বললেন। মোবারক সাহেব ছাড়া পেলেন আধঘণ্টা পর। পিএকে বললেন-- নোট করে রাখুন মন্ত্রী আফসারউদ্দিনের মেয়ের বিয়ে ২৫ তারিখ। সেনাকুঞ্জে। বিয়ের টাইমটা জেনে নেবেন। গিফট আইটেম— একটা কোরান শরিফ সুন্দর করে র‍্যাপিং পেপারে মোড়া।

কোরআন শরিফ ?

হ্যাঁ।

মোবারক সাহেব মনে মনে হাসলেন। মন্ত্রী আফসারউদ্দিনের সঙ্গে এই রসিকতা করা যায়। সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছে লাল রঙের টয়োটা সিভান আসছে। সে জানে না এই জগতের কোনো কিছুই নিশ্চিতভাবে নেয়া ঠিক না। জগতের কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়।

১১

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে চিঠি এসেছে। রফিক লিখছে— সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার শরীর খারাপ। মা যেন একবার তাকে দেখতে যায়।

শাহেদাকে সেই চিঠি দেখানো হয়েছে। তিনি কিছু বলেন নি। ঝুমুর বলল, তুমি কি দেখতে যাবে? শাহেদা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছেন। সেই প্রশ্নেরও জবাব দেন নি। ঝুমুর বলল, তুমি যদি যেতে চাও, আপাকে বলতে হবে। দেখা করতে চাইলেই তো দেখা হয় না। ঘুস-টুস খাওয়াতে হয়। আগে থেকে না জানালে আপা ব্যবস্থা করবে কীভাবে? শাহেদা তারপরেও জবাব দিলেন না। ঝুমুর বলল, তুমি কি আপার সঙ্গে কথা বলবে? আপা ঘরেই আছে। আজ সে কোথাও যাবে না।

তুই স্কুলে যা। তোকে এত কথা বলতে হবে না।

আমি আজ স্কুলে যাব না। আপার সঙ্গে সারাদিন গল্প করব।

কর যা ইচ্ছা।

মিতু দরজা ভিজিয়ে শুয়ে আছে। ছোট বোনের সঙ্গে গল্প করার ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ঝুমুর কয়েকবার কাছে গেল, বিছানার পাশে বসল। মিতু তাকিয়ে দেখল— কিছু বলল না।

আপা মাথা বিলি দিয়ে দেব?

মিতু না-সূচক মাথা নাড়ল।

শুয়ে আছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

শরীর খারাপ লাগছে না। শরীর ভালোই, আরাম করছি। বিকেল পর্যন্ত শুয়ে থাকব।

তারপর?

বিকেলে বেরুব।

ঝুমুর আপার চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, রাতে শুটিং আছে?

হুঁ।

সারারাত শুটিং চলবে?

মিতু হাঁ-সূচক মাথা নেড়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, ঝুমুর তুই কি আমার একটা কাজ করে দিবি?

অবশ্যই দেব।

একটা চিরুনি কিনে আনবি। সুন্দর একটা চিরুনি।

চিরুনি দিয়ে কী করবে?

চিরুনি দিয়ে মানুষ কী করে।

তোমার তো চিরুনি আছে এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

মবিন ভাইকে দেব। ঐ দিন দেখলাম ওর চিরুনি নেই।

আমিও তাই আন্দাজ করছিলাম।

জানালার পর্দা টেনে দে তো।

ঝুমুর উঠে পড়ল। জানালার পর্দা টেনে দিতে বলার অর্থ— আমি এখন ঘুমুব। আপা তাকে খুব ভদ্রভাবে বলছে, তুই উঠে চলে যা।

আপা তুমি চা খাবে? চা বানিয়ে আনব?

না?

ঝুমুর ইতস্তত করে বলল, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম আপা, জরুরি কথা।

বল।

আমি এই বছর পরীক্ষা দেব না। সামনের বছর দেব।

মিতু কিছু বলছে না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আপা আমি একদম পড়াশোনা করতে পারছি না। বই নিয়ে বসি অন্য কথা ভাবি। সামনের বছর আমি খুব মন দিয়ে পড়ব। পরীক্ষায় দেখবে খুব ভালো করব। ঠিক আছে আপা?

মিতু চোখ না মেলেই বলল, আমার হ্যান্ডব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে একটা চিরুনি কিনে আন।

এখনি যাব?

এক সময় গেলেই হবে।

পরীক্ষার ব্যাপারে তো তুমি কিছু বললে না।

মিতু চাপা গলায় বলল, পরীক্ষা দেয়া না-দেয়া তোর ব্যাপার। আমার আর বলার কী আছে?

রাগ করছ না তো?

না। তুই এখন ঘর থেকে যা।

ঝুমুর চিরুনি কিনতে বের হয়ে গেল। তখন ঘরে ঢুকলেন শাহেদা। তাঁর হাতে চায়ের কাপ। পিরিচে দু'টা বিসকিট। মিতু বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, চা খাব না মা। তুমি খেয়ে ফেল। বিসকিটও খাব না।

সকালে নাশতাও খাস নি।

খিদে জমাচ্ছি। দুপুরে এক গামলা ভাত খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুব।

শাহেদা মেয়ের পাশে বসে চা খাচ্ছেন। মিতু বলল, বিসকিট খাও মা। তোমার খাওয়া দেখি।

খাওয়া দেখার কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। পৃথিবীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো খাওয়া। সেই খাওয়া দেখাটা তুচ্ছ করার মতো কিছু না।

বাড়িওয়ালা বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে, শুনেছিস?

হুঁ। ঝুমুরের কাছে শুনলাম।

বাড়ি দেখেছিস ?

না।

এক তারিখের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে তো।

বললেই তো বাড়ি ছেড়ে দেয়া যায় না।

আমি বলেছি ছেড়ে দেব।

বলেছ, ভালো করেছ। আমি বুঝিয়ে বলব।

আমি এখানে থাকতে চাই না। লোকজন আজেবাজে কথা তোর নামে ছড়াচ্ছে।

যেখানে যাবে সেখানেও তো ছড়াবে।

শাহেদা চুপ করে গেলেন। চায়ে বিসকিট ভিজিয়ে তিনি বিসকিট খাচ্ছেন। মিতু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

আজ রান্না কী মা ?

নলা মাছ নিয়ে এসেছিল। রাতে খাবি। দুপুরে ডাল ভাত।

দুপুরেই রাঁধ মা। আরাম করে খাই। রাতে আমি থাকব না। রাতে শুটিং আছে।

আজ শুক্রবারে। শুক্রবার তো শুটিং থাকে না।

আজ আছে।

ঐ দিন না বললি ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে ?

প্যাঁচওয়ার্ক বাকি আছে। কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার করা হবে।

রাতে ফিরবি না ?

না।

শাহেদা মুখ শক্ত করে বসে আছেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। চায়ের কাপে তিনি এখন আর চুমুক দিচ্ছেন না। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। মিতু শঙ্কিত গলায় বলল, কিছু বলছ মা ?

শাহেদা ক্ষীণ স্বরে বললেন, তোর বাবাকে কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি। মুখটা খুব মলিন। তিনি বললেন— তুমি এত কষ্ট করছ কেন ? কষ্ট করার দরকার কি ? এই টিনটা রাখ, এখানে ইঁদুর মারা বিষ আছে। তুমি নিজে খাও— মেয়ে দু'টাকে খাওয়াও, দেখবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এই বলে তিনি একটা টিনের কৌটা আমার হাতে দিলেন।

রাতদিন এইসব ভাব এই জন্যেই স্বপ্নে দেখেছ।

তোর বাবা কথাটা কিন্তু ভুল বলে নি।

মিতু হাসছে। শাহেদা বললেন, হাসছিস কেন ?

এমনি হাসছি। তুমি ঝাল ঝাল করে নলা মাছ রাঁধ তো মা। ইঁদুর মারা বিষ আবার মিশিয়ে দিও না। আমার এখন মরার কোনো রকম ইচ্ছা নেই।

শাহেদা নড়লেন না। বসেই রইলেন। মিতু বলল, এক কাজ করলে কেমন হয় মা, আজ আমি রান্না করি, রান্না করে তোমাকে খাওয়াই। তুমি চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম কর। আরেকটা কথা শোন, সংসারের সমস্যা নিয়ে তুমি মোটেও ভাববে না। আমি কী করব তোমাকে বলি, ঝুমুরকে বিয়ে দিয়ে দেব। ওর আর পড়াশোনা হবে না। ওর পড়াশোনায়

মন নেই। মোটামুটি ধরনের একটা ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। ওর চেহারা ভালো— ছেলে পাওয়া কোনো সমস্যা হবে না। তোমাকে আমি বলি নি। এর মধ্যেই একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলেটা ব্যাংকে চাকরি করে। ছোট চাকরি। তবে সংসারের দায়দায়িত্ব নেই। দু'জন মিলে ওরা সুখেই থাকবে... মবিন ভাই এর মধ্যে একটা চাকরি পেয়ে যাবে। তখন আমি বিয়ে করব। তুমি থাকবে আমার সংসারে। মাঝে মাঝে ঝুমুরকে গিয়ে দেখে আসবে। এখন তুমি আস তো আমার সঙ্গে, রান্নার সময় যদি ভুল-টুল করি তুমি ধরিয়ে দেবে। আরেকটা কথা মা— এর পরে যদি কোনোদিন স্বপ্নে বাবাকে দেখ তোমার কাছে ইঁদুর মারা বিষ গছিয়ে দিতে চাচ্ছে তাহলে তুমি তাঁকে কিন্তু কঠিন ধমক দেবে।

মিতু বিছানা থেকে নামল। তার মাকে হাত ধরে তুলল। মিতুর মুখ হাসি হাসি।

শাহেদা বললেন, ঝুমুরকে বিয়ে করতে চাচ্ছে যে তার নাম কি ?

আমানুল্লাহ্। অগ্রণী ব্যাংকে কাজ করে।

কী রকম কাজ ? দারোয়ান টারোয়ান না তো ?

না দারোয়ান না, ক্লার্ক।

তোকে সরাসরি বলেছে ?

আমাকে বলে নি, মবিন ভাইকে বলেছে।

ওকে কেন বলবে ? ও কে ? তার কিছু বলার থাকলে সরাসরি তোকে কিংবা আমাকে বলবে। ছেলেটার দেশ কোথায় ?

আমি মা কিছুই জানি না। আমি খোঁজ নিয়ে বলব।

কবে খোঁজ নিবি ?

আজই খোঁজ নেব। এফডিসিতে যাবার আগে মবিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তারপর যাব।

মবিন শুয়ে ছিল। মিতুকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল। অবাক হয়ে বলল, আরে তুমি।

মিতু বলল, অবেলায় শুয়ে আছ কেন ?

বেকার মানুষের আবার বেলা, অবেলা, কালবেলা ? তুমি এই সময় যে ?

এটা কি নিষিদ্ধ সময় ?

না নিষিদ্ধ হবে কেন ? এস ভেতরে এস ? আমার চিরুনি এনেছ ?

হুঁ।

সিগারেট ?

না। সিগারেট আনা হয় নি।

কতক্ষণ থাকবে ?

রাত আটটা পর্যন্ত থাকতে পারি কিন্তু তোমার তো সময় হবে না।

সময় হবে না তোমাকে কে বলল ?

সন্ধ্যাবেলায় তোমার টিউশানি আছে না ?

ছিল— এখন নেই। সন্ধ্যাটায় আমি এখন স্বাধীন। গতকাল সন্ধ্যায় কী করেছি জান,

একটা সিনেমা দেখে ফেললাম, 'জানি দুশমন'। আশায় আশায় গিয়েছিলাম, হয়তো তোমাকে দেখব। জানি দুশমন ছবিতে তুমি কাজ কর নি তাই না ?

না।

টেপী কি করেছে ? সুন্দর মতো একটা এক্সট্রা মেয়ে দেখলাম। নায়িকার সঙ্গে নদীতে পানি আনতে গেল।

টেপী ঐ ছবিতে কাজ করেছে কিনা বলতে পারছি না।

দেখা হলে জিজ্ঞেস কোরো তো। ওর সঙ্গে এখন দেখা হয় না ?

কম হয়।

ছবির ঐ মেয়েটাকে দেখে মনে হলো, এ নিশ্চয়ই টেপী। মেয়েটার মাথা ভর্তি চুল, জোড়া ভুরু।

জোড়া ভুরু ! তাহলে টেপী না। টেপীর জোড়া ভুরু না।

মবিন আগ্রহের সঙ্গে বলল, টেপীর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ওকে আমার দেখার খুব ইচ্ছা। একদিন তোমার সঙ্গে এফডিসিতে যাব। মেয়েটাকে দেখে আসব।

আচ্ছা।

ও আছে কেমন ?

ভালোই আছে। দারুণ এক বড়োলোকের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। সেদিন এফডিসি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গেল।

বল কী ! সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি।

টেপী নিশ্চয়ই খুব খুশি।

না খুশি না। ও দেখলাম খুব ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠল। মুখটা কান্নাকান্না।

কেন বল তো ?

বড়লোকরা গাড়ি পাঠিয়ে তো আর গল্প করার জন্যে নিয়ে যায় না, প্রেম করার জন্যেও নিয়ে যায় না— অন্য কারণে নিয়ে যায়। সবাই সেটা জানে। কাজেই সবার চোখের উপর দিয়ে বিরাট এক গাড়িতে করে যাওয়া খুব লজ্জার ব্যাপার না ?

অস্বস্তির ব্যাপার তো বটেই। দারুণ বড়লোকদের জন্যে দারুণ বড়লোক মেয়ে পাওয়া সমস্যা না— তারা পথেঘাটের মেয়েদের গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে কেন ?

মিতু হাই তুলতে তুলতে বলল, পথের মেয়েদের সঙ্গে যত সহজ হওয়া যায় অন্যদের সঙ্গে তো তত সহজ হওয়া যায় না। পথের মেয়ের আলাদা আনন্দ আলাদা থ্রিল। যাই হোক টেপীকে নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। অন্য কিছু নিয়ে কথা বল।

কী কথা শুনতে চাও ?

যা ইচ্ছা বল। তার আগে কাছে আস তো আমি তোমার চুল আঁচড়ে দিই। নাকি আমি চুল আঁচড়ে দিলে লজ্জা লাগবে ?

না লজ্জা লাগবে না।

মবিন এগিয়ে এল। খুব কাছে এল না। মাথা এগিয়ে দিল। যেন গায়ের সঙ্গে গা

লেগে গেলে মস্ত বড়ো অন্যায় হয়ে যাবে। মিতু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, তুমি কি ঝুমুরের জন্যে একটা ছেলে যোগাড় করে দেবে? আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব।

বাচ্চা মেয়ে বিয়ে দেবে কেন?

ওর এখনই বিয়ে হওয়া ভালো। বিয়ে হলে মা মানসিক শান্তি পাবেন। মা ওকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করেন। মা'কে আমি অবশ্যি বলেছি আমানুল্লাহ নামের এক ছেলে ঝুমুরকে বিয়ে করতে চায়। এতেই মা খুশি।

আমানুল্লাহ কে?

মিতু হাসতে হাসতে বলল, আমানুল্লাহ কেউ না। আমার বানানো এক নাম। মা'কে খুশি করার জন্যে গল্পটা তৈরি করা।

তিনি খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ খুশি হয়েছেন। অভিনয় তো আমি ভালো পারি— যাই বলি এত সুন্দর করে বলি, সবাই বিশ্বাস করে।

আমার বেলাতেও তাই কর?

না।

কখনো না?

মাঝে মাঝে করি। যখন করি তখন খুব খারাপ লাগে।

মবিন হাসছে। মিতুও হাসছে। মিতু বলল, চুল আঁচড়ানোটা ভালো হয় নি। এস আবার আঁচড়ে দিই। এরকম শক্ত হয়ে থাকবে না— আমার শরীরে কুষ্ঠ হয় নি যে ছোঁয়া লাগলে তোমার ক্ষতি হবে।

মবিন হড়বড়িয়ে বলল, কী যে তুমি বল!

ঠিকই বলি— তুমি আমার সঙ্গে সব সময় এমন ভাব কর যেন আমি তোমার ছাত্রী। তুমি আমাকে পড়াচ্ছ এবং আমার মা একটু দূরে বসে পড়ানো কেমন হচ্ছে লক্ষ করছেন।

মবিন হাসল।

মিতু কঠিন গলায় বলল, আমি সামান্য এক্সট্রা মেয়ে হতে পারি কিন্তু আমার হাত দু'টা সুন্দর। সুন্দর না? দেখ কী সুন্দর লম্বা লম্বা আঙুল!

সে তো সব সময়ই দেখছি।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখ। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলে তোমার মান যাবে?

মবিন বিস্মিত হয়ে বলল, আজ তোমার কী হয়েছে বল তো?

কিছু হয় নি। হবার মধ্যে যা হয়েছে তা হলো তোমার দেয়া শাড়িটা পরেছি। বেগুনি রং আমার অসহ্য কিন্তু শাড়িটা পরার পর নিজেকে এত সুন্দর লাগছে কেন কে জানে। আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছি। তোমার কাছে কি আমাকে সুন্দর লাগছে না?

লাগছে।

সত্যি লাগছে, না আমাকে খুশি করার জন্যে বলছ?

সত্যি লাগছে।

তাহলে তোমার আজ ভয়ঙ্কর বিপদ।

তার মানে!

আমি আজ কোথাও যাব না। সারারাত গল্প করব। যদি ঘুম পায় তোমার এই খাটে তোমার পাশে শুয়ে থাকব। তোমার কি একটাই বালিশ ?

মবিন তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পড়ছে না। মিতু বলল, এভাবে তাকিয়ে থাকবে না। আমি মন ঠিক করে এসেছি।

তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

মিতু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাই বোধহয়। ক'টা বাজে দেখ তো ?

সাতটা।

তুমি ওঠ, স্যান্ডেল পরে নাও। আমাকে বাসে তুলে দেবে। রাতে আমার শুটিং আছে। এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম। আমি কী সুন্দর অভিনয় পারি দেখলে তো ? আমার কথা বিশ্বাস করে ভয়ে ঘেমে-টেমে একেবারে অস্থির। এত ভয় পাচ্ছিলে কেন ?

না মানে, লোক জানাজানি হলে তোমার অসম্মান। আজ রাতে তোমার শুটিং ?

হুঁ। কিছু প্যাঁচওয়ার্ক দরকার পড়ে গেল। নরমাল টাইমে শিডিউল পাচ্ছিল না। আজই শেষ।

শেষ হলেই ভালো। সারারাত জেগে কাজ করা কী বিশ্রী ব্যাপার !

সবাই সুশ্রী ব্যাপার করবে তা তো হয় না। কাউকে কাউকে বিশ্রী ব্যাপারও করতে হয়। আমরা কিন্তু রিকশা নেব না। হেঁটে হেঁটে বাসস্টেশন পর্যন্ত যাব। আমার হাঁটতে ইচ্ছা করছে।

অনেকখানি রাস্তা তো।

অনেকখানি রাস্তাই তোমার সঙ্গে হেঁটে পার হব। তুমি আমার হাত ধরে থাকবে। অন্ধকার রাস্তা— কেউ দেখবে না।

মনিব বলল, চল তোমাকে এফডিসি পর্যন্ত দিয়ে আসি।

কোনো দরকার নেই। আমি একাই যাব।

আমি সঙ্গে গেলে অসুবিধা আছে ?

আছে। এক্সট্রাদের সঙ্গে যে সব পুরুষ মানুষ থাকে তাদের দালাল দালাল মনে হয়। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সবাই আড়চোখে তোমাকে দেখবে, আমার অসহ্য লাগবে। আমাদের বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে যাব। পরিচিত সবাইকে ক্যান্টিনে চা-টা খাইয়ে দেব। তুমি কী বল ?

সেটা মন্দ না।

তারা বাসস্টেশনে চলে এসেছে। ঢাকা যাবার বাস আসছে দেখা যাচ্ছে। মিতু বিষণ্ন ভঙ্গিতে বলল, এতটা রাস্তা আমরা পাশাপাশি হেঁটে এলাম, তুমি কিন্তু একবারও আমার হাত ধর নি।

ও সরি। দেখি তোমার হাত।

থাক দেখতে হবে না। বাস চলে এসেছে।

দিলদার খাঁ দরজা খুলেই বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, এতক্ষণে। ক'টা বাজে জান ?

রেশমা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, বাস পথে জ্যামের মধ্য পড়েছে। অ্যাকসিডেন্টের জন্যে এয়ারপোর্ট পুরা দু'ঘণ্টা বন্ধ। কী করব বলুন।

রাত বাজে এগারটা, পার্টি এতক্ষণ তোমার জন্যে বসে থাকবে ? আমার নিজেরও একটা বদনাম হয়ে গেল। কথা রাখতে পারলাম না।

সরি দিলদার ভাই।

এখন সরি বলে লাভ কী ? রাত ন'টা পর্যন্ত পার্টিকে ধরে রেখেছি। তারপর বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা করেছি। হুট করে তো কাউকে পাওয়া যায় না। পার্টির পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে।

রেশমা বলল, আমি এখন কী করব ?

কী আর করবে ? বাসায় চলে যাবে।

এত রাতে বাসায় যাব না। ভোরবেলা যাব। রাতটা আপনার বাসায় থেকে যাই।

দিলদার বিরক্ত গলায় বলল, আরে সর্বনাশ ! বাসায় থাকতেই পারবে না। তোমার ভাবি এইসব ব্যাপারে অসম্ভব স্ট্রিক্ট।

বসার ঘরের সোফায় শুয়ে থাকব।

অসম্ভব। বসার ঘরের সোফা কেন, বারান্দায় শুয়ে থাকলেও সে ঝাঁটাপেটা করবে।

রেশমা বলল, ঠিক আছে থাকব না। ঘরে ঢুকতে দিন। ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা হয়েছে। এক গ্লাস পানি খাব— তারপর ভেবে ঠিক করব কী করা যায়।

দিলদার খাঁ নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

পুরনো অসুখটা কি আবার তাঁকে ধরেছে ? সেই ভয়াবহ অসুখ ? যে অসুখ গভীর গোপনে লুকিয়ে থাকে, হঠাৎ বের হয়। যখন বের হয় তখন সমগ্র চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করে দেয়।

মোবারক সাহেবের চিন্তা-চেতনা গুলিয়ে যাচ্ছে। তিনি বসে আছেন তাঁর এল সি থ্রি পারসোনাল কম্পিউটারের সামনে। পর্দায় দাবার বোর্ড। এবারের চাল তাঁর দেয়ার কথা। পর্দায় ফ্ল্যাসিং সাইন উঠছে। সুন্দর চাল তাঁর আছে। মন্ত্রীর সামনের বড়ে এক ঘর এগিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের নাইটকে বেকায়দায় ফেলা। তিনি চাল দিচ্ছেন না। মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর ভেতর থেকে একজন কেউ বলছে, অর্থহীন, এই চাল দেয়া অর্থহীন। কে বলছে ? তাঁর পুরনো অসুখটা বলছে ?

হ্যাঁ সেই পশুটাই বলছে। কিন্তু পশুটাকে এখন আর পশু বলে মনে হচ্ছে না। পশুর গলার স্বর মধুর। প্রথম যৌবনের কিশোরী প্রেমিকার কণ্ঠস্বরের মতো। তাঁর প্রথম যৌবনে কোনো কিশোরী প্রেমিকা ছিল না। থাকলে অবশ্যই সে এরকম কণ্ঠে কথা বলত।

কণ্ঠস্বর বলল, দাবার চাল দিয়ে কী হবে ?

তিনি যুক্তি দিতে চেষ্টা করলেন। ক্ষীণস্বরে বললেন, আনন্দ। খেলার আনন্দ। জয়-পরাজয়ের আনন্দ।

জয়-পরাজয়ের আনন্দ সবার জন্যে নয়। এই খেলায় জয় করেও তুমি আনন্দ পাবে না। পরাজিত হয়েও তুমি আনন্দ পাবে না। একটু শুধু ক্লান্ত হবে। তুমি ক্লান্ত হবার জন্যে খেলছ ?

না।

তাহলে শুধু শুধু খেলছ কেন ?

খেলছি না তো আমি বসে আছি।

এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে ?

জানি না।

অনন্তকাল বসে থাকবে ?

অনন্তকাল বসে থাকব কেন ? আমি এখন উঠব। হাত-মুখ ধোব, কফি খাব, তারপর ঘুমুতে যাব।

কারো কারো জন্যে সময় থেমে যায়। তোমার জন্যে সময় থেমে গেছে। তুমি যাই কর তোমার কাছে মনে হবে তুমি অনন্তকাল ধরে করছ। সত্যি না ?

হ্যাঁ সত্যি।

তুমি যখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল— তোমার কাছে মনে হবে তুমি অনন্তকাল ধরে কথা বলছ। তুমি যখন হাতে কফির পেয়ালা নেবে তখন মনে হবে অনন্তকাল ধরেই কফির পেয়ালা হাতে তুমি বসে আছ।

আমি কি অভিশপ্ত ?

সব মানুষই অভিশপ্ত। ওরা তা জানে না বলে ওরা হেসে খেলে জীবন ধারণ করছে। তুমি জেনে গেছ। তোমার মতো আরো অনেকেই জেনেছে। জাপানের নোবেল পুরস্কার পাওয়া সেই ঔপন্যাসিকের নাম যেন কি ?

কাওয়াবাতা ?

হ্যাঁ কাওয়াবাতা। তিনি যখন সব পেয়ে গেছেন তখন তিনি আত্মহত্যা করেন। এরকম উদাহরণ আরো আছে। আছে না ?

আছে ? কবি মায়াকোভস্কি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে... পুশকিনকেই বা বাদ দেবে কীভাবে ?

পুশকিন ডুয়েলে মারা গেছেন।

একই কথা। ব্যাপার একই। জীবন তাদের কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই। তুমিও বুঝে গেছ...

আমার বিশাল কর্মকাণ্ড, ব্যবসা...

তাঁদের কর্মকাণ্ড কি তোমার চেয়ে কম ছিল ?

মৃত্যু আমাকে কী দেবে ?

কিছুই দেবে না। এটা কি অনেক বড় উপহার না ?

সে রকমই মনে হচ্ছে।

একটা বইয়ের শেষ পাতায় কী লেখা থাকে— দি এন্ড। সমাপ্তি। মৃত্যু তোমাকে শেষ পাতায় এনে দেবে। এটা কি আনন্দময় একটা ব্যাপার না ?

হ্যাঁ। আমাকে তুমি এখন কী করতে বল ?

তুমি তোমার কম্পিউটারে লেখ— The End. সুন্দর করে লেখ। কম্পিউটারের পর্দায় তিনি লিখলেন—

The End.

এত ছোট করে লিখেছ কেন ? বড় টাইপে লেখ। সব ক্যাপিটেল লেটারে।

তিনি লিখলেন—

THE END.

আর তখন বিশ্রী শব্দে ইন্টারকম বাজতে লাগল। তিনি ইন্টারকমের রিসিভার কানে নিলেন। ইদরিস বলল, স্যার স্লামালিকুম।

তিনি যন্ত্রের মতো বললেন, কী ব্যাপার ইদরিস?

একটা মেয়ে এসেছে স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

কে এসেছে?

এই বাড়িতে সে আগে একবার এসেছিল।

টেপী?

নাম বলল রেশমা।

ও আচ্ছা।

ওকে কী বলব স্যার?

মোবারক সাহেব চুপ করে রইলেন। তার ভেতরে সেই পশু কিছু বলে কিনা শুনতে চেষ্টা করলেন। কেউ কিছু বলছে না। তিনি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ইদরিস রেশমাকে উপরে নিয়ে এস।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

রেশমা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভয়ে ভয়ে উঠছে। সিঁড়ির মাথায় মোবারক সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। মোবারক সাহেবের মুখ হাসি হাসি।

তিনি দূর থেকে বললেন, কী ব্যাপার বল তো?

রেশমা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাকে একটু যেন বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। সে বলল, আমি আমার চুলের ফিতাটা ফেলে গিয়েছিলাম। নিতে এসেছি।

মোবারক সাহেবের মনে হলো, বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। সুন্দর জবাব দিয়েছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে মনের ভেতেরের পশুটাকে অনেকক্ষণের জন্যে আটকে রাখা যাবে।

তুমি কি ফিতা নিয়েই চলে যাবে?

আপনি থাকতে বললে থাকব।

দাঁড়িয়ে আছ কেন, এস ! এস ! মোবারক সাহেব হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রেশমা ইতস্তত করছে। মোবারক সাহেব বললেন, ধর আমার হাত ধর।

রেশমা হাত ধরল। মোবারক সাহেব বললেন— তুমি হঠাৎ করে আসায় আমি যে কী ভয়ঙ্কর খুশি হয়েছি তুমি কোনোদিনও তা জানবে না। তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাইবে তাই পাবে। এটাকে মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে ধরে নাও। বল কী চাও?

রেশমা বলল, আমি কি অন্য কারো জন্যে কিছু চাইতে পারি?

হ্যাঁ পার।

আমার একজন অতি প্রিয় মানুষ আছে। চা বাগানের একটা চাকরির তার খুব শখ। ভালো একটা চাকরি।

মোবারক সাহেব বললেন, আমার সঙ্গে আস। আমি কম্পিউটারে তার নাম-ঠিকানা তুলে নিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করব।

মোবারক সাহেব তাঁর কম্পিউটার থেকে Thc End লেখা মুছে ফেললেন। জরুরি লেখা ফোল্ডার ওপেন করে বললেন—

বল রেশমা, নাম বল।

রেশমা নাম বলল।

তুমি কি খেয়ে এসেছ ?

জ্বি না।

আশ্চর্য ! আমিও খাই নি। ইদরিসকে বলি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। তুমি কী খেতে পছন্দ কর ?

আমি সবকিছুই পছন্দ করি। আপনি কী পছন্দ করেন ?

জানি না। আসলেই জানি না। মজার ব্যাপার কী জান মিতু অনেকদিন পর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কী পছন্দ করি— ঐ ভদ্রলোকের ঠিকানা কী বল ? মেইলিং অ্যাড্রেস।

১২

ঝুমুরদের রান্নাঘর বারান্দায়। করোগেটেড টিন দিয়ে বারান্দার একটা অংশ আলাদা করে রান্নাঘর। চালে কয়েক জায়গায় ফুটো আছে। বৃষ্টির সময় ফুটো দিয়ে পানি পড়ে। রাঁধতে শাহেদার খুব যন্ত্রণা হয়। শাহেদা এই মুহূর্তে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। বড়া ভাজার জন্যে তেল চড়িয়েছেন। বৃষ্টির পানি ফুটন্ত তেলে এসে পড়ছে। ফুটন্ত তেলের ছিটা তার মুখে এসে পড়েছে। মুখের খানিকটা তো অবশ্যই পুড়েছে। শাহেদাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। তিনি আহ্ উহ্ জাতীয় কোনো শব্দ করেন নি। তাঁর ব্যস্ততা চুলাটা নিরাপদ কোনো জায়গায় সরিয়ে নেয়ার দিকে। এই সময় ঝুমুর এসে বলল, বাড়িওয়ালা এসেছে মা।

শাহেদা বললেন, কাল সকালে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে যেতে বল।

বাড়ি ভাড়া নিতে আসে নি মা। বাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা। আমরা বাড়ি ছাড়ি নি এই নিয়ে খুব চেঁচামেচি করছে।

শাহেদা নির্বিকার গলায় বললেন, করতে থাকুক।

তিনি কেরোসিনের চুলা দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিলেন। সেখানে পানি আরো বেশি পড়ছে। ঝুমুর বলল, মা তুমি আস উনি বিশ্রী বিশ্রী সব কথা বলছেন। বাড়ির সামনে লোক জমে গেছে।

শাহেদা চুলা থেকে কড়াই নামালেন। মাথার উপর আঁচল তুলে দিলেন। ঝুমুর মা'র সঙ্গে গেল না। তার হাত-পা কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড হতে যাচ্ছে। এমন সময় হচ্ছে যখন আপা বাড়িতে নেই। আপা থাকলে যত ভয়ঙ্কর কাণ্ডই হোক সামাল দিতে পারত। এখন কে সামলাবে ? এক ফাঁকে সে গিয়ে কি মবিন ভাইকে নিয়ে আসবে ? মাঝে মাঝে একজন পুরুষ মানুষের উপস্থিতির এমন প্রয়োজন পড়ে!

শাহেদা বারান্দার খোলা দরজার পাশে দাঁড়ালেন। বাড়ির উঠানে এবং রাস্তায় এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে তিনি কল্পনা করেন নি। হৈচৈ শুনে এরা জড়ো হয়েছে তাও মনে হচ্ছে না। বৃষ্টি মাথায় করে এতগুলো মানুষ জড়ো হবে না। নিজামউদ্দীন

সাহেব মনে হচ্ছে এদের সঙ্গে করেই এনেছেন। ফুটন্ত তেল শাহেদার থুঁতনির কাছে পড়েছে। জায়গাটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি জমে ফোঁসকা উঠে যাবে। তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। শাহেদা বললেন, কী হয়েছে ?

নিজামউদ্দীনের গলা শীতল। কণ্ঠস্বরে কোনো রাগ নেই। তাঁর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য পরিষ্কার। তিনি কথা বললেন উঁচু গলায় যাতে জড়ো হওয়া প্রতিটি মানুষ তার কথা শুনতে পায়।

কী হয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন ? কী হয়েছে সেটা তো আপনি বলবেন। একত্রিশ তারিখ বাড়ি ছাড়ার কথা। আজ সাত তারিখ। বাড়ি ছাড়ার কোনো লক্ষণ নাই। বাড়ি ভাড়া দেয়ার সাড়াশব্দ নাই। ভাড়া আমার দরকার নাই। বাড়ি ছাড়েন।

শাহেদা শান্ত গলায় বললেন, ছাড়ব তো বটেই। বাড়ি খুঁজছি। পাওয়া গেলেই ছেড়ে দেব।

আমি খোঁজাখুঁজির কথা শুনতে চাই না। বাড়ি ছাড়বেন। আজ রাত্রেই ছাড়বেন।

আজ রাত্রেই ছাড়তে হবে ?

অবশ্যই। ভদ্রপাড়ায় বাস করে দুই মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করবেন সেটা আর হতে দেয়া যায় না।

আপনি কী বলছেন ?

গলা বড় করবেন না। আমি বড় গলার ধার ধারি না। ভদ্রলোকের পাড়ায় বাস করে ব্যবসা করবেন আর আমরা চুপ করে থাকব ? ঢাকা শহরে খারাপ পাড়ার তো অভাব নাই, সেখানে গিয়ে ওঠেন। ব্যবসাও ভালো হবে। উঠতি বয়সের দুই মেয়ে !

শাহেদা ভাঙা গলায় বললেন, চুপ করুন। আমি আপনার পায়ে ধরছি। চুপ করুন। আজ রাত্রেই আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব। আসুক, মেয়েটা আসুক।

নিজামউদ্দীন হৃষ্ট গলায় বললেন, মেয়ে ট্রিপ দিতে গেছে, এত সহজে কি আসবে ? তার আসতে রাত দু'টা-তিনটা বাজবে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বলল, চুপ করেন না ভাই, অনেক তো বললেন।

শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। বুকের ভেতর প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। মনে হচ্ছে চিৎকার করে উঠলে ব্যথা কমবে।

নিজামউদ্দীন খড়খড়ে গলায় বললেন, আমি যা বলেছি সত্য কথা বলেছি। যদি মিথ্যা বলি আমার উপর যেন আল্লাহর গজব পড়ে। তারপরেও বলতেছি— রাতটা থাকেন, পরের দিনটাও থাকেন। ব্যাস। পরশুদিন সকালে যেন দেখি বাড়ি পরিষ্কার। ভাড়া বাকি পড়েছে— দেয়া লাগবে না। মেয়ে খাটা পয়সার আমার দরকার নাই।

নিজামউদ্দীন নেমে যাচ্ছেন। যুদ্ধজয়ীর ভঙ্গিতে নামছেন। বৃষ্টির বেগও বাড়ছে। বাড়ির সামনে জড়ো হওয়া লোকজন চলে যাচ্ছে। শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বুকের যন্ত্রণাটা খুব বেড়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ঝুমুর এসে ডাকল, মা মা।

শাহেদা তাকালেন না। বড়ো বড়ো করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন।

মা তুমি বিছানায় এসে শোও।

ঝুমুর মা'র হাত ধরল। শাহেদার ইচ্ছা করল প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে মেয়ের হাত সরিয়ে দেন কিন্তু তিনি কোনো জোর পাচ্ছেন না। তাঁর শরীর পাখির পালকের মতো হালকা লাগছে। ঝুমুর হাত ধরে তাকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, মা তুমি এরকম করছ কেন? শাহেদা বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। তাঁর হাত-পা ঘামছে। খুব তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। মেয়েকে পানি এনে দেবার কথা বলতে পারছেন না। জিভ ভারি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঘুমও পাচ্ছে। এই ঘুমই কি শেষ ঘুম? মেয়েগুলোকে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাচ্ছিলেন। বলা বোধহয় সম্ভব হবে না। চোখে আলো লাগছে। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

আবার যখন চোখ মেললেন তখন করুণ একটা মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। সেই মুখ গভীর মমতায় জানতে চাইল, কেমন আছ মা? চিনতে পারছ না আমাকে? আমি মিতু।

শাহেদা ক্ষীণস্বরে বললেন, পানি খাব।

মিতু পানির গ্লাস নিয়ে এল। চামচ নিয়ে এল। সে চামচে করে মা'কে পানি খাওয়াতে যাচ্ছে কিন্তু তার হাত এত কাঁপছে যে চামচ থেকে ছলকে পানি পড়ে যাচ্ছে। মিতু কাঁদছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কাঁদছে। এত বেশি কাঁদছে যে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। শাহেদা বললেন, কাঁদিস না মা। তিনি মাথা ঘুরিয়ে ঝুমুরকে খুঁজলেন। মিতু বলল, ঝুমুরকে পাঠিয়েছি মবিন ভাইকে আনতে।

কয়টা বাজে?

রাত বেশি হয় নি মা, আটটা।

শাহেদা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আবারো বললেন, কাঁদিস না।

মবিনের ঘরের সামনে ঝুমুর দাঁড়িয়ে আছে। ঘর বন্ধ, তালা ঝুলছে। নিচতলার দরজির দোকান খোলা। সেখান থেকে সেলাই মেশিনের খটখট শব্দ আসছে। ভয়ে ঝুমুর অস্থির হয়ে গেছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। বৃষ্টি পড়ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁসে। মাথার উপর ছাদের মতো একটু আছে বলে বৃষ্টিতে ভিজছে না। তাতে কি? কতক্ষণ সে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? সে যে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে তা দরজির দোকানের লোকটি দেখেছে। মেশিন বন্ধ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। ঝুমুরের মনে হচ্ছে সেই লোকটা উপরে উঠে আসবে। একা আসবে না, দু-একজন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে আসবে।

ঝুমুর এখন কী করবে? বাসায় ফিরে যাবে? বাসায় ফিরে যাবার পথেও তো ঝুমুরকে তারা ধরে ফেলতে পারে। এমন অন্ধকার রাস্তা। তারা যদি রিকশা থামায়। রিকশা থামিয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে নিয়ে যায়? চিৎকার করে উঠলে লাভ হবে না। এখনকার সময় এমন যে চিৎকার শুনলে কেউ আসে না। বরং দূরে সরে যায়।

বৃষ্টি জোরে নেমেছে। ঝুমুরের পা ভিজে যাচ্ছে। নিচের সেলাই মেশিনের খটখট শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। লোকটা নিশ্চয়ই সেলাই মেশিন বন্ধ করে উপরে উঠে আসছে।

ঝুমুরের গা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তার যে এত

ভয়ঙ্কর বিপদ তা কেউ জানতে পারছে না। দরজির দোকানের লোকটা তাকে কোনো একটা খুপড়ি ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে— তারপর সারারাত ধরে কুৎসিত কাণ্ডকারখানা করবে। ভোররাতে গলা টিপে মেরে ফেলে রাখবে ধানক্ষেতে। এই ক্ষেত্রে এরকমই হয়।

বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস দিচ্ছে। ঝুমুর এখন পুরোপুরি ভিজে যাচ্ছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। আসছে, দরজির দোকানের লোকটা আসছে। ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটতে যাচ্ছে। সে এখন কী করবে ? ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবে ? সাহস কি তার আছে ? এমনও তো হতে পারে যে দরজির দোকানের লোকটা না মবিন ভাই-ই আসছেন। যদি মবিন ভাই হয় সে প্রথমে আনন্দে একটা চিৎকার দেবে এবং ছুটে গিয়ে মবিন ভাইকে জড়িয়ে ধরবে। এতে মবিন ভাই কিছু মনে করলেও তার কিছুই যায় আসে না।

না, মবিন ভাই না। দরজির দোকানের লোকটা। লম্বা কালো, রোগা একটা লোক। কী বিশ্রীভাবে সে তাকিয়ে আছে! ঝুমুর প্রায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। লোকটা বলল, মবিন সাহেবের খোঁজে আসছেন ?

ঝুমুর কোনো উত্তর দিল না। তার শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

বৃষ্টিতে ভিজতেছেন। নিচে বসেন। আসেন।

বদমায়েশ লোকটা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেনেও ঝুমুর যাচ্ছে। কারণ না গিয়ে সে কী করবে ? কী হবে চিৎকার করে ?

সাবধানে নামবেন, সিঁড়ি পিছল।

ঝুমুর নিশ্চিত হলো সিঁড়ি পিছল এই অজুহাতে লোকটা তার হাত ধরবে। আচ্ছা ঝুমুর কি পারে না প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সিঁড়িতে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে ? তার জন্যে খুব বেশি সাহস কি লাগে ? আচ্ছা আল্লাহ্ কিছু কিছু মানুষকে এত কম সাহস দিয়ে পাঠান কেন ? তাকে যদি একটু বেশি সাহস দিয়ে পাঠাতেন। সামান্য বেশি, তাহলে তাঁর এমন কী ক্ষতি হতো ?

ঝুমুর দোকানে ঢুকেছে। দোকানে লোকটা একা না। আট-দশ বছরের একটা ছেলেও আছে। সে শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে। লোকটা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, বসেন।

ঝুমুর বসল। না বসে সে কী আর করবে। লোকটা এখন কী করবে ঝুমুর জানে। কোনো একটা অজুহাতে ছেলেটাকে বাইরে পাঠিয়ে দেবে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেবে।

মবিন সাহেব বাসাতেই থাকে। আজ যেন কোথায় গেছে। এসে পড়বে।

ঝুমুরকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলা। পরিস্থিতি শুরুতে একটু স্বাভাবিক করা।

চা খাবেন ?

ঝুমুর হ্যাঁ না কিছু বলল না। লোকটা পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে বলল, ইসমাইল দৌড় দে।

ঝুমুর যা ভেবেছে তাই— ছেলেটাকে সরিয়ে দিচ্ছে। তার ইচ্ছা করল চিৎকার করে বলে খবরদার তুই যাবি না, তুই বসে থাক।

ছেলেটা ছোট একটা কেতলি হাতে উল্কার মতো বের হয়ে গেল। মনে হয় চা-আনার কাজ তার খুব পছন্দ।

মাথাটা মুছে ফেলেন।

লোকটা একটা তোয়ালে ঝুমুরের দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। ঝুমুর বলল, মাথা মুছতে হবে না। লোকটা তোয়ালে রেখে দিয়ে সহজ গলায় বলল, ভয় পাবেন না। ভয় পাওয়ার কিছু নাই। মবিন সাহেব আসতে দেরি করলে আমি আপনাকে বাসায় দিয়া আসব।

ঝুমুর যা ভেবেছে তা হচ্ছে না। ছেলেটা চলে যাবার পরও লোকটা দরজা বন্ধ করছে না। বরং ছেলেটার ফেলে যাওয়া শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে। শার্টের বোতাম লাগানোর কাজগুলো সাধারণত মেয়েরা করে। ছেলেদের এই কাজ করতে দেখলে একটু অস্বস্তি লাগে।

এই দোকানটা কি আপনার?

না, আমি একজন কর্মচারী।

আপনার বাসা কোথায়?

বাসা-টাসা নাই।

রাতে থাকেন কোথায়?

দোকানেই থাকি।

খাওয়াদাওয়া কোথায় করেন?

হোটেলে খাই।

ঝুমুর খুব অবাক হচ্ছে। কারণ সে লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। আগ্রহ করে কথা বলছে। অবশ্য কথা না বলেই বা কী করবে? দু'জন মানুষ তো চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তাছাড়া মানুষটাকে তার এখন খুব ভদ্র, খুব বিনয়ী মনে হচ্ছে। ছোট কাজ যারা করে তারাও ভদ্র হতে পারে, বিনয়ী হতে পারে।

ছেলেটা চা নিয়ে এসেছে। তিনটা কাপ বের করল। ছোট ছোট কাপ। কাপের সাইজ যে এত ছোট হতে পারে ঝুঁমুরের ধারণা ছিল না। তারা তিনজনই চুকচুক করে চা খাচ্ছে। সবচে' বেশি মজা করে চা খাচ্ছে ছোট ছেলেটা। প্রতিবারই চুমুক দিয়ে আহ্ করে উঠছে। বাইরে বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। ছোট ছেলেটা দাঁত বের করে বলল, শহীদ ভাই তুফান আইতাছে। যেন তুফান আসা খুব আনন্দের ব্যাপার। ঝুমুর বলল, আমার মার খুব শরীর খারাপ এই জন্যে মবিন ভাইকে নিতে এসেছি।

কী হয়েছে?

অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জ্ঞান ফেরে নাই?

আমি যখন আসি তখনো ফেরে নাই।

বলেন কী?

ঝুমুরেরও মনে হলো আরে তাই তো! এতক্ষণে একবারও তার মা'র কথা মনে হয় নি। সে বেশ আরাম করে চা খাচ্ছে। মা কেমন আছে কে জানে। মারা যায় নি তো? ঝুমুর উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণস্বরে বলল, আমি চলে যাব।

শহীদ নামের লোকটা বলল, চলুন আমি সঙ্গে যাই।

ঝুমুর কোনো আপত্তি করল না। লোকটাকে তার ভালো লাগছে। বেশ ভালো লাগছে।

শহীদ ঝুমুরকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ডাক্তার আনতে গেল। এবং মুহূর্তের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার ব্লাডপ্রেসার মাপলেন। প্রেসার কমাবার ওষুধ দিলেন। শহীদ ওষুধ আনতে গেল। ছাতা নেই, ভিজতে ভিজতে গেল।

মিতু বলল, লোকটা কে রে?

ঝুমুর বলল, আমার চেনা একজন।

চেনা মানে কি? কীভাবে চিনিস? পরিচয় হয়েছে কোথায়?

ঝুমুর জবাব দিল না। মিতু চিন্তিত গলায় বলল, কত দিনের পরিচয়?

ঝুমুর বলল, অনেক দিনের।

অনেক দিনের মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কি প্রায়ই আসে নাকি? কথা বলছিস না কেন? কী করে?

শার্টের বোতাম লাগায়।

তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?

ফাজলামি করছি না, যা সত্যি তাই বলছি।

বাঁদরের মতো দেখতে একটা লোক, তার সঙ্গে তোর এত খাতির কীভাবে হলো?

তুমি এত রাগছ কেন আপা?

না আমাকে বল এত খাতির কীভাবে হলো?

তোমার হৈচৈ শুনে মা জেগে যাবে আপা।

মিতু বিস্ময় নিয়ে বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঝুমুর বলল, আপা উনি ওষুধ নিয়ে আসার পর উনাকে রাতে খেয়ে যেতে বলি? বেচারা হোটেলে খায়। হোটেলের কুৎসিত খাবার খেয়ে খেয়ে শরীরের কী হাল করেছে দেখেছ?

তুই খুবই আশ্চর্য একটা মেয়ে রে ঝুমুর।

রাতদুপুরে মবিন ভাই যদি এরকম ছোটাছুটি করত তুমি কি তাকে না খাইয়ে বিদেয় করতে?

মবিন ভাই আর সে এক হলো?

এক ভাবলেই এক।

মিতু তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঝুমুর সেই তীব্রদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, চারটা চাল বসিয়ে দেব আপা?

যা ইচ্ছা কর।

বেগুন আছে। বেগুন ভেজে ফেলি?

যা ভাজতে ইচ্ছে করে সব ভেজে ফেল।

মিতু অবাক হয়ে দেখল ঝুমুর সত্যি সত্যি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল?

শহীদ খাবারের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল। ঝুমুর বলল, না না করলে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। গামছাটা দিয়ে ভালোমতো মাথা মুছে ফেলুন।

আমি খাব না। অন্য কোনো দিন এসে...

আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। না খেয়ে আপনি যেতে পারবেন না।

শহীদ অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছে। মেয়েটার কাণ্ডকারখানা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মেয়েটা কি পাগল টাইপের?

ঝুমুর বলল, খাবার কিছু নেই— বেগুন ভাজা, ডাল আর আলু ভর্তা। আপনার কষ্ট হবে।

মিতু বলল, উনি খেতে চাচ্ছেন না, তুই এত জোর করছিস কেন?

এত রাতে উনি হোটেলেও কিছু পাবেন না, না খেয়ে থাকবেন নাকি?

শহীদ শরমে মরে গিয়ে মিতুর দিকে তাকাল। মিতু বলল, আপনি খেয়ে যান। ঝুমুর চট করে খাবার দিয়ে দে।

মিতু মা'র ঘরে বসে আছে। দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে— মাথা নিচু করে মানুষটা খাচ্ছে। তার সামনে ঝুমুর বসে আছে। সে খাবার তুলে দিচ্ছে। কী যেন আবার নিচু গলায় বলছে। কী বলছে? বলুক যা ইচ্ছা।

শাহেদার ঘুম ভেঙেছে। শাহেদা বললেন, ছেলেটা কে রে?

মিতু বলল, আমি জানি না মা।

শাহেদা বললেন, যার ইচ্ছা আসছে, খেয়ে যাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না মা, কিছুই বুঝতে পারছি না।

তুমি চিন্তা কোরো না মা। আমার মনে হয় না চিন্তার কিছু। তুমি ঘুমিয়ে থাক।

শাহেদা চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ। বন্ধ চোখের কোণা বেয়ে পানি পড়ছে। ঘরে আলো নেই বলে মিতু তা দেখতে পাচ্ছে না।

ঝুমুর চাদরে সারা শরীর ঢেকে শুয়ে আছে। মাথাও চাদরের নিচে ঢুকানো। আজ সে একা ঘুমুবে। মিতু ঘুমুবে মা'র সঙ্গে। ঘুমুতে যাবার আগে সে বোনের ঘরে ঢুকল। বিছানায় বসতে বসতে বলল, ঘুমুচ্ছিস নাকি ঝুমুর?

ঝুমুর জবাব দিল না। মিতু বলল, তুই জেগে আছিস আমি জানি। মুখ থেকে চাদর সরা।

ঝুমুর চাদর সরাল। মিতু বলল, ছেলেটা কে?

জানি না।

জানি না মানে? ওর নাম কি?

শহীদ।

তোর সঙ্গে কত দিনের পরিচয়?

আজই পরিচয় হয়েছে।

সে কী!

মবিন ভাইয়ের বাসার নিচে দরজির দোকানে কাজ করে। আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে

গেল। চা খাওয়াল।

আর তুই তাকে এরকম খাতির-যত্ন করে দিলি। না জানি সে কী ভাবছে ?

ঝুমুর লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বলল, পরশুদিন সকালে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আপা।

পরশুদিন আসুক তখন দেখা যাবে।

তুমি তো আজকের কাণ্ড দেখ নি— আজকের কাণ্ড দেখলে তোমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে যেত।

তোর কাণ্ড দেখে আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেছে।

ঝুমুর মাথা নিচু করে খুব হাসছে। হাসি দেখে মিতুর বড় মায়া লাগল। হঠাৎ সে বলল, আয় তো ঝুমুর তোকে একটু আদর করি। ঝুমুর চোখ তুলে তাকাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপাকে জড়িয়ে ধরল।

দু'বোন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে অনেক রাত পর্যন্ত কাঁদল। কেন কাঁদল তারা জানে না।

এক সময় ঝুমুর চোখ মুছে লজ্জিত ভঙ্গিতে ডাকল, আপা !

কি ?

আমরা এত কান্নাকাটি করছি কেন ?

আমি কী জন্যে কাঁদছি সেটা আমি জানি, তুই কী জন্যে কাঁদছিস সেটা তোর জানার কথা।

আমি জানি না।

না জেনেই ভেউ ভেউ করে কাঁদছিস ?

হুঁ। আপা শোন—

বল শুনছি।

পরশু কী হবে বল তো— বাড়িওয়ালা চাচা যখন আসবে তখন তুমি যদি না থাক ?

আমি না থাকলে তুই তো থাকবি। তুই সামলাবি।

আমি সামলাব ? তুমি কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে ? কী সব কুৎসিত কথা যে লোকটা বলছিল !

বলুক না। এক সময় বলার কথা শেষ হয়ে যাবে।

লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কুৎসিত কুৎসিত কথা বলবে তখন আমি কী করব ?

তুই ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হবি। তাতেই কাজ হবে। কিছু মানুষের সিমপ্যাথি পেয়ে যাবি। যদি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাস তাহলে আর দেখতে হবে না। সব লোক তোর পক্ষে চলে আসবে।

কী যে তোমার কথা আপা !

মিতু হাসতে হাসতে বলল, ইচ্ছা করলে লোকটাকে আমরা কঠিন শাস্তিও দিতে পারি। কীভাবে জানিস ?

কীভাবে ?

খুব সহজ— কাঁদতে কাঁদতে ছোট্ট একটা অভিনয় করতে হবে। লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে— যখন তখন আমাদের বাসায় আসত। কখনো পেঁপে নিয়ে আসত, কখনো কলা, কখনো আম নিয়ে আসত। একদিন খারাপ একটা ইঙ্গিত করে। আমরা তাকে ঘর থেকে বের করে দেই। তারপর থেকে সে আমাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

করবে। মানুষের চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে যাই বলা হয় তাই সবাই বিশ্বাস করে।

তুমি বলতে পারবে এমন কথা?

না।

পরশুদিনের কথা ভেবে আমার এমন অস্থির লাগছে!

অস্থির লাগার কিছু নেই। পরশুদিন কেউ আসবে না। আমি ব্যবস্থা করব।

কী ব্যবস্থা করবে?

সেটা তোর জানার দরকার নেই। তবে নিশ্চিত থাক পরশুদিন কেউ আসবে না।

কী ব্যবস্থা তুমি করবে সেটা না জানলে আমি নিশ্চিত হতে পারব না। আমি ঘুমুতে পারব না।

আমার চেনা একজন মানুষ আছে। তাকে জানালেই আর কোনো সমস্যা হবে না।

উনি কি ভয়ঙ্কর কোনো মানুষ?

মোটেই না। আমুদে একজন মানুষ। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর ক্ষমতা।

এরকম মানুষকে তুমি চেন কীভাবে?

বেঁচে থাকার জন্যে অনেক মানুষকে চিনতে হয়। অনেক কুৎসিত কাণ্ডকারখানা করতে হয়।

বেঁচে থাকাটা কি এতই জরুরি?

মিতু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে থাকা খুব জরুরি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় মোটেই জরুরি না।

কখন তোমার কাছে মনে হয় বেঁচে থাকটা জরুরি?

ঘুম পাচ্ছে— শুয়ে পড়।

না বল— কখন তোমার কাছে মনে হয় বেঁচে থাকাটা জরুরি?

মিতু নিচু গলায় বলল, মাঝে মাঝে শুটিং শেষ হবার পর— অনেক রাতে বাসায় ফিরি। পথে মনে হয় তুই আমার জন্যে বারান্দায় চুপচাপ বসে আছিস। পথে কোনো রিকশা দেখলেই চট করে উঠে দাঁড়াচ্ছিস, তখন বেঁচে থাকাটা খুব জরুরি মনে হয়। মাঝে মাঝে শেষ রাতের দিকে হঠাৎ মনে হয় মা আমার কপালে হাত রেখে দোয়া পড়ছেন, তখন বেঁচে থাকাটা জরুরি মনে হয়। শুধু জরুরি না, অসম্ভব জরুরি মনে হয়।

তুমি আসল কথাটা কিন্তু আপা বল নি। আসল কথাটা এড়িয়ে গেছ।

আসল কথাটা কী?

আমরা কিছু না— মবিন ভাইয়ের কথা তোমার যখনই মনে হয় তখনি বেঁচে থাকাটা তোমার কাছে খুব জরুরি মনে হয়। ঠিক বলেছি না আপা?

হয়তো ঠিক বলেছিস।

হয়তো না— আমি জানি এটাই আসল সত্য, বাকি সব নকল সত্য।

বয়সের তুলনায় তুই বেশি বেশি জেনে ফেলছিস। জানা ভালো, তবে বেশি জানা ভালো না।

ঝুমুর বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, খুব দুঃখী মানুষেরও বোধহয় বেঁচে থাকা জরুরি মনে হয় তাই না আপা ?

হয় বোধহয়। নয়তো তারা বেঁচে থাকে কেন ?

সবাই তো আর বেঁচে থাকে না। কেউ কেউ আবার মরেও যায়। বিষ খায়। গলায় দড়ি দিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ে। কেন পড়ে ?

জানি না কেন ?

মবিন ভাইকেও প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলাম— উনি উত্তর দিতে পারেন নি।

তাকে আবার কখন জিজ্ঞেস করেছিস ?

ঐ দিন স্কুল থেকে টিফিন পিরিয়ডে পালিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলাম। তাঁর ঘরে কী সুন্দর একটা শীতলপাটি পাতা! আমার সব সময় মনে হয়েছে তার ঘরটায় একা একা হাত-পা ছড়িয়ে শীতলপাটিতে ঘুমুতে পারলে খুব একটা আরামের ঘুম হবে। সেই জন্যে গিয়েছিলাম। তখন প্রশ্নটা করলাম।

মিতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ঘুমিয়েছিলি ?

হুঁ। মবিন ভাই ঘরের ভেতরে আমাকে রেখে তালা দিয়ে ছাত্র পড়াতে চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা এসে তালা খুললেন। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছ। কী শান্তির ঘুম যে ঘুমিয়েছি!

ও আচ্ছা।

তুমি কি রাগ করলে আপা ?

না।

কিন্তু তোমার গলার স্বর কেমন কঠিন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুমি রাগ করেছ।

পাশের ঘর থেকে শাহেদা ডাকলেন, মিতু, এই মিতু।

মিতু উঠে গেল। ঝুমুর আবার চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ফেলল। চাদর দিয়ে শরীর ঢাকামাত্র আলাদা একটা জগৎ তৈরি হয়ে যায়। সেই জগতে কত কাণ্ড হয়। আধোঘুম জাগরণে ঝুমুর তার রহমস্যময় জগতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এখন সে হয়েছে দারুণ বড়োলোকের এক মেয়ে। ঘর থেকে সে পালিয়ে চলে এসেছে। তাকে খোঁজার জন্যে হুলস্থুল পড়ে গেছে। দু'লাখ টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে, সে অতি সাধারণ একটা জায়গায় লুকিয়ে আছে। একটা দরজির দোকানে। দরজির দোকানের কর্মচারীর নাম শাহেদ। সে রাতে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে এক কোণায় রাজকন্যাদের মতো একটা মেয়ে লুকিয়ে আছে। সে ভয় পেয়ে বলল, কে ?

ঝুমুর বলল, আমি নীলাঞ্জনা (রাজকন্যার নাম নীলাঞ্জনা চৌধুরী)

আপনি এখানে কেন ?

আমি কয়েকদিন লুকিয়ে থাকব। আপনি কি আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না ?

আপনার মতো রূপবতী মেয়েকে আমি কোথায় লুকিয়ে রাখব?

লুকিয়ে রাখতে না চান না রাখবেন, শুধু আজ রাতটা থাকতে দিন, আমি ভোরবেলা চলে যাব।

রাতে কোথায় ঘুমুবেন?

কেন আপনার খাটে ঘুমুব। আপনি একদিকে তাকিয়ে ঘুমুবেন, আমি অন্যদিকে তাকিয়ে ঘুমুব। মাঝখানে একটা বালিশ দিয়ে রাখব যাতে গায়ের সঙ্গে গা লেগে না যায়।

আপনি তো ভয়ঙ্কর কথা বলছেন।

আমি মোটেই ভয়ঙ্কর কথা বলছি না। আমি সহজ স্বাভাবিক কথা বলছি।

ঝুমুর নীলাঞ্জনা চৌধুরীর ভূমিকায় অনেক রাত পর্যন্ত অভিনয় করল। তার ঘুম এল শেষ রাতে। তখন মোরগ ডাকতে শুরু করেছে।

১৩

মাগরিবের নামাযের পর মবিন তার ছাত্রীর বাড়িতে যায়। গরমের দিন বলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে আযান পড়ে। সাতটা থেকে ন'টা— এই দু'ঘণ্টা একনাগাড়ে পড়ায়। মাঝখানে ইন্টারভ্যালের মতো হয়। ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা দু'জন উঠে চলে যান। তখন তার জন্যে চা আসে— লেবু চা। চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা ঢোকেন। পড়াশোনা শুরু হয়। দেয়াল ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা পড়ামাত্র ছাত্রী প্রথমে ঘড়ির দিকে, তারপর তার মা'র দিকে তাকায় — এর অর্থ পড়া শেষ। দু'জন আবার উঠে চলে যায়।

মবিনের মাঝে মাঝে মনে হয় সে রোবটকে পড়াচ্ছে। যা বলছে লাইলী নামের রূপবতী রোবট তার মেমরি সেলে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। পড়ানোয় রোবটের লাভ কতটুকু হচ্ছে তাও ধরা যাচ্ছে না। এ ধরনের ছাত্রী পড়িয়ে আরাম নেই। তাছাড়া সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কোনো কারণে রোবটের মর্যাদা বা সম্মান ক্ষুণ্ন না হয় সেই ভয়।

একবার একটিভ ভয়েস পেসিভ ভয়েস পড়ানোর সময় মবিন একটু ঝুঁকে এসেছে— টেবিলের নিচে তার পা লেগে গেল রোবটের সঙ্গে। রোবট ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল। মুখ তুলে তাকাল মবিনের দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঠোঁট কাঁপতে শুরু করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি প্রচণ্ড এক চিৎকার দেবে। মবিনের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রোবটের মা টেবিলের নিচে কী হয়েছে বুঝতে পারলেন না। তবে মেয়ের মুখভঙ্গি দেখে কিছু আঁচ করলেন। শঙ্কিত গলায় বললেন, কী হয়েছে রে?

লাইলী চোখ নামিয়ে বলল, কিছু না।

হাঁপ ছেড়ে মবিন আবার পড়াতে শুরু করল। একবার তার ইচ্ছে করল একটা কাগজে ইংরেজিতে লেখে Young lady, that was not intentional— লিখে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দেয়। সেই সাহসও হলো না। মেয়েটি যদি কী লেখা হয়েছে না পড়েই প্রেমপত্র লেখা হয়েছে মনে করে চিৎকার দিয়ে ওঠে! চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারলে মবিনের জন্য ভালো হতো। ছাড়া যাচ্ছে না। দু'ঘণ্টা পরিশ্রমে সাত শ' টাকা বেতন প্লাস দু'বেলা খাওয়া ভাবা যায় না।

মবিনের ধারণা ছাত্রীর রোবট ভাব এবং ছাত্রীর মায়ের খবরদারি কিছুদিনের মধ্যেই কমে যাবে। যখন দু'জনই লক্ষ করবে এই মাস্টারের উদ্দেশ্য পড়ানো— টেবিলের পা

দিয়ে পা চেপে ধরা না, প্রেমপত্র লেখা না।

মবিনের ধারণা মিলছে না— দু'মাস হলো সে পড়াচ্ছে, ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা দু'মাস আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। মবিনকে পড়ানোর সময় হাত-পা খুব সাবধানে রাখতে হয়। সারাক্ষণ মনে হয় সে একটা কচ্ছপ হলে মেয়েটিকে পড়ানো সহজ হতো। হাত-পা খোলসের ভেতর ঢুকিয়ে শুধু মাথাটা বের করে ছাত্রী পড়াত।

প্রকৃতি জীব জগতের নানান 'ফরম' নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানুষের জন্যে বর্তমান ফরম বেছে নিয়েছে। মানুষের জন্যে কচ্ছপ ফরমটাও খুব খারাপ ছিল না।

মবিন তার ছাত্রীর বাসার বারান্দায় উঠে কলিংবেলে হাত রাখল। এই আরেক বিরক্তিকর ব্যাপার। এ বাড়িতে কলিংবেল টেপার অনেকক্ষণ পর একজন কেউ এসে দরজা খোলে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় অনন্তকাল পার করে দিচ্ছে।

আজ দেরি হলো না। কলিংবেল টেপামাত্র দরজা খুলে গেল। বুড্ডা মাথা বের করে বলল, আফা পড়ব না।

মবিনের ভুরু কুঞ্চিত হলো। গতকালও রোবট পড়তে আসে নি। কেন আসে নি সেই কারণও দর্শানো হয় নি। রোবটমাতা শুধু বলেছেন— লাইলী আজ পড়বে না। তুমি রাত ন'টার দিকে এসে খেয়ে যেও। মবিন চলে এসেছে। রাত ন'টায় ভাত খাবার জন্যে যায় নি। খাওয়ার জন্যে আবার ফিরে যেতে লজ্জা লাগল। রাতে হোটেলে খেয়ে নিয়েছে। মানুষের অভ্যাস কত দ্রুত বদলায় কাল রাতে সে টের পেয়েছে। হোটেলের খাবার বলতে গেলে কিছুই খেতে পারে নি। যা খেয়েছে তাও হজম হয় নি— পেট নেমে গেছে।

বুড্ডা বলল, আফনেরে বলছে ভাত খাইয়া যাইতে।

তোমার আপা আজো পড়বে না?

জ্বে না।

পড়বে না কেন শরীর খারাপ?

জ্বে।

কী হয়েছে তার?

শইল খারাপ হইছে।

মবিন চলে আসছে। তার মন একটু খারাপ। হোটেলের ভয়ঙ্কর খাবার আজো খেতে হবে। পেট খারাপের ব্যাপারটা মনে হয় স্থায়ী হয়ে যাবে। মবিন গেট পর্যন্ত চলে এসেছে, বুড্ডা ছুটে এসে বলল, আম্মা আফনেরে ডাকে।

রোবটের মা অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন না। মবিনকে আধঘণ্টার মতো বারান্দায় বসে থাকতে হলো। বুড্ডা এসে এক সময় বলল, আফনেরে ভিতরে যাইতে বলছে। মবিন বুড্ডার পেছনে পেছনে ঢুকল। রোবটমাতা বললেন, তুমি কাল খেতে আস নি কেন? লাইলী পড়ুন না পড়ুক তোমার দু'বেলা খাওয়ার কথা, তুমি খাবে।

ওর কী হয়েছে?

গায়ে গোটা গোটা উঠেছে, মনে হয় হাম।

আমি কয়েকদিন আসা বাদ দেব?

বাদ দাও। ও সুস্থ হলে আমি খবর পাঠাব।

জ্বি আচ্ছা। আজ তাহলে যাই ?

এখনি যাবে কেন ? ভাত খাও। ভাত খেয়ে একবারে যাও। ভাত দিতে বলেছি।

মবিনের খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলা সামনে থাকেন না। আজ রইলেন। কাছে এলেন না— দূরে বসে রইলেন। মবিনের অস্বস্তি লাগছে। দীর্ঘদিন একা একা খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে। মহিলাদের কেউ আশপাশে থাকলে অস্বস্তি লাগে। ভদ্রমহিলা অবশ্যি দূরে বসে আছেন। সেটাও অস্বস্তিকর। মাতৃসম মহিলারা খাবার সময় এত দূরে থাকবেন কেন ?

তোমার বাবা-মা কি বেঁচে আছেন ?

জ্বি।

কোথায় থাকেন, দেশে ?

জ্বি।

বাবা কিছু করেন ?

স্কুল টিচার ছিলেন। এখন গ্রামেই থাকেন। সামান্য জমিজমা আছে, না থাকার মতোই।

ভাইবোন ক'জন?

ভাই নেই, চার বোন।

বোনদের সব বিয়ে হয়ে গেছে ?

দু'জনের হয়েছে।

ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্যে রাগ করছ না তো ?

জ্বি না।

আমার কাজের ছেলেটা বলছিল তোমার ঘরে সুন্দরমতো একটা মেয়েকে দেখেছে। মেয়েটা কে ?

ওর নাম মিতু। ওর বড় ভাই আমার সঙ্গে পড়ত।

যে ভাই খুনের জন্যে জেল খাটছে ?

মবিন বিরক্ত হলো— মহিলা সব জেনেশুনেই জিজ্ঞেস করছেন মেয়েটা কে ? এতসব প্রশ্নের দরকারই বা কি ?

সে দরিদ্র প্রাইভেট মাস্টার। পড়াতে এসেছে, পড়িয়ে চলে যাবে। ব্যাস।

ঐ মেয়ে কি তোমার কাছে প্রায়ই আসে ?

জ্বি।

মেয়েটা কী করে।

সিনেমার ছোটখাটো রোল করে।

এতেই ওদের সংসার চলে ?

চলে আর কোথায় ? কোনোমতে জীবন ধারণ করা।

তিনজনের সংসার, বাড়ি ভাড়া, বোনের স্কুলের খরচ সব মেয়ের সামান্য রোজগারে চলে ?

চালাতে হয়।

আমি মেয়েটার নামে অনেক আজেবাজে কথা শুনি। দামি দামি গাড়ি নাকি মাঝেমধ্যে নামিয়ে দিয়ে যায়।

মবিনের খাওয়া হয়ে গেছে। সে হাত ধোয়ার জন্যে উঠল। ভদ্রমহিলা নিজেও উঠে দাঁড়ালেন। উপদেশ দিচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, এ জাতীয় মেয়েদের সাথে সম্পর্ক না রাখাই ভালো।

মবিন কঠিন কিছু কথা বলতে গিয়েও বলল না। কী হবে কঠিন কথা বলে ?

আমি তাহলে যাই ?

বোস। আরেকটু বোস। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। খুব জরুরি।

মবিন বিস্মিত হলো। তার সঙ্গে এই মহিলার কী জরুরি কথা থাকতে পারে ? টেবিলের নিচে একবার তাঁর রোবটকন্যার পায়ের সঙ্গে তার পা লেগে গিয়েছিল— এই খবরটা কি মেয়ে তার মা'কে জানিয়েছে ?

এই ঘরে না, পাশের ঘরে আস। এই ঘরে লাইলীর বাবার কাছে বাইরের লোকজন আসে।

মবিন পাশের ঘরে গেল। এটা মনে হচ্ছে গেস্টরুম। সুন্দর করে সাজানো। আলনা খালি দেখে মনে হয় কেউ থাকে না। বোস, তুমি চেয়ারটায় বোস। মবিন অস্বস্তির সঙ্গে বসল। ভদ্রমহিলা দরজা ভিজিয়ে দিয়ে মবিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গলার স্বর নিচু করে বললেন, কাজের ছেলেটা যে দুপুরে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে যায়— লাইলী কি ঐ ছেলের হাতে তোমাকে কোনো চিঠি পাঠিয়েছে ?

মবিন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা বিষণ্ন গলায় বললেন, সত্যি কথা বল। আমি খুব অশান্তিতে আছি।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ও শুধু শুধু আমাকে চিঠি লিখবে কেন ?

লেখে নাই তাহলে ?

জ্বি না।

আচ্ছা তুমি যাও।

সমস্যাটা কী হয়েছে আপনি কি বলবেন ?

না, সমস্যা কিছু না।

আমার কারণে কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে আমাকে বলে দিন।

বললাম তো কোনো সমস্যা হয় নি।

আপনার যদি মনে হয় লাইলীকে পড়াতে না এলে ভালো হয়— তাহলে আমি কাল থেকে আসব না।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা তাহলে তুমি বরং এস না।

জ্বি আচ্ছা।

আমি শুনেছি তুমি চাকরি খুঁজছ, পাচ্ছ না। আমি লাইলীর বাবাকে বলে দেব যদি কিছু করতে পারে। ওর তো অনেক জানাশোনা।

তার কোনো দরকার নেই। আমি তাহলে যাই ?

দাঁড়াও একটু, তোমার বেতনটা দিয়ে দিই।

মবিন বেতনের অপেক্ষায় বসে রইল। মাস এখনো শেষ হয় নি। দশদিন বাকি। মবিনকে তিনি খামে করে পুরো সাত শ টাকা দিয়ে গেলেন। মবিনের এত খারাপ লাগছে বলার নয়। তার ইচ্ছা করছে টাকাটা রেখে চলে আসতে। সেটা বড় ধরনের অভদ্রতা হয়। সেই অভদ্রতা করার অধিকার তার নেই। তারচেয়ে বড় কথা— সাত শ টাকা তুচ্ছ করার মতো মনের জোরও তার নাই। সাত শ টাকা অনেক টাকা।

সন্ধ্যাবেলা এখন আর তার কিছু করার নেই। একটা টিউশানি ছেড়ে দিয়ে এইটা নিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে একূল ওকূল দু'কূলই গেছে।

চিঠির ব্যাপারটাও বেশ রহস্যময়। এই মেয়ে তাকে চিঠি লিখবে এ জাতীয় উদ্ভট চিন্তা ভদ্রমহিলা কেন করছেন? এতটা সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হলে চলবে কীভাবে?

মবিনের নিজের কুঠুরিতে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী হবে সেখানে গিয়ে? শীতলপাটির বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবে? বালিশের নিচে রাখা মা'র চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়বে?

বাবা মবিন,

আমার দোয়া নিও। দীর্ঘদিন তোমার পত্রাদি পাইতেছি না। তোমার বাবার চোখের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে। ডাক্তার দেখাইয়াছি। তাহার অভিমত অতি সত্ত্বর ঢাকা নিয়া চিকিৎসা না করাইলে চক্ষু নষ্ট হইবে। এখন তোমার বিবেচনা।

তুমি সংসারের হাল অবস্থা জান। জানিবার পরও তোমার কোনো পরিবর্তন নাই। ইহাতে আমি এবং তোমার বাবা দু'জনই মর্মাহত। গত মাসে মাত্র পাঁচ শ টাকা পাঠাইয়াছ। অথচ তুমি জান জোছনার সন্তান হইবে। সে এই কারণে বাবা-মা'র কাছে আসিয়াছে। আমি কোন মুখে জামাইয়ের নিকট হাত পাতিয়া আমার মেয়ের সন্তান.প্রসবের খরচ নেই?

তোমার কারণে জামাইয়ের কাছে মাথা হেঁট হইয়াছে। যাহা হউক শুনিয়া খুশি হইবে জোছনার পুত্র সন্তান হইয়াছে। জামাই অত্যন্ত খুশি হইয়াছে। নাতির মুখ দেখিয়া আমি কিছু দিতে পারি নাই। এই লজ্জা রাখিবার আমার জায়গা নাই। তুমি অতি অবশ্যই একটি সোনার চেইন খরিদ করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে।

আল্লাহপাকের দরবারে সর্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করি। দোয়াগো —

তোমার মা।

মবিন রাত আটটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় হাঁটল। তারপর রওনা হলো মিতুদের বাড়ির দিকে।

তার মন বেশি রকম খারাপ হয়েছে। মিতুকে না দেখলে মন ভালো হবে না।

মিতু বাসায় ছিল না।

ঝুমুর হাসিমুখে বলল, আপা রাতে ফিরবে না। আপার সঙ্গে দেখা করতে হলে

সারারাত থাকতে হবে। আপা ভোর রাতের দিকে চলে আসবে। ভালোই হয়েছে, আসুন আমরা সারারাত গল্প করে কাটিয়ে দেই। আপনার কি শরীর টরীর খারাপ করেছে মবিন ভাই ? কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে !

চা খাওয়াতে পারবে ?

অবশ্যই পারব। চিনি এবং চা পাতা ছাড়া চা বানাতে হবে। দু'টাই নাই।

তুমি পানি গরম করতে দাও, আমি নিয়ে আসছি।

আপনি কি জানেন মবিন ভাই দু'দিন আগে যে রাতদুপুরে আপনার খোঁজে গিয়েছিলাম ?

জানি না তো।

তা জানবেন কেন ? আপনি কি আমাদের খোঁজ নেন ? খোঁজ নেন না। আমরাই যখন তখন আপনার কাছে ছুটে যাই। মা'র শরীর হঠাৎ খুব খারাপ করেছিল। তখন আপনাকে আনতে গিয়েছিলাম।

কী হয়েছিল ?

সে এক লম্বা গল্প, আপনার শুনতে অনেক সময় লাগবে। চা পাতা আর চিনি নিয়ে আসুন, তারপর আপনাকে বলব। আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে মবিন ভাই ?

না।

খুব ভালো হয়েছে, রাতে আমার সঙ্গে খাবেন। আমি আপনাকে রান্না করে খাওয়াব। ঘরে অবশ্য রান্নারও কিছু নেই। আপনাকে ডিমও কিনে আনতে হবে।

আর কিছু লাগবে ?

না আর কিছু লাগবে না। আপনি কিন্তু বেশি দেরি করতে পারবেন না— যাবেন আর আসবেন।

আচ্ছা।

চলুন রাস্তা পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিই। আপনাকে একটা গোপন খবর বলি মবিন ভাই। কাউকে কিন্তু বলবেন না। আপা যদি জানে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

খবরটা কী ?

গতকাল থেকে আমাদের টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছে। আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না। পরীক্ষা দিয়ে তো গোল্লাই খাব। কী দরকার সেধে গোল্লা খাবার ?

ঝুমুর খিলখিল করে হাসছে। ঝুমুরের হাসিও মিতুর মতো। হাসলে ঝনঝন শব্দ হয়। মবিনের হাসি শুনতে ভালো লাগছে।

১৪

জয়দেবপুর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে মোবারক সাহেবের একটা কুঁড়েঘর আছে। লোকে বাসাবাড়ি তৈরি করে; তিনি কুঁড়েঘর বানিয়েছেন। আক্ষরিক অর্থেই কুঁড়েঘর। তিন একর জমি নিয়ে ছোট্ট মাটির ঘর। খড়ের ছাদ।

আধুনিক কুঁড়েঘরের এক ফ্যাশন ইদানীং চালু হয়েছে। মাটির দেয়াল, খড়ের ছাদের ভেতর থাকে কার্পেট। এয়ারকুলার বিজবিজ করে চলে। বাথরুম হয় মার্বেল পাথরের। কুঁড়ে ঘর নিয়ে এক ধরনের রসিকতা।

মোবারক সাহেব তা করেন নি। তার ঘরে বড় একটা চৌকি পাতা। চৌকির উপর হোগলার পাটি— মাথার নিচে দেয়ার জন্যে শক্ত বালিশ। এ বাড়িতে কোনো টেলিফোন নেই। তিনি ইলেকট্রিসিটিও আনেন নি। সন্ধ্যার পর হারিকেন জ্বলে।

দর্শনীয় কোনো বাগানও করা হয় নি। কেনার সময় গাছগাছড়া যা ছিল এখনো তাই আছে। তিনি শুধু তাঁর জমিটা কংক্রিটের পিলার এবং শক্ত কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আলাদা করেছেন। বাড়ির গেটে পাহারাদার আছে।

বছরে দু'একবার শুধু রাত কাটাতে আসেন। রাত ন'টা-দশটার দিকে এসে ভোরবেলা চলে যান। একাই আসেন। পাহারাদার দু'জন গেটে তালা দিয়ে চলে যায়।

আজ একা আসেন নি। মিতুকে সঙ্গে এনেছেন। পাজেরো জিপ তাদের নামিয়ে চলে গেছে। মোবারক সাহেব গেটের দারোয়ান দু'জনকেও চলে যেতে বলেছেন। তারা এখনো যায় নি। মোবারক সাহেবের মালপত্র ঘরে ঢুকিয়ে গেটে তালা দিয়ে তারা যাবে। রাতটা থাকবে জয়দেবপুরে। ভোরবেলা এসে গেটের তালা খুলবে।

মিতু হকচকিয়ে গেছে। তার চারদিকে ঘোর অন্ধকার। জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। আলো বলতে জোনাকি পোকার আলো।

মোবারক সাহেব হালকা গলায় বললেন, ভয় লাগছে?

মিতু বলল, না। ভয় লাগার কিছু আছে কি?

সাপ আছে। বর্ষাকাল তো— খুব সাপের উপদ্রব।

মোবারক সাহেবের হাতে ছোট একটা পেনসিল টর্চ। টর্চ ছোট হলেও আলো তীব্র। তিনি আলো ফেললেন। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা। জায়গায় জায়গায় পানি জমে আছে। সেখানে ইট বিছানো। মোবারক সাহেব টর্চ নিভিয়ে ফেললেন— ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল।

দারোয়ান দু'জন জিসিনপত্র রেখে চলে এসেছে। কুঁড়েঘরে আলো জ্বেলে এসেছে। জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে।

মোবারক সাহেব টর্চটা মিতুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তুমি চলে যাও। আমি ওদের বিদেয় করে আসছি। মোবারক সাহেব ভেবেছিলেন মিতু বলবে— আমার একা যেতে ভয় লাগছে। আমি অপেক্ষা করি। দু'জন একসঙ্গে যাব। মিতু তেমন কিছু বলল না। টর্চ হাতে এগিয়ে গেল।

তিনি দারোয়ানদের বিদেয় করলেন। গেটে তালা দিয়ে চাবি নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সিগারেট আছে কিনা। সিগারেট আছে। কয়েকদিন হলো সিগারেট বেশি খাওয়া হচ্ছে। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। আকাশ মেঘলা বলে তারার আলো নেই। চাঁদ উঠবে রাত তিনটার দিকে। কাজেই রাত তিনটা পর্যন্ত এমন ঘন অন্ধকার থাকবে। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে না। এই অঞ্চলের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক বিখ্যাত। এরা ডাকা বন্ধ করেছে এর অর্থ হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হবে। বৃষ্টি শুরুর আগে আগে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাক বন্ধ করে দেয়। জোনাকি পোকারাও তাদের আলো নিভিয়ে ফেলে। জোনাকি পোকারা অবশ্যি তাদের আলো এখনো নিভায় নি। কাজেই বৃষ্টি শুরু হতে একটু দেরি আছে। এইসব তথ্য তিনি তাঁর কুঁড়েঘরে রাত্রি যাপন করে শিখেছেন।

তাঁর শেখার ক্ষমতা ভালো। তিনি দ্রুত শিখতে পারেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তিও ভালো। লেখালেখির ক্ষমতা থাকলে তিনি ভালো লেখক হতে পারতেন।

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। তবু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়েটি ঘরের ভেতর কী করছে কে জানে। তার কি উচিত না উদ্বিগ্ন হয়ে একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ানো ? মেয়েটি তাঁকে পছন্দ করছে না। কিন্তু একদিন করবে। অবশ্যই করবে। মেয়েটির শরীর তিনি কিনে নিয়েছেন। আত্মা শরীরেই বাস করে। একদিন সেই আত্মাও তিনি কিনতে পারবেন। বেঁচে থাকার জন্যে একটি শুদ্ধ ও সুন্দর আত্মার তাঁর খুব প্রয়োজন।

তিনি আকাশের দিকে তাকালেন— তারা দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি নামবে। আজ রাতে কোনো এক সময় ঘনবর্ষণ হবে। ঠিক কখন হবে তা বলা যাচ্ছে না। মানুষকে সেই ক্ষমতা দেয়া হয় নি। সেই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে মানুষের চেয়ে অনেক নিম্নশ্রেণীর পশুপাখিকে, কীটপতঙ্গকে। গাছদের কি দেয়া হয়েছে ? অবশ্যই দেয়া হয়েছে। তাঁর ধারণা, প্রতিটি গাছ জানে কখন বৃষ্টি হবে। তাঁর এই বাগানবাড়ির প্রতিটি গাছ অপেক্ষা করছে...।

সরসর শব্দ করে তাঁর ডান দিকের ঝোপে কী যেন চলে গেল। সাপ হতে পারে। বৃষ্টির আগে আগে তারা জায়গা বদল করে নিচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে যখন সাপের গর্ত ভর্তি হয়ে যায় তখন তারা কী করে ? তারা নিশ্চয়ই বৃষ্টির পানিতে ডুবে বসে থাকে না ?

মোবারক সাহেব ঘরের দিকে এগোলেন। টর্চলাইটটা হাতে থাকলে হতো। অন্ধকারে কোথায় পা ফেলতে কোথায় ফেলছেন কে জানে। এক জায়গায় পানি জমে ছিল। তিনি পানিতে পা ফেলে পায়ের পাতা ভিজিয়ে ফেললেন।

কুঁড়েঘরের বারান্দায় বড়ো বালতি ভর্তি পানি। পানির উপর মগ ভাসছে। একপাশে সাবানদানিতে সাবান। তিনি উঠানে উঠে সহজ স্বরে ডাকলেন, মিতু হারিকেন নিয়ে এস তো।

মিতু হারিকেন হাতে পাশে এসে দাঁড়াল।

মগে করে আমার পায়ে পানি ঢাল। কাদায় পা দিয়ে ফেলেছি।

মিতু পানি ঢালছে। মোবারক সাহেব বললেন, আমার বাগানবাড়ি পছন্দ হয়েছে ?

হয়েছে।

মনে হচ্ছে না জায়গাটা পৃথিবীর বাইরে ?

মিতু জবাব দিল না। মোবারক সাহেব বললেন, আমার মাঝে মাঝে একা থাকতে ইচ্ছা করে, তখন এখানে আসি।

আজ তো একা আসেন নি।

না, আজ অবশ্যি একা আসি নি। এখানে একা রাত্রি যাপন করতে কেমন লাগে তা আমি জানি। দু'জনে কেমন লাগে তা জানি না। এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে এসেছি। দু'জনে মিলে অন্ধকার দেখব, ইন্টারেস্টিং সব গল্প করব। আমি অসংখ্য অদ্ভুত গল্প জানি। সবচে' বেশি জানি ভূতের গল্প। ভূতের গল্প তোমার কেমন লাগে ?

ভালো লাগে।

মোবারক সাহেবের হাত-মুখ ধোয়া শেষ হয়েছে। তিনি কিছু বলার আগেই মিতু ঘরের ভেতর চলে গেল। তোয়ালে এনে হাতে দিল। তিনি তোয়ালে দিয়ে হাত-পা

মুছলেন।

বারান্দায় কিছুক্ষণ বসা যাক কী বল মিতু।

আপনি যা বলবেন তাই হবে। কোথায় বসব ? চেয়ার তো নেই।

ঘরের ভেতর মাদুর আছে। তুমি খুঁজে পাবে না, আমি নিয়ে আসছি।

মোবারক সাহেব নিজেই মাদুর এনে বিছিয়ে দিলেন। শান্ত স্বরে বললেন, পুরোপুরি অন্ধকার হলে ভালো লাগত। কিন্তু আলো কিছু রাখতেই হবে— নয়তো সাপ উঠে আসবে। একবার কী হয়েছে শোন— একা একা বারান্দায় বসে আছি। চারদিক অন্ধকার, ঘরের বাতিও নেভানো। পা মেলে বসে অন্ধকার দেখছি। হঠাৎ ভারি কী যেন পায়ের উপর উঠে গেল। পায়ে যে সাপ উঠে গেছে সেটা বুঝতে বুঝতে সাপ নেমে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, কিন্তু মনে হয় অনন্তকাল। তুমি বোস, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

মিতু বসল। মোবারক সাহেব বললেন, আরাম করে বোস।

আমি আরাম করেই বসেছি।

তুমি গান জান ?

জ্বি না।

ভালো টিচার রেখে গান শেখার ব্যবস্থা করে দেব। তোমার গলা ভালো। গান ভালোই গাইবে। তাছাড়া নাচ-গান এইসব ভালোমতো জানা তোমার নিজের স্বার্থেই দরকার। ছবির জগতের প্রধান নায়িকা নাচ-গান না জানলে চলে ? আমি যে একটা ছবি বানাচ্ছি সেটা কি তুমি জান ?

জ্বি শুনেছি।

সেই ছবির তুমিই প্রধান নায়িকা এটা শুনেছ ?

আঁচ করতে পারছি।

তোমার ভালো লাগছে না ?

চারদিকের বিপুল গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মিতু বলল, ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে।

১৫

প্রায় এক ঘণ্টার মতো হলো মবিন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে। চিঠি যখন পড়েছে তখন ঘরে দিনের আলো ছিল। এখন অন্ধকার। মবিন আলো জ্বালে নি। অন্ধকার ঘরেই বসে আছে। তার চারদিকে পিনপিন করছে মশা। মশা তাড়াবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটাও হচ্ছে না।

অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সিলেটের চা বাগানের এক ব্রিটিশ মালিক খোদ ইংল্যান্ড থেকে জানাচ্ছেন— তাকে লাক্কা টি গার্ডেনের ম্যানেজারের নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। এক বছরের ট্রেনিং পিরিয়ডের পর চাকরি স্থায়ী হবে। ট্রেনিং পর্ব দুভাগে বিভক্ত। প্রথম চার মাস ট্রেনিং হবে শ্রীলঙ্কার 'ইয়ালো বিং টি গার্ডেনে'। পরের আট মাস ইংল্যান্ডে।

ট্রেনিং পিরিয়ডের ভাতা উল্লেখ করা আছে। অঙ্কটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। পোশাক পরিচ্ছদ এবং প্যাসেজ মানির জন্যে চেস ম্যানহাটন ব্যাংকের ইস্যু করা

একটি ব্যাংক ড্রাফট চিঠির সঙ্গে আছে। পাউন্ড স্টারলিঙে যে অঙ্ক সেখানে বসানো তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

চা বাগানের চাকরির চেষ্টা সে করেছিল। ইন্টারভ্যু দিতে চিটাগাং পর্যন্ত গিয়েছিল। যাওয়া-আসার ভাড়া মিতু দিয়েছিল। সেই চাকুরি ছোট একটা চাকুরি। অন্য চা বাগান। এই যোগাযোগ কী করে হলো মবিন বুঝতে পারছে না। ইন্টারভ্যু বোর্ডের কেউ কি তার জন্যে সুপারিশ করেছেন? রহস্যটা কি?

মবিনের হতভম্ব ভাব কিছুতেই কাটছে না। চেস ম্যানহাটন ব্যাংকের ড্রাফট্‌টা সঙ্গে না থাকলে ভাবত কেউ রসিকতা করছে। মানুষ নির্মম রসিকতা মাঝে মধ্যে করে।

এখন সে কী করবে? আনন্দ প্রকাশের জন্যে কিছু একটা করা উচিত। কাকে খবরটা প্রথম দেয়া যায়? মিতুকে তো বটেই। যদিও তার ইচ্ছা হচ্ছে একটা মাইক ভাড়া করে গাজীপুর শহরে রিকশায় ঘুরে ঘুরে খবরটা বলে বেড়ায়।

এ রকম একটা খবর মিতুকে খালি হাতে জানানো যাবে না। এক লাখ গোলাপ কিনতে পারলে এক লাখ গোলাপ নিয়ে মিতুর কাছে যাওয়া যেত। কত দাম এক লাখ গোলাপের?

মিতু খবরটা শুনে কী করবে? কী করবে মবিন আন্দাজ করতে পারে। চট করে উঠে দাঁড়াবে, তারপর ছুটে সামনে থেকে চলে যাবে। কাঁদার জন্যে যাবে। মিতু তার সামনে কাঁদতে পারে না। অনেকক্ষণ পর সে ফিরে আসবে। খুব স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারবে না। মিতুর ধারণা অভিনেত্রী হিসেবে সে খুব বড়ো। আসলে বড়ো না। আসলে সে কাঁচা অভিনেত্রী। আবেগ লুকাতে পারে না।

না মিতুকে খবরটা এভাবে দেয়া যাবে না। মজা করে দিতে হবে। মুখ শুকনো করে তার কাছে যেতে হবে। বেশ রাত করে। মিতু উদ্বিগ্ন হয়ে বলবে, কী ব্যাপার এত রাতে? তখন সে বলবে, ঘরে কোনো খাবার আছে মিতু? সারাদিন খাই নি। হাত একেবারে খালি। লজ্জায় আসতেও পারছিলাম না। এটা শুনে মিতুর মুখ ছাইবর্ণ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পানি এসে যাবে এবং সে দৌড়ে সামনে থেকে চলে যাবে। আধঘণ্টা পর এসে বলবে, এস খেতে এস। এমনভাবে বলবে যেন কিছুই হয় নি।

মা'কে একটা চিঠি লিখতে হবে। আজ রাতেই চিঠি লিখতে হবে।

মা,

আমার সালাম নিও।

তোমার চিঠি পেয়েছি। নানান ঝামেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরি হলো। জোছনার ছেলে হয়েছে শুনে খুব খুশি হয়েছি। ওকে আমার অভিনন্দন দিও। বাবার চোখের খবর শুনে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আমার উচিত নিজে গিয়ে বাবাকে নিয়ে আসা। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। চা বাগানের ম্যানেজারের একটা চাকরি পেয়েছি। প্রাথমিক ট্রেনিঙে আমাকে শ্রীলঙ্কা এবং পরে ইংল্যান্ডে যেতে হবে। ভিসা এবং অন্যান্য ব্যাপারে খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে। যাই হোক, আমি টাকা পাঠাচ্ছি। তুমি বাবাকে নিয়ে চলে এস। আমি এখানে ভালো একটা হোটেল ব্যবস্থা করে রাখব। তোমরা ঢাকায়

আসার পর বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটির কাজগুলো মিতু করবে। মিতু হচ্ছে রফিকের বোন। ঐ যে একবার রফিককে নিয়ে এসেছিলাম। বাঁশি বাজিয়ে যে সবাইকে হতভম্ব করে দিয়েছিল।

মিতু খুবই চালাকচতুর মেয়ে। সে তোমাদের কোনো অসুবিধাই হতে দেবে না। আমি যখন দেশের বাইরে থাকব তখনো সে-ই তোমাদের দেখাশোনা এবং খোঁজখবর করবে।

তোমরা কবে নাগাদ আসবে আমাকে টেলিগ্রাম করে জানিও। ভালো কথা, জোছনার ছেলের জন্যে সোনার চেইন, জোছনার জন্যে ভালো একটা শাড়ি কেনার জন্যে আলাদা করে টাকা পাঠালাম। তোমরা ভালো থেক। বাবাকে আমার সালাম দিও ...

ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন ?

মবিন দারুণ চমকে উঠল। মিতু দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে। মবিন উঠল। বাতি জ্বালাল। অদ্ভুত গলায় বলল, ভেতরে এস মিতু।

মিতু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, অন্ধকারে মূর্তির মতো বসে কী করছিলে ?

চিঠি লিখছিলাম ?

চিঠি লিখছিলে মানে ?

মনে মনে লিখছিলাম। মনে মনে চিঠি লিখতে কাগজ, কলম, আলো কিছুই লাগে না। মনে মনে লেখা চিঠিতে কোনো বানান ভুলও হয় না।

কী হয়েছে তোমার বল তো ?

অদ্ভুত একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা রেজিস্ট্রি ডাকে ইংল্যান্ড থেকে এসেছে।

খারাপ কিছু ?

ভয়ঙ্কর খারাপ। নাও পড়।

মিতু চিঠি পড়ছে। মনিব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিতুর দিকে। সে যা ভেবেছে তাই। মিতুর চোখে পানি এসে গেছে। সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, দশ হাজার পাউন্ড স্ট্যার্লিং মানে কত টাকা ?

ষাট দিয়ে গুণ দাও। গুণ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।

তোমার হাতে তো একদম সময় নেই।

মবিন উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ছোটাছুটি করতে করতে জান বের হয়ে যাবে। শোন তোমাকে আগেভাগে বলে রাখছি, যাবতীয় ছোটাছুটিতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। সিনেমা টিনেমা বাদ দাও। তুমি অনেক কষ্ট করেছ। আর কষ্ট করতে হবে না।

আর কষ্ট করতে হবে না ?

অবশ্যই না। আজ এই মুহূর্ত থেকে তোমার যাবতীয় কষ্টের অবসান হলো, ঝুমুরকে নিয়ে বা তোমার মা'কে নিয়েও তোমার চিন্তা করতে হবে না।

সব চিন্তা তোমার ?

অবশ্যই। বিয়ের ব্যাপারটা এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে ফেলব। বাবা চোখ দেখানোর জন্যে ঢাকা আসবেন, মাও আসবেন। ঝুমুর আছে, তোমার মা আছেন— আমরা আমরাই, বাইরের কাউকে বলার কোনো দরকার নেই। বাইরের কেউ তো নেইও। তুমি যদি তোমার ফিল্ম লাইনের কাউকে বলতে চাও বলবে।

টেপীকে বলব ?

মিতু এমনভাবে প্রশ্ন করল যে মবিন চমকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। মিতু হাসল। সহজভাবেই হাসল। সেই হাসিতেও কিছু একটা ছিল। মবিন চোখ ফেরাতে পারল না। মিতু বলল, তোমার জন্যে সিগারেট এনেছি। নাও।

মবিন হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতে নিতে অস্পষ্ট গলায় বলল, মিতু তুমি হঠাৎ করে টেপীর কথা তুললে কেন ?

মিতু শান্ত স্বরে বলল, তোমার এত বুদ্ধি। তারপরেও একটা সাধারণ ব্যাপার ধরতে তোমার এত সময় লাগল কেন ?

মবিন সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে। তার চোখ-মুখ ফ্যাকাসে। মিতু বলল, আমার ধারণা টেপীকে তুমি অনেক আগেই ধরেছ। তারপরেও না ধরার ভান করে গেছ। নিজের সঙ্গে ভান। নিজেকে প্রতারণা। তাই না ?

মবিন কিছু বলল না।

মিতু বলল, এখন বল। আমার দিকে তাকিয়ে বল, এখন কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে ?

পারব।

সত্যি পারবে ?

অবশ্যই পারব।

মিতু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমারও মনে হয় তুমি পারবে। কিন্তু বিয়েটা ভালো হবে না। যতবারই আমাকে জড়িয়ে ধরবে ততবারই মনে হবে— আরো অনেকে এই ভঙ্গিতেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। মনে পড়বে না ?

না।

ছেলেমানুষের মতো কথা বলবে না তো মবিন ভাই। তুমি ছেলেমানুষ না। তুমি এখন চোখ-কান বন্ধ করে আমাকে বিয়ে করবে। তার পেছনে ভালোবাসা অবশ্যই আছে। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাবোধও আছে। আমি তোমার দুঃসময়ে তোমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছি। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ। ঠিক কিনা বল ?

মবিন চুপ করে রইল। তার হাতের সিগারেট নিভে গেল। মিতু হালকা গলায় বলল, দু'জনের জীবন নষ্ট করে তো লাভ নেই। একজনেরটাই নষ্ট হোক। একজন টিকে থাক। তুমি খুব ভালো দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর। তুমি সুখে আছ, আনন্দে আছ— এই দৃশ্য দূর থেকে দেখলেও আমার ভালো লাগবে। একদিন হয়তো তোমার চা বাগানে বেড়াতে যাব। তোমার বাংলোতে বসে তোমার সঙ্গে এককাপ চা খাব। তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে ছবি তুলব। সেই আনন্দও কম কি ?

মিতুর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে বলল, মবিন ভাই তোমার কাছে রুমাল আছে, দাও রুমাল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দাও। আমি এখন চলে যাব।

মবিন সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। হালকা পায়ে নেমে যাচ্ছে মিতু। সে মাথার উপর শাড়ির আঁচল টেনে দিয়েছে। তাকে কেমন বউ বউ লাগছে। চারদিকের বিপুল অন্ধকারে মিশে যাবার জন্যে নেমে যাচ্ছে অপূর্ব একটি মেয়ে। তাকে কি এইভাবে নেমে যেতে দেয়া উচিত ?

মবিন কঠিন গলায় ডাকল, মিতু দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ তুমি ? উঠে এস। উঠে এস বললাম।

মবিন এখন পর্যন্ত কোনোদিন মিতুর হাত ধরে নি। তার খুব লজ্জা লাগে। এই প্রথম লজ্জা ভেঙে সে মিতুর হাত ধরল। আহ্ কী কোমল সেই হাত !



আমার আছে জল

রেল স্টেশনের এত সুন্দর নাম আছে নাকি? "সোহাগী"। এটা আবার কেমন নাম? দিলু বলল, আপা, কী সুন্দর নাম দেখেছ!

নিশাত কিছু বলল না। তার ঠাণ্ডা লেগেছে। সারারাত জানালার পাশে বসে ছিল। খোলা জানালায় খুব হাওয়া এসেছে। এখন মাথা ভারভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নাক দিয়ে জল ঝরতে শুরু করবে। দিলু বলল, আপা, স্টেশনের নামটা পড়ে দেখ না। প্লীজ।

পড়েছি। ভালো নাম।

দিলুর মন খারাপ হয়ে গেল। সে আশা করেছিল নিশাত আপাও তার মতো অবাক হয়ে যাবে। চোখ কপালে তুলে বলবে— ও মা, কেমন নাম! কিন্তু সে আজকাল কিছুতেই অবাক হয় না। কথাবার্তা বলে স্কুলের জিওগ্রাফী আপার মতো। নিশাত বলল, দিলু, দেখ তো বাবু কোথায়? দুধ খাবে বোধহয়।

দিলু বাবুকে কোথাও দেখতে পেল না। এমন দুষ্টু হয়েছে। ওয়েটিং রুমে ঘাপটি মেরে বসে আছে হয়তো। কাছে গেলেই টু দেবে। ধরতে গেলেই আবার ছুটে যাবে।

ওয়েটিং রুমের সামনে একগাদা জিনিসপত্রের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বিরক্ত মুখ। তিনি দিলুকে দেখেই বললেন, একেকজন একেক দিকে চলে গেছে। ব্যাপারটা কী? তোর মা কোথায়?

জানি না তো।

তোর মাকে খুঁজে বের কর।

আমি পারব না বাবা, আমি বাবুকে খুঁজছি।

বাবুকে খুঁজলে তোর মাকে খোঁজা যাবে না— এরকম কথা কোথাও লেখা আছে?

সবাই আজ এরকম করে কথা বলছে কেন? কোথাও বেড়াতে গেলে সবার খুব হাসিখুশি থাকা উচিত। কিন্তু এখানে সবাই কেমন রেগে কথা বলছে। রাগটা তার ওপরই। ট্রেনে মা তিনবার বললেন, দিলু পা নাচাচ্ছ কেন? পা নাচানো একটা অসভ্যতা। চুপ করে বস।

পা নাচানোর মধ্যে আবার সভ্যতা-অসভ্যতা কী! যত আজগুবি কথা।

দিলু।

বল।

তোর মাকে খুঁজে বের কর। আমার পাইপের তামাক রেখেছে কোথায় সে?

আমি কী করে জানব? আমি রাখলে আমি জানতাম। আমি তো রাখি নি।

দিলুর বাবা ওসমান সাহেব রাগী চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওসমান সাহেবের বয়স আটান্ন। কিন্তু দেখায় আরো বেশি। শরীর হঠাৎ করে ভারী হয়ে গেছে। মাথার সমস্ত চুল পাকা। মেজাজের পরিবর্তনও হয়েছে হঠাৎ করেই। এখন আর কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারেন না। তিনি দিলুর ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন। দিলুর বয়স এই মার্চে চৌদ্দ হবে। নাকি পনের? মেয়েদের এই বয়সটা অন্যরকম। এই বয়সে চেনা মেয়েগুলোকেও অচেনা লাগে। মনে হয় অন্য বাড়ির মেয়ে। এদের ওপর কিছুতেই রাগ করা যায় না।

দিলু পরেছে একটা ধবধবে সাদা স্কার্ট। পায়ের মোজা ও জুতা দুই-ই লাল। মাথায় দুটি লম্বা বেণী। শীতের সকালের রোদে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে বড় অচেনা লাগছে। এর ওপর রাগ করা যায় না। ওসমান সাহেব বাক্স-পেটরা হাতড়াতে লাগলেন। পাইপ ধরানোর ইচ্ছা হচ্ছে। অনিয়ম করা যায়। ছুটি হচ্ছে অনিয়মের জন্যে।

দিলু ওয়েটিং রুমে কাউকে দেখল না। তবে ওয়েটিং রুমের বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কেউ আছে নিশ্চয়ই। মা বোধহয় বাবুকে বাথরুম করাচ্ছেন। দিলু ডাকল— বাথরুমে কে ? জল পড়ার শব্দ থেমে গেল। দিলু আবার বলল, বাবু তুমি ? কোনো সাড়া নেই। তার মানে মা। মা একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাথরুম থেকে কথা বলবেন না।

দিলু যদি বলে— মা, গায়ে মাখার সাবানটা আছে ? মা জবাব দেবেন না। বাথরুম থেকে কথা বলা নাকি অসভ্যতা। এর মধ্যে অসভ্যতার কী আছে ?

খুট করে দরজা খুলল। দিলু দেখল ভেজা মুখে জামিল ভাই বের হয়ে আসছেন।

কী-রে দিলু ইমার্জেন্সি নাকি। যা ঢুকে পড়।

ছি, কী অসভ্যতা! জামিল ভাইয়ের একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। মেয়েদের কেউ বাথরুমে যাবার কথা ওভাবে বলে নাকি ? সে যে বড় হচ্ছে এটা কি জামিল ভাইয়ের চোখে পড়ে না। এখন শাড়ি পরলে অনেকেই তাকে 'আপনি' করে বলে। জামিল ভাই বোধহয় তাকে কখনো শাড়ি পরা দেখে নি।

জামিল ভাই, বাবুকে দেখেছেন ?

না।

মা-কে দেখেছেন ?

না। কেন ?

আপা খুঁজছে বাবুকে। বাবা খুঁজছে মা-কে।

ওরা মনে হয় স্টেশনের বাইরে হাঁটতে গেছে। চল যাই খুঁজে নিয়ে আসি। তোকে তো দারুণ লাগছেরে দিলু। ট্রেনে কি এই ড্রেসেই ছিলি নাকি ?

হুঁ।

মাই গড! তখন তো চোখেই পড়ে নি।

জামিল দেখল দিলু খুব লজ্জা পাচ্ছে। এর কারণ সে ঠিক বুঝতে পারল না। মেয়েটি কি বড় হয়ে যাচ্ছে নাকি ?

'দেখতে দারুণ লাগছে'— এই কথায় কানটান লাল করার মানেটা কী ? জামিল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

দিলু, তুই যেন কোন ক্লাসে এবার ?

ক্লাস নাইনে। ইস আপনি যেন জানেন না!

কোন্ গ্রুপ, সায়েন্স না আর্টস ?

সায়েন্স।

বাপরে বাপ, সায়েন্স! ইলেকটিভ অংকে গোল্লা খাবি তো।

কেন, গোল্লা খাব কেন ?

মেয়েরা অংক-মানসাংক এসব জানে নাকি ?

জামিল পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিরুনি বের করে বাথরুমের আয়নায় চুল আঁচড়াতে গেল। দরজা পর্যন্ত বন্ধ করল না। কী বাজে অভ্যাস। দিলু শুনল চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জামিল ভাই গুনগুন করে গান গাচ্ছে— আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফোটে, এত পাখি গায়।

এই শীতে বসন্তের গান ? দিলু বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখল। সুরেরও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। বাথরুমে ঢুকলেই গান গাইতে হবে এমন কোনো কথা আছে ?

চল দিলু, দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা।

ওসমান সাহেব একটা কালো ট্রাঙ্কের ওপর বসে আছেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব এখন আর নেই। পাইপের তামাক পাওয়া গেছে। পাইপ তৈরি করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন ধরাতে পারছেন না। জামিলদের বেরুতে দেখে হাসিমুখে বললেন, জামিল, আমাকে এখানে বসিয়ে একেকজন একেক দিকে কেটে পড়েছে, ব্যাপারটা কী বল তো ?

সম্ভবত ছুটির দিনে আপনাকে কেউ ভয়-টয় পায় না। আপনাকে নিরীহ মনে করে।

ওসমান সাহেব শব্দ করে হাসলেন। এত শব্দে তিনি কখনো হাসেন না। দিলুও হাসল। কাউকে হাসতে দেখলেই দিলুর হাসি পায়। ওসমান সাহেব বললেন, কী রকম মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে দেখলে ? স্টেশনে জীপ নিয়ে থাকার কথা। জীপ তো নেই-ই, একজন মানুষ পর্যন্ত নেই।

এসে পড়বে।

কিছু মুখে দেয়া দরকার। এত বেলা হয়েছে, সবার ক্ষিধে পেয়েছে।

বেলা কিন্তু চাচা বেশি হয় নি, মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। সকাল হয়েছে মাত্র।

তাই নাকি! ওসমান সাহেব বেশ অবাক হলেন।

জামিল বলল, আমি দেখি চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ঐখানে একটা চায়ের দোকান আছে।

ঐ চা কি মুখে দেয়া যাবে ?

চেষ্টা করতে দোষ কী। লেট আস ট্রাই।

ওসমান সাহেব আবার শব্দ করে হাসলেন। তাঁর মেজাজ সম্ভবত ভালো হতে শুরু করেছে। দিলু হাসল। এখন বেশ পিকনিক পিকনিক লাগছে।

২

নিশাত একটা কাঠের বেঞ্চিতে লাল চাদর গায়ে দিয়ে বসে ছিল। রোদ পড়েছে তার মুখে। শীতের বাতাসে তার কপালে ছোট ছোট কিছু চুল নাচছে। সে বসে আছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে। তার ফর্সা গালে লাল চাদরের আভা পড়েছে। দিলু ফিসফিস করে বলল, আপা কত সুন্দর দেখেছেন ?

হ্যাঁ, দেখলাম।

আপাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই ?

ডাক। ডাকলেই হয়।

দিলু ডাকল— আপা, এই আপা। নিশাথ ওদের দুজনকে দেখল। কিছু বলল না। মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুখ ঘুরিয়ে নেবার ভঙ্গিটি— রাগী ভঙ্গি। সে এমন রেগে আছে কেন?

আপা, আমাদের সঙ্গে যাবে? আমরা স্টেশনের বাইরে হাঁটতে যাচ্ছি।

না, বাবু কোথায়?

বাবু মা'র সঙ্গে। ওদেরই খুঁজতে যাচ্ছি। তুমিও চল।

না, আমি যাব না।

চল না আপা।

এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। তোরা যা।

দিলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আপা মাঝে মাঝে এমন কড়া করে কথা বলে। এত সুন্দর একটি মেয়ে এরকম করে কথা বলবে কেন? দিলু হাঁটতে শুরু করল।

জামিল ভাই, এগুলো কী গাছ?

জানি না কী গাছ।

কৃষ্ণচূড়া নাকি?

না, কৃষ্ণচূড়া না। কৃষ্ণচূড়ার পাতা তেঁতুল গাছের পাতার মতো। এগুলো খুব সম্ভব জারুল। কচুরিপানার মতো ফুল হয় এদের। নীল রঙের। খুব সুন্দর।

এই স্টেশনের নামটা কত সুন্দর দেখেছেন?

নামটার একটা গল্প আছে, জান?

কী গল্প?

এখানে এক রাজা ছিলেন। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ের নাম সোহাগী। রাজ্যে পানির খুব কষ্ট। রাজা ঠিক করলেন এমন এক পুকুর কাটবেন যে, রাজ্যে পানির কষ্ট থাকবে না। তিনি সত্যি প্রকাণ্ড এক পুকুর কাটালেন। কিন্তু আশ্চর্য, একফোঁটা পানি নেই। সে বছর খুব খরা। রাজ্যের লোক হাহাকার করছে। রাজা শুকনো মুখে পুকুর পাড়ে বসে আছেন, তখন শুনলেন কে যেন বলছে— রাজন, তোমার কন্যাকে পানিতে নামিয়ে দাও, জল আসবে। রাজা সোহাগীকে নামিয়ে দিলেন এবং বললেন— কোনো ভয় নেই মা, জল আসতে শুরু করলেই তোমাকে টেনে তুলে ফেলব।

মেয়ে পুকুরে নামামাত্রই চারিদিক থেকে হু-হু করে জল আসতে লাগল। রাজা আর তাকে টেনে তুলতে পারলেন না। পুকুরটির নাম হলো সোহাগী পুকুর। জায়গাটার নাম হলো সোহাগী।

যান, এটা সত্যি না। বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।

বানাব কেন? সোহাগী পুকুর সত্যি সত্যি আছে। জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। আর তুমি যদি ভরা পূর্ণিমার রাতে পুকুর পাড়ে বসে থাক তাহলে সোহাগীর কান্নাও শুনবে। ঐ মেয়েটি ভরা পূর্ণিমায় কাঁদে।

কেন?

পূর্ণিমার রাতে সে পুকুরে নেমেছিল তাই। প্রতি পূর্ণিমাতেই সে আসে।

দিলু অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তার চোখ ভিজে আসছে। তার খুব অল্পতেই কান্না পায়।

নিশাত দেখল— ওরা লোহার গেট পার হয়ে স্টেশনের ওপাশের কাঁচা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জামিল ভাই গল্প করছেন হাত নেড়ে নেড়ে। কী গল্প কে জানে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে দিলু। দিলুকে আজ অন্যদিনের চেয়েও একটু বড় লাগছে। এত বড় মেয়ের স্কার্ট পরা ঠিক না। চোখে লাগে। মাকে বলতে হবে।

লোকজন বিশেষ নেই চারদিকে। শুধু একজন বুড়ো খুব মন দিয়ে নিশাতকে দেখছে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। নিশাত ভেবেছিল ভিক্ষা চায় বুঝি। কিন্তু না, এ ভিক্ষুক নয়। ভিক্ষুকদের এতটা কৌতূহল থাকে না। তারা সরাসরি ভিক্ষা চায়। না পেলে চলে যায় অন্য কোথাও।

নিশাতের নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। দুটি প্যারাসিটামল খেয়ে নেয়া দরকার। নিশাত উঠে দাঁড়াল। বুড়োটি বলল, কই যাইবেন গো মা ? আশ্চর্য, কত সহজেই 'মা' ডাকল। প্রশ্ন করাতেও কোনো সংকোচ নেই। যেন কতদিনের চেনা।

আমরা যাব নীলগঞ্জ।

ডাকবাংলোয় ?

জ্বি।

নিশাত চলতে শুরু করল। তার পেছনে পেছনে গেঞ্জি গায়ে বুড়োটি আসছে। আরো কিছু জানতে চায় হয়তো। গ্রামের মানুষদের খুব কৌতূহল। ওরা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে।

জামিল একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল। দিলু বলল, এখানে চা খাবেন ? যা ময়লা! জামিল বলল, গ্রামে ঝকঝকে তকতকে রেস্টুরেন্ট কোথায় ? এটা মন্দ কী।

বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে চা বানাচ্ছিল। তার সামনে কাঠের একটা লম্বা বেঞ্চে পিঠ মেলে দু'জন লোক বসে চা খাচ্ছে। তাদের একজন বলল, আপনারা যাইবেন কোনখানে ?

নীলগঞ্জ।

মেলা দূর। যাইবেন ক্যামনে ?

জীপ আসার কথা।

রাস্তা তো ঠিক নাই। জীপগাড়ি আওনের পথ নাই।

তাই নাকি ?

জ্বি। এইজন কি আপনের মাইয়া ?

না, আমার বোন।

দিলু দেখল দুটি লোকই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে। তার বড় অস্বস্তি লাগতে লাগল। জামিল ভাই এই বেঞ্চে বসেই চা খাবেন নাকি ? লোক দুটির কৌতূহলের সীমা নেই। একজন বলল, সাব আপনের নাম ?

আমার নাম জামিল।

আপনে করেন কী ?

মাস্টারি করি ভাই। দেখি, একটু বসার জায়গা দেন।

দিলু অবাক হয়ে দেখল ওরা সবাই বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসল। আগের মতোই

তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। এতটুকু সংকোচ নেই। জামিল বলল, দেখি, দু'কাপ চা দাও তো। দিলু খাবি তো ?

খাব।

লোক দু'জনের একজন বলল, বজলু, সাবরে আর মাইয়াডারে কুকি বিসকুট দে। খালি পেডে চা খাওন ঠিক না। ছেলেটি দুটি লম্বা বিসকিট হাতে করে এগিয়ে দিল। দিলু নিল না, কিন্তু জামিল নিল এবং চায়ে ভিজিয়ে বাচ্চাদের মতো খেতে লাগল। কী যে সব কাণ্ড জামিল ভাইয়ের। দেখতে মজা লাগে।

৩

রেহানা বাবুকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সাব্বির। সাব্বির তাঁর দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে। সাব্বিরের এখানে আসার কথা ছিল না। হঠাৎ করেই এসেছে। এই হঠাৎ করে আসার অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা রেহানা তা বুঝতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাব্বির ছেলেটি হয় খুব চাপা কিংবা অতিরিক্ত চালাক। তার হাবভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

রেহানার ধারণা ছিল ট্রেনে সাব্বির নিশাতের আশে পাশে বসতে চেষ্টা করবে। এবং গল্পটল্প করবে। সে তেমন কিছু করে নি। বসেছে কোণার দিকে। কিছুক্ষণ অত্যন্ত মন দিয়ে একটা কমিক পড়েছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের একজন মানুষ মুগ্ধ হয়ে কমিক পড়ছে, ব্যাপারটা তার ভালো লাগে নি। কমিক শেষ হওয়া মাত্র সে জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করেছে কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশাতের দিকে তার কোনোরকম আগ্রহ বোঝা যায় নি। তবে এও হতে পারে যে, সে চেষ্টা করে তার আগ্রহ গোপন রাখছে। নিশাতকে ভালোরকম জানতে চায়।

আজ ভোরে তিনি দেখলেন সাব্বির ক্যামেরা হাতে একা একা যাচ্ছে। বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেও এগুলেন। অল্প কিছু কথাবার্তা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন— দেশে কতদিন থাকবে ?

বেশি দিন না। খৃসমাসের ছুটির পর যাব। জানুয়ারির তিন-চার তারিখের মধ্যে পৌঁছতে হবে।

তাহলে তো খুব অল্প দিন।

জ্বি।

রেহানা ইতস্তত করে বলেই ফেললেন— বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরবে নাকি ? অনেকে তো তাই করে।

এখনো কিছু ঠিক করি নি। আমার মা অবশ্যি মেয়ে-টেয়ে দেখছেন। বিয়ে করতেও পারি।

রেহানা কিছু বললেন না। দেখলেন সাব্বির ক্রমাগত ছবি তুলছে। গাছের ছবি। নদীর ছবি। নৌকার ছবি। কুয়াশায় সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভালো ছবি আসার কথা নয়। তবু ছবি তুলছে। রেহানা একটা ব্যাপার লক্ষ করলেন— এই ছেলেটি অত যে ছবি তুলছে, একবারও বলে নি— আসুন মামী, আপনার একটা ছবি তুলে দেই। এই বয়সে ছবি তোলার তাঁর কোনো শখ নেই। তবু এটা সাধারণ ভদ্রতা। সাব্বির বলল, আপনার নাতি

খুব শান্ত। খুব চুপচাপ।

খুব শান্ত না। বিরক্ত করে। নতুন জায়গা দেখে চুপ করে আছে। অপরিচিত মানুষের সামনে সে ভেজা বেড়াল।

ওর বয়স কত?

পাঁচ বছরে পড়ল।

রেহানা আশা করছিলেন সাব্বির এবার বাবুর সম্পর্কে কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা বকের ছবি ফোকাসে আনতে চেষ্টা করল। টেলিস্কোপিক লেন্স থাকা সত্ত্বেও বকের ছবিটি স্পষ্ট হচ্ছে না। বেশ কুয়াশা। মোটামুটি স্পষ্ট হলে ছবিটি ভালো হতো। বকের ধ্যানী ছবিটি হালকা সবুজের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ভালো আসছে। রোদ আরেকটু চড়ে গেলে ছবি ভালো হবে না।

সাব্বির, চল যাই। তোমার মামা বোধহয় রেগে যাচ্ছেন।

চলুন।

বাবুকে কোলে নিয়ে হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। একবার বললেন— বাবু, আমার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে চল। বাবু শক্ত করে তাঁর গলা চেপে ধরল। তার মানে সে কিছুতেই নামবে না। রেহানা আশা করছিলেন সাব্বির বলবে— আমার কোলে দিন। আমি নিয়ে যাব। কিন্তু সাব্বির সে সব কিছুই বলল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। মেয়েদের সঙ্গে এত দ্রুত হাঁটা যায় না। এই সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানও কি ওর নেই? রেহানা মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেন।

স্টেশনের কাছে এসে তিনি দিলু এবং জামিলকে দেখলেন। নোংরা একটি বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। তাদেরকে ঘিরে চার-পাঁচ জন গ্রামের মানুষ বসে আছে মাটিতে। দিলু স্কার্ট পরে থাকায় তার ফর্সা পা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটি তার ভালো লাগল না। গ্রামের মানুষগুলি বোধ করি বসে আছে ফর্সা পা দেখার জন্য। তিনি একবার ভাবলেন দিলুকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। দিলুর জামা-কাপড় কী কী এনেছেন তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। মনে পড়ল না। জামা-কাপড় সব গুছিয়েছে নিশাত, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

দিলু তাদের দেখেই ডাকল— মা, কোথায় ছিলে তোমরা? তারপর ছুটে এল তাদের দিকে।

আমরা ভাবলাম তোমরা বোধহয় হারিয়েই গেছো।

হারিয়ে যাব কেন? নে, বাবুকে কোলে নে।

দিলু বাবুকে কোলে নিয়েই বলল, সাব্বির ভাই, আমাদের একটা ছবি তুলে দিন তো। এই বাবু, উনার দিকে তাকিয়ে হাস তো লক্ষ্মী ছেলের মতো।

সাব্বির ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগল। এবং ছবি তুলল বেশ কয়েকটি। রেহানার মনে হলো এই একটি ব্যাপারে ছেলেটির আগ্রহ আছে। ছবি তোলায় তার কোনো ক্লান্তি নেই।

ওসমান সাহেব ভেবে রেখেছিলেন রেহানার ওপর খুব রাগ করবেন। সেটা সম্ভব হলো না। সাব্বির রয়েছে। তার সামনে কোনো সিন ক্রিয়েট করার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও বিরক্ত স্বরে বললেন, তোমারা ছিলে কোথায়?

কাছেই। তোমার জীপ তো এখনো আসে নি। এত তাড়া কীসের ?

জীপ আসবে না। নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে।

গরুর গাড়ি ?

দু'টা গুরুর গাড়ি, একটা মহিষের গাড়ি। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হবে।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, তিনটা গাড়ি কেন ?

পাগল-ছাগলের কাণ্ড। যতগুলো পেয়েছে, নিয়ে এসেছে।

তোমার পুলিশের লোকজন কেউ আসে নি ?

না।

ওসমান সাহেবের মনে হলো রেহানা মুখ টিপে হাসছে। কেউ নিতে আসে নি ব্যাপারটা দুঃখজনক। এ নিয়ে হাসবে কেন ? রেহানা বললেন, তোমার খবর বোধহয় পায় নি। পেলে আসত।

ওয়ারলেস ম্যাসেজ দিয়েছি। পাবে না মানে ?

তোমাদের নীলগঞ্জ থানায় হয়তো ওয়ারলেস নেই।

প্রতিটি থানায় ওয়ারলেস সেট আছে। কী বলছ এসব ?

দিলু বলল, বাবা, আমি কিন্তু মহিষের গাড়িতে করে যাব।

ওসমান সাহেব একটা ধমক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বের হয়েছেন, ছুটির সময়টায় কোনো রাগারাগি করবেন না।

কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখা যাচ্ছে না। কেন কেউ নিতে আসবে না ? থানাওয়ালাদের এত বড় স্পর্ধা থাকা ঠিক নয়।

৪

গাড়িতে গুছিয়ে বসতে বসতে ন'টা বেজে গেল। প্রথম কথা হয়েছিল একটিতে যাবে শুধু মালপত্র। অন্য দুটির একটিতে জামিল ও সাব্বির এবং আরেকটিতে দিলুরা। কিন্তু নিশাত বলল, আমি মা বাবুকে নিয়ে একটি গাড়িতে একা যেতে চাই।

কেন ?

কোনো কেন-টেন নেই। এম্নি যেতে চাই।

সব সময় তুই একটা ঝামেলা করতে চেষ্টা করিস।

ঝামেলা করতে চেষ্টা করি না। কমাতে চেষ্টা করি। আমি মা একা যেতে চাই।

নিশাত শেষ পর্যন্ত অবশ্যি একা একা গাড়িতে ওঠে নি। রেহানা উঠেছেন তার সঙ্গে। প্রথম গাড়িতে বাবা, দিলু ও বাবু। মহিষের গাড়িটিতে জামিল ও সাব্বির।

গাড়ি চলা শুরু করা মাত্রই সাব্বির মাথার নিচে একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। জামিল বলল, কি, ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

হ্যাঁ। রাতে ভালো ঘুম হয় নি।

এই ঝাঁকুনিতে ঘুম হবে ?

হবে। আমার অভ্যেস আছে।

ঘুমুবার আগে একটা সিগারেট খাবেন ?

জ্বি না, আমি সিগারেট খাই না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাব্বির ঘুমিয়ে পড়ল। জামিল একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা বোধ করল। এত সহজে কেউ অমন ঘুমিয়ে পড়তে পারে ? একা বসে থাকা ক্লান্তিকর ব্যাপার। নেমে গিয়ে প্রথম গাড়িটিতে ওঠা যেতে পারে। সেখানে সিগারেট খাওয়া যাবে না এই একটা ঝামেলা। তাছাড়া সঙ্গী হিসেবে ওসমান সাহেব বেশ বোরিং হবেন বলেই তার ধারণা। লোকটির রসবোধ নেই। অফিসের বাইরে যে আরো কিছু থাকতে পারে তা খুব সম্ভব তিনি জানেন না।

এক পর্যায়ে জামিলের মনে হলো এখানে আসা কি সত্যি দরকার ছিল ? মানুষ বেড়াতে যায় ফূর্তি করবার জন্যে। এখানেও কি সে রকম কিছু হবে ? সম্ভাবনা খুব কম। জামিল গাড়োয়ানের পাশে এসে বসল। রাস্তায় ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ি খুব ধীরে চলে বলে যে ধারণা আছে সেটা ঠিক নয়। বেশ দ্রুতই চলছে। গান শুনতে শুনতে যেতে পারলে হতো। কিন্তু ক্যাসেট প্লেয়ারটি নিশাতদের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে নাকি ?

নিশাতের নাক ভার হয়ে আছ। মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা। সে বলল, মা, তোমার কাছে প্যারাসিটামল আছে ?

আছে। তোর জ্বর নাকি ?

না সর্দি। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রেহানা তার গায়ে হাত দিলেন— গা তো বেশ গরম। শুয়ে থাক।

শুয়ে থাকতে হবে না। তুমি দুটো ট্যাবলেট দাও।

পানি তো নাই। পানির বোতল পেছনের গাড়িতে।

পানি লাগবে না। তুমি দাও।

রেহানা দুটি ট্যাবলেট দিলেন। নিশাত একটুও মুখ বিকৃত করল না। ট্যাবলেট দুটি গিলে ফেলল।

শুয়ে থাক।

আমার শুয়ে থাকার যখন প্রয়োজন হবে আমি শুয়ে থাকব। তোমার বলতে হবে না।

তুই এত রেগে আছিস কেন ?

নিশাত মায়ের চোখে চোখ রেখে শীতল গলায় বলল, সাব্বির সাহেব আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন ? ঠিক করে বল তো মা।

বেড়াতে যাচ্ছে, আবার কেন ? ও বাংলাদেশের অনেক ছবি তুলে নিতে চায়। আমারা গ্রামের দিকে যাচ্ছি শুনে সে-ও আগ্রহ করে যেতে চাইল।

না, সে কোনো আগ্রহ দেখায় নি। তুমি ঝুলাঝুলি করছিলে।

যদি করেই থাকি তাতে অসুবিধা কী ? আমাদের আত্মীয়, এতদিন পর দেশে এসেছে। ঘুরেফিরে দেখতে চায়।

আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয় মা।

আসল ব্যাপারটা কী শুনি ?

তুমি চাচ্ছ ঐ ছেলেটি যাতে আমাকে পছন্দ করে ফেলে। এবং পুরনো দুঃখ-কষ্ট ভুলে আমি তাকে বিয়ে করে ফেলি।

যদি চেয়েই থাকি সেটা কি খুব অন্যায় ?

হ্যাঁ অন্যায়। তুমি যা ভাবছ সেটা ঠিক নয়।

আমি কী ভাবছি ?

তুমি ভাবছ— আমার স্বামী নেই, একটা বাচ্চা আছে। কাজেই আমার একটি অবলম্বন দরকার। এটা মা ঠিক না। আমি তোমাদের বিরক্ত করব না, আমি নিজের দায়িত্ব নিজে নেব। অনেকবার তো তোমাদের বলেছি।

নিশাত দেখল জামিল এগিয়ে আসছে। সে চুপ করে গেল।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোমাদের কাছে ?

জ্বি না, দিলুর কাছে।

জামিল এগিয়ে গেল। সামনের গাড়িটি অনেক দূর চলে গেছে। নিশাত দেখল জামিল দৌড়াতে শুরু করেছে। এই দৃশ্যটি তার কেন জানি ভালো লাগল। রেহানা বললেন, জামিলকে বলে দে পানির বোতলটা দিয়ে যাক।

কেন ?

অষুধ খেয়ে তোর মুখ তেতো হয়ে আছে না ?

মা, আমার জন্যে তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

দিলু ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছিল। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তিনি দিলুর কথা বেশ মন দিয়ে শুনছেন এবং তাঁর ভালোই লাগছে।

সোগাহী নাম কেমন করে হয়েছে শুনবে বাবা ?

বল শুনি।

আমার দিকে তাকাও বলছি। অন্যদিকে তাকিয়ে আছ কেন ?

ওসমান সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন। দিলু হাত নেড়ে নেড়ে গল্পটা বলল। ওসমান সাহেব বললেন, এই জাতীয় মীথ প্রায় সব পুকুর সম্পর্কেই থাকে। এটা ঠিক নয়। একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় মাটি কাটলেই পানি আসবে। শীতের সময় যদি নাও আসে বর্ষার সময় বৃষ্টির পানিতে ভরে যাবে।

দিলুর মন খারাপ হলো। গল্পটা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন, রাজার মেয়ের নাম সোহাগী— এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন ?

রাজাদের মেয়ের এমন সাধারণ নাম থাকে না। ওদের গালভরা নাম থাকে। ফুলকুমারী, রূপকুমারী, নূরজাহান, নূরমহল।

দিলুর বেশ মন খারাপ হলো। সে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল জামিল ভাই আসছেন।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোর কাছে ?

হ্যাঁ।

ওটা নিতে এসেছি।

জামিল গরুর গাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসল।

দিলু, ভালো দেখে কয়টা ক্যাসেট দে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত ?

না হিন্দি-ফিন্দী।

দিলু ক্যাসেট বাছতে বাছতে বলল, বাবা কিন্তু সোহাগী পুকুরের গল্পটা বিশ্বাস করেন নি। বাবা বলছেন, মাটি কিছু দূর খুঁড়লেই পানি আসবে।

এটা ঠিক নয়। ঢাকা আর্ট কলেজে একটা বিরাট পুকুর আছে। খুব গভীর। বর্ষাকালে পর্যন্ত সেখানে এক ফোঁটা পানি থাকে না।

সত্যি ?

হ্যাঁ এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কেউ যদি সেই পুকুরে নামে তাহলে খিলখিল হাসির শব্দ শোনে।

ওসমান সাহেব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, জামিল, সত্যি নাকি ?

পুকুরে পানি নেই বর্ষাকালেও এটা সত্যি, আমি নিজে দেখেছি। তবে হাসির কথাটা জানি না, ওটা বানানোও হতে পারে।

দিলু বলল, আমাকে ঐ পুকুরটা দেখাবেন ?

একদিন গিয়ে দেখে এলেই হয়। তোদের বাসার কাছেই তো।

জামিল ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে নেমে গেল। দিলু বলল, জামিল ভাই অনেক কিছু জানে। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

জামিল ভাই আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল, সেটা দারুণ মজার, তোমাকে জিজ্ঞেস করব ?

কর।

আচ্ছা মনে কর তোমার কাছে দশ সের পানি দেয়া হলো। এখন তুমি কি পারবে এই দশ সের পানি একবারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে ? বালতি-টালতি কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু হাত দিয়ে নেবে এবং একবারে নেবে।

ওসমান সাহেব ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। দিলু মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলল— খুব সহজ বাবা। চেষ্টা করলেই পারবে। একটু হিন্টস দেব ?

না হিন্টস দিতে হবে না।

ওসমান সাহেব সত্যিই গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

জামিল নিজের গাড়িতে ফিরে এসে দেখে সাব্বির উঠে বসেছে। ক্যামেরা নিয়ে কী সব যেন করছে।

কি, ঘুম হয়ে গেল ?

হ্যাঁ।

কী করছেন ?

একটা ব্লু ফিল্টার লাগাচ্ছি।

ব্লু ফিল্টার দিয়ে কী হয় ?

দিনের বেলা ছবি তুললে মনে হয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছবি তোলা হয়েছে।

আপনি নিজে তো একজন ইঞ্জিনিয়ার ?

জ্বি।

আপনাকে দেখে মন হয় ছবি তোলাই আপনার একমাত্র কাজ।

এটা আমার একটা হবি।

খুব বড় ধরনের হবি মনে হচ্ছে ?

সাব্বির শান্ত স্বরে বলল, আমি কিন্তু খুব নামকরা ফটোগ্রাফার। আমার নিজের তোলা ছবি নিয়ে আমেরিকান এক পাবলিশার একটি বই বের করেছে, নাম হচ্ছে— অন দি টপ অব দি ওয়ার্লড।

আপনার কাছে কপি আছে ?

আছে, দিচ্ছি।

সাব্বির আহমেদ তিনশ' পৃষ্ঠার একটি বই বের করল তার স্যুটকেস থেকে। জামিলের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই বইটির কথা কি দিলুরা জানে ?

না। নিজের কথা বলতে ভালো লাগে না।

সাব্বির ছবি তুলতে শুরু করল। ক্যামেরার শাটার পড়ছে। কোনো কিছু যে সে দেখছে মন দিয়ে তা মনে হচ্ছে না।

একটি গ্রাম্য বধু লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাটার পড়তে লাগল খটাখট।

ছাগলের গলার দড়ি ধরে একটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। খটাখট শাটার পড়তে শুরু করল। জামিল বলল, এই ছবিটা আপনার ভালো হবে না। জোছনা রাতে কেউ ছাগল চড়াতে বের হয় না। আপনি বরং ব্লু-ফিল্টার বদলে নিন।

সাব্বির হালকা গলায় বলল, উল্টোটাও হতে পারে, ছবি দেখে মনে হতে পারে রাতের রহস্যময়তায় মুগ্ধ হয়ে একটি শিশু তার পোষা প্রাণীটি নিয়ে বের হয়েছে। দু'জনের চোখেই বিস্ময় ও ভয়, তাদের ঘিরে আছে জোছনা।

আপনি কি ফটোগ্রাফার না কবি ?

আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার।

জামিল বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, আপনার এই বইটিতে তো মানুষের কোনো ছবি নেই। শুধুই জড়বস্তুর ছবি। মানুষের ছবি বেশি তোলেন না ?

আমার অন্য একটি বইতে মানুষের ছবি আছে। সবই অবশ্যি 'নুড' ছবি।

বইট আছে ?

আছে।

আমেরিকায় আপনি কতদিন ধরে আছেন ?

প্রায় এগারো বছর।

দেশে ফিরবেন না ?

না।

কেন ?

থাকবার জন্যে এ জায়গাটি ভালো। বিশাল দেশ, ঘুরে বেড়ানোর চমৎকার সুযোগ। এরকম পাওয়া যায় না। তা ছাড়া...।

তা ছাড়া কী ?

সাব্বির কথা শেষ করল না। মাঠের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, এগুলো সর্ষে ফুল না ? হলুদ রঙের কী চমৎকার ভেরিয়েশন।

৫

তারা নীলগঞ্জে ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছল বিকেল চারটায়, তখন আলো নরম হয়ে এসেছে। শীতের উত্তরী হাওয়া বইছে।

ডাকবাংলোটি চমৎকার। ফিসারিজের বাংলো। হাফ বিল্ডিং। উপরের ছাদ টালীর, মন্দিরের গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে গেছে। বাড়ি যত বড় তার চেয়েও বড় তার বারান্দা। সেখানে কালো একটি গোল টেবিলের চারপাশে গোটাপাঁচেক ইজিচেয়ার। দেখলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। বাড়িটির চারপাশে রেন্টি (রেইন ট্রি) গাছ। বিকেল বেলাতেই বাড়িটিকে অন্ধকার করে ফেলেছে। পেছনে বেশ বড়সড় একটা পুকুর। কাকের চোখের মতো কালো জল।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, এই জঙ্গলে এত চমৎকার বাড়ি গভর্নমেন্ট কেন বানিয়েছে ? ওসমান সাহেব নিজেও হকচকিয়ে গেছেন। এদিকে তাঁর প্রথম আসা। খোঁজখবর এসেছে জামিলের কাছ থেকে।

জামিল, এই ডাকবাংলো তৈরি হয় কবে ?

এটা সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার শিকার বাড়ি। পরে সরকার নিয়ে নেয়। এখন ফিসারিজ ডিপার্টমেন্টের হাতে দেয়া হয়েছে। আগে আরো সুন্দর ছিল।

এরচে' সুন্দর আর কী হবে ?

একটা কাঁচঘর ছিল। গোটা ঘরটাই কাঁচের তৈরি। লোকজন কাঁচটাচ সব নিয়ে গেছে। অনেক ঝাড় লণ্ঠন ছিল। বড় বড় অফিসার একেকজন এসেছেন, একেকটা করে নিয়ে গেছেন। পেছনের পুকুরের ঘাটে মার্বেল পাথরের একটি দেবশিশু ছিল, ঢাকা মিউজিয়াম নিয়ে গেছে।

তুমি এত কিছু জান কীভাবে ?

আমি তো এখানে প্রায়ই আসি।

দিলু বলল, বাবা আমি একা একটা ঘরে থাকব। ওসমান সাহেব উত্তর দিলেন না। জামিল বলল, তা পারবি না দিলু— সব পুরনো ডাকবাংলোয় ভূত থাকে।

আপনাকে বলেছে!

সন্ধ্যা হলেই টের পাবি। সন্ধ্যা নামুক। তখন দেখা যাবে।

বাবুর্চি আছে দু'জন। তারা রান্নাবান্না সেরে ফেলেছে। খাবার ঘরে খাবার দিতে শুরু করেছে। খাবার ঘরটা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালানো

হয়েছে। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে। শুধু নিশাত নেই। রেহানা খোঁজ নিতে গেলেন। নিশাত শুয়ে ছিল। সে ক্লান্ত গলায় বলল, আমি কিছু খাব না।

কেন খাবি না ?

খেতে ইচ্ছে করছে না, তাই খাব না।

সারাদিন তো কিছুই মুখে তুলিস নি। কিছু মুখে দে।

আমি গোসল না করে কিছু মুখে দেব না। আমার গা ঘিনঘিন করছে।

জ্বর গায়ে গোসল করবি কী!

প্লীজ মা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। বাবুকে খাওয়াও। তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর।

রেহানা মুখ কালো করে বের হয়ে এলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করল নিশাত। ঠাণ্ডা পানি। গায়ে জ্বর থাকার জন্যে পানি বরফ-শীতল মনে হচ্ছে। তবু ভালো লাগছে। ঝকঝকে বাথরুম। পিতলের বালতিতে পরিষ্কার জল। মোড়ক খোলা নতুন সাবান।

নিশাত যখন বেরিয়ে এল তখন সত্যি সত্যি অন্ধকার নেমে এসেছে। নিশাত একটি ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিল। উঁকি দিল মায়ের ঘরে। বাবু অবেলায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। আজ সারাদিন বাবুর সঙ্গে তার কোনো কথাবার্তা হয় নি। বাবু কি ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ? রাতে সে এখন তার সঙ্গে ঘুমায় না। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে— দাদীর কাছে যাব। রেহানাকে সে দাদী বলে। কেন বলে কে জানে !

নিশাত বলল, ও কি কিছু খেয়েছে ?

ভাত মুখে দেয় নি। দুধ খেয়েছে।

নিশাত নিচু হয়ে ছেলের কপালে চুমু খেল। রেহানা বললেন, কিছু খাবি মা ?

না। চা খাব এক কাপ।

বস তুই এখানে। আমি চায়ের কথা বলে আসি। মশারি খাটানোর কথাও বলতে হবে। খুব মশা এদিকে।

দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে। নিশাত মুখ তুলে দেখল জামিল ভাই।

নিশাত, তোমার নাকি জ্বর ?

ব্যস্ত হবার মতো কিছু না।

ব্যস্ত হই নি নিশাত, খোঁজ নিচ্ছি। খোঁজ নেয়াটা অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।

আমি ভালো আছি।

জামিল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। চলে যেতে চাইল। নিশাত বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে জামিল ভাই।

বল।

আপনি বারান্দায় বসুন, আমি আসছি।

ঝগড়া করবে মনে হচ্ছে।

নিশাত জবাব দিল না। বাবুর গালে একটা মশা বসেছিল। হাত দিয়ে সেটিকে উড়িয়ে দিল। ছেলেটিকে বড় রোগা রোগা লাগছে। এ ক'দিন ওর দিকে একটুও নজর দেয়া হয় নি। নিশাতের মনে হলো সে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। বাবু এখন আর মা'র

জন্যে খুব ব্যস্ত নয়। শিশুরা অবহেলা খুব সহজেই টের পায়। নিশাত বাবুর চুলে হাত রাখল। পাতলা লালচে ধরনের চুল। বাবার মতো। কবিরের চুলও এ রকম ছিল। তবে বাবুর মতো পাতলা ছিল না। কবিরের চেহারার সঙ্গে বাবুর খুব বেশি মিল নেই। কবিরের নাক ছিল খাড়া, বাবুর তা নয়। সে হয়েছে মা'র মতো। নিশাত নিচু হয়ে বাবুর ঠোঁটে চুমু খেল। কেমন দুধ দুধ গন্ধ। নিশাত আবার নিচু হলো। বাবু ঘুমের মধ্যেই তাকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল।

বারান্দা অন্ধকার। এখানে কোনো বাতি দিয়ে যায় নি। জামিল বসে ছিল একা। নিশাত এসে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসল— হালকা গলায় বলল, ভেতরে বসলেই হতো, এখানে বড় হাওয়া।

থাকুক হাওয়া। বারান্দাই ভালো।

আলো দিতে বলব ?

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সহজভাবে বলল, বল কী বলবে ?

আপনি আমাদের এই বাংলোয় কেন নিয়ে এসেছেন ?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কী মিন করছ।

আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন। এখন ভান করছেন বুঝতে পারছেন না।

দেখ নিশাত, আমি ভান করি না। ঐ একটা জিনিস আমি কখনো করি না।

তাহলে বলুন এত ডাকবাংলো থাকতে আপনি এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন কেন ?

কবির এবং আমি অনেক রাত এই ডাকবাংলোয় কাটিয়েছি। এই ডাকবাংলোর উপর ওর একটা দুর্বলতা ছিল। আমি জানি বিয়ের পর ও অনেকবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছে। আসা হয়ে ওঠে নি। আমি তাই ভেবেছিলাম এখানে এলে তোমার ভালোই লাগবে।

আমি ওর সঙ্গেই এখানে আসতে চেয়েছিলাম, আর কারো সঙ্গে নয়।

ভেবে নাও ও তোমার সঙ্গেই আছে।

সব কিছু কি ভেবে নেয়া যায়। জীবন এত সহজ মনে করেন ?

জীবন সহজও নয় জটিলও নয়। জীবন জীবনের মতো। আমরাই একে জটিল করি— সহজ করি। তুমি একে ক্রমেই জটিল করছ।

নিশাত চুপ করে গেল। জামিল হালকা সুরে বলল, দুঃখ শুধু কি তোমার একার ? আমাদের সবারই দুঃখ আছে।

আপনার আবার কীসের দুঃখ ? দুঃখের আপনি কী জানেন ?

নিশাত উঠে দাঁড়াল। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। কে একজন এসে বারান্দায় একটি হারিকেন রেখে গেল। হ্যারিকেনের আলোয় সব কেমন অদ্ভুত লাগছে।

জামিল সাহেব, আপনি যেভাবে বসে আছেন বসে থাকুন। একটা ছবি তুলব। নড়বেন না, শাটার স্পীড খুব কম।

অনেকখানি সময় নিয়ে সাব্বির ছবি তুলল।

৬

পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়ার ধাঁধাটি ওসমান সাহেবের মাথায় ঘুরতে শুরু করেছে দুপুর থেকে। ওসমান সাহেব নিজের ওপরই বিরক্ত হচ্ছিলেন। ধাঁধার মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এই বয়সে কেউ এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে না। কিন্তু তিনি হচ্ছেন। এটা কি বয়সজনিত স্থবিরতা ? তিনি কেমন যেন চ্যালেঞ্জ বোধ করছেন। এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ বোধ করার কী আছে! ধাঁধার উত্তর জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

তিনি পাইপ হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁর গায়ে ভারী একটা ওভারকোট। গলায় মাফলার। তবু তাঁর শীত করতে লাগল। বয়স! বয়স বাড়ছে। এখন একদিন একটা মাইল্ড স্ট্রোক হবে। লক্ষণও টের পাওয়া যাচ্ছে। ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ঘুম কমে গেছে। খিদে কমে গেছে। চিন্তাও পরিষ্কার করতে পারছেন না। পারলে এই সহজ ধাঁধার জবাব বের করতে পারতেন। কিংবা কে জানে এটা হয়তো সহজ নয়। হয়তো বেশ জটিল।

বারান্দায় রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। ওসমান সাহেব রেহানার ডান দিকের খালি চেয়ারটিতে বসলেন। রেহানা বললেন, নিশাতের বেশ জ্বর।

তাই নাকি ?

একশ' দুই-টুই হবে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ ?

না।

তাহলে বুঝলে কীভাবে একশ' দুই ?

অনুমান করে বলছি।

অনুমান করে আমাকে কিছু বলবে না।

তুমি এ রকম করছ কেন ?

কী রকম করছি ?

এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন ?

মেজাজ কোথায় দেখালাম ?

থানার ওসি ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করলে কেন ?

খারাপ ব্যবহার তো করি নি। আমি বিরক্ত হয়েছি। এই বিরক্তির ব্যাপারটি তাকে জানিয়েছি। সে জানে আজ ভোরে আমি আসব, কিন্তু সে স্টেশনে আসে নি। আমি ডাকবাংলোয় পৌছানোর পর সে এসেছে। আমাকে সে কী ভেবেছে ?

তুমি কোনো সরকারি ট্যুরে আস নি। তুমি ছুটি কাটাতে এসেছ। কেন সে আসবে ?

সে আসবে। তার পুরো দলবল নিয়ে আসবে। কারণ আমি পুলিশের আই.জি.।

রেহানা একবার ভাবলেন বলবেন না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন। এবং বললেন বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই— তুমি এখন আর আই.জি. নও। রিটায়ারমেন্ট নিয়েছ। রিটায়ারমেন্টের আগে পাওনা ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি পুলিশের আই.জি. এটা এখন যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পার ততই ভালো।

ওসমান সাহেবের পাইপ নিভে গেছে। নিভে যাওয়া পাইপ হাতে তিনি মূর্তির মতো দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। রেহানা শীতল স্বরে বললেন, এখন আর তোমাকে দেখামাত্র

পুলিশের অফিসাররা ছুটোছুটি করবে না। এটা মানসিকভাবে একসেপ্ট করার চেষ্টা কর। তোমার জন্যেও ভালো। আমাদের সবার জন্যেও ভালো। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। দূরের রেন্টি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রেহানার মনে হলো এই কথাগুলি হয়তো না বললেও চলত। তিনি গলার স্বর স্বাভাবিক করতে করতে বললেন, চা খাবে ?

না।

শীতের মধ্যে ভালো লাগবে।

আমাকে এক ঢোক হুইস্কি দিতে বল।

হুইস্কি এখানে কোথায় পাবে ?

আছে, আলিম নিয়ে এসেছে। আলিমকে বল।

আলিম ওসমান সাহেবের বাসায় গত বিশ বছর ধরে আছে। তার বয়স ওসমান সাহেবের চেয়েও বেশি। কিন্তু গৃহভৃত্যদের কোনো পেনসনের ব্যবস্থা নেই, কাজেই তাকে একদিন আগেই রান্নার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নীলগঞ্জে আসতে হয়েছে। আজ প্রচণ্ড দাঁতব্যথা থাকা সত্ত্বেও সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রেহানা বললেন, আলিম শুয়ে আছে। ওর শরীর ভালো না। তাছাড়া এখানে এসব করতে পারবে না।

কেন, এখানে অসুবিধা কী ?

অসুবিধা আছে। ঘরে তুমি যা কর, তাই বলে বাইরে এসেও করবে ?

রেহানা, এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি। রিলাক্স করতে এসেছি।

তুমি একা আস নি। তোমার সঙ্গে বাইরের মানুষ আছে।

বাইরের মানুষ এখানে কেউ না। জামিল ঘরের ছেলে, সে আমার অভ্যাস জানে আর সাব্বির এগারো বছর ধরে বাইরে আছে।

আমি তোমাকে মদ খেতে দেব না।

রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে উঠে গেলেন। যাবার সময় হ্যারিকেন হাতে করে তুলে নিয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব অন্ধকার বারান্দায় একা একা বসে রইলেন। এখানে মশা আছে। বন্য মশা। মানুষ কামড়িয়ে অভ্যেস নেই বোধহয়। কামড়াচ্ছে না। শুধু বিরক্ত করছে। ওসমান সাহেব আবার ধাঁধা নিয়ে ভাবতে বসলেন। পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হবে। শুধু হাতে নিতে হবে এবং একবারে নিতে হবে। কোনো মানে হয় ?

বাবা, তুমি অন্ধকারে বসে কী করছ ?

দিলু ঢুকল। ওসমান সাহেব মিষ্টি একটা গন্ধ পেলেন। দিলু পাউডার মেখেছে কিংবা গায়ে সেন্ট-টেন্ট দিয়েছে। গন্ধটা হালকা এবং চেনা। পরিচিত কোনো ফুলের গন্ধ। কী ফুল ওসমান সাহেব সেটা মনে করতে পারলেন না। অনেকদিন সচেতনভাবে কোনো ফুলের গন্ধ নেয়া হয় নি। দিলু তার পাশে চেয়ারে বসল এবং আবার বলল, অন্ধকারে একা একা বসে কী করছ ?

তোর সমস্যা নিয়ে ভাবছি।

আমার ? আমার আবার কী সমস্যা ?

দিলু বেশ অবাক হলো। ওসমান সাহেব নরম গলায় বললেন, ঐ যে পানি এক

জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেবার ব্যাপারটা।

ও আল্লা, তুমি এটা নিয়ে এখনো ভাবছ ?

হ্যাঁ, ভাবছি।

বলে দেব ?

না, বলিস না। নিজেই বের করব।

আরেকটা সহজ ধাঁধা ধরব ? জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি। দারুণ মজার।

না, আর না। যেটা দিয়েছিস সেটাই আগে সল্‌ভ করি।

দিলু হাসল খিল খিল করে।

হাসছিস কেন ?

বলা যাবে না।

যা আলিমকে একটু আসতে বল।

আমি পারব না বাবা।

পারবি নে কেন ?

কী অন্ধকার— দেখছ না ? ভয় ভয় লাগে। বাবা!

কী ?

একটা ভূতের গল্প শুনবে ? সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি। উনার নিজের লাইফের ঘটনা।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। পাইপ ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খুব হাওয়া। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে।

বাবা বলব ?

বল্।

দিলু তার বাবার কাছে ঘেঁষে এল। একটা হাত রাখল বাবার হাতে। গলার স্বর নিচু করে গল্প শুরু করল।

বুঝলে বাবা, তখন শ্রাবণ মাস। জামিল ভাই গিয়েছেন তার বন্ধুর বাড়ি। গ্রামের দোতলা বাড়ি। জামিল ভাইকে যে ঘরটায় থাকতে দেয়া হয়েছে তার জানালাগুলো খুব ছোট ছোট। বাবা শুনছো তো ?

শুনছি।

তাহলে হুঁ বলবে একটু পর পর। না বললে মনে হবে গল্প শুনছো না।

ঠিক আছে বলব। তারপর কী হলো ?

মাঝরাতে হঠাৎ খুব ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। ঘরে হ্যারিকেন ছিল, হ্যারিকেনটা গেল নিভে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না।

তারপর ?

তারপর হলো কী শুন। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। জামিল ভাই বললেন, কে ? একজন মেয়েমানুষের গলা শোনা গেল— দয়া করে দরজা খুলুন।

তারপর কী হলো ?

জামিল ভাই দরজা খুলতেই ঘরে একটা মেয়ে ঢুকল ষোল-সতের বছর বয়স। বাইরে এত ঝড়-বৃষ্টি কিন্তু মেয়েটি খটখটে শুকনো।

ওসমান সাহেব বললেন— ঘুটঘুটে অন্ধকারে জামিল কী করে দেখল মেয়েটি শুকনো এবং বুঝলইবা কী করে ওর বয়স সতের-আঠার ?

দিলু থমকে গেল। এটা সে ভাবে নি। ওসমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁকি আছে। তাই না দিলু ? দিলু জবাব দিল না। তার একটু মন খারাপ হয়ে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, গল্পটা শেষ কর।

না, থাক!

থাকবে কেন ? বাকিটা শুনি।

তোমাকে শুনতে হবে না।

দিলুর গলার স্বর ভারী। যেন সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছিস ?

জামিল ভাইকে কথাটা জিজ্ঞেস করে আসি।

পরে জিজ্ঞেস করলেও হবে।

না আমি এখন জিজ্ঞেস করব। কেন সে আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে ?

গল্প তো গল্প। গল্প কখনো সত্যি হয় ?

জামিল ভাই বলেছিল এটা সত্যি গল্প।

দিলু প্রথমে গেল খাবার ঘরে। সেখানে একজন অপরিচিত রোগা লোক হ্যাজাক লাইট ঠিক করতে চেষ্টা করছে। এক একবার দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, লোকটি "খাইছেরে" বলে এক লাফে পেছনে সরে। ব্যাপারটা দিলুর কাছে খুব মজার লাগল। দিলু হাসিমুখে বলল, আপনার কী নাম ?

আমার নাম বাদলা।

বাদলা আবার নাম হয় ?

বাপ-মায় দিছে, কী করমু কন ?

তারা বোধহয় নাম দিয়েছিল বাদল।

দিলুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাজাকটা ঠিক হয়ে গেল— বাদলা দাঁত বের করে বলল, আফা আপনের খুব ভয়। দিলু বলল, আপনি কি জামিল ভাইকে দেখেছেন ? ঐ যে লম্বা। গায়ে পাঞ্জাবি আর ক্রীম কালারের চাদর।

জ্বি দেখছি।

কোথায় দেখেছেন ?

এই সাব আরেকজন কোট পরা সাব বইসা আছে পুকুর ঘাটে। গফ করতাছে।

আপনি যান তো জামিল ভাইকে ডেকে নিয়ে আসুন। বলবেন— দিলু আপনাকে ডাকছে। আমার নাম দিলু। দিলশাদ থেকে দিলু।

লোকটি চলে গেল। দিলু মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। রাত বেশি হয় নি। মাত্র আটটা কিন্তু মনে হচ্ছে গভীর রাত। ঝিঁঝি ডাকছে চারদিকে। বাবুর কান্না শোনা যাচ্ছে। সে সারাদিন ঘুমিয়েছে। কাজেই সারারাত সে জেগে থাকবে। একটু পরে কাঁদবে। মা-

কে কোলে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হবে। দিলু শুনল মা তাকে গল্প বলার চেষ্টা করছেন। তুলা রাশি কন্যার গল্প। এই গল্পটি ছোটবেলায় সে-ও শুনেছে। এক রাজকন্যার ওজন মাত্র এক ছটাক। কিন্তু এক রাতে হঠাৎ তার ওজন বেড়ে গেল।

কী ব্যাপার দিলু! জরুরি তলব কেন?

জামিল ভাই, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন? কেউ আমাকে মিথ্যে বললে আমার খুব খারাপ লাগে।

কোনটা মিথ্যে বলেছি বলেন তো? মিথ্যে আমি তেমন বলি না।

ঐ যে, একটা সত্যি ভূতের গল্প বললেন, ওটা আসলে মিথ্যে ভূতের গল্প।

কোন্ গল্পটি?

ঐ যে, বন্ধু বাড়িতে গিয়েছেন। ঝড়-বৃষ্টির সময়। ষোল-সতের বছরের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিথ্যে হবে কেন? ওটা সত্যি গল্প।

না, সত্যি না। এই অন্ধকারে আপনি কী করে বুঝলেন ওর বয়স ষোল-সতের। ওর কাপড় ভেজা না।

জামিল গম্ভীর গলায় বলল, ঐ রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝড়ের সময় ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। বিদ্যুতের আলো শহরের ইলেকট্রিকের আলোর চেয়েও কড়া।

দিলু তাকিয়ে রইল চোখ বড় করে। জামিল বললেন, তবে মেয়েটির বয়সের ব্যাপারটা আমার কল্পনা। আমি নিজে তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, কাজেই সব মেয়ের বয়সই মনে হতো ষোল-সতের।

দিলু কিছু বলল না।

কি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। জামিল ভাই—

বল।

আরেকটা সত্যি গল্প বলেন।

আরেক দিন বলব!

জামিল ভাই, আপনি কি আমার ওপরে রাগ করেছেন?

না, রাগ করব কেন?

দিলু হঠাৎ উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। জামিল হাসল। দিলু নিশাতের মতো হয় নি। সে হয়তো এখন কিছুক্ষণ কাঁদবে।

৭

রাতের খাবার দেয়া হলো ন'টার দিকে। দেখা গেল কারোরই খাওয়ার দিকে মন নেই। শুধু সাব্বির, খাবার দেয়া হয়েছে শোনামাত্র, এসে বসেছে এবং খেতে শুরু করেছে। রেহানা বাবুকে কিছু-একটা মুখে দেয়াবার জন্যে আবার ঘরে এসে সাব্বিরের একা একা খাওয়ার দৃশ্যটি দেখলেন। সাব্বির ঘনঘন পানি খাচ্ছে। রেহানা বললেন, খুব ঝাল হয়ে গেছে নাকি?

একটু হয়েছে, অসুবিধা নেই।

এরা বেশ ঝাল দেয়। আলিম রান্না করলে এটা হতো না। আলিম অসুখ হয়ে পড়ে আছে।

কী অসুখ ?

দাঁতে ব্যথা।

সাব্বির গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছে। রেহানা লক্ষ করলেন সে একবারও বলল না— অন্যরা কেউ খেতে আসছে না কেন ? এটা একটা সাধারণ ভদ্রতা। দশ-এগার বছর বিদেশে থাকলেই কেউ অভদ্র হয়ে যায় না। বরং আরো ভদ্র হয়। সেটাই স্বাভাবিক। রেহানা বললেন, এতকিছু রান্না হয়েছে কিন্তু কেউ খেতে চাচ্ছে না। সব নষ্ট হবে।

দিলু ঘরে ঢুকল। সে এসেছে নিশাতের জন্যে এক গ্লাস পানি নিতে। রেহানা দেখলেন, পানি ঢালতে গিয়ে সে অনেকখানি পানি টেবিলে ফেলল। মেয়েটা কাজকর্মে এত আনাড়ি হয়েছে। পানি গড়িয়ে যাচ্ছে সাব্বিরের দিকে। তাকে অল্প সরে বসতে হলো। দিলু বলল, সাব্বির ভাই আপনি এত পেটুক কেন, সবাইকে ফেলে খেতে বসেছেন।

রেহানার কপালে ভাঁজ পড়ল। মেয়েটা এমন রুচিহীন কথাবার্তা বলে। লজ্জায় পড়তে হয়।

দিলু চলে যেতেই সাব্বির বলল, আপনার এই মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। ওর মধ্যে এক ধরনের সরলতা আছে।

রেহানা কিছু বললেন না। মনে মনে সাব্বিরের কথাটার অন্য কোনো অর্থ হয় কিনা বুঝতে চেষ্টা কবলেন। এই মেয়েটিকে তার পছন্দ— এর মানে কি এই নয় যে, বড় মেয়েটিকে পছন্দ নয়। বড়ো মেয়েটির মধ্যে সরলতা নেই। প্রথমদিকে সাব্বিরকে যতটা ভালো লেগেছিল এখন আর ততটা ভালো লাগছে না। ছেলেটি অভদ্র, অমিশুক। অবশ্যি সে অত্যন্ত সুপুরুষ। চেহারায় অন্য ধরনের কাঠিন্য আছে যা সহজেই চোখে পড়ে।

কবির এরকম ছিল না। কবিরের মধ্যে একটা হালকা ফুর্তির ভাব ছিল যা কোনো বয়স্ক মানুষকে ঠিক মানায় না। এটা ভাবতে ভাবতে রেহানা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তে কবিরকে অপছন্দ করার চেষ্টা করছেন। এটা অন্যায়। কবিরকে অপছন্দ করার উপায় নেই। সে এ বাড়ির সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। ওসমান সাহেব, যিনি পৃথিবীর কোনো কথাই প্রায় বিশ্বাস করেন না তিনি পর্যন্ত কবিরের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। একবার কবির এসে বলল, খবর শুনেছেন নাকি ? মালয়েশিয়ায় একটা মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে।

কী ধরা পড়েছে ?

মৎস্যকন্যা। মারমেইড। মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল পত্রিকায় বিরাট ছবি ছাপা হয়েছে। হুলস্থুল কাণ্ড!

বল কী!

অন্য কেউ এ কথা বললে ওসমান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। কবিরের বেলায় সে রকম কিছুই হলো না। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো তিনি বিশ্বাসও করছেন না আবার ঠিক অবিশ্বাসও করছেন না। রাতে শোবার সময় গম্ভীর মুখে

স্ত্রীকে বললেন, দুনিয়ায় কত অদ্ভুত জিনিসই না হয়। রেহানা বললেন, জামাইয়ের কথার কি কোনো ঠিক আছে? তুমি এটা বিশ্বাস করে আছ? ওসমান সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, কোন্ কথাটা এ পর্যন্ত সে মিথ্যে বলছে শুনি? ওসমান সাহেব কবিরের কোনো বদনাম সহ্য করতে পারতেন না। এখনো পারেন না। যে লোক জীবনে কোনোদিন নমাজ-রোজা করেছে বলে রেহানার মনে পড়ে না সেই লোকও দেখা যায় একুশে আগস্টে একটা জায়নামাজ টেনে বের করেন। এবং গভীর রাত পর্যন্ত টুপী মাথায় বসে থাকেন। অপরিচিত এই পোশাকে তাঁকে অদ্ভুত দেখায়। একুশে আগস্ট কবিরের মৃত্যুদিন।

পানি আনতে এতক্ষণ লাগল?

দিলু পানি আনতে দেরি করে নি। গিয়েছে, নিয়ে এসেছে। নিশাত আজ অকারণে রাগ করছে। দিলু বলল, নাও, পানি নাও।

লাগবে না, যা। তৃষ্ণা মরে গেছে।

এটা কেমন কথা। তৃষ্ণা কখনো মরে যায়? তৃষ্ণা থাকেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। দিলু নরম স্বরে বলল, আপা খেয়ে নাও, প্লিজ। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। নিশাত পানির গ্লাস হাতে নিল।

তুমি রাতেও কিছু খাবে না?

না।

কেন?

দেখছিস না আমার শরীর ভালো না।

মাথা টিপে দেব?

না, লাগবে না। তুই এখন যা।

অন্ধকারে একা বসে থাকবে কেন? আমিও থাকি তোমার সঙ্গে।

দিলু খাটের ওপর পা উঠিয়ে বসল। অন্ধকারে পা নামিয়ে বসতে তার ভালো লাগে না। সব সময় মনে হয় কেউ-একজন খাটের নিচ থেকে চুপি চুপি এসে পা চেপে ধরবে।

আপা, একটা ভূতের গল্প শুনবে?

নিশাত জবাব দিল না।

সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের নিজের জীবনে ঘটেছিল।

নিশাত তবুও চুপ করে রইল।

এ গল্প শুনলে তুমি আর একা একা অন্ধকারে বসে থাকতে পারবে না। এবং রাতে ঘুমও আসবে না।

এত ভয়ের গল্প শুনতে চাই নে। থাক। মাথা ধরার মধ্যে গল্প শুনতে ভালো লাগে না।

আপা, তোমার মাথার চুল টেনে দেই?

দে। আস্তে আস্তে টানবি।

দিলু নিশাতের কপালে হাত দিয়েই চমকাল। বেশ জ্বর গায়ে। এতটা জ্বর তা বোঝা যায় নি।

আপা, তোমার গা তো খুব গরম।

হুঁ।

জানালা বন্ধ করে দেই, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

না থাক। জানালা বন্ধ থাকলে আমার কেমন যেন লাগে। মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

মশারি ফেলা নেই। মাঝে মাঝে মশা কামড়াচ্ছে। দিলু হালকা স্বরে বলল, জান আপা, আমি কখনো মশা মারি না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কারণ যেসব মশা মানুষকে কামড়ায় তার সব স্ত্রী মশা। পুরুষ মশারা কামড়ায় না। আমি নিজে মেয়ে হয়ে একটা মেয়ে মশাকে কী করে মারি, বল?

পুরুষ মশারা কামড়ায় না— এ কথাটা তোকে বলেছে কে?

জামিল ভাই বলেছেন।

নিশাত বিছানায় উঠে বসল। নিচু স্বরে বলল, জামিল ভাইয়ের সঙ্গে তোর এত মাখামাখি কেন?

দিলু অবাক হয়ে বলল, এই কথা কেন বলছ?

সব সময় তোর মুখে জামিল ভাই, জামিল ভাই। এটা ভালো নয়।

ভালো নয় কেন?

তোর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা খুব সহজে নানান রকম দুঃখ-কষ্ট পায়।

নিশাত চুপ করে রইল। দিলু বলল, পরিষ্কার করে বল আপা।

নিশাত কঠিন স্বরে বলল, তোর মতো বয়েসী মেয়েরা খুব সহজে মুগ্ধ হয়। দুঃখ-কষ্ট আসে সে জন্যেই।

তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয় তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস। আমার যখন তোর মতো বয়স ছিল তখন তো আমি সবই বুঝতাম। তুই জামিল ভাইয়ের সঙ্গে বেশি মিশবি না।

কেন, সে কি খারাপ লোক?

না, সে খারাপ লোক না। ভালো মানুষ। বেশ ভালো মানুষ। সে জন্যেই ভয়। এক সময় তুই তাকে ভালোবাসতে শুরু করবি। তোর জন্যে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে।

দিলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। নিশাতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু নিশাতের মনে হলো দিলু কাঁদছে।

তুই কাঁদছিস নাকি?

দিলু কোনো উত্তর দিল না। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

চলে যাচ্ছিস?

দিলু সে কথারও কোনো জবাব দিল না। নিশাতের মনে হলো দিলুকে এসব কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন আর মনে করে কী লাভ? যা বলা হয়ে গেছে তা আর ফেরানোর উপায় নেই।

হ্যারিকেন হাতে রেহানা ঢুকলেন। তার কোলে ঘুমন্ত বাবু। তিনি বাবুকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলেন। নিশাত বলল, ওকে তোমার কাছে রাখ মা। আমি আজ এ ঘরে একা শোব।

কেন, একা শুবি কেন?

সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

তোর শরীর ভালো নেই, একজন কেউ তোর সাথে থাকা দরকার। আমি থাকি কিংবা দিলু থাকুক।

কাউকে থাকতে হবে না।

রেহানা একটি কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন— রাতে কি খাবি?

কিছু খাব না।

খাবি না কেন? তোর রাগটা আসলে কার ওপর? ঠিক করে বল তো?

কারো ওপর আমার কোনো রাগ-টাগ নেই। শরীর ভালো নেই, তাই খাব না।

ঠিক আছে।

রেহানা চলে যাচ্ছিলেন, নিশাত বলল, দিলুকে একটু পাঠিও তো মা।

দিলু আসবে না। তুই ওকে কী বলেছিস জানি না। দিলু কাঁদছে।

কাঁদার মতো আমি কিছু বলি নি।

রেহানা শীতল স্বরে বললেন, তোর কথাবার্তা শুনে আমারই কাঁদতে ইচ্ছে হয় আর ও তো বাচ্চা মেয়ে।

ও বাচ্চা মেয়ে নয়। এই বয়সে মেয়েরা বাচ্চা থাকে না।

সবাই তোর মতো নয়। কেউ কেউ বাচ্চা থাকে।

এ কথার মানে কী, মা?

মানে-টানে কিছু নেই। তুই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ নিশাত। যার দুঃখে আজ এরকম করছিস তার সঙ্গে তোর আচার-ব্যবহার কেমন ছিল?

তার মানে?

ক'টা দিন তুই কবিরের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছিস?

মানুষ সব সময় হাসিমুখে থাকতে পারে না।

তা পারে না। কিন্তু তুই ভালোমতো ভেবে দেখ তো কবিরের সঙ্গে তোর ব্যবহারটা কেমন ছিল।

তুমি যাও তো মা।

রেহানা চলে এলেন। নিশাত অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে দরজার ছিটকিনি লাগাল। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ সময়। বাবু ঘুম ভেঙ্গে কাঁদতে শুরু করেছে— মা'র কাছে যাব। মা'র কাছে যাব। রেহানা তাকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। নিশাত শুনল মা বলছেন— কেন যে মরতে এখানে এলাম।

নিশাতের চোখ জ্বালা করছে। আজকাল তার চোখে জল আসে না। চোখ জ্বালা করে। মা একটু আগে যা বলে গেলেন সেটা কি ঠিক? মা কি ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করছেন না যে, সে এখন যা করছে তা করার তার কোনো অধিকার নেই। মা একটা মোটা দাগের ইঙ্গিত করেছেন। স্থূল ধরনের কথা বলেছেন।

সবার স্বভাব এক রকম নয়। সব মেয়েরাই তাদের স্বামীকে নিয়ে আহ্লাদ করে না।

কেউ কেউ গম্ভীর স্বভাবের থাকে। সহজে উচ্ছ্বসিত হয় না। তাছাড়া কবিরের মধ্যে কি সত্যি সত্যি উচ্ছ্বসিত হবার মতো কিছু ছিল?

সে ভালো ছেলে এতে সন্দেহ নেই। আমুদে ছেলে। হৈচৈ করত। প্রচুর মিথ্যে কথা বলত। টিভি'র প্রতিটি বাংলা সিনেমা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখত এবং শেষ হওয়ামাত্র বলত— শালা, সময়টাই মাটি। আগে জানলে কে বসে থাকত? কবির এমন একটি ছেলে যে পৃথিবীর যে-কোনো মেয়েকে বিয়ে করেই সুখী হতো। এই সব ছেলেদের সুখী হবার ক্ষমতা অসাধারণ। এরা হয় সুখী স্বামী, সুখী বাবা এবং বুড়ো বয়সে একজন সুখী দাদা। সুক্ষ্ম রুচির মানুষ এত সহজে সুখী হয় না। সংসারে সুখী হবার মতো উপকরণ ছড়ানো নেই।

বাবু খুব কাঁদছে। নিশাত দরজা খুলে বের হলো। হ্যাজাক লাইটটি বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে। জামিল বাবুকে কোলে নিয়ে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটছে।

জামিল ভাই, ওকে আমার কাছে দিন।

জামিল ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করল। বাবুর ঘুমিয়ে পড়ার একটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মায়ের কথা শুনে জেগে উঠতে পারে। নিশাত অপেক্ষা করতে লাগল।

আচ্ছা, কবির বেঁচে থাকলে কি এরকম করত? ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াত? এটি কখনো জানা হবে না। কিন্তু সবাই বলবে— বেঁচে থাকলে কত আদর করেই না ছেলে মানুষ করত। মৃত মানুষদের সম্পর্কে সব সময় ভালো ভালো কথা ভাবতে হয়। মৃত মানুষেরা অনেক সুবিধা ভোগ করেন। সবার বয়স বাড়ে কিন্তু মৃত মানুষদের বয়স কখনো বাড়ে না। নিশাত এক সময় বুড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু কবিরের বয়স সাতাশ বছরেই থেমে থাকবে। তার কোনোদিন চুলে পাক ধরবে না। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হবে না। কোনো মানে হয় না।

নিশাত, বাবু ঘুমিয়ে পড়ছে। কোথায় রাখবে?

মা'র কাছে দিয়ে আসুন।

জামিল হাঁটছে কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। হাঁটার ভঙ্গিটাও কেমন চেনা চেনা। কবির কি এমন করেই হাঁটত? এখন তার অনেক কিছুই মনে পড়ে না। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। একদিন হয়তো কিছুই মনে থাকবে না।

নিশাত, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।

থ্যাংকস।

তোমার জ্বর কেমন?

আমার জ্বরের খবর মনে হচ্ছে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জামিল তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মৃদুস্বরে বলল, বেড়াতে এসে অসুখে পড়াটা খুব খারাপ।

আমি বেড়াতে-টেড়াতে আসি নি। সবাই এসেছে, বাধ্য হয়ে আমিও এসেছি।

জামিল হালকা স্বরে বলল, অবস্থা এরকম হবে জানলে আমি তোমাদের সঙ্গে জুটতাম না।

জুটেছেন কেন, আপনাকে তো কেউ সাধাসাধি করে নি। নাকি করেছে?

না, করে নি। আমি নিজে থেকেই এসেছি।

কেন এসেছেন?

নিশাত, তোমার শরীর ভালো না। যাও তুমি শুয়ে থাক।

না, আপনি আমাকে বলুন আপনি কেন এসেছেন? ইউ গট টু টেল মি দ্যাট!

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সে লক্ষ করল— নিশাত অল্প অল্প কাঁপছে।

জামিল ভাই, আমি আপনাকে আগেও পছন্দ করি নি, এখানো করি না। আমার মনে হয় আপনি সেটা জানেন না।

নিশাত, যাও ঘুমাতে যাও।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে উঠে এলেন— এই নিশাত কী হয়েছে?

কিছু হয় নি বাবা।

জামিলকে কী বলছিলি?

কিছু বলছিলাম না।

নিশাত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, জামিল, ও চেঁচামেচি করছিল কেন?

জানি না চাচা। আপনি এখনো বারান্দায় বসে আছেন কেন? ঠাণ্ডা লাগবে তো।

ঠাণ্ডা অলরেডি লেগে গেছে। কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকতে ভালোই লাগছে। জামিল, তুমি একটা কাজ কর তো, দেখ, আলিমকে কোথাও পাও কিনা। আর শোন, এই হ্যাজাকটা এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা কর। আলো চোখে লাগছে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

হয়েছে।

সাব্বির কোথায়? ওকে এখানে আসার পর একবারও দেখি নি।

উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আলিম ওসমান সাহেবের সামনে তাঁর প্রিয় গ্লাসটি রাখল। লম্বা গ্লাস। জার্মান ক্রিস্টালের অপূর্ব গ্লাস। এই গ্লাস ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পান না। ওসমান সাহেব স্পষ্ট একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেললেন। আলিম মনে করে এনেছে। আলিম দ্বিতীয়বারে একটা বড় বাটিতে একগাদা বরফ নিয়ে এল।

আরে তুই বরফ পেলি কোথায়?

আসার সময় নেত্রকোণা থেকে বিশ সের বরফ কিনলাম।

বলিস কী! গলে নাই?

কাঠের গুঁড়া দিছি চাইর দিকে। তবু গলছে। এখন আছে অল্প।

আলিম খুব সাবধানে হোয়াইট হর্সের বোতল খুলে হুইস্কি ঢালল। ওসমান সাহেবের পেগ সাধারণ পেগের চেয়ে একটু বড়। আলিম মাপটা জানে। তবু অন্ধকারে কিছু বেশি

পড়ল। অন্য সময় হলে ধমকে দিতেন। আজ কিছুই বললেন না। বরফের ব্যাপারটা তাকে অভিভূত করেছে।

তোর দাঁতের ব্যথার কী অবস্থা?

ব্যথা আছে।

রেহানার কাছ থেকে নিয়ে তিনটা এ্যাসপিরিন খা, ব্যথা কমে যাবে।

আলিম কথা বলল না। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, তোর এখানে থাকার দরকার নেই। যা শুয়ে পড়।

স্যার আপনে ঘরে বসেন, বাইরে ঠাণ্ডা।

বাইরেই ভালো। শোন আলিম, দু'টো পানির বোতল আর কিছু বরফ দিয়ে যাস।

আচ্ছা।

আলিম চলে যেতেই বিদ্যুতের মতো ওসমান সাহেব দিলুর ধাঁধার রহস্য ভেদ করলেন। অত্যন্ত সহজ উত্তর। বরফ। দশ সের পানিকে প্রথমে জমিয়ে বরফ করতে হবে। তারপর সেই বরফের টুকরোটি হাতে করে যেখানে যাবার সেখানে যেতে হবে।

ওসমান সাহেব গভীর আনন্দ বোধ করলেন। নীলগঞ্জ ডাকবাংলোটি তার কাছে হঠাৎ করে বড় প্রিয় হয়ে গেল। যেন তিনি জীবনের সবচে বড় পাওয়াটি এই ডাকবাংলোয় পেয়ে গেলেন। যেন তার আর কিছু পাওয়ার নেই। জীবনের সমস্ত সাধ পূর্ণ হয়েছে।

বাবা!

দিলু একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে উঠে এসেছে, শীতে কাঁপছে অল্প অল্প।

কী-রে দিলু?

তুমি এখানে বসে কী করছ?

কিছু করছি না। বসে আছি।

আমার ঘুম আসে না বাবা। তোমার সঙ্গে একটু বসি?

বোস।

হুইস্কি খাচ্ছ, না? মা জানলে খুব রাগ করবে।

ওসমান সাহেব একটি হাত মেয়ের পিঠের ওপর রাখলেন। দিলু হালকা স্বরে বলল, বাবা, চা চামুচ দিয়ে এক চামুচ খেয়ে দেখি? আমার খুব খেতে ইচ্ছে করে।

ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন— যা একটা চামুচ নিয়ে আয়। বলতে পারলেন না।

দিলু বলল, তোমার শীত করছে না?

করছে। তোর মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ। সবাই ঘুমুচ্ছে। শুধু আমরা দুজন জেগে আছি।

জায়গাটা কেমন লাগছে?

ভালো।

পুকুরটা দেখেছিস?

হুঁ।

বিরাট পুকুর তাই না?

হুঁ। এ রকম একটা বাড়ি আমাদের থাকলে খুব ভালো হতো— তাই না বাবা ? পেছনে বিরাট একটা পুকুর থাকবে। সামনে থাকবে প্রকাণ্ড সব রেন্টি গাছ।

এগুলো রেন্টি গাছ নাকি ?

হুঁ।

কে বলেছে ?

জামিল ভাই বলেছেন।

দিলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর খুব হালকা গলায় বলল, আপা আমার সঙ্গে আজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

আমরা সবাই কখনো না কখনো খারাপ ব্যবহার করি।

কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি তো কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না। করি ? তুমি বল ?

ঘুমুতে যা দিলু।

দিলু উঠে গেল। ওসমান সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ল, আরে তাই তো, ধাঁধার উত্তরটা তিনি জানেন এটা দিলুকে বলা হলো না। উঠে গিয়ে ডাকবেন নাকি ? কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। গাছে জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। শীতল উত্তরী হাওয়া। ওসমান সাহেব চতুর্থ পেগটি ঢাললেন। অনেক বেশি পড়ে গেল, অন্ধকারে অনুমান ঠিক হয় না।

দিলু ঘুমিয়েছে নিশাতের সঙ্গে। প্রকাণ্ড একটা খাট। খাটের নিচে আলো কমিয়ে হ্যারিকেনটা রাখা। ঘরময় আবছা অন্ধকার। পায়ের দিকের জানালার একটা কাঁচ ভাঙ্গা। সেই ভাঙ্গা গলে শীতের হাওয়া আসছে। দুটি কম্বল আছে গায়ে, তবু শীত মানছে না। দিলু নিশাতের দিকে আরো একটু সরে এলো। নিশাত শীতল স্বরে বলল, গায়ের ওপর এসে পড়ছ কেন, দিলু ? সরে শোও। এত ঘেঁষাঘেষি আমার ভালো লাগে না। দিলু অনেকখানি সরে গেল। পাশের ঘরে বাবু কাঁদছে। বিড় বিড় করে কী সব যেন বলছে। বোঝা যাচ্ছে না। দিলু বলল, আপা, বাবু কাঁদছে।

কাঁদছে কাঁদুক।

ওকে এখানে নিয়ে এস না। অনেক জায়গা তো।

ভ্যান ভ্যান করিস না। চুপ করে থাক।

দিলুর চোখ ভিজে উঠল। এমন বাজে করে কথা বলে কেন আপা ? কী করেছে সে ? কিছুই তো করে নি। শুধু বলেছে, বাবু কাঁদছে। এটা বলা কি দোষের ? দিলু কম্বলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেলল। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। বাবুর কান্নার শব্দও সেখানে যাচ্ছে না। অন্ধকার দিলুর ভালো লাগে না। অন্ধকারে তার মৃত্যুর কথা মনে হয়। দাদীজান মারা যাবার সময় থেকেই তার এরকম হয়েছে। দাদীজান মারা গিয়েছিলেন রাত ন'টায়। সবাই যখন কান্নাকাটি করছে তখন হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। কী ভয়াবহ অবস্থা! সবাই কান্না থামিয়ে মোমবাতি মোমবাতি বলে চেঁচামেচি শুরু করল। দিলু বসে ছিল সোফায়। হঠাৎ তার মনে হলো দাদীজান যেন উঠে আসছেন তার দিকে। কী অবস্থা! ভাগ্যিস বাবা তখন লাইটার জ্বালিয়ে দিলুর পাশে এসে বসলেন।

নিশাত মৃদুস্বরে ডাকল— দিলু ঘুমিয়ে পড়েছিস ? দিলু জবাব দিল না। নিশাত কম্বলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলুকে কাছে টানল। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। এত অভিমানী হয়েছে কেন ? নিশাতের ইচ্ছা হলো দিলুকে ডেকে তুলে খানিক্ষণ গল্পগুজব করে। সে আবার ডাকল— এই দিলু, এই পাগলি। দিলুর ঘুম ভাঙল না। নিশাত ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর ঠিক তখনই জামিলের হাসির শব্দ শোনা গেল। কী আশ্চর্য, অবিকল কবিরের মতো ঘর কাঁপিয়ে হাসি। জামিল ভাই তো এরকম কখনো হাসেন না। তার সব কিছুই মাপা। এবং কোনো কিছুর সঙ্গেই কবিরের কোনো মিল নেই। তবু আজ এরকম মিল পাওয়া গেল কেন ? নাকি সব মানুষের মধ্যেই অদৃশ্য কোনো মিল আছে ?

রাত বাড়ছে। বাবু কাঁদছে না। চারদিকে সুনসান নীরবতা। নিশাত হাত বাড়িয়ে দিলুকে কাছে টানল। দিলু ঘুমের মধ্যেই কাঁদছে। কোনো মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে হয়তো। কতদিন হয়ে গেল নিশাত কোনো স্বপ্ন দেখে না!

৮

নিশাত খুব ভোরে জেগে উঠল।

তখনো অন্ধকার কাটে নি। পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। ঘন কুয়াশা চারদিকে। নিশাত দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মাথার যন্ত্রণা আর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। প্রচণ্ড ক্ষিধে। এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ জাগে নি।

নিশাত টুথব্রাশ হাতে বারান্দায় হাঁটতে লাগল। এত সুন্দর বাড়ি। রাতে ঠিক বোঝা যায় নি। নিশাত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছনের দিকে চলে এলো। প্রকাণ্ড পুকুরটি চোখে পড়ল তখন। কুয়াশার জন্যে পুকুরটি পুরোপুরি দেখা যায় না। মনে হয় বিশাল সমুদ্র। পানি দেখলেই ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। নিশাত এগিয়ে গেল।

এই ভোরেও পাতলা একটা উইণ্ডব্রেকার পরে বাঁধানো ঘাটে সাব্বির বসে আছে। তার পাশেই স্ট্যান্ড-ক্যামেরা বসানো। নিশাত বলল, এত ভোরে ক্যামেরায় কার ছবি তুলছেন ?

কুয়াশার ছবি। আপনার জ্বর সেরে গেছে ?

হ্যাঁ।

নিশাত সিঁড়ি বেয়ে শেষ পর্যন্ত নেমে গেল। হাত বাড়িয়ে পানিতে আঙুল ডুবাল। তার ধারণা ছিল পানি বরফশীতল হবে। কিন্তু তেমন ঠাণ্ডা নয়।

আপনি যেমন বসে আছেন ঠিক তেমনিভাবে বসে থাকুন, আমি আপনার একটা ছবি তুলব।

অনুমতি প্রার্থনা নয়। যেন আদেশ। নিশাত বলল, মুখে টুথব্রাশ ঝুলতে থাকবে ?

হ্যাঁ। থাকুক। আপনি হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করছেন। এটাই আমার ছবির থীম।

সাব্বির ক্যামেরা হাতে কয়েকটা ধাপ নেমে এলো। নিশাতের কি রাগ করা উচিত না, বলা উচিত— এভাবে আমি ছবি তুলি না। কিন্তু নিশাত রাগ করতে পারছে না। কেন পারছে না সে-ও এক রহস্য। সাব্বির বলল, আজ ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনে হচ্ছিল ছবির জন্যে একটা ভালো কম্পোজিশন পাব।

আপনি ছবি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না?

ভাবতে পারি হয়তো কিন্তু ছবির কথা ভাবতেই ভালো লাগে।

নিশাত হাসতে হাসতে বলল, আপনার মাথার মধ্যে শুধু কম্পোজিশন ঘুরে তাই না? সাব্বির তার জবাব দিল না। ক্রমাগত ছবি তুলতে লাগল। পানিতে হাত ডুবিয়ে বসে রইল নিশাত। সে একটা ব্যাপার লক্ষ করল— সাব্বির অন্য ফটোগ্রাফারদের মতো নয়। অন্য ফটোগ্রাফাররা বলতো— একটু বাঁ দিকে ফিরুন, একটু হাসুন। মাথাটা একটু ওপরে তুলুন। শাড়ির আঁচল টেনে দিন। সাব্বির কিছুই বলছে না। শুধু ছবি তুলছে! নিশাত হাসতে হাসতে বলল, এত ছবি তুলছেন একটা তো ভালো হবেই।

সব সময় হয় না। ছত্রিশটি ছবির মধ্যে যার একটি ছবি ভালো হয় সে একজন বড় ফটোগ্রাফার।

আপনি একজন বড় ফটোগ্রাফার?

হ্যাঁ।

নিশাত লক্ষ করল সে 'হ্যাঁ' বলেছে খুব জোরের সঙ্গে। যেন সে মনেপ্রাণে কথাটা বিশ্বাস করে। সাব্বির বলল, যে ছবিটি দিয়ে আমি প্রথম নাম করি তার কথা শুনতে চান?

বলুন।

ছবির নাম 'সরলতা'। ইনোসেন্স।

সাব্বির সহজভাবেই নিশাথের পাশে বসল। যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ পাশাপাশি বসেছে।

আমি তখন থাকি নর্থ ডাকোটায়। একবার রুজভেল্ট ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে গিয়েছি। একা একা গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। সেখানে দেখলাম ছোট্ট একটা জলা জায়গা। চারদিকে বড় বড় সব উইলি গাছ। উইলি গাছের ছায়া পড়েছে পানিতে। অপূর্ব পরিবেশ। এবং সেই অপূর্ব পরিবেশে অল্প বয়েসী একটি মেয়ে লাঞ্চবক্স হাতে নিয়ে বসে আছে। ওর বন্ধুটি বোধহয় কাছেই কোথাও গেছে। আমি মেয়েটিকে বললাম— তোমার কয়েকটি ছবি তুলতে চাই। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আমি বললাম— তুমি কি ঘুমিয়ে পড়বার মতো একটা ভঙ্গি করতে পার? সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অসংখ্য ছবি তুললাম, কিন্তু মনে হলো কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ছবিটি অসম্পূর্ণ। ঠিক তখনই একটা বুনো প্রজাপতি এসে বসল লাঞ্চবক্সে, তৈরি হয়ে গেল ছবি। বিখ্যাত ছবি।

বুনো প্রজাপতি আবার কী? সব প্রজাপতিই তো বুনো। পোষা প্রজাপতি আবার আছে নাকি?

ঐ প্রজাপতিটির পাখায় কোনো রঙ ছিল না। কালো কালো দাগ। কাজেই বুনো প্রজাপতি বলছি। আপনি কি ঐ ছবিটি দেখতে চান?

আছে আপনার কাছে?

হ্যাঁ। বসুন আপনি, আমি নিয়ে আসছি।

সাব্বির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

সাব্বিরকে নিশাত কি আগে ভালো করে লক্ষ করে নি নাকি? বেশ লাগছে একে। মনে হচ্ছে এর মধ্যে ভান নেই। শুধু কথাবার্তা নয়, চোখের দৃষ্টিও বেশ স্বচ্ছ। মেয়েদের

মতো বড় বড় চোখ। না, কথাটা ঠিক হলো না। সব মেয়েদের চোখ বড় বড় নয়। বরং বলা উচিত মেয়েলী চোখ। পুরুষ মানুষকে এত বড় বড় চোখে মানায় না। না, এটাও ঠিক হলো না। সাব্বির সাহেবকে তো ভালোই মানিয়েছে। নিশাত বেশ আগ্রহ নিয়ে ছবির বইটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যেন এই আগ্রহ থাকাটা ঠিক নয়। এটা অন্যায়।

এত চমৎকার একটা ফটোগ্রাফির বই নিয়ে সাব্বির ফিরবে নিশাত আশা করে নি। সে দু'বার বলল, এ বইয়ের সব ছবি আপনার তোলা ?

হ্যাঁ। ব্যাক কভারে ফটোগ্রাফারের ছবি আছে। দেখুন না।

আপনি তো বিখ্যাত ব্যক্তি।

হ্যাঁ। আমি মোটামুটি বিখ্যাত। ঐ দেশে অনেকেই আমাকে চেনে।

নিশাত পাতা উল্টাতে লাগল। অপূর্ব সব ছবি। মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো ছবি।

তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় ঐ ছবিটি আছে। দেখুন। ঐ ছবিটি দিয়ে আমি ফটোগ্রাফির জগতে প্রথম এন্ট্রি পাই।

নিশাত তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুলে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না।

ছবিটা ভালো লেগেছে ?

হ্যাঁ। কিন্তু মেয়েটির গায়ে কোনো কাপড় ছিল না— এই কথা আপনি আগে বলেন নি। ও কি এইভাবে বনে বসে ছিল ?

হ্যাঁ।

এবং আপনি ছবি তুলতে চাইতেই রাজি হয়ে গেল ? কোনো আপত্তি করল না ?

না, কোনো আপত্তি করে নি।

ঐ মেয়েটির কী নাম ?

নাম জানি না। ছবির জন্যে মেয়েটির নামের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সাব্বির হেসে উঠল। রোদ উঠে গেছে। কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে। কেমন চমৎকার লাগছে চারদিক। নিশাত নরম গলায় বলল, এই বইটি আমার কাছে থাকুক ?

থাকুক।

নিশাত উঠে দাঁড়াল। নিচুস্বরে বলল, যাই।

সাব্বির বলল, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন।

দয়া করে রাগ করবেন না বা মন খারাপ করবেন না।

এমন কী কথা যে আমি রাগ করব ?

সাব্বির অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলল, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। শুধু ভালো লেগেছে বললে কম বলা হয়। আমার আরো কিছু বলা উচিত। কিন্তু গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার ভালো লাগার ব্যাপারটা আপনার মা'কে বলতে পারি।

নিশাত ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু কিছু বলল না। ঘাটের ধাপ ভেঙে ওপরে এলো।

আপা, তুমি এখানে— আর আমি সারা বাড়ি খুঁজছি।

কেন ?

দিলু হাত নেড়ে নেড়ে বলল, আমরা সবাই মিলে শিকারে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছিস ?

শিকারে। বালিহাঁস মারব আমরা। এসো, তাড়াতাড়ি নাশতা খেয়ে নাও। রোদ বেশি কড়া হলে হাঁস পাব না।

বাবু কোথায় রে ?

জনি না কোথায়। তোমার জ্বর নেইতো ?

নাহ্।

তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন আপা ?

সুন্দর— সেই জন্যে সুন্দর লাগছে।

নিশাত হাসল। আজকের দিনটি চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে।

কুয়াশা নেই। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আকাশ, চৈত্রের আকাশের মতো ঘন নীল। আহ চমৎকার একটি দিন!

৯

শিকারে যাবার প্রোগ্রাম হঠাৎ করেই হয়েছে। নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব সকালবেলা একটি দোনলা বন্দুক আর একগাদা ছর্‌রা গুলি নিয়ে উপস্থিত— স্যার, শিকারে যাবেন নাকি ? বড় গাঙের চরে বালিহাঁস পড়েছে। কায়দামতো একটা গুলি করতে পারলে বিশ-পঁচিশটা পাখি পড়বে।

বলেন কী ?

স্যার, একটা স্পীডবোটের ব্যবস্থা করেছি।

ওসমান সাহেব বহুদিন পর উৎসাহিত বোধ করেন। শিকার করা অনেক দিন হয় না। শেষ শিকারে গিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ বছর আগে।

ওসি সাহেব, তাহলে তো তাড়াতাড়ি রওনা হতে হয়।

জ্বি স্যার।

চা-টা খেয়েই রওনা দেব, কী বলেন ওসি সাহেব ?

ঠিক আছে স্যার।

ওসমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর রক্তে যৌবনের উত্তেজনা অনুভব করেন। থানার ওসি'র মত একজন অধস্তন অফিসারকেও হঠাৎ করে বন্ধুস্থানীয় মনে হয়।

ওসি সাহেব।

জ্বি স্যার।

দিনটাও আজ শিকারের জন্যে ভালো। কুয়াশা নেই, কিছু নেই।

না স্যার, কুয়াশা থাকলেই ভালো। পরিষ্কার দিন শিকারের জন্যে না। একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার স্যার।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল সবাই যাবে। পাখি শিকার হোক না হোক নৌকা ভ্রমণ হবে। কিন্তু সাব্বির যেতে রাজি হলো না। তার নাকি শিকারে তেমন উৎসাহ নেই। রেহানাও থেকে গেলেন। কারণ বাবুর গা গরম হয়েছে। সকালে একবার বমি করেছে। রেহানা ধরেই নিয়েছিলেন নিশাত বাবুকে রেখে যাবে না। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, নিশাত দিলুর মতোই উৎসাহ নিয়ে সাজ করছে। অনেক দিন পর তার চোখ ঝলমল করছে।

স্পীডবোটটি আহামরি কিছু নয়। দেশী নৌকায় বারো হর্স পাওয়ারের একটা মেশিন বসানো, বসবার জায়গা নেই। চারদিক ভেজা। এটা বোধহয় মাছ আনা-নেয়া করে। মাছের বোটকা গন্ধ। তবু দিলুর ভীষণ ভালো লাগছে। সে বসেছে জামিলের পাশে। বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে ক্রমাগত গল্প করছে। ওসমান সাহেব হাসি মুখে বললেন, মেয়েটা তো বড্ড বকবক করতে পারে। সবাই হেসে উঠল। দিলু মোটেও অপ্রস্তুত হলো না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার এক বান্ধবীর গল্প করতে শুরু করল। তার নাম লীনা কিন্তু সবাই তাকে ডাকে বক লীনা। কারণ সে বকের মতো মাথা নিচু করে হাঁটে। দিলু মাথা নিচু করে ব্যাপারটা দেখাল। ওসমান সাহেব বললেন, আয় মা তুই আমার পাশে বসে গল্প কর। কিন্তু দিলু নড়ল না। সে জামিলের পাশেই বসে রইল।

বড় গাঙের চর পর্যন্ত স্পীডবোট নিয়ে যাবার উপায় নেই। পানি কম। তাছাড়া ভট ভট শব্দ হচ্ছে। শব্দে পাখি উড়ে যাবে। ওসি সাহেব বললেন, এখান থেকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। অসুবিধা হবে না তো স্যার?

না, অসুবিধা কী?

খানিকটা পানি ভেঙে যেতে হবে।

বেশি পানি?

জ্বি না স্যার। খুব বেশি হলে হাঁটুপানি। জুতো খুলে ফেলেন।

ওসমান সাহেব জুতা খুলে ফেললেন। দিলুও জুতা খুলল। ওসি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, তুমিও যাবে নাকি খুকি?

জ্বি।

কষ্ট হবে। একটু পরেই রোদ উঠবে কড়া।

উঠুক।

ওসমান সাহেব বললেন, শখ করে এসেছে, চলুক। নিশাত, তুই যাবি নাকি?

আমি হাঁটু পানি ভেঙে যাব? পাগল হয়েছ বাবা?

দিলু বলল, চলো না আপা। আমি তো যাচ্ছি। তোমার ভালোই লাগবে।

এখানে বসে থাকতেই আমার ভালো লাগছে।

ওসমান সাহেব বললেন, একা একা বসে থাকবি, খারাপ লাগবে না?

একা একা থাকব না। জামিল ভাই থাকবেন। কি জামিল ভাই, আমাকে একা ফেলে নিশ্চয়ই আপনি পাখি শিকারে যাবেন না? নাকি আপনিও যেতে চান?

না, আমি আছি।

রোদের তাপ বাড়ছে। মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে মাঠ থেকে। এ অঞ্চল বেশি নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একটা মাছ ধরার নৌকা শুধু যাচ্ছে। নৌকায় বসে থাকা লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু খুব-একটা অবাক হচ্ছে না। স্পীড বোট নিয়ে শহরের লোকজন হয়তো প্রায়ই এদিকে শিকারে আসে।

নিশাত হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে বলল, জামিল ভাই, এই কি সেই বিখ্যাত কাশফুল ?

হুঁ। তবে এখনো ফুল ফুটে নি। সময় হয় নি।

কই, তেমন কিছু তো লাগছে না।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের মতো উঠানামা করে তখন ভালো লাগে। তুমি কি বোটেই বসে থাকবে, না নামবে ?

চলুন নামি। হিল পরে হাঁটা যাবে তো ?

হিল পরে এসেছ ?

হ্যাঁ দেখছেন না কত লম্বা লাগছে আমাকে।

জামিল ঠিক বুঝতে পারছে না। নিশাতকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে। সাজগোজের মধ্যেও যথেষ্ট যত্নের ছাপ। ঠোঁটে কড়া করে লিপস্টিক দিয়েছে।

নিশাত বলল, গ্রাম-নদী এইসব কিন্তু আমার কাছে তেমন এক্সাইটিং মনে হয় না।

একেকজনের দেখার ক্ষমতা একেক রকম। সাব্বির সাহেব যা দেখে মুগ্ধ হবেন তুমি হয়তো তা দেখে মুগ্ধ হবে না। তাছাড়া...।

সাব্বির ভাইকে আপনার কেমন লাগে ?

চমৎকার। ভদ্রলোক অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে দারুণ ইমপ্রেস করেছেন। এই একটি লোক দেখলাম যার মধ্যে ভান নেই।

নিশাত ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এত তাড়াতাড়ি একটা ডিসিশনে আসা ঠিক না। আপনি মানুষ সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে চলে আসেন। নিশাত খুব সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগল।

জামিল বলল, জুতো পরে তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। জুতো খুলে ফেল।

খালি পায়ে হাঁটব ?

হ্যাঁ। খারাপ লাগবে না। শুকনো পথঘাট।

নিশাত হিল খুলে ফেলল— খালি পায়ে হাঁটতে তার ভালোই লাগল। খুশি খুশি গলায় বলল, ফ্লাক্সটা নিয়ে এলে ভালো হতো। কোথাও বসে চা খাওয়া যেত। শাড়ি পরা আট-ন' বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে কোত্থেকে হঠাৎ এসে উদয় হয়েছে। চোখ বড় বড় করে দেখছে। নিশাত বলল, এ্যাই, তোমার নাম কী ? মেয়েটি জবাব দিল না।

বাড়ি কোথায় তোমার ?

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে যেদিকে দেখাল সেদিকে কোনো ঘরবাড়ি নেই।

জামিল ভাই, মেয়েটি কি হারিয়ে গেছে নাকি ?

না ওরা হারাবে না। গ্রামের মেয়ে, সমস্ত অঞ্চল এদের খুব ভালো করে চেনা। নিশাত, কোনদিকে যেতে চাও ?

চলুন, ঐ গাছটার নিচে বসি। কী গাছ ওটা ? বিরাট বড় তো।

শিমুল গাছ।

শিমুল গাছে এত বড় বড় কাঁটা থাকে নাকি?

থাকে।

জামিল সিগারেট ধরাল। নিশাত হ্যান্ডব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে চোখে দিল। হালকা স্বরে বলল, একটা হাসির গল্প বলুন তো। দিলুকে রোজ কী-সব গল্প বলেন। দেখি এবার আমি একটা শুনি।

দিলুকে হাসির গল্প বলি না। দিলুকে বলি ভূতের গল্প। ভূতের গল্প শুনতে চাইলে বলতে পারি।

নিশাত খিলখিল করে হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে ছোট্ট মেয়েটাও হাসতে শুরু করল। জামিল নিজেও হাসল।

না জামিল ভাই, বলুন একটা হাসির গল্প। দেখি আপনি আমাকে হাসাতে পারেন কিনা।

হাসাতে পারলে কী দেবে?

আপনি আগে বলুন, তারপর দেখা যাবে।

টেলিফোনের খুঁটি বাসানো হচ্ছে। সারাদিন ধরে কাজ চলছে। সন্ধ্যাবেলা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কাজ দেখতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন— তোমরা ক'টা খুঁটি পুঁতলে? ওরা বলল, স্যার বারোটা। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, মন্দ না, বারোটা খারাপ না। তারপর গেলেন অন্য একটা দলের কাছে— তোমরা ক'টা পুঁতলে? ওরা বলল, স্যার একটা। ইঞ্জিনিয়ার রেগে আগুন— এত কম! ঐ দল তো বারোটা পুঁতলো। দলের সর্দার বলল, আমাদের কাজ আর ওদের কাজ? ওদের খুঁটির সবটাই মাটির ওপর আর আমাদেরটা দেখুন। মাটির ওপর আছে চার আঙুল। সবটাই ঢুকিয়ে দিয়েছি।

নিশাত গল্প শুনে হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, এই গল্পটা জামিল ভাই আপনি আমাকে ইচ্ছে করে বললেন।

ইচ্ছে করে বলব কেন?

গল্পটা বাবুর আব্বার।

হ্যাঁ, আমি কবিরের কাছ থেকে শুনেছি। এটা একটা চমৎকার গল্প, তাই তোমাকে বললাম। অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সব কিছুতেই তুমি এত উদ্দেশ্য খোঁজ কেন?

নিশাত উঠে দাঁড়াল— চলুন, বোটে ফিরে যাই। ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বলল না। ছোট মেয়েটি আবার পেছনে পেছনে আসছে। খুব কৌতূহল মেয়েটির। ছোট্ট শাড়িটা পরেছেও খুব গুছিয়ে। শাড়ির রঙ গাঢ় সবুজ। তার মধ্যে লাল পাড়। জামিল বলল, নিশাত, তুমি কি লক্ষ করেছ বেশির ভাগ গ্রামের মেয়ের শাড়ির রঙ সবুজ।

না, আমি লক্ষ করি নি। গ্রামই দেখি নি। গ্রামের মেয়ে দেখব কোথায়?

গ্রামের মেয়েরা যে সবুজ শাড়ি পরে এটাও কিন্তু প্রথম নোটিস করে কবির। তার ধারণা, এরা সবুজ দেখতে দেখতে সবুজ রঙের প্রতি একটা উইকনেস জন্মিয়ে ফেলে। আমার ধারণা কিন্তু তা নয়।

আপনার কী ধারণা?

আমার ধারণা, সবুজ রঙের কাপড় ময়লা হয় কম, সে জন্যই এরা সবুজ কাপড় পরে।

আপনার ধারণাটাই প্রাকটিক্যাল। কিন্তু হঠাৎ করে আপনি রঙের প্রসঙ্গ আনলেন কেন ?

জামিল কিছু বলল না। স্পীডবোটে উঠে বসল। স্পীডবোটের ড্রাইভার রোদের মধ্যে পা মেলে দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। নিশাত ফ্লাক্স খুলল— চা দেব জামিল ভাই ?

দাও।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু ? কেক আছে। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

নিশাত এক পিস কেক বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। সে নিল না। পিছিয়ে গেল অনেকখানি। জামিল বলল, এ ভিখিরী নয়, কারো কাছ থেকে কিছু নেয়া এর অভ্যেস নেই।

আপনি চট করে সবকিছু বুঝে যান কীভাবে ?

জামিল হাসল। ঠিক তখনি পর পর দুটি গুলির শব্দ হলো। ওরা পাখি পেয়েছে কিনা কে জানে। স্পীডবোটের ড্রাইভার চোখ কচলে উঠে বসল। শিকারিরা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। নিশাত অবাক হয়ে দেখল তার মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, এত পাখি! তারা ডাকছে কর্কশ গলায়। শুনতে ভালো লাগে না।

ওরা কোথায় যাবে ?

নিরাপদ কোনো জায়গায় যাবে। তারপর সেখানেও শিকারিরা যাবে। সেখান থেকেও এদের উড়ে যেতে হবে।

নিশাত তাকিয়ে রইল। জামিল বলল, সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পাখির জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে গিয়ে। মানুষের জন্যেও এটা সত্যি। আমরাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি।

মাস্টারি করতে করতে বক্তৃতা দেয়া আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

এবং আপনি মনে করেন, জগৎ-সংসারের সমস্ত রহস্য আপনি বুঝে ফেলেছেন ?

না, তা বুঝি নি। তবে বুঝতে চেষ্টা করি। তোমার মতো চোখ বন্ধ করে থাকি না।

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। নিজেই হাত বাড়িয়ে ফ্লাক্স থেকে চা ঢাললো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে বড়সড় একটা বক্তৃতা দেবে কিন্তু জামিল তেমন কিছুই করল না। সিগারেট টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পীডবোটের ড্রাইভার নেমে গিয়ে ছোট মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ যে মেয়ে একটি কথাও বলে নি, তার মুখে এখন খই ফুটছে।

তোর নাম কী ?

ফুলি।

তোর বাপের নাম কী ?

কসির শেখ।

কোন্ গ্রাম ?

আতরা, মিয়াবাড়ি।

ভাই-ভইন কয়জন ?

ছয়জন।

নিশাত খুব মন দিয় ওদের কথাবার্তা শুনছে। এই মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল কেন ?

জামিল ভাই।

বল।

এই মেয়েটি এতক্ষণ কোনো কথাবার্তা বলে নি কিন্তু দেখুন ঐ লোকটির সঙ্গে কেমন জমিয়ে গল্প করছে।

জামিল কোনো উত্তর দিল না।

জামিল ভাই, আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন ?

না, রাগ করি নি। রাগ করতে হলে একটা অধিকার থাকতে হয়। তোমার ওপর আমার সে রকম কোনো অধিকার নেই।

দিলুর ওপর আছে ?

হ্যাঁ, আছে। ওর সঙ্গে আমি কিন্তু প্রায়ই রাগ করি।

আপনারা কি নিয়ে এত কথা বলেন ?

যা মনে আসে তাই বলি। ওর সঙ্গে তো আর হিসাব করে কথা বলতে হয় না।

নিশাত গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, আমার কিন্তু মনে হয় ওর সঙ্গেই আপনার সবচে' সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

কেন ?

এই বয়সে মন অন্যরকম থাকে। আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাচ্ছি ?

পারছি।

আপনি কি এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান ?

চাই। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়।

তার মানে ?

দিলুর মতো যখন তোমার বয়স ছিল তখন তুমি আমার প্রতি অন্যরকম ধারণা পোষণ করতে।

এসব আপনি কী বলছেন ?

স্কুল ছুটির পর ক'দিন এসেছ আমাদের বাড়িতে মনে আছে ?

কেন আপনি এখন এসব পুরনো কথা তুলছেন ?

জমিল চুপ করে গেল।

দেখা গেল শিকারিরা ফিরে আসছে। ওসি সাহেবের হাতে কয়েকটা হাঁস। ওদের জবাই করা গলা দিয়ে তখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। দিলু ওসমান সাহেবের শরীরে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে। জামিল বলল, কী হয়েছে দিলু ?

পায়ে কাঁটা ফুটছে।

শিকার কেমন লাগল ?

ভালো না।

ওসমান সাহেব উল্লাস বোধ করছিলেন। তার চোখে-মুখে ক্লান্তির কোনো চিহ্নই নেই। ওসি সাহেব বললেন, স্যার, কাল আবার যাব নাকি ?

চলেন যাই। নতুন কোনো স্পটে চলেন।

স্যার যেতে হবে কিন্তু আরো সকালে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি শেষ রাতে উঠতে পারেন।

উঠব। শেষ রাতেই উঠব। নো প্রবলেম।

ওসমান সাহেব নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন বোধ করেন।

ওসি সাহেব, রাতে খান আমাদের সঙ্গে।

জ্বি-না স্যার। জ্বি-না।

দিলু বসে নিশাতের পাশে। গাছের গুঁড়িতে বসে থাকা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে— এই, নাম কী তোমার ?

ফুলি।

বাহ্ কী সুন্দর নাম ! ফুল থেকে ফুলি।

ছোট্ট মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল। দিলু বলল, সাব্বির ভাই থাকলে এই মেয়েটির ছবি তুলতে বলতাম। কী সুন্দর মেয়ে, দেখেছ আপা ? নিশাত জবাব দিল না। দিলু বলল, গ্রামের মেয়েরা কী সুন্দর হয়! বড় মায়া লাগে।

১০

ওসমান সাহেব হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছেন। তাঁর ভাগ্য ভালো বরফের জোগাড় হয়েছে। ওসি সাহেব জীপ পাঠিয়ে রবফ আনিয়েছেন। শুধু বরফ নয় তিনি এক কেস বিয়ার এনেছেন। ওসমান সাহেব বিয়ার খান না। তবু খুশি হলেন। প্রথম দিনে এই ওসির ওপর এতটা বিরক্ত হওয়া ঠিক হয় নি।

ওসমান সাহেব সত্যিকার অর্থেই ছুটির আনন্দ ভোগ করলেন। আলিম এসে পেঁয়াজ, মরিচ ও ভিনিগার মাখানো এক প্লেট চিনাবাদাম রেখে গেছে। হুইস্কির সঙ্গে এই প্রিপারেশনটি অপূর্ব।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হলো বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কাঁপছে। হুইস্কি নিয়ে তো প্রায়ই বসেন, এ রকম কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন ? ইচ্ছে হচ্ছে হেসে হেসে সবার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে। চাঁদ উঠেছে কিনা কে জানে। যদি চাঁদ উঠে তাহলে ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে একটু হেঁটে আসলে হয়তো ভালো লাগবে।

বারান্দার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। অপরিচিত কেউ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু তিনি পরিষ্কার বুঝলেন লোকটির গায়ে ইউনিফর্ম।

খট শব্দে স্যালুট হলো— স্যার আমি। ওসি সাহেব পাঠিয়েছেন।

কী ব্যাপার ?

কিছু না স্যার। পাহারার জন্যে। ফিক্সড সেন্ট্রি।

পাহারা লাগবে না, তুমি চলে যাও।

সে ইতস্তত করতে লাগল। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, যাও যাও, পাহারার কোনো দরকার নেই। আমি কি মিনিস্টার ?

এই বলেই তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন। খালি পেটে দু'পেগ পড়ার জন্যেই বোধহয় তাঁর কিঞ্চিৎ নেশা হয়েছে।

আলিমের দাঁতের ব্যথা কমে নি। আজ সারাদিনে আরো বেড়েছে। ডান দিকের গাল ফুলে গেছে অনেকখানি।

আলিম, গোটা চারেক প্যারাসিটামল খাও।

স্যার খাইছি।

লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচি কর।

করেছি স্যার।

গরম সেঁক দাও। সেঁকটা খুব উপকারী।

স্যার আর কিছু লাগব ?

না, লাগবে না। খানা তৈরি হতে দেরি হবে নাকি ?

জ্বি স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আজ রাতে রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে সাব্বির। ওয়াইল্ড ডাক রোস্টের সে নাকি একটি চমৎকার প্রিপারেশন জানে। দুপুর বেলাতেই সে বালিহাঁসগুলির চামড়া তুলে টক দৈ-এ ডুবিয়ে রেখেছে। টক দৈ-এ আট ঘণ্টা ডুবানো থাকতে হবে, এক মিনিটও এদিক-ওদিক হতে পারবে না।

আট ঘণ্টা পার হয়েছে রাতি আটটায়। এখন হাঁসগুলোকে স্টীম করা হচ্ছে। কেটলিতে পানি ফুটানো হচ্ছে। কেটলির নল দিয়ে যে বাষ্প বেরিয়ে আসছে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে স্টীম করবার জন্যে। কায়দাটা ভালোই। দিলু সমস্ত ব্যাপারটা দেখছে মুগ্ধ হয়ে। সে রান্নাঘরে একটা চেয়ার নিয়ে চেয়ারের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে আছে। এবং সারাক্ষণই কথা বলছে।

সাব্বির ভাই, স্টীম দিচ্ছেন কেন ?

স্টীম দেয়ার জন্যে মাংস নরম হবে।

টক দৈ-এ ডুবিয়ে রাখলেন কেন ?

রেসিপিতে বলা হয়েছে তাই। টক দৈ না পেলে ভিনিগারেও ডুবিয়ে রাখা যেত। টক দৈ ভিনিগারের চেয়ে ভালো।

এরপর কী করবেন ?

পেটের ভেতর রসুন ভরে আগুনে ঝলসাব। ব্যাস।

এই রান্না কার কাছ থেকে শিখলেন ?

আমার এক মেক্সিকান বান্ধবী ছিল— ও রাঁধত। ও অনেক রকম রান্না জানত।

দিলু একটু লজ্জা পেল। কেউ এভাবে বান্ধবীর কথা বলে নাকি? কিন্তু সাব্বির ভাই এমন সহজভাবে বলছেন যেন বান্ধবী থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

উনার নাম কী সাব্বির ভাই?

ওর নাম মারিয়া।

মারিয়া? কী বিশ্রী নাম।

বিশ্রী কোথায়? মেরী থেকে মারিয়া।

উনি দেখতে কেমন?

আমার কাছে তো ভালোই লাগত। খুব লম্বা। বড় বড় কালো চোখ। খুব শব্দ করে হাসত।

উনার ছবি আছে?

আছে। দেখতে চাও?

হুঁ।

আচ্ছা দেখাব।

সাব্বির ভাই, আমার কয়েকটা সুন্দর ছবি তুলে দেবেন তো।

দেব।

কবে দেবেন?

যখন চাও। কাল ভোরেই দিতে পারি। এক কাজ কর— তোমার লাল শাড়ি আছে?

না, লাল স্কার্ট আছে।

ঠিক আছে, ঐ লাল স্কার্ট পরে পুকুরে সাঁতার দেবে। আমি ছবি তুলব। সবুজ পানির ব্যাকগ্রাউণ্ডে লাল স্কার্ট চমৎকার আসবে। তবে আমার ফিল্ম হাই স্পীড এ.এস.এ. ফাইভ হানড্রেড। আরেকটু কম হলে ভালো হতো।

আমি তো সাঁতার জানি না।

ইস, সাঁতার দেয়া ছবি ভালো আসত। জলকন্যার এফেক্ট পাওয়া যেত।

রাত-দিন আপনি শুধু ছবির কথা ভাবেন। তাই না?

হুঁ, ভাবি।

দিলু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। দেখল সাব্বির কীভাবে হাঁসের গায়ে স্টীম লাগাচ্ছে। দেখে মনে হয় লোকটা এ কাজ দীর্ঘদিন ধরে করছে। দিলু বলল, মারিয়া বুঝি খুব ভালো মহিলা ছিলেন।

হ্যাঁ। বাঙালি মেয়েদের মতো।

বাঙালি মেয়েরা বুঝি ভালো?

হ্যাঁ। বাঙালি মেয়েরা খুব সেন্টিমেন্টাল। সেন্টিমেন্টাল না হলে মেয়েদের মানায় না।

আচ্ছা সাব্বির ভাই, আমি সেন্টিমেন্টাল?

হ্যাঁ।

কীভাবে বুঝলেন?

জামিল সাহেবের সঙ্গে বসে তুমি গল্প করছিলে, আমি শুনছিলাম।

কথা শুনেই বুঝে গেলেন ?

দিলু, কথা শুনে অনেক কিছুই বোঝা যায়। আমি বুঝতে পারি।

দিলু ভয়ে ভয়ে বলল, আর কী বুঝেছেন ?

বুঝলাম যে, তুমি জামিল সাহেবের প্রেমে পড়েছ। এডোলেসেন্স লাভ। চমৎকার জিনিস।

দিলুর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক কোনো কথাবার্তা না বলে সে চুপচাপ বসে রইল। সাব্বির হাসিমুখে বলল, কি দিলু, ঠিক বলি নি ?

দিলু কোনো জবাব দিল না।

রেহানা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন চোখমুখ লাল করে দিলু চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে আছে। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, তুই এখানে কী করছিস ?

দেখছি।

বাবুকে একটু সামলাবার চেষ্টা করলেও তো পারিস। আমি কতক্ষণ দেখব ?

দিলু নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। রেহানা বললেন, সাব্বির, তোমার রান্নার কতদূর ?

হয়ে এসেছে। এখন শুধু আগুনে ঝলসাব।

খাওয়া যাবে তো ?

আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো না লাগলে এতটা কষ্ট শুধু শুধু করতাম না।

রেহানা বললেন, আমাকে কিছু করতে হবে ?

না, আপনি বিশ্রাম করুন।

রেহানা চলে গেলেন। পুরুষ মানুষ রান্নাঘরে হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এটা তাঁর দেখতে ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে। রেহানা বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন। নিচু গলায় বললেন, আজও বসেছ ?

হ্যাঁ, বসলাম।

বোতল ক'টা এনেছ ?

বেশি না, দুটো মাত্র। রেহানা, একটু বস আমার পাশে।

না।

কেন এরকম করছ ? বেশিদিন তো আর বাঁচব না। শেষ ক'টা দিন আরাম করতে দাও।

বেশিদিন বাঁচবে না— এই তথ্যটা আবার কবে জোগাড় করলে ?

এক পামিস্ট আমার হাত দেখে বলেছে আমি বাঁচব মাত্র ষাট বছর। ভালো পামিস্ট। যা বলে তাই ঠিক হয়। একটু বস রেহানা।

রেহানা বসলেন। ওসমান সাহেব হৃষ্ট গলায় বললেন, একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি, দেখি বলতে পার কিনা।

ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ।

দারুণ ধাঁধা, দিলুর কাছ থেকে শিখেছি এবং নিজে নিজেই উত্তর বের করেছি। আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখছি, তুমি পারবে না। কি, বলব ?

ওসমান সাহেব দিলুর পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়ার ধাঁধাটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন।

কাঁচঘরের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় হাঁস ঝলসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন তেমন জ্বলছে না। বাঁশের চাটাই দিয়ে হাওয়া আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামিল তদারক করছে মোড়ায় বসে। দিলু বারান্দা থেকে তাদের দেখল। একবার ভাবল কাছে যাবে। কিন্তু গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। জামিল ডাকল— এই দিলু, এদিকে আয়। দিলু এগিয়ে গেল।

আমাদের ফটোগ্রাফার সাহেব কি হাঁসকে বাতাস দিয়ে শেষ করেছেন ?

দিলু জবাব দিল না।

কী ব্যাপার এত গম্ভীর কেন ?

মাথা ধরেছে।

আগুনের পাশে বস। মাথা ধরা সেরে যাবে। চেয়ারটা টেনে আন।

দিলু বসল।

গল্প শুনাব নাকি বল ? মারাত্মক একটা ভূতের গল্প জানি। বলব ?

না।

না কেন ? তোর কী হয়েছে ?

দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাই, আপনি আমাকে তুই করে বলবেন না।

কেন ? বলব না কেন ?

আমার খারাপ লাগে।

আপনি করে বলব। তাই চাস ?

দিলু জবাব দিল না।

তোর কী হয়েছে ?

তুই করে বললে আমি জবাব দেব না।

আপনার কী হয়েছে ?

দিলু গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। জামিল তাকে হাত ধরে টেনে বসাল।

দিলু, তোমার কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি ?

না কিছু-একটা হয়েছে। আমাকে বল।

আমার খুব মন খারাপ লাগছে। মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দূর বোকা মেয়ে।

জামিল শব্দ করে হাসল। একটা হাত রাখল দিলুর পিঠে। নিশাত দূর থেকে দৃশ্যটি দেখল। একবার ভাবল— দিলুকে সে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। আগুনের পাশে বসে থাকা মানুষ দুটিকে সুন্দর লাগছে। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। রেহানা এসে বললেন, বাবুকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দে না নিশাত।

আমি পারব না।

দাঁড়িয়েই তো আছিস।

দাঁড়িয়ে আছি না মা। দেখছি।

কী দেখছিস?

দিলুকে দেখছি। দিলু কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে দেখেছ মা?

রেহানা তাকালেন। তিনি দিলুর বড় হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখলেন না। দিলু চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। এটা একটা অভদ্রতা, দিলুকে বলতে হবে। তিনি বাবুর কাছে গেলেন। নিশাত চড়া গলায় বলল, দিলু তুই একটু আয়।

দিলু শান্ত স্বরে বলল, না।

জামিল বলল, যাও না, শুনে আস কী জন্যে ডাকছে।

না, আমি যাব না।

জামিল কৌতূহলী হয়ে তাকাল। তার মনে হলো দিলু কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে। দিলু মদুস্বরে বলল, জামিল ভাই।

কী!

চলুন, আমরা আজ সারারাত এরকম আগুনের পাশে বসে গল্প করি।

কী নিয়ে গল্প করবে?

আগে বলুন আপনি রাজি আছেন কিনা?

না। দারুণ ঘুম পাচ্ছে। তার ওপর সারারাত এরকম ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

দিলু উঠে দাঁড়াল। জামিল বলল, কোথায় যাও? দিলু তার জবাব দিল না।

১১

রোস্ট ডাক জিনিসটি যে খেতে এতটা ভালো হবে রেহানা কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁর আফসোস হতে লাগল তিনি পাশে বসে রান্নার পুরো ব্যাপারটা কেন দেখলেন না। সাব্বির বলল, আমি খুব গুছিয়ে লিখে রেখে যাব, আপনার যখন ইচ্ছা রান্না করতে পারবেন।

বালি হাঁস ছাড়া সাধারণ হাস দিয়ে রান্না হবে?

জানি না। হওয়া তো উচিত। আমি অবশ্যি কখনো ট্রাই করি নি।

জামিল বলল, আমার মনে হয় না সাধারণ হাঁস দিয়ে এটা হবে। সাধারণ হাঁসগুলোর গায়ে প্রচুর চর্বি থাকে। বালি হাঁসের গায়ে চর্বি থাকে না।

নিশাত হাসিমুখে বলল, আপনি বুঝি পৃথিবীর সব জিনিস জানেন?

না, আমি খুব কমই জানি, মাঝে মাঝে লজিক খাটিয়ে দু'একটা কথা বলতে গিয়ে সবাইকে বিরক্ত করি।

ওসমান সাহেব বললেন, দিলুকে দেখছি না যে। দিলু কোথায়?

ও খাবে না। ওর মাথা ধরেছে।

চেখে দেখুক। ডেকে নিয়ে আয় তো নিশাত।

অনেক বলেছি বাবা।

জামিল বলল, আমি নিয়ে আসছি।

দিলু কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। জামিলকে ঢুকতে দেখে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। আলো চোখে লাগে বলে হ্যারিকেন ডিম করে রাখা হয়েছে। জামিল বলল, দিলু আমাদের সঙ্গে এসে বস! জিনিসটা বেশ ভালো হয়েছে। তোমার ভালো লাগবে। দিলু জবাব দিল না।

তুমি হয়তো লক্ষ কর নি। আমি তুমি করে বলছি। এসো দিলু। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আগুনের পাশে বসে গল্প করব।

আমার মাথা ধরেছে জামিল ভাই।

এমন মজার গল্প বলব যে মাথা ধরা সেরে যাবে। এসো!

দিলু উঠে এল। গল্প খুব জমে উঠল খাবার টেবিলে। ওসমান সাহেব পর্যন্ত একটা হাসির গল্প বলে ফেললেন। নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প। সবারই জানা তবু সবাই হাসল। কিছু কিছু সময় আসে যখন সব কিছুই ভালো লাগে।

সাব্বির বলল নিউইয়র্কে এক হোটেলে তার অভিজ্ঞতার গল্প— তার বিছানার সঙ্গে একটি যন্ত্র ফিট করা। সেখানে লেখা— গা ম্যাসাজ করতে হলে এখানে দুটি কোয়ার্টার ফেলুন। বেচারা সরল মনে দুটি কোয়ার্টার ফেলল। তারপর বিছানায় শোয়ামাত্র বিছানা কাঁপতে শুরু করল। সে কী কাঁপুনি! বসে থাকা যায় না, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। মিনিট দশেক পর কাঁপুনি থামল। কিন্তু যন্ত্রটির বোধহয় কিছু একটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হলো কাঁপুনি। থামে, আবার শুরু হয়। আবার থামে, আবার শুরু হয়।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে রেহানা বিষম খেলেন এবং মনে মনে স্বীকার করলেন ছেলেটি রসিক। প্রচুর রসজ্ঞান না থাকলে গল্পটি এত সুন্দরভাবে বলা সম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বললেন, সবাই একটা না একটা গল্প করছে। নিশাত চুপ করে আছে কেন?

বাবা আমি শুনছি।

শুধু শুনলে হবে না। বলতেও হবে।

নিশাত মৃদুস্বরে বলল, একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম আমি। জামিল ভাই হঠাৎ করে দিলুকে 'তুমি তুমি' করে বলছেন।

জামিল শান্ত স্বরে বলল, দিলু বড় হচ্ছে, এখন আর ওকে তুই বলা ঠিক না।

বড় কোথায়, ওর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স।

দিলু শীতল কণ্ঠে বলল, নভেম্বরে আমার পনের হয়েছে আপা। তোমার কিছু মনে থাকে না।

পনের হলেই যদি তুমি বলতে হয় তাহলে তো আমাদেরকেও তুমি বলতে হয়।

দিলু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, দিলু মা'র মনটা মনে হয় খারাপ।

নিশাত বলল, ওর মন ভালোই আছে। লোকজন ওকে তুমি করে বলা শুরু করেছে। মন খারাপ হবে কেন?

আমার মন ভালোই আছে।

সাব্বির বলল, মন ভালো থাকলে আমাদের একটা হাসির গল্প শুনাতে হবে।

দিলু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করল— পরীক্ষায় গরু সম্পর্কে রচনা এসেছে। সবাই লিখছে। একটি ছেলে বলল, স্যার জহির নকল করছে। স্কুলের মাঠে একটা গরু বাঁধা আছে। জহির জানালা দিয়ে গরুটা দেখছে আর লিখছে।

ওসমান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মদ্যপানজনিত কারণে তিনি ঈষৎ তরল অবস্থায় আছেন। ছোট ছোট হাসির ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে অসাধারণ মনে হলো।

আরেকটা বল তো মা দিলু।

ইতিহাসের স্যার প্রশ্ন করলেন— আচ্ছা বল তো, শেরশাহ কোথায় মারা গেছেন? ছাত্র বলল, ইতিহাস বইতে স্যার। পনের পাতায়।

রেহানার মনে হলো তার এই মেয়েটি একটু অন্যরকম হয়েছে। কারো সঙ্গেই ঠিক মেলে না। একটু যেন আলাদা। নিশাত বলল, দুটি গল্পই জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা, তাই না?

হ্যাঁ। তাতে কোনো অসুবিধা আছে?

দিলু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে যেন সে সত্যি জবাবটি শুনতে চায়। সাব্বির বলল, এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হতো না। কেউ কি কষ্ট করে চা বানাবে?

নিশাত উঠে দাঁড়াল— আমি বানাব। দিলু, তুই আয় তো আমার সঙ্গে, একা একা ভয় লাগে।

কেটলিতে চায়ের পানি ফুটছে। নিশাত এবং দিলু বসে আছে চুপচাপ। দিলুর মুখ থমথম করছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদবে। নিশাত বলল, তুই চা খাবি নাকি দিলু?

না।

আয় আমরা বরং কফি খাই। ইন্‌স্‌টেন্ট কফির পটটা কোথায় দেখেছিস?

আপা, আমি কফি খাব না। তুমি কী বলবে বল।

আমি আবার কী বলব?

কিছু-একটা বলবার জন্যেই আমাকে রান্নাঘরে এনেছ। এখন বল কী বলবে।

দিলু, তুই কি রাগ করেছিস?

দিলু চুপ করে রইল। নিশাত বলল, চল দু'জনে দু'কাপ চা নিয়ে পুকুর ঘাটে বসি। যা, গরম চাদর একটা গায়ে জড়িয়ে আয়।

তুমি কি ওখানে নিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাও?

আয় না গিয়ে বসি, তারপর বলা যাবে। যা চাদর-টাদর কিছু-একটা গায়ে দিয়ে আয়।

দিলু উঠে গেল। লাল রঙের একটা শাল বের করে গায়ে দিল। কাঁচঘরের পাশে জামিল সিগারেট টানছে। সে উঁচু গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছিস রে?

দিলু জবাব দিল না। জামিল ভাই 'তুই' বললে সে আর জবাব দেবে না। জামিল বলল, দিলু কোথায় যাচ্ছ?

পুকুর ঘাটে।

একা একা ? একটু সাবধানে থাকবে।

কেন ?

ভূত আছে।

আপনার মাথা আছে।

জামিল শব্দ করে হাসল— তুমি চাইলে আমি সাহস দেবার জন্যে সঙ্গে থাকতে পারি।

সাহস দিতে হবে না।

পুকুর ঘাটটি বড় বেশি নির্জন। মাঝে মাঝে হাওয়া আসে, গাছের পাতায় সরসর শব্দ হয়। ক্রমাগত ঝিঁঝি ডাকে আবার কোনো-এক বিচিত্র কারণে হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক বন্ধ হয়ে চারদিকে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। নিশাত বলল, একটু যেন ভয় ভয় লাগেরে।

ফিরে যাবে ?

নাহ্, বস।

তারা বসল। নিশাত ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। দিলু বলল, আপা, তুমি কী বলতে চাও বল। নিশাত চাপা স্বরে বলল, আমার যখন তোর মতো বয়স তখন জামিল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। জামিল ভাইরা তখন আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন। মগবাজারে।

আপা, আমি জানি।

না, সবটা তুই জানিস না। তারপর কী হলো শোন। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সটা তো খুব খারাপ। সেই বয়সে কাউকে ভালো লাগলে সেটা যে কত তীব্র হয় তা তুই বুঝতে পারছিস কিছুটা। পারছিস না ?

দিলু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। নিশাত বলল, অল্প বয়সের ভালো লাগার অনেক রকম ব্যাপার আছে। যখন কলেজে উঠলাম তখন লক্ষ করলাম জামিল ভাইকে আর ভালো লাগছে না। এরকম হয়। বি.এ. পড়বার সময় বিয়ে হয়ে গেল। যার সঙ্গে বিয়ে হলো সে জামিল ভাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু।

এসব তো আপা আমি জানি।

সবটা জানিস না। শোন মন দিয়ে। তোর দুলাভাই একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন। পৃথিবীর যে-কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারতো। কিন্তু আমি হই নি। আমার সারাক্ষণই জামিল ভাইয়ের কথা মনে হতো।

নিশাত চোখ মুছল। দিলু বলল, আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন আপা ?

জানি না কেন।

আমার এসব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

নিশাত চুপ করে রইল। কাছেই কোথাও সরসর শব্দ হচ্ছে। দিলু বলল, চল আপা ঘরে যাই।

আরেকটু বস। তোকে একটা মজার গল্প বলি। ক্লাস টেনে উঠলাম যেবার সেবার আমি আর জামিল ভাই মিলে ঠিক করলাম পালিয়ে যাব।

কোথায় পালিয়ে যাবে ?

সে সব কিছু ঠিক হয় নি। ঐ বয়সে ভেবে-চিন্তে তো কিছু কখনো করা হয় না। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে পারলে এত ঝামেলা হয় ?

নিশাত হাসতে চেষ্টা করল।

গল্প-উপন্যাসের মতো সত্যি সত্যি একদিন স্কুলে যাবার নাম করে চলে গেলাম কমলাপুর রেল স্টেশন।

তোমরা যাও নি নিশ্চয়ই ?

না, জামিল ভাই আসেন নি।

ভালোই করেছ, যাও নি।

না, ভালো করি নি। এখনো তার জন্যে মনে একটা কষ্ট আছে আমার।

দিলু ছোট্ট করে বলল, তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও ?

নিশাত জবাব দিল না। দিলু দ্বিতীয়বার বলল, তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও ?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে চাই।

দিলুর মনে হলো নিশাত কাঁদছে। গলার স্বর যেন ভাঙা ভাঙা। নিশাত খুব শক্ত মেয়ে। সে কি সত্যি সত্যি কাঁদবে ? বিশ্বাস হয় না। দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাইকে কিছু বলেছ ?

না।

বল তাকে। তিনি তোমার জন্যেই আসেন।

নিশাত দিলুকে বুঝতে চেষ্টা করল। শান্ত ভাবলেশহীন মুখ। উজ্জ্বল চোখ। বড় মায়াবতী চেহারা দিলুর।

নিশাতের মনে হলো আজ ঠিক এই মুহূর্তে দিলুর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে।

লেবু ফুল ফুটেছে কোথাও, মিষ্টি গন্ধ আসছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। নিশাত কাঁদতে শুরু করল। দিলু বসে রইল চুপচাপ। নিশাত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বেঁচে থাকা বড় কষ্ট।

আপা, চল যাই। শীত লাগছে।

আরেকটু বস ! প্লীজ।

তারা দুজন বসে রইল প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। এক সময় হাতে টর্চ নিয়ে তাদের খুঁজতে এলো জামিল— পানিতে ডুবে গেছ কিনা তাই দেখতে এলাম। মনে হচ্ছে ঠিকমতোই আছ। কাজেই ডিসটার্ব না করে চলে যাচ্ছি। শুধু একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে— এ বাড়িতে ভূত আছে। ঠাট্টা না, সত্যি।

নিশাত কিছু বলল না। দিলু বলল, জামিল ভাই, আপনি বসুন এখানে। আপা কী যেন বলবেন আপনাকে। টর্চটা দিন। আমি চলে যাই।

যেতে পারবে একা ?

পারব।

দিলু যেতে যেতে থমকে পেছনে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে জামিল ভাইয়ের জ্বলন্ত সিগারেট উঠানামা করছে। এর বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কত কাছাকাছি বসে তারা দুজন! নিশাত আপা যদি আজ বলে— জামিল ভাই, চলুন আজ সারারাত আমরা গল্প করি তাহলে জামিল ভাই কী বলবেন?

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেবের ঝিমুনি ধরে গেছে। তিনি উঠব উঠব করছিলেন কিন্তু আবার ঠিক উঠতেও চাচ্ছিলেন না।

দিলু একসময় এসে দাঁড়াল তার পাশে।

ঘুমোস নি মা?

না বাবা।

কোথায় ছিলি?

পুকুর ঘাটে বসে ছিলাম আপার সঙ্গে। বাবা, আমি তোমার পাশে একটু বসি?

ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে পাশের চেয়ারটি টানতে গেলেন। দিলু বলল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে বসব। আমাকে একটু জায়গা দাও। ওসমান সাহেব সরে জায়গা করে দিলেন। নরম স্বরে বললেন, দিলু তোর কী হয়েছে?

বাবা, আমার বড় কষ্ট!

কীসের কষ্ট?

জানি না বাবা।

ওসমান সাহেব মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মনে হলো দিলু কাঁদছে। কিন্তু দিলু কাঁদছিল না।

ওসমান সাহেব ভরাট গলায় বললেন, যাও মা ঘুমুতে যাও। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শরীর খারাপ করবে।

রেহানা বাবুকে ঘুম পাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলেন। দিলুকে দেখে বললেন, তোর কি শরীর খারাপ? তোকে এমন লাগছে কেন?

শরীর ভালোই আছে।

নিশাত কোথায়?

পুকুর ঘাটে।

রেহনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, এত রাতে একা একা সেখানে কী করছে?

একা একা না মা। জামিল ভাই আছেন।

রেহানা উঠে বসলেন। তাঁর ধারণা ছিল জামিলকে নিশাত সহ্য করতে পারে না। তিনি কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও জিজ্ঞেস করলেন না। দিলু বলল, মা আমি তোমার পাশে একটু শুয়ে থাকি?

দিলু মা-কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, নিশাত আপার সঙ্গে জামিল ভাইয়ের বিয়ে হলে ভালোই হবে মা।

কী বলছিস বিড় বিড় করে। পরিষ্কার করে বল।

কিছু বলছি না মা।

দিলু আরো শক্ত করে মা-কে জড়িয়ে ধরল। চারদিকে আবছা অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। শীতের হিমেল হাওয়া। বাবু ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠল। একটা টিকটিকি ডাকল— টিক টিক টিক।

১২

দিলু ভাসছিল মাঝপুকুরে।

তার পরনে লাল একটা স্কার্ট। মাথার কালো চুল চারদিকে ছড়ানো। দীঘির সবুজ জলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটি অসাধারণ কম্পোজিশন। একজন ফটোগ্রাফার এরকম একটি দৃশ্যের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে।

সাব্বির দীর্ঘ সময় দিলুর ভেসে থাকা শরীরটির দিকে তাকিয়ে রইল। ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। স্কার্টের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। সাব্বির ছবি তুলতে গিয়েও তুলতে পারল না। পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল— তোমরা কে কোথায় আছ এই মেয়েটিকে বাঁচাও!

দমকা একটা হাওয়া এল তখন। সে হাওয়ায় দিলু ভেসে আসতে লাগল ঘাটের দিকে। যেন সে বলছে— "ছবি তুলুন সাব্বির ভাই।"



মেঘ বলেছে যাব যাব

একদল হাঁসের সঙ্গে সে হাঁটছে।

তার মানেটা কী ? সে হাঁসদের সঙ্গে হাঁটবে কেন ? সে তো হাঁস না। সে মানুষ। তার নাম হাসানুর রহমান। বয়স আটাশ। মোটামুটি সুদর্শন। লাল রঙের শার্ট পরলে তাকে খুব মানায়। সে কেন হাঁসদের সঙ্গে ঘুরছে ?

হাঁসের দল জলা জায়গায় নেমে পড়ল। সেও তাদের সঙ্গে নামল। হাঁসরা শামুক গুগলি জাতীয় খাবার খাচ্ছে। সেও খাচ্ছে। কপ কপ করে খাচ্ছে। ঝিনুকের খোল খুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। একটা হাঁস তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। হাঁসটার চোখ মানুষের চোখের মতো বড় বড়। কাজল পরানো। হচ্ছেটা কী ? এটা কি কোনো দুঃস্বপ্ন ? দুঃস্বপ্ন তো বটেই।

হাসান প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল দুঃস্বপ্নটা থেকে জাগতে। হাঁস না, তাকে স্বাভাবিক মানুষ হতে হবে। শামুক খেতে তার অসহ্য লাগছে। দুঃস্বপ্নটা কাটছে না— বরং আরো গাঢ় হচ্ছে। জলা জায়গাটা এখন নদীর মতো হয়ে গেছে। নদীতে প্রবল স্রোত। সে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে না। স্থির হয়ে ভাসছে— যদিও সে সাঁতার জানে না। ব্যাপারটা তাহলে স্বপ্ন। স্বপ্নেই মানুষ আকাশে উড়তে পারে, প্রবল স্রোতেও স্থির হয়ে ভাসতে পারে।

আহ্ এই দুঃস্বপ্নের ঘুম ভাঙে না কেন ? হাসান পাশ ফিরল। পাশ ফিরতেই সিগারেট লাইটারের খোঁচা লাগল পিঠে। সে চোখ মেলল। ভাগ্যিস পাশ ফিরেছিল। পাশ ফেরার কারণে ঘুম ভাঙল।

স্বপ্নের কর্মকাণ্ডের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। স্বপ্ন নিয়ে রাগ করারও কোনো মানে হয় না। কিন্তু হাসানের রাগ লাগছে। এমন উদ্ভট স্বপ্ন সে কেন দেখবে ?

তার জীবনে উদ্ভট ব্যাপার অবশ্যি মাঝেমধ্যেই ঘটে। ঢাকা শহরে নিশ্চয়ই ঠেলাগাড়ির নিচে কেউ পড়ে নি। সে পড়েছে। মালিবাগ রেলক্রসিঙের কাছে হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা ঠেলাগাড়ি তার গায়ে উঠে গেল। এক সময় সে বিস্মিত হয়ে দেখে ঠেলাগাড়ির দুই চাকার মাঝখানে সে প্রায় গিট্টু পাকিয়ে পড়ে আছে। চারপাশে প্রচণ্ড ভিড়। ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। পুলিশের সার্জেন্ট বাঁশি বাজাচ্ছে। ঠেলাগাড়ির নিচ থেকে তাকে বের করা মোটেই সহজ হয় নি। গাড়ি বোঝাই লোহার রড। সব রড নামিয়ে লোকজন ধরাধরি করে ঠেলাগাড়ি উঁচু করল, তারপরও সে বেরোতে পারল না। কারণ তার বাঁ পা ভেঙে গেছে। তাকে পুরো এক মাস পায়ে প্লাস্টার বেঁধে শুয়ে থাকতে হলো। তার এম.এ. পরীক্ষা দেয়া হলো না। সেই পরীক্ষা এখনো দেয়া হয় নি। আবার কখনো দেয়া হবে— সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

হাসান বিছানায় উঠে বসল। তার ইচ্ছে করছে আগুনগরম এক কাপ চা খেতে। সবার বাড়িতে যদি খানিকটা হোটেল ভাব থাকত তাহলে ভালো হতো। খাটের পাশে টেলিফোন। টেলিফোন তুলে গম্ভীর গলায় বলা— হ্যালো রুম সার্ভিস! এক কাপ আগুনগরম চা।

এ বাড়িতে সকালবেলা এক কাপ চা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। নাশতা খাওয়া শেষ হবার পর সবার জন্যে যখন গণ-চা হবে তখনই পাওয়া যাবে। তার আগে না।

রান্নাঘরে দু' বার্নারের একটা গ্যাসের চুলা। সকালবেলা গ্যাসের চাপ কমে যায়। একটা চুলা অনেক কষ্টে ধিকি ধিকি করে জ্বলে। সেই চুলায় নাশতা তৈরি হয়। রুটি-

ভাজি, কিংবা রুটি-হালুয়া। হাসানের বড় ভাই তারেক ভাত খেয়ে অফিসে যান। তার জন্যে ভাত রান্না হয়। তারেকের দুই পুত্রের স্কুলের টিফিন বানানো হয়। চুলা কখনো খালি থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে সকালে বেড-টি চাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবার কথা।

কোনো একটা ব্যাপার মাথার ভেতর ঢুকে গেলে সেটা আর বেরোতে চায় না। গ্রামোফোনের কাঁটা রেকর্ডের মতো বাজতেই থাকে। 'এক কাপ আগুনগরম চা'— এই বাক্য হাসানের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। হাসান বিছানা থেকে নামল। বাসার সামনের রাস্তা পার হলেই ইস্কান্দর মিয়ার চায়ের দোকান। এক কাপ চা চট করে খেয়ে আসা যায়। সকাল বেলার বিরক্তিকর কর্মকাণ্ড, যেমন— দাঁত ব্রাশ, দাড়ি কামানো আপাতত স্থগিত থাকুক।

হাসান লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরল। লুঙ্গি পরে বাসা থেকে বের হওয়া যাবে না। রীনা ভাবি একগাদা কথা শুনিয়ে দেবে। রীনা ভাবির প্রেস্টিজজ্ঞান খুব বেশি।

বারান্দায় বের হতেই হাসান রীনার মুখোমুখি হয়ে গেল। রীনার হাতে লাল রঙের প্লাস্টিকের বালতি। বালতিভর্তি কাপড়। এই কাপড়ে সে নিজ হাতে সাবান মাখিয়ে কলতলায় রেখে আসবে। কাজের মানুষের হাতে সাবান ছেড়ে দিলে দুদিনে একটা করে সাবান লাগবে।

রীনা শান্ত গলায় বলল, হাসান তুমি আজ অবশ্যই তোমার কোটিপতি বন্ধু রহমানের বাড়িতে যাবে। তার দাদি খুব অসুস্থ। তিনি তোমাকে দেখতে চান।

আচ্ছা।

আচ্ছা না, অবশ্যই যাবে। রহমান কাল সন্ধ্যাবেলা এসে বলে গেছে। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। রহমানের দাদির ব্যাপারটা কী ? উনি প্রায়ই তোমাকে দেখতে চান কেন ?

জানি না ভাবি।

তোমার বন্ধু আজ যে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সেই গাড়ি গলি দিয়ে ঢোকে না। গলির মোড়ে রেখে আসতে হয়েছিল।

হাসান হাসল, কিছু বলল না। রীনা কলতলার দিকে রওনা হতে গিয়েও হলো না। হাসিমুখে বলল, আমি নতুন একটা শাড়ি পরেছি, তুমি তো কিছু বললে না।

নতুন শাড়ি ?

হ্যাঁ। ছেলেদের নতুন শার্ট-প্যান্ট আর মেয়েদের নতুন শাড়ি আলাদা ব্যাপার। মেয়েদের নতুন শাড়ি পরা মানে একটা বিশেষ ঘটনা। সেই ঘটনা যখন ঘটে তখন লক্ষ করতে হয়।

তোমাকে নতুন শাড়িতে খুবই সুন্দর লাগছে ভাবি।

রীনা এমনিতেই সুন্দর। আজ আরো বেশি সুন্দর লাগছে। ঘুম থেকে উঠেই সে গোসল করেছে। সুন্দর করে সেজেছে। ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে। কাজলদানিতে কাজল ছিল না। থাকলে কাজলও দিত।

রীনা বলল, সুন্দর মানুষকে সুন্দর লাগবে না ?

তুমি রাজকন্যা সেজে ধোপানীর মতো কাপড় ধুতে যাচ্ছ— এটা মানাচ্ছে না।

মালাচন্দন নিয়ে কদমগাছের নিচে বসে থাকলে মানাত— তাই না ?

রীনা হাসতে হাসতে কলতলার দিকে চলে গেল। যদিও সে হাসছে কিন্তু তার মনটা খুব খারাপ। আজ একটা বিশেষ উপলক্ষে সে নতুন শাড়ি পরেছে। আজ তাদের বিয়ের ন'বছর পূর্ণ হলো। দিনটার কথা তারেকের মনে নেই। সে ভুরু কুঁচকে খবরের কাগজ পড়ছে। রীনা আজকের দিনের ব্যাপারটা কায়দা করে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে— বলেছে, তুমি তো রোজই শার্ট-প্যান্ট পরে অফিসে যাও। আজ এক কাজ কর, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে যাও। তোমার জন্যে একটা পাঞ্জাবি কিনেছি। তারেক খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বিরক্ত গলায় বলেছে— অফিস কি শ্বশুর বাড়ি নাকি যে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে চোখে সুরমা দিয়ে যাব ? মাঝে মাঝে কী অদ্ভুত কথা যে তুমি বল!

রীনার মুখে কঠিন কিছু কথা এসে গিয়ছিল, সে নিজেকে সামলাল। কী দরকার কঠিন কথা বলার ? আজ সারাদিন সে মেজাজ খারাপ করবে না। কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। রাতে পোলাও রান্না করবে। হঠাৎ পোলাও কেন জিজ্ঞেস করলে বলবে— বাচ্চারা অনেকদিন থেকেই পোলাওয়ের জন্যে ঘ্যানঘ্যান করছিল, ওদের ঘ্যানঘ্যানানি থামানোর জন্যে পোলাও। মিথ্যা বলা হবে না, তার দুটা বাচ্চাই পোলাওয়ের জন্যে পাগল। রোজই খেতে বসে বলবে— মা, পোলাও খাব।

চায়ের স্টলে ঢুকতে গিয়ে হাসান ছোটখাটো একটা ধাক্কার মতো খেল। তার বাবা রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার জনাব আশরাফুজ্জামান সাহেব চায়ের স্টলে বসে আছেন। তিনি বেশ আরাম করে পরোটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন। তাঁর সামনে দুটা বাটি— একটায় সব্জি, অন্যটায় রসে ডোবানো একটা রসগোল্লা। আশরাফুজ্জামান চোখ মেলে ছেলেকে দেখলেন। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়েও নিলেন। মনে হলো তাঁর গলায় পরোটা বেজেও গেল। তিনি খুক্ খুক্ করে কাশতে লাগলেন।

বয়সের সঙ্গে মানুষ কত দ্রুত বদলায় বাবাকে দেখে হাসান ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। এক সময় এই মানুষটার সংসারঅন্ত প্রাণ ছিল— ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার আগে নফল রোজা করতেন। ফাইনাল পরীক্ষার আগে তারা যেন রাত দুটা পর্যন্ত পড়াশোনা করে সে জন্যে নিজে ঘুম ঘুম চোখে পাশে বসে থাকতেন।

সেই মানুষের এখন আর কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই। বড় ছেলের বাসায় তাঁর একটা ঘর আছে, তিনি সেখানে বাস করছেন— এই তো যথেষ্ট। ছেলেদের কার চাকরি আছে, কার নেই তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে ? পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় হয়ে গেছে, এখন শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবা যায়। ক্ষিধে লাগলে চুপিচুপি চায়ের স্টলে বসে— পরোটা রসগোল্লা দিয়ে নাশতা। মন্দ কী ?

আশরাফুজ্জামান বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, কী-রে চা খাবি ?

হাসান কিছু বলল না। তার উচিত চলে যাওয়া, যাতে তিনি আরাম করে খাওয়াটা শেষ করতে পারেন। কিছু না বলে চলে যেতেও অস্বস্তি লাগছে। আশরাফুজ্জামান বললেন, মর্নিং ওয়াক শেষ করে এমন ক্ষিধে লাগল— বাসার নাশতা কখন হয় তার নেই ঠিক। গরম গরম পরোটা আছে খা-না। আমি দাম দিচ্ছি।

হাসান বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। এ কী অদ্ভুত কথা— আমি দাম দিচ্ছি! হাসান বাবার সামনে বসল। একই বাড়িতে দুজন বাস করে, কিন্তু দু'জন এখন কত দ্রুত দুদিকে চলে যাচ্ছে! এই দূরত্ব এখন বোধহয় আর দূর হবার নয়।

আশরাফুজ্জামান আনন্দিত গলায় বললেন, পরোটা কী দিয়ে খাবি? মুরগির লটপটি দিয়ে খাবি? বেশ ভালো।

মুরগির লটপটিটা কী?

কলিজা গিলা পাখনা এইসব দিয়ে ঝোলের মতো বানায়। বেশ ভালো।

তুমি কি প্রায়ই এখানে নাশতা কর?

মাঝে মাঝে খাই। বৃদ্ধ বয়সে রুচি নষ্ট হয়ে যায়। তখন রুচি বদলের জন্যে হোটেল মোটেলের খাবার খাওয়া। রসগোল্লা খাবি?

তুমি কি নিয়মিত রসগোল্লাও খাচ্ছ? তোমার ভয়াবহ ডায়াবেটিস...

শেষ সময় এখন আর ডায়াবেটিস নিয়ে ভেবে কী হবে? তোকে একটা রসগোল্লা দিতে বলব?

বল।

এখানে যে নাশতা করি— বউমা যেন না শোনে। রাগ করবে। মেয়েরা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই রাগ করে। এদের সঙ্গে তর্ক করাও বৃথা। তুই আরেকটা পরোটা নিবি?

না।

নাশতা শেষ করে হাসান বাসায় ফিরল না। বেকার মানুষ একবার ঘর ছেড়ে বেরোলে রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরতে পারে না। সে রওনা হলো রহমানদের বাসার দিকে। রহমানরা থাকে উত্তরায়— সকালবেলা ওইদিকে আরাম করে যাওয়া যায়। বাস ফাঁকা থাকে। জানালার পাশে একটা সিট দখল করে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া। সমস্যা হচ্ছে—যেতে ইচ্ছা করছে না। না যাবার মতো কোনো অজুহাত যদি থাকত। বাস ড্রাইভার্স এসোসিয়েশন স্ট্রাইক ডেকেছে, ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে বন্ধ। রহমানকে বলা যাবে— খুব ইচ্ছা ছিল, বাস নেই, করব কী?

সমস্যা হচ্ছে হাসান মিথ্যা কথা বলতে পারে না। একেবারেই পারে না। দু' ধরনের মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না। সবল মনের মানুষ এবং দুর্বল মনের মানুষ। হাসানের ধারণা সে দুর্বল মনের মানুষ। রহমানদের বাড়িতে তার যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু সে জানে শেষ পর্যন্ত সে উপস্থিত হবে। দুর্বল মনের মানুষরা তাই করে।

রহমানের দাদি আম্বিয়া খাতুনের বয়স প্রায় নব্বই। গত পাঁচ বছর প্যারালিসিস হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। চোখে দেখেন না, তবে কান এবং নাক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আম্বিয়া খাতুন হাসানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কেন করেন সেই কারণ খুব স্পষ্ট না। হাসান নিজেও কারণ খুঁজতে যায় নি। স্নেহমমতার পেছনে কারণ খুঁজতে যাওয়ার মধ্যে ছোটলোকামি আছে। হাসান দুর্বল মনের মানুষ হলেও ছোটলোক না।

রহমানের বাবা সেকান্দর আলি পুলিশের সাবইন্সপেক্টর ছিলেন। ঘুস খাবার অপরাধে তাঁর চাকরি চলে যায়। তিনি ব্যবসা শুরু করেন এবং দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে যান। উত্তরায় দশ কাঠা প্লটে তিনি যে বাড়ি করেছেন তা দেখলে পুলিশের সব সাবইন্সপেক্টরই ভাববে— ঘুস খাবার অপরাধে কেন আমাদের চাকরি যাচ্ছে না।

টাকা-পয়সার সঙ্গে মানুষের রুচি এবং মানসিকতা বদলায়। সেকান্দর আলি সাহেবের পরিবারের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি ঘটে নি। তারা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই

আছে। সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ির সদস্যরা যদি নাভিতে সরিষার তেল দিয়ে রোদে শুয়ে থাকে তাহলে কেমন যেন মানায় না। সেকান্দর আলী সাহেবের পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকালে মনে হয় তারা সবাই যেন নীরবে বলছে— দূর ভালো লাগে না, আগে যখন গরিব ছিলাম তখনই ভালো ছিলাম।

হাসান রহমানদের রাজপ্রাসাদে পৌঁছাল সকাল এগারটায়। পোজপাজ আগে যা ছিল তার চেয়েও বেড়েছে। পোশাক পরা দুই দারোয়ান— একজনের হাতে ব্যাটন।

রহমান বাসায় ছিল না। সেটা কোনো সমস্যা না। হাসানকে এ বাড়ির সবাই চেনে। সে যে আজ আসবে, এটাও সবাই জানে। সেকান্দর আলি সাহেব বিরক্ত মুখে বারান্দার সোফায় বসে আছেন। তাঁর খালি গা। বিশাল ভুঁড়ি ওঠানামা করছে। সকালবেলা দেখার মতো কোনো সুন্দর দৃশ্য না। সেকান্দর আলি সাহেব তাকে দেখে বললেন, যাও দেখা দিয়ে আস। তোমার জন্যে দম আটকে আছে কি না কে জানে ! পরশু থেকে তোমার কথা বলছে। আধাপাগল তো, একবার মাথায় কিছু ঢুকে গেলে আর বের হয় না।

এখন অবস্থা কী ?

অবস্থা আর কী, অক্সিজেন চলছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। কাল রাত তিনটায় শ্বাস উঠল— আমি ভাবলাম ঘটনা বুঝি ঘটেই যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিয়ে আনালাম। ভোরবেলা আবার দেখি সামলে উঠেছেন। দুঃখ-কষ্টে মানুষ হয়েছেন তো, শক্ত শরীর।

হাসান কিছু বলল না। সেকান্দর আলি বিরক্ত গলায় বললেন, গত তিন দিন ধরে কাজকর্ম বাদ দিয়ে ঘরে বসে আছি। কোনো একটা কাজে যাব— মা'র দম বের হয়ে যাবে। শেষ সময়ে দেখা হবে না। ঠিক বললাম না ?

জ্বি ঠিক বলেছেন।

তুমি যাও দেখা করে আস।

উনার জ্ঞান আছে তো ?

জ্ঞান আছে মানে ? টনটনা জ্ঞান। এখনো তার সাথে তুমি কথায় পারবে না। তুমি একটা কথা বললে তোমাকে দশটা কথা শুনিয়ে দেবে।

আম্বিয়া খাতুন বোধহয় ঘুমোচ্ছিলেন। সাধারণত তাঁর ঘরে পা দেয়ামাত্র তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কে ? আজ একেবারে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াবার পর বললেন, কে ?

হাসান বলল, দাদিমা আমি হাসান।

তোকে খবর দিয়েছে কখন ?

কাল সন্ধ্যায়।

এখন বাজে কয়টা ?

এগারটা।

কতক্ষণ পর দেখা করতে এলি ?

সতের ঘণ্টা পর।

এত দেরি হলো কেন ?

দাদিমা আমি খবর পেয়েছি আজ সকালে।

তোর চাকরি বাকরি এখনো কিছু হয় নি ?

না।

ব্যবসাপাতি করবি ?

না।

না কেন ? ব্যবসা কি খারাপ ? আমাদের নবীজী কি ব্যবসা করেন নি ?

আমি তো তাঁর মতো না দাদিমা। সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষ না। তুই গাধামানুষ।

হতে পারে।

তোর বন্ধুবান্ধব সব চাকরি বাকরি পেয়ে গেল তুই পেলি না। এটা কেমন কথা!

পেয়ে যাব।

কবে পাবি ? খবরটা তো শুনেও যেতে পারব না যে তোর চাকরি হয়েছে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বিছানার পাশে বোস— নাকি রোগীর বিছানায় বসতে ঘেন্না লাগে !

হাসান বসল। বৃদ্ধা এক হাতে হাসানের হাত ধরলেন, ক্লান্ত গলায় বললেন, ব্যবসাপাতি যদি করতে চাস, বল, আমি সেকান্দরকে বলব। সেকান্দর আমার কথা ফেলবে না। পাপী ছেলে তো এই জন্যেই ফেলবে না। পাপী ছেলেপুলে বেশি মাতৃভক্ত হয়। তাদের মন থাকে দুর্বল। সব সময় মনে করে— মা মনে কষ্ট পেলে সর্বনাশ হবে। আসলে হয় না কিছুই। আল্লাহপাক কপালে যা লিখে রেখেছেন তাই হয়। মাকে ভক্তি করলেও হয়, মাকে ভক্তি না করলেও হয়। হাসান!

জ্বি।

দুপুরে খেয়ে যাবি। ওরা আজ আমার রোগমুক্তির জন্যে ফকির খাওয়াচ্ছে। খিচুড়ি রান্না হয়েছে। দুই পদের খিচুড়ি হয়েছে — ফকির মিসকিনদের জন্যে ইরি চালের খিচুড়ি, আর ঘরের মানুষের খাবারের জন্যে কালিজিরা চালের খিচুড়ি।

আমি কোন খিচুড়ি খাব ?

তুই তো ফকির মিসকিনের মতোই। তুই খাবি ইরি চালের খিচুড়ি। রাগ করলি ?

জ্বি না।

আমি সেকান্দরকে ডেকে বললাম, বাবা দুই পদের খিচুড়ি করলি কোন আন্দাজে ? গরিব মানুষকে খাওয়াবি— ভালো কিছু খাওয়া। সে বলল, মা চিকন চালের খিচুড়িতে ওদের পেট ভরে না। এই জন্যেই মোটা চাল। আমি তখন বললাম, খুব ভালো বুদ্ধি করেছিস। শোন বাবা, তুই আজ মোটা চালের খিচুড়ি খাবি। এটা আমার আদেশ। এই শোনার পর থেকে সেকান্দর আলি মুখ শুকনা করে বসে আছে। তার কত বড় ভুঁড়ি হয়েছে দেখেছিস। চার-পাঁচ বালতি চর্বি আছে ওই ভুঁড়ির ভেতর। হি হি হি।

আম্বিয়া খাতুন শব্দ করে হাসতে লাগলেন। হাসির দমকে নাক থেকে অক্সিজেনের নলটা ছুটে গেল। নার্স এসে নল লাগিয়ে হাসানকে কঠিন গলায় বলল— রোগীকে শুধু শুধু হাসাবেন না। ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনের রোগী। আপনি এখন যান।

হাসান বের হয়ে এল। আম্বিয়া খাতুন তখনো হাসছেন। মহিলার কি মাথা আউলা হয়ে গেছে ? দাঁত নেই মানুষের হাসিতে অশরীরী ভাব থাকে। গা ছমছম করে। হাসানের গা ছমছম করছে।

সেকান্দর আলি বললেন, চলে যাচ্ছ নাকি ?

হাসান বলল, জ্বি না।

মা'র সঙ্গে দেখা তো হয়েছে। শুধু শুধু বসে থেকে কী করবে, চলে যাও।

দাদিমা খেয়ে যেতে বললেন। মোটা চালের খিচুড়ি খেতে বললেন।

ও আচ্ছা, তাহলে খেয়ে যাও। দেরি হবে কিন্তু। এখন ফকির মিসকিনদের খাওয়াবে। রান্না হয় নি এখানো। রান্না হবে তার পর। ফকির ব্যাচ শেষ হলে আমাদের খাওয়া। তিনটা বেজে যাবে। থাকবে এতক্ষণ ?

জ্বি।

বেশ থাক। এখন করছ কী ?

কিছু করছি না।

রহমান যে বলল হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে কী কাজ করছ।

তেমন কিছু না। যা করছি তাকে চাকরি বলা যায় না।

কোনো কাজকেই ছোট করে দেখবে না হাসান। কোনো কাজই ছোট না। শিক্ষিত ছেলেপুলেদের এই এক সমস্যা হয়েছে। চাকরির জাতিভেদ করে ফেলেছে। কাজ হচ্ছে কাজ।

জ্বি।

তিনটা পর্যন্ত চুপচাপ বসে না থেকে তুমি বরং ঘুরে টুরে এসো। দুটা-আড়াইটা নাগাদ চলে এসো। অসুস্থ মানুষের বাড়িতে বসে থাকাও তো যন্ত্রণা।

আমার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না।

সেকান্দর সাহেব বললেন, তাহলে থাক। লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বোস। বইটই পড়। লাইব্রেরি ঘরটা নতুন করেছি। কনকর্ডকে দিয়ে ডিজাইন করানো। চার লাখ টাকা নিয়েছে লাইব্রেরি করতে। অল বার্মাটিক। এখন তো আর বই পড়া হয় না। শেষ বয়সে পড়ব এই জন্যে লাইব্রেরি বানানো। যাও দেখ গিয়ে— শেলফ থেকে বই যদি নামাও তাহলে যেখানকার বই সেখানে তুলে রাখবে।

জ্বি আচ্ছা।

চার লাখ টাকা দামের বার্মাটিকের লাইব্রেরি দেখার ব্যাপারে হাসানের উৎসাহ দেখা গেল না। সে লাইব্রেরি ঘরের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। সামনে খবরের কাগজ আছে কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করছে না। বেকার মানুষ খবরের কাগজ পড়তে পারে না— এই তথ্যটা কি কেউ জানে ? মনে হয় জানে না। নতুন বেকাররা অবশ্যি পত্রিকা হাতে নেয়, আগ্রহ নিয়ে কর্মখালি বিজ্ঞাপন পড়ে। পুরনো বেকাররা তাও করে না। সে পুরনো বেকার।

খবরের কাগজে মজা কিছু কি আছে ? বাণী চিরন্তনী, কিংবা শব্দ জট, এস ওয়ার্ড পাজল ?

চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এই সবের ওপর চোখ বোলানো যায়। শব্দজট পাওয়া গেল। শব্দগুলো উলটপালট করে লেখা— মূল শব্দ খুঁজে বের করতে হবে। হাসান অনাগ্রহ নিয়ে শব্দগুলো দেখছে—

কুলাশন্ত
ণত্রারিপ
জ্রভিতাঅ

শেষের দুটা পারা গেল— পরিত্রাণ এবং অভিজ্ঞতা। প্রথমটা কী ? ধাঁধা-শব্দজট এই ব্যাপারগুলো ভয়াবহ, একবার মাথায় ঢুকে গেলে আর বেরোতে চায় না। মাথায় ঘুরতে থাকে। খুবই অস্বস্তি লাগে। হাসানের মাথায় ঘুরছে কুলাশন্ত কুলাশন্ত, কুলাশন্ত, কুলাশন্ত। আসল শব্দটা কী ? পারমুটেশন কম্বিনেশনে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না—

লাশন্তকু
কুশলান্ত
ন্তশলাকু

কিছুই তো হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে হাসানের মাথা ধরে গেল। সে মাথা ধরা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আশ্চর্য কাণ্ড ঘুমের মধ্যে আবারো সেই উদ্ভট স্বপ্ন! সেই হাঁসের দলের সঙ্গে সে। এবারের হাঁসগুলো মানুষের মতো কথা বলছে। সর্দিবসা গলায় খ্যাস খ্যাস করে কথা। হাসান তার পাশের হাঁসটিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি শব্দজট ছাড়াতে পার ?

হাঁসটা বলল, জ্বি স্যার পারি।

'কুলাশান্ত' জট ছাড়ালে কী হবে ?

এটা পারব না। এটা পারব না।

তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে না ?

জ্বি না। তবে একজন পারতে পারে— তার খুব বুদ্ধি।

সে কে ?

তার নাম শকুন্তলা।

হাঁসের নাম শকুন্তলা।

জ্বি। আপনাদের যেমন নাম আছে— আমাদেরও আছে। ওই যে শকুন্তলা, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন।

জিজ্ঞেস করতে হবে না। শব্দ জট দূর হয়েছে। কুশলান্ত হলো শকুন্তলা।

হাসানের ঘুম ভাঙল। আশ্চর্য! বেলা পড়ে এসেছে। ঘড়িতে বাজছে চারটা দশ। এত লম্বা ঘুম সে দিল কীভাবে ? সে কি অসুস্থ ? অসুস্থ মানুষরাই সময়ে-অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে উদ্ভট এবং জটিল স্বপ্ন দেখে।

বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ফকির মিসকিনরা কি খিচুড়ি খেয়ে চলে গেছে ? তাকে কেউ ডাকে নি। রেডক্রস আঁকা একটা গাড়ি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আম্বিয়া খাতুনকে দেখতে কোনো ডাক্তার বোধহয় এসেছেন। হাসানের পেট চক্কর দিয়ে উঠছে। সে রাস্তার পাশে বসে হড় হড় করে বমি করল।

শরীরটা আসলেই খারাপ করেছে। মাথা টলমল করছে। বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী হবে বাসায় ফিরে ?

স্যার আপনের কী হইছে ?

খালি একটা রিকশা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। প্রশ্নটা করছে রিকশাওয়ালা। তার গলায় কৌতূহলের চেয়েও মমতা বেশি। একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনে একশ' বার সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে মমতা ও করুণায় আর্দ্র কথা শুনবে। সম্পূর্ণ অপরিচিত

একজন মানুষ বাড়িয়ে দেবে সাহায্যের হাত। এই রিকশাওয়ালা কি সেই একশ' জনের এক জন ?

স্যার আপনার কী হইছে ?

কিছু না। হঠাৎ শরীরটা খারাপ করেছে।

বাড়িত যান। বাড়িত গিয়া ঘুমান। আহেন রিকশাত উঠেন, লইয়া যাই।

রিকশা করে যাবার ভাড়া নেই রে ভাই।

ভাড়া লাগব না, আহেন।

হাসানের কাছে রিকশা ভাড়া আছে। রিকশাওয়ালা সেই একশ জনের এক জন কি না তা পরীক্ষা করার জন্যেই কথাগুলো বলা। মনে হচ্ছে এই রিকশাওয়ালা সেই এক শ জনের এক জন।

স্যার যাইবেন কই ?

হাসান কিছু বলল না। রিকশায় উঠলেই তার মানসিকতা একটু যেন বদলে যায়। নির্দিষ্ট কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। রিকশাওয়ালা তার ইচ্ছেমতো নানা জায়গায় নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে রিকশা থামিয়ে রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে চা খাবে। আনন্দময় মন্থর ভ্রমণ। স্কুলে রচনা আসে— এ জার্নি বাই ট্রেন, এ জার্নি বাই বোট। জার্নি বাই রিকশা রচনাটা আসে না কেন ?

স্যার যাইবেন কই ?

হাসান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল— চলতে থাক। রিকশাওয়ালা হাসল। তবে কথা বাড়াল না। সে ধীরে সুস্থে প্যাডেল চাপছে। হাসান হুড ধরে চুপচাপ বসে আছে। তার মাথা খানিকটা টালমাটাল করছে। বমি করার পর মুখ ধোয়া হয় নি। সমস্ত শরীরই কেমন অশুচি অশুচি লাগছে। কোনো একটা ফোয়ারার পাশে রিকশা থামিয়ে ফোয়ারার পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। ফোয়ারাগুলো নাকি কোটি কোটি টাকা খরচ করে বানানো হয়েছে। শহরের সৌন্দর্যবর্ধন করা হচ্ছে। হাসান আকাশের দিকে তাকাল। মেঘে মেঘে আকাশ কালো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের লাইন মনে আসছে— মেঘের পরে মেঘ জমেছে। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি কখনো রিকশায় চড়েছেন ? মনে হয় চড়েন নি। রিকশায় চড়লে সুন্দর একটা বর্ণনা পাওয়া যেত। হাসানের পেট আবার পাক দিচ্ছে। আবারো কি বমি হবে ? ঝুম বৃষ্টি নামলে খুব ভালো হতো। বৃষ্টিতে নেয়ে ফেলা যেত। ক'দিন ধরেই রোজ বিকেলে মেঘ করছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না।

রীনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সকালবেলার নতুন শাড়িটা তার গায়ে নেই। সে পুরনো একটা শাড়ি পরেছে। বেগুনি এবং গোলাপির মাঝামাঝি রং। নতুন অবস্থায় শাড়িটা পরলে নিজেকে খুব চকচকে লাগত। পুরনো হয়ে শাড়িটা সুন্দর হয়েছে। এই শাড়ি পরে রীনা দাঁড়িয়ে আছে, কারণ একদিন তারেক বলেছিল— বাহ্! শাড়িটায় তো তোমাকে খুব মানিয়েছে। রীনার ধারণা তারেকের এটা কথার কথা। হঠাৎ কী মনে হয়েছে— বলেছে। শাড়ির দিকে ভালোমতো না তাকিয়েই বলেছে। স্বামীরা স্ত্রীদের খুশি করার জন্যে মাঝে মাঝে এ ধরনের কথা বলে। যে শাড়িটা পরার জন্যে স্বামী খুব সুন্দর বলে সেই শাড়ি পরে ঘুরলে স্বামী ফিরেও তাকায় না।

রাত দশটার মতো বাজে। তারেকের জন্যে অপেক্ষা। অফিস থেকে বিকেলে বাসায় ফিরেছে। এক কাপ চা খেয়ে হাসিমুখে বলেছে— রীনা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরব। রীনা বলেছে, যাচ্ছ কোথায় ? তারেক জবাব দেয় নি। মুখ টিপে হেসেছে। রীনা ধরেই নিয়েছে— তারেকের শেষ মুহূর্তে বিয়ের দিনের কথাটা মনে পড়েছে। সে যাচ্ছে কিছু একটা কিনতে। পাঁচ-ছ'টা সস্তার মরা মরা গোলাপ কিনবে। বেলিফুলের মালা ভেবে যে মালাটা কিনবে সেটা আসলে রজনীগন্ধা ফুলের মালা। যা ইচ্ছা কিনুক— বিয়ের দিনের কথাটা মনে পড়েছে এই যথেষ্ট।

এখন মনে হচ্ছে তারেক উপহার কিনতে যায় নি। কোনো কলিগের বাসায় গিয়েছে। বিয়ের দিনের কথাটা তার মনেও নেই। আসলে বিয়ের দিনটাকে মেয়েরা যত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ছেলেরা হয়তো ততটা করে না। ঘরে সে আজ পোলাও রান্না করেছে। বাচ্চা দুটার এত শখের পোলাও! ওরা না খেয়েই ঘুমিয়েছে। ব্যাপারটা ঘটেছে রীনার জন্যে। ওরা খেতে চেয়েছে— রীনা বলেছে, বাবা আসুক তারপর খাবে। বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বেচারারা ঘুমিয়ে পড়েছে। এদের ঘুম অসম্ভব গাঢ়। একবার ঘুমোলে আর জাগবে না। তারেকও নিশ্চয়ই খেয়ে আসবে। বিয়ের দিনে যে পোলাও রান্না হয়েছে সেটা কেউ খাবে না।

ভাবি, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

রীনা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। লায়লা চুপিচুপি কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মেয়ে কোনো রকম শব্দ না করে হাঁটতে পারে।

লায়লা বলল, ভাইয়ার জন্যে অপেক্ষা করছ ?

না। গরম লাগছিল, তাই বারান্দায় দাঁড়িয়েছি। কী অসহ্য গরম পড়েছে দেখেছ ? আজ এত মেঘ করেছিল! ভাবলাম— বৃষ্টি হবে, বৃষ্টিতে ভিজব।

খবরদার ভাবি বৃষ্টিতে ভিজবে না, চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে।

চামড়া নষ্ট হবে কেন ?

শহরের বৃষ্টি মানেই হলো এসিড রেইন। গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া বৃষ্টির সঙ্গে গায়ে এসে পড়ে চামড়ার বারোটা বাজিয়ে দেবে।

রীনা হাসল। তার এই ননদ শরীরের চামড়া, মাথার চুল, চোখ এইসব ব্যাপারে খুব সাবধান। শরীর ঠিক রাখার নানা কায়দা-কানুন সে করে।

ভাবি, চামড়ার সবচে' ক্ষতি কীসে হয় তুমি জান ?

না।

সবচে' ক্ষতি করে আলট্রা ভায়োলেট রে। সূর্যের আলোয় যে মেয়ে সবচে' কম আসবে তার চামড়া থাকবে সবচে' সুন্দর।

তারেক আসছে। হেঁটে হেঁটে আসছে। মুখে পান। পানের পিক ফেলল— তার মানে খেয়ে এসেছে। লায়লা বলল, ভাবি ভাইয়া চলে এসছে।

তাই তো দেখছি।

তুমি ভাইয়াকে বলে আমার জন্যে দু শ টাকা নিয়ে রেখো তো ভাবি। আমাদের ক্লাসে পিকনিক হচ্ছে— দু শ টাকা করে চাঁদা। ছেলেরা এক শ আর মেয়েরা দু শ। মেয়েদের হাতে নাকি টাকা বেশি থাকে এই জন্যে চাঁদা বেশি। টাকাটা কাল সকালেই

দিতে হবে ভাবি।

আচ্ছা আমি টাকা নিয়ে রাখব।

তারেক হাতমুখ ধুয়ে সরাসরি শোয়ার ঘরে চলে এল। রীনা বলল, ভাত খাবে না ?

তারেক হাই তুলতে তুলতে বলল, না।

খেয়ে এসেছ ?

হুঁ। আমাদের এক কলিগের মেয়ের আকিকা ছিল। খাসির রেজালা ফেজালা করে হুলস্থুল করেছে।

ও আচ্ছা।

রান্নাও হয়েছে ভালো। এমন খাওয়া খেয়েছি যে হাঁসফাঁস লাগছে। লবণ দিয়ে লেবুর শরবত করে দাও তো। পানিটা কুসুম কুসুম গরম করে নিও।

রীনা রাতে কিছু খেল না। একা একা খেতে ইচ্ছা করে না। বিয়ের দিন উপলক্ষে সে খুব আগ্রহ করে পোলাও রান্না করেছিল। আশ্চর্য, সেই পোলাও কেউ খেল না। লায়লা পোলাও খায় না। হাসানের শরীর খারাপ, সে না খেয়েই শুয়ে পড়েছে। রীনার শ্বশুর গিয়েছেন কল্যাণপুর তাঁর মেয়ের বাসায়। রীনার কান্না পাচ্ছে। এত তুচ্ছ ব্যাপারে কাঁদা ঠিক না। রীনার সমস্যা হচ্ছে বড় বড় দুঃখের ব্যাপারে তার কান্না পায় না। ছোট ছোট ব্যাপারে চোখে পানি চলে আসে।

রীনা ঘুমোতে যাবার আগে হাসানের ঘরে উঁকি দিল। হাসানের ঘরের দরজা খোলা—ঘর অন্ধকার। হাসানের এই অভ্যাস— মাঝে মাঝে দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

হাসান।

জ্বি ভাবি।

দরজা খোলা রেখে ঘুমোচ্ছ। দরজা লাগাও।

ঘুমোচ্ছি না ভাবি। জেগে আছি।

শরীরের অবস্থা কী ?

অবস্থা ভালো। এখন একটু যেন ক্ষিধে ক্ষিধে লাগছে।

কিছু খাবে ? পোলাও আছে, গরম করে দেব ?

পাগল হয়েছ! দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন ভাবি, ভেতরে এস।

রীনা ঘরে ঢুকল। হাসান টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। রীনা খাটের পাশে বসতে বসতে বলল, তুমি ভালো একজন ডাক্তার দেখাও হাসান। দু'দিন পরপর তুমি অসুখ বাঁধাচ্ছ।

হাসান দেয়ালে হেলান দিয়ে খাটে বসেছে। অন্ধকারে খালি গায়ে শুয়েছিল— ভাবিকে দেখে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছে, সেই পাঞ্জাবি উল্টো হয়েছে। বুক চলে গেছে পেছনে। হাসান বিব্রত ভঙ্গিতে পাঞ্জাবি দেখতে দেখতে বলল, ভাবি আমার অসুখটা হলো মনে। মনটা ঠিক নেই, এই জন্যেই শরীর ঠিক থাকছে না।

মন ঠিক নেই কেন ?

চাকরি টাকরি পাচ্ছি না— এই জন্যেই মন ঠিক নেই।

তুমি না বললে হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কাজ করছ।

ওইটা কোনো কাজ না ভাবি। সপ্তাহে একদিন যাই, ভদ্রলোকের কথা শুনি। খাতায় নোট করি। ওই প্রসঙ্গ থাক। আচ্ছা ভাবি হাঁস স্বপ্নে দেখলে কী হয়? ইদানীং খুব হাঁস স্বপ্নে দেখছি। ঘুমোলেই দেখি এক ঝাঁক হাঁসের সঙ্গে হাঁটছি, সাঁতার কাটছি।

রীনা তাকিয়ে আছে। তার খুব মায়া লাগছে। হাসানকে অসহায় দেখাচ্ছে। রীনার যদি চেনাজানা কোনো মন্ত্রী থাকত তাহলে সে হাসানের চাকরির জন্যে মন্ত্রী সাহেবের পা ধরে বসে থাকত।

ভাবি যাও ঘুমোতে যাও।

রীনা উঠে দাঁড়াল। হাসান বলল, ভাবি এক সেকেন্ড। তোমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছিলাম। টেবিলের ওপর রেখেছি, নিয়ে যাও। আমি গরিব মানুষ— এরচে' বেশি কিছু দেবার আমার ক্ষমতা নেই।

রীনা বিস্মিত হয়ে দেখল টেবিলে গোলাপ ফুলের সুন্দর একটা তোড়া। তোড়ায় ন'টা গোলাপ। তাদের বিয়ের ন' বছর আজ পূর্ণ হয়েছে। হাসান বলল, হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভারসারি ভাবি।

রীনা বলল, থ্যাংক য়্যু।

তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। গোলাপগুলো এত সুন্দর! মনে হচ্ছে, এইমাত্র বাগান থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে।

হাসানের ঘুম আসছে না। সে এপাশ ওপাশ করছে। কাল বুধবার। হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনাকে কি মুখ ফুটে সে বলে ফেলবে— স্যার, আমি খুব কষ্টে আছি। আমাকে পার্মানেন্ট একটা চাকরি দিন। আপনার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না।

হিশামুদ্দিন সাহেবের কথা ভাবতে ভালো লাগছে না। ঘুমোবার আগে সুন্দর কিছু ভাবা দরকার। তিতলীর কথা ভাবা যায়। তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কাল্পনিক কথাবার্তাও বলা যায়।

তিতলী কেমন আছ?

ভালো আছি।

আজ কী গরম পড়েছে দেখেছ?

হুঁ।

তুমি কি জান আমি যে ঘরে ঘুমোই সে ঘরে কোনো ফ্যান নেই।

জানি না, আমি তো তোমার ঘরে কখনো ঢুকি নি।

আমি করি কী জান? ঘরের দরজা-জানালা সব খুলে ঘুমোই। রীনা ভাবি খুব রাগ করে। রীনা ভাবির ধারণা. দরজা খোলা থাকলেই চোর ঢোকে। চোর ঢুকলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমার ঘরে এমন কিছু নেই যে চোর এসে নিয়ে যাবে।

অন্য কিছু নিয়ে কথা বল তো। চোর নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না।

হাঁস নিয়ে কথা বলি? শোন তিতলী, হাঁস স্বপ্নে দেখলে কী হয় তুমি জান? ইদানীং আমি ঘুমোলেই শুধু হাঁস স্বপ্নে দেখছি।

কী হাঁস— রাজহাঁস?

আরে না। আমি ছোট মানুষ, আমার স্বপ্নগুলোও ছোট ছোট— আমি স্বপ্নে দেখি পাতিহাঁস। একটা দুটা না— হাজার হাজার পাতিহাঁস। আমার ধারণা, আমি পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি।

তিতলী হাসছে। খিলখিল করে হাসছে। হাসান কল্পনায় একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু তার হাসি এত জীবন্ত! হাসান তিতলীর হাসি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য তো!

২

গরম লাগছে?

হাসান বলতে যাচ্ছিল, জ্বি না স্যার। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। গরম লাগছে না বললে বোকার মতো কথা বলা হবে। বোকার মতো কথা সে প্রায়ই বলে কিন্তু এই লোকের সঙ্গে বোকার মতো কথা বলা যাবে না। যা বলার ভেবেচিন্তে বলতে হবে। গরমে সে অস্থির বোধ করছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঁঠালপাকা গরম। হাসান যদি কাঁঠাল হতো এর অর্ধেক গরমে পেকে যেত। এখন ভরদুপুর। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে মাটির তল থেকে গরম ভাপ বের হয়। সেই ভাপে পচা ঘাসের গন্ধ থাকে। হাসান গন্ধ পাচ্ছে।

সে বসেছে মাঝারি সাইজের একটা ঘরে। ঘরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিরাট জানালা। জানালায় ভারি পরদা টানা বলে ঘর আবছা অন্ধকার। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। কার্পেটের ওপর শীতল পাটি। হাসানের ঠিক সামনেই বসেছেন হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের হিশামুদ্দিন সাহেব। গরম তাঁকে মনে হয় তেমন কাবু করতে পারছে না। তিনি বেশ আয়েশ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছেন। খালি গা। পরনে লুঙ্গি। হাসান লক্ষ করছে লুঙ্গির গিঁট খুলে গেছে। হিশামুদ্দিন সাহেব ব্যাপারটা জানেন কিনা কে জানে! হয়তো জানেন না। যদি না জানেন তাহলে যে-কোনো সময় একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কথাবার্তা শেষ করে হিশামুদ্দিন সাহেব দাঁড়ালেন এবং লুঙ্গি পা বেয়ে নেমে এল। সর্বনাশ!

হিশামুদ্দিন সাহেব পান চিবোচ্ছেন। তাঁর হাতের কাছে ধবধবে সাদা রুমাল। তিনি মাঝে মাঝে রুমালে ঠোঁট মুছছেন। সাদা রুমালে পানের রসের লাল দাগ ভরে যাচ্ছে। হিশামুদ্দিন সাহেবের বয়স কত? হাসান জানে না। ঠিক অনুমানও করা যাচ্ছে না। কিছু কিছু মানুষের বয়স ধরা যায় না। হাসানের ধারণা হিশামুদ্দিন সাহেবের বয়স চল্লিশও হতে পারে আবার ষাটের কাছাকাছিও হতে পারে। তবে চল্লিশ হবার সম্ভাবনা কম। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কেউ কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারে না।

হিশামুদ্দিন ঘরের সিলিঙের দিকে তাকালেন। মাথার ওপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। ফুল স্পিডে ঘুরছে না, ধীরে সুস্থে ঘুরছে। গরম বাতাস গায়ে এসে লাগছে। হিশামুদ্দিন সাহেব প্রথম প্রশ্নটি আবারো করলেন— নিচু গলায় বললেন, হাসান তোমার গরম লাগছে?

হাসান লজ্জিত গলায় বলল, জ্বি স্যার।

বলতে গিয়ে কথা খানিকটা আটকেও গেল। যেন গরম লাগাটা ঠিক না। যেন সে একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

হিশামুদ্দিন বললেন, আজকের টেম্পারেচার কিন্তু গতকালের চেয়ে কম। গতকাল

ছিল থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ থার্টি ফোর। এক ডিগ্রি কম। তারপরেও গরম বেশি লাগছে। কারণটা হিউমিডিটি। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে গরম বেশি লাগে। আজ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। এর মানে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। আমার ধারণা রাত ন'টা-দশটার দিকে বৃষ্টি শুরু হবে।

হাসান চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। তার কাজই হচ্ছে কথা শুনে যাওয়া। আলোচনায় অংশগ্রহণ না করা। কথা শোনার জন্যে সে টাকা পায়। ঘণ্টা হিসেবে রেট। প্রতি ঘণ্টায় ছয় শ' টাকা। শুরুতে হাসানের মনে হয়েছিল অনেক টাকা। এখন সে জানে টাকাটা আসলে খুবই কম। হিশামুদ্দিন সাহেব কখনোই তাকে বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশি সময় দেন না। এত সময় তাঁর কোথায় ? বিশ-পঁচিশ মিনিটে যা বলেন হাসানকে তা মন দিয়ে শুনতে হয়। তার দায়িত্ব শোনা কথাগুলো গুছিয়ে লেখা। যেন কোনো ভুলভ্রান্তি না হয়। হাসানের ধারণা এই কাজটা একটা টেপরেকর্ডারে খুব ভালো করা যায়। হিশামুদ্দিন সাহেব যা বলার বলবেন। টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করা থাকবে। কথাবার্তা শেষ হবার পর সে ক্যাসেট বাসায় নিয়ে যাবে। ক্যাসেট শুনে শুনে লিখে ফেলবে। কোনোরকম ভুলভ্রান্তি হবে না। হাসান ভয়ে ভয়ে হিশামুদ্দিন সাহেবকে টেপরেকর্ডারে কথাটা বলেছিল। তিনি মন দিয়ে তার কথা শুনেছেন। ভদ্রলোকের এই ব্যাপারটা আছে। কেউ যখন কথা বলে তিনি খুব মন দিয়ে শোনেন। এমনও হয় যে চোখের পলক ফেলেন না। যে কথা বলে সে পলকহীন চোখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা ভড়কে যায়।

হাসানের কথা শেষ হওয়ার মাত্র হিশামুদ্দিন সাহেব বললেন, যন্ত্রের সঙ্গে কি কথা বলা যায় হাসান ? আমি যখন কথা বলি তোমার সঙ্গে কথা বলি, একটা মানুষের সঙ্গে কথা বলি। তাই না ?

জ্বি স্যার।

শোনা কথা লিখতে তোমার ভুলভ্রান্তি হচ্ছে হোক না, পরে ঠিক করা যাবে। ঠিক না করলেও অসুবিধা নেই। আমি তো আমার জীবনী লিখে বই করে ছাপাচ্ছি না। আমি আমার ইন্টারেস্টিং জীবনীটা লিখতে চাচ্ছি আমার নিজের জন্যে। যখন কাজকর্ম করার ক্ষমতা থাকবে না—বিছানায় শুয়ে শুয়ে, কিংবা হুইল চেয়ারে বসে বসে পড়ব।

জ্বি স্যার।

তুমি যাতে তালগোল পাকিয়ে না ফেল এই জন্যেই আমি অল্প অল্প করে বলি।

হাসান মনে মনে বলছে—স্যার, আপনি যদি একসঙ্গে অনেকখানি করে বলতেন তাহলে আমার কিছু লাভ হতো। দুটা টাকা বেশি পেতাম।

হিশামুদ্দিন সপ্তাহে একদিন হাসানের সঙ্গে বসেন। বুধবার দুপুর দুটা থেকে তিনটা। এক ঘণ্টা কখনো কথা বলেন না। পনের-বিশ মিনিট পার হবার পরই বলেন— 'আজ এই পর্যন্তই।' হাসান ঘর থেকে বের হয়ে নিচে আসে। হিশামুদ্দিন সাহেবের পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রহমতউল্লাহ দাঁত বের করে বলে, কী, কাজ শেষ ?

জ্বি।

পঁচিশ মিনিট পার হয়েছে। যাই হোক তিরিশ করে দিচ্ছি। রাউন্ড ফিগার। পেমেন্ট নিয়ে যান।

থাক জমুক। পরে একসঙ্গে নেব।

ওরে সর্বনাশ, তা হবে না। স্যারের নির্দেশ আছে সব পেমেন্ট আপটুডেট থাকবে। আসুন ভাই খাতায় সই করে টাকা নিন।

হাসানকে শুকনো মুখে খাতায় সই করে টাকা নিতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবে বলবে— আমাকে চাকরি দেবার সময় বলা হয়েছিল বুধবারে এক ঘণ্টা করে সিটিং হবে। এক ঘণ্টা হিসেবে আমাকে টাকা দিতে হবে। পাঁচ মিনিট কথা বললেও এক ঘণ্টার পেমেন্ট বলা হয় নি। হাসানের ধারণা কথাটা বলামাত্রই তা বড় সাহেবের কানে চলে যাবে। তিনি বিরক্ত হয়ে ভাববেন— ছেলেটা তো লোভী! হাসান চাচ্ছে না হিশামুদ্দিন সাহেব তাকে লোভী ভাবুন। কারণ প্রথমত সে লোভী না, দ্বিতীয়ত এই মানুষটাকে সে পছন্দ করে।

হাসান।

জ্বি স্যার।

আজ শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ থাক।

জ্বি আচ্ছা।

হাসান মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আজ কোনো কথাই হয় নি। তার হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি থাকলে বলে দিতে পারত দশ মিনিটের বেশি সময় পার হয় নি। মাত্র এক শ টাকা। হাসান উঠে দাঁড়াতে গেল— হিশামুদ্দিন বললেন, বোস একটু। হাসান বসল। হিশামুদ্দিন রুমাল দিয়ে আবার ঠোঁট মুছলেন। মাথার ওপরের ফ্যানটার দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের তাকানোর ভঙ্গি এমন যেন তিনি ফ্যানের কথা শোনার চেষ্টা করছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না।

হাসান।

জ্বি স্যার।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি প্রচণ্ড গরমের সময় বুড়ো ধরনের মানুষরা গামছা ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে বসে থাকত। তুমি কি এ রকম দৃশ্য দেখেছ?

জ্বি না স্যার।

গরমের সময় ভিজিয়ে গায়ে রাখার জন্যে আলাদা গামছাই পাওয়া যেত। মোটা মোটা সুতা— গামছাগুলোকে বলত জলগামছা।

হাসান মনে মনে কয়েকবার বলল, জলগামছা। জলগামছা। জলগামছার ব্যাপারটা লিখে ফেলতে হবে। কোনো এক ফাঁকে এই তথ্য ঢুকিয়ে দিতে হবে। শুধু জলগামছা আওড়ালে মনে নাও থাকতে পারে। কাছাকাছি আরো কয়েকটা শব্দ বলা দরকার—

জলগামছা
পানিগামছা
ওয়াটারগামছা

হাসান।

জ্বি স্যার।

সবচে' কষ্টের গরম কোন মাসে পড়ে জান?

জ্বি না স্যার।

ভাদ্র মাসে। ভাদ্র মাসের গরমকে বলে তালপাকা গরম। তখন বাতাসে জলীয় বাষ্প খুব বেশি থাকে। গরমটা বেশি লাগে এই কারণে। একবার ভাদ্রমাসে কী হয়েছে শোন—

আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। আমাদের বাসা নেত্রকোনার উকিলপাড়ায়। দু' কামরার ঘর। সাধারণ নাম হলো হাফ বিল্ডিং। করোগেটেড টিনের ছাদ। টিনের ছাদের বাড়ি রাতে ঠাণ্ডা হবার কথা। আমাদের বাসা কখনোই ঠাণ্ডা হতো না। আমরা সাত ভাইবোন গরমে ছটফট করতাম।

স্যার আপনি একবার বলেছিলেন আপনারা আট ভাইবোন।

যখনকার কথা বলছি তখন আমরা সাত জন। আমার মেজো ভাই রাগ করে বাসা থেকে চলে গিয়েছিল। অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে রাগ করেছিল। তার কেডসের জুতার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই ফিতা কিনে দেয়া হচ্ছিল না। একটা জুতায় ফিতা ছিল, আরেকটায় ছিল না। সেই জুতাটা খুলে খুলে আসত। ক্লাসের বন্ধুরা তাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। বাবা প্রতিদিন বলতেন, আজ ঠিক নিয়ে আসব। আসতেন না। একদিন স্কুল থেকে বাসায় না ফিরে সে বাড়ি চলে গেল, সেদিন বিকেলে বাবা ফিতা নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজ পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ নেই।

স্যার আপনার ভাইটার নাম কী?

ভাইয়ের গল্প তো এখন করছি না। এখন তোমাকে বলছি অন্য গল্প। মেজো ভাইয়ের গল্প যখন বলব তখন নাম বলব।

জ্বি আচ্ছা।

আমি কী বলছিলাম যেন?

আপনারা সাত ভাইবোন গরমে ছটফট করতেন।

ও হ্যাঁ, আমরা গরমে ছটফট করতাম। বাবা অনেক রাত পর্যন্ত তালপাখা দিয়ে আমাদের হাওয়া করতেন। সেই পাখা পানিতে ভিজিয়ে নেয়া হতো। ভেজা পাখার হাওয়া নাকি ঠাণ্ডা।

একদিনের কথা— বাবা বাসায় ফিরলেন অনেক দেরিতে। তাঁর হাতে বাজার করার চটের একটা ব্যাগ, মুখ হাসি হাসি। তিনি রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন— কোথায় আমার সৈন্যসামন্ত। আমরা ছুটে এলাম। বাবা চটের ব্যাগ খুললেন। ব্যাগের ভেতর খবরের কাগজে মোড়া চকচকে নতুন সিলিং ফ্যান। আমরা হতভম্ব ! সেই রাতেই ফ্যান লাগানো হলো। বাবা নিজেই মিস্ত্রি। রাবারের জুতা পরে তিনি ইলেকট্রিসিটির কানেকশন দিলেন। ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। কী বাতাস, মনে হচ্ছে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এখন থেকে এক ঘুমে রাত কাবার করে দিবি। হা করে ঘুমোবি যাতে পেটের ভেতরেও ফ্যানের হাওয়া চলে যায়।

সেই ফ্যান সর্বমোট আমরা তিন দিন ব্যবহার করি। চতুর্থ দিনে বাড়িতে পুলিশ এসে উপস্থিত। আমরা বিস্মিত হয়ে জানলাম বাবা যে দোকোনে কাজ করতেন সেই দোকানের একটা ফ্যান তিনি খুলে নিয়ে চলে এসেছেন।

আমাদের চোখের সামনেই সিলিং থেকে ফ্যান খোলা হলো। বাবা সবার দিকে তাকিয়ে সারাক্ষণই অমায়িক ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। যেন বেশ মজাদার একটা ঘটনা ঘটেছে। তিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে আনন্দিত।

দোকানের মালমাল চুরির অভিযোগে বাবার বিরুদ্ধে মামলা হয়। বাবার দু মাসের জেল হয়ে যায়। কোর্টে আমরা কেউ ছিলাম না। শুধু আমার বড় বোন ছিলেন। মালার

রায় হবার পরে বাবা তাকে বলেন, পুষ্প কোনো রকম চিন্তা করিস না। জেলখানায় বিশ দিনে মাস হয়। দুই মাস আসলে চল্লিশ দিন। চল্লিশটা দিন তুই কোনো রকমে পার করে দে। পারবি না মা ?

আমার বড় বোন পুষ্পের কথা কি এর আগে তোমাকে বলেছি ?

জ্বি না।

ডাকনাম পুষ্প, ভালো নাম লতিফা বানু।

হিশামুদ্দিন সাহেব চুপ করলেন। সামনে রাখা পানের বাটা থেকে পান নিলেন। রুমালে ঠোঁট মুছলেন। আবার মাথা উঁচু করে ফ্যানের দিকে তাকালেন।

হাসান।

জ্বি স্যার।

মানুষের প্রধান সমস্যা হলো সে কোনো কিছুই খুঁটিয়ে দেখে না। তার সব দেখা, সব observation ভাসা ভাসা। ঠিক না ?

হাসান চুপ করে রইল। মানুষের প্রধান সমস্যা কী তা নিয়ে সে কখনো ভাবে নি। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন কেন তাও তার কাছে পরিষ্কার না। তবে হিশামুদ্দিন সাহেবের এই স্বভাব আছে। কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। তারপর আবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসেন।

হিশামুদ্দিন বললেন, তুমি এক শ টাকার নোট অনেকবার দেখেছ। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তুমি বলতে পারবে না এক শ টাকার নোটের দু পিঠে কী ছবি আছে। বলতে পারবে ?

জ্বি না স্যার।

একপিঠে আছে লালবাগ দুর্গের ছবি, আরেক পিঠে তারা মসজিদের ছবি। তোমার সঙ্গে এক শ টাকার নোট আছে না ? আমার কথা মিলিয়ে দেখ।

এক শ টাকার নোট নেই স্যার।

কত টাকার নোট আছে ?

দশ টাকার।

দশ টাকার নোটের এক দিকে আছে কাপ্তাই বাঁধের ছবি, আরেকদিকে টাঙ্গাইলের একটা মসজিদের ছবি— আতিয়া জামে মসজিদ। মানিব্যাগ খুলে দেখ।

দেখতে হবে না স্যার। আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই আছে।

তবুও তুমি একবার দেখে নাও।

হাসান মানিব্যাগ বের করে দেখল। হিশামুদ্দিন সাহেব বললেন, নোটের গায়ে কী ছবি আঁকা থাকে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। তারপরেও আমি মনে করি— আমাদের দৃষ্টি আরো পরিষ্কার থাকা দরকার। মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে এই কথাটা তোমাকে বললাম। কেন বললাম বল তো ?

বলতে পারছি না স্যার। আমার বুদ্ধি সাধারণ মানের।

আজ এই পর্যন্তই থাক।

জ্বি আচ্ছা।

হিশামুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। হাসান খুবই অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। না সে রকম কোনো ঘটনা ঘটে নি— লুঙ্গি গড়িয়ে নিচে নেমে যায় নি। হিশামুদ্দিন সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কাঁটায় কাঁটায় চারটা বাজছে। হিশামুদ্দিন সাহেব চারটা থেকে সাড়ে চারটা এই ত্রিশ মিনিট তাঁর শোবার ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। নিজের ইচ্ছায় না, ডাক্তারের নির্দেশে। দুটা বড় ধরনের স্ট্রোক তাঁর হয়ে গেছে। তৃতীয়টির জন্যে অপেক্ষা। অপেক্ষার সময়টায় নানান নিয়মকানুন মেনে চলা। আজ হিশামুদ্দিন সাহেব নিয়মের খানিকটা ব্যতিক্রম করলেন। শোবার ঘরে ঢোকার আগে মতিঝিলে হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের হেড অফিসে টেলিফোন করলেন। টেলিফোন ধরল জীবন। জীবনকে তিনি একটা কাজ দিয়েছিলেন। হাসান সম্পর্কে খোঁজখবর করা। ছেলেটি সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করছেন বলেই অনুসন্ধান।

আজ হাসানের একটা ব্যাপার তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি যখন বলছিলেন— সিলিং থেকে ফ্যান খোলা হচ্ছে আর তাঁর বাবা দূরে দাঁড়িয়ে অমায়িক ভঙ্গিতে হাসছেন— তখনই তিনি লক্ষ করলেন হাসানের চোখে পানি এসে গেছে। সে চোখের পানি সামলাবার জন্যে দ্রুত অন্যদিকে তাকিয়েছে। হিশামুদ্দিন সাহেবের অনেক প্রিয় গল্পের মধ্যে এই গল্পটি একটি। অনেককে এই গল্প বলেছেন। সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনেছে। কারো চোখে পানি আসে নি। শুধু তাঁর মেয়ে চিত্রলেখার চোখে পানি এসেছিল। তাঁর মেয়েটি সেদিন স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে ফিরছে। চোখ লাল। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরছে। জ্বরে কাতর মেয়েটিকে দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। রাত ন'টায় তিনি রওনা হবেন জাপানে। এয়ারপোর্টে সন্ধ্যা সাতটায় রিপোর্টিং। মেয়েটিকে একা রেখে তাকে যেতে হবে। বিশাল এই বাড়িতে চিত্রলেখা একা একা ঘুরবে। তিনি এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে মেয়ের পাশে বসলেন। না, জ্বর বেশি না। উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। চিত্রলেখা বলল, তোমার এয়ারপোর্ট যাবার সময় হয়ে গেছে তাই না বাবা ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

কতক্ষণ থাকতে পারবে আমার পাশে ?

আধঘণ্টা।

তাহলে একটা গল্প বল।

তিনি তাঁর বাবার ফ্যানের গল্পটা বললেন। গল্পের এক পর্যায়ে চিত্রলেখা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তিনি সহজ গলায় বললেন, কাঁদছ কেন মা ?

তোমার বাবার কথা মনে করে কান্না পাচ্ছে।

ও আচ্ছা।

তোমার বাবা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন তাই না ? এখন তোমার কত টাকা ! ইচ্ছে করলে বাংলদেশের সব ফ্যান তুমি কিনে নিতে পার তাই না বাবা ?

হুঁ।

তোমার বাবা তোমার ভাইবোনদের মধ্যে কাকে সবচে' ভালোবাসতেন ?

আমার বড় বোনকে, তাঁর নাম পুষ্প।

তাঁকে সবচে' ভালবাসতেন কেন ?

বড়বুবু দেখতে অবিকল আমার মা'র মতো ছিলো, এই জন্যেই বোধহয়। তাছাড়া

প্রথম সন্তানের প্রতি বাবা-মা'র একটা আলাদা মমতা থাকে।

তোমাকে কতটা ভালবাসতেন?

আমাকে খুব সামান্য। আমি সবার শেষের দিকে তো এই জন্যে বোধহয়। মাঝে মাঝে আমার নাম পর্যন্ত ভুলে যেতেন।

কী যে তুমি বল বাবা নাম ভুলবে কী করে?

ভুলে যেতেন। আমার ঠিক আগের ভাইটার নাম ফজলু। আমার ডাকনাম বজলু। তিনি আমাকে ডাকতেন ফজলু বলে।

তুমি রাগ করতে না?

না।

আমি হলে খুব রাগ করতাম। আমাদের অঙ্ক আপা আমাকে মাঝে মাঝে ডাকেন চিত্ররেখা। আমি জবাব দিই না। চিত্ররেখা তো আমার নাম না। চিত্ররেখা ডাকলে আমি কেন জবাব দেব? ঠিক না বাবা?

হ্যাঁ ঠিক।

এখন তোমার এয়ারপোর্টে যাবার সময় হয়ে গেছে তুমি চলে যাও।

তোমার জন্যে কিছু আনতে হবে?

না।

কিছু না?

না, কিচ্ছু না।

হিশামুদ্দিন সাহেব তাঁর বাবার গল্প যখন বলছিলেন তখন ঠিক যে জায়গায় এসে চিত্রলেখা কেঁদে ফেলেছিল সেই জায়গায় হাসান ছেলেটার চোখে পানি এসেছে। ব্যাপারটা তুচ্ছ, আবার ঠিক তুচ্ছও না। জীবনকে এই ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজখবর করতে বলেছিলেন। সে কতটা খোঁজখবর করেছে কে জানে!

হ্যালো জীবন?

জ্বি স্যার।

হাসান ছেলেটি সম্পর্কে তোমাকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম— খোঁজ নিয়েছ?

জ্বি স্যার। খুবই সাধারণ ছেলে স্যার।

এ ছাড়া আর কী?

ঝিকাতলায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকে। এড্রেস হচ্ছে এগার বাই...

হিশামুদ্দিন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালেন। হড়বড় করে এড্রেস বলছে— এড্রেস তো তার অফিসেই আছে। জীবন এখন পর্যন্ত কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারে নি। ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না। তবু এই ছেলেটিকে তাঁর বেশ পছন্দ।

হাসান সম্পর্কে আর কী জান?

কয়েকটা প্রাইভেট টিউশ্যানি করে?

ক'টা?

একজাক্ট বলতে পারছি না স্যার।

বিয়ে করেছে?

জ্বি না।

তার কোনো পছন্দের মেয়ে কি আছে ?

জ্বি স্যার, একজনের বাসায় মাঝে মাঝে যায়— সেই বাসার এড্রেস হলো স্যার— কলাবাগান— ভেতরের দিকে দুই বাই...

হিশামুদ্দিন আবারো ভুরু কুঁচকালেন। জীবন মনে হয় এড্রেস ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না। সে এড্রেস-বিশেষজ্ঞ।

জীবন।

জ্বি স্যার ?

মেয়েটির নাম কী ?

কোন মেয়ের নাম স্যার ?

হাসানের পছন্দের মেয়েটির নাম...

ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, নাম স্যার জানি না। তবে নাম-এড্রেস সব সংগ্রহ করতে পারব।

থাক সংগ্রহ করতে হবে না। আমি হাসানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

হিশামুদ্দিন সাহেব টেলিফোন রেখে শোবার ঘরে ঢুকলেন। ঘর কেমন অন্ধকার হয়ে আছে। মনে হচ্ছে আকাশে মেঘ করেছে। তাঁর হিসেব মতো বৃষ্টি হবার কথা রাত ন'টা-দশটার দিকে। এখুনি আকাশ এত অন্ধকার হলো কেন ?

তাঁর ব্যক্তিগত বেয়ারা মোতালেব চায়ের কাপ নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সাড়ে চারটার সময় তিনি এক কাপ হালকা লিকারের চা খান। বিকেল পাঁচটায় অফিসে উপস্থিত হন। আজ নিয়ম ভাংতে ইচ্ছে করছে।

তিনি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, মোতালেব আকাশে কি মেঘ আছে ?

মোতালেব বিস্মিত হয়ে বলল, জ্বি।

কী মনে হয় তোমার, বৃষ্টি হবে ?

ঝুম বৃষ্টি হবে স্যার। আসমান অন্ধকার কইরা মেঘ করছে।

তুমি টেলিফোন করে জীবনকে জানিয়ে দাও যে আজ অফিসে যাব না।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঝুম বৃষ্টি যদি নামে তাহলে আজ বৃষ্টিতে গোসল করব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

হিশামুদ্দিন সাহেব লক্ষ করলেন মোতালেব তাঁর কথায় অবাক হলো না। মোতালেবকে এখন পর্যন্ত তিনি বিস্মিত হতে দেখেন নি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হিশামুদ্দিন সাহেব বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁর খুব অস্থির লাগছে। অস্থির লাগছে কেন ? তৃতীয় স্ট্রোকের সময় কি হয়ে গেছে ? কপাল ঘামছে ? পিঠের মাঝখানে ব্যথা বোধ হচ্ছে।

তিনি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কথা বলার জন্যে মোতালেবকে কি ডেকে পাঠাবেন ? সে বিছানার কাছে এটেনশন হয়ে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে— তিনি কথা বলে যাবেন। তিনি ডাকলেন— মোতালেব।

মোতালেব ছুটে এল। তিনি কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। তার বাবার ফ্যান চুরির গল্পটা কি বলবেন? গল্পটা সে কীভাবে নেবে? সবাইকে কি সে বলে বেড়াবে— আমাদের স্যারের বাবা ছিলেন চোর। কথাগুলো সে বলবে ফিসফিস করে। যারা শুনবে তারাও অন্যদের কাছে ফিসফিস করবে।

মোতালেব।

জ্বি স্যার।

বৃষ্টি কি নেমেছে?

জ্বি না স্যার।

আচ্ছা তুমি যাও— এক কাজ কর, টেলিফোন হ্যান্ডসেটটা দিয়ে যাও।

মোতালেব বের হয়ে গেল। হিশামুদ্দিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরে টেলিফোন রাখেন না। টেলিফোন কেন— কিছুই রাখেন না। বিশাল একটা ঘর, ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খাট— আর কিছু নেই। কাপড় বদলানোর জন্যেও তাকে পাশের ঘরে যেতে হয়। ফাঁকা একটা ঘরে রাতে যখন ঘুমোতে আসেন তখন তাঁর মনে হয় তিনি খোলা মাঠে শুয়ে আছেন।

টেলিফোন নিয়ে মোতালেব ঢুকল না, ঢকুল রহমতউল্লাহ। শঙ্কিত গলায় বলল, স্যারের শরীর কি ভালো?

হিশামুদ্দিন বললেন, শরীর ভালো। তুমি টেলিফোন রেখে চলে যাও।

কাকে করবেন বলুন স্যার, আমি লাইন লাগিয়ে দি।

কাকে করব বুঝতে পারছি না। তুমি রেখে যাও।

ডাক্তার সাহেবকে কি খবর দেব স্যার?

না।

আজ রাত আটটায় আপনার ডিনারের দাওয়াত, চেম্বারস অব কমার্সের মিটিং। আপনি কি যাবেন?

আটটা বাজতে তো দেরি আছে— আছে না?

জ্বি স্যার।

আমি যাব। তবে বৃষ্টি নেমে গেলে যাব না। আজ বৃষ্টিতে ভিজব।

রহমতউল্লাহ অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। হিশামুদ্দিন বললেন, আচ্ছা তুমি যাও। রহমতউল্লাহ গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। হিশামুদ্দিন বললেন, তুমি কিছু বলবে?

জ্বি না স্যার।

দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও।

হিশামুদ্দিন টেলিফোন সেট হাতে নিয়ে বসে আছেন। কাকে টেলিফোন করবেন? এমন কেউ যদি থাকত যার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিকভাবে গল্প করা যায় তাহলে ভালো হতো। এমন কেউ নেই। ক্ষমতাবান মানুষরা ধীরে ধীরে কী পরিমাণ নিঃসঙ্গ হয় তা তিনি এখন বুঝতে পারছেন। তাঁর ক্ষমতা আরো বাড়বে— তাঁকে অর্থমন্ত্রী করার কথা হচ্ছে। প্রস্তাব এখনো সরাসরি আসে নি, তবে চলে আসবে। তার গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা

উড়বে। পেছনের সিটে তিনি গা এলিয়ে বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে থাকবেন। ফাইল হাতে ড্রাইভারের পাশে তার চেয়েও বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে থাকবে তার পিএস। পেছনের একটা গাড়িতে বসে থাকবে সিকিউরিটির লোকজন।

হাসানকে তাঁর বাবার গাড়িপ্রীতির গল্পটা বলা হয় নি। একদিন বলতে হবে। তাঁর বাবার গাড়িপ্রীতি ছিল অসাধারণ। কিছু টাকা-পয়সা যোগাড় হলেই তিনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেলতেন। ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে আধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা শহরে ঘোরা।

মোতালেব ঘরে ঢুকল। হিশামুদ্দিন বললেন, কিছু বলবে মোতালেব ?

বৃষ্টি নামছে স্যার।

বেশি নেমেছে না ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে ?

ফোঁটা ফোঁটা।

যখন ঝুম বৃষ্টি নামবে তখন বলবে।

জ্বি আচ্ছা স্যার। চা দিমু ?

না।

হিশামুদ্দিন টেলিফোনের নাম্বার টিপছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ কিন্তু টেলিফোন নাম্বার মনে থাকে না। মনে রাখার চেষ্টাও অবশ্য করেন না। টেলিফোন নাম্বার মনে রাখার জন্যে তাঁর লোক আছে। একটা টেলিফোন নাম্বারই তাঁর মনে থাকে। মেয়ের নাম্বার। মেয়েকে টেলিফোন করে কি পাওয়া যাবে ? সামারে সে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

কে ? চিত্রলেখা ?

বাবা তুমি! কী ব্যাপার ?

এত অবাক হচ্ছিস কেন! আমি টেলিফোন করতে পারি না ?

অবশ্যই করতে পার। আমি সে জন্যে অবাক হচ্ছি না। আমার অবাক হবার কারণ ভিন্ন।

কারণটা কী ?

আমি ক্যাম্পিং করতে যাচ্ছি ভার্জিনিয়াতে। গাড়িতে সব জিনিসপত্র তোলা হয়েছে। গাড়ি স্টার্টও দিয়েছিলাম হঠাৎ মনে হলো সব নেয়া হয়েছে, কাগজ-কলম নেয়া হয় নি। কাগজ-কলম নেবার জন্যে আবার ফিরে এসেছি— শুনি টেলিফোন বাজছে। তুমি কেমন আছ বাবা ?

ভালো।

তোমার ডিপ্রেশন কেটেছে ?

আমার আবার ডিপ্রেশন কী ?

শেষবার যখন তোমার সঙ্গে কথা হলো— তখন মনে হলো— তুমি খুব ডিপ্রেশনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ।

আমি ভালো আছি।

তোমার জীবনের মজার মজার ঘটনাগুলো যে কাকে দিয়ে লেখাচ্ছিলে— এখনো কি লেখাচ্ছ ?

লেখা কেমন এগোচ্ছে?

খুব এগুচ্ছে না।

যা লিখেছ আমার কাছে ফ্যাক্স করে পাঠাও, আমি পড়ে দেখি।

আচ্ছা পাঠাব।

তোমাদের ওখানে ওয়েদার কেমন?

খুব গরম পড়েছে। অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না।

এদিকে ওয়েদার খুব চমৎকার। তোমাকে কি আমি একটা অনুরোধ করতে পারি বাবা?

হ্যাঁ করতে পারিস।

তুমি আমার কাছে চলে এস। আমরা দুজনে মিলে ক্যাম্পিং করব। তাঁবুর ভেতর থাকব। নিজেরা জঙ্গল থেকে কাঠ এনে রান্না করে খাব। হ্রদে মাছ ধরব। সেই মাছ বারবিকিউ করে খাব। বাবা আসবে?

না।

তুমি এত কঠিন করে না বলা শিখেছ কীভাবে?

না বলতে পারাটা খুব বড় গুণ মা। বেশির ভাগ মানুষ 'না' বলতে পারে না। এতে তারা নিজেরাও সমস্যায় পড়ে, অন্যদেরও সমস্যায় ফেলে। আমার বাবা কখনো না বলতে পারতেন না। যে যা বলত— তিনি বলতেন, আচ্ছা। শুধু এই কারণেই সারা জীবন তিনি একের পর এক সমস্যার ভেতর দিয়ে গেছেন...

বাবা!

হুঁ।

তুমি যে-কোনো আলাপে তোমার বাবাকে নিয়ে আস কেন? তাঁর ব্যাপারে তোমার কি কোনো অপরাধবোধ আছে?

হিশামুদ্দিন সাহেব জবাব দিলেন না। চিত্রলেখা বলল, বাবা আমি এখন রওনা হচ্ছি। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। আর শোন— কোনো কারণে আমি যদি তোমার মন খারাপ করিয়ে দিয়ে থাকি তাহলে— সরি। এপোলজি কি গ্রান্টেড বাবা?

হ্যাঁ গ্রান্টেড।

হিশামুদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোতালেব চা নিয়ে ঢুকল। তিনি চা চান নি। কিন্তু এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে। তিনি হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন, বৃষ্টি কি নেমেছে?

মোতালেব লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জ্বি না স্যার।

বৃষ্টি না নামার অপরাধে সে নিজেকে অপরাধী ভাবছে।

৩

আকাশে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। বিজলি চমকাচ্ছে। বাতাস ভারি। মাটির ভেতর থেকে অদ্ভুত গন্ধ আসছে। ছোট বাচ্চাদের গায়ের গন্ধের মতো গন্ধ। প্রবল বর্ষণের আগে আগে এ রকম গন্ধ পাওয়া যায়। হাসান রিকশা থেকে নেমেছে তবে মনস্থির করতে পারছে না। রিকশাটা ছেড়ে দেবে না রিকশা করেই ফিরে যাবে। বৃষ্টি নামলে আর রিকশা পাওয়া যাবে না।

রিকশাওয়ালারা এখন স্বাস্থ্যসচেতন। ভিজে জবজবা হয়ে তারা রিকশা চালায় না। বৃষ্টির সময় হুড তুলে সেটির ওপর আরাম করে বসে বিড়ি টানে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে— ভাড়া যাবেন ? বিরক্ত হয়, জবাব দেয় না।

হাসান আকাশের দিকে তাকাল— কতক্ষণে বৃষ্টি নামবে বোঝার চেষ্টা। হাস্যকর চেষ্টা তো বটেই। আবহাওয়া বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। আকাশে কত রকমের মেঘ হয় ছোটবেলা পড়েছিল— স্তূপ মেঘ, পালক মেঘ...। তার আবহাওয়াবিদ্যা এই পর্যন্তই। রিকশাওয়ালা টুন টুন করে দুবার ঘণ্টা বাজিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, খাড়াইয়া আছেন ক্যান ? ভাড়া দেন। হাসান ভাড়া দিয়ে দিল। পাঁচ টাকা ভাড়া, দু টাকা বাড়তি দিল। আজ তার পকেটে টাকা আছে। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তিতলীদের বাসার গেটের সামনে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না বুঝতে পারছে না। তার হাতে ঘড়ি নেই, তবে রাত মনে হয় ভালোই হয়েছে, দশটার কম না। এত রাতে তিতলীর বাসায় ঢুকলে সবাই সরু চোখে তাকাবে। না ভুল বলা হলো, সবাই তাকাবে না তিতলীর বাবা মতিন সাহেব তাকাবেন। সেটা কি ভালো হবে ? হাসান ক্লান্ত পায়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল, ঠিক করল গেট থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত যেতে যদি তার গায়ে কোনো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে তাহলে সে ফিরে আসবে। এতদূর এসে তিতলীকে এক পলকের জন্যে না দেখে গেলে খুব খারাপ লাগবে। লাগুক। পৃথিবীতে বাস করতে হলে অনেক খারাপ লাগা সহ্য করে বাস করতে হয়। হাসান বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে, গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে নি। এখন কলিংবেল টেপা যেতে পারে।

কলিংবেলে হাত দিয়েই হাসান ভালো একটা শক খেল। ডান হাতটা ঝিনঝিন করে উঠল। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। শক খেলেও বেল ঠিকই বাজল। ভেতর থেকে ধমকের সুরে তিতলীর বাবা বললেন, কে ? হাসান জবাব দিল না, সে শকের ধকল সামলাচ্ছে। হাতের ঝিনঝিন ভাব এখানো যাচ্ছে না।

তিতলীদের বাসার কলিংবেলটা অনেকদিন থেকেই নষ্ট। কিছুদিন কলিংবেলটার ঠিক ওপরে হাতে লেখা একটা কাগজ স্কচটেপ দিয়ে আটকানো ছিল। কাগজে লেখা—

কলিংবেল নষ্ট। দয়া করে হাত দেবেন না।

কাগজটা এখন নেই। আর থাকলেও লাভ হতো না। হাসান ঠিকই বেল টিপত। তিতলীদের বাসার আশপাশে এলে তার মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। সম্ভবত ব্লাডপ্রেসারঘটিত কোনো সমস্যা। হয় প্রেসার বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়।

হাসান কড়া নাড়ল। তিতলীর বাবা মতিন সাহেব একবার 'কে' বলে চুপ করে আছেন। তাঁকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার, যে কলিংবেল টিপেছিল সে চলে যায় নি। এখনো আছে। মতিন সাহেব আবারো ধমকের গলায় বললেন, কে ? হাসান জবাব দিল না। বন্ধ দরজার দুপাশ থেকে বাক্যালাপ চালানোর অর্থ হয় না। হাসান বলবে, আমি। মতিন সাহেব বলবেন, আমিটা কে ? হাসান বলবে, জ্বি আমি হাসান। কোনো মানে হয় না। এরচে' বিশ্রীভাবে কয়েকবার কড়া নেড়ে চুপ করে থাকা ভালো।

দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ হচ্ছে। এ বাড়ির দরজার ছিটকিনিগুলোও নষ্ট। সহজে খোলা যায় না, ধস্তাধস্তি করতে হয়। হাসান ভেবেছিল মতিন সাহেব দরজা খুলে শ্লেষ-জড়ানো বিরক্ত গলায় বলবেন, ও আচ্ছা তুমি ? এত রাতে কী মনে করে ? হাসানকে অবাক করে দিয়ে দরজা খুলল তিতলী। এত রাতেও সে বেশ সেজেগুজে আছে। চুল

বাঁধা। পরনে চাঁপা রঙের শাড়ি। ঠোঁটে লিপস্টিকও আছে। গলায় চিকমিক করছে সরু চেইন। মনে হয় কোনো বিয়েবাড়ি থেকে দাওয়াত খেয়ে এসেছে। তিতলী গভীর বিস্ময় নিয়ে বলল, আরে তুমি ? এত রাতে তুমি কোত্থেকে ?

রাত খুব বেশি নাকি ?

সাড়ে ন'টা বাজে।

ভেতর থেকে মতিন সাহেব বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস ? তিতলী লাজুক গলায় বলল, হাসান ভাইয়া এসেছেন বাবা। মতিন সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, ও।

তিতলী হাসানের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার এত আনন্দ লাগছে। আনন্দে চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। শুধু পানি জমা না— আনন্দে শরীরও কাঁপছে। এই তো সে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছে। আঙুলগুলো সত্যি সত্যি কাঁপছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ভেতরে এস।

হাসান খানিকটা অস্বস্তি নিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকল। এত রাতে এসে তিতলীকে বিব্রত করার কোনো মানে হয় না। তিতলীদের বসার ঘরের অবস্থা শোচনীয়। পুরনো সোফায় কয়েক জায়গায় গদি ছিঁড়ে তুলা বের হয়ে পড়েছে। একটা সোফার স্প্রিং নষ্ট। বসলে তলিয়ে যেতে হয়। দুটা বেতের চেয়ার আছে। চেয়ারের নানা জায়গা থেকে পেরেক বের হয়ে আছে। অসাবধানে চেয়ার থেকে উঠতে গেলে প্যান্ট বা শার্ট ছিঁড়বেই। হাসানের কালো প্যান্টটা এভাবেই ছিঁড়েছে। ঘরের অর্ধেকটা অংশ জুড়ে খাট পাতা। খাটে তোশক বিছানো আছে। তোশকের ওপর বেশির ভাগ সময় কোনো চাদর থাকে না। আজ অবশ্যি আধময়লা একটা চাদর আছে। দেয়ালে গত বছরের একটা ক্যালেন্ডার। জুন মাস বের হয়ে আছে। ক্যালেন্ডারের ছবিটা সুন্দর। হ্রদের জলে স্নানের পোশাক পরা এক তরুণী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তরুণীর চোখ বন্ধ। হ্রদের জল যেমন নীল, তরুণীর স্নানের পোশাক তেমনি লাল। লাল-নীলে মিলে দারুণ একটা ছবি। ক্যালেন্ডারটার পাশেই একটা দেয়ালঘড়ি। ঘড়িটা আজ বন্ধ। সাতটা একুশ বাজছে। হাসান ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, তিতলী এক গ্লাস পানি খাব।

তিতলী পানি আনতে গেল। খাবার ঘরের টেবিলে পানির জগ এবং গ্লাস রাখা আছে। তিতলী সেদিকে গেল না। বাবা খাবার টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর মুখ সন্ধ্যা থেকেই থমথমে। এখন সেই থমথমে ভাব আরো বেড়েছে। তাঁর সামনে পড়লে তিনি কঠিন চোখে তাকাবেন। সব সময় কঠিন চোখ দেখতে ভালো লাগে না।

রান্নাঘরে তিতলীর মা সুরাইয়া ভাত বসিয়েছেন। মতিন সাহেবের জন্যে আলাদা করে ভাত রাঁধতে হচ্ছে। তিনি আতপ চালের ভাত খান। সেই ভাত ঝরঝরে হতে হয়। ভাতের প্রতিটি দানা থাকবে আলাদা। একটার গায়ে আরেকটা লেগে থাকবে না। পাকা রাঁধুনির জন্যেও কঠিন ব্যাপার। সুরাইয়া পাকা রাঁধুনি নন। স্বামীর ভাত রান্নার সময় তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে থাকেন। তিতলী রান্নাঘরে ঢুকতেই সুরাইয়া মেয়ের দিকে তাকালেন। তিতলী লজ্জামাখা গলায় বলল, হাসান ভাইয়া এসেছে মা। বলতে গিয়ে তিতলীর কথা জড়িয়ে গেল, গাল খানিকটা লালচে হয়ে গেল। ব্যাপারটা সুরাইয়ার চোখ এড়াল না। সুরাইয়া ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওকে খেয়ে যেতে বল।

দরকার নেই মা।

তিতলী পানির গ্লাস নিয়ে বের হয়ে গেল। কেমন হড়বড় করে বের হচ্ছে। দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে খানিকটা পানি সে ছলকে ফেলে দিল। মেয়েটার অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখে সুরাইয়ার মন কেমন করতে লাগল। হাসানকে দেখলেই মেয়েটা এমন অস্থির হয়ে পড়ে কেন ? কী আছে হাসানের মধ্যে ? এ বছরও এম.এ. পরীক্ষা দেয় নি। প্রতি বছর শোনা যায় পরীক্ষা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেয় না। হাসানের চেহারাও ভালো না। কেমন বোকা বোকা ভাব। সংসারের অবস্থা সাধারণ, ভাইয়ের সঙ্গে বাস করছে। চাকরি বাকরি কোনোদিন পাবে এ রকম মনে হয় না। আজকাল চাকরি বাকরি হলো ধরাধরির ব্যাপার। হাসানের ধরাধরি করার কেউ নেই।

ভাতের পানি ফুটছে। সুরাইয়া ভাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছে আজ ভাতে কোনো গণ্ডগোল হবে। ভাত গায়ে গায়ে লেগে যাবে। তিতলীর বাবা খেতে বসে নানান ধরনের কটু কথা বলবেন। সুরাইয়া তিনবার 'ইয়া জালজালালু ওয়াল ইকরাম' বলে হাঁড়ির ঢাকনা তুলে ফুঁ দিলেন।

হাসান এক চুমুকে পানিটা শেষ করে গ্লাস তিতলীর দিকে বাড়িয়ে বলল, তিতলী যাই।

তিতলী কিছু বলল না। মাথা নিচু করে হাসল। এমনভাবে হাসল যেন হাসান দেখতে না পায়। হাসানের অনেক বিচিত্র অভ্যাসের একটা হচ্ছে তিতলীদের বাড়িতে এসেই সে প্রথমে এক গ্লাস পানি খেতে চাইবে। পানি খাওয়া শেষ হলে বলবে— তিতলী যাই। মুখে বলবে কিন্তু যাবার কোনো লক্ষণ দেখাবে না।

মা তোমাকে খেয়ে যেতে বলেছে।

আরে না।

আরে না কেন ? খেয়ে যাও না। মেনু অবশ্য ভালো না— চোখে দেখা যায় না এমন সাইজের কই মাছ। বাবার ধারণা কই মাছ সাইজে যত ছোট হয় তত স্বাদ বেশি হয়।

হাসান কিছু বলল না। তিতলী বলল, তুমি যে আজ আসবে এটা কিন্তু আমি জানতাম।

আমি আসব কীভাবে জানতে ?

আজ ঘুম থেকে উঠেই তিনটা শালিক দেখেছি। মুখ ধুতে কলঘরের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি বারান্দায় কাপড় শুকোবার দড়িতে দুটা শালিক বসে আছে। তারপর কী হয়েছে শোন— মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি আরো একটা শালিক এসে বসেছে। মোট তিনটা শালিক। তখনই আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম— আজ তুমি আসবে।

তিনটা শালিক দেখলে কেউ আসে ?

তিতলী গানের মতো গুনগুন করে বলল—

'One for sorrow
Two for joy
Three for letter
Four for boy.

প্রথমে দুটা শালিক দেখলাম— তার মানে আনন্দের কোনো ব্যাপার ঘটবে, তারপর দেখলাম তিনটা, অর্থাৎ চিঠি পাব। তুমি যখনই আস একটা চিঠি নিয়ে আস। কাজেই আমি পুরোপুরি নিশ্চিত তুমি আসবে। শাড়ি পরে কেমন সেজে আছি দেখছ না। রাত

সাড়ে ন'টার সময় কেউ এমন সেজেগুজে থাকে ? এটা নতুন শাড়ি, আগে কখনো পরি নি। রংটা সুন্দর না ?

খুব সুন্দর।

না দেখেই তুমি বললে খুব সুন্দর। বল তো কী রঙের শাড়ি ?

চাঁপা রং।

গুড। হয়েছে। আমার চিঠি এনেছ ?

হুঁ।

দাও।

হাসান পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিঠি বের করল। তিতলীর হাতে দিতে দিতে বলল, আজ উঠি।

তিতলী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এসেই উঠি উঠি করছ কেন ? মা তোমাকে ভাত খেয়ে যেতে বলেছে।

তিতলী চিঠি মুঠোয় লুকিয়ে তার ঘরে চলে গেল। তার ঘর হলেও সে একা ঘুমোয় না। এই ঘরে দুটা খাট পাতা। দুটা খাটে তারা তিন জন ঘুমোয়। সে আর তার ছোট দু বোন— নাদিয়া, নাতাশা। নাদিয়া-নাতাশা আজ বড় ফুফুর বাসায় বেড়াতে গেছে, রাতে থাকবে। তিতলীরও যাবার কথা ছিল। ভোরবেলায় তিনটা শালিক না দেখলে সে অবশ্যই যেত। বড় ফুফুর বাসায় যেতে তার সবসময় ভালো লাগে।

চিঠি খুলে তিতলীর মন খারাপ হয়ে গেল। এতটুকু একটা চিঠি— এক সেকেন্ডে পড়া হয়ে যাবে। তিতলী চিঠিটা গালে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে, হাত-পা কাঁপছে। আশ্চর্য, এ রকম হচ্ছে কেন ? হাসানের চিঠি তো সে আজ নতুন পড়ছে না। অনেকদিন থেকেই পড়ছে। হাসানের এই চিঠিটা তিয়াত্তর নম্বর চিঠি। চিঠিটা পড়তে ইচ্ছে করছে না। পড়লেই তো ফুরিয়ে যাবে। এখন থাক, রাতে বিছানায় শুয়ে আরাম করে পড়া যাবে। ইচ্ছে করলে চিঠিটা বুকের ওপর রেখে ঘুমিয়েও পড়তে পারে। নাদিয়া-নাতাশা কেউ নেই। ঘরটা আজ তার একার। আচ্ছা মানুষটা লম্বা একটা চিঠি লিখতে পারে না ? উপন্যাসের মতো লম্বা একটা চিঠি। সে পড়তেই থাকবে পড়তেই থাকবে চিঠি ফুরাবে না। এমন লম্বা চিঠি যে রাতে ঘুমোতে যাবার সময় চিঠি পড়তে শুরু করল ভোরবেলা আযানের সময় চিঠি শেষ হলো।

তিতলী।

তিতলী চমকে উঠল। এমনভাবে চমকাল যে গালে ধরে রাখা চিঠি মেঝেতে পড়ে গেল। দরজার কাছে সুরাইয়া দাঁড়িয়ে আছেন। তিতলীর বুক ধকধক করছে। মা কি চিঠিটা দেখে ফেলেছেন ? মনে হয় না। চিঠি দেখলে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি তাকিয়ে আছেন তিতলীর দিকে। মা অবশ্যি দেখেও না দেখার ভান করতে পারেন। এইসব ছোটখাটো ভান মা খুব ভালো করেন।

সুরাইয়া বললেন, ঘরে একা একা কী করছিস ?

কিছু করছি না মা।

তিতলী কী করবে বুঝতে পারছে না। পা দিয়ে চিঠিটা চেপে ধরবে ? না যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ? মা সামনে থেকে না সরলে সে ঘর থেকে বের

হতে পারবে না। আগে চিঠিটা লুকোতে হবে।

তোর বাবাকে ভাত দিচ্ছি। তোর বাবার খাওয়া হয়ে যাক তারপর তুই হাসানকে খাইয়ে দে। এত রাতে না খেয়ে যাবে কেন?

আচ্ছা।

সুরাইয়া সরে যেতেই তিতলী ছোঁ মেরে চিঠিটা তুলে বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেলল। তার বুকের ধুকধুকানি এখানো যায় নি। তার কেন জানি মনে হচ্ছে মা চিঠিটা দেখেছে।

মতিন সাহেব প্লেটে ভাত নিতে নিতে বললেন, এতদিনেও সামান্য ভাত ঠিকমতো রাঁধা শিখলে না। এটা এমন কী জটিল কাজ যে কুড়ি বছরেও শেখা যাবে না।

সুরাইয়া চুপ করে রইলেন। মতিন সাহেব বললেন, তোমাকে পোলাও-কোরমা, কোপ্তা-কালিয়া তো রাঁধতে বলি না। সামান্য ভাত— এটাও ঠিকমতো রাঁধবে না।

সুরাইয়া কৌটা থেকে এক চামচ ঘি ভাতের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। মতিন সাহেব আগুনগরম ভাতের প্রথম কয়েক নলা ঘি দিয়ে খান। এই ঘি দেশ থেকে আসে।

মতিন সাহেব বললেন, রাতদুপুরে হাসান এসেছে কেন? তিতলীও দেখি ওর সঙ্গে গাবের আঠার মতো লেগে আছে। দু'জনে মিলে গুটুর গুটুর গল্প। ঘরের ভেতর বাংলা সিনেমা আমার খুব অপছন্দ। রাতদুপুরে সে আসবেই বা কেন?

সুরাইয়া ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি আসতে বলেছি।

তুমি আসতে বলেছ? কেন?

শুনেছিলাম হাসানের মা'র খুব অসুখ ছিল— এখন কেমন তা জানার জন্যে আসতে বলেছিলাম।

কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো না। মা'র অসুখের খবর ছেলেকে রাতদুপুরে ঘরে এনে জিজ্ঞেস করতে হবে? মা'র অসুখের তুমি করবে কী? তুমি সিভিল সার্জনও না, পীর ফকিরও না।

সুরাইয়া ক্ষীণ স্বরে বললেন, আরেক চামচ ঘি দেব?

দাও। আর শোন, তোমাকে বলছি, তোমার কন্যাদেরও বলছি— বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ না। বাড়াবাড়ি আমি খুব অপছন্দ করি। হাসানের মা'র খবর জেনেছ?

হুঁ।

তাহলে ওকে বসিয়ে রেখেছ কেন— চলে যাক না।

ভাত খেয়ে যেতে বলেছি।

ভাত খেয়ে যেতে বলেছ কেন?

সুরাইয়া প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, এত রাতে না খায়ে যাবে!

মতিন সাহেব প্লেটে ডাল নিতে নিতে বললেন, তুমি সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি কর। বড়াবাড়ির ফল কখনো শুভ হয় না। হাসানের মা'র হয়েছে কী সেটা তো বললে না।

সুরাইয়া সমস্যায় পড়ে গেলেন। মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে তিনি সামান্য মিথ্যা বলেছেন। মিথ্যা বলাটা ঠিক হয় নি। একটা মিথ্যা বললে পরপর কয়েকটা মিথ্যা বলতে হয়। সুরাইয়া ইতস্তত করে বললেন, জ্বর।

জ্বর শুনে একেবারে ছেলেকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছ। টাইফয়েড-টয়েড হলে তো গুষ্ঠীসুদ্ধা খবর দিয়ে নিয়ে আসতে। আমাকে বল তো— এই বাড়াবাড়ির মানে কী ?

আরেকটা মাছ নাও। আগেই ডাল নিলে কেন ?

মতিন সাহেব আরেকটা মাছ নিলেন। জনপ্রতি একটা করে কই মাছ তিনি হিসেব করে নিয়ে এসেছেন। দুই মেয়ে তাদের ফুফুর বাড়িতে গেছে। দুটা মাছ বেঁচে গেল। তিনি একটা নিতে পারেন। তারপরেও হাসানের জন্যে একটা থাকবে। মতিন সাহেব খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আজ তিনি একা শোবেন। সুরাইয়া তার মেয়ের সঙ্গে ঘুমোবে। আঠার বছরের মেয়েকে কখনো একা ঘরে শুতে দিতে নেই। আঠার বছরের মেয়ে হলো সাক্ষাৎ আগুন। আগুনের সঙ্গে সব সময় পানি রাখতে হয়। মেয়ের মা হলো সেই পানি। আগুন-পানি একসঙ্গে থাকলে বিপদ থাকে না।

হাসান লজ্জিত মুখে খেতে বসেছে। সুরাইয়া তিতলীকে বললেন, তুই খেতে বসে যা।

তিতলী বলল, আমি তোমার সঙ্গে খাব মা।

তিতলীর চোখ জ্বলজ্বল করছে। মনে মনে মাকে সে অনেকবার ধন্যবাদ দিয়েছে। মা এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পদের খাবার করে ফেলেছে। বেগুন ভাজা, ডিম ভাজা, পটল ভাজা। সুরাইয়া বললেন, তুই হাসানকে দেখেশুনে খাওয়া; আমি দেখি তোর বাবার কিছু লাগে কি না।

তিতলী মনে মনে বলল, মা তুমি এত ভালো কেন ? আমি কোনোদিনও তোমার মতো ভালো মেয়ে হতে পারব না। হাজার চেষ্টা করলেও পারব না।

হাসান কিছু খেতে পারছিল না। একটু ডিম ভেঙে মুখে দিল। বেগন ভাজা দিয়ে ভাত মেখে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

তোমার প্রাইভেট টিউশ্যানি কেমন চলছে ?

ভালো।

আর ওই যে জীবনী লেখার কাজ। লিখছ ?

হুঁ।

ভদ্রলোকের নাম যেন কী ?

হিশামুদ্দিন।

তাঁকে তুমি বল না কেন একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে। তাঁকে বল—স্যার আমি চাকরিও করব আর ফাঁকে ফাঁকে আপনার জীবনীও লিখব।

হাসান জবাব দিল না। তিতলীর খুব ইচ্ছে করছে হাসানকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। সাহসে কুলোচ্ছে না, কখন হুট করে মা ঢুকে পড়বেন। তাছাড়া হাত ছুঁয়ে দেখতে হলে অজুহাত লাগে। তেমন কোনো অজুহাতও মাথায় আসছে না। 'তোমার গালে এটা কী ?' এই বলে কি গালটা ছুঁয়ে দেখা যায় না ?

তিতলী বলল, খাচ্ছ না কেন ?

রুচি হচ্ছে না। জ্বর আসছে বোধহয়।

দেখি তো জ্বর কিনা!

তিতলী হাসানের কপালে হাত রেখে চমকে উঠল। জ্বরে কপাল পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর নিয়ে কেউ খেতে বসে ? তার উচিত গায়ে চাদর জড়িয়ে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা। জ্বর নিয়ে তার আসার দরকার ছিল কী। সে তো তাকে আসার জন্যে খবর দেয় নি।

তোমাকে খেতে হবে না। তুমি হাত ধুয়ে ফেল।

হাসান সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বেসিনের কাছে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল। তিতলী বলল, লেবু দিয়ে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দেব ?

না।

জ্বর নিয়ে আসার দরকারটা ছিল কী ?

তোমার টাকাটা নিয়ে এসেছি।

টাকার জন্য কি আমি মরে যাচ্ছিলাম ?

এখন দিতে না পারলে পরে হাত খালি হয়ে যাবে। দিতে পারব না।

সামান্য দু শ টাকা— আশ্চর্য! খবরদার ওই টাকা তুমি আমাকে দেবে না। তোমার কাছে থাকুক সুদে-আসলে বাড়ুক।

বমি বমি লাগছে। তিতলী ঘরে পান আছে ?

আছে। তুমি বসার ঘরে গিয়ে বোস। এ কী ! তুমিতো দেখি ঠিকমতো হাঁটতেও পারছ না। বাসায় যাবে কীভাবে ?

অসুবিধা হবে না, রিকশা নিয়ে চলে যাব।

তিতলী চিন্তিত গলায় বলল, এক কাজ কর— আজ থেকে যাও। বসার ঘরের খাটে মশারি খাটিয়ে দিচ্ছি। এত জ্বর নিয়ে তুমি কোথায় যাবে ?

আরে না, তুমি কী যে বল! তোমার বাবা যদি ভোরবেলা উঠে দেখেন আমি শুয়ে আছি— তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে দেবেন।

আমি মাকে বলি। মাকে বললেই মা ব্যবস্থা করে দেবে।

উনাকে কিছু বলবে না।

মা এত জ্বর নিয়ে তোমাকে কিছুতেই একা যেতে দেবে না।

উনাকে কিছু বলার দরকার নেই। তিতলী আমি যাচ্ছি।

পান। পান খাবে না ?

উহুঁ।

বৃষ্টি পড়ছে তো, বৃষ্টির মধ্যে যাবে কীভাবে ?

অসুবিধা হবে না।

জ্বর নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবে ?

হুঁ।

পাগলের মতো হুঁ হাঁ করছ কেন ? ভালোমতো কথা বল।

হাসান হেসে ফেলল। তিতলীর অস্থিরতার মধ্যে শিশুসুলভ একটা ব্যাপার আছে, যা দেখতে ভালো লাগে।

হাসছ কেন ?

জ্বর হলে হাসতেও পারব না ?

জ্বর নিয়ে তুমি এলে কেন ? কে তোমাকে আসতে বলেছে ?

হাসান আবারো হাসল। তিতলী বিরক্ত মুখে বলল, কথায় কথায় হাসবে না।

আচ্ছা যাও হাসব না।

তিতলী হাসানের হাত ধরল। ধরেই থাকল। মা এসে দেখে ফেললে দেখবে। সে কিচ্ছু কেয়ার করে না। তার চোখে এখন পানি এসে গেছে। হাসানের হাত ধরলেই তিতলীর চোখে পানি আসে।

হাসান নিজেই দরজা খুলল। ভালো বৃষ্টি নেমেছে। বাতাস নেই। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সরাসরি নেমে আসছে, বাঁকাভাবে আসছে না। বাতাস থাকলে বৃষ্টি ধরে যেত— বাতাস জলভর্তি মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেত। আজ মেঘ উড়ে যাবে না। অনেক রাত পর্যন্ত বৃষ্টি পড়তেই থাকবে। আজ রাতটা হচ্ছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর রাত। হাসান বৃষ্টির ভেতর এগোচ্ছে। দরজা ধরে তিতলী দাঁড়িয়ে আছে। হাসানের ইচ্ছা করছে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তিতলীকে দেখে। ইচ্ছাটা সে চাপা দিল। মেয়েটার কান্না কান্না মুখ না দেখাই ভালো। হাসানের শরীর কাঁপছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। রবফের কুঁচির মতো গায়ে এসে লাগছে। চামড়া ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকে যাচ্ছে শরীরের ভেতর। এমন প্রবল বৃষ্টিতে রিকশা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। হেঁটে হেঁটে পুরানা পল্টন থেকে ঝিকাতলা যাওয়া কি সম্ভব ?

হাসান প্যান্টের পকেটে হাত দিল— টাকার বান্ডিলটা আছে তো ? ডান প্যান্টের পকেটে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা তিন হাজার টাকা আছে। তিনটা পাঁচ শ টাকার নোট, বাকি সব এক শ টাকার নোট। সুমির মা তাঁকে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন। সুমিকে তিন মাস ইংরেজি এবং অঙ্ক শেখানোর পারিশ্রমিক। টাকা দেবার সময় ভদ্রমহিলা শুকনো মুখে বললেন, টাকাটা দিতে দেরি হলো কিছু মনে করবেন না। আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম মেয়ের বাবা প্রতি মাসে টাকা পাঠান না, তিন-চার মাস পর পর একসঙ্গে পাঠান। হাসান হাসিমুখে বলল, কোনো অসুবিধা নেই। একসঙ্গে পেয়ে আমার বরং সুবিধাই হলো।

টাকাটা গুণে নিন।

গুণতে হবে না।

গুণতে হবে না কেন ? অবশ্যই গুণতে হবে। গুণুন।

ভদ্রমহিলা সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাসান টাকা গুণল। সব চকচকে নতুন নোট। নতুন নোটের গন্ধ শুঁকে ভালো লাগে। ভদ্রমহিলার সামনে এই কাজটা করা যাবে না।

হাসান সাহেব।

জ্বি।

আমি ঠিক করেছি এখন থেকে আমার মেয়েকে আমি নিজেই পড়াব। আপনার আর আসার দরকার নেই।

হাসানের মন খারাপ হয়ে গেল। তার তিনজন ছাত্রছাত্রী আছে। তিন জনের ভেতর সুমি মেয়েটা অন্যরকম। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে টুকটুক করে গল্প করে। প্রতিটি গল্পই খুব মজার। বেণি দুলিয়ে যখন গল্প করে তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।

স্যার, আমার বাবার যে অসম্ভব বুদ্ধি এই গল্পটা কি আপনাকে বলেছি ?

না তো!

বাবার অসম্ভব বুদ্ধি। বুদ্ধিতে বাবার নাম্বার হলো এক শ-তে এক শ দশ।

এক শ-তে এক শ দশ কীভাবে হয় ?

সবার জন্যে হয় না, বাবার জন্যে হয়।

তাই বুঝি ?

হাঁ তাই। বাবার বুদ্ধি যে এক শ-তে এক শ দশ এটা কে বলে জানেন স্যার ?

না জানি না। কে বলে ?

আমার মা বলেন। আর কী বলেন জানেন ?

জানি না।

আর বলেন— মানুষের এত বুদ্ধি থাকা ভালো না।

তোমার বুদ্ধি কেমন ?

এখন আমার বুদ্ধি কম, তবে আমি যখন বড় হব তখন আমার বুদ্ধিও হবে এক শ-তে এক শ দশ। স্যার আসুন এখন আমরা পড়াশোনা করি। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছি তো মা টের পেলে রাগ করবেন।

হাসান টাকা গোণা শেষ করেছে। সুমির মা বললেন, রাবার ব্যান্ড দিচ্ছি, রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিন। আর শুনুন আমার মেয়েটা আপনাকে খুব পছন্দ করে। ওর বাবা বিদেশে— মেয়েটা একা একা থাকে, কথা বলার কেউ নেই। আপনি মাঝেমধ্যে এসে সুমিকে দেখে যাবেন।

জ্বি আচ্ছা। সুমিকে একটু ডাকুন। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

ওকে ডাকার দারকার নেই। আপনি চলে যাচ্ছেন সে জানে। কান্নাকাটি করতে পারে।

এতগুলো টাকা পকেটে থাকলে মনের বিষণ্ন ভাব কেটে যায়। হাসানের কাটে নি। সে সুমিদের বাসা থেকে বের হবার সময় একবার ভাবল বলে— আমাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না। আমি সপ্তাহে তিন দিন এসে আপনার মেয়েকে পড়িয়ে যাব। বলা হয় নি। লাজুক ধরনের মানুষ বেশির ভাগ সময়ই মনের কথা বলতে পারে না। মনের কথা হড়বড় করে শুধুমাত্র পাগলরাই বলতে পারে। পাগলরা সেই কারণেই মনে হয় সুখী।

বড় রাস্তায় নেমেই হাসান রিকশা পেয়ে গেল। একটা না, তিনটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনই ঝিকাতলা যাবার জন্যে প্রস্তুত। হঠাৎ এ রকম সৌভাগ্যের কারণটা কী ? সৌভাগ্যের পরই দুর্ভাগ্য আসে। তাকে কি পথে হাইজ্যাকার ধরবে ? ধরতে পারে। ধরলে মানিব্যাগ হাতে তুলে দিতে হবে। মানিব্যাগে দুটা এক শ টাকার নোট আছে। ওরা হাসিমুখে মানিব্যাগ নিয়ে চলে যাবে। প্যান্টের পকেটে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা তিন হাজার টাকার খোঁজ করবে না। তবে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির রাতে দেখা হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। ঝড়বৃষ্টির রাতে তারা মজা করে নেশাটেশা করে। বৃষ্টিতে ভিজে হাইজাকিং করা তাদের পোষায় না।

জ্বর সম্ভবত আরো বেড়েছে। হাসানের শরীর থরথর করে কাঁপছে। মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে রিকশায় পড়ে গেলে সমস্যা হবে। হাসান দু হাতে রিকশার হুড ধরে আছে। রিকশাওয়ালার হয়তো ধারণা হয়েছে সে রিকশা চালাচ্ছে না, স্পোর্টস কার চালাচ্ছে। রাস্তার পানি কেটে রিকশা শাঁ শাঁ করে এগোচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে রাস্তা ডুবে আছে। গর্ত-খানা-খন্দ কিছুই চোখে পড়ছে না। হাসানের কেবলি মনে হচ্ছে কোনো একটা গর্তে পড়ে রিকশা উল্টে যাবে।

রিকশাওয়ালাকে রিকশা আস্তে চালাতে বলতেও ইচ্ছা করছে না। হাসানের মনে হচ্ছে— তার কথা বলার শক্তিও নেই।

ঝিকাতলা গলির মুখে এসে রিকশা থামল। এরচে' ভেতরে আর যাবে না। গলিতে একহাটু পানি। ছোটখাটো একটা খাল তৈরি হয়ে গেছে। স্রোতের মতো পানি বইছে— কল কল শব্দও হচ্ছে।

হাসান রিকশা ভাড়া মিটিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে রাবার ব্যান্ডে মোড়া তিন হাজার টাকার প্যাকেটটা নেই। রিকশার সিট খালি— পা রাখার জায়গাটাও খালি।

রিকশাওয়ালা বলল, ভাইজান আপনার কি শইল খারাপ?

হাসান ক্লান্ত গলায় বলল, হুঁ।

তাইলে টাইট হইয়া বহেন লইয়া যাই। জুম বৃষ্টি নামছে— সোভানাল্লাহ কী অবস্থা!

হাসান রিকশা থেকে নেমে গেল। রিকশায় টাইট হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না।

গলির নোংরা পানিতে পা টেনে টেনে হাসান এগোচ্ছে। বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙ্গে। হাসানের মনটা খুব খারাপ। তিন হাজার টাকা তার কাছে অনেক টাকা। এই টাকার শোক ভুলতে তার দীর্ঘদিন লাগবে। তিতলী দু শ টাকা পেত, সেই টাকাটাও তাকে দেয়া হলো না। আবার কবে তার হাতে টাকা আসবে কে জানে!

রাত যত বাড়ছে বৃষ্টি ততই বাড়ছে। তিতলী শুয়েছে জানালার পাশে। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে তাকে প্রায় ভিজিয়ে দিচ্ছে। সুরাইয়া উঠে বসলেন, তিতলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, জানালাটা বন্ধ করে দে। ভিজে যাচ্ছিস তো!

ভিজছি না।

ভিজছিস না মানে— গা তো অর্ধেক ভেজা।

সুরাইয়া জানালা বন্ধ করার জন্য এগোলেন। তিতলী করুণ গলায় বলল, পায়ে পড়ি মা। জানালা খোলা থাকুক।

শেষে একটা অসুখ-বিসুখ বাঁধাবি।

আমার কিচ্ছু হবে না।

তিতলী গুটিসুটি মেরে মায়ের কাছে ঘেঁষে এল। সুরাইয়া মেয়ের গায়ের ওপর একটা হাত তুলে দিলেন। মেয়ের জন্য আজ তাঁর মনটা খুব কাঁদছে। তিতলীর সামনে ভয়াবহ দুঃসময়। তিললীর বড় ফুফু তিতলীর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলছেন। ছেলে খুবই ভালো, জিওলজিতে মাস্টার্স করে ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়েছে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছে। বউ নিয়ে পিএইচডি করতে যাবে কানাডায়। তারা এসে কয়েক দফায় তিললীকে দেখে গেছে। মেয়ে পছন্দ কি অপছন্দ হয়েছে এমন কিছু বলছে না।

তবে পছন্দ তো হয়েছে নিশ্চয়ই— নয়তো দফায় দফায় মেয়ে দেখত না। তিতলীর ফুফু আজ এসেছিলেন, তিনি সুরাইয়াকে আড়ালে ডেকে বলেছেন— ওরা খবর পাঠিয়েছে মেয়ে ওদের পছন্দ। তারপরেও একটু খোঁজখবর করছে— ফাইনাল কথা আগামী সপ্তাহে বলবে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ কর।

যদি শেষ পর্যন্ত ওরা পছন্দ করে ফেলে তিতলীকে সেখানেই বিয়ে দিতে হবে। বড় ফুফুর ইচ্ছার বাইরে যাবার ক্ষমতা তিতলীর নেই। তিতলীর কেন, এ বাড়ির কারোই নেই।

তিতলী।

জ্বি মা।

হাসানের কি একটা এনজিওর চাকরি যে হবার কথা ছিল হয় নি?

হয়েছিল। সে যায় নি—গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়, বেতনও খুবকম।

কত বেতন?

আঠার শ টাকা।

বলিস কী! মাত্র আঠার শ টাকা?

হুঁ।

সুরাইয়া বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন— তিতলরি শরীর কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি মেয়েকে আরো কাছে টেনে নিলেন।

তিতলী!

জ্বি মা।

কাঁদছিস নাকি?

তিতলী জবাব দিল না, তবে তার ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল।

কাঁদছিস কেন?

তিতলী অস্পষ্ট স্বরে বলল, ফুফু তোমাকে আড়ালে নিয়ে কী বলেছে?

কিছু বলে নি।

আমি জানি বলেছে। মা শোন, আমি এখন বিয়ে করব না।

তোর ফুফু চাইলে না করবি কীভাবে?

তিতলী জবাব দিল না। তার শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হয়েছে। সে নিজেকে সামলেছে। সুরাইয়া নরম গলায় বললেন, একটা মেয়ের জীবনে বিয়ে অনেক বড় ব্যাপার। বিয়ে হলো তার নিজের ঘর-সংসার। সুন্দর ঘর-সংসার সব মেয়েই চায়। চায় না?

হুঁ।

একটা বেকার ছেলেকে বিয়ে করে অভাব-অনটনে সারা জীবন কাটানোর কোনো মানে হয় মা? প্রেমের চেয়েও টাকা-পয়সা অনেক বেশি জরুরি।

এখন এইসব কথা থাক মা। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাক।

তোর ফুফুরা তোর জন্যে যে বিয়েটা দেখছে সেটা যদি হয় তাহলে তোর জন্যে কিন্তু ভালো হবে। বরের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবি। ঢাকা শহরে নিজের বাড়িতে থাকবি...

মা চুপ কর তো।

টাকা-পয়সাটা যে কত জরুরি সেটা কি তুই আমাদের এই সংসার দেখেও বুঝতে পারছিস না ? তোর বাবার চাকরি নেই— সংসার চালাতে হয় ফুফুদের দেয়া টাকা থেকে। তোর ফুফুদের কথা আমরা ফেলব কীভাবে ? মা, ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

তিতলী জবাব দিল না। তার আবারো কান্না পাচ্ছে। খুব সাবধানে কাঁদতে হবে। মা যেন টের না পায়। মা টের পেলে মনে কষ্ট পাবে। তিতলী কাউকে কষ্ট দিতে চায় না।

কষ্ট দিতে না চাইলেও তাকে কষ্ট দিতে হবে। হাসানকে ছাড়া সে বাঁচবে না। সে যদি পথে পথে ভিক্ষা করেও বেড়ায় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। দেশ-বিদেশ দেখে কী হবে ? সে তার একটা জীবন হাসান ভাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে।

তাছাড়া কোনো একটা চাকরি তো হাসান ভাইয়ের অবশ্যই হবে। তখন তারা ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া করবে। দু কামরার ঘর হলেই তাদের চলবে। একটা শোবার ঘর, একটা বসার ঘর। এক চিলতে বারান্দা থাকলে খুব ভালো হয়। বারান্দায় সে ফুলের টব রাখবে। কোনো এক সময় তাদের সংসারে একটা বাবু আসবে। বাবুর নামও সে ঠিক করে রেখেছে।

সুরাইয়া ভারি ভারি নিঃশ্বাস ফেলছেন। তিতলীর ঘুম আসছে না। তার খুব অস্থির লাগছে। হাতের আঙুল কাঁপছে। হাসানের আশপাশে থাকলে তার এ রকম হয়। নির্জনে যখন হাসানের কথা ভাবে তখনো হয়। বিয়ের পরেও কি এ রকম হবে ? নাকি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে! বাবা যেমন মায়ের সঙ্গে কঠিন গলায় কথা বলেন, হাসানও তার সঙ্গে কঠিন গলায় কথা বলবে ? না, তা সে কখনো হতে দেবে না। তিতলী খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামল। হাসানের চিঠিটা আরেকবার পড়তে ইচ্ছে করছে। সে বারান্দায় চলে যাবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিঠিটা আরেকবার পড়বে।

হাসানের চিঠিগুলো খুব সাদামাটা ধরনের হয়। আবেগের কথা কিছুই থাকে না, তবু চিঠি চোখের সামনে ধরলেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কেন এ রকম হয় ?

> *তিতলী,*
>
> *ক'দিন ধরে আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। রাতে ঘুমোতে গেলেই উদ্ভট স্বপ্ন দেখি। একটা স্বপ্ন বেশ কয়েকবার দেখে ফেললাম—স্বপ্নটা হচ্ছে আমি একদল হাসের সঙ্গে ঘুরছি। শামুক গুগলি খাচ্ছি। কী বিশ্রী স্বপ্ন তাই না ? আচ্ছা শোন হাস বানানে কি চন্দ্রবিন্দু আছে ? যদি থাকে তুমি দিয়ে নিও।*
>
> *ইতি*
>
> *হাসান*

এই হচ্ছে চিঠি। কষ্ট করে কি আরো কয়েকটা লাইন লেখা যেত না ? সে কি লিখতে পারত না—

> *"তিতলী শোন, আমি সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবি। সারাক্ষণ আমার ইচ্ছা করে তোমার হাত ধরে বসে থাকতে। সেই দিন কবে যে আসবে! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। চল আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলি— তারপর যা হবার হবে।*

না হাসান এই জাতীয় কথাবার্তা কখনো লিখবে না। তার চিঠিগুলো হলো কাজের চিঠির মতো।

তিতলী ঘুমোতে এল। বৃষ্টি আরো প্রবল হয়েছে। তারা যখন সংসার করবে তখন বৃষ্টির রাতগুলো ঘুমিয়ে নষ্ট করবে না। তিতলী মায়ের গায়ে হাত উঠিয়ে দিল। সুরাইয়া মেয়েকে নিজের দিকে আরেকটু টেনে নিয়ে বললেন, চিঠিতে কী লেখা যে একটু পর পর পড়তে হচ্ছে? তিতলীর হাত-পা শক্ত হয়ে গেল। সুরাইয়া হাসলেন। অন্ধকারে সেই হাসি তিতলী দেখতে পেল না— সে গুটিসুটি মেরে মায়ের বুকের কাছে চলে এল।

৪

মে মাসের কড়া ঝাঁঝালো রোদ এসে পড়েছে হাসানের মুখের ওপর। রোদ ঠেকাবার জন্যে হাসানকে উঠে জানালা বন্ধ করতে হবে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। হাসানের বিছানায় উঠে বসার ক্ষমতা নেই, জানালা বন্ধ করা তো অনেক পরের ব্যাপার। তার গায়ে এক শ তিন পয়েন্ট পাঁচ জ্বর। রীনা কিছুক্ষণ আগে জ্বর মেপেছে। জ্বর থার্মোমিটারে মাপা হয় নি, বাসায় থার্মোমিটার নেই। রীনা কপালে হাত রেখে গম্ভীর গলায় বলেছে, এক শ তিন পয়েন্ট পাঁচ। জ্বরের ক্ষেত্রে রীনার অনুমান ভালো। জ্বর মনে হয় বাড়ছে। গায়ে কাঁপুনি দিচ্ছে। মুখের ওপর রোদটা আগেও ছিল। তখন এতটা খারাপ লাগছিল না। এখন অসহ্য বোধ হচ্ছে। রোদটা মনে হচ্ছে তরল আকার নিয়েছে। মুখ থেকে গড়িয়ে চোখের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। চোখ ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে।

হাসান কয়েকবার ডাকল, এদিকে কে আছে? এই এই! ডাক তেমন জোরালো হলো না কিংবা জোরালো হলেও কেউ শুনল না। সকালবেলার কয়েকটা ঘণ্টা বাড়ির লোকজন সীমাহীন ব্যস্ততায় থাকে। সকাল আটটা থেকে সাড়ে ন'টা এই দেড় ঘণ্টা সময়ের ভেতর তারেক অফিসের দিকে রওনা হন। অফিসে যাবার প্রস্তুতি পর্ব শেষ হতে তার পুরো এক ঘণ্টা লাগে। তিনি কোনো জিনিসই খুঁজে পান না। তার হাঁকডাক ক্রমাগত শোনা যেতে থাকে— আমার জুতার ভেতর মোজাজোড়া রাখলাম, একটা আছে আরেকটা গেল কোথায়? পরিষ্কার একটা রুমাল দিতে বললাম— কথাটা কারো কানে যাচ্ছে না? এটা বলার জন্যে কি আমি মাইক ভাড়া করব? টেবিলের ওপর বড় একটা হলুদ খাম ছিল— খামের ওপর লাল কালি দিয়ে 'Important' লেখা। খামটা গেল কোথায়? একটু আগেও তো দেখেছি। খামের তো আর পা নেই যে হেঁটে হেঁটে মালিবাগ চলে যাবে?

তারেক সাহেবের দুই ছেলে রকেট ও বুলেটের স্কুল সাড়ে আটটায়। (আসল নাম মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন। রকেট এবং বুলেট হাসানের ছোট ভাই রকিবের দেয়া নাম— এই নামেই তারা স্কুলে এবং বাসায় পরিচিত। তাদের সুন্দর ডাকনামও আছে টগর ও পলাশ। এই দুই নামে তাদের মা ছাড়া এখন আর কেউ ডাকে না।) তারা দু'জন এক বছরের ছোট বড় হলেও একই ক্লাসে পড়ে। যমজ ভাইদের মতো প্রতিটি কর্মকাণ্ড তারা একসঙ্গে করে। সকাল সাড়ে সাতটায় স্কুলের জন্য তৈরি হয়ে দুজনেই বলে, 'আজ স্কুলে যাব না।' সাড়ে সাতটা থেকে আটটা এই আধঘণ্টা তাদের ওপর স্কুলযাত্রায় রাজি করানোর নানা প্রক্রিয়া চালানো হয়। কোনোটিই কাজ করে না। শেষ ওষুধ হিসেবে রীনা দু'জনের গালেই কষে চড় বসায়। দু'জন একই সঙ্গে গলা ছেড়ে কাঁদে। ক্রন্দনরত অবস্থাতেই তাদের প্রায় টেনেহেঁচড়ে রিকশায় তুলে দেয়া হয়। এদের

স্কুলে পৌঁছে দেয়া এবং স্কুল থেকে আনার দায়িত্ব পালন করেন তাদের দাদুভাই আশরাফুজ্জামান সাহেব। কাজটা তিনি যে খুব আগ্রহের সঙ্গে করেন তা না। রিটায়ার্ড বাবা যদি ছেলের সংসারে বাস করতে আসেন তাহলে তাঁকেও কিছু কাজকর্ম করতে হয়। জগতে ফ্রি লাঞ্চ বলে কিছু নেই।

হাসানের ছোট বোন লায়লা জগন্নাথ কলেজে বি.এ. পড়ে। সে লাঞ্চবক্সে করে দুপুরের টিফিন নিয়ে যায়। তাকে এই সময় অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা যায়। সে খুব সাজগোজ পছন্দ করে। তার ব্যস্ততা একই সঙ্গে সাজগোজের দিকে এবং টিফিন তৈরি হলো কি না সেই দিকে। নিজের সাজগোজের ওপর লায়লার আস্থা খুবই কম। সাজের প্রতিটি পর্যায়ে সে তার ভাবির কাছে ছুটে যায়— ভাবির মতামত নিয়ে নিয়ে সাজের পরবর্তী ধাপের দিকে এগোয়, ভাবি টিপটা কি মাঝখানে হয়েছে? লাল টিপটাই পরব নাকি টিপ হাতে আঁকব? ঠোঁটের লিপস্টিক কি বেশি কড়া হয়ে গেছে?

রীনা বিরক্ত হয় না। সাজসজ্জার ব্যাপারে অন্যকে পরামর্শ দেবার ব্যাপারে কোনো মেয়েরই বিরক্তি থাকে না। মেয়েরা এই কাজটা খুব আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে করে।

ঠিক ন'টার সময় ঠিকা কাজের মেয়ে ফুলির মা আসে। প্রতিদিনই তার সঙ্গে এ বাড়ির স্থায়ী কাজের মেয়ে কমলার মা'র একটা ঝগড়া শুরু হয়। কমলার মা নিচু গলায় ঝগড়া করলেও ফুলির মার গলা— কাকতাড়ুয়া গলা। সে চিৎকার শুরু করলেই আশপাশের কাক উড়তে থাকে। প্রতিদিনই একবার ঠিক করা হয় ফুলির মাকে আর রাখা হবে না। পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে বিদায় করা হবে। বিদায় করা হয় না। কারণ ফুলির মার কর্মক্ষমতা অসাধারণ। ঝগড়া করতে করতেই সে অতি দ্রুত বাসনকোসন মেজে ঝকঝকে করে ফেলবে। পুরো বাড়ি ঝাঁট দেবে, কলঘরে রাখা দু বালতি কাপড় ধুয়ে চিপে দড়িতে শুকোতে দেবে। তার দায়িত্ব এই পর্যন্তই। দায়িত্ব পালনের পরেও সে যাবার আগে রীনাকে জিজ্ঞেস করবে, আর কোনো কাম আছে আফা। থাকলে তুরন্ত কন। এক বাড়িত কাম করলেই আমার শেষ না, আরো বাড়ি আছে। নিজের ঘর-সংসার আছে।

এমন একজন কাজের মানুষকে শুধুমাত্র ঝগড়া করার স্বভাবের জন্যে কেউ বিদায় করে না। মানুষ এত বোকা না!

সকালের এই ব্যস্ততা, হট্টগোল হাসান তেমন টের পায় না। কারণ তার ঘুম ভাঙে ন'টার পরে। ততক্ষণে হইচই থিতিয়ে আসে। চারদিকে ঝড়ের পরের শান্ত অবস্থা বিরাজ করে। আজ জ্বরের কারণে সকাল ছ'টা থেকে সে জেগে। বাড়ির প্রতিটি শব্দ তার কানে আসছে। প্রবল জ্বরের সময় মানুষের কান তীক্ষ্ণ হয়। নিচু শব্দও অনেক বড় হয়ে কানে বাজে। হাসান বিড় বিড় করে নিজের মনেই বলল, হইহল্লাটা একটু কমানো যায় না? গড অলমাইটি বাড়িটা একটু শান্ত করে দিন। আমার ওপর একটু দয়া করুন। প্লিজ।

হইহল্লা কমল না, বরং বাড়তে থাকল। ঝনঝন শব্দে থালা বা কাচের জগ ভাঙল। কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ একবার হয়েই থেমে যাবার কথা— এই শব্দ থামছে না— ঝনঝন করে বেজেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে থালাবাসনও টের পেয়েছে এ বাড়িতে একজন অসুস্থ মানুষ আছে। তাকে বিরক্ত করা তার পবিত্র কর্তব্য। এর মধ্যে লায়লা ঘরে ঢুকে বলল, দাদা তোর নাকি আকাশ-পাতাল জ্বর— ভাবি বলল।

হাসান জবাব দিল না। লায়লা সেন্ট মেখেছে, সেন্টের গন্ধে হাসানের গা গোলাচ্ছে। হাসান নিশ্চিত লায়লা আর কিছুক্ষণ তার ঘরে থাকলে সে বমি করে দেবে। যে কোম্পানি

এই সেন্ট বানিয়েছে সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়া দরকার।

দাদা দেখতো এই হলুদ শাড়িটা কি বেশি কটকটে লাগছে?

হাসান ধমকের গলায় বলল, তুই ঘর থেকে যা তো। জাস্ট ক্লিয়ার আউট।

লায়লা হাসানের ধমকে বিস্মিত হলো না বা রাগও করল না। যেভাবে ঘরে ঢুকে ছিল, সেভাবেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তখন হাসানের মনে হলো একটা ভুল হয়েছে লায়লাকে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করালে কাজ হতো। রোদটা আর চোখের ভেতর ঢুকে যেত না। কী বিশ্রী কী ভয়ংকর রোদই না আজ উঠেছে! তরল রোদ। রোদের ভিসকোসিটি অনেক— গড়াতে গড়াতে কী সুন্দর চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে মাথাটা ভারি করে ফেলছে!

কলঘর থেকে কাপড় কাচার শব্দ এবং ফুলির মার গলাবাজি একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে— উচিত কথা আমারে শিখায়। আরে ধুমসী কাইলা মাগী— উচিত কথার ধার ফুলির মা ধারে না। তোর উচিত কথাত ফুলির মা থুক দেয়। থু থু থু।

রীনার গলা শোনা গেল— ফুলির মা চুপ কর তো।

ফুলির মার গলা আরো এক ধাপ উঠে গেল, আফা আমারে না— ধুমসী কাইলা মাগীরে চুপ করতে কন। হের গলা পাও দিয়া চাইপ্যা ধরেন। মাগী আমারে উচিত কথা শিখায়।

ফুলির মা মাগী ফাগী বলবে না খবরদার!

মাগীরে মাগী বলব না তো কী বলব আফা? ছাগী বলব? মাগীরে ছাগী বললে ছাগীরে কী বলব— বোতল বলব? আপনেই বলেন, আপনের বিচারটা কী হুনি।

চুপ কর।

আপনে চুপ করেন। অত গরম ভালো না। ফুলির মা গরমের ধার ধারে না।

হাসানের ইচ্ছা করছে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে— তোমরা দয়া করে চুপ করবে? দয়া করে কেউ একজন এসে আমার জানালা বন্ধ করবে? তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না আমার মাথার ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে।

হাসানের মনে হলো হঠাৎ সব শব্দ কমে গেল। মাথার ভেতর জমে থাকা তরল রোগ হঠাৎ জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে গেল। হাসানের ঘুম ঘুম পেতে লাগল।

তার সত্যি ঘুম পাচ্ছে, না সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? প্রচণ্ড জ্বরে অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা সে অন্যের কাছে শুনেছে। তার বেলায় এই প্রথম ঘটছে। খুব খারাপ তো লাগছে না। অজ্ঞানটা আরো আগে হতে পারলে ভালো হতো। হাসান ক্ষীণ গলায় ডাকল— ভাবি, ভাবি।

মাথায় ঠাণ্ডা পানির ধারা। কেউ একজন চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। কে পানি ঢালছে? চোখ মেললেই দেখা যায়— চোখ মেলতে ইচ্ছা করছে না। বাসায় পানি ঢালার মানুষ নেই। কমলার মা কি পানি ঢালছে? মনে হচ্ছে কমলার মা। তবে কমলার মা মাথায় পানি ঢাললেও চুলে বিলি কাটবে না। তাহলে কে? চোখ মেলে কি দেখবে? না, দেখতে ইচ্ছা করছে না। যার ইচ্ছা পানি ঢালুক কিছু যায় আসে না।

হাসান!

জ্বি ভাবি।

একটু কি ভালো লাগছে ?

হুঁ।

তোমার জ্বর কত উঠেছে জান ?

না।

এক শ পাঁচ। আমি বাড়িওয়ালাদের বাসা থেকে থার্মোমিটার এনে জ্বর মেপে হতভম্ব! তুমি অচেতনের মতো হয়ে ছিলে। মুখ দিয়ে ফেনা টেনা বের হয়ে বিশ্রী কাণ্ড। উঠে বসতে পারবে ?

উঠে বসতে হবে কেন ?

দু'টা প্যারাসিটামল খাইয়ে দিতাম। জ্বরটা কমত।

শুয়ে শুয়ে খেতে পারব। দাও ট্যাবলেট দুটা দাও।

গলায় আটকাবে তো ?

আটকাবে না।

হাসান শোন, পুরো এক ঘণ্টা তোমার মাথায় পানি ঢালা হয়েছে, গা স্পঞ্জ করা হয়েছে। আমার ধারণা জ্বর অনেকটা কমেছে। আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি। তুমি বসে প্যারাসিটামল খাও। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে জ্বরটা আরো কমবে তখন নাশতা নিয়ে আসব। দাঁড়াও মাথাটা আগে মুছে দি।

হাসানকে ধরে উঠাতে হলো না, সে নিজেই উঠে বসল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। রীনা তার কোলে একটা বালিশ দিয়ে দিল। জ্বর কতটা কমেছে দেখতে পারলে হতো। সম্ভব না— কারণ থার্মোমিটার কিছুক্ষণ আগে টেবিল থেকে পড়ে ভেঙেছে। বাড়িওয়ালাকে এই জাতীয় আরেকটা থার্মোমিটার কিনে দিতে হবে। আজ দিনের মধ্যেই কিনতে হবে। সন্ধ্যার মধ্যে থার্মোমিটার পাঠানো না হলে লোক চলে আসবে। তাদের বাড়িওয়ালা কঠিন বস্তু।

এখন কি একটু ভালো লাগছে ?

হুঁ।

রাত দুপুরে বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বরজ্বারি তো হবেই।

মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ হওয়া ভালো, সেবা পাওয়া যায়।

অসুখ-বিসুখ ছাড়াই সেবা পাওয়ার লোক নিয়ে এসো— চোখ বন্ধ করে বসে আছ কেন ? তাকাও।

আলো চোখে লাগছে ভাবি।

লাগুক। চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে না। বিশ্রী লাগে। তোমার ভাইয়েরও একই অভ্যাস। খাটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা আর পা নাচানো। মনে হয় তার একটা পা স্প্রিঙের। বাতাস পেলেই দোলে।

হাসান চোখ মেলল। আলোটা এখন আর তেমন চোখে লাগছে না। শরীর ঘামছে, জ্বর মনে হয় সত্যি সত্যি কমছে। তবে সিগারেট খাবার ইচ্ছা এখনো হচ্ছে না। যখন হবে তখন বুঝতে হবে জ্বর পুরোপুরি কমে গেছে। হাসান রীনার দিকে তাকিয়ে হাসল।

একবার ভাবল বলে— ভাবি আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। শেষ পর্যন্ত বলল না। রীনা ভাবির মুখ খুব আলগা— ফট করে এমন এক কথা বলবে যে অস্বস্তিতে মুখটুক শুকিয়ে যাবে। ভাবি সেটা নিয়ে দিনের পর দিন ঠাট্টা করে বেড়াবে। একদিন রীনা হালকা সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরেছিল, চুলগুলো ছিল ছাড়া। হাসান তাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলেছিল— তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন ভাবি ? রীনা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি কি রবীন্দ্রনাথ ?

তার মানে ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বউদির প্রেমে পড়েছিলেন। তোমারও মনে হয় সেই অবস্থা।

হাসান দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। রীনা সহজ ভঙ্গিতে বলল, চোখমুখ এমন করে ফেলেছ কেন ? বউদিদের প্রেমে পড়া এমন কোনো ভয়াবহ অপরাধ না। এ দেশের সমাজ ব্যাপারটা সহজভাবেই দেখে। প্রেম খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছলে দেবরকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বউয়ের সঙ্গে এক রাত কাটাবার পর সব প্রেম শেষ। প্রেমের সলির সমাধি হয় না— হয় বিছানা সমাধি।

রীনার রসিকতা এখানে শেষ হলেও হতো। শেষ হয় নি। সেদিনই রীনা হাসানের সামনে তার বড় ভাইকে বলল, ঘটনা শুনেছ ? তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তো আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভাইকে এক্ষুনি বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আর দেরি করলে সে আমাকে প্রেমপত্র-টত্র লিখে ফেলবে। তখন যন্ত্রণা হবে। ইট ইজ হাই টাইম।

হাসানের লজ্জায় মরে যাবার মতো অবস্থা। এ জাতীয় বিপজ্জনক মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলতে হয়। হাসান খুবই সাবধানে কথা বলে। তারপরেও মাঝে মাঝে বিশ্রী ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

রীনাকে আজ আসলেই খুব সুন্দর লাগছে। কে বলবে এই মহিলা ত্রিশ বছর পার করে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে হালকা পাতলা গড়নের এক কিশোরী— আজ মজা করে শাড়ি পরে বড় সেজেছে।

আজ কী বার ভাবি ?

সোমবার।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন ?

সোমবার আমার জন্যে খুব খারাপ। ভয়াবহ সব সমস্যা হয় সোমবারে।

তোমার তো শুধু সোমবার খারাপ। আমার সব বারই খারাপ।

ভাবি চা খাব।

শুধু চা ?

চায়ের সঙ্গে একটা টোস্ট খেতে পারি। জ্বর মনে হয় কমে যাচ্ছে ভাবি। ঘাম দিচ্ছে।

ভেরি গুড— শোন তোমার টাকাটা ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। তুমি এত অসাবধান কেন ?

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না ভাবি কীসের টাকা ?

কাল রাতে যে ভেজা প্যান্ট কলঘরে ছেড়ে এলে তার হিপ পকেটে তিন হাজার টাকা। রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। কাপড় ধুতে গিয়ে ফুলির মা পেয়েছে— আমাকে দিয়ে

গেছে।

বল কী?

বল কী মানে? টাকার কথা জানতে না? অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর হয়, অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড বেকার হয় বলে তো জানতাম না। কোথায় পেয়েছ এত টাকা?

টিউশ্যানির টাকা ভাবি। সুমি বলে একটা বাচ্চা মেয়েকে পড়াতাম। তিন মাসের টাকা এক মাসে দিয়ে চাকরি নট করে দিয়েছে।

কেন?

পড়াতে পারি না এই জন্যে বোধহয়।

পড়াতে পার না?

নাহ্— পড়াতে গিয়ে শুধু গল্প করি।

বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে এত কীসের গল্প?

বাচ্চাদের সঙ্গে গল্পই সবচে' ইন্টারেস্টিং ভাবি। যা ইচ্ছা বলতে পারেন। ওরা মন দিয়ে শুনবে। বড়দের সঙ্গে গল্প করা খুব সমস্যা। প্রতিটি কথা ভেবেচিন্তে বলতে হয়।

আমার সঙ্গে গল্প করার সময়ও কি তুমি প্রতিটি কথা ভেবে চিন্তে বল?

রীনা ঠোঁট টিপে হাসছে। হাসান সাবধান হয়ে গেল। ভাবির মতলব ভাল না— কোনো একটা প্যাঁচে ফেলে দেবে।

চা খাব ভাবি।

চা, টোস্ট, সিদ্ধ ডিম?

হ্যাঁ।

মাথাটা এগিয়ে আন তো জ্বরের অবস্থা দেখি। এ কী! লজ্জায় এমন লাল হয়ে যাচ্ছ— তুমি কি সত্যি সত্যি আমার প্রেমে পড়েছ নাকি? আশ্চর্য কাণ্ড!

রানী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারটা প্রায় বাজে, আজ হাফস্কুল, বাচ্চাদের এগারটার মধ্যে চলে আসার কথা— এখনো আসছে না কেন? অস্পষ্ট কুয়াশার মতো দুশ্চিন্তা হচ্ছে। যদিও রীনা জানে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বাবা সঙ্গে আছেন। ট্রাফিক জ্যামট্যামে রিকশা নিশ্চয়ই আটকা পড়েছে।

আজ দুপুরে কী রান্না হবে সেটাও দেখতে হবে। বাজার হয় নি। রোজকার বাজার হাসান করে দেয়। আগে সপ্তাহের বাজার করে ফ্রিজে রাখা হতো। ফ্রিজ কাজ করছে না। নতুন গ্যাস ভরতে হবে। দোকান থেকে ডিম আনিয়ে ডিমের তরকারি করা ছাড়া উপায় নেই। ডিম আনানোর লোক নেই। কমলার মাকে পাঠানো যাবে না। তার বাড়ি থেকে বের হওয়া মানেই অ্যাকসিডেন্ট। রিকশার নিচে পড়ে যাওয়া, ড্রেনে পড়ে যাওয়া— একবার মাইক্রোবাসের ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে দু'দিন ছিল হাসপাতালে। আরেকবার পান কিনতে গিয়ে কুকুরের কামড় খেয়ে এল। মহাখালিতে নিয়ে নাভিতে ইনজেকশন— শতেক যন্ত্রণা।

রীনা রান্নাঘরে ঢুকল। গ্যাসের চুলা দু'টিই জ্বলছে। চুলায় কিছু নেই। কমলার মা নির্বিকার ভঙ্গিতে সুপারি কাটছে। কমলার মা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পান খায়। পানের খরচ তাকে

আলাদা দিতে হয়।

কমলার মা ?

জ্বি।

একটা ডিম সিদ্ধ কর তো।

ডিম নাই আফা।

একটাও নেই ?

জ্বি না। আমার পানও ফুরাইছি। সকাল থাইক্যা সুপারি চাবাইতাছি। অখন একটা পান না খাইলে দমফুটা লাইগ্যা মিত্যু হবে।

মৃত্যু হবার দরকার নেই— যাও পান নিয়ে আস। দু হালি ডিম আনবে। আজ ডিমের তরকারি করবে। ঘরে বেগুন আছে না ? বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি। এস টাকা নিয়ে যাও। রাস্তা সাবধানে পার হবে কমলার মা। গ্যাসের চুলা নিভিয়ে দিয়ে যাও— শুধু শুধু জ্বলছে কেন ?

রীনার সংসারের টাকা স্টিলের আলমারিতে চকলেটের খালি টিনে আলাদা করে থাকে। আজ মাসের ২৫ তারিখ, সেই টিন খালি। রীনা তা জানে তারপরেও টিন খুলল। টিন আসলেই খালি— একটা চকচকে দশ টাকার নোট পড়ে আছে। টাকার বাক্স পুরোপুরি খালি রাখতে নেই বলেই দশ টাকার নোটটা আছে।

আরেকটা টিনের কৌটা আছে তার শোবার ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে। ইমার্জেন্সি ফান্ড। সেটাও খালি। টাকা-পয়সার এই শোচনীয় অবস্থার কথা তারেককে সে দুদিন আগেই বলেছে। তারেক বলেছে ব্যবস্থা করছি। আজ তার কিছু টাকা আনার কথা। আজ না আনলে আগামীকাল বাচ্চাদের স্কুলেও পাঠানো যাবে না। এই মাসটা তাও কোনোক্রমে পার হয়ে গেল— সামনের মাসটায় কী হবে কে জানে ! এ মাসে বাড়ি ভাড়া পুরোটা দেয়া হয় নি। এক হাজার টাকা কম দেয়া হয়েছে। সামনের মাসে বাড়ি ভাড়ার সঙ্গে এক হাজার টাকা বেশি দিতে হবে। বাড়তি এক হাজার টাকাটা আসবে কোত্থেকে ?

এই বাড়িওয়ালা এমন না যে তাকে বাচ্চাদের মতো ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যাবে। সে ঠিকই সামনের মাসে দু তারিখে সস্তা কিছু লজেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হবে। হাসিমুখে ডাকবে রীনা বউমা কোথায় ? রকেট-বুলেট কোথায় ? এই দুজনকে দিনে একবার না দেখলে ভালো লাগে না।

টাকা-পয়সার এই অশান্তি রীনার অসহ্য বোধ হচ্ছে। কোনোখান থেকে একবার হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাওয়া গেলে খুচরা ঋণগুলো দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা যেত। সেই সম্ভাবনা নেই। হার্ডওয়ারের দোকানে আলাদীনের চেরাগ কিনতে পাওয়া যায় না। আলাদীনের চেরাগ ছাড়া এই সমস্যার কোনো দিন সমাধান নেই।

রীনার একটা ভারি নেকলেস আছে। তার দাদিজান বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। পাঁচ ভরি সোনার পদ্মহার। দাদির স্মৃতিচিহ্ন। স্মৃতিচিহ্ন-ফিহ্ন আবার কী ? বেঁচে থাকাটাই সবচে' বড় স্মৃতিচিহ্ন। হারটা বিক্রি করে দিতে হবে।

রীনা আবার হাসানের ঘরে ঢুকল। হাসান হাসিমুখে বলল, ভাবি জ্বরটা মনে হয় পুরোপুরি সেরে গেছে। একটু আগে একটা সিগারেট খেলাম।

ভালো। তোমার চা-টোস্ট এবং ডিম চলে আসবে। শোন হাসান, তোমার তিন হাজার টাকা থেকে আমাকে কিছু ধার দিতে পারবে— শ পাঁচেক?

ভাবি তুমি পুরোটাই নিয়ে যাও। টাকাটার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম পাওয়া যখন গেছে এটা তোমার।

আমি পাঁচ শ টাকাই নিচ্ছি বাকি টাকাগুলো দিয়ে তুমি দয়া করে কিছু ভালো কাপড়চোপড় বানাও। ইন্টারভ্যুর সময় এলেই তোমার ভাইয়ের শার্ট-প্যান্ট নিয়ে তুমি দৌড়াদৌড়ি কর— আমার খারাপ লাগে। তোমার বয়েসী একটা ছেলের এক সেট ভালো কাপড়চোপড় থাকবে না, এটা কেমন কথা! আর শোন, ভালো একজোড়া জুতা তুমি অবশ্যই কিনবে। শার্ট ইন করে প্যান্ট পরবে, জুতা পরবে, চকচকে নতুন টাকার মতো স্মার্ট ভঙ্গিতে ইন্টারভ্যু দিতে যাবে তবেই না চাকরি হবে। লেবেন্ডিসের মতো ইন্টারভ্যু দিতে যাও বলেই তোমার কিছু হয় না। তুমি আমাকে দোকানে নিয়ে যেও। আমি দেখে শুনে তোমার জামাকাপড় কিনে দেব।

হাসান লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আচ্ছা।

রীনা টাকা হাতে বের হয়ে এল। তার লজ্জা লাগছে। টিউশ্যানি করে হাসান অল্প কিছু টাকাই পায় সেই টাকায় রীনাকে প্রায়ই ভাগ বসাতে হয়। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে! রীনা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ঠিক করে ফেলল পদ্মহারটা সে অবশ্যই বিক্রি করবে। সেই টাকায় একটা সেট পোশাক সে হাসানকে বানিয়ে দেবে। এটা হবে হাসানকে দেয়া তার উপহার। বাংলাদেশের দশটা ভালো ছেলের তালিকা তৈরি হলে হাসানের নাম সেখানে অবশ্যই থাকবে। এমন একটি ছেলেকে সামান্য উপহার দিতে না পারাটা খুব কষ্টের।

রীনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বারটা একুশ বাজে। বাচ্চা দুটি এখনো ফিরছে না। কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয় নি তো! এত দেরি হবার তো কথা না। রীনার বুক ধড়ফড় করছে। কাল রাতে সে বাজে একটা স্বপ্নও দেখেছে— ঘরের ভেতর একটা হাতি ঘুরছে—শুঁড় দিয়ে আলনা থেকে টেনে কাপড় জামা নামাচ্ছে। স্বপ্নে হাতি দেখা খুব খারাপ। হাতির পিঠ কবরের মতো বলে হাতি দেখলে অতি প্রিয় কারো মৃত্যু হয়। রীনার হাতপা কাঁপছে। বারান্দার রেলিঙে একটা কাক বসে আছে। কী বিশ্রী ভঙ্গিতেই না সে তাকাচ্ছে! রীনা জানে এইসব কিছুই না, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে বাবা রিকশা করে ওদের নিয়ে আসছেন। সেই কিছুক্ষণটাই অনন্তকালের মতো দীর্ঘ মনে হবে। কোনোরকম দুশ্চিন্তা ছাড়া মনের আনন্দে মানুষের বাঁচাটা কি এতই কঠিন?

বারান্দা থেকে সামনের রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। কমলার মার এর মধ্যে চলে আসার কথা। দু হালি ডিম আর পাঁচ টাকার পান কিনতে এত সময় লাগবে কেন? আবার কি কুকুরে কামড়েছে? চিঠির ব্যাগ হাতে পোস্টম্যান আসছে। রীনার বুক ধক করে উঠল। যদিও ধক করে ওঠার কারণ নেই। পোস্টম্যান নিশ্চয়ই তাদের বাসার দিকে আসছে না। আর আসলেই বা কী?

রীনা অস্বস্তি নিয়ে পোস্টম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। না সে তাদের বাড়িতে আসছে না। ওই তো রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। রীনা প্রায় এক মাস আগে রেজিস্ট্রি করা

একটা চিঠি পেয়েছিল। পত্র প্রেরকের কোনো নাম নেই। আধপৃষ্ঠায় একটি চিঠিতে লেখা—

ম্যাডাম,

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনার স্বামীর অফিসে চাকরি করি। একটি বিশেষ কারণে আপনাকে এই পত্র লিখছি। আমাদের অফিসে লাবণী নামে একজন অল্পবয়স্কা টাইপিস্ট আছেন। আপনার স্বামী তারেক সাহেবের সঙ্গে তার গভীর প্রণয়। তাদের শারীরিক সম্পর্ক আছে ইহা নিশ্চিত। আমি ভেতরের খবর জানি। আপনি ঘর সামলান। বিলম্বে পস্তাবেন।

ইতি

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী জনৈক অচেনা বন্ধু

এই চিঠির কথা রীনা কাউকে বলে নি। উড়ো চিঠিকে কখনো গুরুত্ব দিতে নেই। রীনার হিতাকাঙ্ক্ষী অচেনা বন্ধু তাকে নামহীন চিঠি পাঠাবে না। সবচে' বড় কথা তারেককে সে চেনে। অতি সরল ধরনের একজন মানুষ। একজন সরল মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতিও সরল হয়।

চিঠি পাবার পর রীনা একবার ভাত খেতে খেতে তারেককে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তোমাদের অফিসে লাবণী নামের কোনো মেয়ে আছে ?

তারেক বিস্মিত হলো না, চমকাল না। রীনার দিকে তাকালও না— ভাত মাখতে মাখতে বলল, আছে। টাইপিস্ট। আমাদের দুজন মহিলা আছেন। ক্যাশ সেকশনে নতুন একটা মেয়েকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। নাম সুস্মিতা।

মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের কথা হয় না ?

হ্যাঁ হয়। হবে না কেন ? সুস্মিতা মেয়েটা পাগলা ধরনের— সারাক্ষণ কথা বলে।

লাবণী কম কথা বলে ?

ওর কথা বলার সুযোগ কোথায়! বড় সাহেবের চিঠি টাইপ করতে করতে হালুয়া টাইট।

লাবণীদের গ্রামের বাড়ি কোথায় ?

জানি না তো কোথায় ? আচ্ছা জিজ্ঞেস করে দেখব।

থাক তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না।

লাবণী দেখতে কেমন ?

দেখতে ভালো। গোল মুখ। সুস্মিতা দেখতে ভালো না। মিকি মাউসের মতো দুটা বড় বড় দাঁত।

কথা এই পর্যন্তই। তারেক না হয়ে অন্য যে কেউ হলে জিজ্ঞেস করত— লাবণীর কথা জানতে চাচ্ছ কেন ?

তারেক সেই প্রশ্ন করবে না। একজন সরল মানুষ পৃথিবীর সমস্ত প্রশ্নই সরলভাবে গ্রহণ করে।

রীনার মনে কোনো শঙ্কা নেই তারপরেও চিঠিটা কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে।

হাসানকে দেখালে কেমন হয় ? না, তা সম্ভব না। হাসান তাকে নিয়েই হাসাহাসি করবে। অলীক এক গল্পের পেছনে সময় নষ্ট করার বা দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। দুশ্চিন্তার অনেক ব্যাপার আমাদের চারপাশেই আছে।

বাচ্চাদের আসতে দেখা যাচ্ছে। রীনা দেখল টগর ঘুমোচ্ছে। রীনার শ্বশুর ছেলেকে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে আছে। তবে জড়িয়ে ধরে রাখতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। ছেলেটার পা অনেকখানি বের হয়ে আছে। যে-কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারত। একটা ট্রাক কিংবা মাইক্রোবাস এসে ঘষা দিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস হয় নি! কমলার মাকেও আসতে দেখা গেল। ঘুমন্ত টগরকে রীনার শ্বশুর কমলার মার কোলে দেবার চেষ্টা করছেন। কমলার মা অতি সেয়ানা— সে ভুলেও নেবে না। বেচারা বুড়ো মানুষকেই নাতি কোলে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে হবে।

রীনার শ্বাশুড়ি আছেন কল্যাণপুরে তাঁর মেয়ের বাসায়। স্বামীর সঙ্গে রাগ করে চলে গেছেন। রাগ ভাঙিয়ে তাঁকেও কল্যাণপুর থেকে আনতে হবে। রীনার শ্বশুর রাগ ভাঙানোর প্রচুর চেষ্টা করছেন— প্রতিদিন একবার করে কল্যাণপুরে যাচ্ছেন। লাভ কিছু হচ্ছে না— রোজ রিকশা ভাড়া দিতে হচ্ছে। টগরের বাবা ফিরলে তাকে দিয়ে মাকে আনিয়ে নিতে হবে। ছেলে গেলে মা সুড়সুড় করে চলে আসবেন। এ রকম ছেলেভক্ত মা খুব কম আছে।

টগরের ঘুম ভেঙেছে। দাদার কোল থেকে নেমে সে এখন ছুটতে ছুটতে আসছে। মাথাটা সামনের দিকে বাঁকা করা। এটা তার মহিষ মহিষ খেলা। মহিষের মতো শিং দিয়ে সে মাকে গুঁতো দেবে। মহিষের বয়স পাঁচ বছর হলে কী হবে গায়ে জোর আছে। রীনা হাসিমুখে মহিষের ধাক্কা সামলানোর জন্যে রেলিং ধরে দাঁড়াল। তার এত ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আলাদীনের চেরাগ ছাড়াও বেঁচে থাকাটা এমন অসহনীয় নয়।

বাড়িওয়ালাদের কাজের মেয়েটি আসছে। মেয়েটার নাম হালিমা। খুব ভালো নাম। নরম স্বভাব। হাসিখুশি। এ রকম একটা কাজের মেয়ে থাকলে খুব ভালো হতো। রীনা হালিমাকে বলে দিয়েছে দেশে গেলে সে যেন তার মতো একটা মেয়ে নিয়ে আসে।

রীনা বলল, কী খবর হালিমা।

হালিমা হাসিমুখে বলল, আফনের টেলিফোন আইছে গো আফা। জরুরি ফোন।

বাড়িওয়ালার বাসার টেলিফোন নাম্বারে ভাড়াটেদের ফোন এলে তাদের ডাকা হয় না। কোনো দুঃসংবাদের ফোন কি এসেছে ? মৃত্যু সংবাদ ? রীনার বুক আবারো ধক করে উঠল। আজকের দিনটা তার জন্যে খারাপভাবে শুরু হয়েছে। বারবার শুধু মৃত্যু সংবাদের কথা মনে আসছে। মানুষের মনে যা আসে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। রীনার মুখ শুকিয়ে গেল।

হ্যালো।

কে ভাবি ? আমি রকিব।

ও আচ্ছা।

ভাইজান কি অফিস থেকে ফিরেছেন ?

না। কেন বল তো।

আমি একটা সিরিয়াস বিপদে পড়েছি ভাবি।

কী বিপদ ?

সেটা তোমাকে বলতে পারব না। তবে ভালো বিপদ। ভাবি আমি আসলে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

কেন ?

আছে, ব্যাপার আছে। স্টুডেন্ট পলিটিক্সের অনেক ঝামেলা আছে। তুমি বুঝবে না। ভাবি আমার কিছু টাকা লাগবে।

কত টাকা ?

পাঁচ হাজার টাকা।

এত টাকা আমি পাব কোথায় ?

যেভাবে হোক যোগাড় কর ভাবি।

রবিক শোন— তুমি খুবই অসম্ভব কথা বলছ। সংসারের অবস্থা তো তুমি জান।

আমি সবই জানি। কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। ভাবি শোন আমি সন্ধ্যাবেলা একটা লোক পাঠাব, তার হাতে টাকাটা দিয়ে দিও।

রকিব কাউকে পাঠিও না। তুমি নিজে আস— তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা কর।

রকিব টেলিফোন রেখে দিল। রীনা বোকার মতো খানিকক্ষণ হ্যালো হ্যালো করল।

পাঁচ হাজার টাকা সে কিছুতেই যোগাড় করতে পারবে না। হাসানের কাছ থেকে নিয়ে হাজার দুয়েক টাকা সে দিতে পারবে— এর বেশি না। এতে কি রকিবের বিপদ কাটবে ? বিপদটা কী তাও সে স্পষ্ট করে নি। এমন কী বিপদ যে বাসায় এসেও টাকা নেয়া যাবে না!

বাড়িওয়ালার স্ত্রী জাহেদা বললেন, মা বোস শরবত খেয়ে যাও।

রীনা বলল, জ্বি না চাচি— টগর-পলাশ এরা মাত্র স্কুল থেকে এসেছে। এদের গোসল করাব-খাওয়াব।

শরবত খেতে কয় মিনিট লাগে ? তিন মিনিট। গরমে তেঁতুলের শরবত খেয়ে দেখ— শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বোস খাটের ওপর বোস।

রীনা খাটে বসল। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বসল। জাহেদা গল্প করতে ভালবাসেন। তার হাতে ধরা খেলে সহজে মুক্তি পাওয়া মুশকিল। তার সব গল্পই ভাড়াটেদের কর্মকাণ্ডের ওপর। ভদ্রমহিলা কখনো কোনো ভাড়াটের ঘরে যান না। কিন্তু তাদের সব খবর জানেন।

কেমন আছ মা তুমি ?

জ্বি ভালো।

তোমার দেওর যে হাসান সে চাকরি বাকরি কিছু পায় নি ?

তেমন কিছু পায় নি, তবে বেকার না। হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে কাজ করছে।

কী কাজ ?

হিশামুদ্দিন সাহেবের পার্সোনাল কিছু কাজ করে দিচ্ছে। পরে ওই ফার্মেই চাকরি দেবে।

ওর বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছ। ভাবলে বলবে— আমার হাতে ভালো মেয়ে আছে। খরচপাতি করে বিয়ে দেবে। দানসামগ্রী ছাড়া ক্যাশ টাকাও দেবে।

জ্বি আচ্ছা বলব।

ভাগ্য ফেরাবার জন্যে হলেও পুরুষমানুষের বিয়ে দিতে হয়। কথায় আছে না স্ত্রীভাগ্যে ধন।

জ্বি।

শরবতটা কেমন লাগল মা ?

খুব ভালো লেগেছে চাচি। এখন উঠি ?

দুটা মিনিট বোস মা। একটা ঘটনা বলি। এ রকম ঘটনা যে ঘটতে পারে বাপের জন্মে শুনি নাই। আমাদের চারতলায় ভাড়া থাকে যে ইয়াছিন সাহেব, উনাকে চেন ?

জ্বি না।

ওই যে রোগা-চিমসা মুখ, মাথায় টাক, এজি অফিসে কাজ করে— তার ঘটনা।

চাচি আরেকদিন এসে শুনব ?

এসেছ যখন শুনে যাও। ইয়াছিন সাহেবের ফ্যামিলি গিয়েছে দেশে। ভদ্রলোক ছুটি পায় নাই, যেতে পারে নাই। একদিন দেখি কী একটা মেয়ে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। সুন্দর মতো চেহারা। সতের-আঠার বছর বয়স। আমার হলো সন্দেহ— ব্যাপারটা কী ? এই সময় তো তার অফিসে থাকার কথা। মেয়ে নিয়ে ঘরে কেন ? বিষয় জানার জন্যে আমি নিজেই গেলাম।

কী জানলেন ?

সে বিরাট ইতিহাস। ইয়াছিন সাহেব কেঁদে আমার পায়ে পড়ে গেল...

চাচি আরেক দিন এসে পুরো গল্প শুনব। মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং।

রীনা উঠে দাঁড়াল। হাসান চলে যাবার আগেই তাকে ধরতে হবে। রকিবের জন্যে হাসানের টাকা রেখে দিতে হবে। ইয়াসিন সাহেব যা ইচ্ছা করুক। তার সংসার ঠিক থাকলেই হলো।

৫

আশরাফুজ্জামান সাহেব দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে গেলেন। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াকিটকি হাতে অল্প বয়েসী এক পুলিশ অফিসার। হাসি হাসি মুখ। যেন ঈদের দাওয়াত খেতে এসেছে। পুলিশের মুখের হাসিতে আশরাফুজ্জামান সাহেব বিভ্রান্ত হলেন না। শুকনো গলায় বললেন, কাকে চাই ?

আপনি কি রকিবউদ্দিনের বাবা ?

জ্বি।

স্যার কেমন আছেন ?

ভালো আছি।

একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

বলুন।

বাইরে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। ঘরে গিয়ে বসি।

আশরাফুজ্জামান দ্রুত চিন্তা করলেন। ঘরের ভেতর পুলিশ ঢোকানো ঠিক হবে না। একবার পথ চিনে ফেললে এরা বারবার আসবে। লোকজন নানান সন্দেহ করবে। আশরাফুজ্জামান সাহেব বললেন— আমি তো এখন বেরোচ্ছি। আমার একজন আত্মীয় অসুস্থ। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে।

উনি কোথায় আছেন ?

হলিফ্যামিলি হাসপাতালে। আমার ভাই হয়। চাচাতো ভাই।

আমি কি পরে আসব ?

কখন বাসায় থাকি ঠিক নাই তো। রোগীর অবস্থা ভালো না। সারাদিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। বুকে কনজেশান হয়েছে। ক্রিটিক্যাল অবস্থা।

তাহলে বরং একটা কাজ করুন— রোগী দেখে আপনি থানায় চলে আসুন। রমনা থানা। আমার নাম বললেই হবে। আমার নাম আব্দুল খালেক সাবইন্সপেক্টর।

জ্বি আচ্ছা

আপনার ছেলের ব্যাপারে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব। চিন্তিত হবার মতো কিছু না।

আমি চিন্তিত না।

তাহলে স্যার যাই ? স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আশরাফুজ্জামান সাহেব পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বের হয়ে এলেন। মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলেন। সিগারেট তাঁর জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ হলেও তিনি সমানে খেয়ে যাচ্ছেন। সিগারেট খাবার জন্যেই তাকে দীর্ঘ সময় বাসার বাইরে থাকতে হয়। সিগারেট হাতে তিনি ইস্কান্দরের চায়ের দোকানে ঢুকলেন। তার ডায়াবেটিস আছে। চিনি দিয়ে চা খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইস্কান্দরের চায়ের দোকানে তিনি এই নিষিদ্ধ কর্মটিও করেন। দু চামচের জায়গায় তিন চামচ চিনি দিয়ে চা খান।

ইস্কান্দর বলল, চাচামিয়া কেমুন আছেন ?

তিনি হাসিমুখে বললেন, ভালো আছি। দেখি চা দাও। দই আছে ?

আছে।

মিষ্টি না টক ?

মিষ্টি।

দাও একটু দই খাই। এক কাজ কর, দইয়ের সঙ্গে একটা কালোজাম দাও।

তিনি খুব আরাম করে দই-কালোজাম খেলেন। চা সিগারেট খেলেন। পুলিশের দুশ্চিন্তা তার মাথা থেকে চলে গেল। তাঁর এখন শেষ সময়। শেষ সময়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ কী! তিনি কোনো অন্যায় করেন নি। পুলিশ তাকে নিয়ে জেলে ঢোকাতে পারবে না। যে ক'টা দিন আছেন— সুখে শান্তিতে পার করে দিতে পারলেই হলো।

রকিব কী ঝামেলা পাকিয়েছে কে জানে ? ঝামেলা যদি পাকিয়েই থাকে তার ভাইরা বুঝবে। তিনি কে ? তিনি কেউ না।

আশরাফুজ্জামান সাহেব আরেক কাপ চা দিতে বললেন। প্রথম চা-টা সিগারেট ছাড়া খেয়েছেন। দ্বিতীয় কাপ সিগারেট দিয়ে খাওয়া। ইস্কান্দরের হোটেলে দুপুরে তেহারি রান্না হয়। আজ তেহারি খেতে ইচ্ছা করছে। গরম হাঁড়ি নামলেই খেয়ে ফেলতে হবে। দেরি করলে নিচে তেল জমে যায়। তেল খাওয়াটা ঠিক না।

ইস্কান্দর।

জ্বি।

আজ তোমার এখানে তেহারি খাব।

জ্বি আচ্ছা।

মুখের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। ভালোমন্দ খেতে ইচ্ছা করে। তোমার তেহারিটা ভালো হয়। বাবুর্চি ভালো । নাম কী বাবুর্চির ?

ইস্কান্দর জবাব দিল না। সে জেনে গেছে বুড়োদের সব কথার জবাব দিতে হয় না। একটা পর্যায়ে কথা বলা বন্ধ করে দিতে হয়।

ইস্কান্দর।

জ্বি।

দেশে রাজনীতির হালচাল কী ?

জানি না।

মিলিটারি ছাড়া আমাদের গতি নাই ইস্কান্দর। লেফট রাইট না করালে দেশটার কিছু হবে না। দেখি তোমার পিচ্চিটারে ডাক তো— একটা খবরের কাগজ আনব।

বাসায় খবরের কাগজ আছে। তারপরেও আলাদা করে কাগজ পড়ার অন্য রকম মজা। বাসার কাগজ পড়ায় সেই মজা নেই। আশরাফুজ্জামান সাহেব মাঝে মাঝে নিজের টাকায় কাগজ কেনেন। পড়া হয়ে গেলে সেই কাগজ যত্ন করে জমা করে রাখেন। অনেকগুলো কাগজ জমেছে। বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। খবরের কাগজ কত দরে বিক্রি হয় কে জানে!

ইস্কান্দর।

জ্বি।

পুরনো খবরের কাগজের দর কত জান ? কী দরে বিক্রি হয় ?

জানি না।

দেখি আরেক কাপ চা দিতে বল। দুধ বেশি করে দিবে।

খবরের কাগজ শেষ করতে তাঁর এক ঘণ্টার মতো লাগল। টাকা পুরোপুরি উসুল করলেন। কোনো কিছুই বাদ দিলেন না। এরশাদ সাহেবের একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। নদী-পাখি-আকাশ বিষয়ক। সেই কবিতা তিনি পড়ে ফেললেন। নদী-পাখি এবং আকাশ নামক বস্তুগুলোর প্রতি তার মমতা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন কি না বোঝা গেল না।

আশরাফুজ্জামান সাহেব পত্রিকা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে নিলেন। তেহারি রান্না হতে এখনো দেরি আছে। আজ ছুটির দিন বাসায় লোকজন নেই। বউমা তার ভাইয়ের বাসায়। খালি বাসায় চুপচাপ বসে থাকার অর্থ হয় না। বড় মেয়ের বাসা থেকে কি একবার ঘুরে আসবেন ? তাঁর স্ত্রী বর্তমানে বড় মেয়ের বাসায় আছেন। স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হলো। স্ত্রীর

সঙ্গে দেখা হওয়াটা অবশ্য তত জরুরি না। বড় মেয়ের কাছে গেলে একটা লাভ অবশ্য হয়। বড় মেয়ে মাঝেমধ্যেই তাকে কিছু টাকা-পয়সা দেয়। বেশি না, সামান্যই। কখনো একশ' টাকার দুটো নোট। কখনো পঞ্চাশ টাকার তিনটা নোট। তার স্বামী যখন আশপাশে থাকে না তখন চট করে নোট কটা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিলে বলে— বাবা রেখে দিন।

চাচা স্লামালিকুম।

আশরাফুজ্জামান সাহেব চমকে তাকালেন। লম্বা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মুখভর্তি হাসি। এমন আনন্দিত মুখের কোনো ছেলেকে তিনি ইদানীংকালে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

চাচা আমাকে চিনতে পারেন নি, তাই না ?

না চিনতে পারি নি।

আমি লিটন।

ও আচ্ছা লিটন। ভালো খুব ভালো।

আমি হাসানের বন্ধু। স্কুলে পড়েছি ওর সঙ্গে।

ভালো ভালো। খুব ভালো।

হাসানের খোঁজে বাসায় গিয়েছিলাম— দেখি বাসায় কেউ নেই।

হাসান কোথায় গেছে জানি না। বউমা গেছে তার ভাইয়ের বাসায়।

হঠাৎ করে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে চাচা। আজ সন্ধ্যাবেলায় বিয়ে। অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান কিছু না— কাজি ডেকে বিয়ে। হাসানকে খবরটা দিতে এসেছিলাম।

আমি বলে দেব।

চাচা আমার নাম মনে থাকবে তো ? লিটন। লিটন বললেই হবে।

আমি বলব।

আশরাফুজ্জামান হাঁটছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লিটনও হাঁটছে। ভালো যন্ত্রণা হলো দেখি।

আমি পরশুদিন সকালে মালয়েশিয়া চলে যাচ্ছি। আদম বেপারিকে ধরে ব্যবস্থা হয়েছে। দেশে কিছু হচ্ছিল না। খুব কষ্টে ছিলাম চাচা— এখন মনে হয় আল্লা মুখ তুলে চেয়েছেন।

ভালো খুব ভালো।

হাসান আমার কাছে দুই হাজার টাকাও পায়। এক হাজার টাকা নিয়ে এসেছি। আপনার কাছে দিয়ে যাই।

আচ্ছা দাও।

ইচ্ছা ছিল সবার সব ঋণ শোধ করে যাব। সম্ভব হয় নাই। এখন বিদেশ থেকে পাঠাব।

ভালো খুব ভালো। ঋণ রাখতে নেই।

মালয়েশিয়ায় গুছিয়ে বসে ইনশাল্লাহ হাসানকেও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

আশরাফুজ্জামান লিটনের টাকাটা রাখলেন। তাঁর হেঁটে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—

এখন রিকশা নিয়ে ফেললেন। পকেটে টাকা আছে রিকশায় ঘোরাফেরা করা যায়।

চাচা।

বল বাবা।

কাল সকালে চলে যাচ্ছি তো— তাই তাড়াহুড়া করে বিয়ে। আগেভাগে কাউকে কিছু বলতে পারি নি। হাসানকে আপনি অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন।

অবশ্যই পাঠাব।

আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন চাচা।

অবশ্যই দোয়া করব।

লিটন পা ছুঁয়ে সালাম করল। আশরাফুজ্জামান সাহেব চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করলেন।

রিকশা চলছে। তিনি হুড ধরে আনন্দিত ভঙ্গিতে বসে আছেন। লিটনের টাকাটা পেয়ে ভালো লাগছে। হাত একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিলো। কিছু টাকা চলে এল। টাকার কথা, লিটনের বিয়ের কথা হাসানকে বলার তিনি কোনো কারণ দেখছেন না। তিনি বুড়ো মানুষ এইসব কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

রিকশাওয়ালা বললেন, কই যাইবেন চাচা মিয়া ?

চল রমনা থানায় চল।

রমনা থানার ঝামেলাটা চুকিয়ে আসা ভালো। তিনি রিকশার হুড ফেলে দিলেন। গায়ে রোদ লাগুক। রোদে ভাইটামিন সি না ডি কী যেন আছে। বৃদ্ধ বয়সে শরীবে সব রকম ভাইটামিন দরকার— এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে, ...। রমনা থানার যার সঙ্গে কথা বলবেন তার নাম হচ্ছে— আব্দুল খালেক। হাসানেব বন্ধুব নাম লিটন। বয়স হলেও স্মৃতিশক্তি এখনো ভালো আছে। মাথায় রোদ লাগছে। তিনি রিকশার হুড তুললেন না। বগলে রাখা খবরের কাগজটা মাথার ওপর ধরলেন। আব্দুল খালেকের সঙ্গে কথা বলে বড় মেয়ের বাসায় যাবেন। আজ দিনটা শুভ, বড় মেয়েও হয়ত নতুন পাঁচশ টাকার একটা নোট পকেট ঢুকিয়ে দেবে। যখন টাকা আসতে থাকে তখন আসতেই থাকে। এটা হলো টাকাব ধর্ম।

আব্দুল খালেক হাসিমুখে বললেন, ও আপনি এসেছেন ? আপনার রোগী কেমন ?

আশরাফুজ্জামান চিন্তিত মুখে বললেন, ভালো না। মনে হয় সময় হয়ে গেছে।

বয়স কত ?

বয়স অল্প— ৪৫/৪৬ হবে।

চা খাবেন ?

জ্বি না, বাসায় গিয়ে ভাত খাব। আমার নিজেব শরীরও ভালো না। আপনি কী জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলেন জিজ্ঞেস করুন।

আপনার ছোট ছেলের নাম রকিব ?

জ্বি ?

ও কী করে না না করে তা কি আপনি জানেন ?

পড়াশোনা করে— ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।

পড়াশোনা ছাড়া আর কী করে জানেন ?

জ্বি না।

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ কেমন ?

যোগাযোগ নেই। ছেলেমেয়ে কারো সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। বাপ বুড়ো হলে যা হয়।

সিগারেট খাবেন ?

দেন, একটা খাই।

আব্দুল খালেক সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিজের চেয়ার আরো কাছে টেনে এনে গলা নিচু করে বললেন— আপনার এই ছেলে ভালো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। চকবাজারের একজন রবারের ব্যবসায়ীকে সে এবং তার কয়েক বন্ধু মিলে ধরে নিয়ে গেছে। তিন লাখ টাকা দিলে ছেড়ে দেবে। এই হলো ঘটনা। তারা ওই ভদ্রলোককে প্রথম দিন রেখেছে শহীদুল্লাহ হলে— এখন অন্য কোথায় যেন ট্রান্সফার করেছে। আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। তিনি খুব যে বিস্মিত হয়েছেন তাঁকে দেখে তাও মনে হলো না।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে তারা যদি মেরে টেরে ফেলে তাহলে অবস্থা খারাপ হবে। এই কথাটা আপনার ছেলেকে জানানো দরকার। যদি সে বাসায় আসে, বাসার কারো সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাকে ব্যাপারটা বলবেন।

জ্বি বলব।

আমার যা বলার বলেছি— এখন আপনি চলে যেতে পারেন।

জ্বি আচ্ছা।

আপনাকে থানায় এনে কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না।

জ্বি না।

সময় খারাপ— অপরাধ করে ছেলেমেয়ে, আমরা বাবা-মাকে জেরা করি। আমাদেরও খারাপ লাগে।

আশরাফুজ্জামান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মনটা খারাপ হয়েছে। তবে এই মন খারাপ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই বয়সে ছেলেপুলেদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। অল্প যে কদিন আছেন নিশ্চিন্ত মনে থাকতে চান। তিনি রাস্তায় নেমে রিকশা নিলেন। বড় মেয়ের বাসায় যাবেন। আজ দুপুরে তেহারি মনে হয় খাওয়া হবে না। বড় মেয়ের বাসায় গেলে না খেয়ে আসা যায় না। খেয়ে আসতে হয়। ইদানীং ঘরের খাওয়া তার মুখে রুচে না— তবু ভাব করতে হয় যেন অমৃত খাচ্ছেন।

তিনি বাসায় ফিরলেন রাত আটটায়। ঘরে ঢুকে একটা মজার দৃশ্য দেখলেন— তার ছোট ছেলে রকিব এসেছে। সে ঘোড়া সেজেছে। টগর এবং পলাশ দুজন তার পিঠে চেপে আছে। তারা হাঁট হাঁট করছে এবং ঘোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছে— মাঝে মাঝে চিঁহি করে বিকট চিৎকার দিচ্ছে।

বাবাকে দেখে রকিব হাসি মুখে বলল, বাবা কেমন আছ ?

ভালো। তুই কখন এসেছিস ?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

টগর আনন্দিত গলায় বলল, দাদুভাই ছোট চাচা আজ আমাদের সবাইকে চাইনিজ খাওয়াবে। তাড়াতাড়ি কাপড় পর।

আশরাফুজ্জামান বললেন, সত্যি নাকি রে ?

রবিক বলল, হ্যাঁ সত্যি। তোমার জন্যেই দেরি করছি। কাপড় পরে নাও।

চাইনিজ খাওয়াবি টাকা পেলি কোথায় ?

খেলাধুলার জন্যে একটা স্কলারশিপ পেয়েছি।

ভালো খুব ভালো।

আশরাফুজ্জামান খুশি মনে কাপড় বদলাত গেলেন। অনেকদিন চাইনিজ খাওয়া হয় না। থাই স্যুপ তাঁর খুব পছন্দের জিনিস। বৃদ্ধ বয়সে স্যুপ জাতীয় খাবারই ভালো। সহজপাচ্য, খেতেও সুস্বাদু।

সবাই চাইনিজ খেতে গেল। শুধু যে এ বাড়ির সবাই তাই না, রকিব তার বড় বোনকেও বলে এসেছিল। সেও চলে এল। হাসানের মা রাগ করে এতদিন মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। তিনিও এলেন। শুধু হাসান গেল না। তার শরীর ভালো না। সন্ধ্যা থেকে মাথা ঘোরাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে থাকলে মাথা ঘোরায় না। চোখ মেললেই মাথা ঘোরে। একজন ডাক্তার মনে হয় দেখানো দরকার।

বাসা খালি হয়ে যাবার পর হাসানের মন কেমন করতে লাগল। বেশি রকম একলা লাগছে। সবার সঙ্গে গেলেই হত। কিছু না খেয়ে বসে থাকলেও হতো। বাসার সবার একসঙ্গে হওয়া একটা বড় ঘটনা। অনেকদিন পর এই ঘটনা ঘটছে শুধু সে বাদ পড়ল।

হাসান বিছানা থেকে নামল। একা একা শুয়ে থাকতে অসহ্য লাগছে। রেস্টুরেন্টের ঠিকানা জানা থাকলে সেখানে চলে যেত। ঠিকানা জানা নেই। হাসান রওয়ানা হলো তিতলীদের বাসার দিকে। অসুস্থ অবস্থাতেই প্রিয়জনদের বেশি দেখতে ইচ্ছে করে। তিতলীকে কেন জানি খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। হাসান তিতলীদের বাড়ির গেট পর্যন্ত গেল। গেটের ভেতর ঢুকল না। এত ঘনঘন ওই বাড়িতে যাওয়া ঠিক না। তিতলীর বাবা নিশ্চয়ই রাগ করবেন। সেই রাগ তিনি হাসানের ওপর দেখাবেন না, দেখাবেন তিতলীর ওপর। তার কারণে তিতলী বকা খাবে এটা ঠিক না।

ফেরার পথে হাসান ঠিক করে ফেলল পরের বার যখন হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে তখন সে অবশ্যই একটা চাকরির কথা তাঁকে বলবে। তাকে বলতেই হবে। এইভাবে থাকা আর যায় না।

একটা মোটামুটি ভদ্র চাকরি হলে সে তিতলীর মাকে বলতে পারে— খালা আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

না, তার পক্ষে এটা সরাসরি বলা অসম্ভব। সে ভাবিকে দিয়ে বলাবে। হিশামুদ্দিন সাহেব যেদিন তাকে চাকরি দেবেন সেদিনই সে ভাবিকে পাঠাবে। অবশ্যই, অবশ্যই, অবশ্যই।

হাসান কেমন আছ ?

জ্বি স্যার ভালো।

চোখ লাল কেন?

হাসান জবাব দিতে পারল না। তার যে চোখ লাল এই ব্যাপারটা সে জানে না। ঘর থেকে বেরোবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়েছে। তখন চোখের দিকে তাকায় নি। আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস তার নেই।

হিশামুদ্দিন সাহেব বললেন, রাতে ঘুম হয় নি?

জ্বি স্যার হয়েছে।

তোমার কি অনিদ্রা রোগ আছে?

জ্বি না।

তুমি তাহলে মানুষ হিসেবে খুব আধুনিক নও। অনিদ্রা হচ্ছে আধুনিক মানুষের রোগ।

হাসান চুপ করে রইল। হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে সমান তালে গল্প করার মতো অবস্থা তার না। হিশামুদ্দিন সাহেব প্রশ্ন করলে সে জবাব দেবে। যতদূর সম্ভব কম কথায় জবাব দেবে। তবে আজ সে তার চাকরির কথাটা বলবে। যে ভাবেই হোক বলবে।

বিয়ে কর নি তো?

জ্বি না।

বিয়ের কথা ভাবছ না?

হাসান জবাব দিল না। একবার ভাবল এখনই সময়। এখনি বলা দরকার, স্যার চাকরি বাকরি নেই, বিয়ে করলে স্ত্রীকে খাওয়াব কী? এই কথায় দ্রবীভূত হয়ে হিশামুদ্দিন সাহেব তাঁর বিশাল কোম্পানিতে কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তবে বাস্তব আশার পথ ধরে চলে না— বাস্তব চলে নিরাশার এবড়ো খেবড়ো পথে। তার কথায় হিশামুদ্দিন সাহেব দ্রবীভূত হবেন এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এ জাতীয় মানুষকে অন্যরা দ্রবীভূত করতে পারে না। তবে চাকরির কথাটা আজ বলতেই হবে। এখন না হলেও কিছুক্ষণ পরে বলবে।

হাসান।

জ্বি স্যার।

তোমার কি পছন্দের কেউ আছে যাকে বিয়ে করতে চাও।

হাসান লজ্জিত গলায় বলল, আছে স্যার।

তার নাম কী?

তিতলী।

হাসান খুবই অবাক হচ্ছে। হিশামুদ্দিন সাহেব এ জাতীয় হালকা প্রশ্ন কেন করছেন সে বুঝতে পারছে না। তার পছন্দের কেউ আছে কি না তা দিয়ে হিশামুদ্দিন সাহেবের কিছু যায় আসে না।

তিতলী নামের অর্থ কী?

প্রজাপ্রতি।

প্রজাপতি তো সুন্দর নাম।

হিশামুদ্দিন সাহেব দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন— এস শুরু করি।

হাসান অপেক্ষা করছে, হিশামুদ্দিন সাহেব কিছুই বলছেন না। মানুষটা কি ঘুমিয়ে পড়ছে? ভাবভঙ্গি ঘুমিয়ে পড়ার মতোই। এস শুরু করি বলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে না। হিশামুদ্দিন সাহেবের মতো মানুষ তো বটেই। হাসান বুঝতে পারছে না। খুক্ খুক্ করে কেশে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কি না। সেটা ঠিক হবে না। অনেক ওপরের লেভেলের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাশি কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। হাত উঠানো যায়। হাত উঠালে লাভ হবে না, হিশামুদ্দিন সাহেব চোখ বন্ধ করে আছেন— কিছু দেখবেন না।

হাসান

জ্বি স্যার।

কী বলব গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। তুমি যদি জীবনের গল্প শুরু কর তখন দেখবে গোছানো খুব কঠিন। সিস্টেমেটিকালি সব মনেও আসে না। তুচ্ছ ঘটনা আগে মনে পড়ে। অনেক বড় বড় ঘটনা মনেই পড়ে না। ধারাবাহিকতা থাকে না। ধারাবাহিকভাবে মানুষ তার সমস্ত ঘটনা পানিতে ডুবে মরার সময় দেখতে পায় বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। তাও ঠিক না। আমি পানিতে ডুবে মরতে বসেছিলাম আমি কিছুই দেখি নি। চোখের সামনে শুধু হলুদ আর লাল আলো দেখেছি। তুমি কি কখনো পানিতে ডুবেছ?

জ্বি না স্যার?

সাঁতার জান?

জ্বি না।

আমার পানিতে ডোবার ঘটনাটা বলব, না বাবার জেল থেকে ফিরে আসার গল্পটা আগে বলব বুঝতে পারছি না।

আপনার বাবার ফিরে আসার গল্পটা বলুন।

বাবার নাম কি তোমাকে বলেছি?

জ্বি না।

উনার নাম আজহারউদ্দিন খাঁ। আমরা খাঁ বংশ। খুবই উচ্চ বংশ। যাই হোক আমাদের উচ্চ বংশীয় বাবা দু মাসের জেল খেটে হাসিমুখে একদিন বাসায় ফিরলেন। তাঁর হাতে চারটা কদবেল। জেলখানার গাছের কদবেল। জেলার সাহেবকে বলেটলে কীভাবে জানি নিয়ে এসেছেন। মানুষকে মুগ্ধ এবং খুশি করার আর্ট বাবা খুব ভালো জানতেন। যে-কোনো মানুষের সঙ্গে বাবা যদি কিছুক্ষণ কথা বলেন তার ধারণা হবে বাবা অসাধারণ একজন মানুষ। বাবা বাসায় ফিরলেন। নিজের হাতে কদবেলের ভর্তা বানালেন। কদবেলের ভর্তা কখনো খেয়েছ হাসান?

জ্বি না স্যার।

ঠিকমতো বানাতে পারলে অতি উপাদেয় একটা জিনিস। চিনি দিয়ে টক কমাতে হয়। কাঁচামরিচ দিয়ে ঝাল ভাব আনতে হয়। লবণও দিতে হয়। চিনি ও লবণের অনুপাতের ওপর স্বাদ নির্ভর করে। বাবা ছিলেন কদবেল ভর্তার বিশেষজ্ঞ। আমরা বিপুল আনন্দে কদবেলের ভর্তা খেলাম। বাবা হাসিমুখে জেলখানার গল্প করতে লাগলেন। রোমাঞ্চকর সব গল্প। গল্প শুনলে যে কেউ বাকি জীবনটা জেলখানায় কাটিয়ে দিতে চাইবে।

বাবা তাঁর জেল জীবনের স্মৃতির উপসংহার টানলেন এই বলে যে, প্রতিটি মানুষের জীবনে জেলের অভিজ্ঞতা দরকার আছে। বাবার গল্প শুনে আমি ঠিক করে ফেললাম জীবনের একটি অংশ যে করেই হোক আমাকে জেলে কাটাতে হবে।

হিশামুদ্দিন সাহেব চুপ করলেন। হাসান মনে মনে কয়েকবার আওড়াল আজহারউদ্দিন। নামটা যেন মনে থাকে। হিশামুদ্দিন সাহেবের স্বভাব হলো কোনো নাম তিনি বারবার বলেন না। এক-দুবার বলেন। আজহারউদ্দিন নামটা তিনি আরো বলবেন বলে মনে হয় না।

হাসান।

জ্বি স্যার।

গল্প বলার সময় তোমার মনে যদি কোনো প্রশ্ন আসে— তুমি যদি কিছু জানতে চাও জিজ্ঞেস করো। চুপ করে থেকো না। প্রশ্ন করলে আমার মনে হবে তুমি আগ্রহ করে শুনছ।

স্যার আমি খুব আগ্রহ করেই শুনছি ?

কেন ?

হাসান জবাব দিতে পারল না। হিশামুদ্দিন বললেন, আমি যে সব গল্প বলছি তা খুবই সাধারণ গল্প। কিন্তু তুমি আগ্রহ করে শুনছ কারণ যিনি গল্প বলছেন তিনি অসম্ভব বিত্তবান একজন মানুষ। তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। পরাজিত মানুষের গল্প আমাদের শুনতে ভালো লাগে না। বিজয়ী মানুষের গল্প আমরা আগ্রহ নিয়ে শুনি। চেঙ্গিস খাঁর গল্প আমরা পড়ি কারণ তিনি জয়ী। যে সব রাজাদের তিনি পরাজিত করেছেন— যারা ধ্বংস হয়ে গেছে— তাদের গল্প আমরা পড়ি না। ঠিক বলছি হাসান ?

জ্বি স্যার।

বাবার গল্পে চলে যাই। বাবা জেল থেকে ফেরার পর আমরা খুব কষ্টে পড়লাম। আসল কষ্ট— ভাতের কষ্ট। তিনি যে কদিন জেলে ছিলেন সেই কদিন ভাতের কষ্ট আমাদের ছিল না। দুবেলা ভাত খেতে পেরেছি। আমাদের বড় বোন পুষ্প ব্যবস্থা করেছেন। কী করে করেছেন আমরা জানি না— কিন্তু করেছেন। বাবা ফেরার পর দায়িত্ব তাঁর হাতে চলে গেলে তিনি অকূল সমুদ্রে পড়লেন। জেলখাটা দাগি লোক কাজেই কোথাও চাকরি জোটাতে পারছেন না। সারাদিন চাকরির সন্ধানে ঘোরেন।

রাত আটটার-ন'টার দিকে বাসায় ফেরেন। খাবার নিয়ে ফেরেন। আমরা রাতে একবেলা খাই— তবে পেট ভরে খাই। বাবা খাবার আনতেন হোটেল থেকে। তুমি জান কি না জানি না ভালো চালু হোটেলে উৎকৃষ্ট খাবার প্রচুর জমে যায়। হোটেল মালিকরা সেইসব খাবার ফেলে না। একত্রে জমা করে রাখে। গরিব-দুঃখীদেরকে দিয়ে দেয়। বাবা একটা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত আটটার দিকে প্যাকেটভর্তি খাবার নিয়ে আসতেন। সবকিছু একসঙ্গে মেশানো বলে অদ্ভুত স্বাদ। মাছ, গোশত, ভাজি, বিরিয়ানি, খিচুড়ি— সবকিছুর অদ্ভুত মিশ্রণ !

স্যার খেতে কেমন ?

প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে যা খাওয়া যায় তাই অমৃতের মতো লাগে— তবে ওই খাবারটা ভালো ছিল। আমরা সবাই খুব আগ্রহ করে খেতাম। শুধু আমার মেঝো বোন খেতেন

না। আমার মেঝো বোন ছিলেন বিদ্রোহী টাইপের। তিনি বিদ্রোহ করে ফেলেন, কঠিন গলায় বললেন, মানুষের এঁটো খাবার আমি খাব না। মরে গেলেও না। বাবা তাকে নানা যুক্তি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলেন— 'সবকিছু এঁটো হয় কিন্তু খাবার কখনো এঁটো হয় না।' মেঝো বোন বাবার যুক্তির ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি চোখমুখ শক্ত করে বললেন, আমি এঁটো খাবার খাই না। তার জন্যে চিঁড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে শুকনো চিঁড়া চিবিয়ে পানি খেত।

আমার মেঝো বোন খুব রূপবতী ছিলেন। আমরা সবাই দেখতে মোটামুটি ভালো ছিলাম— মেঝো বোন ছিলেন সেই ভালোর মধ্যেও ভালো। খুব হাসিখুশি ছিলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে আশপাশের মানুষদের চমকে দিতে ভালোবাসতেন। যেমন তাঁর একটা কথা ছিল— একটা পোকা আছে আমার খুব প্রিয়। আমি সেই পোকা কী যে পছন্দ করি! পোকাটার নাম চিংড়ি মাছ।

আপনার সেই বোনের নাম কী স্যার ?

হিশামুদ্দিন ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— তার নাম আমি তোমাকে বলব না। ওই নামটা অজানাই থাকুক। হাসান আজ আর কথা বলব না। কেমন যেন মাথা ধরে গেছে। আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

তোমাকে টাকা-পয়সা ঠিকমতো দিচ্ছে তো ?

জ্বি সার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

হাসান তার কথা বলতে পারল না। হিশামুদ্দিন সাহেব যেখানে তাঁর গল্প থামিয়েছেন সেখানে হুট করে চাকরি চাওয়া যায় না।

হিশামুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কেমন জানি অস্বস্তি লাগছে। বুকে চাপ ব্যথা বোধ হচ্ছে। লক্ষণগুলো পরিচিত। আবার ঠিক পরিচিতও নয়। শরীর খারাপের একটা লক্ষণের সঙ্গে অন্যটার তেমন মিল থাকে না।

হিশামুদ্দিন নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় কি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবেন ? তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। বুকের ব্যথাটা কমে গেছে তবে মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছে। মনে হয় চোখ সম্পর্কিত কোনো সমস্যা। কাল অনেক রাত জেগে কাগজপত্র দেখেছেন— চোখের ওপর চাপ পড়েছে। চশমাটা বদলানো দরকার, বদলানো হচ্ছে না। তাঁর পানির পিপাসা হচ্ছে। পানি দেবার জন্যে কাউকে বলতে হয়— এই পরিশ্রমটুকু করতে ইচ্ছা করছে না। খাটের পাশে কলিংবেলের সুইচ আছে, সুইচে হাত পড়লেই কেউ একজন ছুটে আসবে। তিনি বসেছেন সোফায়— কলিংবেলটা মনে হচ্ছে অনেক দূরে।

চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বললে কেমন হয় ? মেরিল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের সময়ের ব্যবধান যেন কত ? এই তথ্য তাঁর জানা, তারপরেও চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতিবার নতুন করে জানতে হয়। দিনের শুরুতেই তিনি জানেন আজ কত তারিখ। তারপরেও প্রতিটি সিগনেচারের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হয়— আজ কত তারিখ।

বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার সময়ের ব্যবধান কত ? আট ঘণ্টা ? রাত দুটোর সময়ে মেয়েকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার কোনো অর্থ হয় না। হিশামুদ্দিন সোফা থেকে

উঠে খাটের দিকে গেলেন। খাটে হেলান দিয়ে সুইচ টিপলেন। মোতালেব উদ্বিগ্নমুখে ছুটে এলো। ঘরে ঢুকল না। দরজার পরদা সরিয়ে উঁকি দিল। হিশামুদ্দিন সাহেব ঠিক বুঝতে পারলেন না, কী জন্যে মোতালেবকে ডেকেছেন। পানি দেবার জন্যে, নাকি কটা বাজে জানার জন্যে। তাঁর শোবার ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। ঘড়ির শব্দে তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়। সময় জানার জন্যে তাকে কাউকে না কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয়।

কটা বাজে মোতালেব?

স্যার চারটা এখনো বাজে নাই। চা দিব?

না— আজ চা খাব না। তুমি টেলিফোন হ্যান্ডসেটটা নিয়ে এস।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

মোতালেব প্রায় দৌড়ে গেল। বাংলাদেশ-আমেরিকার সময়ের পার্থক্যটা জানা হলো না। চিত্রলেখা হয়তো ডরমিটরিতে নেই— ক্লাসে গেছে। টেলিফোন বেজে যাবে কেউ ধরবে না।

হ্যালো।

কেমন আছিস রে মা?

বাবা এক সেকেন্ড ধরে রাখ— আমি আসছি।

হিশামুদ্দিন টেলিফোন ধরে আছেন। তাঁর মাথার যন্ত্রণাটা এখন খুব বেড়েছে। এই যন্ত্রণা নিয়েই তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে মেয়ের সঙ্গে কথা বলবেন। এটাও এক ধরনের খেলা।

হ্যালো বাবা।

এক সেকেন্ডের জন্যে কোথায় গিয়েছিলে?

মাইক্রো আভেন বন্ধ করতে গিয়েছিলাম।

রান্নাবান্না?

ঠিক রান্নাবান্না না— ক্ষিদে লেগেছিলে। পিজা 'থ' করতে দিয়েছিলাম।

থ হয়েছে?

হুঁ। হয়েছে। আমি কপ কপ করে খাচ্ছি। শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?

পাচ্ছি।

তোমার খবর কী বাবা?

খবর ভালো।

জীবনী লেখা হচ্ছে?

হুঁ।

যতটুকু লেখা হয়েছে পাঠিয়ে দিতে পারবে— এখন আমার একটা ফ্যাক্স নাম্বার আছে। নাম্বার দেব?

না।

না কেন?

সবটা লেখা হোক তারপর।

তোমার গলা এমন শোনাচ্ছে কেন বাবা?

কেমন শোনাচ্ছে ?

মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ।

আমি সুস্থই আছি। তোর পড়াশোনার অবস্থা কী ?

অবস্থা ভালো। এখন পর্যন্ত কোনো B পাই নি। স্ট্রেইট A।

ও আচ্ছা।

তুমি একটা শুকনা ও আচ্ছা দিয়ে সেরে ফেললে ? স্ট্রেইট A যে কী ভয়াবহ জিনিস তুমি কি জান ? আমি যখন করিডোর দিয়ে হাঁটি ছেলেমেয়েরা তখন অদ্ভুত চোখে তাকায়। বাবা এক সেকেন্ড ধরবে— আমি একটা কোকের ক্যান নিয়ে আসি।

হিশামুদ্দিন টেলিফোন ধরে রাখলেন। মাথার ব্যথাটা এখন আর নেই, তবে পিঠে ব্যথা হচ্ছে। ব্যথার ব্যাপারটা কি সাইকোলজিক্যাল ? মনস্তাত্ত্বিক ব্যথাই শুধু মিনিটে মিনিটে স্থান বদলায়।

বাবা।

কী মা ?

কোকের ক্যান নিয়ে এসেছি এখন কথা বল।

কী কথা বলব ?

কী কথা বলবে সেটা তুমি জান। আমি কী করে বলব।

তুই কথা বল আমি শুনি।

আমার কথা বলার হলে তো আমিই টেলিফোন করতাম। টেলিফোন তুমি করেছ তুমি কথা বলবে আমি শুনব।

আগের বার বলেছিলি ব্রাজিলের এক ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে, সেই ভাব এখনো আছে ?

ভাব হয়েছে এই কথা তো বাবা বলি নি— সে আমাকে ডিনার এবং মুভি দেখার জন্য ইনভাইট করেছিল আমি গিয়েছিলাম।

তারপর ?

তারপর আবার কী ?

একবারই গিয়েছিলি ? আর যাস নি ?

না। হাঁদা টাইপ ছেলে। চেহারা দেখে বুঝা যায় না। কিছুক্ষণ কথা বললেই টের পাওয়া যায়। ওর সঙ্গে কথা বলে আমার কী মনে হয়েছে জান ?

কী মনে হয়েছে ?

মনে হয়েছে— মানুষ বানর থেকে এসেছে ঠিকই তবে সবাই পুরোপুরি মানুষ হয় নি। অনেকেই বানর রয়ে গেছে। হি হি হি।

এখন এমন কেউ নেই যার সঙ্গে ডিনার খেতে যাচ্ছিস বা মুভি দেখছিস ?

উঁহুঁ। ইচ্ছে করে না। বাবা আমার কী ধারণা জান ? আমার ধারণা পুরুষরা প্রাণী হিসেবে মেয়েদের অনেক নিচে। বুদ্ধিবৃত্তি লোয়ার লেভেলে। রাগ করেছ বাবা ?

রাগ করব কেন ?

তুমিও তো পুরুষ এই জন্যে হি হি হি।

কথায় কথায় হাসার অভ্যাস কি তোর এখনো আছে ?

এটা তো বাবা কোনো খারাপ অভ্যাস না যে ছেড়ে দিতে হবে।

তা না।

তুমি যে বলেছ আমার জন্যে ভালো একটা ছেলে খুঁজে বের করবে যাকে আমি বিয়ে করব, খুঁজে পেয়েছ ?

এখনো পাই নি।

খুঁজছ নাকি খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছ ?

খুঁজছি।

বাবা আমার পয়েন্টগুলো মনে আছে তো ? ছেলেটির কী কী গুণ থাকতে হবে মনে আছে ?

আছে।

বল তো শুনি।

লম্বা হতে হবে, গায়ের রঙ শ্যামলা, IQ থাকবে ১৬০-এর ওপরে, কথায় কথায় হি হি করে হেসে ওঠার ক্ষমতা থাকতে হবে, পড়াশোনায় খুব ভালো হতে হবে।

একটা পয়েন্ট বাদ গেছে বাবা।

কোন পয়েন্ট ?

ঠোঁট মোটা হলে চলবে না, ঠোঁট পাতলা হতে হবে।

তুই কি এর মধ্যে দেশে বেড়াতে আসবি ?

পাগল হয়েছ ? আমার মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগলের অবস্থা। পড়াশোনার যে কী প্রচণ্ড চাপ তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। এখন সবাই ঘুরে টুরে বেড়াচ্ছে আর আমি চারদিকে বই সাজিয়ে বসে আছি। তুমি টেলিফোন রাখামাত্র আমি ফার্মাকোলজির বই খুলে বসব।

তাহলে টেলিফোন এখন রাখি মা ?

আচ্ছা।

হিশামুদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। মোতালেব চা নিয়ে এসেছে। তিনি চা দিতে নিষেধ করেছিলেন তার পরেও এনেছে।

হিশামুদ্দিন চায়ের কাপ হাতে নিলেন।

৬

তিতলী কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। অপেক্ষা করছে বাবার জন্যে। মতিন সাহেব বাথরুমে ঢুকেছেন। বাথরুম থেকে বের হলে তিতলী রিকশা ভাড়া চাইবে। একবার না তিতলীকে কয়েকবার চাইতে হবে। তিনি শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিরক্ত মুখে মানিব্যাগ খুলে দুটা দশ টাকার নোট বের করবেন। আসা-যাওয়ার রিকশা ভাড়া বাবদ পনের টাকা আর পাঁচ টাকা টিফিনের জন্যে। টাকাটা চাওয়া মাত্র দিয়ে দিলে কী হয় ? একসঙ্গে কয়েকদিনের টাকা দিয়ে দিলে রোজ রোজ চাইতে হয় না।

মতিন সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, অস্থির হয়ে পড়েছিস কেন ? টাকা টাকা করে তুই তো দেখি দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকে পড়ার ব্যবস্থা করেছিস। স্বভাব থেকে অস্থিরতা

দূর কর। অস্থির মানুষ কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

রাগে-দুঃখে তিতলীর কান্না পেয়ে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলার সম্পর্ক থাকলে সে অবশ্যই বলত, তুমি নিজে তো খুব সুস্থির মানুষ। তুমি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছ?

বাবার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলার সম্পর্ক তার না। তিতলী চাপা নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইল। মতিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। টেবিলের ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বের করবেন। তিতলীর প্রতীক্ষার অবসান হবে। তিতলী বাবার পেছনে পেছনে গেল। মতিন সাহেব ড্রয়ারের দিকে গেলেন না। খাটের ওপর বসতে বসতে বললেন, আজকের কাগজটা দিয়ে যা। আর তোর মাকে বল এক কাপ চা দিতে। চিনি দিয়ে যেন আবার শরবত না বানায়। এক কাপে এক পোয়া চিনি না দিয়ে তো সে আবার চা বানাতে পারে না।

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা।

খবরের কাগজটা দিতে আর তোর মাকে চায়ের কথা বলতে কতক্ষণ লাগবে? কথা বলে তুই যে সময়টা নষ্ট করছিস তারচে' কম সময়ে কাগজটা দিয়ে যেতে পারতি। মাকেও খবর দিতে পারতি।

তিতলী কাগজ এনে বাবার হাতে দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। সুরাইয়া মেয়েকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী রে এখনো কলেজে যাস নি?

তিতলী বলল, বাবাকে এক কাপ চা দাও। আর আমাকেও এক কাপ চা দাও। আজ কলেজে যাব না।

যাবি না কেন?

যেতে ইচ্ছা করছে না।

সুরাইয়া কলেজ প্রসঙ্গে আর কিছু বললেন না। মনে হলো মেয়ে কলেজে না যাওয়ায় তিনি খুশিই হয়েছেন। তিতলী যেদিন কলেজে না যায় সেদিন মাকে নানান কাজে সাহায্য করে। দুপুরে রান্নার সময় বলে— মা তুমি একটা মোড়া এনে মোড়ায় চুপচাপ বসে থাক আমি তোমার রান্না করে দিচ্ছি। রোজ রোজ রান্না করতে তোমার নিশ্চয়ই বিরক্তি লাগে। আজ সব রান্না আমি রাঁধব তুমি শুধু বাবার ভাত রাঁধবে।

তিতলীর হাতে কোনো মন্ত্রটন্ত্র আছে— যাই রাঁধে খেতে ভালো হয়।

কলেজে যাবি না কেন?

বললাম তো ইচ্ছা করছে না।

অসুবিধা হবে না?

কোনো অসুবিধা হবে না। কলেজে পড়াশোনা কিছু হয় না মা। টিচাররাও আসেন না। যারা আসেন হড়বড় করে দু-এক কথা বলে যান। তারা কী বলেন— আমরা কেউ শুনিও না। আমরা নিজেদের মতো ফিসফিস করে গল্প করি। কাটাকুটি খেলা খেলি।

বলিস কী!

সত্যি কথা বললাম মা। আমরা কলেজে যাই গল্পগুজব হইচই করার জন্যে। পড়াশোনা যাদের করার তারা ঘরে বসে করে।

কলেজে তাহলে খুব খারাপ অবস্থা?

খারাপ হবে কেন ভালো অবস্থা।

সুরাইয়া চায়ের কাপে চা ঢাললেন। তিতলী কাপ হাতে বাবার ঘরের দিকে রওয়ানা হলো। চট করে বাবার কাপে একটা চুমুক দিয়ে দেখে নিল চিনি ঠিক আছে কি না। কাজটা ঠিক হলো না। চা এঁটো করে দেয়া হলো। তবে বাবা-মার চা এঁটো করা যায়।

মতিন সাহেব চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, টেবিলের ওপর পেপারওয়েটে টাকা চাপা দেয়া আছে নিয়ে যা।

তিতলী টাকাটা নিল।

মতিন সাহেব বললেন, এদিক থেকে লালমাটিয়া কলেজে কোনো মেয়ে পড়ে না? তাহলে দুজনে শেয়ার করে যেতে পারতিস। খরচও বাঁচত। দুজন একসঙ্গে যাবার একটা সিকিউরিটিও আছে। কলেজের নোটিশ বোর্ডে একটা নোটিশ দিয়ে দিবি।

তিতলী অবাক হয়ে বলল, কী নোটিশ দেব?

সহযাত্রী চেয়ে বিজ্ঞপ্তি।

তিতলী বলল, আচ্ছা।

টাকাটা যে সেভ হচ্ছে সেটা বড় কিছু না— সিকিউরিটিটা আসল। দিনকাল খুবই খারাপ। চারিদিকে সিকিউরিটি প্রবলেম।

তিতলী বাবার সামনে থেকে চলে গেল। বাবার বক্তৃতা মার্কা কথা শুনতে অসহ্য লাগছে। এরচে' মার সঙ্গে গল্প করার অন্য আনন্দ। মা যত না গল্প করবেন তারচে' বেশি গল্প শুনতে চাইবেন। সামান্য গল্পও মা মুগ্ধ হয়ে শোনেন। এই ধরনের মানুষকে গল্প শুনিয়ে খুব আনন্দ।

সুরাইয়া মেয়ের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে দিতে বললেন, নাদিয়ার কি হয়েছে তুই জানিস?

তিতলী বিস্মিত হয়ে বলল, না তো। ওর আবার কী হবে!

সুরাইয়া বললেন, আমি নাশতা খাবার জন্যে ডাকতে গেলাম দেখি বই পড়ছে ঠিকই কিন্তু চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে— কিছু বলে না।

আমি জেনে আসছি কী ব্যাপার। মা শোন আজ দুপুরে আমি রাঁধব।

কী রাঁধবি? ঘরে তো বাজারই নেই।

বাবা বাজারে যাবে না? বাবাকে দিয়ে এক কেজি ভালো গরুর গোশত আনিয়ে দাও তো মা। আমি কাটা পেঁয়াজ দিয়ে একটা গোশত রান্না করব। প্রমীদের বাড়িতে একদিন খেয়েছিলাম। খেতে খুব ভালো। আমি প্রমীর আম্মার কাছে সব জেনে এসেছি। ঘরে কি সিরকা আছে মা? সিরকা লাগবে। সিরকা ছাড়া হবে না।

ঘরে তো সিরকা নেই।

সিরকা আনিয়ে দাও না মা। রান্নাটা একবার রাঁধতে না পারলে ভুলে যাব। একবার রাঁধলে আর ভুলব না।

সিরকা টিরকার কথা বললে তোর বাবা আবার রেগে যায় কি না কে জানে।

এটা আবার কী ধরনের কথা মা? বাবাকে তুমি ভয় পাও কেন? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো। তোমাদের এ রকম কেন? তোমাদের দেখে মনে হয় একজন গুরুমশাই আরেকজন প্রাইমারি ক্লাসের ছাত্রী।

তিতলী উঠে দাঁড়াল। তার চা শেষ হয় নি। খেতে ভালো লাগছে না। তিতলী জানে তার মা তার চায়ের কাপের চাটুকু এক সময় চুমুক দিয়ে খাবেন। তিনি অপচয় সহ্য করতে পারেন না।

নাদিয়া নিঃশব্দে পড়ছে। তিতলী ঘরে ঢুকতেই সে বই থেকে মাথা না সরিয়ে বলল, কলেজে যাও নি আপা ?

তিতলী বলল, আজ কলেজে যাব না। আজ আমার ছুটি।

নাদিয়া বই থেকে মুখ ঘুরিয়ে বড় বোনের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার হাসিই বলে দিচ্ছে বড় আপার কলেজে না যাওয়ার সংবাদে সে খুব আনন্দিত। যদিও তার আনন্দিত হবার কিছু নেই— সে বই রেখে আপার সঙ্গে গল্প করতে বসবে না। বিকেলে একবার কিছুক্ষণের জন্যে উঠবে। ছাদে হাঁটতে যাবে, তাও একা একা। ছাদ থেকে নেমে আবারো বই নিয়ে বসবে।

তিতলী একটা চেয়ার টেনে নাদিয়ার পাশে বসতে বসতে বলল, নাদিয়া তোকে খানিকক্ষণ বিরক্ত করি ?

কর কিন্তু আপা বেশিক্ষণ না।

দিনরাত যে এত পড়িস তোর ভালো লাগে ?

হুঁ।

যে হারে পড়াশোনা করিস সব বই তো তোর মুখস্থ হয়ে যাবার কথা।

নাদিয়া লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলল, সব বই তো আমার মুখস্থই।

মুখস্থ ! তাহলে আর পড়ার দরকার কী ?

না পড়লে ভুলে যাব না ?

ভুলে গেলে ভুলে যাবি। সামান্য এস.এস.সি. পরীক্ষার জন্যে জীবনটা নষ্ট করে ফেলবি। তোকে দেখে মনে হয় তুই মানুষ না— একটা যন্ত্র।

নাদিয়া বলল, আপা তুমি অনেকক্ষণ বিরক্ত করে ফেলেছ। এখন যাও। তোমাকে আর সময় দেয়া যাবে না।

আসল কথা যা বলতে এসেছিলাম সেটা বলা হয় নি।

আসল কথা কী ? মা সকালে নাশতা নিয়ে এসে দেখে তুই বই পড়তে পড়তে কাঁদছিস। কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি।

আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা আছে ?

না খুবই তুচ্ছ ব্যাপার আপা। এই জন্যে বলতে ইচ্ছে করছে না।

কাউকে কিছু বলবি না— আবার ফিঁচ ফিঁচ করে কাঁদবি এটা কেমন কথা ?

আর কাঁদব না।

আমরা তিন বোনের কেউ কাঁদলে মা মনে খুব কষ্ট পায়। কী জন্যে কাঁদছিস এ জন্যেই মাকে সেটা জানানো দরকার।

মাকে কিছু জানাতে হবে না আপা— তোমাকে বলছি তুমি শুনে রাখ। ফুফুর বাসায় যে গিয়েছিলাম সেখানে জামান ভাইয়া আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। কুৎসিত একটা

চিঠি। কেউ যে কাউকে এমন কুৎসিত চিঠি দিতে পারে তাই আমি জানতাম না।

কী লেখা চিঠিতে?

কী লেখা তোমাকে আমি বলতে পারব না।

চিঠিটা কি ফেলে দিয়েছিস?

না ফেলি নি রেখে দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে চিঠিটা আমি কোনোদিন দেখাব না। দেখতে চেও না। চিঠিটা পড়লে তোমার শরীর অশুচি হয়ে যাবে। আপা এখন তুমি যাও।

তিতলী উঠে দাঁড়তে দাঁড়াতে বলল, চিঠিতে কি ভালোবাসার কথা লেখা?

নাদিয়া চাপা গলায় বলল, ভালোবাসার কথা লেখা থাকলে আমি রাগ করব কেন? ভালোবাসা টাসা না আপা অতি কুৎসিত কিছু কথা। আপা শোন মাকে কিছু বলার দরকার নেই।

ফুফুকে কি ঘটনাটা বলব?

না ফুফু উল্টা আমার ওপর রাগ করবে। কোনো মার কাছেই নিজের ছেলের দোষ ধরা পড়ে না। তাছাড়া এইসব ঘটনায় সবার আগে দোষী ভাবা হয় মেয়েটাকে। ফুফু কী বলবে জান? ফুফু বলবে বাংলাদেশে তো মেয়ের অভাব ছিল না। এত মেয়ে থাকতে জামান তোকে কেন এই চিঠি লিখল? এই রহস্যটার মানে কী? তুই নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিস যে তোকে এ ধরনের চিঠি লেখার সাহস পেয়েছে।

তিতলী বলল, ফুফু এ রকম বলবে ঠিকই। তুই তো বেশ গুছিয়ে চিন্তা করা শিখে গেছিস।

আমি মোটেও গুছিয়ে চিন্তা করি না আপা। যা মনে আসে বলে ফেলি। পড়তে পড়তেই সময় পাই না— এত চিন্তা করব কীভাবে।

নাদিয়া হাসল। এত সুন্দর করে হাসল যে তিতলীর তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা করল বোনকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকতে। সেটা করতে গেলে নাদিয়া বিরক্ত হবে। আচ্ছা নাদিয়া কি জানে যত দিন যাচ্ছে সে তত সুন্দর হচ্ছে! না, তা সে জানে না। আয়নায় সে মনে হয় নিজেকে দেখেও না। তার সমস্ত জগৎ পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ। তিতলীর ধারণা সে যদি প্রেমে পড়ে তাহলে কোনো মানুষের প্রেমে পড়বে না, কোনো একটা পাঠ্যবইয়ের প্রেমে পড়বে। তিতলী উঠে পড়ল।

মতিন সাহেব গোশত বা সিরকা কোনোটাই আনেন নি। গোশত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, গোশত শরীরের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সবচে' খারাপ ধরনের প্রোটিন হলো এনিমেল প্রোটিন। সপ্তাহে একদিনের বেশি গোশত খাওয়া ঠিক না। এই সপ্তাহে এর মধ্যে দু'দিন হয়ে গেছে— আর না। সিরকার প্রসঙ্গে বলেছেন— সিরকাটা কোন কাজে লাগে? বাড়িটা তো কাবাব হাউস না যে সিরকা লাগবে, সয়াসস লাগবে।

সুরাইয়া স্বামীর সঙ্গে যুক্তিতর্কে যান নি। চুপ করে গেছেন। তাঁর মন একটু খারাপ হয়েছে। মেয়েটা শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে।

মতিন সাহেব তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগিও করেছেন। তিতলীর কলেজ বাদ দেয়া প্রসঙ্গে রাগারাগি।

সকাল থেকে তো রিকশা ভাড়া রিকশা ভাড়া করে আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকে পড়বে। যখন ভাড়া দিলাম তখন আর কোথাও যায় না। এর মানে কী ? আদর দিয়ে দিয়ে সব ক'টা মেয়ের মাথা যে তুমি খেয়েছ সেটা কি তুমি জান ? মেয়েরা কিছু বললে তোমার হুঁশ থাকে না। মেয়েদের কেউ মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করলে ওইটা নিয়েই থাক। মুখ দিয়ে 'সিরকা' শব্দটা বের করেছে, তুমিও তসবি জপা শুরু করলে, 'সিরকা সিরকা।' আদর এবং প্রশ্রয় কম দেবে। এর ফল আখেরে শুভ হবে।

মতিন সাহেব বাজার এনে দিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন। তিতলীর কলেজের নোটিশ বোর্ডে ঝোলানোর জন্যে একটা বিজ্ঞাপন তিনি নিজেই লিখবেন। কাল কলেজে যাবার সময় মেয়ের হাতে ধরিয়ে দেবেন। মেয়ে নিজের আগ্রহে এই কাজ করবে না। তেমন শিক্ষা তারা মার কাছ থেকে পায় নি। তাদের মা তাদের শুধু আদরই দিয়েছে— শিক্ষা দেয় নি। মতিন সাহেব অনেক চিন্তা ভাবনা এবং পরিশ্রম করে জিনিসটা দাঁড় করালেন।

সহযাত্রীর জন্যে বিজ্ঞপ্তি

আমার বাসা কলাবাগানের অভ্যন্তরে। দেশের বর্তমান অশান্ত পরিবেশে রিকশাযোগে একা একা কলেজে আসবার সময় কিঞ্চিৎ ভীত থাকি। এমতাবস্থায় সহপাঠী বন্ধুদের জানাচ্ছি তাহাদের কেহ যদি কলাবাগান এলাকায় থাকেন এবং আমার সঙ্গে একত্রে রিকশায় আসা-যাওয়া করতে রাজি থাকেন তাহা হইলে আমার জন্যে অত্যন্ত শুভ হয়। রিকশা ভাড়া বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয় তা সমান সমান ভাগাভাগি করা হইবে ফলশ্রুতিতে অভিভাবকেরও অর্থনৈতিক সাশ্রয় হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
তিতলী বেগম
১২/১০ কলাবাগান। হলুদ কাঠের গেটওয়ালা বাড়ি।

দুপুরে খেতে বসে নাদিয়া উৎফুল্ল গলায় বলল, নিশ্চয় আপা রেঁধেছে। রঙ দেখেই টের পাচ্ছি আপার রান্না।

তিতলী লজ্জিত গলায় বলল, আহ্লাদী করিস না, খা।

তুমি যাই রাঁধ তাই এমন অপূর্ব কেন হয় বল তো ? তুমি একটা রান্নার স্কুল দিও তো আপা। দেখবে দলে দলে তোমার স্কুলে ছাত্র ভর্তি হবে।

যথেষ্ট হয়েছে।

মোটেই যথেষ্ট হয় নি। আপা তুমি কি জান তুমি খুব অল্প বয়সে বিধবা হবে ?

সুরাইয়া তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এটা কী ধরনের কথা ?

নাদিয়া বলল, আপা ভালো ভালো রান্না করবে। সেই রান্না খেয়ে খেয়ে দুলাভাই ফুলে ফেঁপে একাকার হবে। কোলেস্টরল হবে, হাই ব্লাডপ্রেসার হবে। তারপরেও খাওয়া ছাড়তে পারবে না। তারপর একদিন হার্ট অ্যাটাক।

সুরাইয়া বললেন, রসিকতা ভালো, এ ধরনের রসিকতা ভালো না। তওবা কর। বল তওবা।

নাদিয়া বলল, তওবা।

সুরাইয়া বললেন, তুই কথাবার্তা আরো সাবধানে বলবি। যা ইচ্ছা বলে ফেলিস। আশ্চর্য!

তিতলী বলল, বক্তৃতা বন্ধ কর তো মা। বেচারি আরাম করে খাচ্ছে খাক।

সন্ধ্যাবেলা তিতলীর ফুফু নাফিসা খানম এলেন। পরনে ধবধবে সাদা শাড়ি। কাঁধে গোলাপি চাদর। ছোটখাটো মহিলা, সরল ধরনের গোলগাল মুখ, কথা বলেন নিচু গলায়— কিন্তু তাঁর নিচু গলার প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব অসীম।

নাফিসা খানম গাড়ি থেকে নেমেই ভুরু কোঁচকালেন। নষ্ট কলিংবেল এখনো বদলানো হয় নি। গত সপ্তাহে তিনি শক খেয়েছিলেন। মতিনকে বলে গেছেন ঠিক করতে। মতিন সেটা করে নি।

তিনি ড্রাইভারকে তৎক্ষণাৎ দোকানে পাঠালেন। ড্রাইভার ডিংডং শব্দ হয় এমন একটা কলিংবেল কিনবে, একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তিনি থাকতে থাকতেই কলিংবেল ঠিক হবে।

নাফিসা খানম কারো বাড়িতেই খালি হাতে যান না। এখানেও এক কেজি জিলাপি নিয়ে এসেছেন। জিলাপি দোকানের কেনা না— তার নিজের বানানো। এক ময়রার কাছ থেকে তিনি মিষ্টি বানানো শিখছেন। জিলাপি ভালো হয়েছে তবে জিলাপির প্যাঁচ ঠিকমতো হয় নি। আড়াই প্যাঁচ হবার কথা— তার কোনো কোনোটিতে তিন প্যাঁচ হয়েছে কোনোটাতে এক প্যাঁচ।

মতিন এসে বড়বোনকে কদমবুসি করলেন। এটা নতুন না, সব সময় করেন। নাফিসা খানম এত ভক্তিতেও বিচলিত হলেন না। শুকনো গলায় বললেন, কী রে তোকে না বললাম, কলিংবেল ঠিক করাতে। ঠিক করাস নি কেন?

মতিন আমতা আমতা করে বললেন— বেল কিনিয়েছি। বেল, ইলেকট্রিক তার সব কেনা, মিস্ত্রি পাচ্ছি না।

মিস্ত্রি পাবি না কেন? মিস্ত্রিরা সব দল বেঁধে গেল কই?

আমার পরিচিত একজন মিস্ত্রি আছে— ও গেছে দেশের বাড়িতে।

পয়সা দিয়ে কাজ করাবি তার আবার পরিচিত-অপরিচিত কী?

কাল-পরশুর মধ্যে লাগিয়ে ফেলব আপা।

তিতলীকে ওযুর পানি দিতে বল— মাগরেবের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। জিলাপি নিয়ে এসেছি— খা। গরম গরম খা। ঠাণ্ডা হলে ভালো লাগবে না।

নাফিসা খানম ওযু করে নামায পড়তে বসলেন। মতিন সাহেব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যে কলিংবেল সমস্যা বেশিদূর গড়ায় নি।

সমস্যার এত সহজ সমাধান অবশ্যি হলো না। নামায শেষ করেই নাফিসা খানম বললেন, মতিন তুই তোর কলিংবেল আর তারফার কী কিনেছিস আমাকে দেখা। আমি ড্রাইভারকে কিনতে পাঠিয়েছি যেটা ভালো সেটা লাগাব। বাকিটা তুলে রাখব।

মতিন মুখ শুকনো করে কলিংবেল খুঁজতে গেলেন। যে জিনিস কেনাই হয় নি সে জিনিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মতিন সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা খুঁজছেন আর কিছুক্ষণ পর পর বলছেন, আশ্চর্য পলিথিনের একটা কালো ব্যাগে ছিল— খাটের নিচে রেখেছি গেল কোথায়? তাঁর স্বগতোক্তি নাফিসা খানম শুনেও না শোনার ভাব করছেন। এত কিছু শোনার সময়ও তাঁর নেই। তিনি এসেছেন জরুরি কাজে— তিতলীর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে। ওই পার্টি গা এলিয়ে দিয়েছিলো ফাইনাল কথা বলবে বলে ডেট দিয়ে আসে নি। এখন আবার খানিকটা উৎসাহ দেখাচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তিনি আলাপ করতে এসেছেন। আলাপ তিনি করছেন সুরাইয়ার সঙ্গে তবে তিনি চাচ্ছেন মেয়েরাও ব্যাপারটা শুনুক। মতামত দেবে না, শুধু শুনে যাবে। বিয়েটিয়ে বিষয়ক গল্প শুনতে নাদিয়ার একেবারেই ভালো লাগে না— তারপরেও তাকে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে হচ্ছে। ফুফু যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ সবাই তাকে ঘিরে থাকবে এটাই অলিখিত নিয়ম।

নাফিসা খাটে পা উঠিয়ে বসে আছেন। তার দুপাশে নাদিয়া এবং তিতলী। নাতাশা ঠিক তার পেছনে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাতাশার দায়িত্ব হচ্ছে ফুফুর চুল টেনে দেয়া। এই কাজটা নাকি নাতাশা খুব ভালো পারে।

ঘটনা কী হলো শোন। রাত আটটা বাজে। তিতলীর ফুফার কাছে গেস্ট এসেছে। আমি গেস্টদের চা আর নুডুলস দিয়ে শোবার ঘরে এসেছি। খুবই মাথা ধরেছে। কাজের মেয়েটাকে বললাম চুল টেনে দিতে। সে চুল টানছে তখন টেলিফোন এল। খুবই নরম গলা— আপা কেমন আছেন? শরীর ভালো? এইসব ন্যাকামি টাইপ কথা। আমি গলা শুনেই বুঝেছি— কে। তারপরেও বললাম, চিনতে পারছি না তো কে বলছেন? বলল— আমি বুলা। আমি বললাম, ও আচ্ছা। বুলা হচ্ছে ছেলের মামি। পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে তো চর্বির ভাঁজে ভাঁজে দুষ্টবুদ্ধি। আমাদের মতো সোজা সরল না। আমি বললাম কী ব্যাপার হঠাৎ টেলিফোন? সে বলে কী— আপা আপনার সঙ্গে একটু যে বসতে হয়। সোমবারে কি আপনার সময় হবে? আমি বললাম, না। এই সপ্তাহটা খুব ব্যস্ত থাকব। কোনোরকম আগ্রহ দেখালাম না। ভাবটা এ রকম করলাম যে আমার কোনো গরজ নেই। গরজ দেখালেই এরা মাথায় উঠে যায়। শুরুতে বেশি গরজ দেখানোর জন্যে ওরা ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল। যেই গরজ দেখানো বন্ধ ওমনি খোঁজ পড়েছে।

সুরাইয়া বললেন, ওদের আগ্রহ আছে?

আগ্রহ অবশ্যই আছে। তবে ভালো ছেলে একটা হাতে থাকলে যা হয়— দুনিয়ার মেয়ে বাজিয়ে দেখে। তাই করছে— দুনিয়ার মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। কোনো মেয়েরই ভালো কিছু চোখে পড়ছে না শুধু খুঁতগুলো চোখে পড়ছে।

নাদিয়া বলল, ভালো ছেলে আপনি কাকে বলেন ফুফু?

নাফিসা খানম পানের বাটা থেকে পান মুখে দিতে দিতে বললেন, আমার কাছে ভালো ছেলের হিসেব খুব সোজা। ছেলের ঢাকা শহরে নিজের বাড়ি থাকতে হবে। ভালো একটা চাকরি থাকতে হবে। পরিবারের ছোট বা মেজো ছেলে হতে হবে— বড় ছেলের ওপর সংসারের দায়-দায়িত্ব থাকে। বড় ছেলে চলবে না। গায়ের রঙ ফরসা হতে হবে। রঙ ময়লা হলে তার মেয়েগুলোর রং হবে ময়লা— মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে জান বের হয়ে যাবে। লম্বা হতে হবে। বাপ বাটু হলে— ছেলেমেয়ে সব নাটবল্টু হয়। তোর বাবাকে

ডাক তো তাকে দুটা কথা বলে বিদেয় হব।

মতিন শুকনো মুখে এসে দাঁড়ালেন। নাফিসা খাতুন চায়ের কাপে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, কলিংবেল পাওয়া গেছে?

না। পলিথিনের ব্যাগে করে খাটের নিচে এনে রেখেছিলাম।

ভালো করে ভেবে দেখ। কিনে হয়তো দোকানেই ফেলে এসেছিস।

সেটাও হতে পারে।

কিনেছিস কোত্থেকে?

নওয়াবপুর থেকে।

কাল গিয়ে খোঁজ নিবি। পয়সা দিয়ে জিনিস কিনে দোকানে ফেলে আসা কোনো কাজের কথা না।

জ্বি বুবু।

আচ্ছা এখন যা।

মতিন হাঁপ ছাড়লেন। মনে হচ্ছে ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে। নাফিসা বললেন—তিতলী কাগজ আর কলম আন। জিলাপির রেসিপি তোকে লিখে দিয়ে যাই। আমি মুখে মুখে বলি তুই লিখে নে। না নাদিয়া তুই লেখ। তোর হাতের লেখা ভালো।

নাদিয়া জিলাপির রেসিপি লিখছে। আজ তার অনেক সময় নষ্ট হলো। নষ্ট সময়টা কভার করার জন্যে অনেক রাত জাগতে হবে।

সুন্দর করে লিখে রাখ উপকরণ—

ময়দা ১ কাপ
চিনি ১ কাপ
গোলাপজল ১ টেবিল চামচ
সয়াবিন তেল ১ কাপ।

ময়দা আধকাপ পানিতে ভালো করে গুলে দুদিন ঢেকে রাখতে হবে।...

রেসিপি দিয়ে নাফিসা উঠলেন। সুরাইয়ার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিলেন। সামনের মাসের খরচ চার হাজার টাকা। টাকার খাম সুরাইয়া খুব লজ্জিত মুখে নিলেন। তার লজ্জা অবশ্যি নাফিসা খানমের চোখে পড়ল না। তিনি কলিংবেল লাগানো হয়েছে কিনা দেখতে গেলেন। মিস্ত্রি কলিংবেল লাগিয়েছে। নাফিসা খানম দুবার বেল টিপলেন। বেলের আওয়াজে তেমন খুশি হলেন না। ক্যানক্যানে শব্দ। কানে লাগে।

নাদিয়া রাত একটা পর্যন্ত পড়ে। বড় ফুফুর জন্যে দেড় ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। সেই সময় পুষিয়ে নেবার জন্যে সে আড়াইটা পর্যন্ত পড়ে ঘুমোতে গেল। দুটা খাটের একটাতে সে একা ঘুমোয় অন্যটাতে তিতলী নাতাশাকে নিয়ে শোয়। কেউ সঙ্গে শুলে নাদিয়ার ঘুম আসে না। এটা তার ছেলেবেলার অভ্যাস। একমাত্র ব্যতিক্রম বড় আপা। বড় আপা তার সঙ্গে ঘুমোলে কোনো সমস্যা হয় না। বরং ঘুমের আগে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করতে পেরে ভালো লাগে।

রাত আড়াইটার সময় কারো জেগে থাকার কথা না। নাদিয়া ঘুমোতে এসে দেখে তিতলী জেগে আছে। নাদিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন ?

তিতলী হাই তুলতে তুলতে বলল, তোর জন্যে জেগে আছি। ঘুমের আগে খানিকক্ষণ গল্প না করলে ভালো লাগে না।

আপা থ্যাংক য়্যু।

আজ কী নিয়ে গল্প করবি ?

আমি তো আপা গল্প করতে পারি না। তুমি গল্প করবে আমি শুনব।

কী গল্প শুনতে চাস ?

কলেজে কী মজাটজা কর সেই সব বল।

কলেজে কোনো মজাটজা করি না। মজা মজা ভাব করি— এই পর্যন্তই।

তোমার মজা মজা ভাবের গল্প কর আমি শুনি। আমার নিজের কোনো মজা করতে ইচ্ছে করে না— অন্যের মজা শুনতে খুব ভালো লাগে। হাসান ভাইয়া হঠাৎ হঠাৎ যখন আসে তুমি মুখটুখ লাল করে তার সঙ্গে গল্প কর। আমার কী যে ভালো লাগে! কিন্তু আপা আমি কোনোদিনও এ রকম করতে পারব না। একটা ছেলের সঙ্গে আমি গল্প করছি— ভাবতেই পারি না।

গল্প করায় সমস্যাটা কী ?

কী গল্প করব— আমি তোমাকে ভালোবাসি, এইসব বলব। ভাবতেই তো গা শিরশির করছে।

একটা ছেলে আর মেয়ে যখন গল্প করে তখন কেউ কিন্তু বলে না— আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বলে না কেন ?

ভালোবাসার কথা বলার দরকার হয় না।

হাসান ভাই তোমার সঙ্গে কী নিয়ে গল্প করে ?

ও কী গল্প করবে ? ও চুপচাপ থাকে।

তুমি একা বকবক করে যাও ?

হুঁ।

কী নিয়ে বকবক কর ?

ভালো যন্ত্রণা হলো দেখি ! আমি কি মুখস্থ করে রেখেছি নাকি ?

হাসান ভাইয়ের কোন জিনিসটা তোমার সবচে' ভালো লাগে আপা ?

জানি না। এই নিয়ে ভাবি নি।

একজন ছেলের প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ, আর তাকে কী জন্যে ভালোবাস তা জান না ?

তুই হঠাৎ এমন বকবক শুরু করলি কেন ?

নাদিয়া বলল, আর করব না।

আয় শুয়ে পড়ি।

নাদিয়া লজ্জিত গলায় বলল, ছাদে যাবে আপা ?

তিতলী বিস্মিত গলায় বলল, রাত তিনটার সময় ছাদে যাবি মানে ? তোর মাথায় আসলে ছিট টিট আছে।

নাদিয়া মাথা নিচু করে হাসছে।

তিতলী চিন্তিত গলায় বলল, শোন নাদিয়া আমার কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে তুই রাত দুপুরে এ রকম একা একা ছাদে যাস। যাস নাকি ?

নাদিয় হাসছে। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসছে।

এ রকম করে হাসছিস কেন ?

আমি সহজভাবেই হাসছি তোমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। চল না আপা ছাদে যাই। দশ মিনিটের জন্যে।

বৃষ্টিতে ছাদ পিছল হয়ে আছে।

অকারণে অজুহাত তৈরি করবে না তো আপা। তুমি যদি এখন আমার সঙ্গে ছাদে যাও তাহলে তোমাকে মন খুশি হয়ে যাবার মতো একটা কথা বলব।

তিতলী বোনের সঙ্গে ছাদে গেল। নিশিরাতের ছাদ গা কেমন জানি ছমছম করে। তিতলী বলল, তুই একা একা ছাদে এসে কী করিস ?

কিছু করি না। আকাশের তারা দেখি।

আমাকে কী কথা বলবি বলেছিলি বলে ফেল। কী সে কথা যা শুনলে আমার মন ভালো হয়ে যাবে ?

নাদিয়া হাসতে হাসতে বলল, কোনো কথা না আপা। তোমাকে ছাদে আনার জন্যে এটা হলো আমার একটা ট্রিকস। সরি।

ট্রিকস করার দরকার ছিল কি ? আমাকে বললেই আমি আসতাম।

না আসতে না। আচ্ছা আপা আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে। তুমি যদি রাগ না কর তাহলে বলি।

রাগ করব না— বল।

আগে প্রতিজ্ঞা কর যে রাগ করবে না।

তোর এইসব প্রতিজ্ঞা ফ্রতিজ্ঞা ছেলেমানুষি আমার ভালো লাগে না— বললাম তো রাগ করব না। কথাটা কী ?

নাদিয়া মুখ নিচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি কি কখনো হাসান ভাইকে চুমু খেয়েছ আপা ?

তিতলী স্তম্ভিত হয়ে গেল। নাদিয়ার মতো মেয়ে যে এ রকম অশালীন একটা কথা বলতে পারে তা তার কল্পনাতেও আসে নি। হতভম্ব ভাব সামলিয়ে তিতলী বলল, তুই এসব কী বলছিস! পড়াশোনা করতে করতে তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

সরি আপ।

আমি খুব রাগ করেছি। অসম্ভব রাগ করেছি।

তুমি কিন্তু বলেছিলে রাগ করবে না।

আমি তো বুঝতে পারি নি তুই এ ধরনের কথা বলতে পারিস।

আর কোনোদিন বলবো না আপা। তুমি কি খুব বেশি রাগ করেছ ?

হ্যাঁ।

তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব দাও নি।

তারপরেও তুই জবাব চাচ্ছিস ?

হ্যাঁ। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। আমি তো কল্পনাও করতে পারি না আপা একটা মেয়ে কী করে একটা ছেলেকে চুমু খাবে।

তিতলীর ইচ্ছে করছে বোনের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে কঠিন গলায় বলল, চল নিচে যাই।

আপা তোমর মনটা তো খুব বেশি খারাপ হয়েছে— এখন তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি। তোমাকে আমি বলছিলাম না যে তোমার মন খুশি হবার মতো একটা কথা বলব। এটা কোনো ট্রিকস না— সত্যি। কথাটা হচ্ছে কাল তুমি যখন নিউমার্কেটে গিয়েছিলে তখন হাসান ভাই এসেছিলেন।

কখন, সকালে ?

হুঁ।

কাল দিন গেল, আজকের দিন গেল তুই বলিস নি কেন ?

তোমাকে চমকে দেবার জন্যে জমা করে রেখেছিলাম। হাসান ভাই যখন এলেন তখন বাবা বাসায় ছিলেন না। কাজেই আমি উনাকে যত্ন করে বসালাম। অনেক গল্প করলাম।

কী গল্প করলি ?

উনি তো গল্প করতে পারেন না। আমি একাই গল্প করলাম।

তুই গল্প করতে পারিস নাকি ?

মাঝে মাঝে আমি খুব মজা করে গল্প করতে পারি। হাসির কথা বলতে পারি। আমি মানুষের গলার স্বরও নকল করতে পারি।

সে কী !

আমি তোমার গলার স্বর নকল করে হাসান ভাইকে শুনিয়ে দিলাম— উনি হেসেছেন।

তোর যে এমন গোপন প্রতিভা আছে তা তো জানতাম না।

হাসান ভাই তোমার জন্যে একটা চিঠি আমার কাছে দিয়ে গেছেন। এই নাও চিঠি। খামে বন্ধ চিঠি— এই চিঠি দিতেও তার কী সংকোচ! আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, হাসান ভাই ভয় নেই আমি চিঠি পড়ব না। আমার ওপর রাগ কি তোমার একটু কমেছে আপা ? মনে হচ্ছে কমেছে। চল নিচে যাই। তোমার নিশ্চয়ই চিঠি পড়ার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে।

তিতলী নিজের ঘরে এসে চিঠি খুলল। একটু দূর থেকে খুব আগ্রহ নিয়ে নাদিয়া বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। দু পাতার চিঠি। পুরো পাতাজুড়ে গুণ চিহ্ন আঁকা। তিতলী লজ্জা পেয়ে হাসল। এই গুণ চিহ্নের মানে শুধু তারা দুজনই জানে।

নাদিয়া বলল, এত লম্বা চিঠি এত তাড়াতাড়ি পড়া শেষ হয়ে গেল ?

হুঁ।

এখন কী করবে ? বাতি নিভিয়ে দেবে ? শুয়ে পড়বে ?

হুঁ।

বাতি নিভিয়ে নাদিয়া বোনের সঙ্গে ঘুমোতে এল। বোনের বুকে খানিকক্ষণ মাথা ঘষে আদুরে গলায় বলল, আপা গুণ চিহ্নের মানে কী? চুমু? বলেই নাদিয়া খিলখিল করে হাসল। হাসি থামলে চাপা গলায় বলল— সরি আপা, তোমার চিঠি আমি পড়েছি। লোভ সামলাতে পারি নি। তুমি যদি এখন শাস্তি হিসেবে ধাক্কা দিয়ে আমাকে খাট থেকে ফেলে দিতে চাও ফেলে দিতে পার। আমি কিচ্ছু মনে করব না।

তিতলী বোনকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল।

৭

সন্ধ্যা এখনো হয় নি কিন্তু ঘরের ভেতর অন্ধকার। দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতরে বাতি জ্বালানো হয় নি। বাতাস ভারি হয়ে আছে। বাতাসে সিগারেটের কটু গন্ধ। সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বমির গন্ধ। খালি পেটে হুইস্কি খাওয়ার ফল ফলেছে— সাখাওয়াত বমি করে ঘর ভাসিয়েছে। সাখাওয়াতের মদ্যপানের অভ্যাস নেই। গত কয়েক দিন খুব খাচ্ছে— আজ বেশি খেয়ে ফেলেছে। বমি করেও তার উৎসাহ কমে নি— হানড্রেড পাইপারের বোতল উঁচু করে বলল, আর মাত্র তিন আঙ্গুল আছে। আয় সবাই এক আঙ্গুল করে খেয়ে বোতল ফেলে দিই।

রকিব জবাব দিল না। সিগারেট ধরাল। তার প্যাকেটের শেষ সিগারেট। ঘরে আর কারো কাছেই সিগারেট নেই। রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কয়েক প্যাকেট সিগারেট এনে রাখা দরকার ছিল। এখন ঘর থেকে বের হয়ে সিগারেট আনা ঠিক হবে না। রাত ন'টায় এক সঙ্গে বের হতে হবে।

সাখাওয়াত চারটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। মাপমতো ঢালার চেষ্টা করছে। তার হাত কাঁপছে। বদরুল বলল, এই সাখাওয়াত তোর মুখে বমি লেগে আছে। মুখ ধুয়ে আয় না!

সাখাওয়াত হাসিমুখে বলল, আর মুখ ধোয়াধুয়ি। আগে মাল খেয়ে নি।

রকিব বলল, তিন গ্লাসে ঢাল। আমি খাব না।

খাবি না কেন?

তোর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে? খেতে ইচ্ছা করছে না, খাব না।

শালা তোর বাপ খাবে।

রকিব ক্রুদ্ধচোখে তাকাল। তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে। সাখাওয়াত ভীত গলায় বলল, এ রকম করে তাকাচ্ছিস কেন?

রকিব বলল, বাপ তুলে আর যদি কথা বলিস তোর নিজের বমি তোকে চেটে খাইয়ে দেব।

ঠাট্টা করছিলাম রে দোস্ত। থাক তোর খেতে হবে না— তোরটা আমি খাব। এই দেখ খাচ্ছি।

রকিব মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানছে। ঘড়িতে মাত্র ছ'টা বাজে। ন'টা বাজতে এখনো তিন ঘণ্টা। এই দীর্ঘ সময় শুধু শুধু বসে থাকতে হবে ভাবতেই তার মাথা ধরে

যাচ্ছে। তার ওপর সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

ঘরের এক কোণায় বিড়ি ব্যবসায়ী হাজি মুসাদ্দেক পাটোয়ারী বসে আছেন। তার হাত পেছন দিক করে বাঁধা। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে আছেন। যদিও এখন তার ভয় থাকার কথা না। তার পরিবার থেকে তিন লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। রাত ন'টার সময় তাকে একটা বেবিট্যাক্সিতে তুলে দেয়া হবে। সেই বেবিট্যাক্সি নিয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন।

হাজি মুসাদ্দেক পাটোয়ারী বিড়বিড় করে বললেন, বাবা আপনাদের দয়ার কথা কোনোদিন ভুলব না। আমি খাস দিলে আপনাদের জন্য দোয়া করি।

হাজি সাহেব কথাগুলো আন্তরিকভাবেই বললেন। তিনি বেঁচে আছেন এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে এই আনন্দেই তিনি অভিভূত।

বাবারা একটা কথা।

মোজাম্মেল কঠিন গলায় বলল, অকারণে কথা বলবেন না। চুপচাপ থাকেন। ন'টা বাজুক ছেড়ে দিব।

বাবারা একটু পিশাব করব।

পিশাব ন'টার পরে করবেন। বাড়িতে গিয়ে আরাম করে পিশাব করবেন। কমোডে বসে করবেন।

জ্বি আচ্ছা।

সাখাওয়াত বলল, হাজি সাহেবকে একটু মাল খাইয়ে দিব? আমি আর খেতে পারছি না।

কেউ কোনো জবাব দিল না। সাখাওয়াত উৎসাহের সঙ্গে বলল, কি হাজি সাহেব, হুইস্কি খাবেন?

বাবারা আপনারা বললে অবশ্যই খাব।

সাখাওয়াত আনন্দিত স্বরে বলল, হাজি সাহেব হুইস্কি খেতে চায়।

রকিব বলল, সাখাওয়াত তুই বাড়াবাড়ি করছিস।

সাখাওয়াত সাথে সাথে বলল, ঠাট্টা করছি রে দোস্ত। আমি কি আর সত্যি খাওয়াতাম! তোরা আমাকে ভাবিস কী?

ছড় ছড় শব্দ হচ্ছে।

সবাই হাজি সাহেবের দিকে তাকাল। হাজি সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, পিশাব হয়ে গেছে বাবারা। বয়স হয়েছে, ডায়াবেটিস আছে। বাবারা কিছু মনে করবেন না। আপনাদের দয়ার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। আমি খাস দিলে আপনাদের জন্যে দোয়া করি।

ঘ্যানঘ্যান করবেন না। চুপ থাকেন।

বাবারা একটু পানি খাব।

রকিব বলল, সাখাওয়াত দেখ তো পানি আছে কি না।

সাখাওয়াত অপ্রসন্ন মুখে উঠে দাঁড়াল। এটা সাখাওয়াতের বোনের বাড়ি। বোন মিডল ইস্টে তার স্বামীর কাছে গিয়েছে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সাখাওয়াতের কাছে দেয়া। মাঝে মধ্যে সাখাওয়াত বন্ধুদের নিয়ে আসর বসাত। নিরিবিলিতে বাড়ি। রাতভর হইচই করে আড্ডা দিলেও কেউ কিছু বুঝবে না। দুদিন দু রাত হাজি সাহেবকে এ বাড়িতে রাখা হয়েছে। তাকে ছেড়ে দিলেও তিনি এই বাড়ি চিনে বের করতে পারবে না। তাকে আনা হয়েছে গভীর রাতে— কম্বল দিয়ে মুড়ে। তাকে ছাড়াও হবে এই ভাবে। সাখাওয়াত পানির বোতল এনে দিল। রকিব বলল, গ্লাস দে। হাত বাঁধা, পানি খাবে কীভাবে ? হাতের বাঁধন খুলে দে।

হাজি সাহেব অনবরত নিচু গলায় বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। সাখাওয়াত বলল, বিড়বিড় করে কী বলেন ?

বাবারা দুরুদ শরিফ পড়তেছি। আপনাদের ডিসটার্ব হলে পড়ব না।

পাকসাফ হয়ে দুরুদ পড়বেন। পেশাব করে ঘর ভাসিয়ে দুরুদ শরীফ।

বাবারা আমি খুবই শরমিন্দা। আমি পায়ে ধরে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই।

হাজি সাহেব রকিবের পায়ে ধরার জন্যে এগোলেন। রকিব কঠিন গলায় বলল, যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন। খবরদার নড়বেন না।

জ্বি আচ্ছা বাবা।

সাখাওয়াত বাঁধন খুলতে পারছে না। সাহায্য করার জন্য বদরুল এগিয়ে গেল। সে বিরক্ত গলায় বলল, হাজি সাহেবর গা তো পুড়ে যাচ্ছে। হাজি সাহেব বললেন, সামান্য জ্বর হয়েছে বাবারা। বাড়িতে গেলে ইনশাল্লাহ্ আরোগ্য হব।

পুলিশের কাছে বা অন্য কারো কাছে আমাদের নাম বলবেন না তো ?

জ্বি না বাবারা। পাক কোরআনের দোহাই, নবীজীর দোহাই, কাউরে কিচ্ছু বলব না। কোরআন মজিদ নিয়া আসেন কোরআন মজিদে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করব।

রকিব ঘড়ি দেখল। ছ'টা পঁয়ত্রিশ। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট পার হয়েছে। আরো দুই ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট পার করতে হবে। সর্বনাশ! এত সময় পার করবে কীভাবে। সাখাওয়াত বলল, দোস্ত সিগারেট দে।

সিগারেট নাই।

সর্বনাশ ! সিগরেট ছাড়া চলবে কীভাবে ? প্যাকেট খুলে দেখ না ফাঁকেফুকে থাকতেও পারে।

সাখাওয়াত তুই কথা বেশি বলছিস। চুপ থাক।

তুই ঝিম ধরে বসে আছিস কেন ? তোর কী হয়েছে ?

চুপ থাক।

শালা তুই চুপ থাক।

রকিব উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় কষাল। সাখাওয়াত উল্টে পড়ল তার নিজের বমিতে।

হাজি সাহেব বিড়বিড় করে আবারো দুরুদ শরীফ পড়ছেন। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এরা কি তাকে সত্যি ছাড়বে ?

রাত ন'টায় হাজি সাহেবকে বেবিট্যাক্সিতে তুলে দেয়া হলো। তিনি বসেছেন মাঝখানে, একপাশে বদরুল অন্য পাশে সাখাওয়াত। বদরুল হাজি সাহেবের মাথা চেপে ধরে আছে। যাতে তিনি কিছু দেখতে না পান। তারা কিছুদূর গিয়ে নেমে পড়বে। হাজি সাহেব একা একা যাবেন। হাজি সাহেব বিড়বিড় করে আবারো বললেন, বাবারা আপনাদের দয়ার কথা কোনোদিন ভুলব না। আমি আপনাদের জন্যে খাস দিলে দোয়া করি।

রকিব এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট কিনল। চমনবাহার দেয়া মিষ্টি পান কিনল এক খিলি।

তিন লাখ টাকার ভাগাভাগিতে তার অংশে পড়েছে এক লাখ তিরিশ। সে আরো বেশি নিতে পারত, নেয় নি। এক লাখ টাকা আলাদা করে রাখতে হবে। কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দেয়াও দরকার। পাসপোর্ট করে ইন্ডিয়া ঘুরে এলে হয়। তিন হাজার টাকা ফিস দিলে চব্বিশ ঘণ্টায় পাসপোর্ট হয়। ইন্ডিয়ায় দেখার অনেক কিছু আছে। কোনারকের সূর্যমন্দিরটা নাকি দেখার মতো। কোনারক কোথায় কে জানে? খোঁজ নিতে হবে। পাসপোর্ট করতে ছবি লাগে। ছবিটা আজকে তুলে ফেললে কাল পাসপোর্টের টাকা জমা দেয়া যায়। এত রাতে কি কোনো স্টুডিও খোলা আছে? আছে নিশ্চয়ই। রাত ন'টা এমন কিছু রাত না। রকিব স্টুডিওর খোঁজে রওনা হলো। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ উঠেছে। সুন্দর জোছনা। জোছনায় হাঁটতে রকিবের বেশ ভালো লাগছে। নতুন প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরাল। নতুন প্যাকেটের প্রথম সিগারেটের স্বাদ আলাদা।

ক্ষিধে লেগেছে। প্রচণ্ড ক্ষিধের সময় সিগারেট ধরালে ধোঁয়াটা চট করে মাথায় গিয়ে লাগে। এখনো তাই হচ্ছে। ক্ষিধের দোষ নেই— দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি। শিঙাড়া-বাদাম, এখন বাজে রাত সাড়ে ন'টা, ক্ষিধের দোষ কী? কোনো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকে চাইনিজ ফাইনিজ খেয়ে নিলে হয়। রেস্টুরেন্টে একা খেতে ইচ্ছে করে না। রেস্টুরেন্টে একা খেতে যাবার অর্থ— এই মানুষটার সংসার নেই, বন্ধুবান্ধব নেই। বয় বেয়ারার চোখে করুণা চলে আসে। সে করুণার ধার ধারে না।

বাসায় চলে গেলে কেমন হয়। বাসায় সবাই সকাল সকাল খেয়ে ফেলে। ভাত তরকারি কিছুই হয়তো নেই। তাতে কী, রীনা ভাবি চোখের নিমিষে চাল ফুটিয়ে একটা ডিম ভেজে দেবে। ভাপ ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে ডিমভাজা— এই তো যথেষ্ট। রীনা ভাবির কাছ থেকে টাকাটা নেয়া হয়েছিল, টাকাটা ফেরত দেয়া দরকার। টগর এবং পলাশের জন্য কিছু গিফটও কেনা দরকার। খেলনার দোকান কি খোলা আছে? গরমের সময় রাত দশটা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকার কথা। টগর এবং পলাশের পছন্দের খেলনা একটাই— 'বল'। যখনই জিজ্ঞেস করা হয়— কী খেলনা চাই ওরা বলবে, 'বল'। সে নিজেই ওদের চার-পাঁচটা 'বল' দিয়েছে। ঠিক আছে— পুরনো বলের সঙ্গে যুক্ত হোক আরো দুটা 'বল'। বলে বলে ধুলপরিমাণ।

রকিব দুটা 'বল' কিনল।

দোকানদার বলল, স্যার রঙ পেন্সিল কিনবেন? চাইনিজ পেন্সিলের সেট আছে, দাম খুব সস্তা, আশি টাকা করে।

রকিব দুই সেট পেন্সিলও কিনে ফেলল। সুন্দর সুন্দর কলম বিক্রি হচ্ছে। দেখে মনে হয় ফাউন্টেন পেন, খুললে দেখা যায় বল পয়েন্ট। কালির কলম বোধহয় পৃথিবী থেকে

উঠে যাচ্ছে। একবার রীনা ভাবি বলছিল— কালির কলমে লিখতে তার সবচে' ভালো লাগে। একটা কালির কলম কিনে ফেললে হয়। রকিব দেখে শুনে কালির কলমও একটা কিনল। দাম বেশি নিল না পাঁচ শ টাকা। নিক রীনা ভাবিকে কখনো কোনো গিফট দেয়া হয় না।

সবার জন্যে একটা করে গিফট কিনলে কেমন হয় ? কত আর টাকা লাগবে ? দোকানটা ছোট। সবার পছন্দসই জিনিস এখানে পাওয়া যাবে না। গুলশানের দিকে গেলে হয়। গুলশানের দোকানগুলো জিনিসপত্রে ঠাসা থাকে। লায়লার জন্যে একটা ঘড়ি কিনতে হবে। লায়লার হাতঘড়ি চুরি হয়ে গেছে আর কেনা হয় নি।

রকিব দোকান থেকে বেরোল। তার কেমন যেন মাথা ঘুরছে। শরীর মনে হয় ভেঙে আসছে। সাততলা দালানে দ্রুত উঠে এলে যেমন লাগে তেমন লাগছে, অথচ আজ সে কোনো পরিশ্রমই করে নি। বলতে গেলে সারাদিনই সাখাওয়াতের বোনের বাসায় বসা। রকিব রিকশা নিল। বাসায় যাবার পরিকল্পনা বাদ দিল। তার মুখ দিয়ে নিশ্চয়ই ভক ভক করে গন্ধ বেরোচ্ছে। ভাড়া ঠিক করার সময় রিকশাওয়ালা অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল : কথাও বলছিল উঁচু গলায়। মাতালদের সঙ্গে মানুষ সব সময় উঁচু গলায় কথা বলে। সবাই ধরেই নেয় নিচু গলায় কিছু বললে মাতালরা শুনতে পায় না।

সে মাতাল না। তার মাথা ঠিক আছে। খুব ঠিক আছে।

৮

সন্ধ্যা মিলাবার পরপর খানিকটা সময় হাসানের খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটে। মনে হয় কিছুই করার নেই। ঘরে মন টেকে না, বাইরেও মন টেকে না। ব্যাপারটা কি শুধু তার একারই হয় না কমবেশি সবার হয় ? এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে তার মনে এলেও উত্তর জানার সে কোনো চেষ্টা করে নি। এ রকম এক সন্ধ্যায় মনের অস্থির ভাব কাটাবার জন্যে সে সুমিদের বাসায় উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে সে খানিকটা লজ্জায় পড়ে গেল। সুমি পড়ছে তার স্যারের কাছে। স্মার্ট ধরনের যুবক। চোখে চশমা। ঠোঁটের ওপর ঘন গোঁফ। মনে হচ্ছে সিরিয়াস ধরনের শিক্ষক। এরা ছাত্রীর সঙ্গে গল্প করে সময় নষ্ট করে না। পড়া শেষ করে যাবার সময় একগাদা হোমওয়ার্ক দিয়ে যায়। সুমির মা হাসানকে ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন এই টিচার রেখেছেন। হাসানের ওপর আস্থা রাখতে পারে নি। ভদ্রমহিলা যদিও তাকে বলেছিলেন মেয়েকে তিনি নিজেই পড়াবেন। হাসান তাই বিশ্বাস করেছিল।

সুমি হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। এক্ষুণি আমার পড়া শেষ হবে।

সুমির এই কথাতেও তার নতুন শিক্ষক ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। এটিও সিরিয়াস শিক্ষকের নমুনা। সিরিয়াস শিক্ষক পড়াশোনা ছাড়া যে-কোনো কথায় ভুরু কুঁচকাবেন। তিন বছরের মাথায় তার কপালে পার্মানেন্ট 'ভুরু-কুঁচকা' দাগ পড়ে যাবে। হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলার মতো ভুরু-কুঁচকা দাগ দেখে বলে দেয়া যাবে ইনি একজন আদর্শ শিক্ষক।

হাসান চুপচাপ বসে আছে। ঘরের পরদা সরিয়ে সুমির মাও তাকে এক ঝলক দেখেছেন। তাকে দেখে খুশি হয়েছেন না বিরক্ত হয়েছেন হাসান তা বুঝতে পারে নি।

তিনিও কি হাসানের মতো অস্বস্তিতে পড়েছেন ? অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা অবশ্যি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি। তারা যে-কোনো পরিস্থিতি অতি দ্রুত সামাল দিতে পারে। পরম শত্রুকেও হাসিমুখে জিজ্ঞেস করতে পারে— তারপর ভাই কী খবর ?

সুমির পড়া শেষ হয়েছে। তার টিচার এখন হোমওয়ার্ক দাগিয়ে দিচ্ছেন।

সুমি।

জ্বি স্যার।

আগামীকাল আমার আসতে আধঘণ্টা দেরি হবে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

জ্বি আচ্ছা বললে হবে না, তোমার মাকে বলতে হবে, তিনি যেন আধঘণ্টা পরে গাড়ি পাঠান।

আমি বলব।

নতুন টিচার উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন হাসানের দিকে। সেই দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ— 'এ আবার কে ?'—টাইপ দৃষ্টি।

হাসান নতুন শিক্ষকের ভাগ্যে সামান্য ঈর্ষা অনুভব করল। ইনাকে গাড়ি দিয়ে আনা-নেয়া করা হয়। হাসানের বেলা কখনো তা করা হয় নি। একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল— সুমি বলল, 'মা স্যারকে গাড়ি দিয়ে আসুক'। সুমির মা বলেছিলেন, ড্রাইভার আজ সারাদিন গাড়ি চালিয়েছে। এখন রেস্ট নিচ্ছে। গাড়ি বের করতে বললে রাগ করবে। হাসান ড্রাইভারকে রাগ করতে দেয় নি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রওনা হয়েছিল।

সুমি পা দোলাতে দোলাতে বলল, স্যার আজ যে আপনি আসবেন তা কিন্তু আমি জানতাম।

হাসান একটু চমকাল। জগতের অনেক বিস্ময়কর রহস্যের মতো একটি রহস্য হলো আট বছরের বালিকা এবং একুশ বছরের তরুণীর কথার ভেতরও মিল আছে। তারা একই ভঙ্গিতে কথা বলে। সুমি সামনের খালি সোফায় বসেছে। পা নাচাচ্ছে। তিতলীও সুমির মতো পা নাচায়। এবং তিতলীও প্রায়ই বলে তুমি যে আজ আসবে তা কিন্তু আমি জানতাম।

আমি যে আজ আসব তুমি জানতে ?

জ্বি।

কীভাবে জানতে ? শালিক দেখেছিলে ?

শালিক দেখি নি। শালিক দেখলে তো কেউ আসে না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়েছে আপনি আসবেন।

হাসান সিরিয়াস শিক্ষকদের মতো ভুরু কুঁচকে ফেলল। মেয়েটি কি সত্যি কথা বলছে ? না তাকে খুশি করার জন্যে বাক্য তৈরি করছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। যেদিন যেদিন বাবার চিঠি আসে আমি আগে আগে বলে দেই। এই জন্যেই না বিশ্বাস করেছে।

তুমি কেমন আছ সুমি ?

ভালো আছি।

তোমার নতুন স্যার কেমন?

ভালো।

আমার চেয়ে ভালো?

হুঁ।

তোমার ধারণা আমি বেশি ভালো না?

আপনি তো ভালো পড়াতে পারতেন না।

ও আচ্ছা।

আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

না রাগ করি নি। শোন সুমি আমি তোমার জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি।

ইংরেজি বই?

না, বাংলা। পথের পাঁচালী।

সত্যজিত রায়ের?

না। সত্যজিত রায় তো ছবি বানিয়েছিলেন— এটা মূল বই বিভূতিভূষণের লেখা।

বাংলা গল্পের বই পড়তে আমার ভালো লাগে না।

হাসান বইটি বাড়িয়ে দিল। সুমি বইয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাল না। সে পা দোলাচ্ছে এবং হাসানের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে।

হাসছ কেন সুমি?

এমনি হাসছি।

তোমার পরীক্ষা কবে?

পরীক্ষা দেরি আছে। আপনি এত রোগা হয়ে গেছেন কেন স্যার?

রোগা হয়ে গেছি নাকি?

হুঁ। আপনার খুব জ্বর হয়েছিল তাই না?

জ্বর অবশ্যি হয়েছিল। তুমি জানলে কীভাবে?

সুমি জবাব দিল না। আগের মতো রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল এবং পা দোলাতে লাগল। ট্রেতে করে শিঙাড়া এবং চা নিয়ে সুমির মা ঢুকলেন। এটি একটি বিশেষ ভদ্রতা। অন্য সময় কাজের মেয়ে আসে।

হাসান সাহেব কেমন আছেন?

জ্বি ভালো।

আপনার ছাত্রী আজ সকালেই বলছিল আপনি আসবেন।

হাসান চুপ করে রইল। সুমির মা বসতে বসতে বললেন, আপনার জন্যে আপনার ছাত্রী খুব ব্যস্ত থাকে। প্রতিদিন সে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমার সঙ্গে আপনার গল্প করবে।

আমাকে নিয়ে গল্প করার মতো তেমন মালমসলা তো তার কাছে নেই।

গল্প করার জন্যে ওর কোনো মালমসলা লাগে না। বানিয়ে বানিয়ে সে অনেক কিছু বলতে পারে। আপনার ছবিও সে এঁকেছে। সেগুলো কি দেখেছেন?

জ্বি না।

সুমি স্যারকে তোমার ছবি দেখাও।

না।

না কেন ? ছবিগুলো তো সুন্দর হয়েছে। এনে দেখাও।

না।

সুমি পা দোলানো বন্ধ করে উঠে চলে গেল। তার জন্যে আনা বইটিও নিয়ে গেল না। 'পথের পাঁচালী' পড়ে রইল অনাদরে। সুমির মা বললেন, আপনার ছাত্রী যে কীসে রাগ করে কীসে রাগ করে না তা বুঝা খুব মুশকিল। এখন রাগ করে উঠে গেল।

রাগ করল কেন ?

একমাত্র সেই জানে কেন। হাসান সাহেব চা খান। আপনি এসেছেন আমি খুশি হয়েছি। সামনের মাসে সুমির বাবা আসবেন— তখন আপনাকে খবর দেব। আপনি এসে আমাদের সঙ্গে একবেলা ডালভাত খাবেন।

জ্বি আচ্ছা। আজ উঠি ?

একটু বসুন সুমিকে ডেকে নিয়ে আসি। ওকে হ্যালো বলে যান। জানি না সে আসবে কি না।

সুমি এল না। তবে সুমির মা প্রথমবারের মতো আর একটা ভদ্রতা করলেন। ড্রাইভারকে বললেন— হাসানকে গাড়িতে পৌঁছে দিতে। ড্রাইভার বিরক্ত হলো— গাড়িতে চড়ার যোগ্য নয় মানুষকে গাড়িতে চড়তে দেবার ব্যাপারে ড্রাইভারদের খুব অনাগ্রহ থাকে।

বাজছে মাত্র আটটা। এখন বাসায় ফিরে হবে কী ? ছাত্র অবস্থায় বাসায় ফেরার একটা তাড়া থাকে। বই নিয়ে বসতে হবে। এখন সেই তাড়া নেই। এম.এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দেখলে হয়। সাহসে কুলোচ্ছে না। তারপরেও মনে হয় দেয়া উচিত। তখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে তাকে বলা যাবে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষা করছি। কী করেন ? 'আমি কিছু করি না' বলা খুব কষ্টের।

ড্রাইভার বিরক্ত গলায় বলল, আপনে যাবেন কই ?

হাসান বলল, কোথাও যাব না। তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে নামিয়ে দিতে পার।

আপনার বাসা কোন দিকে ?

বাসা অনেক দূর। এতদূর আমাকে নিয়ে যাবার মতো ধৈর্য তোমার নেই— কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দাও।

ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল। হাসান নেমে গেল। ড্রাইভারের সঙ্গে সামান্য রসিকতা করলে কেমন হয় ? পকেট থেকে ছেঁড়া ন্যাতন্যাতে একটা এক টাকার নোট যদি ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলা হয়— এই নাও বকশিশ। ড্রাইভারের চোখমুখের ভাব কেমন হবে ? যত ইন্টারেস্টিংই হোক চোখমুখের ভাব দেখাটা ঠিক হবে না। বেকারদের অনেক কিছু নিষিদ্ধ। সেই অনেক কিছুর একটা হচ্ছে রসিকতা। বেকারদের কিছু ধর্ম আছে। তাদের সেই ধর্ম পালন করতে হয়। হাসানের স্কুল জীবনের বন্ধু জহিরের

মতে বেকার ধর্মের চারটি স্তম্ভ—

(১) কচ্ছপ বৃত্তি।

সব সময় কচ্ছপের মতো নিজেকে খোলসের ভেতর লুকিয়ে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে মাথা বের করে চারপাশ দেখে আবার টুক করে মাথা ঢুকিয়ে ফেলা।

(২) গণ্ডার বৃত্তি।

চামড়াটাকে গণ্ডারের চামড়ার মতো করে ফেলা। কোনো কিছুই যেন গায়ে না লাগে। গায়ে এসিড ঢেলে দিলেও ক্ষতি হবে না।

(৩) প্যাঁচা বৃত্তি।

কাজকর্ম সবই রাতে। গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রাত এগারটা থেকে বারটার দিকে যখন বেশিরভাগ মানুষ শুয়ে পড়ে।

(৪) কাক বৃত্তি।

কাকের মতো যেখানে যা পাওয়া যাবে তাই সোনামুখ করে খুঁটিয়ে খেয়ে ফেলা। কোনো অভিযোগ নেই।

বেকার ধর্মের চারটি স্তম্ভ যে মেনে চলে সে আদর্শ বেকার। তার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাও হবে না। হাসানের নিজের ধারণা সে একজন আদর্শ বেকার। আদর্শ বেকার রাত এগারটার আগে বাসায় ফেরে না। রাত এগারটা পর্যন্ত হাসানের করার কিছু নেই। জহিরের কাছে যাওয়া যায়। জহির থাকে আগামসি লেনের এক মেসে। রাত বারটার আগে তাকে পাওয়া যাবে না। বারটা পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করা যায়। অনেকদিন জহিরের সঙ্গে দেখা হয় না। জহিরের 'প্রোজেক্ট বাংলা হোটেলে' কিছু টাকা দিয়ে আসা যায়। গত কয়েক মাসে কোনো টাকা-পয়সা দেয়া হয় নি।

জহির নানান সময়ে নানান ধরনের স্বপ্ন দেখে। তার বর্তমান স্বপ্ন হলো— সাধারণ ডালভাতের হোটেল দেয়া। বিভূতিভুষণের আদর্শ হিন্দু হোটেলের মতো আদর্শ বাংলা হোটেল। সে হোটেলে আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, করলা ভাজি, ডালের চচ্চড়ি টাইপ খাবার ছাড়া কোনো খাবার পাওয়া যাবে না। নতুন ধরনের এই হোটেল দেখতে দেখতে জমে যাবে। বন্যার স্রোতের মতো হু-হু করে টাকা আসতে থাকবে।

বুঝলি হাসান ফালতু চাইনিজ খেতে খেতে আমাদের মুখ পচে গেছে। চাইনিজদের মতো নাকও খানিকটা ডেবে গেছে। আগে বাঙালি জাতির যে খাড়া নাক ছিল এখন নেই। আমাদের নতুন ধরনের খাবার, নতুন ব্যবস্থা— লোকজন পাগলের মতো হয়ে যাবে। ভাত খাবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

নতুন ব্যবস্থাটা কী?

পাটি পেতে খাবার ব্যবস্থা। আয়েশি ব্যবস্থা। পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে খাবে।

প্যান্ট পরে তো পাটিতে বসতেই পারবে না।

যারা বসতে পারবে না তারা খাবে না। আমাদের হোটেল এমন হবে যারা আসবে তারা তৈরি হয়েই আসবে।

জহির আদর্শ বাংলা হোটেল ফান্ড খুলেছে। ফান্ড চালু হয়েছে এক বছরের মতো। প্রতি মাসেই রোজগারের একটা অংশ হাসানের সেই ফান্ডে দেবার কথা। গত তিন মাস কিছু দেয়া হয় নি। ফান্ডে দেবার মতো রোজগারই হয় না— দেবে কী ? আজ কিছু টাকা আছে জহিরকে দিয়ে এলে সে খুশি হবে। হাতে টাকা বেশিদিন থাকবে না। দিতে হলে এখনই দিয়ে আসা দরকার।

জহিরকে পাওয়া না গেলে সে যাবে লিটনের খোঁজে। লিটন বেচারা খুব খারাপ অবস্থায় আছে। তাকে কিছু টাকা দিয়ে আসবে। সে নিতে চাইবে না। জোর করে দিতে হবে। তার চাকরি হচ্ছে না— ঠিক আছে। কিন্তু জহিরের মতো একটা ভালো ছেলের চাকরি হবে না এটা খুব কষ্টের।

হাসান আগামসি লেনের দিকে রওনা হলো। জহিরের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। হেঁটে হেঁটে যাওয়াই ভালো— সময় কাটবে। স্বাস্থ্যটাও ভালো থাকবে। বেকাররা ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় কারণ তাদের প্রচুর হাঁটতে হয়।

রাত বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও জহিরের দেখা পাওয়া গেল না। ইদানীং নাকি জহিরের ফেরার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কয়েক দিন রাত তিনটায় ফিরেছে। এত রাত পর্যন্ত সে বাইরে কী করে তাও কেউ বলতে পারছে না। আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। এত রাতে লিটনের খোঁজে যাওয়াও অর্থহীন। হাসান রাত একটায় বাড়ি ফিরে এল।

রীনা দরজা খুলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি কোথায় ছিলে ?

রীনার পাশে লায়লা। সেও কাঁদছে। বেশ শব্দ করেই কাঁদছে।

হাসান অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে ভাবি ?

তোমার ভাই তো মরতে বসেছিল।

মরতে বসেছিল মানে কী ?

রীনা কী হয়েছে বলার আগে বাচ্চা মেয়েদের মতো কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। হাসান হাত ধরে ভাবিকে চেয়ারে বসাল।

ঘটনা যা ঘটেছে তা ভয়াবহ তো বটেই।

ঘটনাটা এ রকম— তারেক অফিস থেকে ফিরে চা খেল। রীনা একবাটি মুড়ি ভেজে দিয়েছিল। সে মুড়ি খেল না। তার নাকি শরীরটা ভালো লাগছে না। রাত আটটার সময় হঠাৎ দেখা গেল তারেক শার্ট-প্যান্ট পরছে। রীনা অবাক হয়ে বলল, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ ?

তারেক বিরক্ত গলায় বলল, এত রাত কোথায় দেখলে রাত মোটে আটটা বাজে।

যাচ্ছ কোথায় ?

ফ্রিজ সারাইয়ের দোকানে যাব। ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে। গ্যাস ভরে দেবে।

রাত আটটার সময় যাবার দরকার কী ? দিনের বেলা যেও।

তারেক বিরক্ত গলায় বললেন, দিনের বেলা আমার অফিস থাকে। দিনের বেলা যাব কীভাবে ?

তাহলে থাক তোমাকে যেতে হবে না। ফ্রিজের দোকানের ঠিকানাটা দিও। হাসান যাবে।

সবকিছু নিয়ে হাসানকে ডাকার আমি কোনো কারণ দেখি না। ওদের সঙ্গে কথা হয়ে আছে— সামান্য ব্যাপার।

তুমি বলছিলে শরীরটা ভালো লাগছে না।

এখন ভালো লাগছে। দেখি এক গ্লাস পানি দাও।

রীনা পানি এনে দিল। তারেক সেই পানিতে এক চুমুক মাত্র দিল। তারপর গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। রীনা খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, যদিও অস্বস্তির তেমন কোনো কারণ নেই। রীনা বাচ্চাদের হোমওয়ার্ক শেষ করে তাদের খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

বাসায় তার শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই নেই। শাশুড়ির রাগ এখনো ভাঙে নি। রীনার শ্বশুর স্ত্রীর রাগ ভাঙানোর চেষ্টা হিসেবে গত তিন দিন হলো মেয়ের বাড়িতে আছেন। রীনা লায়লার সঙ্গে গল্প করতে গেল। প্রায় এক ঘণ্টার মতো গল্প করল। লায়লার সঙ্গে গল্প করার জন্যে কোনো বিষয়বস্তু লাগে না। যে-কোনো বিষয়ে গল্প শুরু করলে লায়লা কীভাবে কীভাবে সেই গল্প সাজগোজের দিকে নিয়ে আসে। আজ গল্প হলো ইটালিয়ান স্যান্ডেল নিয়ে। ইটালিয়ান ঘাসের স্যান্ডেল লায়লার এক বান্ধবীর বাবা মেয়ের জন্যে নিয়ে এসেছেন। লায়লা সেই স্যান্ডেল পায়ে পরে দেখেছে। তার সমস্ত হৃদয় এখন স্যান্ডেলে। তার কথা শুনে মনে হতে পারে সে তার সমগ্র পৃথিবী একজোড়া ঘাসের স্যান্ডেলের জন্যে দিয়ে দিতে পারে।

বুঝলে ভাবি স্যান্ডেল পায়ে দিয়েছি— মনে হচ্ছে স্যান্ডেল না, পায়ে খানিকটা মাখন মেখেছি। এত সফট আর কেমন ওম ওম ভাব।

ঢাকায় পাওয়া যায় না ?

পাগল হয়েছ ভাবি— এইসব জিনিস ঢাকায় কোথায় পাবে!

গুলশানের দোকানে নাকি অনেক বিদেশী স্যান্ডেল পাওয়া যায়।

পাওয়া গেলেও সব সেকেন্ড গ্রেড জিনিস পাওয়া যায়। গরিব দেশে ভালো ভালো জিনিস এনে লাভ কী ? কে কিনবে ? স্যান্ডেল জোড়ার দাম কত জান ?

কত ?

ইউএস ডলারে দু শ কুড়ি ডলার। ডিউটি-ফ্রি শপ থেকে কিনেছে বলে সস্তা পড়েছে। সাধারণ শপিংমল থেকে কিনলে— আড়াই শ ডলার মিনিমাম লাগত। আড়াই শ ডলার হচ্ছে বাংলাদেশী টাকার দশ হাজার টাকা। দশ হাজার টাকা দামের স্যান্ডেল। চিন্তা করা যায় ভাবি ?

চিন্তা করা যায় না। আমি যদি এই স্যান্ডেল পরি তাহলে আমার পায়ে ফোসকা পড়ে যাবে।

আমি একদিন স্যান্ডেলগুলো তোমাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে আসব। তুমি পায়ে পরে কিছুক্ষণ হাঁটলে তোমার কাছেই মনে হবে— দশ হাজার টাকা কোনো দামই না।

লায়লা ভাত খেতে গেল এগারটার দিকে। তারেক তখনো আসে নি। লায়লা বলল, ভাইয়া কোথায় গেছে ভাবি ?

ফ্রিজ সারাইয়ের দোকানে।

রাতদুপুরে ফ্রিজ সারাইয়ের দোকানে কেন ?

কী জানি কেন ? চলে আসবে।

আমার তো টেনশান লাগছে ভাবি। ঢাকা শহরের যে অবস্থা। আমার এক বান্ধবীর মামাকে হাইজ্যাকাররা পেটে ছুরি মেরেছে। নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়েছিল। আমি উনাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম।

রীনার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল।

ভাবি তুমি টেনশান করছ নাকি?

না।

তোমাকে দেখে মন হচ্ছে টেনশান করছ। প্লিজ টেনশান কোরো না। তোমাকে গল্পটা বলাই ঠিক হয় নি।

রাত এগারটার পর থেকে রীনা বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। বাসার সামনে রিকশা বা বেবিট্যাক্সি থামলে চোখে পড়ে। ফ্রিজের দোকানে তারেকের এত সময় লাগার কথা না। রাত ন'টার ভেতর দোকান বন্ধ হয়ে যাবার কথা। সে এত দেরি করছে কেন? সত্যি সত্যি হাইজ্যাকারদের হাতে পড়লে ভয়াবহ অবস্থা হবে। ছুরি মেরে ফেলে রাখলেও কেউ আগাবে না। মানুষের বিপদে এখন আর মানুষ এগিয়ে আসে না। এই যুগের নীতি হচ্ছে বিপদগ্রস্থ মানুষের কাছে থেকে দূরে চলে যাওয়া। যে যত দূরে যাবে সে তত ভালো থাকবে। টেনশানে রীনার বুক ধকধক করা শুরু হলো। তার এই অসুখ ছোটবেলা থেকেই আছে। যত দিন যাচ্ছে অসুখ তত বাড়ছে। আগে শুধু বুক ধকধক করত। এখন শুধু যে বুক ধকধক করে তাই না— প্রচণ্ড ব্যথাও হয়। নিঃশ্বাস আটকে আটকে আসে। খুব শিগগিরই ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তারের কাছে যেতেও ভয় লাগে। রীনা নিশ্চিত জানে— ডাক্তারের কাছে যাওয়ামাত্রই ডাক্তার ইসিজি ফিসিজি করিয়ে একগাদা খরচ করাবে। তারপর বলবে— আপনার হার্টের অসুখ আছে। একটা আর্টারি ব্লক। এনজিওগ্রাম করাতে হবে। তারচে' বুকের ব্যথা সহ্য করা ভালো। এই ব্যথা বেশিক্ষণ থাকে না। টেনশান চলে যাওয়া মাত্র ব্যথাও চলে যায়।

ঠিক বারটার সময় বাসার সামনে এসে একটা বেবিট্যাক্সি থামল। হতভম্ব রীনা দেখল দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক বেবিট্যাক্সি থেকে ধরাধরি করে তারেককে নামাচ্ছে। তারেক ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না, মনে হচ্ছে মাথা এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সে কি মদ টদ খেয়ে এসেছে? গল্প-উপন্যাসে এ রকম বর্ণনাই তো থাকে। মাতাল স্বামীকে বন্ধুরা পৌঁছে দিতে আসে। দুদিক থেকে দুজন তাকে ধরে রাখে। রীনা দৌড়ে এসে দরজা খুলল। তারেক এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন রীনাকে চিনতে পারছে না। মোটাসোটা ধরনের অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন— আপা উনি কি এখানে থাকেন?

রীনা হতভম্ব গলায় বলল, ওর কী হয়েছে?

আমরাও বুঝতে পারছি না। রাস্তার মাঝখানে চুপচাপ বসে ছিলেন। বিড়বিড় করে কী বলছিলেন। তারপর ঠিক মাঝরাস্তায় বসে পড়লেন।

আপনারা এইসব কী বলছেন!

চিন্তা করবেন না আপা। শুরুতে উনি তার নাম, বাসার ঠিকানা কিছুই বলতে পারছিলেন না। শেষে বলেছেন। উনার কথামতোই আমরা এসেছি। একজন ডাক্তারের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললেন— কাউন্ড অব নার্ভাস ব্রেক ডাউন। ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন। রাতে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে বলেছেন।

রীনা অস্পষ্ট গলায় কী একটা বলল। কী বলল সে নিজেও বুঝতে পারল না। তারেক স্পষ্ট গলায় বলল, রীনা বাচ্চারা কি স্কুল থেকে ফিরেছে ?

এই হলো ঘটনা।

হাসান পুরো ঘটনা নিঃশব্দে শুনছে। রীনা ঘটনাটা খুব গুছিয়ে বললেও মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। রীনা যতবার কেঁদে উঠছে, লায়লাও তার সঙ্গে কেঁদে উঠছে।

ভাইজান এখন কী করছে ?

ঘুমাচ্ছে।

তুমি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছ ?

হুঁ।

তোমার সঙ্গে ভাইজানের কোনো কথা হয় নি ? তুমি জিজ্ঞেস কর নি ব্যাপার কী ?

জিজ্ঞেস করেছিলাম— কিছু বলে ন।

রাতে খাওয়াদাওয়া করেছে ?

রুটি বানিয়ে দিয়েছিলাম। একটা রুটি খেয়েছে।

তার মানিব্যাগ কি আছে না খোয়া গেছে ?

মানিব্যাগ আছে।

যে দুজন ভদ্রলোক নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন— তাদের ঠিকানা কি রেখেছ ?

না, ঠিকানা জিজ্ঞেস করার কথা মনেও হয় নি। আমি তাদের থ্যাংকস পর্যন্ত দেই নি। মাথা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। আমার এখন এত খারাপ লাগছে।

খারাপ লাগার কিছু নেই ভাবি। এই জাতীয় কাজ যারা করে— তারা থ্যাংক-এর আশা করে না।

তোমার কি ধারণা তোমার ভাইজানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

ভাইজানের কিছু হয় নি। মানুষের মাথা খুব শক্ত। চট করে খারাপ হয় না। মাথার কোনো সমস্যা হলে বাসার ঠিকানা বলতে পারত না। কাল সকালে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

যদি ঠিক না হয় ?

অবশ্যই ঠিক হবে। ভাবি তুমি দয়া করে কাঁদা বন্ধ কর। ঘুমের ওষুধ তুমিও একটা খাও, খেয়ে ঘুমাতে যাও।

তারেক সারা রাত মরার মতো ঘুমাল। তার পাশে তার গায়ে হাত দিয়ে রীনা বসে রইল। একপলকের জন্যেও চোখ বন্ধ করল না।

সকালবেলা তারেক খুব স্বাভাবিকভাবে বিছানা থেকে নামল। রীনার চোখ তখন ধরে এসেছে। সে খাটে হেলান দিয়েছে, এই অবস্থাতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। চিন্তিত গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ ? তারেক বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাই মানে ! বাথরুমে যাই— আবার কোথায় যাব ?

তোমার শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে ?

শরীর খারাপ লাগবে কেন ?

রাতের প্রসঙ্গ টেনে আনা ঠিক হবে কিনা, রীনা বুঝতে পারছে না। মনে হয় ঠিক হবে না। সে খাটে বসে রইল। তারেকের বাথরুমে ঢোকার শব্দ, কল খোলার শব্দ, দাঁতে ব্রাশ ঘষার শব্দ সবই শুনল কান খাড়া করে। শব্দগুলোর ভেতর কি কোনো অস্বাভাবিকতা আছে ? ব্রাশ কি অন্যদিনের চেয়ে দ্রুত ঘষছে ? কলটা বন্ধ করছে না কেন ? পানি ছড়ছড় করে পড়েই যাচ্ছে। ব্রাশ ঘষার সময় কলটা বন্ধ করছে না কেন ? কলের পানি পড়েই যাচ্ছে। স্বাভাবিক একজন মানুষ তো এই সময় কলটা বন্ধ করবে।

তারেক বাথরুম থেকে বের হয়ে বলল, রীনা চা দিতে বল তো। চা খাব।

এটাও তো অস্বাভাবিক। তারেকের কোনো অস্বাভাবিক চা-প্রীতি নেই। বাসিমুখে কখনো চা খেতে চায় না। আজ চাচ্ছে কেন ? রীনা চিন্তিত মুখে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো। টগর এবং পলাশ দুজনেরই ঘুম ভেঙেছে। কমলার মা তাদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে কলঘরের দিকে। টগর বলল, মা আমি কিন্তু আজ স্কুলে যাব না। পলাশও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও যাব না।

অন্যদিন হলে রীনা কঠিন গলায় বলত, অবশ্যই স্কুলে যাবে। স্কুলে যাব না এইকথা যেন না শুনি। আজ রীনা বলল, আচ্ছা যেতে হবে না।

টগর এবং পলাশ বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা তাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে আনন্দের বিকট চিৎকার দিতেও ভুলে গেছে।

আজ তাদের স্কুলে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। স্কুলে নিয়ে যাবার মানুষ নেই। হাসানকে পাঠানো যায়। রীনা তা করতে রাজি না। তারেককে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। সে একা যাবে না, হাসানকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। শ্বশুর-শাশুড়িকেও বাসায় নিয়ে আসতে হবে। মাথার ওপর মুরুব্বি কেউ থাকলে ভরসা থাকে। যে-কোনো দুশ্চিন্তার ভাগ মুরুব্বিরা নিয়ে দুশ্চিন্তা হালকা করে ফেলেন। কাল তাঁর শাশুড়ি বাসায় থাকলে তিনিও রীনার সঙ্গে সারা রাত জাগতেন।

তারেক চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, তোমার চোখমুখ এমন শুকনো কেনো, কী ব্যাপার ?

রীনা বলল, রাতে ঘুম হয় নি।

শোবার আগে আমার মতো গোসল করে শুবে তাহলে দেখবে ভালো ঘুম হবে।

রীনা ইতস্তত করে বলল, কাল রাতে তুমি ফ্রিজের দোকানে গিয়েছিলে ?

তারেক বলল, ফ্রিজের দোকানে যাব কেন ?

যাবে বলছিলে এই জন্যে জিজ্ঞেস করলাম।

তারেক চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। রীনা বুঝতে পারছে না, কাল রাতের প্রসঙ্গটা নিয়ে আরো কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা। মনে হয় ঠিক হবে না। রীনা বলল, এক কাজ কর, আজ তোমার অফিসে যাবার দরকার নেই।

তারেক বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। শুধু শুধু অফিস কামাই করব কেন ? খবরের কাগজ এসেছে কি না একটু দেখ তো। হকারটাকে বদলাতে হবে। ঠিক অফিসে যাবার আগে আগে কাগজ এনে দেয়। অফিসে যেতে হয় কাগজ না পড়ে।

তারেক খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নাশতা খেল, অফিসের জন্য তৈরি হতে লাগল। রীনা বলল, হাসান তোমার সঙ্গে যাবে।

আমার সঙ্গে কোথায় যাবে ?

মতিঝিলে ওর নাকি কী কাজ আছে। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে সে তার কাজে যাবে। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?

তারেক বিস্মিত হয়ে বলল, কী উদ্ভট কথা আমার আপত্তি থাকবে কেন ?

মতিঝিলে হাসানের কোনো কাজ নেই। সে ঠিক করে রেখেছে কাজ না থাকলেও সে আজ মতিঝিলেই ঘোরাফেরা করবে। দুপুরে কোনো সস্তা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে বিকেলে ভাইকে নিয়ে একসঙ্গে ফিরবে। ভাবি বেশি রকম চিন্তিত। যদিও সে চিন্তার তেমন কিছু দেখছে না।

হাসান ভাইকে নামিয়ে দিয়ে ঘুরতে বের হলো। বিশাল কর্মকাণ্ডের মতিঝিলের সঙ্গে তার যোগ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার। অঞ্চলটা কেমন গমগম করছে। কাজ ছাড়া হাঁটতেও ভালো লাগে। অপরিচিত এক ভদ্রলোক চোখ ইশারায় হাসানকে ডাকল। হাসান এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক গলা নিচু করে বললেন, ডলার কিনবেন ?

জ্বি না।

ডলার আছে ? বিক্রি করবেন ?

জ্বি না।

লোকটা উদাস হয়ে গেল। হাসান ভেবে পেল না তার চেহারায় ডলারের কেনাবেচার কোনো ছাপ কি আছে ? ছাপ না থাকলে শুধু শুধু তার সঙ্গে ডলার নিয়ে ভদ্রলোক কথা বলবেন কেন ? এরা অভিজ্ঞ ধরনের মানুষ। চোখ দেখে অনেক কিছু বলে ফেলে। এদের তো ভুল করার কথা না।

এক জায়গায় টেবিল-চেয়ার পেতে ফরম বিক্রি হচ্ছে। লোকজন লাইন দিয়ে ফরম কিনছে। হাসান কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। আমেরিকা যাবার ইমিগ্রেশন ফরম। দুদিন পর পর আমেরিকানরা একটা তাল বের করে, বাংলাদেশের কিছু লোকজন তাতে মোটামুটি ভালো ব্যবসা করে। ফরম বিক্রি হচ্ছে কুড়ি টাকায়। পুরোপুরি ফিলাপ করলে পঞ্চাশ টাকা।

ফরম যে বিক্রি করছে তার চোখেমুখে খুব সিরিয়াস ভাব। যেন ফরম ফিলাপ করামাত্র আমেরিকান ভিসা সে দিয়ে দেবে। সমানে বেনসন সিগারেট টেনে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ব্যবসা তার ভালোই হচ্ছে।

হাসান লাইনে দাঁড়িয়ে ফরম কিনল। সময় কাটানো দিয়ে হচ্ছে কথা। লম্বা লাইনে দাঁড়ানোয় কিছু সময় কেটে গেল। লাইনে দাঁড়ানো নিয়েও সমস্যা। একজন আগে ঢুকে পড়েছিল তাকে বের করে দেয়া হলো। সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে শাসাচ্ছে। ভালো যন্ত্রণা।

আরেক জায়গায় বিক্রি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড যাবার ফরম। এই ফরমের দামও বেশি। এদের পোজপাজও বেশি। ফরমের দাম দু শ টাকা। দাম বেশি বলেই কোনো লাইন নেই। বেকারদের পকেটে দু'শ টাকা থাকে না। যে ফরম বিক্রি করছে তার পেছনে নিউজিল্যান্ডের ছবি। নীল পাহাড়, পাহাড় মনে হচ্ছে লেকের পানি ফুঁড়ে বের হয়ে এসেছে। পালতোলা নৌকায় তরুণ-তরুণী। তরুণী যে পোশাক পরে আছে তাতে তাকে

নগ্নই বলা যায়। যারা নিউজিল্যান্ডের ফরম কিনবে তারা অবশ্যই মেয়েটির কথা মনে রাখবে।

ভাই আপনি কি ফরম কিনবেন ?

জ্বি না।

তাহলে শুধু শুধু ভিড় করবেন না।

ভিড় তো করছি না আপনার এখানে তো লোকই নেই।

হাসান চলে এল। বিমান অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর ঢুকে গেল অফিসে। এখানেও প্রচণ্ড ভিড়। এই ভিড়ের জাত আলাদা। যারা ভিড় করে আছে তাদের চোখ অনেক উজ্জ্বল। সেই চোখে স্বপ্নের ছায়া।

দুপুরে হাসান এক ছাপড়া হোটেলে খেতে গেল। ছাপড়া হোটেল হলেও কায়দাকানুন আছে। মিনারেল ওয়াটারের বোতল আছে। যারা খাচ্ছে তারাও শার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক। হোটেলের মালিককে গিয়ে হাসান জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা ভাই সাহেব, বড় বড় হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার কি আছে ? কাস্টমারদের না খাওয়া খাবার জমা করে পরে বিক্রি করে সেই জাতীয় কিছু ?

হোটেলের মালিক চোখমুখ কুঁচকে বলল, দুই নম্বরী কোনো কিছু এইখানে পাবেন না।

কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারবেন ? একটু খাওয়ার শখ ছিল।

জানি না। আমাদের সব টাটকা ব্যবস্থা। বাসির কারবার নাই। খেতে চাইলে হাত ধুয়ে আসেন।

চারটার পর হাসান তার ভাইয়ের অফিসে উপস্থিত হলো। সে ভেবেছিল তারেক তাকে দেখে খুব বিরক্ত হবে।

তারেক বিরক্ত হলো না, অবাকও হলো না। হাসানই বরং বিব্রত গলায় বলল, মতিঝিলের দিকে এসেছিলাম ভাইয়া, ভাবলাম দেখি তোমার ছুটি হয়েছে কি না। ছুটি হলে একসঙ্গে বাসায় ফিরব।

তারেক বলল, চল যাই। এখন বেবিট্যাক্সি-রিকশা কিছুই পাওয়া যাবে না। হাঁটতে হবে। আমার হাঁটতে ভালোই লাগে। এক্সারসাইজ হয়। ফোর্স সেভিংসের মতো— ফোর্স এক্সারসাইজ।

রাস্তায় নেমে তারেক নিচু গলায় বলল, তোকে একটা কথা বলি তোর ভাবি যেন না জানে। তোর ভাবি জানলে দুশ্চিন্তা করবে।

কথাটা কী ?

মাঝে মাঝে আমার মেমোরি লসের মতো হয়। খুবই অল্প সময়ের জন্যে হয়— কিন্তু হয়।

ব্যাপারটা বুঝলাম না।

এই যেমন ধর অফিস থেকে বাসায় ফিরছি। হঠাৎ মনে হয় কিছু চিনতে পারছি না। আমি কোথায় যাচ্ছি— বাসা কোথায় কিছুই মনে করতে পারি না। খুব অল্প সময়ের জন্যে হয়— কিন্তু যখন হয় তখন খুব ভয় লাগে।

ভয় লাগারই তো কথা।

একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

চল আজই চল।

আজ না— যাব একদিন। তোর ভাবিকে কিছু বলিস না— দুশ্চিন্তা করা হলো তার নেচার।

তোমার মেমোরি লসের ব্যাপারটা শেষ কবে হয়েছে ভাইয়া?

তারেক জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন যেন উসখুস করছে। চারদিকে তাকাচ্ছে। হাসান শঙ্কিত গলায় বলল, কী হয়েছে?

তারেক বলল, কিছু হয় নি। চা খাবি?

চা?

চল নিরিবিলিতে কোথাও বসে চা খাই।

অফিস ছুটির সময় নিরিবিলি কোথায় পাওয়া যাবে? চায়ের দোকানগুলোতে রাজ্যের ভিড়। এর মধ্যেই আকবরিয়া রেস্টুরেন্টের একটা কেবিন হাসান যোগাড় করল। শিক কাবাব তৈরি হচ্ছে, তার ধোঁয়ার সবটাই সরাসরি কেবিনে ঢুকে যাচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে।

চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে ভাইয়া? শিক কাবাব?

খাওয়া যায়।

শিক কাবাব চলে এসেছে। নোংরা একটা বাটিতে খানিকটা সালাদ। অন্য একটা বাটিতে হলুদ বর্ণের কী একটা তরল পদার্থ। সম্ভবত টক জাতীয় কিছু। তারেক বলল, তুই খাবি না?

না। তুমি খাও।

তারেক আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। মনে হয় সে দুপুরে কিছু খায় নি।

চা দিতে বলেছিস?

বলেছি। কাবাব কি তোমাকে আরেকটা দিতে বলব?

বল।

আরেকটা কাবাবের অর্ডার দিয়ে হাসান বসে আছে। সে তার ভাইয়ের ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছে না।

হাসান।

বল।

আমি আসলে বিরাট একটা সমস্যায় পড়েছি। কাউকে বলতেও পারছি না।

সমস্যাটা কী? চাকরি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা?

না চাকরি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা না। পারসোনাল।

বল আমাকে শুনি।

তোর কাছে সিগারেট আছে? দে তো একটা।

সিগারেট তো তুমি খাও না।

একদম যে খাই না তা না। মাঝেমধ্যে অফিসে এসে একটা-দুটা খুচরা কিনি।

তুমি বস আমি তোমাকে সিগারেট এনে দিচ্ছি। কী সিগারেট খাও।

বাংলা ফাইভ। আর শোন, যাচ্ছিস যখন তখন জর্দা দিয়ে একটা পানও নিয়ে আসিস।

হাসান সিগারেট-পান নিয়ে ফিরল। তারেক আনন্দিত গলায় বলল, এরা চা-টা খুব ভালো বানায়। মনে হয় আফিং টাফিং মেশায়— ভেরি গুড টেস্ট। এরপর থেকে অফিস ফেরতের সময় এদের এখানে এক কাপ করে চা খেতে হবে।

আরেক কাপ চা দিতে বলব?

বল।

নাও ভাইয়া সিগারেট ধরাও। এই নাও ম্যাচ।

হাসান লক্ষ করল তার ভাইয়া সিগারেট ধরাতে পারছে না। তার হাত কাঁপছে।

ভাইয়া।

হুঁ।

তোমার সমস্যাটা কী বল শুনি।

তেমন কোনো সমস্যা না। আবার তুচ্ছ করাও ঠিক না।

আমি তুচ্ছ করছি না, তুমি বল।

বলছি দাঁড়া সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে নেই। পান এনেছিস?

এনেছি।

জর্দা দিয়ে এনেছিস তো?

হ্যাঁ জর্দা দিয়েই এনেছি।

এই রেস্টুরেন্টটা মনে হচ্ছে খুব চালু। কাস্টমারে একেবারে গমগম করছে। ভাগ্যিস আমরা একটা ফাঁকা কেবিন পেয়েছিলাম।

ভাইয়া তোমার সমস্যার কথা বল।

আমাদের অফিসে একজন মহিলা কলিগ আছেন— নাম হচ্ছে গিয়ে লাবণী। বয়স অল্প— কুড়ি-একুশ হবে। গত বছর বি.এ. পাস করেছে পাসকোর্সে।

দেখতে কেমন?

আছে ভালোই। এভারেজ বাঙালি মেয়েরা যেমন থাকে।

আনমেরিড?

বিয়ে হয়েছিল হাসবেন্ড মারা গেছে। বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে— ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বিয়ে হয়। প্রেমের বিয়ে। হাসবেন্ড মারা যায় বিয়ের দু বছরের মধ্যে। সে আরিচা থেকে ফিরছিল। রাস্তায় একটা কুকুর দাঁড়িয়েছিল। কুকুরকে সাইড দিতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টটা হয়।

ও আচ্ছা।

লাবণীর একটা মেয়ে আছে। খুবই সুইট চেহারা। মেয়েটার নাম কেয়া। লাবণীর হাসবেন্ডই শখ করে নাম রেখেছিল। কেয়া এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। কলাবাগানে ওমেন ফেডারেশনের একটা স্কুলে। খুব ভালো ছাত্রী। প্রতি বছর ফার্স্ট হচ্ছে। গান জানে, নাচ

জানে, টেলিভিশনে 'নতুন কুঁড়ি'-তে গিয়েছিল। টিকতে পারে নি। ওইসব জায়গায় সবই তো ধরাধরির ব্যাপার। লাবণীর ধরাধরি করার কেউ নেই।

সমস্যার ব্যাপারটা বল।

না মানে হয়েছে কী, একদিন অফিসে কাজ করছি লাবণী এসে খুব লজ্জিত গলায় বলল, সে ক্যান্টিনে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে চায়। আমি একটু অবাক হলাম, তবে এর মধ্যে দোষের কিছু দেখলাম না। চা খেতে গেলাম। সেইখানেই লাবণী বলল যে আমার চেহারা স্বভাব চরিত্র সব নাকি তার হাসবেন্ডের মতো।

তাই নাকি ?

লাবণী তার হাসবেন্ডের একটা সাদাকালো ছবিও নিয়ে এসেছিল। মিল কিছুটা আছে। তবে সে যতটা বলছে ততটা না। তবে মেয়ে মানুষ তো বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখে।

লাবণী কি তোমাকে প্রায়ই ক্যান্টিনে নিয়ে চা খাওয়াচ্ছে ?

আরে না। ও সেই রকম মেয়েই না।

তোমার কামরায় প্রায়ই আসে ?

এক অফিসে কাজ করছি। আসবে না ? ধর আমি একটা চিঠি টাইপ করতে দিলাম— চিঠি নিয়ে তাকে তো আসতেই হবে।

সমস্যাটা কোথায় ?

তারেক বলল, না সমস্যা আবার কী ? সমস্যা কিছু না।

তুমি যে বললে তুমি একটা সমস্যায় পড়েছ।

লাবণীকে দেখে খারাপ লাগে— এই আর কী ? দুঃখী মেয়ে। একে তো রূপবতী মেয়ে, তার ওপর অল্প বয়স, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিধবা টাইটেল। এই তিন সাইনবোর্ডের মেয়ে আমাদের দেশে টিকতে পারে না। লাবণী থাকে তার বড় বোনের সঙ্গে। বেশ ভালোই ছিল। ইদানীং সমস্যা হচ্ছে। বড় বোনের হাসবেন্ডের ভাবভঙ্গি সুবিধার মনে হচ্ছে না। গত সপ্তাহে ওই হারামজাদা রাত তিনটার সময় লাবণীর দরজায় টোকা দিয়েছে। লাবণী দরজা খুলে হতভম্ব। লাবণী বলল, দুলাভাই কী ব্যাপার ? হারামজাদাটা বলে কী— মাথা ধরেছে, তোমার কাছে ঘুমের ট্যাবলেট আছে ? লাবণী কি তার ঘরে ফার্মেসি দিয়েছে যে তার কাছে ঘুমের ট্যাবলেট খুঁজতে হবে ?

এইসব গল্প কি লাবণী তোমার সঙ্গে করেছে ?

হাঁ। দুঃখের কথা ঘনিষ্ঠ দু-এক জনের কাছে বললে মনটা হালকা হয়।

তুমি কি তার ঘনিষ্ঠজন ?

তারেক জবাব দিল না। পান মুখে দিল। হাসান বলল, ভাইয়া তুমি কি প্রায়ই লাবণীদের বাসায় যাও ?

তারেক বলল, আরে না। প্রায়ই যাব কী ! মাঝেমধ্যে যাই। কেয়ার জন্মদিন হলো। জন্মদিনে গেলাম। সেও গত সপ্তাহে। এই সপ্তাহে এখনো যাই নি।

হাসান বলল, ভাইয়া চল উঠি।

তারেক উঠে দাঁড়াল।

হাসান বলল, ভাইয়া একটা কথার জবাব দাও তো। তুমি কি লাবণী মেয়েটার প্রেমে পড়েছ ?

তারেক জবাব দিল না। ভাইয়ের চোখের দিকে সরাসরি তাকালও না। তবে তার মুখে এক ধরনের শান্তি শান্তি ভাব দেখা গেল। যেন ভাইকে ব্যাপারটা বলতে পেরে সে শান্তি পেয়েছে।

তারেকের অফিসে যাবার পর থেকে রীনার মন উতলা হয়ে ছিল। বাড়িওয়ালার বাসা থেকে সে অফিসে একবার টেলিফোনও করেছিল। তারেকের সঙ্গে কথা হয়েছে তাতেও রীনার উতলা ভাব দূর হয় নি। দুপুরে সে তার শাশুড়িকে নিয়ে এল। রীনার শাশুড়ি এতদিন রাগ করে তার বড় মেয়ের বাসায় ছিলেন। কঠিন রাগ অনেক চেষ্টা করেও ভাঙানো যাচ্ছিল না। আজ তারেকের ঘটনা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন। তিনি বাসায় পা দেয়ামাত্র রীনার মনে হয়েছে— আর ভয় নেই। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

মনোয়ারা তসবি টিপতে টিপতে রীনার কাছে পুরো ঘটনা দু'বার শুনলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, বউমা কোনো চিন্তা করবে না। একটা মুরগি ছদকা দিয়ে দাও। আর শোন— সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হতে দেবে না। যা কাজকর্ম দিনে করবে। সন্ধ্যার পর সংসার দেখবে। চিরকালের নিয়ম। রীনা বলল, মা আপনি একটু বলে দেবেন।

মনোয়ারা বললেন, আমি তো বলবই। বিয়ের পর মার কথার ধার থাকে না। তার ওপর আমি হলাম পরগাছা মা। ছেলের রক্ত চুষে বেঁচে আছি। আমার কথার দাম কী। তুমি বলবে। শক্ত করে বলবে।

জ্বি আচ্ছা।

বিবাহিত ছেলে সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে থাকবে এটা কেমন কথা!

শাশুড়ির কথা রীনার এত ভালো লাগল। তার মনের সমস্ত চিন্তাভাবনা এক কথায় উড়ে গেল। বিকেলে আরো আনন্দের ব্যাপার হলো। রকিব একগাদা উপহার নিয়ে বাসায় উপস্থিত। পলাশ এবং টগরের জন্যে দুটা ফুটবল। তার জন্যে কালির কলম। লায়লার জন্যে ঘড়ি। রীনার কাছ থেকে ধার করা টকাটাও ফেরত দিল। রীনা হতভম্ব গলায় বলল, তুমি এত টাকা পেলে কোথায় ?

রকিব বলল, কিছুদিন ধরে একটা ফার্মের সঙ্গে থেকে একটা পার্টটাইম চাকরি করেছি। ওরা থোক কিছু টাকা দিয়েছে।

কত টাকা ?

সেটা তোমাকে বলব না। ভাবি শোন আজ রাতে ভালোমন্দ কিছু রান্না কর তো। পোলাও-কোরমা-রোস্ট। আমি বাজার করে নিয়ে আসছি।

সন্ধ্যা হয়েছে।

বাচ্চারা ফুটবল নিয়ে খেলছে। তাদের চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। রকিব গিয়েছে বাজার করতে। তারেক ও হাসান দুজনই ফিরেছে। আশ্চর্য কাণ্ড— তারেক তার জন্য একটা শাড়ি কিনে এনেছে। আহামরি কিছু না— সবুজ জমিন লাল পাড়। তবুও তো সে কিনল। এই প্রথম তারেক তার জন্যে শাড়ি কিনল।

তারেক গম্ভীর গলায় বলল, শাড়িটা পর দেখি।

রীনা লজ্জিত গলায় বলল, হঠাৎ শাড়ি কেন ?

আনলাম আর কী ? সবুজ রঙ কি তোমার পছন্দ না ?

খুব পছন্দ।

রীনার লজ্জা লাগছে। আনন্দও লাগছে। তার চোখ ভিজে উঠছে। সে বুঝতে পারছে না এত সুখী আল্লাহ তাকে কেন বানিয়েছেন!

৯

বিবাহিত পুরুষ সন্ধ্যার পর ঘরে থাকবে। সন্ধ্যায় সে ঘরে ফিরবে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সময় কাটাবে। মনোয়ারার এই কথাগুলো রীনার খুব মনে ধরলেও সে জানে এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। পুরুষমানুষ মানেই— একটা অংশ ঘরের বাইরে। ভালো না লাগলেও এটা স্বীকার করে নিতে হবে। রীনা স্বীকার করে নিয়েছে।

তারেককে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জামাকাপড় পরতে দেখেও চুপ করে রইল। তারেক বলল, দেখি একটা চিরুনি দাও তো চুলটা আঁচড়াই। রীনা চিরুনি এনে দিল এবং হঠাৎ লজ্জিত মুখে বলল, মাথাটা নিচু কর— চুল আঁচড়ে দেই। বিয়ের পর অনেক দিন রীনা তারেকের চুল আঁচড়ে দিয়েছে। তারপর এক সময় সংসারে টগর-পলাশ এলো— রীনা ব্যস্ত হয়ে পড়ল সংসার নিয়ে। অফিসে যাবার সময় স্বামীর চুল আঁচড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়াটা ঠিক হয় নি। তার অবশ্যই উচিত ছিল স্বামীর জন্যে কিছুটা সময় আলাদা করে রাখা। রাখলে তারেকের বাইরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসটা নিশ্চয়ই কিছু কমত।

তোমার চুল খুব লম্বা হয়েছে। চুল কাটাও না কেন ?

কাটাব।

সন্ধ্যাবেলা যাচ্ছ কোথায় ?

তারেক বলল, নাপিতের কাছে যাব। চুল কাটাব। চুল লম্বা হয়ে কানে লাগছে— অসহ্য।

রীনার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারেক মিথ্যা কথা বলছে। সন্ধ্যাবেলা সে নাপিতের কাছে চুল কাটাতে যাচ্ছে না। চুল কাটার প্রসঙ্গ উঠছে বলেই সে ফট করে বলল চুল কাটাতে যাচ্ছি। মানুষটা গুছিয়ে মিথ্যা কথাও বলতে পারে না। বেচারা।

তারেক বলল, জুতার ব্রাশটা দাও তো জুতাজোড়া কালি করি।

রীনা নিজেই জুতা কালি করতে বসল। তারেক মোজা পায়ে অপেক্ষা করছে। রীনার কেমন যেন মায়া লাগছে। এই মায়ার উৎস সে জানে না। রীনা বলল, সেজেগুজে নাপিতের কাছে চুল কাটাতে যাচ্ছ ?

তারেক বলল, সাজের কী দেখলে ? জুতা ময়লা হয়েছিল।

ফিরতে দেরি হবে ?

দেরি হবে কেন ? চুল কাটাতে যতক্ষণ লাগে।

রীনার মনে হলো সে শুধু শুধুই সন্দেহ করছিল। বেচারা আসলে চুল কাটাতেই যাচ্ছে। সরল ধরনের মানুষের কর্মকাণ্ডও সরল প্রকৃতির হয়। নাপিতের দোকানে যে জুতা ব্রাশ করে যাবার দরকার নেই তা মনে থাকে না।

তারেক চলে যাবার পর রীনার নিজেকে খুব একলা মনে হতে লাগল। সবাই কাজকর্ম করছে শুধু তার কিছু করার নেই। টগর-পলাশ তার দাদুভাইয়ের সঙ্গে পড়তে বসেছে। তার শাশুড়ি বসেছেন জায়নামাজে। ন'টার আগে তিনি উঠবেন না।

লায়লা পড়ছে। তার পড়া বাচ্চাদের মতো। শব্দ করে সে পড়া মুখস্থ করে।

হাসান আজ বের হয় নি। ঘরে আছে। তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা যায়। রীনার ইচ্ছা করছে না। মাকে চিঠি লিখবে। অনেকদিন মাকে চিঠি লেখা হয় না। রকিবের দেয়া কলমটায় এখনো কিছু লেখা হয় নি। রীনার মনে হলো প্রথম চিঠিটা মাকে না লিখে তারেককে লিখলে কেমন হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার সে তার স্বামীকে এখন পর্যন্ত কোনো চিঠি লেখে নি। চিঠি লেখার প্রয়োজন হয় নি। বিয়ের আগে তাদের পরিচয় ছিল না যে চিঠি লেখালেখি হবে। বিয়ের পর থেকে তো তারা একসঙ্গে আছে। চিঠি লেখার দরকার কী ? আজ একটা চিঠি লিখে ফেললে কেমন হয় ? রীনা কাগজের খোঁজে লায়লার ঘরে ঢুকল। লায়লা সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ করে হাসিমুখে তাকাল।

এক টুকরা কাগজ দিতে পারবে লায়লা ?

হ্যাঁ পারব। ভাবি তোমাকে আজ এমন দুঃখী দুঃখী লাগছে কেন ?

দুঃখী দুঃখী লাগছে ?

খুব দুঃখী দুঃখী লাগছে। বোস, বল তোমার কী দুঃখ ?

আমার কোনো দুঃখ নেই লায়লা।

সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি। তোমার মনে কি কোনো দুঃখ আছে ?

হুঁ।

কী দুঃখ ?

বলা যাবে না, বললে তুমি হাসবে।

মানুষের দুঃখ শুনে আমি হাসব। আমি কি এতই খারাপ ?

লায়লা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার দুঃখ খুবই হাস্যকর। আমার সব সময় মনে হয় আমার বিয়েটিয়ে হবে না।

বিয়ে হবে না কেন ?

চেহারা ভালো না। রঙেও ময়লা।

তোমার চেহারা ভালো না কে বলল ? আর শ্যামলা মেয়েদের বুঝি বিয়ে হয় না ? সবচে' ভালো বিয়ে হয় শ্যামলা মেয়েদের এটা কি তুমি জান ?

না জানি না। সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি। তোমার বিয়ে নিয়ে তুমি কোনো দুশ্চিন্তা করো না তো লায়লা। যথাসময়ে বিয়ে হবে।

আমার বিয়ে নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না। কোনো সম্বন্ধ আসে না। তোমরাও তো কখনো কিছু বল না।

তোমার সামনে বলি না। তবে আড়ালে সব সময় বলি। অনেক ছেলে দেখাও হয়েছে।

সত্যি ভাবি ?

অবশ্যই সত্যি। দেখি এখন আমাকে একটা কাগজ দাও।

লায়লা কাগজ দিতে দিতে লজ্জিত গলায় বলল, ভাবি নিজের বিয়ে নিয়ে এতগুলো কথা বললাম, আমার এখন খুব লজ্জা লাগছে।

লজ্জার কিছু নেই। তুমি পড়াশোনা কর।

লায়লা সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করতে শুরু করল। লায়লার জন্যে রীনার খুব মায়া লাগছে। তার বিয়ে নিয়ে আসলেই কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। হওয়া উচিত। রীনা নিজের ঘরে ঢুকে চিঠি লিখতে বসল। সে দীর্ঘ সময় নিয়ে তার স্বামীকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখল। সে চিঠি পড়ে নিজেই খুব লজ্জা পেল। চিঠিটা ড্রয়ারের অনেক নিচে লুকিয়ে রাখল। আজই চিঠি দিতে হবে এমন না। কোনো এক সময় দিলেই হবে। রীনা বারান্দায় এসে বসল। তার একা ভাবটা কাটছে না।

হাসানের ঘর বন্ধ। সে বিছানায় উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে। তিতলীর কাছে চিঠি। তেমন এগোচ্ছে না। 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এ ছাড়া তিতলীকে তার লেখার কিছু নেই। সে কোনো বড় লেখক বা কবি হলে এই বাক্যটি ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে দীর্ঘচিঠি লিখতে পারত। লেখালেখির হাত তার একবারেই নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি ছাড়া তিতলীকে তার আর কী লেখার আছে ? 'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে'— হ্যাঁ এই বাক্যটাও লেখা যায়। তিতলীকে তার সবসময় দেখতে ইচ্ছা করে। বিয়ের পরেও কি এই ইচ্ছাটা থাকবে ? নাকি প্রেমে ভাটা পড়বে ? দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখমুখ শক্ত করে ঝগড়া করবে ? হাসান লিখল,

তিতলী

তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।

হাতের লেখাটা ভালো হলো না। অক্ষরগুলো কেমন জড়িয়ে গেছে। তার হাতের লেখা ভালো না। তিতলীর হাতের লেখা অপূর্ব। গোটা গোটা অক্ষর। জড়ানো না, পেঁচানো না। প্রতিটা অক্ষর আলাদা। প্রতিটি শব্দ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

দরজায় টক টক শব্দ হলো। হাসান ভুরু কুঁচকে তাকাল। যতক্ষণ দরজা খোলা থাকে কেউ আসে না। দরজা বন্ধ করামাত্র দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। সে কাগজ-কলম নিয়ে বসার পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনবার উঠে দরজা খুলতে হয়েছে। এবারেরটা নিয়ে হবে চতুর্থবার। অথচ মাত্র একটা লাইন লেখা হয়েছে।

কে ?

রীনা।

হাসান ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামল। রীনা ভাবির কিছু কিছু ব্যাপার আছে বেশ মজার। সবাই 'কে ?' প্রশ্নের জবাবে বলে আমি। একমাত্র রীনা ভাবিই 'কে?'-র উত্তরে বলবে— রীনা।

দরজা বন্ধ করে কী করছিলে ?

কিছু করছিলাম না। উপুড়পটাং হয়ে পড়েছিলাম।

উপুড়পটাং আবার কী ?

চিৎপটাং-এর উল্টোটা উপুড়পটাং।

চিঠি লিখছিলে ?

হুঁ।

তোমার সেই তিতলী বেগমকে ?

হুঁ।

মেয়েটাকে একদিন নিয়ে আসতে পার না ?

পারি।

একদিন নিয়ে এসো। জমিয়ে আড্ডা দেব।

আচ্ছা।

তোমার এই চিঠি কি এক্ষুণি লিখতে হবে, না কিছুক্ষণ পর লিখলেও হবে ?

পরে লিখলেও হবে।

আমি আসলে তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। বাচ্চারা পড়ছে। একা একা আমার দেখি কিছু ভালো লাগছে না।

গল্প কর— আমি শুনি।

রীনা খাটের এক মাথায় বসতে বসতে বলল, আমি কোনো গল্প করব না। আমার কাছে গল্প নেই। তুমি সারা শহর ঘুরে বেড়াও তুমি গল্প কর আমি শুনি।

হিশামুদ্দিন সাহেবের গল্প বলব ? তাঁর জীবন কাহিনী।

দূর দূর— তার জীবন কাহিনী শুনে কী হবে ? একটা লোক একগাদা টাকা করেছে বলেই তার জীবন কাহিনী শুনতে হবে ?

কমলার মা ট্রে নিয়ে ঢুকল। ট্রেতে দু কাপ চা। রীনা বলল, গল্প করার প্রস্তুতি দেখছ। কমলার মাকে বলেছি— আধঘণ্টা পর পর দু কাপ করে চা দিয়ে যেতে।

হাসান বলল, তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুমি আসলে গল্প শুনতে আস নি। কিছু বলতে এসেছ ? সেটা কী ?

তুমি কি মিসির আলি হয়ে গেছ ? ভাবভঙ্গি দেখে মনের কথা বলে ফেলছ। শুনুন মিসির আলি সাহেব— আমি গল্প শুনতেই এসেছি— কিছু বলতে আসি নি।

ভূতের গল্প শুনবে ভাবি ?

ভূতের গল্প শোনা যেতে পারে। তবে ঝড়বৃষ্টির রাত ছাড়া ভূতের গল্প জমে না। তুমি জমাতে পারবে তো ?

পারব। আমি যে কজনকে এই গল্প বলেছি তারা সবাই সেই রাতে ঘুমোতে পারে নি। গল্পটা ঠিক ভূতেরও না। একটা ফ্যামিলিতে দুটা কিশোরী মেয়ে খুন হয় তার গল্প।

বল শুনি।

দাঁড়াও একটা সিগারেট খেয়ে নি।

হাসান সিগারেট বের করল। রীনা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, গত কয়েকদিন ধরে তোমার ভাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার করছে— এর মানেটা কী বল তো।

অদ্ভুত ব্যাপারটা কী ?

যেমন ধর— পরশুদিন রাতে ঘুমোতে গেছি। বাতি নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকতেই সে বলল— লাবণী আমার মনে হয় মশারির ভেতর মশা আছে। বাতি জ্বালিয়ে মশাগুলো মেরে নাও।

হাসান তাকিয়ে আছে। ভাবির গল্প করতে আসার কারণটা এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

হাসান।

জ্বি ভাবি।

তোমার ভাইয়ের এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী ? মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে সে নিশ্চয়ই লাবণী নামের কোনো মেয়ের কথা ভাবছিল। মাথার মধ্যে সেই নামটা ঘুরছিল। ফস করে মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়েছে।

তুমি কিছু জিজ্ঞেস কর নি ?

না। আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই বাতি জ্বালিয়ে মশা মারলাম। তারপর বাথরুমে হাত ধুয়ে ঘুমোতে গেলাম। সারারাত আমার এক ফোঁটা ঘুম হলো না। তোমার ভাই অবশ্যি তার স্বভাবমতো কিছুক্ষণের মধ্যে নাক ডাকিয়ে ভস ভস করে ঘুমোতে শুরু করল।

সামান্য একটা কারণে তোমার সারারাত ঘুম হলো না ?

কারণটা তুমি যত সামান্য ভাবছ তত সামান্য না। আরো একবার এ রকম হয়েছে। আমাকে রীনা ডাকার বদলে লাবণী ডেকেছে।

সেটা কবে ?

সপ্তাহখানেক আগে। সকালে নাশতা খেতে বসেছে— হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, লাবণী দেখ তো খবরের কাগজ দিয়ে গেছে কিনা। আমি খবরের কাগজ এনে দিলাম। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

আর তুমি চিন্তায় অস্থির হলে ?

চিন্তায় অস্থির হওয়াটা কি অন্যায় ?

অবশ্যই অন্যায়। ভাইয়াকে তুমি চেন । চেন না ?

মানুষকে চেনা কি এতই সহজ ?

ভাইয়াকে চেনা খুবই সহজ। ভাইয়া হচ্ছে পানির মতো।

হাসান তুমি একটা ভুল উপমা দিলে। পানি মোটেই সহজ বস্তু না। পানি অতি জটিল। পানি একমাত্র দ্রব্য যা কঠিন হলে আয়তনে বাড়ে।

পানি আয়তনে বাড়লেও ভাইয়া বাড়ে না। ভাইয়া খুব সাধারণ সহজ সরল একজন মানুষ। লাবণী ফাবনী নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না তো ভাবি।

রীনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ওদের অফিসে লাবণী নামে একটা মেয়ে আছে। ওদের সঙ্গে কাজ করে। নতুন এসেছে।

হাসান হাসতে হাসতে বলল, ব্যাপারটা তো তাহলে আরো সহজ হয়ে গেল। ভাইয়া মেয়েটাকে চেনে। তার নামটা মনে আছে। সে হয়তো দেখতেও অনেকটা তোমার মতো। থুতু দেখে যক্ষ্মা ভেবে বসবে না ভাবি। মেয়েদের স্বভাব হচ্ছে থুতু দেখলে যক্ষ্মা ভাবে।

আর ছেলেদের স্বভাব কী? যক্ষ্মা দেখলে থুতু ভাবা?

আমার ভূতের গল্পটা কি তোমাকে এখন বলব?

বল।

তাহলে পা তুলে খাটে হেলান দিয়ে আরাম করে বস।

বসলাম।

তোমার মুখের চামড়া এখনো শক্ত আছে। রিলাক্স কর।

তুমি তোমার গল্প শুরু কর তো।

দাঁড়াও আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নি।

হাসান তুমি আজকাল বেশি সিগারেট খাচ্ছ। সিগারেটের গন্ধে তোমার ঘরে ঢোকা যায় না।

হাসান গল্প শুরু করল। সে লক্ষ করল রীনা মন দিয়ে কিছু শুনছে না। তাকিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু অন্য কিছু ভাবছে। অমনোযোগী শ্রোতাকে দীর্ঘ গল্প শোনানো খুবই কষ্টের ব্যাপার। হাসান বলল, গল্পটা কেমন লাগছে ভাবি?

ভালোই তো।

শেষ করব, না বাকিটা আরেকদিন শুনবে?

কেমন যেন মাথা ধরেছে। বাকিটা আরেক দিন শুনব। তুমি আজ বরং তোমার চিঠি শেষ কর।

ভাবি তোমার কি মন খারাপ?

না মন খারাপ না। কেমন যেন একা একা লাগছে।

ভাইয়া বাসায় নেই?

উঁহুঁ। নাপিতের কাছে চুল কাটাতে গেছে।

রাত দুপুরে চুল কাটাচ্ছে?

রীনা হালকা গলায় বলল, নাপিতের কথা বলে অন্য কোথাও যেতে পারে। আচ্ছা হাসান ছেলেরা ঘরের চেয়ে বাইরে থাকতে বেশি পছন্দ করে, কারণটা কী?

জানি না ভাবি।

আমি মনে মনে একটা কারণ খুঁজে বের করেছি। আমার ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন পশু শিকার করে বেঁচে থাকত তখন থেকেই ব্যাপারটা শুরু। পুরুষরা শিকারে বের হতো। মেয়েরা সন্তানের দেখশোনা করত। ওই যে পুরুষদের বাইরে থাকা অভ্যাস হয়ে গেল— সেই অভ্যাস আর যায় নি।

ভালো বলেছ তো ভাবি!

রীনা উঠে তার ঘরে চলে গেল। হাসান চিন্তিত মুখে বসে রইল। তিতলীর চিঠিটা শুরু করা দরকার। ঘোর কেটে গেছে। লিখতে ইচ্ছে করছে না।

তারেক বাসায় ফিরল রাত এগারটায়। তার হাতে দড়িবাঁধা মাঝারি সাইজের একটা কাতল মাছ। রীনা বলল, রাতদুপুরে মাছ আনলে কোত্থেকে?

আড়ঙের সামনে হাতে নিয়ে নিয়ে মাছ বিক্রি করে। ধানমণ্ডি লেকের মাছ। এক

ব্যাটা জোর করে গছিয়ে দিয়েছে। সস্তা পড়েছে— এক শ টাকা।

তুমি খেয়ে এসেছ ?

হুঁ।

কী দিয়ে খেলে ?

তারেক কাপড় ছাড়তে ছাড়াতে বলল, সাধারণ খাবার— ভাজাভুজি। তবে নতুন একটা জিনিস খেলাম কালিয়াজিরার ভর্তা। একটু তিতা তিতা তবে খেতে ভালো। কালিয়াজিরা ভর্তা দিয়ে এক প্লেট ভাত খেয়ে ফেলেছি।

লাবণীর কাছ থেকে রেসিপি নিয়ে এসো, আমি কালিয়াজিরা ভর্তা বানাব।

তারেক অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, আচ্ছা। বলেই চমকে গেল। রীনার কাছে সে বলে গেছে নাপিতের কাছে যাচ্ছে। সেখানে রীনা হুট করে লাবণীর প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছে এবং সেও স্বীকার করে ফেলেছে। তারেক অসহায় ভঙ্গিতে বলল, এক কাপ চা খাব রীনা।

রীনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, হাত মুখ ধোও চা নিয়ে আসছি।

চিনি দিও না। একটা বয়সের পরে চিনি ছেড়ে দেয়া দরকার।

আচ্ছা চিনি কমই দেব।

তারেক শোবার ঘরের চেয়ারে বসে আছে। বিছানায় টগর এবং পলাশ দুই ভাই জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। তারা ঘুমোয় দাদাদাদির সঙ্গে, আজ এখানে চলে এসেছে। ওদেরকে দাদির ঘরে পার করতে হবে। কাজটা করতে হবে খুব সাবধানে— একবার ঘুম ভেঙে গেলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে।

রীনা চা এনে তারেকের সামনে রাখল। টগরকে খুব সাবধানে কোলে নিয়ে রওনা হলো। তারেক বলল, হাসানের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে এসো তো। রীনা বলল, আচ্ছা।

তারেক চায়ে চুমুক দিচ্ছে। সে খুবই অসহায় বোধ করছে। রীনা যদি আবারো লাবণীর প্রসঙ্গ তোলে সে কী বলবে। হুট করে রীনা লাবণীর প্রসঙ্গ তুললই বা কেন ? হাসান কি তাকে কিছু বলেছে ? বলার তো কথা না।

এই নাও সিগারেট।

থ্যাংক য়্যু।

তুমি দেখি পুরোপুরি সিগারেট ধরে ফেলছ।

আরে না টেনশানের সময় দু-একটা খাই।

এখন কি তোমার টেনশানের সময় ?

কী যে বল টেনশানের কী আছে! তুমি কি ভাত খেয়েছ ?

না, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

ব্যাপারটা কী তোমাকে বলি—

কিছু বলতে হবে না।

আরে শোন না। বোস তো খাটে।

রীনা খাটে বসল। তারেক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল— আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার শামসুল কাদের সাহেবের গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। সাকসেসফুল

অপারেশন, হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দিয়েছে। বাসায় এসে আবার আগের মতো ব্যথা। ডাক্তার বলল ব্যথাটা সাইকোলজিক্যাল। ব্যথা হবার কোনো কারণ নেই। যাই হোক আমি দেখতে গেলাম, গিয়ে দেখি আমাদের অফিসের লাবণী। সেও দেখতে এসেছে। তার বাসা কাদের সাহেবের বাসার সামনে। রাস্তার এমাথা ওমাথা। ফেরার সময় লাবণী বলল, স্যার আমার বাসাটা দেখে যান। এমন ধরল না যাওয়াটা অভদ্রতা হয়। গেলাম। লাবণীর বাবা ছিলেন বাসায় তিনি না খাইয়ে ছাড়বেন না। এই হলো ঘটনা।

রীনা বলল, তোমার সিগারেট খাওয়া তো হয়েছে। চল শুয়ে পড়ি।

তারেক হাই তুলতে তুলতে বলল, চল। সে খুবই ভালো বোধ করছে। খুব গুছিয়ে সে সুন্দর একটা মিথ্যা গল্প ফেঁধেছে। গল্পটা বলেছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে। রীনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে গল্পটা বিশ্বাস করছে। মেয়েরা সত্যির চেয়ে মিথ্যাটাকে সহজে গ্রহণ করে।

রীনা।

হুঁ।

একটা পান দাও না। চা খেয়ে মুখটা মিষ্টি হয়ে আছে। ঘরে পান আছে না?

আছে।

রীনা পান আনতে গেল। তারেক বেশ আয়েশ করে পা নাচাচ্ছে। সে বেশ আনন্দিত। তাৎক্ষণিকভাবে জটিল একটা মিথ্যা তৈরির আনন্দ। রীনা এই গল্পটা বিশ্বাস করেছে জটিলতার কারণে। কারণ রীনা জানে তার ভেতরে কোনো জটিলতা নেই।

রীনা পান দিয়ে মশারির ভেতর ঢুকল। মশারি ভর্তি মশা। এত মশা ঢোকে কীভাবে কে জানে। মশারিতে কোনো ফুটা কি আছে? ফুটা তো চোখে পড়ছে না।

পান খাওয়া শেষ হলে বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে এসো।

আচ্ছা।

বাড়িওয়ালার টাকাটা তুমি এখনো দিচ্ছ না। উনি আজো এসেছিলেন।

দিয়ে দেব।

কবে দেবে সেটা পরিষ্কার করে বল, আমি সেই ভাবে তাকে বলব। রোজ আসেন, বিশ্রী লাগে।

সামনের সপ্তাহে দেব। শনি-রোববারে আসতে বলো।

আচ্ছা।

নাপিতের কাছে আর যাও নি না?

গিয়েছিলাম, এত ভিড়!

রীনা জেগে আছে। বিছানায় শোয়ামাত্র তার ঘুম আসে না। গভীর রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকে। আজ তার ঘুম একেবারেই আসবে না। তারেকের মতো একটা মানুষ কী করে জটিল একটা গল্প ফাঁদল এটা তার মাথাতেই আসছে না। খুব সহজ যে মানুষ, তার ভেতরেও কি জটিল একটা অংশ লুকিয়ে থাকে। ঠিক তেমনি ভয়াবহ জটিল মানুষের একটা অংশে কি থাকে শিশুর সারল্য? পুরোপুরি সহজ কিংবা পুরোপুরি জটিল মানুষ কি এই পৃথিবীতে হয় না?

তারেক বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম। সুখী মানুষের নিদ্রা। মানুষটা কি সত্যি সুখী ? একজন সুখী মানুষকে জটিল মিথ্যা গল্প বানাতে হয় না। জটিল সব গল্প অসুখী মানুষেরা তৈরি করেন।

রীনা সাবধানে খাট থেকে নামল। তার কেমন যেন গা জ্বালা করছে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থাকলে গা জ্বালা ভাবটা হয়তোবা কমবে।

হাসানের ঘরে বাতি জ্বলছে। সে মনে হয় চিঠি লিখছে। ভালবাসার চিঠি। রীনা তার এই জীবনে ভালোবাসার কোনো চিঠি পায় নি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কেউ তাকে কখনো বলে নি— আমি তোমাকে ভালোবাসি। তারেকও না। সোজা সরল মানুষরা ন্যাকামি ধরনের কথা বলে না।

১০

সোমবার তিতলীর তিনটা ক্লাস। তিনটাই পর পর। ন'টার মধ্যে শুরু হয়ে বারটার মধ্যে সব ক্লাস শেষ। ঝড়-বৃষ্টি-টর্নেডো যাই হোক না সোমবার বারটায় হাসান লালমাটিয়া কলেজের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে। এক জায়গায় থাকে না। একেক দিন একেক জায়গায়। তিতলীর দায়িত্ব হচ্ছে কলেজ থেকে বের হয়ে তাকে খুঁজে বের করা। একদিন সে হাসানকে পেয়েছে নাপিতের দোকানে মাথা মালিশ করাচ্ছে। কুৎসিত দৃশ্য। চোখ বন্ধ করে আয়েশ করে সে বসে আছে। নাপিত শব্দ করে মাথা বানাচ্ছে। তিতলী তার জীবনে এমন ভীতু কোনো ছেলে দেখে নি। তিতলীর ধারণা, হাসানের তুলনায় তার সাহস অনেক বেশি। যেমন— হাসান কখনো তাকে নিয়ে রিকশায় উঠবে না। কোথাও যেতে হলে বেবিট্যাক্সি নেবে। বেবিট্যাক্সির সিটের দু প্রান্তে দুজন বসে থাকলে নাকি বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। বেবিট্যাক্সিতে উঠেও শান্তি নেই— হাসান বলবে, তিতলী ওড়নাটা দিয়ে নাক আর মুখ ঢেকে রাখ। নাকমুখ ঢাকা থাকলে মানুষ চেনা যায় না। তোমার পরিচিত কেউ যদি তোমাকে দেখেও ফেলে চিনতে পারবে না।

চিনতে পারলে চিনবে। তোমাকে এত ভাবতে হবে না। তুমি সহজ হয়ে বস তো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে 'উইজার্ড অব ওজের' কাঠের পুতুল।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি হাসান কখনো তিতলীর হাত ধরে না। বেবিট্যাক্সিতে উঠে হাত ধরার কাজটা তিতলীকে করতে হয়। হাত ধরার পর হাসান বাইরের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন ভেতরে কী হলো সে জানে না।

ছেলেদের এত ভীতু হলে মানায় না। ছেলেরা হবে সাহসী, বেপরোয়া। তাদের দাবি থাকবে অনেক বেশি। মেয়েরা সেই সব দাবি সামলে সুমলে মোটামুটি একটা সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসবে। এটাই নিয়ম। যে ছেলের দাবি এক শ তাকে দেবে কুড়ি কিন্তু এমন ভাব করতে হবে যেন সত্তর দেয়া হয়ে গেল। হাসানের বেলায় সব নিয়ম উল্টো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তিতলীর অনেক সাহসী দাবি সে সামলে সুমলে চলছে।

ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হবার পর জানা গেল বাকি দুটা ক্লাস হবে না। ক্লাস না হওয়া সবসময়ই আনন্দজনক ব্যাপার। তিতলীর আনন্দ হচ্ছে না। কারণ, তাকে বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বারটার পর হাসানকে খুঁজে বের করতে হবে। এই দু ঘণ্টা সময় কী করা যায় ? কলেজ ক্যান্টিনে চা খাওয়া যায়। দশ মিনিট গেল সেখানে— তারপর ?

লাইব্রেরিতে যাবে ? অসম্ভব। লাইব্রেরিতে গেলেই তার মাথা ধরে যায়। সঙ্গে কোনো গল্পের বই নেই। গল্পের বই থাকলে কোনো একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে বসে গল্পের বই পড়া যেত।

তিতলী ক্যান্টিনের দিকে এগোচ্ছে। ক্যান্টিনে কাউকে পেলে তাকে নিয়ে আড়ঙ-এ চলে যাওয়া যায়। আড়ঙ-এ শাড়ি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা কেটে যাবে।

এই তিতলী!

তিতলী তাকাল— নাসরিন হাত ইশারা করে ডাকছে। তার তাকানো এবং হাত ইশারার ভঙ্গি সবই রহস্যময়। নববর্ষে নাসরিন খেতাব পেয়েছে সর্পিণী। নাসরিন লম্বা ও ছিপছিপে। সর্পিণী নাম তার জন্যে মানানসই। মাছ যেমন প্রতিবছর খোলস ছাড়ে নাসরিনও নাকি খোলস ছাড়ে। তবে তার জন্যে এক বছর অপেক্ষা করতে হয় না। পছন্দের কোনো মানুষ তাকে খোলস ছাড়তে বললেই নাকি সে ছাড়ে।

তিতলী অপ্রসন্নমুখে নাসরিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আশপাশে কেউ নেই। তবু নাসরিন গলা নামিয়ে বলল, তোর কাছে পঞ্চাশটা টাকা আছে ? সহজ স্বাভাবিকভাবে সে কোনো কথাই বলতে পারে না। তার সবকিছুতেই খানিকটা রহস্য।

না।

তাহলে ভালো একটা জিনিস মিস করলি। আমার কাছে পাঁচটা ছবি আছে। একেকটা ছবি দেখতে দশ টাকা করে লাগবে।

কী ছবি ?

কী ছবি বুঝতে পারছিস না ? ওইসব ছবি— হুঁ হুঁ।

ওইসব ছবি দেখার আমার কোনো শখ নেই।

না দেখেই বলে ফেললি ? ছবিগুলো সব টিভি স্টারদের। এদের কাণ্ডকারখানা দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে যাবি।

আমার মাথায় হাত দিয়ে বসার দরকার নেই। তুই ছবি দেখিয়ে টাকা নিচ্ছিস আশ্চর্য তো!

টাকা না নিলে হবে ? পাঁচটা ছবি আমাকে কি কেউ মাগনা দিয়েছে। নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। গলাকাটা ছবি না। একজনের মুখ কেটে আকেজনের শরীরে বসানো না। জেনুইন ছবি।

বুঝলি কী করে জেনুইন ছবি ?

যে দেখবে সেই বুঝবে জেনুইন ছবি। তুই দশ টাকা দিয়ে একটা ছবি দেখ। তারপর যদি তোর মনে হয় ছবি জেনুইন না, আমি টাকা ফেরত দেব।

কোনো দরকার নেই। ছবি দেখার পর তাদের নাটক দেখব তখন শরীর ঘিনঘিন করবে।

আচ্ছা যা তোর টাকা লাগবে না। তোকে বিনা টাকায় দেখাব। আমাকে চা আর আলুর চপ খাওয়া। দারুণ ক্ষিধে লেগেছে।

ক্যান্টিনে এখন ভিড় কম। টিফিন টাইমে বসার জায়গা থাকে না। আজ ফাঁকা

ফাঁকা। সর্পিণী তিতলীকে নিয়ে কোণার দিকে একটা টেবিলে চলে গেল। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে পাঁচটা ছবি বের করে তিতলীর হাতে দিল। ছবি হাতে নেবার পর তিতলীর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। সে ছবিগুলোর দিকে তাকাতেও পারছে না। আবার চোখ সরিয়েও নিতে পারছে না। নাসরিন পা নাচাতে নাচাতে শিস দিচ্ছে। শিস দেয়া বন্ধ করে সে তিতলীর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, এই জাতীয় ছবি তুই আগে দেখিস নি ?

না।

তোর দেখি শরীর কাঁপছে। ফোঁসফোঁসানি শুরু হয়ে গেছে। ছবিগুলো আমার কাছে দিয়ে নরমাল হ।

তিতলী ছবিগুলো দিয়ে দিল— নরম্যাল হওয়া বলতে যা বুঝায় তা হতে পারল না। এখনো তার হাতপা কাঁপছে। নাসরিন বলল, তোকে দেখে আমার ভয় লাগছে তুই বাথরুমে গিয়ে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে আয়। আমি চায়ের অর্ডার দিচ্ছি। হাতমুখ ধুয়ে এসে চা খা।

আমি চা খাব না। বাসায় চলে যাব।

ন্যাকামি করিস না তো। তোর ন্যাকামি অসহ্য লাগছে। বাসায় চলে যাবে ? তোর নায়ক বারটার সময় আসবে তখন কী হবে ?

প্লিজ চুপ কর।

ছবিগুলো আরেকবার দেখবি ?

না।

আচ্ছা তুই একটা কাজ কর একটা ছবি আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি। তুই নিয়ে যা।

কী আশ্চর্য কথা! আমি ছবি নিয়ে কী করব ?

তোর নায়ককে দেখাবি। এইসব ছবি দুজনে মিলে দেখার মধ্যে অনেক মজা। পাঁচটার মধ্যে কোনটা নিবি ?

কী অদ্ভুত কথা! আমি কোনোটা নেব না।

এক কাজ কর পাঁচটাই নিয়ে যা। রাতে দরজা-টরজা বন্ধ করে আরাম করে দেখ। কাল নিয়ে আসিস। ক্যান্টিনে বসে টেনশানে এইসব ছবি দেখে কোনো মজা পাওয়া যায় না।

এই নিয়ে আর কোনো কথা বলবি না তো নাসরিন। আমি তোর কাছে হাতজোড় করছি।

তিতলী উঠে দাঁড়াল। নাসরিন বিস্মিত গলায় বলল, তুই যাচ্ছিস কোথায় ? তোর না আমাকে চা আর আলুর চপ খাওয়ানোর কথা।

বাথরুমে যাচ্ছি। হাতমুখ ধোব।

সামান্য ছবি দেখে এত গরম হয়েছিস যে শীতল জলে হাতমুখ ধুয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে হবে ?

নাসরিন প্লিজ।

হাতমুখ ধুয়ে এসেও তিতলী ঠিক স্বাভাবিক হতে পারল না। মাথার ভেতরটা তার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নাসরিন চা আলুর চপ খেল। তিতলীর কাছ থেকে

দশটা টাকা নিয়ে চলে গেল। তার নাকি আজ বাসায় ফেরার রিকশা ভাড়া নেই।

তিতলী ক্যান্টিনেই বসে আছে। তার সময় কাটছে না। এখন বাজছে মাত্র দশটা চল্লিশ। চিঠি লিখতে শুরু করলে হয়। তাহলে কিছুটা সময় কাটে। তিতলী খাতা বের করল। চিঠি লেখার জন্যে সে পাঁচ শ পৃষ্ঠার একটা খাতা কিনেছে। না পাঁচ শ পৃষ্ঠা না। সে গুনে দেখেছে চার শ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা। তিতলী ঠিক করেছে সে চারশ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার একটা চিঠি লিখবে। যদি শেষ পর্যন্ত লিখতে পারে তাহলে তার চিঠিই হবে কোনো মেয়ের তার প্রেমিকের কাছে লেখা দীর্ঘতম প্রেমপত্র। মাত্র আঠার পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। সে একসঙ্গে বেশিক্ষণ লিখতে পারে না। তার শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে। ছবিগুলো দেখার পর আজ যেমন হয়েছিল, অবিকল সে রকম হয়।

তিতলী ঠিক করে রেখেছে চিঠি শেষ হবার পর হাসানকে সে খাতাটা দেবে তার জন্মদিনের উপহার হিসেবে। কদিন ধরে অবশ্যি অন্যরকম একটা পরিকল্পনা মাথার ভেতর ঘুরছে। এই খাতাটা বাসর রাতে হাসানের হাতে দিলে কেমন হয়? হাসান বিস্মিত হয়ে বলবে এই গাব্দুস খাতাটা কীসের? সে বলবে— পড়ে দেখ। এটা একটা চিঠি, চার শ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার চিঠি।

চার শ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার চিঠি! বল কী তুমি! কী লিখেছ?

পড়ে দেখ।

বাসর রাতে হাসান তার স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে চিঠি পড়বে তা মনে হয় না। শুকনা চিঠির চেয়ে রহস্যময়ী রমণী কি অনেক প্রিয় হবার কথা না?

তিতলী চিঠিটা লিখেছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। শুরু করেছে তাদের প্রথম দেখা হবার দিন থেকে। শুরুটা ভালোই। তিতলী খাতা বের করল। খাতার প্রথম পাতায় লেখা— বাংলা দ্বিতীয় পত্র। লালমাটিয়া কলেজ। যেন হঠাৎ কারো হাতে খাতাটা পড়লে সে কিছু বুঝতে না পারে। চিঠির শুরুতে কোনো সম্বোধনও নেই।

> *তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কবে দেখা হয়েছিল তোমার কি মনে আছে? আমি এক লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি তোমার মনে নেই। আমার কিন্তু সব মনে আছে। এমনিতে আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ। কিছু মনে থাকে না। এস.এস.সি. পরীক্ষার আগে ইংরেজি রচনা ঝাড়া মুখস্থ করেছিলাম—A Journey by boat. পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি এই রচনাটাই এসেছে। সবার আগে রচনা লিখতে বসলাম। দুটা লাইন লেখার পর সব ভুলে গেলাম। এই হলো আমার স্মৃতিশক্তির নমুনা। কিন্তু তোমার প্রতিটি ব্যাপার আমার মনে আছে। উয়ারীতে আমরা পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকতাম সেটা অবশ্যই তোমার মনে আছে। আচ্ছা তোমার কি মনে আছে শবেবরাতের হালুয়া নিয়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠছি তুমি নামছ? হঠাৎ কী হলো তুমি হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে আমার গায়ে পড়ে গেলে। তারপর দুজন গড়াতে গড়াতে একেবারে সিঁড়ির নিচে। পিরিচ ভেঙে তোমার ঠোঁট কেটে গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। সারা গা হালুয়া দিয়ে মাখামাখি। লজ্জায় তুমি মরে যাচ্ছিলে আমার দিকে*

চোখ তুলে তাকানো তো অনেক পরের কথা। আমি সিঁড়ির নিচে পড়েই রইলাম, তুমি রক্ত এবং হালুয়ায় মাখামাখি অবস্থাতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালে এবং দৌড়ে ফ্ল্যাটের বাইরে চলে গেলে। এই ঘটনা তোমার অবশ্যই মনে আছে। যেমন— ওই দিন তোমার গায়ে ছিল হালকা সবুজ রঙের একটা ফুলশার্ট। শার্টে কালো স্ট্রাইপ ছিল। ওইদিন যে তুমি দৌড়ে পালিয়ে গেলে বাসায় ফিরলে ঠিক রাত এগারটা পাঁচ মিনিটে। আমি তখন বারান্দায় বসে ছিলাম। বারান্দার বাতি নেভানো ছিল। যাতে তুমি আমাকে দেখতে না পাও। তুমি কখন ফের তা দেখার জন্যেই আমি বসেছিলাম। ওইদিন কত তারিখ ছিল তোমার মনে আছে? দুই লক্ষ টাকা বাজি, তোমার মনে নেই। আমার মনে আছে—১২ তারিখ। কী বার মনে আছে? জানি মনে নেই— রোববার। এতসব খুঁটিয়ে কেন মনে রেখেছি? মেয়েদের স্বভাব হলো তুচ্ছ ব্যাপারগুলো মনে করে রাখা। আমি তো সাধারণ একটা মেয়ে তাই না? শোন ওইদিনটা ছিল আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। ওই দিনের কথা মনে হলেই তোমার লজ্জিত, ব্যথিত মুখের কথা আমার মনে হয়। ভয়ঙ্কর লজ্জায় ওইদিন তোমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। তোমার চোখ ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো পানিতে। তুমি জলভর্তি চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। তোমার ব্যথিত মুখ দেখে আমার কিশোরী হৃদয়ে এক ধরনের হাহাকাব তৈরি হল। ইচ্ছে করল তোমার হাত ধরে বলি— এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? অ্যাকসিডেন্ট হয় না? আমি অবশ্যই বলতাম। তুমি বলার সুযোগ দিলে না দৌড়ে পালিয়ে গেলে।...

তিতলী খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। মাত্র এগারোটা বাজে। এখন একবার কলেজের বাইরে গিয়ে খুঁজে দেখা যেতে পারে। হাসান যে কাঁটায় কাঁটায় বারোটার সময়ই আসবে তা তো না। বারোটার আগেই তার আসার কথা। হয়তো এগারটার সময় এসে নাপিতের দোকানে বসে মাথা বানাচ্ছে। নাপিত তার নোংরা হাতে হাসানের সুন্দর চুলগুলো ছানাছানি করছে। অসহ্য। অসহ্য।

তিতলী কলেজের গেটের বাইরে এসেই দেখে রাস্তার ওপাশে হাসান দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। হাতে চায়ের কাপ। ফুটপাতের দোকান থেকে চা কিনে বাবুর খুব আয়েশ করে চা পান করা হচ্ছে। কী অদ্ভুত মানুষ! সত্যি সত্যি এক ঘণ্টা আগে এসে বসে আছে। হাবলার মতো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তিতলী এক দৌড়ে রাস্তা পার হলো। আজ সে একটা কাণ্ড করবে চুপি চুপি হাসানের পেছনে দাঁড়িয়ে 'হালুম' করে একটা চিৎকার দেবে। এমন চিৎকার যেন হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। বেচারাকে চায়ের কাপের দাম দিতে হবে। ভালো হবে। উচিত শিক্ষা হবে। এক ঘণ্টা আগে এসে বসে থাকার শিক্ষা।

তিতলী বলল, চিঠি এনেছ।

হাসান হ্যাঁ-সুচক মাথা নাড়ল। তিতলী লক্ষ করেছে কলেজের আশপাশে হাসান তার সঙ্গে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে ইশরায় জবাব দেবার চেষ্টা করে। তিতলী বলল, কই চিঠি দাও।

দেব।

দেবটেব না, এখনই দাও।

হাসান অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাচ্ছে। তিতিলীর খুব মজা লাগছে। এমন অস্বস্তি বোধ করার কী আছে ? সে কি ভয়ঙ্কর কোনো পাপ করছে ? এমন পাপ যে এক্ষুনি ফেরেশতারা এসে দোজখে ঢুকিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দেবে।

কই চিঠি দিচ্ছ না কেন ?

বললাম তো দেব। দাঁড়াও একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসি।

বেবিট্যাক্সি না। বেবিট্যাক্সিতে ভটভট শব্দ হয়, কোনো কথা শোনা যায় না। চল একটা রিকশা নিই। ওই রিকশাওয়ালাটাকে ডাক। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ভদ্র। বারবার পেছনে ফিরে আমাদের দেখার চেষ্টা করবে না। আমাদের কথা শোনার চেষ্টাও করবে না।

হাসান একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে এল। তিতলী ভাব করল খুব বিরক্ত হচ্ছে, তবে সে বিরক্ত হয় নি। খুশি হয়েছে। বেবিট্যাক্সিতে চিঠি পড়তে পড়তে যাওয়া যায়। রিকশায় চিঠি পড়া যায় না। সবাই তাকিয়ে থাকে।

হাসান বলল, বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে খানিকক্ষণ ঘুরবে ?

তিতলী বলল, ঘুরব। আমি কিন্তু সাঁতার জানি না। নৌকা ডুবলে তুমি টেনে তুলবে। হাসান বলল, আমিও সাঁতার জানি না।

তিতলী খুশি খুশি গলায় বলল, তাহলে চল। নৌকা ডুবলে দুজন একসঙ্গে তলিয়ে যাব। একজন পানির নিচে আরেকজন বেঁচে আছি— তাহলে খারাপ হতো।

হাসান বলল, বুড়িগঙ্গায় ওইপারে আমার স্কুলজীবনের এক বন্ধু থাকে। ধূপনগর। সে মাছের খামার করেছে সেখানে যাবে ?

তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানে যাব। তুমি যদি আমাকে সস্তা কোনো হোটেলে নিয়ে যাও হোটেলের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও তাতেও আমার আপত্তি নেই।

এসব কী ধরনের কথা ?

বাজে ধরনের কথা। আচ্ছা যাও আর বলব না। চল ধূপনগরে যাই। মাছের খামার দেখে আসি।

ধূপনগরে গেলে ফিরতে কিন্তু দেরি হবে। পাঁচটার আগে ফিরতে পারবে না।

দেরি হলে অসুবিধা হবে না। বাবা দেশের বাড়িতে গেছেন। রাত আটটার ট্রেনে ফিরবেন। বাসায় পৌঁছতে পৌছতে ন'টা।

তোমর মা চিন্তা করবেন না ?

মা তো সবসময়ই চিন্তা করছেন। একদিন না হয় একটু বেশি করলেন। কই চিঠি দাও।

হাসান চিঠি বের করল। বেবিট্যাক্সি চলছে। তিতলী হাসনের গা ঘেঁষে বসেছে। তার সমস্ত মনোযোগ চিঠিতে। চিঠির লেখক পাশে বসে আছে সেটা কোনো ব্যাপার না। হাসানের চিঠি তিতলী যেভাবে পড়ে আজ সেভাবে পড়তে পারল না। হাসানের সামনে তা সম্ভবও নয়। তিতলীর চিঠি পড়ার নিয়ম হচ্ছে— পড়ার আগে খানিকক্ষণ চিঠিটা সে গালে ছুঁইয়ে রাখবে। তারপর চিঠি পড়বে। চিঠি পড়তে পড়তে অবশ্যই তার চোখে পানি আসবে। চিঠি দিয়েই সে চোখের পানি মুছবে। চিঠি পড়তে গিয়ে চোখে যে জল এসেছে সেই জল চিঠিতেই জমা থাকুক।

তিতলী চিঠি শেষ করে নিচু গলায় বলল— তুমি লম্বা চিঠি লিখতে পার না ? অনেকক্ষণ ধরে পড়া যায় এমন চিঠি ? স্লিপের মতো ছোট্ট কাগজ— কয়েকটা মাত্র লাইন— পড়ার আগেই চিঠি শেষ।

হাসান কিছু বলল না। তিতলী বলল, এ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক'টা চিঠি লিখেছ বলতে পারবে ?

না।

তবুও একটা অনুমান কর দেখি কাছাকাছি হয় কি না ?

এক শ ?

চুয়াত্তরটা। আজকেরটা নিয়ে চুয়াত্তর।

তুমি সব চিঠি জমা করে রাখ ?

জমা করে রাখব না তো কী করব, পড়া শেষ হলেই কুঁচিকুঁচি করে ফেলে দেব ?

ফেলে দেয়াই তো ভালো— কখন কার হাতে পড়ে!

হাতে পড়লে পড়বে। আমার এত ভয়ডর নেই।

তোমাকে দেখে কিন্তু খুব সাহসী মনে হয় না। ভীরু টাইপের লাজুক লাজুক একটা মেয়ে মনে হয়।

আমি আসলেই ভীরু এবং লাজুক লাজুক টাইপের মেয়ে। তারপরেও প্রয়োজনের সময় আমি খুব সাহসী।

এটা ভালো।

আমিও জানি এটা ভালো। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে আছে শবনম। খুব সাহসী। টিচারদের সঙ্গে টক টক করে তর্ক করে। রাজনীতি করে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের একবার একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল তখন শবনম সমানে পুলিশের দিকে ঢিল ছুঁড়েছে। কিন্তু যখন সত্যিকার সাহস দেখানোর প্রয়োজন পড়ল তখন সে মিইয়ে গেল। কোনো সাহস দেখাতে পারল না।

প্রয়োজনটা কী ?

সেটা তোমাকে বলব না। মেয়েদের অনেক ব্যাপার আছে— যা ছেলেদের জানা ঠিক না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ তাই। যদিও আমরা সবসময় বলি— একটা ছেলেও মানুষ, একটা মেয়েও মানুষ। তারা আলাদা কিছু না— আসলে কিন্তু অনেকখানিই আলাদা।

হাসান হাসল। তিতলীকে নিয়ে বাইরে বের হলেই সে হড়বড় করে ক্রমাগত কথা বলতে থাকে। সেসব কথা হাসান যে খুব মন দিয়ে শোনে— তা না। তবে একটা মেয়ে মনের আনন্দে কথা বলে যাচ্ছে— ব্যাপারটাই মজার।

তিতলীর কথা বলার মধ্যে আবার হাত নাড়ানাড়িও আছে। মনে হবে তার শ্রোতা একজন না। সে আসলে একদল ছাত্রছাত্রীকে বোঝাচ্ছে।

একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের মধ্যে আসলে কোনো মিলই নেই। শরীরের অমিল খুব ক্ষুদ্র অমিল— আসল অমিল হলো মনে, মানসিকতায়। একটা ছেলের মানসিকতা এবং একটা মেয়ের মানসিকতা— আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য। কোনো ছেলে যদি কোনো মেয়ের মনের ভেতরটা একবার দেখতে পারত তাহলে সে বড় ধরনের চমক খেত।

এত কিছু বুঝলে কী করে ?

বোঝা যায়। চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। বাবাকে দেখে বুঝি, মাকে দেখে বুঝি, তোমাকে দেখে বুঝি, নিজেকে দেখে বুঝি।

আমাকে দেখে কী বোঝ ?

তোমাকে দেখে বুঝি যে তোমার সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে কিন্তু আমার সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে। আমাদের বিয়ের পর কী হবে জান ?

কী হবে ?

তুমি তো আর সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকবে না— অফিসে যাবে। কাজকর্ম করবে। আমি ওই সময়টা সহ্য করতে পারব না। আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে যাবে। সেটা আবার তোমার খারাপ লাগবে। তুমি ভাববে এ কী বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। আর আমি তখন বন্ধন তো আলগা করবই না আরো নতুন নতুন শিকলে তোমাকে জড়োনোর চেষ্টা করব।

ইন্টারেস্টিং।

আমি আরো অনেক ইন্টারেস্টিং কথা জানি। সেসব কথা বলছি না, জমিয়ে রাখছি— বিয়ের পর বলব।

তুমি যে এত সহজে বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আস অস্বস্তি লাগে না ?

না অস্বস্তি লাগে না। উল্টোটা হয়— ভালো লাগে। বাসর রাতে তোমার সঙ্গে আমি কী নিয়ে গল্প করব সব ঠিক করে রেখেছি ?

সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি। আমি সেই রাতে খুব মজার একটা ব্যাপার করব।

মজার ব্যাপারটা কী ?

এখন বলব না। আগে বললে তো মজা থাকবে না। আচ্ছা শোন আমার ক্ষিধে লেগেছে। আজ বাসা থেকে নাশতা না খেয়ে কলেজে এসেছি।

নাশতা না খেয়ে এসেছ কেন ?

মা ঢেলঢেলা একটা খিচুড়ি রান্না করেছে। মুখে দিয়ে বমি আসার মতো হয়েছে। এখন ক্ষিধেয় মারা যাচ্ছি। আচ্ছা শোন এতক্ষণ হয়ে গেছে তুমি সিগারেট খাচ্ছ না ব্যাপারটা কী ? সিগারেট ধরাও। বিয়ের আগ পর্যন্ত তোমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে কিছু বলব না। বিয়ের পর— নো সিগারেট।

বিয়ের পর নো কেন ?

তোমার ওপর যে আমার অধিকার আছে এটা জাহির করার জন্যেই নো।

হাসান পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। তিতলী তার ব্যাগ থেকে দেয়াশলাই বের করল। হাসানের সিগারেট ধরিয়ে দেবে। হাসানের সঙ্গে বাইরে বের হবার সময় তার ব্যাগে একটা দেয়াশলাই থাকে। সে ঠিক করে রেখেছে টাকা জমিয়ে জমিয়ে সে সুন্দর একটা লাইটার কিনবে। লাইটারটা থাকবে তার কাছে। শুধু যখন হাসান সিগারেট ঠোঁটে দেবে তিতলী ধরিয়ে দেবে।

আজ কয়েকটা অদ্ভুত ছবি দেখেছি।

অদ্ভুত ছবি মানে ?

না থাক ছবির ব্যাপারটা থাক।

তুমি আজ এমন ছটফট করছ কেন ?

আর ছটফট করব না। আচ্ছা শোন তুমি আমার হাতটা ধরে বসে থাক না কেন ? এমন দূরে সরে আছ কেন ?

সদরঘাট পৌঁছে হাসান ছইওয়ালা একটা নৌকা তিন ঘণ্টার জন্যে ভাড়া করল। ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা হিসেবে দেড় শ টাকা ভাড়া, পঞ্চাশ টাকা বকশিশ। সব মিলিয়ে দু শ টাকা। হাসান তার বন্ধুর বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে। হুট করে একটা মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলে সে কী ভাববে কে জানে। হাসানের স্কুলজীবনের বন্ধুর সঙ্গে তার মাও থাকেন। তিনি প্রচীনপন্থী মহিলা। তার কাছে ব্যাপারটা নিশ্চিয়ই ভালো লাগেবে না। এরচে নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ানো ভালো। হাসান দু প্যাকেট মোরগ পোলাও একবোতল পানি এবং চারটা মিষ্টি পান কিনেছে। বাসা থেকে ফ্লাস্ক নিয়ে এলে ফ্লাস্কে করে চা নেয়া যেত। ফ্লাস্ক আনা হয় নি। পরের বার অবশ্যই ফ্লাস্ক আনতে হবে।

নৌকা ছোটখাটো হলেও সুন্দর। পাটাতনে শীতলপাটি বিছানো। দুটা ফুলতোলা বালিশ আছে। নৌকার বালিশ তেল চিটেচিটে হয়— এই দুটা বালিশ পরিষ্কার। তিতলী বলল— মাঝিভাই শুনুন, আমরা দুজনই কিন্তু সাঁতার জানি না। নৌকা সবসময় তীরের আশপাশে রাখবেন। মাঝনদীতে যাওয়া একদম নিষিদ্ধ।

মাঝি দাঁত বের করে বলল, কিছুই হইব না আফা। এক্কেবারে লিচ্ছিন্ত থাকেন।

আচ্ছা বেশ 'লিচ্ছিন্ত' থাকব। তারপরেও শুনে রাখুন। নৌকা যদি ডুবে যায়— আপনি কিন্তু আমাদের দুজনের একজনকেও বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না। ভয় পেয়ে তখন হয়তো আমরা দুজনই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করব। আপনি আমাদের বাঁচাবেন না— নিজে সাঁতরে তীরে উঠে পড়বেন।

মাঝি দাঁত বের করে হাসছে। মেয়েটার পাগলামি ধরনের কথায় সে খুব মাজা পাচ্ছে।

বেবিট্যাক্সিতে তিতলী সারাক্ষণ কথা বলছিল। নৌকা ছাড়তেই সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। পানির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল। তার চোখও কেমন ছলছল করছে। মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে।

হাসান বলল, তিতলী খাবার গরম আছে, হাত ধুয়ে খেয়ে ফেল। ঠাণ্ডা হলে খেতে ভালো লাগবে না।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

তুমি-না বলেছিলে ক্ষিধে লেগেছে।

একসময় লেগেছিল এখন ক্ষিধে নেই।

কী হয়েছে তিতলী ?

কিছু হয় নি। মন খারাপ লাগছে।

মন খারাপ লাগছে কেন ?

গান জানি না এই জন্যে খুব মন খারাপ লাগছে। গান জানলে তোমাকে গান গেয়ে শোনাতাম। তোমার কত ভালো লাগত।

আমার যথেষ্টই ভালো লাগছে।

আমার গানের গলা কিন্তু ভালো। বাবার টাকাপয়সা নেই, গান শিখতে পারলাম না। একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবার জন্যে মার কাছে বাবার কাছে কত কান্নাকাটি যে করেছি ? বিয়ের পর তুমি কিন্তু আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবে। তোমার টাকা থাকুক বা না থাকুক।

অবশ্যই কিনে দেব। আমার প্রথম চাকরির বেতনের টাকায় কিনে দেব।

পানিতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর। ঠাট্টা না সত্যি।

হাসান পানিতে হাত দিয়ে রাখল। তিতলী মেয়েটাকে মাঝে মাঝে তার অদ্ভুত লাগে। ঠিক বুঝতে পারে না। একটা মেয়ের ভেতরে আসলেই অনেকগুলো মেয়ে বাস করে।

আমি গান জানলে তোমাকে কোন গানটা গেয়ে শুনাতাম জান ?

না— কোনটা ?

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।

তিতলীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

কী হয়েছে তিতলী ?

কিছু হয় নি।

কাঁদছ কেন ?

বুঝতে পারছি না কেন। হঠাৎ খুব মনটা খারাপ লাগছে।

মন খারাপ লাগছে কেন ?

জানি না কেন ? জানলে তোমাকে জানতাম।

বাসায় চলে যাবে ?

হুঁ।

বেশ তো চল যাই।

তিতলী চারটার আগেই বাসায় পৌঁছে গেল এবং রাত আটটায় তার বিয়ে হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির এক লেকচারের সঙ্গে। ছেলের মামারা বললেন— অনুষ্ঠান পরে হবে, আকদ হয়ে যাক। আজকের দিনটা খুব শুভ। ছেলের দাদি খুবই অসুস্থ। পিজিতে ভর্তি হয়েছেন। যে-কোনো সময় মারা যাবেন। মৃত্যুর আগে নাতবউয়ের মুখ দেখে যেতে চান।

কীভাবে কী ঘটল তিতলী নিজেও জানে না। তিতলীর শুধু মনে আছে তার বাবা কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন— তুই আপত্তি করিস না মা। আমি দরিদ্র মানুষ— এমন ভালো ছেলে তোর জন্যে আমি যোগাড় করতে পারব না। তোর কী সমস্যা আমি কিছু শুনতে চাই না। মা রে তুই আমার প্রতি দয়া কর। তুই রাজি না হলে আমি বিষ খাব রে মা। সত্যি বিষ খাব। তোর মার নামে আমি কসম কেটে বলছি বিষ খাব।

তিতলী তার বাবাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখে নি— সে একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। সে তাকাল তার মার দিকে। ফিসফিস করে বলল, মা আমি কী করব ? সুরাইয়া জবাব দিলেন না। তিনিও কাঁদছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। নাদিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। তিতলী নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, নাদিয়া আমি কী করব ?

নাদিয়া বলল, আপা তুমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরো না।

কিন্তু বাবা কাঁদছেন। হাউমাউ করে কাঁদছেন। বাবাকে তিতলী কখনো কাঁদতে দেখে নি।

পিজি হাসাপাতালের আঠার নম্বর কেবিনে তিতলী দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে সুন্দর চেহারার একটি যুবক। যুবকের মুখ হাসি হাসি। এই যুবকটি তার স্বামী। তার নাম যেন কী ? আশ্চর্য নামটা মনে পড়ছে না।

বৃদ্ধ এক মহিলা আধবোজা চোখে তাকিয়ে আছেন। তার নাকে অক্সিজেনের নল। কাঠির মতো সরু সরু হাত। হাতের নীল রগ বের হয়ে আছে। ভদ্রমহিলার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে।

খুব গয়না-টয়না পরা এক মহিলা তিতলীকে বললেন, তোমার দাদিশাশুড়ি, সালাম কর।

তিতলী নড়ল না। বৃদ্ধা অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে কী যেন বললেন। তিতলী সেই কথার কিছু বুঝতে না পারলেও অন্যরা বুঝল। বৃদ্ধার বালিশের নিচ থেকে গয়নার বাক্স বের করে আনল। বাক্স খুলে গয়না বের করে বৃদ্ধার হাতে দেয়া হলো। বৃদ্ধা তিতলীর দিকে চোখের ইশারা করলেন। গয়নাটা নিতে বললেন। পুরনো দিনের পাথর বসানো হার। বেদানার দানার মতো লাল লাল পাথর— ।

তিতলীর মনে হচ্ছে লাল পাথরগুলো যেন চোখ। যেন বৃদ্ধার হাতের হারটা অনেকগুলো লাল চোখে তিতলীকে দেখছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটা হাসছে। এই যুবক তার স্বামী। তার নাম তিতলীর মনে পড়ছে না।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না।

গানটার সুর যেন কী ? আচ্ছা এই বৃদ্ধার কী হয়েছে ? ক্যানসার ?

১১

লিটনকে কেমন জানি অন্যরকম লাগছে। কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনটা সূক্ষ্ম বলে ধরা যাচ্ছে না। চুল কেটেছে কি ? না চুল কাটে নি। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। চুলের জন্যে কলেজে তার নাম ছিল শ্যাওড়াগাছ। লিটন বলল, তুই এ রকম করে তাকিয়ে আছিস কেন ? কি দেখছিস ?

হাসান বলল, তোকে দেখছি।

আমাকে দেখার কী আছে ?

তোকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।

লিটন বলল, মনটা খুব খারাপ সেইজন্যেই বোধহয় অন্যরকম লাগছে।

মন খারাপ কেন ?

লিটন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে দেখে বুঝতে পারছিস না কেন মন খারাপ ? মালয়েশিয়া শেষ পর্যন্ত যেতে পারি নি। ঢাকা এয়ারপোর্টে আটকে দিয়েছে। ফলস ভিসা।

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, তোর মালয়েশিয়া যাবার কথা ছিল নাকি ?

তুই জানিস না ?

না।

আমি যে বিয়ে করেছি সেটা জানিস ?

না জানালে জানব কীভাবে ? আমি তো অন্তর্যামী না।

চাচাজান তোকে বলেন নি। আমি তাকে বলে গেছি। আমার বিয়ে তো আর কার্ড ছাপিয়ে হবে না যে কার্ড দিয়ে যাব। সস্তার বিয়ে। বন্ধুবান্ধব যে কজনকে বলেছিলাম কেউ আসে নি। কেউ না এলেও তুই আসবি সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বলতে গেলে একা একা বিয়ে করেছি মনটা এত খারাপ হয়েছে।

মন খারাপ হবার কথাই।

বুঝলি হাসান আমি ঠিক করেছিলাম আর কোনো দিন তোর সঙ্গে কথা বলব না।

তোর বিয়ের কথা জেনেও আমি যাব না তুই ভাবলি কী করে ?

লিটন আনন্দিত গলায় বলল, শম্পাকেও আমি এই কথা বলেছি। আমি বলেছি— শোন শম্পা, আর কেউ আসুক না আসুক হাসান আসবেই। শম্পা বলেছে উনি কি আলাদা ? আমি বললাম হাসান আলাদা কি আলাদা না তা আমি জানি না, হাসান আসবে এইটুকু জানি।

হাসান বলল, বাবা আমাকে কিছু বলেন নি, বোধহয় ভুলে গেছেন।

বুড়ো মানুষ ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। চাচাজানের কাছে এক হাজার টাকাও দিয়েছিলাম। ভেবেছি বিদেশ চলে যাচ্ছি যে যা টাকাপয়সা পেত দিয়ে যাই। সেই যাওয়া আটকে গেল। কী যে সমস্যার মধ্যে পড়েছি! আমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে না। শম্পার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। ও খুব কান্নাকাটি করে।

ভাবিকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করো। তুই না যাওয়াতে দুজন একসঙ্গে থাকতে পারছিস।

আমিও একজাক্ট এই কথাই শম্পাকে বলেছি। আমাদের দেশের ব্যাপার তো জানিস— সবাই বলাবলি করছে বিদেশ যাওয়া-টাওয়া সব ভাঁওতাবাজি। বিদেশে যাচ্ছে

এই ভাঁওতা দিয়ে বিয়ে করেছে। আমার মনটা যে কী খারাপ তুই দেখে বুঝবি না।

মন খারাপের কথা বাদ দে তো। ভাবির কথা বল। ভাবি দেখতে কেমন ?

দেখতে মোটামুটি মানে এভারেজ আর কি। কিন্তু অসাধারণ একটা মেয়ে। অন্তরে এত মায়া তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমার সম্পর্কে কেউ একটা কথা বললে তার চোখ দিয়ে চৌ চৌ করে পানি পড়ে। একদিন হয়েছে কি শোন— সকালবেলা ওদের বাসায় গিয়ে নাস্তা করার কথা। যেতে পারি নি। রাত ন'টার দিকে গেছি। গিয়ে শুনলাম— রাত ন'টা পর্যন্ত তোর ভাবি না খেয়ে বসে আছে। সলিড ফুড তো খায়ই নি— পানি পর্যন্ত না— এটা পাগলামি না!

পাগলামি হলেও সুন্দর পাগলামি।

তোরা যতই সুন্দর বলিস— আমি খুব রাগ করেছি। শম্পাকে কঠিন কঠিন কিছু কথা বলব বলে ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত বলি নি। হাইলি সেনসেটিভ মেয়ে তো— কঠিন কথা শুনে কী করে না করে তার ঠিক আছে। চুপচাপ থাকাই ভালো।

ভাবি কোথায় এখন ? তোর সঙ্গে ?

আমার সঙ্গে থাকবে কীভাবে ? আমি থাকি মেসে। বউ নিয়ে তো আর মেসে উঠতে পারি না। শম্পা তার বড় মামার সঙ্গে থাকে। আমি প্রতিদিন কমপক্ষে একবার হলেও দেখে আসি। একবার রাতে ছিলামও। ওদের বাসা খুবই ছোট! দুই কামরার বাসা। এতোগুলো মানুষ। আমরাই যদি একটা ঘর দখল করে থাকি তাহলে হবে কীভাবে ? আর নিউলি ম্যারিড কাপল তো আর অন্যদের সঙ্গে খাটে আড়াআড়িভাবে ঘুমোতেও পারে না।

হাসান হাসছে। লিটন এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। কী সহজ আন্তরিক ভঙ্গিতেই না সে গল্প করছে!

হাসান শম্পার ছবি দেখবি ?

সঙ্গে আছে ?

ওদের ক্যামেরায় কিছু ছবি তুলেছিলাম। ছত্রিশটা স্নাপ নিয়েছি আটটা এর মধ্য নষ্ট হয়েছে। এই দেখ।

হাসান ছবি দেখছে। লিটন গভীর আগ্রহে প্রতিটি ছবি ব্যাখ্যা করছে।

শম্পার সঙ্গে যে ছোট মেয়েটা দেখছিস সে শম্পার মামাতো বোন। ক্লাস টুতে পড়ে। এমনিতে খুব শান্ত মেয়ে, একটা বিচিত্র অভ্যাস আছে। আদর করে কামড় দেয়। ওইতো পরশুদিন হঠাৎ শম্পার নাক কামড়ে ধরল। এক্কেবারে রক্ত বের করে দিয়েছে।

এই ছবিটা দেখ শম্পার গলায় যে হারটা দেখতে পাচ্ছিস এটা রিয়েল না ইমিটেশন।

হাসান বলল, ভাবি তো দেখতে খুব সুন্দর। তুই কী বলছিস মোটামুটি!

সামনাসামনি আরো সুন্দর দেখা যায়। ছবিতে তেমন ভালো আসে নি। ক্যামেরাটাও তত ভালো ছিল না— দেখ না সবাই আউট অব ফোকাস। তোকে একদিন নিয়ে যাব। শম্পা খুব খুশি হবে। তোর কত গল্প করেছি।

আমার আবার কী গল্প ?

তোর গল্পের কি শেষ আছে ? তোর টাকা নেই পয়সা নেই— তারপরেও তুই আমাদের জন্যে যা করিস সেটা কে করে ? তোর একটা গল্প শুনে শম্পার চোখে পানি এসে গিয়েছিল গল্পটা হচ্ছে...

থাক তোকে গল্প বলতে হবে না।

আহা শোন না, এই গল্প আমি যে কতজনকে করেছি— ওই যে কলেজে পড়ার সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তুই খবর পেয়ে...

চুপ কর তো।

আচ্ছা চুপ করলাম, শম্পাকে কবে দেখতি যাবি ?

হাত একদম খালি। খালি হাতে তাকে দেখতে যাব কীভাবে। কিছু তো নিয়ে যেতে হবে। দেখি তিন-চার দিনের মধ্যে যাব।

তোকে এসে নিয়ে যাব। শুক্রবারে আসি ? কিছু নিতে হবে না, তোকে দেখলেই খুশি হবে। উপহার দিয়ে তাকে খুশি করার ক্ষমতা তো আমার নেই। মানুষ দেখিয়ে খুশি করা সেটাও তো কম না। আজ উঠি রে।

হাসান তাকে সঙ্গে করেই বেরোল। আজ বুধবার— হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। হিশামুদ্দিন সাহেবকে এখনো তার নিজের চাকরির কথা বলা হয় নি। লজ্জার কারণে বলা হচ্ছে না— লিটনেরটা বল দেখবে নাকি ? এই মুহূর্তে তারচে' লিটনের চাকরি অনেক বেশি দরকার।

রাস্তায় বের হতেই আশরাফুজ্জামান সাহেবকে দেখা গেল। তিনি কয়েক পলক তাদের দিকে তাকিয়ে হুট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লেন। আজকাল তিনি ছেলেদের দেখলে সরে পড়েন। হাসানের খুব মায়া লাগছে। মানুষের কত পরিবর্তনই না হয়! একটা সময় ছিল তার পায়ের শব্দেই বুক ধড়ফড় করত। সেই মানুষ আজ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। পথেঘাটে হঠাৎ দেখা হলে এমন বিব্রত হন।

লিটন বলল, চাচাজান কি তোকে টাকাটা দিয়েছেন ? এক হাজার টাকা ?

হাসান বলল, না।

তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিস না। বুড়ো মানুষ ভুলে গেছেন। জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পাবেন।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করব না।

প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। এই রোদে হাঁটতে কষ্ট হয়। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। হাসানের পকেটে কুড়িটা মাত্র টাকা। কুড়ি টাকার একটা চকচকে নোট। নোটটা খরচ করা যাবে না। বেকারদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার আছে। পকেট একেবারে শূন্য করতে নেই। হাসান ঘড়ি দেখল। হেঁটে যেতে গিয়ে দেরি হয়ে যাবে না তো ?

দেরি হলেই হিশামুদ্দিন সাহেবের পি.এ. মোতালেব ভুরু কুঁচকে বলবে, মাই গড আজো দেরি ? ভাবটা যেন সে সবসময় দেরি করেই যাচ্ছে।

স্যার তো মনে হয় আজ কথা বলতে পারবেন না।

হাসান বলল, ও আচ্ছা।

মোতালেব হাই তুলতে তুলতে বলল, স্যারের মেয়ে এসছে— 'চিত্রলেখা'; সে স্যারের সব টাইমটেবল ভণ্ডুল করে দিচ্ছে।

হাসান বলল, চলে যাব ?

মোতালেব এই প্রশ্নের জবাব দিল না— হাই তুলল। গুরুত্বহীন মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয়। তাকে ঘন ঘন হাই তুলতে হয়। মোতালেব এই জন্যেই হাই তুলছে।

মোতালেব সাহেব আমি কি চলে যাব?

থাকুন কিছুক্ষণ। চা খান, দেখি স্যার কী বলেন।

হাসান বসে পড়ল। মোতালেবের এই ঘরটা ডাক্তারদের ওয়েটিং রুমের মতো। দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে একসারি বেতের চেয়ার সাজানো। চেয়ারগুলোতে এককালে গদি ছিল— এখন নেই। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। ভারি কালো রঙের টেবিলের ওপর ময়লা কয়েকটা ম্যাগাজিন। ঘরের এক কোনায় ছোট্ট টেবিল নিয়ে ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো বিরক্তমুখে মোতালেব বসে থাকে। মোতালেবের হাতে মুনশি আমিরুদ্দিনের লেখা চটি একটি বই, নাম 'প্রেমের সমাধি'। বইটির কভারে একটা ফুটন্ত ফুলের ছবি। সেই ফুলের ওপর কুৎসিতদর্শন একটা পোকা উড়ছে। পোকাটার গায়ের রং ঘনকৃষ্ণ, চোখ টকটকে লাল। পোকাটা খুব সম্ভব ভ্রমর, তবে দৈত্যাকৃতির ভ্রমর। প্রেমের সমাধি নামের এই চটি বইটি মোতালেব গত দু মাস ধরে পড়ছে। হাসান ঠিক করে রেখেছে মোতালেব সাহেবের এই বই পড়া শেষ হলে সে বইটা তাঁর কাছ থেকে ধার করে নিয়ে পড়ে দেখবে, ব্যাপারটা কী?

ডাক্তারের ঘরে যেমন ওষুদের গন্ধ থাকে, এই ঘরেও তেমনি ওষুধের কড়া গন্ধ। এই গন্ধ-রহস্য হাসান বের করেছে। ইনসেকটিসাইডের গন্ধ। বাগানের ফুলগাছে প্রতি সপ্তাহে একবার স্প্রে করে ইনসেকটিসাইড দেয়া হয়। ইনসেকটিসাইডের বোতল এই ঘরের আলমিরায় তালবন্ধ থাকে। আলমিরায় হাতে লেখা একটা নোটিশ আছে—

'বিপদজণক'

জনক বানানে মূর্ধণ্য ন ব্যবহার করা হয়েছ বলেই বোধহয় নোটিশটা দেখলেই গা ছমছম করে। এই ঘরে সময় থেমে থাকে। পাঁচ মিনিট বসে থাকলেই মনে হয় পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকা হয়েছে। হাসান নড়েচড়ে বসল। সময় থামা অবস্থাতেও অনেকক্ষণ পার হয়েছে।

মোতালেব সাহেব!

মোতালেব বই থেকে মুখ তুলল। তার দৃষ্টি অপ্রসন্ন, ভুরু কোঁচকানো। হাসান অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, চলে যাব?

বাজে কটা?

সাড়ে তিনটা।

আরো পাঁচ-দশ মিনিট বসে চলে যান।

আপনি কি একটু জেনে আসবেন?

জেনে আসা যাবে না। এতদিন পর স্যারের মেয়ে এসেছে। স্যার মেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন— এর মধ্যে হুট করে আমি উপস্থিত হব? ব্যালেন্স ছাড়া কথা বলবেন না।

জ্বি আচ্ছা।

চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনটা থেকে চারটা এই এক ঘণ্টার পেমেন্ট নিয়ে হাসিমুখে চলে যাবেন। বাকিটা আমি দেখব।

জ্বি আচ্ছা। স্যারের মেয়ে দেখতে কেমন?

দেখতে কেমন তা দিয়ে আপনার কোনো দরকার আছে?

জ্বি না।

তাহলে জানতে চান কেন? স্যারের মেয়ে কালো কুৎসিত হলেও আপনার কিছু যায় আসে না, ডানাকাটা পরী হলেও না।

তা তো বটেই।

হাসান একটা ম্যাগাজিন হাতে নিল। সময় কাটানোর জন্যে রোমহর্ষক অপরাধের কাহিনী পড়া ছাড়া কোনো গতি নেই। অপরাধের কাহিনী ছাড়া এখন কোনো মাগাজিন প্রকাশিত হয় না। দেশে তেমন কোনো মজাদার অপরাধের কাহিনী পাওয়া না গেলে বিদেশী অপরাধের কাহিনী ছেপে দেয়া হয়। লস এঞ্জেলসে তিন সমকামী তরুণীর গোপন কাহিনী জাতীয় মজাদার কেচ্ছা।

আপনি কি হাসান সাহেব?

হাসান ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

এক শ ভাগ খাঁটি বাঙালি মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। কেউ না বলে দিলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই মেয়ের নাম চিত্রলেখা। বাবার মতো টকটকে গায়ের রং না— শ্যামলা মেয়ে। মাথাভর্তি চুল— চুল নিয়ে সে খানিকটা বিব্রত। একটু পর পর মুটো করে চুল ধরছে। খুব সাধারণ সুতির শাড়ি পরেছে। মনে হচ্ছে এই সাধারণ শাড়িটা না পরলে তাকে মানাত না। সবচে' মজার ব্যাপার মেয়েটির পায়ে স্যান্ডেল নেই। খালি পা। খালি পা'তেও তাকে মানিয়েছে। মনে হচ্ছে কোনো স্যান্ডেলেই এই মেয়েকে মানাত না। এক ধরনের মানুষ আছে যাদের সবকিছুতেই মানায়। এও বোধহয় সে রকম কেউ।

আপনি হাসান সাহেব তো?

জ্বি।

আপনার না তিনটার সময় বাবার ঘরে যাবার কথা? আমি আপনার জন্যেই বসে ছিলাম।

আমার জন্যে?

জ্বি। আপনাকে বাবা কীসব গল্প বলেন এইসব আর আপনি কীভাবে নোট করেন তাও দেখব। ও আচ্ছা আমি তো আমার পরিচয় দিই নি। আমার নাম চিত্রলেখা।

জ্বি আমি বুঝতে পেরেছি।

কীভাবে বুঝলেন? ও আচ্ছা বোঝাটাই তো স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শুনে ফেলেছেন যে আমি এসেছি তাই না?

জ্বি।

আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

হাসান পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তার খুব ইচ্ছে করছে জিজ্ঞেস করে— আপনি খালি পায়ে হাঁটছেন কেন? জিজ্ঞেস করল না। এ ধরনের প্রশ্ন করার মতো ঘনিষ্ঠতা মেয়েটির সঙ্গে হয় নি। কোনোদিন হবেও না।

হাসান সাহেব?

জ্বি।

আমেরিকার কেউ যদি আমার নাম জিজ্ঞেস করে আমি কী বলি জানেন ? আমি বলি আমার নাম মিস পিকচার ড্র। আমার এই নামটিই এখন চালু। অনুবাদটা ভালো হয়েছে না ?

জ্বি।

যান আপনি বাবার সঙ্গে বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

হিশামুদ্দিন সাহেব আজ একটা ধবধবে পাঞ্জাবি গায়ে বসে আছেন। হাসান তাকে খালি গায়ে দেখেই অভ্যস্ত। পাঞ্জাবিতে তাকে অন্যরকম লাগছে। তার সামনে পানের বাটাও নেই। হাসানের মনে হচ্ছে চিত্রলেখার উপস্থিতির সঙ্গে ঘটনা দুটি সম্পর্কিত।

স্যার স্লামালিকুম।

হাসান বস। আমার মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে ?

জ্বি।

আমার মেয়ের মধ্যে এমন কী দেখলে চোখে পড়ার মতো ?

হাসান ইতস্তত করে বলল, উনি খালি পায়ে হাঁটছেন।

হিশামুদ্দিন হাসতে হাসতে বললেন—আরে দূর। খালি পায়ে হাঁটছে কারণ স্যান্ডেল খুঁজে পাচ্ছে না। ওর সবচে' অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ওর কাছে সব মানুষই চেনা। অতি আপন। তোমার সঙ্গেও নিশ্চয়ই খুব চেনা ভঙ্গিতে কথা বলেছে। আমার বড় বোনের মধ্যেও এই ব্যাপারটা ছিল। আমার বড়বোনের নাম কি তোমার মনে আছে ?

পুষ্প। ভালো নাম লতিফা বানু।

হ্যাঁ ঠিক আছে।

চিত্রলেখার খুব ইচ্ছা আমি তোমাকে কীভাবে গল্পগুলো বলি তা শুনবে। ও আসুক তখন তোমাকে আমার বড় বোনের একটা গল্প বলব।

জ্বি আচ্ছা।

তুমি টাকা-পয়সা ঠিকমতো পাচ্ছ তো ?

পাচ্ছি স্যার।

চিত্রলেখা চা নিয়ে ঢুকল। টি-পটভর্তি চা। দুধের পট, চিনির পট। হাসান অবাক হয় লক্ষ করল প্রথম চায়ের কাপটি চিত্রলেখা তার বাবার জন্যে না বানিয়ে তার জন্যে বানাচ্ছে। খুব সাধারণ একটি ভদ্রতা। হাসানের মতো অভাজনের জন্যে এ ধরনের ভদ্রতা চিত্রলেখার মতো মানুষরা করে না। তার প্রয়োজন নেই।

হাসান সাহেব আপনি কতটুকু চিনি খান ?

তিন চামচ।

আজ প্রথমদিন বলে তিন চামচ দিচ্ছি—দয়া করে চিনি খাওয়া কমাবেন। আমি কিন্তু ডাক্তার। অকারণে উপদেশ দেই না। যখন প্রয়োজন তখনি উপদেশ দি।

হিশামুদ্দিন বললেন, তোর স্যান্ডেল পাওয়া গেছে ?

চিত্রলেখা হাসিমুখে বলল, একপাটি পাওয়া গেছে—অন্য পাটি খোঁজা হচ্ছে।

হিশামুদ্দিন বললেন, তোর কি এক জোড়াই স্যান্ডেল ?

হ্যাঁ। এক শ জোড়া স্যান্ডেল দিয়ে আমি কী করব ? আমি কি লেডি ইমালডা ? বাবা তোমার গল্প শুরু কর।

চিত্রলেখা ঠিক তার বাবার মতোই দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। একটা হাত তার গালে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে— যে গল্প বলে শ্রোতারা তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করে চিত্রলেখা তাকিয়ে আছে হাসানের দিকে। তার চোখ চাপা কৌতুকে ঝিলমিল করছে। হিশামুদ্দিন গল্প শুরু করেছেন।

আমাদের নেত্রকোনার বাসায় একটা শিউলিগাছ ছিল। শিউলিগাছ জংলি ধরনের হয়। খসখসা পাতা— ঝুপড়ির মতো বড় হয়। জঙ্গলে জন্মালেই এই গাছগুলোকে মানাত। শিউলিগাছের আরো সমস্যা আছে— শুয়োপোকা। বৎসরের একটা সময়ে আমাদের শিউলিগাছ ভর্তি হয়ে যেত শুঁয়োপোকায়। সেই সময় বাবা ঠিক করতেন গাছ কেটে ফেলা হবে। বড় আপার জন্যে কাটা হতো না। শিউলি ফুল তার খুব প্রিয় ছিল। গাছটার ফুল ফোটাবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। শীতের সময় উঠোন ফুলে ফুলে ভরে থাকত। বড় আপা বলতেন— জোছনার চাদর। যাই হোক এক বৎসর হঠাৎ কী হলো গাছটায় ফুল ফুটল না। একটা ফুলও না। আমরা সবাই খুব অবাক হলাম— বড় আপা হলেন অস্থির। গাছটায় একটা ফুলও ফুটবে না— এ কেমন কথা। প্রায় সময়ই দেখতাম কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে বড় আপা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেই শীতেই বড় আপা মারা গেলেন। অতি তুচ্ছ কারণেই তাঁর মৃত্যু হলো। বাথরুমে পা পিছলে পড়ে মাথায় ব্যথা পেলেন। সামান্য ব্যথা— তেমন কিছু না। রান্নাবান্না করলেন। আমাদের খাওয়ালেন। নিজে কিছু খেলেন না— তার নাকি শরীরটা ভালো লাগছে না, মাথা ঘোরাচ্ছে। তিনি বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন। তার আধঘণ্টা পর বাবাকে ডাকলেন। বাবা বিছানায় তার পাশে বসলেন। বড় আপা বললেন, বাবা তুমি আমার মাথার চুল বিলি করে দাও। তারপর হঠাৎ করে বললেন, বাবা আমি মরে যাচ্ছি। বাবা ভয় পেয়ে আমাদের সবাইকে ডাকলেন। তার ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই বড় আপা মারা গেলেন। নেত্রকেনা বড় মসজিদের গোরস্থানে তার কবর হলো। হতদরিদ্র পরিবারের মৃত্যুশোক স্থায়ী হয় না। সাতদিনের মাথায় বাসার সব মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। সেই সময় একটা আনন্দের ব্যাপারও ঘটল— বাবা একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। চাকরি তেমন ভালো না, তবে বাবা খুব উল্লসিত— কারণ এই চাকরিতে বাড়তি আয়ের সুযোগ-সুবিধা খুবই ভালো। মাছ সাপ্লাইয়ের কাজ। ভাটি অঞ্চলের বড় বড় মাছ কাঠের পেটিতে বরফ দিয়ে ভরে ঢাকা পাঠানো। বরফের প্যাকিং হয় রাতে। এর মধ্য দু-একটা মাছ এদিক-ওদিক করা যায়। তাতে কেউ কিছু মনেও করে না। এই ধরনের ক্ষতি হিসেবের মধ্যে ধরা থাকে। বাবা আনন্দিত গলায় বললেন— এইবার দেখা যাবে তোরা কে কত মাছ খেতে পারিস। মাছের বড় বড় পেটি খেয়ে দেখবি এক সময় মাছের ওপর ঘেন্না ধরে যাবে। তখন মাছের ছবি দেখলেও 'ওয়াক থু' করে বমি করে ফেলবি।

চাকরি শুরু করার তিন দিনের মাথায় বাবা বিশাল এক চিতল মাছ নিয়ে শেষরাত্রে বাসায় চলে এলেন। মহা উৎসাহে চিতল মাছ রান্না করলেন। সকালে নাশতার বদলে বারান্দায় পাটি পেতে চিতল মাছের পেটি দিয়ে আমরা ভাত খেতে বসলাম। আর তখনি আমার মেজো বোন ময়না চেঁচিয়ে বলল, দেখ দেখ! আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখলাম

শিউলি গাছের নিচটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। শিউলিগাছ আবার ফুল ফোটাতে শুরু করেছে।

হাসান আজ এই পর্যন্তই।

চিত্রলেখা বলল, হাসান সাহেব আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন?

জ্বি না।

আপনি কি বাবার সব গল্প লিখে ফেলেছেন?

জ্বি।

পরের বার যখন আসবেন— লেখা কপিগুলো নিয়ে আসবেন। আমি একটু পড়ে দেখব। আপনি পরের বার কবে আসবেন?

আমি প্রতি বুধবারে আসি। আপনি বললে আমি কালই দিয়ে যাব।

প্লিজ। আমার খুব পড়ার ইচ্ছা। চলুন আমি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

না না এগিয়ে দিতে হবে না।

অবশ্যই এগিয়ে দিতে হবে। আমি খুবই ভদ্র মেয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে চিত্রলেখা বলল, হাসান সাহেব!

জ্বি।

বাবার গল্পগুলো শুনতে আপনার কেমন লাগে?

ভালো লাগে।

বাবা খুব গুছিয়ে গল্প বলেন। লেখক হলেও তিনি খুব নাম করতেন।

জ্বি।

তবে আপনাকে একটা গোপন তথ্য দিচ্ছি— বাবার গল্পে কিছু বানানো ব্যাপার আছে। আপনি সামনে ছিলেন বলে আমি বাবাকে ধরলাম না। আপনি সামনে না থাকলে অবশ্যই ধরতাম।

হাসান বলল, কোন জিনিসটা বানানো?

ওই যে শিউলিগাছে বাবার বড় বোন পুষ্পের মৃত্যুর পর পর ফুল ফুটল।

বানানো বলছেন কেন?

কারণ এই গল্প বাবা আমাকেও বলছেন। তখন গল্পটা অন্য রকম ছিল।

কী রকম ছিল?

আমাকে বাবা বলেছিলেন— তার বড় বোনের মৃত্যুর পর আমাদের দাদাজানের সব রাগ গিয়ে পড়ল গাছটার ওপর— তিনি পাগলের মতো সামান্য মাছকাটা বঁটি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে গাছটা কেটে ফেললেন।

ও আচ্ছা— উনি হয়তো ভুলে গেছেন।

এ রকম একটা বড় ঘটনা ভুলে যাবার কথা তো না।

সবগুলো ডাল হয়তো কাটা হয় নি— একটা রয়ে গিয়েছিল। সেই ডালে ফুল ফুটেছে।

চিত্রলেখা খিলখিল করে হাসছে। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, বাবাকে তো আপনি দেখি আমার চেয়েও বেশি পছন্দ করেন। এখন একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো।

হাসান ভীত গলায় বলল, কোন ব্যাপার ?

বাবা আপনাকে এত পছন্দ করেন কেন সেই কারণটা ধরা গেল। আপনি বাবাকে পছন্দ করেন বলেই বাবা আপনাকে পছন্দ করেন। পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার মানুষ খুব সহজেই ধরতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করে ফেললাম। এখন আপনি চলে যান।

চিত্রলেখা হাসানকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। খালি পায়ে সে হাঁটছে— হাসানের আবারো মনে হলো এই মেয়ে খালি পায়ে না হেঁটে স্যান্ডেল পায়ে হাঁটলে তাকে মোটেও মানাত না।

দিনটা মেঘলা।

সারাদিন মেঘ ছিল না। এখন কোত্থেকে গাদা গাদা মেঘ আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে। হাসানের মনে হলো নীল রঙে আকাশকে মানায় না, কালো রঙেই মানায়।

হাসানের হাঁটতে ভালো লাগছে। মেঘলা দিনের বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে। শুধু সারাক্ষণ মনে হয় একজন প্রিয় কেউ পাশে থাকলে আরো ভালো লাগত। তিতলীর বাসায় গিয়ে দেখা যেতে পারে। তাকে যদি কোনোভাবে শুধু বলা যায় — তিতলী আমার খুব ইচ্ছা করছে তোমাকে নিয়ে হাঁটতে। সে যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা করবে। তারা হাঁটবে মেঘের দিকে তাকিয়ে। ওই যে একটা গান আছে না— মেঘ বলেছে যাব যাব। ওই গানটা দুজনই মনে মনে গুনগুন করবে।

হাসান সাত টাকা দিয়ে বড় একটা গোলাপ কিনল। গোলাপ যে এত বড় হয় তার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে বোম্বাই গোলাপ। বড় বলেই দাম বেশি। প্রমাণ সাইজের গোলাপ চার টাকা করে বিক্রি হচ্ছে— এই গোলাপ সাত টাকা। প্রায় ডাবল দাম। গোটাদশেক কিনতে পারলে তিতলী হতভম্ব হয়ে যেত। টাকা নেই। সাত টাকা খরচ করতেও গায়ে লাগছে।

সাত টাকায় সাত কাপ চা খাওয়া যায়। এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট কেনা যায়। এক ডজন দেয়াশলাই কেনা যায়। সাত টাকার এই বোম্বাই গোলাপ একদিনে বাসি হয়ে যাবে। মনে হবে গোলাপটার খারাপ ধরনের ডায়রিয়া হয়েছে। তারপরেও ফেলা হবে না। রেখে দেয়া হবে। তিতলীর যা কাণ্ডকারখানা পাপড়িগুলো সে হয়তো কোনোদিনও ফেলবে না। কোনো এক গল্পের বইয়ের পাতার ভাঁজে ভাঁজে রেখে দিয়ে ভুলে যাবে। হঠাৎ একদিন বই ঝাড়তে গিয়ে পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে গোলাপের পাপড়ির অপূর্ব শুঁটকি। হাসানের মনে হলো একটা গোলাপ নিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। এক হচ্ছে অমঙ্গলসূচক। এক মানেই একা। সবচে' মঙ্গলসূচক সংখ্যা হলো দুই। দুই মানেই আমি এবং তুমি। পনেরটা টাকা চলে যাবে। তার সঙ্গে আছে কুড়ি টাকার একটা নোট। ফেরার সময় ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। হাঁটা মন্দ কী ? তিতলীর সঙ্গে দেখা হবার পর হেঁটে হেঁটে ফিরতে খারাপ লাগবে না।

হাসান ফুলওয়ালাকে বলল, ভাই ঠিক এই সাইজের আরেকটা গোলাপ দিন। এই গোলাপগুলোর নাম কী বলুন তো ? ফুলওয়ালা বিরস গলায় বলল, তাজমহল।

গোলাপের নাম তাজমহল ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। মোতালেব সাহেবকে একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি যেহেতু বাগানে বিষ স্প্রে করেন তিনি জানবেন। হিশামুদ্দিন সাহেবের মেয়েটিও জানতে পারে। তাকে দেখলেই মনে হয় এই মেয়ে সব জানে। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে বলে দেবে।

দুবার কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলল। দরজা খুলে দিল নাদিয়া। হাসান বলল, কেমন আছ নাদিয়া ?

নাদিয়া জবাব দিল না। হাসান জানে নাদিয়া জবাব দেবে না। এই মেয়েটা অসম্ভব লাজুক। তবে একবার কথা শুরু করলে ফড়ফড় করে অনেক কথা বলে। ওই দিন খুব কথা বলেছে।

তোমার প্রিপারেশন কেমন হলো ?

জ্বি ভালো।

সব বই নিশ্চয়ই ঠোঁটস্থ হয়ে গেছে ?

নাদিয়া জবাব দিল না। চোখ বড় বড় করে হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল। হাসানের একটু অস্বস্তি লাগছে। এই মেয়েটা কখনো তো এ রকম করে তাকায় না। ব্যাপারটা কী ?

তিতলী বাসায় আছে ?

জ্বি না।

কোথায় গেছে ? তার ফুফুর বাসায় ?

জ্বি না। হাসান ভাই আপনি বসুন আপনাকে সব বলছি।

হাসান হঠাৎ বুকে একটা ধাক্কা খেল। তিতলীর কি কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে ? হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ? নাকি তারচেয়েও খারাপ কিছু ? না তারচে' খারাপ কিছু না। তারচে' খারাপ কিছু হলে নাদিয়া এমন সহজভাবে কথা বলতে পারত না কিন্তু সহজভাবে সে কি কথা বলছে ?

কী হয়েছে নাদিয়া ?

আপার কাল রাতে হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে গেছে। ফুফু একটা ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন— সেই ছেলের সঙ্গে...

তিতলীর বিয়ে হয়ে গেছে ?

জ্বি।

ও এখন তার শ্বশুরবাড়িতে ?

জ্বি।

ও আচ্ছা। নাদিয়া আমি তাহলে আজ যাই।

হাসান ভাই প্লিজ আপনি এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও বসে যান। আপনি এইভাবে চলে গেলে আমি সারা রাত কাঁদব।

হাসান কিছু বলল না। বসল। তার কেমন অদ্ভুত লাগছে। তার মনে হচ্ছে এই ঘরের আলো হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। ঘরের এক প্রান্তে ষাট পাওয়ারের বাতি জ্বলছে না।

জ্বলছে ফ্লাডলাইটের তীব্র আলো। সেই আলো চোখে লাগছে। চোখ জ্বালা করছে। খুব ঠাণ্ডা পানি চোখেমুখে ছিটাতে পারলে ভালো লাগত।

হাসান ভাই!

হুঁ।

চা খাবেন হাসান ভাই ? আপনার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আসি ?

মেয়েটা এভাবে কথা বলছে কেন ? মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে। কেঁদে ফেলার মতো কিছু হয় নি। তিতলী একটা সমস্যায় পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। এ রকম সমস্যা তো হতেই পারে।

নাদিয়া আমি চা খাব না। তবে একটু পানি খাওয়াতে পার, খুব তৃষ্ণা লেগেছে। আচ্ছা থাক পানি লাগবে না।

হাসান ভাই আপনি বসুন। আমি এক্ষুণি পানি এনে দিচ্ছি।

নাদিয়া ছুটে বের হয়ে গেল। আর প্রায় তৎক্ষণাৎ হাসানের মনে হলো তিতলী এ বাড়িতেই আছে। নাদিয়া ছোট্ট একটা মিথ্যা বলেছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে এটা ঠিক সে এখনো শ্বশুরবাড়িতে যায় নি। এই মিথ্যাটার হয়তো প্রয়োজন ছিল।

হাসানকে নাদিয়া গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। হাসান বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল নাদিয়া কাঁদতে কাঁদতে তার সঙ্গে আসছে। হাসান বলল, কাঁদছ কেন নাদিয়া ?

নাদিয়া গায়ের ওড়নায় চোখ মুছল। কিছু বলল না। হাসান বলল, তিতলী ঘরেই আছে তাই না ?

নাদিয়া ক্ষীণস্বরে বলল, জ্বি।

ওকে বোলো—সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে ও যেন মন খারাপ না করে।

আপনি ভালো থাকবেন হাসান ভাই।

ভালো থাকব। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। আমি জানি তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করবে।

কী করে জানেন ?

আমার মন বলছে।

হাসান ভাই, আপনি আপার ওপর রাগ করে থাকবেন না।

না রাগ করব কেন ? যাই নাদিয়া ?

হাসান এগোচ্ছে। ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না। টিপটিপ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। আশ্চর্য কাণ্ড যখনই সে তিতলীর কাছে আসে তখনই বৃষ্টি হয়।

হাসান হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তিতলীদের বাসাটা একবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। সবসময় এই জায়গা থেকে সে পেছনে ফিরে তাকায়। আরেকটু এগোলে তিতলীদের বাসা আড়ালে পড়ে যাবে আর দেখা যাবে না। হাসান যতবারই এখান থেকে তাকিয়েছে ততবারই দেখেছে তিতলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ নিশ্চয়ই দেখা যাবে না। শুধু আজ কেন আর কোনোদিনই দেখা যাবে না। হাসানও আর আসবে না। আসা ঠিক হবে না।

তিতলীর বাবা নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করবেন। সেই অনুষ্ঠানে তার দাওয়াত হবে না। তিতলী এমন হৃদয়হীন কাণ্ড কখনো করবে না। ভালো কোনো উপহার তার অবশ্যি দিতে ইচ্ছে করছে। টাকা থাকলে তিতলীকে সে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিত। মেয়েটার হারমোনিয়ামের খুব শখ ছিল। তার স্বামী নিশ্চয়ই তিতলীর সেই শখ মেটাবেন। মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ইচ্ছা প্রকৃতি সবসময় পূর্ণ করে।

তিতলী কী গানটা জানি তাকে শোনাতে চেয়েছিল? হাসান কিছুতেই মনে করতে পারছে না— মেঘ বলেছে যাব যাব, মেঘের পরে মেঘ জমেছে? নাকি অন্য কোনো গান? না এটা না অন্য কী একটা গান। আশ্চর্য মনে পড়ছে না। হাসান মাথার ভেতর তীব্র চাপ অনুভব করছে। গানের লাইনগুলো মনে না পড়লে কিছুতেই মনের এই চাপ কমবে না। একবার চট করে তিতলীকে জিজ্ঞেস করে এলে কেমন হয়। না না তিতলীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা ঠিক হবে না। সে জিজ্ঞেস করবে নাদিয়াকে। নাদিয়া তার আপার কাছ থেকে জেনে আসবে।

হাসান পেছন দিকে তাকাল। বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় হয়ে পড়তে শুরু করেছে। হাসান এগোচ্ছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে।

১২

তিতলীদের বাড়ির সামনে বড় একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। কালো রঙের গাড়ি— জানলার কাচ উঠানো বলে গাড়ির ভিতরে কে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

মতিন সাহেব জানালার পরদার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। দুপুরে খাবারের পর তিনি খালি গায়ে হাতপা এলিয়ে ফুলস্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বড় একটা ঘুম দেন। আজো ঘুমোচ্ছিলেন হঠাৎ ইলেট্রিসিটি চলে যাওয়ায় ফ্যান থেমে গেল, তার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি 'চামচিকার বাচ্চারা দেশটার বারটা বাজিয় দিল' বলতে বলতে জানালার পরদা সরিয়ে কালো গাড়িটা দেখলেন। তিতলীর বিয়ের পর পর বড় বড় গাড়ির আনাগোনা শুরু হয়েছে। তিতলীর শ্বশুরবাড়ির দিকের সব আত্মীয়স্বজনেরই মনে হয় গাড়ি আছে। রোজই কেউ না কেউ আসছে। দেখতে ভালো লাগছে। খালি হাতেও কেউ আসছে না। ঘর ভর্তি হয়ে আছে মিষ্টিতে। মিষ্টি খাওয়া তার নিষেধ। সামান্য ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। সেই নিষেধ অমান্য করে তিনি নিয়মিত মিষ্টি খাচ্ছেন। খাওয়া শেষ হবার পর উদাস গলায় বলছেন— মিষ্টিটিষ্টি কী আছে দাও। খাওয়ার পর মিষ্টি খাওয়া রসুলে করিমের সুন্নত। সুন্নত পালন করলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না।

আজ কে এসেছে? যে এসেছে সে গাড়ি থেকে নামছে না কেন? মতিন সাহেব এই বয়সেও বুকের ভেতর এক ধরনের ছেলেমানুষি উত্তেজনা অনুভব করলেন। তার সেই উত্তেজনা চরমে উঠল যখন দেখলেন গাড়ি থেকে নামছে শওকত। তিতলীর হাসবেন্ড। কথা ছিল রুসমত না হওয়া পর্যন্ত শওকত এ বাড়িতে আসবে না। কী জন্যে এসেছে কে জানে। মতিন সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসলেন। আলনা থেকে নিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। সুরাইয়াকে খবর দিতে হবে। গরমের সময় তার একটা বাজে অভ্যাস আছে— ভেতরের মেঝেতে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়া। জামাই যদি এসে দেখে শাশুড়ি মাতারিদের মতো হা করে ঘুমোচ্ছে, মুখের ওপর মাছি ভনভন করেছে— সেই দৃশ্য সুখকর হবে না।

সুরাইয়া ঘুমোচ্ছিলেন না। রান্নাঘরে চায়ের পানি চাপিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। মতিন সাহেব চাপা গলায় বললেন, জামাই এসেছে। জামাই। মেয়েরা কোথায়?

তিনি সুরাইয়ার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। মেয়েদের ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

তিতলী ঘরেই ছিল। নাদিয়া তার বই নিয়ে গেছে ছাদে। মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার থাকলে সে ছাদে চলে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে পড়া মুখস্থ করে।

তিতলী শুয়ে ছিল। হাতপা গুটিয়ে কেন্নোর মতো শুয়ে থাকা। মাথাটা পর্যন্ত বালিশে নেই। বিয়ে হওয়া মেয়ে সবসময় সুন্দর করে সেজেগুজে থাকবে— কী বিশ্রী ভাবেই না সে আছে! মতিন সাহেব কড়া গলায় বললেন, তিতলী ওঠ তো! জামাই এসেছে— শওকত। যা কথাটথা বল, দেখ কী ব্যাপার। হাত মুখ ধুয়ে চুলটুল বেঁধে তারপর যা।

কলিংবেল বাজতে শুরু করেছে। দরজা খুলে দেবার মতো কেউ নেই। মতিন সাহেব নিজেই দরজা খোলার জন্যে গেলেন।

তিতলী শুয়ে শুয়ে কলিংবেলের শব্দ শুনছে— এক দুই তিন চার। চারবার বেল বাজল। হাসান বেল বাজাত দুবার। দুবারের বেশি কখনো না। দরজা না খুললে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার দুবার। এই বিষয়ে হাসানের বক্তব্য হচ্ছে দুই হচ্ছে পৃথিবীর সবচে' সুন্দর সংখ্যা। দুই মানেই আমি এবং তুমি। এটা নিশ্চয়ই হাসানের নিজের কথা না। কোনোখান থেকে শুনে এসে বলেছে। এ রকম গুছিয়ে কথা হাসান বলতে পারে না।

সুরাইয়া দরজা ধরে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন, মা শুয়ে আছিস? জামাই এসেছে। ওঠ মা।

তিতলী হাই তুলতে তুলতে বলল, তুমি এ রকম করে কথা বলছ কেন মা? জামাই এসেছে শুনে মনে হচ্ছে তুমি ভয় পাচ্ছ। জামাই এসেছে তো কী হয়েছে?

হাতমুখ ধুয়ে বসার ঘরে যা।

এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? বিয়ে যখন করেছি বসার ঘরে নিশ্চয়ই যাব। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। তুমি আমাকে চা খাওয়াও। চা খেয়ে তারপর যাব।

কাপড় বদলাবি না?

তুমি বললে অবশ্যই বদলাব।

সুরাইয়া ক্ষীণস্বরে বললেন— তুই এ রকম করে কথা বলছিস কেন?

আমি ভালোমতোই কথা বলছি— তুমি আমাকে নিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে আছ বলে আমার স্বাভাবিক কথাই তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভয় কোরো না মা। আমি হাস্যকর কোনো ড্রামা করব না। গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়া আমাকে দিয়ে হবে না। কেউ একজন আমাকে দিয়ে একটা খেলা শুরু করেছে। সেই খেলাটা আমি শেষ পর্যন্ত খেলব।

খেলা মানে? কী খেলা?

ও তুমি বুঝবে না মা। চা এনে দাও। চা খাব। চা খেয়ে গোসল করব। তারপর সেজেগুজে শওকত সাহেবের সামনে দাঁড়াব।

সুরাইয়া চিন্তিত মুখে ফিরে এলেন। তার মন বলছে এই মেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু করবে।

সেই ভয়ঙ্করটা কী তিনি ধরতে পারছেন না। মেয়ের জন্যে এক বৈঠকে এক শ রাকাত নামায তিনি মানত করেছেন। রুসমতের পর মেয়ে যে রাতে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবে সেই রাতে তিনি মানত শেষ করবেন। মানত শেষ না করা পর্যন্ত তিনি শান্তি পাচ্ছেন না।

মতিন সাহেব অতি আনন্দের সঙ্গে তার জামাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। তার হাতে রথম্যান সিগারেটের প্যাকেট। শওকতের ভদ্রতায় এই মুহূর্তে তিনি মোহিত। শওকত তার জন্যে এক কার্টুন রথম্যান সিগারেট এবং একটা লাইটার নিয়ে এসেছে। এমন সুন্দর লাইটার তিনি তার জন্মে দেখেন নি। কখনো দেখবেন এই আশাও করবেন না। লাইটারটা কালো রঙের। ছোট একটা লাল বোতাম আছে। বোতামে চাপ দিলেই নীলাভ অগ্নিশিখা দেখা দেয়। লাইটারের কর্মকাণ্ড এইখানেই শেষ হয়ে যায় না। যতক্ষণ অগ্নিশিখা জ্বলে ততক্ষণই টুনটুন শব্দ হতে থাকে। লাইটারটা তিনি এর মধ্যেই কয়েকবার জ্বালিয়েছেন-নিভিয়েছেন। আবারো জ্বালাতে ইচ্ছে করছে। জামাইয়ের সামনে এ জাতীয় ছেলেমানুষি শোভন হবে না বলে মনের ইচ্ছা চাপা দিয়ে রেখেছেন। তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, তারপর বাবা বল কেমন আছ ?

শওকত বিনীতভাবে বলল, জ্বি ভালো।

তুমি কি ধূমপান কর ? করলে আমার সামনে সিগারেট খেতে পার। এইসব প্রিজুডিস আমার একেবারেই নেই। বিলেতে, আমেরিকায় বাপ-ছেলে এক টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে— আর আমাদের দেশে... শ্রদ্ধা ভক্তি আসলে মনের ব্যাপার। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর কি কর না তা আমার সামনে সিগারেট খাওয়া-না খাওয়া দিয়ে বিচার করা যাবে না। তুমি কী বল ?

জ্বি তা তো ঠিকই।

নাও একটা সিগারেট খাও।

আমি সিগারেট খাই না।

ভেরি গুড। এটা এমন একটা অভ্যাস যার কোনো ভালো দিক নেই— শরীর নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, পরিবেশ নষ্ট, অর্থ নষ্ট... কোটি কোটি টাকা ধোঁয়ায় উড়ে যাচ্ছে— ভাবাই যায় না। ঠিক বলছি না ?

জ্বি।

তারপর বল তোমার খবরাখবর বল।

শওকত লজ্জিত গলায় বলল, আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম।

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, বল ব্যাপারটা কী ?

আমার এক বন্ধুর বিয়ে। আমার ছোটবেলার বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিয়ে হচ্ছে গাজীপুরে। ওর খুব ইচ্ছা আমি তিতলীকে নিয়ে সেই বিয়েতে যাই...

ইচ্ছে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তুমি তিতলীকে নিয়ে যাও। তোমার স্ত্রীকে তুমি নিয়ে যাবে এর মধ্যে আবার অনুরোধ কী ?

এখনো ফরম্যালি উঠিয়ে নেয়া হয় নি...

তুমি এইসব ব্যাপার নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবে না। কাবিননামা তৈরি হওয়া মানে বিয়ে হয়ে যাওয়া।

ফিরতে হয়তো দেরি হবে। গাজীপুর অনেকখানি দূরে— ।

হোক দেরি কোনো সমস্যা নেই। আমি রাত দুটার আগে ঘুমাই না।

আমার বন্ধু বলছিল রাতটা তার ওখানে থেকে যেতে। রাস্তাটা খারাপ। প্রায়ই ডাকাতি হয়।

রাতটা থেকে সকালে আস। কোনো সমস্যা নেই। আমি তিতলীকে বলে দিচ্ছি। তুমি চা-টা কিছু খাবে ?

এক কাপ চা খেতে পারি।

বোস তুমি, আমি চায়ের কথা বলে আসি।

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন—তার সঙ্গে শওকত উঠে দাঁড়াল। শওকতের ভদ্রতায় মতিন সাহেব আবারো মোহিত হলেন। অসাধারণ একটা ছেলে—তিতলীর ভাগ্য ছক্কা ভাগ্য। দান ফেলেছে ছক্কা উঠে গেছে।

তিতলী লাল রঙের জামদানি শাড়ি পড়েছে। লাল শাড়িতে কালো ফুল। শাড়ির পাড়টাও কালো। যেহেতু বিয়েতে যাচ্ছে সুরাইয়া মেয়েকে কিছু গহনাও পরিয়েছেন। হাতে চারগাছ করে চুড়ি। গলায় পাথর বসানো হার। এই হার তিতলীর ফুফু ধার দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন ক্রমাগত আসছে। বিয়ে হওয়া মেয়ে খালি গলায় থাকবে এটা ঠিক না। তিতলীর কানে সবুজ পাথরের দুটা দুল। গায়ে শাড়ির সঙ্গে কানের এই দুলজোড়া মানাচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও দেখতে ভালো লাগছে।

তিতলী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, মা আমাকে কেমন লাগছে ? সুরাইয়া সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়ের বাঁ হাতের চেটোয় হালকা করে থু থু দিলেন। এই থু থু সুন্দর দেখানোর দোষ কাটিয়ে দেয়। খুব সুন্দর কখনো ভালো না। খুব সুন্দরকে ঘিরে থাকে অসুন্দর। তিতলী বলল, মা যাচ্ছি।

বিসমিল্লাহ করে রওনা হও মা। গলার হারটা সাবধানে রাখবে। খুলে পড়ে না যায়।

পড়বে না।

শওকতের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবি।

অবশ্যই ভদ্রভাবে কথা বলব।

চোখমুখ এমন শক্ত করে রেখেছিস কেন ? মনে হচ্ছে ফাঁসি দেখতে যাচ্ছিস। ঘর থেকে হাসিমুখে বের হ।

নতুন স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে বের হলে লোকজন বেহায়া ভাববে এই জন্যে চোখমুখ শক্ত করে রেখেছি।

বিয়ে বাড়িতে মুখ এমন শক্ত করে থাকবি না।

আচ্ছা। এবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।

মতিন সাহেব মেয়েকে গাড়ি পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন, গাড়ির ড্রাইভার কোথায় ?

শওকত বলল, ড্রাইভার নেই। গাড়ি আমি চালাব।

মতিন সাহেব আবারো মোহিত হলেন। জামাই গাড়ি চালিয়ে যাবে। পাশে বসে থাকবে তিতলী। অসাধারণ দৃশ্য। দেখাতেও আনন্দ।

গাড়ি সাবধানে চালাবে বাবা। ঢাকার ট্রাফিকের যে অবস্থা। নিয়মকানুন বলে কিছু নেই। অদ্ভুত দেশ।

শওকত হাসিমুখে বলল, আপনারা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি খুব সাবধানী ড্রাইভার।

মতিন সাহেব তার নতুন লাইটারে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন— সাবধান হওয়াই ভালো। সাবধানের মার নাই।

শওকত শহর ছাড়িয়ে হাইওয়েতে না পড়া পর্যন্ত একটা কথাও বলল না। মনে হচ্ছে সে কী বলবে বা বলবে না তা গুছিয়ে নিচ্ছে। তিতলীর বসে থাকার মধ্যেও কোনো আড়ষ্টতা নেই। বাতাসে তার চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার ভালোই লাগছে।

আমি একটা সিগারেট ধরালে কি তোমার খরাপ লাগবে?

জ্বি না।

আমি অবশ্যি তোমার বাবাকে বলেছি আমি সিগারেট খাই না। আসলে মাঝে মধ্যে খাই। আমি প্রফেশনাল না, এমেচার। তারপর বল কেমন আছ?

জ্বি ভালো আছি।

বল তো আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আপনার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুর বিয়েতে। গাজীপুর।

এখানেও আমি তোমার বাবাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছি। আমরা গাজীপুর যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু কোনো বন্ধুর বিয়েতে যাচ্ছি না।

ও।

তোমাকে নিয়ে একটু ঘোরবার ইচ্ছা হলো। কাজেই একটা অজুহাত তৈরি করে তোমাকে বের করে নিয়ে এলাম। তুমি রাগ কর নি তো?

রাগ করব কেন?

শওকত হাসিমুখে বলল, আমার সবচেয়ে ছোট মামাকে আমরা ডাকি মিজু মামা। উনি ফটকাবাজি ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন। গাজীপুরে একটা জঙ্গল কিনে বাগানবাড়ি বানিয়েছেন। আজ রাতের জন্যে সেই বাগানবাড়ির চাবি আমার কাছে। জঙ্গল তোমার কাছে কেমন লাগে?

জানি না। জঙ্গলে তো কখনো থাকি নি।

সত্যিকার জঙ্গল অবশ্যি আমাদের দেশে নেই। সুন্দরবনে খানিকটা আছে তাও মূলটা পড়েছে ইন্ডিয়ায়। তুমি কখনো ইন্ডিয়া গিয়েছ?

জ্বি না।

আমি নিয়ে যাব। ইন্ডিয়ার উত্তরপ্রদেশে বড় বড় জঙ্গল আছে। কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ বইটা পড়েছ? জিম করবেটের লেখা?

জ্বি না।

ওই বইটা পড়লে জঙ্গল সম্পর্কে ধারণা পেতে। তোমার গলার এই হারটা তো খুব সুন্দর। কী পাথর এটা?

আমি জানি না। আমার ফুফুর হার। আমার না।

যতদূর মনে হয় জিরকন। জিরকন ছাড়া এমন ব্রাইট রেড পাথর হয় না। আমার কাছে অবশ্যি লালের চেয়ে নীল পাথর বেশি পছন্দ। একটা পাথর আছে নাম একুয়ামেরিন। অপূর্ব নীল! মনে হয় আকাশ জমাট বাঁধিয়ে পাথর তৈরি করা হয়েছে। তবে খুব হালকা পাথর। ভঙ্গুর। আমি যে বকবক করে যাচ্ছি, তোমার বিরক্তি লাগছে না তো ?

জ্বি না।

তুমি মনে হয় কথা কম বল।

জ্বি না। আমি প্রচুর কথা বলি, এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

গাজীপুরে যেখানে যাচ্ছি সেখানে ছোট মামার এক বাবুর্চি থাকে—নাম মন্তাজ মিয়া। আজ রাতে সে-ই আমাদের রেঁধে খাওয়াবে। মন্তাজ মিয়ার বিশেষত্ব কী শুনবে ?

বলুন শুনি।

মিজু মামার ধারণা—মন্তাজ মিয়া হচ্ছে পৃথিবীর পাঁচজন সেরা রাঁধুনির একজন। ও শুধু দেশী রান্না পারে। রোস্ট টোস্ট পারে না। আমি শুনেছি তুমিও খুব ভালো রাঁধতে পার।

কার কাছে শুনলেন ?

তোমার বড় ফুফু বললেন। তোমার হাতে নাকি জাদু আছে। আরেকবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসব সেদিন তুমি রাঁধবে। সব যোগাড় যন্ত থাকবে। তুমি শুধু রান্না চড়িয়ে দেবে। তোমার কী কী লাগবে একটা লিস্ট করে দিলে সেইভাবে ব্যবস্থা করে রাখব। ঠিক আছে ?

জ্বি ঠিক আছে।

তোমার কোন রান্না ভালো হয় ? মাছ না মাংস ?

আমার মনে হয় মাছ।

সর্বনাশ করেছ, মাছ তো আমি খেতেই পারি না। মাছের মধ্যে চিংড়িটা খাই। তাও যে খুব আগ্রহ করে তা না।

শওকত আরেকটা সিগারেট ধরাল। তিতলী তাকিয়ে আছে বাঁ পাশের জানালার দিকে। গাড়িতে বসে থাকতে তার ভালোই লাগছে। লোকটা অকারণে কথা বলে ভাব জমাতে চেষ্টা করছে এটাও খারাপ লাগছে না। একবার তার ইচ্ছা করল বলে— ভাব জমানোর জন্যে অকারণ কথা বলার দরকার নেই। ভাব হবার হলে আপনাতেই হবে।

একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছি তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো ?

জ্বি না।

খুব সস্তা ধরনের একটা কথা তোমাকে বলার ইচ্ছে করছে তুমি কী ভাববে ভেবে বলতে অস্বস্তি বোধ করছি। এ জাতীয় কথা ছেলেরা বাংলা সিনেমায় বলে।

আপনার যা বলতে ইচ্ছে করে বলুন।

তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। সারাক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। তাকিয়ে থাকলে অ্যাকসিডেন্ট হবে সেই ভয়ে তাকাচ্ছি না।

গাড়ি কোথাও পার্ক করুন। পাক করে তাকিয়ে থাকুন।

শওকত শব্দ করে হেসে উঠল। সেই হাসি আর থামেই না।

বাগানবাড়িতে পৌঁছে শওকতের মুখের হাসি পুরোপুরি মিলিয়ে গেল। গেট তালাবন্ধ। আশপাশে কেউ নেই। ডাকাডাকি, চিৎকার, তালা ধরে ঝাঁকুনি কিছুতেই কিছু না। চারদিকে জনমানবশূন্য। তিতলী বলল, আপনি না বলেছিলেন আপনার কাছে চাবি আছে।

শওকত বিরক্তমুখে বলল, ভেতরের ঘরের চাবি। গেটের চাবি নেই। সবাইকে খবর দেয়া আছে তারপরেও এ কী অবস্থা।

গেট শেষ পর্যন্ত খুলল। দারোয়ান ভেতরে ঘুমোচ্ছিল। চোখ ডলতে ডলতে সে এসে গেট খুলে দিল। এতে সমস্যার সমাধান হলো না। শোনা গেল মনতাজ মিয়ার জ্বর এসেছে বলে সে দুপুরে ঢাকায় চলে গেছে। রান্নার কোনো যোগাড় যন্তও নেই। সবকিছু মন্তাজের করার কথা। শওকত রাগে ফুঁসতে লাগল। তিতলী বলল, আপনি অস্থির হবেন না। একটা তো মোটে রাত— না খেয়ে আমি থাকতে পারব।

শওকত বিরক্ত গলায় বলল, না খেয়ে থাকবে কেন? আমি বাজারে যাচ্ছি যা পারি নিয়ে আসব— দারোয়ান রাঁধবে। তুমি একা থাকতে পারবে তো? ঠিক একাও না। দারোয়ান থাকবে। থাকতে পারবে?

পারব।

ভয়ের কিছু নেই। আর এই দারোয়ান খুব বিশ্বাসী।

আপনি বাজার করে আনুন। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

তুমি ঘুরে ঘুরে বাগান দেখ। শোবার ঘরে ছোটখাটো লাইব্রেরির মতো আছে। গল্পের বইটই পড়তে পার।

জ্বি আচ্ছা।

তিতলী একা একা অনেকক্ষণ হাঁটল। বাগানবাড়িটা আসলেই সুন্দর। শহরে পাখির ডাক শোনা যায় না— এখানে অনবরত পাখি ডাকছে। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। পাখির ক্যানক্যানে ডাক খুব শ্রুতিমধুর না। শান্ত কোনো বন কি পৃথিবীতে আছে। যেখানে একটি পাখিও ডাকে না? শুধু খুব বাতাস হলে পাতার শব্দ শোনা যায়। এরকম বন থাকলে চমৎকার হতো। ভদ্রলোকের মামা— কী নাম যেন মিজু মামা, তিনি জায়গাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন। ঝিলের মতো একটা জায়গার পাশে বসার জন্যে সিমেন্টের আসন বানিয়েছেন। দেখলেই বসতে ইচ্ছে করে। ঝিলের পানি অবশ্যি ঘোলা। পুকুর বা ঝিলের পানি হবে আয়নার মতো চকচকে— যে পানি দেখামাত্র হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করবে। যে পানিতে মুখ দেখতে মন চাইবে। এই পানির কাছে যেতে ইচ্ছে করে না।

মানুষের সঙ্গে পানির আশ্চর্য মিল আছে। কোনো কোনো মানুষকে পরিষ্কার ঝকঝকে পানির মতো মনে হয়। তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, সেই পানি ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সেই পানিতে নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। আবার কিছু কিছু মানুষ এই ঝিলের পানির মতো হাত দিয়ে ছোঁয়া দূরের কথা, কাছে যেতেও ইচ্ছে করে না। তারপরেও যেতে হয়। এই যেমন সে ঝিলের এই পানি পছন্দ করছে না, তারপরেও পানির পাশেই বসে আছে।

তিতলী তুমি এখানে ?

জ্বি।

খাবারের ব্যবস্থা করেছি। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছি। দোকানের চা। ওভালটিন দেয়া. খেতে পারবে কিনা জানি না। খাবে ?

জ্বি খাব।

শওকত ব্যস্ত ভঙ্গিতে চা আনতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাস্ক এবং দুটা কাপ নিয়ে এল। শার্টের বুকপকেটে এক প্যাকেট বিসকিট। মনে হচ্ছে মানুষটা খুব গোছানো স্বভাবের।

তিতলী।

জ্বি।

বাগানবাড়ি কেমন লাগছে ?

সুন্দর।

আমাদের গ্রামের বাড়ি কিন্তু খুব সুন্দর। বিরাট পুকুর। শান বাঁধানো ঘাট। পানিও খুব পরিষ্কার— তোমাকে নিয়ে যাব।

জ্বি আচ্ছা।

তুমি দেখি জ্বি এবং জ্বি আচ্ছা ছাড়া কোনো কথা বলছ না। মাথা ধরেছে ?

জ্বি।

এই নাও প্যারাসিটামল। আমি গাড়িতেই বুঝেছি তোমার মাথা ধরেছে— একপাতা প্যারাসিটামল নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও একটা পানির বোতল নিয়ে আসি।

শওকত ব্যস্ত ভঙ্গিতে পানির বোতল আনতে গেল। তিতলী ট্যাবলেটের পাতা হাতে নিয়ে বসে আছে। সে নিজেকে তৈরি করছে। খুব কঠিন কিছু আজ তাকে বলতে হবে। বলতে হবে খুব সহজ ভঙ্গিতে। কথাগুলো সে মনে মনে অনেকবার বলেছে। মনে মনে বলা এক কথা, আর সামনাসামনি বলা আরেক কথা। তবু তাকে বলতেই হবে।

যে কথাটা সে বলবে তা হচ্ছে— আমি আপনাকে বিয়ে করে আপনার ওপর খুব অবিচার করেছি। কারণ আমি কখনো আপনাকে আমার খুব কাছে আসতে দেব না। আমি নিজেকে সাজিয়েছি অন্য একজনের জন্য। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন— কিংবা সারাজীবন পুতুলের মতো সাজিয়ে রাখতেও পারেন। সেটা আপনার ইচ্ছা। তবে আমি কখনো আপনার অবাধ্য হব না। আমার কাছে আপনি যা চাবেন তাই পাবেন।

তিতলী একদৃষ্টিতে ঝিলের পানির দিকে তাকিয়ে আছে। পানিতে কিছু শুকনো পাতা পড়েছে। বাতাসে ঢেউয়ের মতো উঠেছে। পাতাগুলো ঢেউয়ে উঠছে-নামছে। দেখতে ভালো লাগছে।

তিতলী!

জ্বি।

নাও পানি নাও— তুমি কি মাথাধরার ট্যাবলেট প্রায়ই খাও ?

জ্বি।

বেশি খেও না। কিডনির ক্ষতি করে।

শওকত তিতলীর পাশে বসল। তিতলী সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। শওকত বলল, জায়গাটা খুব সুন্দর না?

জ্বি।

বাগানবাড়ি শুনতে অবশ্যি অস্বস্তি লাগে। বাগানবাড়ি শুনলেই মনে হয় নিষিদ্ধ আনন্দের জায়গা। বাগানবাড়ি না বলে খামারবাড়ি বললে মনে হয়— খুব কাজের জায়গা। A place for productive work. তিতলী তুমি কি গান পছন্দ কর?

করি। কী ধরনের গান তোমার পছন্দ?

সব ধরনের।

নাচ? নাচ কেমন লাগে?

ভালো।

গানকে বলা হয় হৃদয়ের শব্দ, আর নাচকে কী বলা হয় জান?

জ্বি না।

নাচকে বলা হয় শরীরের সঙ্গীত। নাচ কত রকমের আছে জান?

জ্বি না।

নাচ মূলত চার রকমের— ভারত নাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী, কত্থক। ইদানীং অবশ্যি আরো দুটা ধারা ধরা হচ্ছে— ওড়িশি, কুচিপুড়ি।

ও আচ্ছা।

এ ছাড়াও আছে— যেমন ধর লোকনৃত্য, ছৌ ছৌ. রায়বেঁশে, বাউল, ঝুমুর, কাঠিনৃত্য, ব্রতচারী, খেমটা, কারবা, তয়ফা, ঠুমকি, বিহু, বাংরা, গরবা... ।

তিতলী মনে মনে হাসল। মানুষটা তাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে। গান, নাচ এই দুটি বিষয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ ব্যাপার মুখস্থ করে এসেছে। তিতলী কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, নাচের এইসব নামধাম আপনি মুখস্থ করেছেন কেন?

শওকত হাসতে হাসতে বলল, এর একটা মজার ইতিহাস আছে। আরেক দিন বলব।

আচ্ছা।

তুমি কি গান গাইতে জান?

জ্বি না।

তোমার ফুফু যে বললেন তুমি সুন্দর গান কর।

ভুল বলেছেন। আমার অনেক গুণ আছে এটা বোঝানোর জন্যে বানিয়ে বলেছেন।

তুমি যদি গান শিখতে চাও আমি শেখাবার ব্যবস্থা করব। শিখতে চাও?

জ্বি না।

এমনভাবে কথা বলছ কেন? তোমার কি মাথাধরা কমে নি?

তিতলী জবাব দিল না। সে অনেক কথা বলে ফেলেছে আর ইচ্ছা করছে না।

১৩

আজ রীনার জীবনে খুব আনন্দময় একটা ঘটনা ঘটেছে। তার এমনই কপাল যে আনন্দের ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন আশপাশে কেউ থাকে না। নিজের সুখ অন্যাকে দেখিয়ে আনন্দ। এই সুখ থেকে রীনা বারবার বঞ্চিত হয়েছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে একটা গল্পের বই নিয়ে সে ঘুমোতে গেছে। ফ্যান ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে সে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে। এই ঘুমের আলাদা মজা। ঘুমে যখন চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে তখন কমলার মা বলল, আফনেরে কে জানি খুঁজে ? বুড়া এক লোক।

রীনা বিরক্ত হয়ে বসার ঘরে গেল। মাথাভর্তি সাদা চুল দাড়ির এক ভদ্রলোক বসে আছেন। সেই গরমেও তার গায়ে সাদা সামার কোট। ভদ্রলোককে খুব চেনা লাগছে আবার ঠিক চেনাও যাচ্ছে না। ভদ্রলোক বললেন, কীরে রীন রীন টিন টিন চিনতে পারছিস না ?

রীনা হতভম্ব গলায় বলল, ছোটমামা!

যাক চুলদাড়ি দিয়ে তোকে বিভ্রান্ত করতে পারি নি। তোকে কিন্তু আমি একবার দেখেই চিনেছি। হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় তোর চেহারা যা ছিল— শাড়ি পরা অবস্থাতেও তাই আছে, একটুকুও বদলায় নি।

রীনা তার ছোটমামার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কত প্রিয় একজন মানুষকে কত দিন পরে দেখা। মনে হচ্ছে অন্য কোনো জীবন থেকে মানুষটা হঠাৎ উঠে এসেছেন। যেন একটা স্বপ্নদৃশ্য।

মা শোন, কেঁদে সময় নষ্ট করিস না, আমি এক্ষুণি চলে যাব। আমি গত তিন দিন ধরে ঢাকায় আছি কিন্তু তোর ঠিকানা বের করতে পারছিলাম না। আজ বিকেলে ফ্লাইট।

এক্ষুণি চলে যাবে ?

হ্যাঁ এক্ষুণি চলে যাব। আমি হংকং-এর একটা সেমিনারে এসেছিলাম। হঠাৎ ভাবলাম বাংলাদেশ হয়ে যাই। তোর সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, তবু যাক শেষ মুহূর্তে দেখা হলো।

তুমি এমন বুড়ো হয়ে গেলে কেন মামা ?

বয়স কত হয়েছে দেখবি না ?

তুমি সত্যি আজই চলে যাবে ?

হ্যাঁ ইয়াং লেডি, তুই চোখের পানি মুছে ফেলে দুই-একটা কথা টথা বল আমি শুনি। তোর বরের সঙ্গে কথা বলার শখ ছিল ও তো মনে হয় অফিসে।

মামা আমি বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করে দিচ্ছি ও চলে আসবে।

কোনো দরকার নেই। আসতে আসতে এক ঘণ্টা লাগবে— ততক্ষণ আমি থাকব না। মা শোন, আমি তোর জন্যে কোনো গিফট আনতে পারি নি— এখানে যে আসব তেমন পরিকল্পনা ছিল না। কয়েকদিন ছুটি পাওয়া গেল, তারপর দেখি টিকিটও এভেইলেবল। ভালো কথা, তোর ছেলেমেয়ে কী ?

দুই ছেলে মামা— টগর এবং পলাশ।

বাহ নাম তো খুব সুন্দর! ওরা কোথায় ?

ওরা তার ফুফুর বাসায় বেড়াতে গেছে।

আমার ভাগ্য খারাপ কারো সঙ্গে দেখা হলো না। মা শোন আমি কিন্তু আর দশ মিনিট থাকব তারপর উঠব। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

রীনার মামা সত্যি সত্যি দশ মিনিট থাকলেন। যাবার সময় রীনার হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, তোর বিয়েতে আমি কিছু দিতে পারি নি, এখানে সামান্য কিছু ডলার আছে, তুই তোর বরকে নিয়ে তোদের পছন্দমতো কোনো উপহার কিনে নিস। ছোটমামা চলে যাবার পর রীনা খাম খুলে দেখে সাতটা একশ ডলারের নোট। নিশ্চয়ই অনেক টাকা। জীবনে এই প্রথম রীনা ডলার দেখছে। সবুজ রঙের এই নোটগুলোর কী প্রচণ্ড ক্ষমতা!

সারা বিকাল রীনা ডলারভর্তি খাম নিয়ে ঘুরে বেড়াল। সাত শ ডলারে ঠিক কত টাকা হবে তাও জানে না। জানতে খুব ইচ্ছে করছে। যত টাকাই হোক সে একটা পয়সা খরচ করবে না। জমা করে রাখবে। শুধু শীতের আগে আগে টগর এবং পলাশের সুন্দর দুটা স্যুয়েটার কিনবে। গত বৎসর এদের জন্যে দুটা স্যুয়েটার তার খুব পছন্দ হয়েছিল। একেকটার সাড়ে চার শ' টাকা করে দাম। তার বাজেট ছিল পাঁচ শ টাকা। তারেককে ভালো একজোড়া পামসু কিনে দিতে হবে। প্রতিবছর ঈদের বাজারের সময়ে সে পামসু দেখে বেড়ায়। জুতা পরে মচমচ করে খানিকক্ষণ হাঁটে। রীনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে— ভালো ফিট করেছে। দাম শুনে আর কেনে না।

এই দুটা জিনিসের জন্যে সে যা টাকা লাগে খরচ করবে। তার বেশি না। একটা টাকাও না।

সন্ধ্যার আগে আগে তারেক ফেরে, আজ ফিরল না তবে হাসান ফিরল। রীনা প্রায় ছুটে গেল হাসানেব ঘরে। উৎফুল্ল গলায় বলল, কেমন আছ হাসান ?

হাসান প্রাণহীন গলায় বলল, ভাবি ভালো আছি।

হাসানের নিষ্প্রাণ গলা রীনার কানে বাজল না। সে আনন্দ ও উত্তেজনায় ঝলমল করছে।

আজ এত সকাল সকাল ফিরলে যে ?

একদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে দেখলাম কেমন লাগে।

কফি খাবে হাসান ?

কফি ?

আজ তোমার ভাইকে চমকে দেবার জন্যে একটিন কফি কিনিয়ে এনেছি। এতটুকু একটা টিন দাম নিয়েছে আশি টাকা।

ভাবি কফি খাব না।

আহা খাও। আমিও তোমার সঙ্গে খাব।

বেশ তো খাব।

রীনা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, হাসান তুমি কি জান বাংলাদেশে ডলার কত করে ?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না ভাবি।

এক ডলারের বদলে বাংলাদেশী কত টাকা পাওয়া যাবে ?

তুমি ডলারের খোঁজ করছ কেন ?

রীনা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আদার ব্যাপারি তো এইজন্যে ডলারের খোঁজ করছি। কত করে ডলার তুমি জান না ?

একশ ডলারে তিন হাজার পাঁচশ টাকা করে পাওয়া যায়।

রীনা দ্রুত হিসাব করে বলল— চব্বিশ হাজার পাঁচ শ, কী সর্বনাশ!

ভাবি বিড়বিড় করে কী বলছ ?

আমি কী বলব তুমি বুঝতে পারবে না। দেখি তুমি হাত পাত তো। চোখবন্ধ করে হাত পাত। আহা হাত পাত না।

হাসান হাত পাতল।

রীনা তার হাতে একটা একশ ডলারের নোট দিয়ে বলল, এটা তোমার। ভাবি ব্যাপার কী ?

আমি কিছু ডলার পেয়েছি, সেখান থেকে এক শ ডলার তোমাকে দিলাম। তোমার টাকায় আমি কত অসংখ্যবার ভাগ বসিয়েছি আজ সামান্য কিছু তোমাকে ফেরত দিতে পেরে আমার কী যে ভালো লাগছে তা তুমি কোনোদিনও বুঝতে পারবে না।

ডলার তোমাকে কে দিয়েছে ?

আমার ছোটমামা। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান। আর ফিরে আসেন নি। তিনি আজ দুপুরে হঠাৎ বাসায় এসে উপস্থিত। যাবার সময় আমাকে সাত শ ডলার দিয়ে গেছেন।

তুমি তো বিরাট বড়লোক ভাবি।

বড়লোকের চেয়ে বড় কথা হল— আমি কী যে খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

তোমার খিলখিল হাসি শুনে বুঝতে পারছি।

ডলারটা পকেটে রাখ হাসান।

হাসান ডলারটা পকেটে রাখল। রীনা বলল, তোমার মুখ এমন শুকনো কেন তোমার কি শরীর খারাপ ?

না।

মন খারাপ ?

হাসান কিছু বলল না। রীনার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হলো, সে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। হাসানের যে মন এতটা খারাপ তা সে বুঝতে পারে না। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে হাসানকে।

সত্যি কিছু হয় নি ?

না।

আমাকে বলতে পার। আমি শ্রোতা হিসেবে ভালো। তোমার সমস্যা আমাকে শুনিয়ে লাভ হবে না। আমি কিছু করতে পারব না। তারপরও শুনতে চাই।

শোনাবার মতো কোনো সমস্যা হয় নি।

বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ? তিতলী বেগম।

হাসান সামান্য হাসল। শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল, না ঝগড়া হয় নি।

আমার মনে হচ্ছে তোমরা ঝগড়া করেছ। ভালোবাসাবাসির সময়ে অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়। কঠিন প্রেম ভেঙে যায় যায় অবস্থাও হয়।

এসব কিছু না ভাবি। আমাদের কখনো ঝাগড়া হয় নি। মনোমালিন্য হয় নি।

তাহলে কী ?

হাসান সহজ গলায় বলল, তিতলীর বিয়ে হয়ে গেছে।

রীনা বিস্মিত হয়ে বলল, কী বললে ?

কাল বিকেলে ওদের বাসায় গিয়ে শুনলাম হঠাৎ করে ওর বিয়ে হয়ে গেছে।

কবে বিয়ে হলো ?

কবে বিয়ে হলো বলতে পারব না। এত কিছু জিজ্ঞেস করি নি।

ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

না। ও বাসাতেই ছিল— দেখা হয় নি।

রীনা কোমল গলায় বলল, হাসান মনটা কি খুব বেশি খারাপ হয়েছে ?

হ্যাঁ।

তোমার মন ভালো করার মতো কিছু কি আমি করতে পারি ?

কড়া করে এক কাপ কফি বানিয়ে খাওয়াতে পার।

তিতলীর ওপর তোমার কি খুব রাগ হচ্ছে ?

না রাগ হচ্ছে না। এক সময় আমরা দুজন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। যে যত অন্যায়ই করুক আমরা কেউ কারো ওপর রাগ করব না। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি।

রীনা উঠে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, আমি তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসছি। হাসান বলল, এখন কপি খাব না ভাবি। পরে এক সময় বানিয়ে দিও। কারো হাতে বরং খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি পাঠাও— পানির পিপাসা হচ্ছে।

ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র রীনার চোখে পানি এসে গেল। এমন একটা কষ্টের ব্যাপার ঘটেছে অথচ সান্ত্বনার কোনো কথা সে বলতে পারছে না। সান্ত্বনা হাসান চাচ্ছেও না। চাইলে নিজেই এসে বলত— । সে বলতে চায় নি রীনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করেছে। কোনো দরকার ছিল না। কেন সে জিজ্ঞেস করতে গেল ? রীনা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রাত ন'টার মতো বাজে। টেবিলে রাতের খাবার দেবার সময় হয়েছে। কমলার মা আজ টেবিলে খাবার দেবে না। তার শরীর ভালো না। সন্ধ্যা থেকে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। রীনা শঙ্কিত বোধ করছে। কমলার মার লক্ষণগুলো ভালো মনে হচ্ছে না। তার শরীর খারাপটা দেশে যাওয়ার ছুতো না তো ? প্রতিবারই দেশে যাবার আগে কমলার মার শরীর খারাপ করে। কয়েকদিন কোনো কাজকর্ম করে না। শুয়ে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে মন টিকছে না, দেশে যাব। টিনের ট্রাংক গুছিয়ে সে তৈরি। কার সাধ্য তাকে আটকায়। আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে সপ্তাহখানিক থেকে সে ফিরে আসে। ঘরে ছেলের বউয়ের যন্ত্রণায় টিকতে পারে না। এবার যদি ছেলের বউ যন্ত্রণা করে, যদি

আদর-যত্ন না করে তাহলে কী হবে ? আচ্ছা রীনার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। একটু আগে সে হাসানের এতবড় একটা দুঃসংবাদ শুনেছে। শোনার পরে সে কিনা ভাবছে কমলার মার কথা ? রীনা রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো। মনোয়ারার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকলেন।

বউমা শুনে যাও তো।

রীনা শাশুড়ির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে ভীত গলায় বলল, মা কিছু বলবেন ?

শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলার সময় তার সব সময় একটু ভয় ভয় লাগে।

তোমাকে দুপুরে একবার বললাম না ডেটল পানি দিয়ে আমার ঘরটা মুছে দেবার ব্যবস্থা করতে ? এখন বাজে রাত ন'টা। ঘরটা মোছা হবে কখন ? আর শুকাবে কখন ?

কমলার মার শরীরটা খারাপ। শুয়ে আছে।

দুদিন পরে পরেই তো শুনি শরীর খারাপ। মাখনের শরীর নিয়ে ঝি-গিরি করতে আসে কেন ? পটের বিবি সেজে পালঙ্কে ঘুমায়ে থাকলেই পারে। তুমি বালতিতে করে এক বালতি পানি, ডেটলের শিশি আর একটা ন্যাকড়া দিয়ে যাবে। তোমার শ্বশুরকে দিয়ে মোছাব। উপায় কী ?

টগরদের খাইয়ে আমি নিজেই এসে মুছে দেব।

তোমার মুছতে হবে না। তারপর চারদিকে বলে বেড়াবে শাশুড়ি এই করেছে সেই করেছে। ছেলের বউয়ের কথা শোনার আমার দরকার নেই। এই বয়সে কথা শুনতে ভালো লাগে না।

আপনি কি মা এখন ভাত খাবেন ?

এখন ভাত খাব না তো কি শেষরাতে খাব ? এটা তো মা রোজার মাস না যে সেহেরি খাওয়াবে।

টেবিলে ভাত বেড়ে আপনাকে খবর দেব।

তারেক এসেছে ?

জ্বি না।

এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকে ?

জানি না মা।

জানি না মা বললে তো হবে না। জানতে হবে। পুরুষমানুষ আর ছাগল এই দুই জিনিসকে চোখে চোখে রাখতে হয়। কখন কীসে মুখ দেয় কিছু বলা যায় না। রাতে যেদিনই দেরি করে ফিরবে মুখের কাছে নাক নিয়ে গন্ধ শুঁকবে। মদ ফদ খেয়েছে কি না বোঝার এটাই বুদ্ধি। একদিন তোমার শ্বশুর কী করেছে শোন— বাসায় ফিরেছে রাত বারটায়। দেখি মুখভর্তি পান। পানের রস গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। দেখেই সন্দেহ হলো কোনোদিন পান খায় না আজ হুজুর খাচ্ছেন কেন ? মুখের কাছে মুখ নিতেই গন্ধ পেলাম। বললাম, গন্ধ কীসের ? তোমার শ্বশুর বলল, জর্দা দিয়ে পান খেয়েছি তো জর্দার গন্ধ। আমি বললাম তুমি পান খাও না—আজ একেবারে জর্দা দিয়ে পান। ব্যাপারটা কী ? তখন দেখি হুজুর গাঁইগুঁই করে। একটু চাপ দিতেই আসল জিনিস বের হয়ে পড়ল। সে নাকি

বন্ধুদের চাপে পড়ে অতি সামান্য হুইস্কি খেয়েছে। আমি বললাম অতি সামান্যটা কত ?

হুজুর বললেন, এক চামচ।

আমি বললাম, কত বড় চামচ ? ডালের চামচ না চায়ের চামচ ?

তরকারির চামচের এক চামচ।

আমি বললাম, এক চামচ হুইস্কি যখন খেয়েছ তখন এক চামচ গু খেতে হবে। গু খেলে বমি হবে। পেটের জিনিস বের হয়ে আসবে। আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, তোমাকে আজ আমি এক চামচ গু খাওয়াব বলেই চায়ের চামচে এক চামচ গু নিয়ে এলাম।

রীনা শঙ্কিত গলায় বলল, খাওয়ালেন ?

গু দেখেই হুজুরের খবর হয়ে গেল। বুঝে গেল আমি খাইয়ে ছাড়ব। বমিটমি করে ঘর ভাসিয়ে ফেলল। সত্যি সত্যি তো আর খাওয়াতাম না। ভাব ধরেছিলাম। ওই ভাবেই কাজ হয়েছে। শাশুড়ির কাছ থেকে একটা জিনিস শিখে রাখ মা। সব সময় ভাব ধরবে। ভাবেই কাজ হবে। পুরুষ মানুষ যদি রাত এগারটা-বারটার সময় ঘরে ফেরে তখন বুঝবে খবর আছে। অনেক কথা বলা হয়েছে এখন যাও ভাত দাও। হুজুর কোথায় ?

টগর আর পলাশকে পড়াচ্ছেন।

তাহলেই কাজ হয়েছে। ওদের আর ইহজনমে পাস করা লাগবে না। হুজুরকে আগে ভাত দাও। হুজুরের খাওয়া শেষ হলে আমাকে দেবে।

তারেক ফিরল রাত বারটার একটু আগে। রীনা দরজা খুলে দিল। তারেক বিব্রতমুখে বলল, দেরি করে ফেললাম। তুমি ভাত খেয়েছ ? রীনা না সূচক মাথা নাড়ল।

তুমি খেয়ে নাও। আমি খাব না। খেয়ে এসেছি।

কোত্থেকে খেয়ে এলে ?

বলছি দাঁড়াও। হাতমুখটা ধুয়ে নি। শরীরটা ঘামে চটচট করছে। রিকশা পাচ্ছিলাম না। হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা কাহিল। গোসল করে ফেলব কিনা ভাবছি।

ভাবাভাবির কী আছে, কর।

তুমি এক কাপ চা দাও। গোসল করে গরম গরম এক কাপ চা খাব। আচ্ছা থাক তুমি খাওয়াদাওয়া সেরে চা দিও।

গিয়েছিলে কোথায় ?

লাবণীদের বাসায় মিলাদের দাওয়াত ছিল। ওর স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকী। না গেলে ভালো দেখায় না ? দুঃখী মেয়ে সেই জন্যেই যাওয়া।

মিলাদ কখন ছিল ?

বাদ আছর ছিল। অফিস থেকে সরাসরি সেই জন্যেই চলে গিয়েছিলাম। মিলাদে লোকজন কিছুই হয় নি। বলতে গেলে আমি আর মওলানা সাহেব। মিলাদে তো আর আজকাল লোক হয় না, গানবাজার জলসা হলে লোক হয়।

মিলাদ রাত বারটা পর্যন্ত চলল ?

আরে না। আছর ওয়াক্তের মিলাদ খুব ছোট হয়। আমি চলে আসতাম লাবণী এমন কান্নাকাটি শুরু করল। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাত হয়ে গেল।

তারেক বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রীনার খিদে মরে গেছে। কিছু মুখে দিতে ইচ্ছা করছে না। তারপরেও তাকে খেতে বসতে হবে কারণ লায়লা তার সঙ্গে খাবে বলে এখনো খায় নি। ভাবি খায় নি বলে সে না খেয়ে বসে থাকবে লায়লা তেমন মেয়ে নয়। তার পেটে বিশেষ কোনো গল্প আছে বলেই সে ভাবির সঙ্গে নিরিবিলিতে খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

খেতে বসে রীনা বলল, কিছু বলবে লায়লা ?

লায়লা বলল, না তো।

তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাও।

কিছু বলতে চাই না। বলব আবার কী ? ভাবি তুমি কি কখনো মাড ট্রিটমেন্ট করেছ ?

মাড ট্রিটমেন্টটা কী ?

মাড ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ভাবি অদ্ভুত একটা জিনিস। মুখের চামড়া ঠিক করার জন্যে এরচে' ভালো কিছু হতে পারে না। কী করতে হয় শোন— কিছু এঁটেল মাটি নিতে হয়। কাগজি লেবুর রস, জামপাতার রস আর সামান্য ফিটকিরি মিশিয়ে এঁটেল মাটিটাকে কাঁদা বানাতে হয়। খুব মিহি কাদা প্রয়োজনে শিলপাটায় বেটে নেয়া যায়। তারপর সেই মিহি কাদাটা মুখে মেখে ঘুমিয়ে পড়তে হয়। সকালবেলা মুখ ধুয়ে ফেলা। সপ্তাহে একদিনও যদি করা যায় তাহলে মুখে কোনোদিনও রিংকেলস পড়ে না। চামড়া হয় উজ্জ্বল এবং সফট...

লায়লা আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে রীনা মনে মনে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল— মেয়েটা কী সুখে আছে! পৃথিবীর কোনো সমস্যাই তাকে স্পর্শ করে না। সে আছে নিজের মতো। সাজগোজের সামান্য উপকরণ পেলেই সে তৃপ্ত। সংসার চলছে না, একটা ভাইয়ের চাকরি নেই, তার নিজের বিয়ের কিছু হচ্ছে না— তাতে কী ?

ভাবি।

হুঁ।

তুমি আমাকে খানিকটা এঁটেল মাটি যোগাড় করে দেবে ?

তুমি মাড ট্রিটমেন্ট করে কী করবে। তোমার মুখের চামড়া এমনিতেই উজ্জ্বল। আয়নায় নিজেকে দেখ না ?

দেখি তো। সারাক্ষণই তো আয়নায় দেখি। আমার নিচের ঠোঁটটা ভাবি একটু বেশি মোটা, আরেকটু কম মোটা হলে ভালো লাগত।

মোটা ঠোঁটের আলাদা সৌন্দর্য আছে।

এটাও ভাবি ঠিক বলেছ। পুরুষরা মোটা ঠোঁট পছন্দ করে। মোটা ঠোঁটের মেয়েদের খুব সেক্সি লাগে তো এই জন্যে।

হাসান ভাত খাবে না।

তার জ্বর এসেছে। রীনা গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে আসলেই জ্বর। বেশ ভালো জ্বর।

রীনা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ল। রুচি হচ্ছে না। প্লেটভর্তি ভাত রেখে উঠতেও কষ্ট হচ্ছে। ছোটবেলায় মা বলতেন না খেয়ে ফেলে রাখা প্রতিটা ভাত সত্তরটা করে সাপ হয়ে দংশন করবে। সেই স্মৃতি বোধহয় মনে রয়ে গেছে।

ভাবি তোমার কি কোনো কারণে মন খারাপ?

না।

ভাবি মন সব সময় ভালো রাখতে হবে। মন খারাপ হলে শরীরের ওপর তার এফেক্ট হয়। চোখের নিচে কালি পড়ে, মুখের চামড়া টামড়া চিমসে মেরে যায়। মাথার চুলও পাতলা হয়ে যায়।

এই জন্যেই কি তুমি কখনো মন খারাপ কর না?

অনেকটা তাই। আমি দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করি ভাবি।

দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপনের পদ্ধতি এক সময় তোমার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে। আমি সব সময় ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় থাকি।

তোমাকে দেখে অবশ্যি তা বুঝা যায় না। তবে এক সময় বোঝা যাবে। হঠাৎ একদিন দেখা যাবে তুমি বুড়ি হয়ে গেছ। তোমার চামড়ায় রিংকেলস পড়েছে।

তখন মাড ট্রিটমেন্ট করব। এ ছাড়া আর উপায় কী?

ভাবি কমলার মা তো দেশে যাচ্ছে ওকে বলেছি কিছু এঁটেল মাটি নিয়ে আসতে।

রীনা শঙ্কিত গলায় বলল, ও দেশে যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ আমাকে তো বলল, তার নাকি শরীর টিকছে না।

কী সর্বনাশের কথা!

একবস্তা এঁটেল মাটি নিয়ে এলে আমাদের অনেক দিন চলে যাবে।

রীনা চা বানাতে বসেছে। লায়লা তার পাশে বসে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। রীনার মনে হলো লায়লা তার মার স্বভাব পেয়েছে। দুজনই কথা বলতে পছন্দ করে। যাকে কথাগুলো বলা হচ্ছে সে শুনছে কি শুনছে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

তারেক গোসল শেষ করে তার ভাইয়ের ঘরে উঁকি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা আসবে। চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটের অভ্যাসটা বোধহয় হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝেই সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। একটা প্যাকেট কিনে আলমারিতে রেখে দিতে হবে।

হাসানের ঘরে বাতি জ্বলছে। সে আধশোয়া হয়ে আছে। সন্ধ্যা থেকেই তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, এখন যন্ত্রণাটা বেড়েছে। জ্বর এসেছে। জ্বরটা কত কে জানে। মনে হচ্ছে আজ রাতে ঘুম হবে না। আর ঘুম হলেও হাঁসের স্বপ্নটা দেখবে।

তোর শরীর খারাপ নাকি রে?

না।

মুখটুখ শুকিয়ে কেমন হয়ে আছে। তোর কাছে কি সিগারেট আছে? থাকলে একটা দে।

হাসান প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট বের করে ভাইয়ের দিকে দিল। তারেক বলল, আরেকটা দে— বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাব।

তোমার দেখি সিগারেটের নেশা হয়ে যাচ্ছে।

তারেক হাসল। হাসানের মনে হলো তার ভাইকে আজ খুশি খুশি লাগছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার জীবনে আনন্দময় কোনো ঘটনা ঘটেছে।

ভাইয়া বস।

তোর ভাবিকে বলেছিলাম চা দিতে। ভুলে গেছে কিনা কে জানে।

ভাবি ভুলবে না।

তুই খাবি ? তুই খেলে রীনাকে বলে আসি।

আমি খাব না। তুমি খাও।

তারেক বসল। আরাম করে সিগারেট ধরাল। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর চাকরির ব্যাপারে আজ কথা বললাম।

কার সঙ্গে কথা বললে ?

লাবণীর সঙ্গে কথা বললাম। লাবণীর আপন মামা কমার্স মিনিস্টার। তাদের হাতে অনেক চাকরি। লাবণীর চাকরির ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।

আজ কি তুমি ওই মহিলার বাসায় গিয়েছিলে ?

হুঁ।

প্রায়ই কি যাও ?

প্রায়ই যাব কী ? মাঝে মধ্যে যাই। দুঃখী মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথা বললে মনে শান্তি পায়। আজ ওর হাসবেন্ডের মৃত্যুদিবস ছিল। সেই উপলক্ষে মিলাদ।

ও।

লাবণীকে চিটাগাং বদলি করে দিয়েছে। সামনের সপ্তাহে চলে যাবে। অফিসের কাণ্ডকারখানা দেখ— একটা মহিলা হুট করে তাকে বদলি করে দিল চিটাগাং।

উনার মামাকে দিয়ে বলালেই বদলি রদ হয়ে যাবে।

লাবণীও চিটাগাং যেতে চাচ্ছে— সেখানে কোয়ার্টার পাবে। নিজের মতো করে থাকতে পারবে। অবশ্যি আজকালকার সোসাইটি যা হয়েছে একজন মহিলার পক্ষে বাচ্চা একটা মেয়ে নিয়ে থাকা মুশকিল। তার উপর আবার বিধবা।

হুঁ।

একা একা চিটাগাং যেতেও ভয় পাচ্ছে। আমি বলেছি পৌঁছে দেব।

তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না ভাইয়া।

এত জিনিসপত্র নিয়ে একা একা যাবে কীভাবে ?

দরকার হলে আমি পৌঁছে দেব।

তোর সঙ্গে যাবে কেন ? তোকে সে চেনে নাকি ? আমাকেই যেতে হবে। তোর ভাবিকে বলব দুদিনের একটা ট্যুর পড়ে গেছে।

হাসান গভীর বিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। কী রকম সহজ সরল ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে— যেন জীবনে জটিলতা বলতে কিছু নেই। জীবনটা শান্ত দিঘির জলের মতো।

রীনা চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হলো।

তুমি এখানে আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারেক আনন্দিত গলায় বলল, হাসানের সঙ্গে গল্প করছিলাম— ওর চাকরির একটা লাইন পাওয়া গেছে। লাবণীর এক মামা হচ্ছেন কমার্স মিনিস্টার। ফুল মিনিস্টার না—

প্রতিমন্ত্রী। তবে প্রতিমন্ত্রীদেরও অনেক ক্ষমতা। মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। লাবণী বলেছে একটা বায়োডাটা তৈরি করে ওর হাতে দিতে।

রীনা গম্ভীর গলায় বলল, ভালো কথা দিও।

তারেক উৎসাহী গলায় বলল, হাসান তুই সুন্দর করে একটা বায়োডাটা তৈরি করে দু-এক দিনের মধ্যে আমাকে দে, সার্টিফিকেট মার্কশিটের ফটোকপি দিবি, দুটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, লেটার অব রেফারেন্স কিছু থাকলে তাও দিবি।

আচ্ছা দেব।

আমি যাই তুই আরাম করে ঘুমো। এত চিন্তা করে কী হবে। রুটিরুজি নিয়ে এত চিন্তা করতে নাই।

তারেক চলে যাবার পর হাসান ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। গত রাতে সে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোতে পারে নি— মনে হয় আজো ঘুমোতে পারবে না। কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসা দরকার ছিল।

তিতলী অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে সুখে আছে— গল্প করছে এই চিন্তাটাই তাকে কষ্ট দিচ্ছে। তিতলী কী নিয়ে গল্প করে? তার গল্প করার বিষয়বস্তুর অভাব হবার কথা না। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও সে সুন্দর কথা বলে। বড়লোক স্বামীর ঘর করছে— গানও নিশ্চয়ই এখন শিখবে। সে কি তার স্বামীকে ওই গানটা শোনাবে? যে গানটা তাকে শোনাবার কথা ছিল। গানটার লাইনগুলো কী? আশ্চর্য এখনো মনে আসছে না। এক কপি গীতবিতান কিনে প্রতি গানের প্রথম লাইনের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেই গানটা পাওয়া যাবে। হাসান সেটা চাচ্ছে না। তার ইচ্ছা আপনাতেই গানটা তার মনে আসুক। 'বিধি ডাগর আঁখি?' উঁহুঁ। চরণ ধরি দিও গো... উঁহুঁ। না তাও না। তাহলে গানটা কী?

হাসানের মাথা দপদপ করেছে। সে উঠে এসে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াল। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ আছে— চাঁদটা দেখা যাচ্ছে না। ডান দিকের সাততলা বাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তিতলী এবং তার স্বামী কি চাঁদটা দেখতে পাচ্ছে? আচ্ছা তারা কি জেগে আছে? জেগে থাকারই কথা। নতুন বিয়ে হওয়া স্বামী-স্ত্রীরা চট করে ঘুমোতে যায় না। এক ধরনের মধুর ইনসমনিয়ায় তারা আক্রান্ত হয়। হাসানের মাথাধরাটা আরো বাড়ছে। সে বাথরুমের দিকে রওনা হলো। কলের নিচে মাথা দিয়ে সে কলটা অনেকক্ষণ ছেড়ে রাখবে। কলে পানি আছে তো? কদিন ধরে পানির খুব টানাটানি যাচ্ছে। সন্ধ্যারাতেই পানির ট্যাংক খালি হয়ে থাকে। আজ কি কৃষ্ণপক্ষ না শুক্লপক্ষ?

১৪

এক শ ডলারের নোটটা হাসান ভাঙিয়েছে। তার ভাগ্য ভালো ডলারের দাম হঠাৎ চড়ে যাওয়ায় তিন হাজার সাত শ টাকা পেয়েছে। এক শ টাকার নোটে পাঞ্জাবির পকেট ভর্তি। একটা হাত সব সময় পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে হচ্ছে। সব সময় টাকা ছুঁয়ে থাকা।

হাসান আজ কিছু উপহার কিনবে। লিটনের স্ত্রীর জন্যে ভালো একটা শাড়ি। লিটনের জন্যে একটা পাঞ্জাবি, পায়জামা এবং একজোড়া স্যান্ডেল। লিটনের স্যান্ডেল

দেখে সেদিন খুব মায়া লেগেছিল। উপহারের চেয়ে টাকাটা পেলে তাদের কাজে লাগত। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় বিয়ে করার যন্ত্রণায় হাসানকে যেতে হয় নি। এটা কম কি?

তার জীবনে যা ঘটেছে মনে হয় ঠিকই ঘটেছে। তিতলীর ভালো বিয়ে হয়েছে। প্রথম কিছুদিন সে কষ্ট করবে তারপর সেই কষ্ট গা সহা হয়ে যাবে। সব কষ্টই মানুষের একসময় শেষ হয়ে যায়। মানুষের কষ্ট গ্যাস বেলুনের মতো— উঁচুতে উঠতে থাকে— এক সময় না এক সময় সেই বেলুন নেমে আসতে থাকে। বেলুন ভর্তি গ্যাস থাকে ঠিকই তবে গ্যাসের বেলুনকে উড়িয়ে রাখার ক্ষমতা থাকে না।

হাসান সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি কিনল। শাড়ি কেনার সময় তিতলীর কথা মনে পড়ল। কোন রঙটা তিতলীকে মানাবে ভেবে কেনা। শাড়ি পছন্দ করার একটা বুদ্ধিও তিতলী তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। সেই বুদ্ধিটাও খুব সুন্দর। দোকানদার অনেকগুলো শাড়ি মেলে ধরবে। তখন তুমি দেখবে কিছু কিছু শাড়ি তোমার হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে। ওই শাড়িগুলোই শুধু কিনবে। তিতলী সব সময় মজার মজার কথা বলত। এখনো কি বলে?

লিটনকে তার মেসে পাওয়া গেল। কেরোসিনের চুলায় সে ভাত বসিয়েছে। একটা বাটিতে ডিম ফেটে রেখেছে। ভাত নেমে যাবার পর ডিম ভাজবে। লিটন হাসানকে দেখে লাফিয়ে উঠল— আরে তুই।

ভাবিকে দেখতে এসেছি, আমাকে নিয়ে চল।

লিটন হাসিমুখে বলল, আশ্চর্য কাণ্ড, আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি তুই এসেছিস। খুবই অদ্ভুত একটা স্বপ্ন। দেখি কী, আমি আর শম্পা কক্সবাজারে বেড়াতে গেছি। সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছি। হঠাৎ শম্পা চেঁচিয়ে বলল, ওই দেখ তোমার বন্ধু বসে আছে। আমি বললাম, তুমি তো তাকে কোনোদিন দেখ নি। চিনলে কী করে। শম্পা তখন এমন হাসতে শুরু করল যে হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখি রাত তিনটা বাজে। তারপর আর ঘুম হয় নি। রাতে চা বানিয়ে খেলাম। সকালে দোকান থেকে পরোটা এনে খেয়েছি। এখন এগারটা বাজে, এর মধ্যে ক্ষিধে লেগে গেছে। ভাত বসিয়েছি।

নিজেই রান্না করে খাস?

হুঁ। খরচ বাঁচে। অবস্থা কাহিল রে দোস্ত।

তুই ভাত খেয়ে নে। আমি বসি।

তোকে একটা ডিম ভেজে দি খা।

না— আমি খাব না।

খা নারে দোস্ত। আমি গরিব মানুষ এর বেশি কী দেব। দাঁড়া আমি চট করে একটা ডিম নিয়ে আসি।

আমার জন্যে কিচ্ছু আনতে হবে না। তুই খেয়ে শেষ কর। তোর জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি— গায়ে দিয়ে দেখ লাগে কি না।

আমার জন্যে পাঞ্জাবি কেন? আমি কী করলাম?

তুই বিয়ে করেছিস। ফকির অবস্থায় বিয়ে করে যে সাহস দেখিয়েছিস সেই সাহসের পুরস্কার।

মাই গড! স্যান্ডেলও কিনেছিস নাকি ?

হ্যাঁ। তোর এখনকার স্যান্ডেল জোড়া দয়া করে আমার হাতে দে। আমি নিজে ডাস্টবিনে ফেলব।

এত দামি পাঞ্জাবি কিনেছিস ? টাকা পেলি কোথায় ? তোর কি চাকরি বাকরি কিছু হয়েছে ?

না। শোন লিটন, তোদের উপহার দেয়ার জন্যে আমি কিছু টাকা বাজেট করেছিলাম। উপহার কেনার পর কিছু টাকা বেঁচে গেছে। এই টাকাটাও আমি দিতে চাই। কার কাছে দেব ? তোর কাছে না তোর স্ত্রীর কাছে ?

লিটন কথা বলছে না। তার ডিম ভাজা হয়ে গেছে—আগুনগরম ভাত সে কপ কপ করে খাচ্ছে। অভাবের সময় মানুষের ক্ষিধে বেশি লাগে এটা বোধহয় ঠিক।

হাসান।

হুঁ।

তুই যে খুব অদ্ভুত একটা প্রাণী তা কি তুই জানিস ?

না।

তোর বন্ধুবান্ধবরা সবাই কিন্তু এটা জানে।

জানলে তো ভালোই।

কত মানুষের দোয়া যে তোর ওপর আছে!

দোয়ায় তো কাজ হয় না।

তা হয় না। কাজ হলে আমার দোয়াতেই তোর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। ভালো চাকরি বাকরি করে সুখে ঘর-সংসার করতি।

আমি সুখেই আছি।

সুখে থাকলে তো ভালোই।

লিটন নতুন পয়জামা-পাঞ্জাবি পরল। স্যান্ডেল পরল। হাসিমুখে বলল, হাসান আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?

খুবই ভালো দেখাচ্ছে শুধু মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িটায় সমস্যা করছে। ভালমতো শেভ কর।

নাপিতের দোকানে শেভ করব। শম্পা আজ কী যে খুশি হবে— ওর খুশি খুশি মুখ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গত চারদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি।

কেন ?

খুবই লজ্জার ব্যাপার— তোকে বলতেও লজ্জা লাগছে।

লজ্জা লাগলে বলার দরকার নেই।

শোন। তোকে না বললে আর কাকে বলব, হয়েছে কী, শেষবার যখন শম্পার সঙ্গে দেখা হলো সে হঠাৎ খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে ? আমি বললাম, কত ? সে বলল, পাঁচ শ টাকা দিলেই হবে। আমি বললাম আজ তো সঙ্গে নেই। পরের বার যখন আসব নিয়ে আসব। টাকার যোগাড় হয় নি

যাওয়াও হয় নি। আজ তুই যখন বললি, উপহার কেনার পর কিছু টাকা বেঁচেছে তুই টাকাটা দিয়ে দিতে চাস তখন আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। তুই বোধহয় লক্ষ করিস নি আমি সেই সময় ডিম ভাজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পুরুষ মানুষের চোখের পানি কাউকে দেখাতে নেই।

শম্পা শাড়ি দেখে ছেলে মানুষের মতো খুশি হলো। কয়েকবার বলল, আশ্চর্য এত সুন্দর শাড়ি! এত সুন্দর রঙ!

লিটন বলল, যাও তো তুমি শাড়ি পরে আস। আর এই খামটা রাখ।

খামে কী ?

এক হাজার টাকা আছে। রেখে দাও— টুকটাক খরচ আছে না ?

শম্পা খুবই লজ্জিতভাবে হাসানের দিকে তাকাচ্ছে। লিটন বলল, হাসান মিষ্টি এনেছে— মিষ্টি ভেতরে দিয়ে আস। বাচ্চারা খাক। আর শোন তুমি হাসানের সঙ্গে দু-একটা কথা বল। এমন মূর্তির মতো বসে আছ কেন ?

শম্পা আরো লজ্জিত হয়ে বলল, আমি শাড়িটা পরে আসি। আর শোন তুমি এই চার দিন আস নি কেন ?

মানুষের কাজকর্ম থাকে না ?

শম্পা হাসানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লিটনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি গতকাল তোমার মেসে গিয়েছিলাম। তুমি ছিলে না। কেউ তোমাকে বলে নি ?

কী আশ্চর্য! তুমি মেসে উপস্থিত হলে কোন আন্দাজে ? তোমাকে না বলেছি আজেবাজে জায়গায় থাকি কখনো যাবে না।

কেন তুমি চারদিন আস্‌লে না ?

শম্পার চোখে পানি এসে গেছে। একটু আগে যে মেয়ে শাড়ি হাতে আনন্দে ঝলমল করছিল এখন সে প্রায় বাচ্চাদের মতোই শব্দ করে কাঁদছে। হাসান খুব অস্বস্তিতে পড়েছে। আবার তার খুব ভালোও লাগছে। তার মন বলছে লিটনের সব সমস্যার সামধান হবে। তাদের দুজনের সুন্দর সংসার হবে। সেই সংসারে চাঁদের মতো খোকাখুকু আসবে। ভালবাসার পবিত্র অশ্রু প্রকৃতি কখনো অবহেলা করে না।

লিটন বলল, শম্পা তুমি যাও তো শাড়িটা পরে আস। আর শোন প্লেটে করে হাসানকে একটু মিষ্টি দাও। ওর মিষ্টিই ওকে খাইয়ে দি। বেলপাতায় বেলপূজা। হা হা হা।

শম্পা শাড়ি হাতে ভেতরে চলে গেল। লিটন বলল, হাসান আমার বউকে কেমন দেখলি ?

সুন্দর খুব সুন্দর।

ছেলেমানুষ— বয়সও অবশ্য কম। জুন মাসে আঠার হবে। এই কদিন আসি নি কেঁদে কেটে কী সিন ক্রিয়েট করল দেখলি! তুই থাকায় রক্ষা নয়তো আরো হইচই করত।

লিটন তুই এক কাজ কর বউকে নিয়ে আজ সারাদিন ঘুরে বেড়া। কিছু টাকা তো আছে?

কোথায় ঘুরব?

জাদুঘর, চিড়িয়াখানা কিংবা এক কাজ কর—সদরঘাটে গিয়ে একটা নৌকা ভাড়া কর। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরবি। কিছু খাবারদাবার সঙ্গে নিবি, একটা ফ্লাস্কে করে চা।

নৌকা ভাড়া কত জানিস?

ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া। পঞ্চাশ টাকা করে ঘণ্টা। নৌকায় বসে দুজনে গল্পগুজব করবি।

মাঝি ব্যাটা তো সব শুনবে।

শুনুক, অসুবিধা কী?

তুইও চল আমাদের সাথে।

আরে না। আমি না। পুরো ব্যাপারটাই দুজনের।

শম্পার চুল কত লম্বা দেখেছিস?

হ্যাঁ, খুব লম্বা চুল।

সেদিন কী বলল শোন, ফট করে বলল, আমি যদি তার সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া করি তাহলে সে চুল কেটে ফেলবে। যা সেনসেটিভ স্বভাব—কেটে ফেলবে তো বটেই। আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি।

লিটন তৃপ্তির হাসি হাসছে। হাসান মুগ্ধ হয়ে লিটনের হাসি দেখছে। না শম্পা মেয়েটা ভাগ্যবতী। সে তার এক জীবনে অসংখ্যবার স্বামীর সুন্দর হাসি দেখবে।

১৫

হিশামুদ্দিন সাহেব বাথরুমে ঢুকে কল ছাড়লেন তখন হঠাৎ তার মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। অস্পষ্ট কাঁপুনি। আশ্চর্য কাণ্ড! সেই কাঁপুনি তার শরীরের প্রতিটি কোষে ঢুকে যাচ্ছে। শরীরও কাঁপছে। ব্যাপারটা কী? তিনি এক হাতে বেসিনে ধরে ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলালেন। ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ি ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় ছুটে যেতে হয়। তার পা থেমে গেছে—তিনি বাথরুম থেকে বেরোবার আশা ছেড়ে দিলেন। বের হওয়া এখন অসম্ভব। তাকে যেতে হবে দরজা পর্যন্ত। দরজার লক খুলতে হবে। অথচ পা জমে আছে। ভূমিকম্পের দুলুনি আরো বাড়ছে। তার শরীরের দুলুনিও বাড়ছে। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন—চিত্রলেখা! চিত্রলেখা! নিজের গলা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে কি না তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। চারদিক থেকে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। সবাই যেন টিনের থালাবাসন হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। তিনি আবারো ডাকলেন চিত্রলেখা! চিত্রলেখা! কেউ কি আযান দিচ্ছে। তিনি আযানের শব্দও শুনছেন।

মহাপ্রাকৃতিক বিপদে মানুষ আযান দেয়। আযান কে দিচ্ছে? মোতালেব?

বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ছে। কে যেন মিষ্টি গলায় ডাকছে— বাবা দরজা

খোল। দরজা খোল। কে ডাকছে ? চিত্রলেখা ? তার গলা তো এমন না। মনে হচ্ছে দশ বছরের কোনো বালিকা।

বাবা তোমার কী হয়েছে ?

ভূমিকম্প হচ্ছে রে মা।

দরজা খোল তো বাবা।

আমি নড়তে পারছি না রে মা।

খোলা কল দিয়ে ছড়ছড় শব্দে পানি পড়ছে। বাথরুমের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে আবার কমে যাচ্ছে। হিশামুদ্দিন বুঝতে পারছেন তার বাথরুমের দরজার পাশে অনেকেই ভিড় করেছে। দরজায় শব্দ হচ্ছে। তারা বোধহয় দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টা বাদ দিয়ে তাদের উচিত— নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়া। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কারো দিকে তাকাতে হয় না। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কারো দিকেই না। শুধু নিজেকে বাঁচানো। তার মধ্যে দোষের কিছু নেই। প্রকৃতি মানুষের ডিএনএ কোষে এই ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির মমতা তার সৃষ্টির জন্যে। প্রকৃতি জানে মহাবিপদের সময় যদি একে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকে তাহলে কেউ বাঁচবে না। কাজেই প্রকৃতি এই বিধান ডিএনএ-তে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যে বিধানে ভয়ঙ্কর বিপদে মানুষের সব চিন্তা নিজের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু এরা এমন করছে কেন ? এরা কেন ছুটে গিয়ে মাঠে কিংবা ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে না। টিনের থালা বাসন পেটানোরও বা অর্থ কী। আনন্দের কোনো ব্যাপার তো না যে ঘণ্টা বাজাতে হবে ?

বাথরুমের দরজা ভাঙা হয়েছে। দরজার ওপাশে উদ্বিগ্নমুখে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। মোতালেব, রহমতউল্লাহ, চিত্রলেখা। চিত্রলেখা বাথরুমে ঢুকে বাবার হাত ধরল। পানির ট্যাপ বন্ধ করল। হিশামুদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বললেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। চিত্রলেখা বলল, ভূমিকম্প হচ্ছে না। তোমার শরীর খারাপ করছে। মনে হয় প্রেসার সাডেন শুট করেছে। তুমি কি আমার হাত ধরে ধরে হাঁটতে পারবে ? নাকি তোমাকে কোলে করে নিতে হবে ?

হাঁটতে পারব।

তাহলে এস।

পা আটকে গেছে। পা নাড়াতে পারছি না।

কোনো অসুবিধা নেই। আপাতত পা না নাড়ালেও চলবে। তোমাকে কোলে করে নেবার ব্যবস্থা করছি।

হিশামুদ্দিন সাহেব খুবই বিস্মিত হচ্ছেন। কল বন্ধ করা হয়েছে অথচ এখনো পানি পড়ার ছড়ছড় শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে শব্দটা মাথার ভেতর ঢুকে পড়েছে। অনন্তকাল এই শব্দ মাথার ভেতর হতেই থাকবে। একঘেয়ে শব্দের জন্যে হিশামুদ্দিন সাহেবের কেমন ঘুমও পেয়ে গেছে। যন্ত্রণাময় ঘুম। প্রবল জ্বরের সময় এ ধরনের ঘুম পায়। ঘুম হচ্ছে অথচ শারীরিক সব যন্ত্রণা টের পাওয়া যাচ্ছে। সবার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে— এ রকম।

হিশামুদ্দিন সাহেব শুয়ে আছেন তার নিজের খাটে। ঘর অন্ধকার। জানালার সব পরদা টেনে দেয়া। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। দিনের শুরুটা ঠাণ্ডা। ফ্যানের বাতাসে

তার শীত শীত লাগছে। গায়ে একটা পাতলা চাদর দিয়ে দিতে কি চিত্রলেখাকে বলবেন ? শীত শীত ভাবটা খুব যে খারাপ লাগছে তা না। মাঝে মাঝে একটু শুধু কাঁপন লাগছে— এই যা।

শরীরটা এখন কেমন লাগছে বাবা ?

ভালো।

তোমার ব্লাডপ্রেসার এখন অনেকখানি কমেছে। তবে পালস রেট এখনো হাই— মিনিটে ৯৮, তবে রেগুলার হয়েছে— আগে খানিকটা ইরেগুলারিটি ছিল। তোমাকে আমি টাংকুলাইজার দিয়েছি। এতে ঘুম হবে কিংবা তন্দ্রার মতো হবে। তোমার থরো চেকাপের একটা ব্যবস্থা আমি করছি। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা তুমি নাড়াতে পার কি না একটু দেখ তো।

হিশামুদ্দিন পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়লেন। চিত্রলেখা বলল, গুড। এখন ব্রেকফাস্ট কর। হালকা কিছু খাও। দুধ সিরিয়েল, আধ কাপ ফলের রস। এক কাপ আগুনগরম চা।

তুই তো সত্যিকার ডাক্তারদের মতো কথা বলছিস।

আমি সত্যিকারেই ডাক্তার। আমি এখন একটু বের হব। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। তোমার কানে যে যন্ত্রণা হচ্ছিল সেটা কি এখনো হচ্ছে ?

না।

একসেলেন্ট। কাঁপছ কেন ? তোমার কি শীত লাগছে ?

একটু মনে হয় লাগছে।

গায়ে চাদর দিয়ে দেব ?

না।

আমি রহমতউল্লাহকে তোমার নাশতা দিয়ে যেতে বলেছি।

কটা বাজে ?

এখন বাজছে আটটা পঁয়ত্রিশ।

আজ এগারটার সময় একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

শুধু আজ না, আগামী এক সপ্তাহ তোমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। তুমি বিছানায় শুয়ে রিলাক্স করবে। গল্প করবে। বইটই পড়বে।

আজ এগারটায় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটা ক্যানসেল করা যাবে না।

সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করা যায় না। মৃত্যুর সঙ্গে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটাকেও পেছনের ডেটে সরানোর জন্য আছি আমরা— ডাক্তাররা।

সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু ক্যানসেল হয় না।

আজ হয় না একদিন হবে। মানুষ অমরত্বের কৌশল জেনে যাবে। এজিং প্রসেস— বৃদ্ধ হবার প্রক্রিয়াটা জানার চেষ্টা হচ্ছে— যেদিন মানুষ পুরোপুরি জেনে যাবে ব্যাপারটা কী সেদিনই দেখবে মৃত্যু জয় করার চেষ্টা শুরু হবে।

ভালো।

তিন হাজার সনের মানুষের অমর হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

হিশামুদ্দিন সহজ গলায় বললেন, তিন হাজার সনের মানুষ তাহলে খুব দুঃখী মানুষ। মৃত্যুর আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত।

চিত্রলেখা অবাক হয়ে বলল, মৃত্যুর আবার আনন্দ কী?

হিশামুদ্দিন হাসিমুখে বললেন, আনন্দ তো মা আছেই। আমরা জানি একদিন আমরা মরে যাব এই জন্যেই পৃথিবীটাকে এত সুন্দর লাগে। যদি জানতাম আমাদের মৃত্যু নেই তাহলে পৃথিবীটা কখনো এত সুন্দর লাগত না।

তুমি ফিলোসফারদের মতো কথা বলছ বাবা।

আর বলব না। ক্ষিধে লেগেছে নাশতা দিতে বল। আর শোন দুধ সিরিয়েল খাব না। দুধ-চিড়া খাব। দুধ-চিড়াও না— দই-চিড়া। পানিতে ভিজিয়ে চিড়াটাকে নরম করে টক দই, সামান্য লবণ, কুচিকুচি করে আধটা কাঁচামরিচ... এটা হচ্ছে আমার বাবার খুবই প্রিয় খাবার।

তুমি যেভাবে বলছ আমারও খেয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। এক কাজ করলে কেমন হয় আগামীকাল আমরা এই নাশতাটা খাব— আজ আমার মতো খাও।

আচ্ছা।

আমি চলে যাচ্ছি, রহমতউল্লাহ ঠিক দশটার সময় দুটা ট্যাবলেট দেবে তুমি হাসিমুখে খেয়ে নেবে।

আচ্ছা হাসিমুখেই খাব।

হিশামুদ্দিন সাহেব নাশতা খেলেন। রহমতউল্লাহ তাকে খাটে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। সাধারণত তিনি তার নাশতা বা খাবার একা একা খান। কেউ পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগে। আজো লাগছে কিন্তু তিনি কিছু বলেন না।

রহমতউল্লাহ।

জ্বি স্যার।

কাল দই-চিড়া খাব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

দই-চিড়া আমার বাবার খুবই প্রিয় খাবার।

জ্বি আচ্ছা।

হিশামুদ্দিনের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি ঠিক কথা বলছেন না। দই-চিড়া তার বাবার প্রিয় খাবার না। গরিব মানুষদের কোনো প্রিয় খাবার থাকে না। খাদ্যদ্রব্য মাত্রই তাদের প্রিয়। তার বাবা যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিছু খেতে পারতেন না তখন বলেছিলেন, দই-চিড়া দে। দই-চিড়া বলকারক, খেতেও ভালো। সেই দই-চিড়ার ব্যবস্থা হয় নি। তার বাবার বিচিত্র ধরনের অসুখ হয়েছিল। অসহ্য গরম লাগত। কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে হাওয়া করেও সেই গরম কমানো যেত না। রাতে ঘরে ঘুমোতে পারতেন না। বারান্দায় হাওয়া বেশি খেলে বলে বারান্দায় শুইয়ে রাখা হতো। এক রাতে অবস্থা

খুব খারাপ হলো। কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ এনে খাওয়ানো হলো। সেই ওষুধের নাকি এমনই তেজ যে খাওয়ামাত্র মরা রোগী লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে। মকরধ্বজ খাওয়ার পর তার অবস্থা আরো খারাপ হলো, তিনি ছটফট করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ছটফটানি কমত— তিনি তখন বলতেন— আমার শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। আরো জোরে হাওয়া কর। আরো জোরে। রাত দুটার দিকে তার জ্বলুনি বোধহয় একটু কমল। তিনি ক্লান্তভঙ্গিতে বললেন—আজ মৃত্যু হবে কি না বুঝতে পারছি না। চাঁদনী রাত ছিল। মরণ হলে খারাপ ছিল না। শরীরের জ্বলুনিটা কমত। জ্বলুনি আর সহ্য হয় না।

দুর্ভাগাদের কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। তার শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হয় নি। তিনি মারা যান পরের রাতে। সে রাতে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। চাঁদ বা তারা কোনোটাই ছিল না।

আচ্ছা তিনি কি তার বাবাকে গ্লামারাইজড করছেন না? একটা দুষ্ট প্রকৃতির লোককে দুঃখী, মহৎ এবং সুন্দর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা আসলে সে রকম না। তার বাবা ছিলেন চোর, অসৎ প্রকৃতির মানুষ, সর্বরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন একজন দুর্বল মানুষ। দুর্বল মানুষদের চরিত্রও দুর্বল থাকে। তার চরিত্রও দুর্বল ছিল। তার খারাপ পাড়ায় যাতায়াত ছিল। খারাপ পাড়ার একটি মেয়েকে তিনি বিয়েও করেছিলেন। সেই মেয়েকে তিনি অবশ্যি ঘরে আনেন নি। তবে সেই নষ্ট মেয়ের গর্ভের একটি সন্তানকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। এই ঘটনা চিত্রলেখাকে বলা হয় নি, হাসানকেও বলা হয় নি। তিনি পাশ কাটিয়ে গল্প বলছেন। এটা ঠিক হয় নি।

রহমতউল্লাহ!

জ্বি স্যার।

তুমি হাসানকে একটু খবর দাও। জ্বি আচ্ছা স্যার।

পান দিতে বল। চা খেয়ে মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে। জর্দা ছাড়া পান।

জ্বি দিচ্ছি।

একটা পাতলা চাদর আমার গায়ে দিয়ে দাও। শীত লাগছে।

ফ্যান বন্ধ করে দিব স্যার?

না ফ্যান বন্ধ করতে হবে না।

হিশামুদ্দিন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ ভালো ঠাণ্ডা লাগছে। তার বাবা মৃত্যুর সময় অসহ্য গরমে ছটফট করেছেন। আর তিনি নিজে হয়তো শীতে কাঁপতে কাঁপতে মারা যাবেন। তার বাবার কোনো সাধই পূর্ণ হয় নি। তার নিজের প্রতিটি সাধ পূর্ণ হয়েছে। তিনি যদি চান তার মৃত্যু হবে জোছনা দেখতে দেখতে তাহলে হয়তো-বা কৃষ্ণপক্ষের রাতেও পূর্ণচন্দ্র দেখা যাবে।

স্যার!

হুঁ।

পান এনেছি স্যার।

পান খাব না নিয়ে যাও। আরেকটা পাতলা চাদর গায়ে দাও। শীত বেশি লাগছে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তুমি চলে যাও।

রহমতউল্লাহ চলে গেল না। ঘরে থেকে বের হয়ে গেল ঠিকই তবে দাঁড়িয়ে রইল দরজার ওপাশে। মনে হয় তার প্রতি চিত্রলেখার এ ধরনের নির্দেশ আছে।

হিশামুদ্দিন চোখ বন্ধ করে আছেন। পানিতে ডুবে যারা মারা যায় সমগ্র জীবনের ছবি তাদের চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। খাটে শুয়ে যাদের মৃত্যু তাদের চোখের ওপর দিয়ে কিছু কি ভাসে? যাপিত জীবনের খণ্ডচিত্র?

রহমতউল্লাহ আবার ঘরে ঢুকেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে লজ্জিত এবং কিঞ্চিৎ ভীত।

কিছু বলবে?

হাসান সাহেবকে খবর দেয়া হয়েছে স্যার।

ভালো। ভেরি গুড। সে এলে তাকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসবে।

জ্বি আচ্ছা।

আপা এই ওষুধ দুটা দিয়ে গেছেন। দশটার সময় আপনাকে খাওয়াতে বলেছেন।

আচ্ছা দাও।

হিশামুদ্দিন ট্যাবলেট দুটা গিলে ফেললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঝিমুনির মতো এসে গেল। তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

হাসান অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। তাকে চা-স্যান্ডউইচ দেয়া হয়েছে। বলা যেতে পারে খানিকটা আদর-যত্ন করা হচ্ছে। অন্য সময় এরচে' দীর্ঘ সময় বসে থাকলেও চা-টা কিছুই দেয়া হয় না। হিশামুদ্দিন সাহেব খুব অসুস্থ এই খবরটা তাকে দেয়া হয়েছে। অসুস্থতার ফলে তাকে এখানে ডেকে আনার কারণটা সে ধরতে পারছে না। গুরুতর অসুস্থ মানুষ ল'ইয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বিষয়-সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ মওলানা ডেকে এনে তওবা করেন। পরকালে নির্ভয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। তবে তওবার ব্যাপারটা নিম্নবিত্তের মানুষদের ক্ষেত্রেই বেশি ঘটে। হিশামুদ্দিন সাহেবদের মতো অকল্পনীয় বিত্তের মানুষরা তওবা করেন না।

হাসান সাহেব!

হাসান প্রায় লাফিয়ে উঠল। হিশামুদ্দিন সাহেবের মেয়ে চিত্রলেখা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটিকে আজ খুব বিষণ্ন লাগছে। বাবার অসুখের ব্যাপারে সে হয়তো চিন্তিত।

ম্যাডাম স্লামালিকুম।

আমাকে ম্যাডাম ডাকবেন না তো— শুনতে কুৎসিত লাগে। আমাকে নাম ধরে ডাকবেন— চিত্রলেখা। কোনো সমস্যা নেই। চা খাওয়া হয়েছে?

জ্বি।

বাবা অসুস্থ শুনেছেন বোধহয়?

জ্বি।

অসুখ যতটা সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ না। বেশ জটিল। আমি বেশ চিন্তিত বোধ করছি। ভালো কোনো ক্লিনিকে তাকে ট্রান্সফার করলে ভালো হত। আমি ক্লিনিক খুঁজে বেড়ালাম। কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না। ক্লিনিকে সুযোগ-সুবিধা কী আছে জানতে চাইলে ওরা বলে— এসি আছে, কালার টিভি আছে, ফ্রিজ আছে, ইন্টারকমের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা কী তা বলে না।

স্যারের কী হয়েছে ?

ব্লাডপ্রেসার খুব ফ্লাকচুয়েট করছে। পালস ইরেগুলার। তার এখন দরকার কনসটেন্ট মনিটরিং।

কোনো হাসপাতালে কি ভর্তি করাবেন ? ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা পিজি ?

এখনো বুঝতে পারছি না। আজ দিনটা দেখে আগামীকাল ডিসিশান নেব। আপনি আসুন। বাবার ঘুম ভেঙেছে তার সঙ্গে কথা বলুন।

উনি আমাকে কেন ডেকেছেন বলতে পারেন ?

লাইফ স্টোরি সম্ভবত বলবেন।

এখন কি উনার কথা বলা ঠিক হবে ?

আমি তাতে কোনো অসুবিধা দেখছি না। কথা বলে তিনি যদি আনন্দ পান তাহলে কথা বলাই উচিত। উনি যে গুরুতর অসুস্থ তা আমি তাকে বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো ?

জ্বি।

বাবা যে আপনাকে গল্প বলেন তার পেছনের কারণটা কি আপনি ধরতে পেরেছেন ?

জ্বি না।

বাবা যা করছেন তা হচ্ছে এক ধরনের কনফেসন। খ্রিষ্টানরা যখন কোনো অপরাধ করে তখন তারা পাদ্রীদের কাছে কনফেসন করে। বাবা যা করছেন তা হচ্ছে এক ধরনের কনফেসন।

উনি তো কোনো অপরাধ করেন নি।

অপরাধ না করেও কেউ কেউ নিজেকে অপরাধী ভাবে। বাবার মা-বাবা, ভাইবোন হতদরিদ্র ছিলেন। অনেকেই মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায়। যারা বেঁচে আছেন তাদের অবস্থা শোচনীয়। অথচ মাঝখান থেকে বাবা হয়ে গেলেন বিলিওনিয়ার। এই কারণেই তিনি হয়তো নিজেকে অপরাধী ভাবেন। মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী হাসান সাহেব। কী, ঠিক বলছি না ?

জ্বি।

আপনার কথাবার্তা দেখছি— জ্বি এবং জ্বি নাতে সীমাবদ্ধ। হড়বড় করে কথা বলা অভ্যাস করুন তো। হড়বড় করে যারা কথা বলে তাদের মন সব সময় প্রফুল্ল থাকে। এটা হচ্ছে রিসেন্ট ফাইন্ডিং নিউজউইকে উঠেছে।

হাসান চুপ করে রইল। চিত্রলেখা বলল, বাবার অপরাধবোধের আরেকটা বড় কারণও আছে। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কোনো সাহায্য করেন নি। কেউ কেউ সাহায্যের জন্যে এসেছিল তাদের দূর দূর করে তাড়িয়েছেন।

ও।

বাবার অনেক কিছু আমি বুঝতে পারি না। এই ব্যাপারটিও পারি না।

বুঝতে বোধহয় চেষ্টাও করেন নি।

ঠিক বলেছেন, চেষ্টাও করি নি। আমার উচিত ছিল বাবার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, আমি সেটাও করি নি। বাবা যেমন পৃথিবীতে একা আমিও একা। আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে— কিন্তু আমার কথা বলার মানুষ নেই। এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি— আমার ভালো লাগছে। কেন ভালো লাগছে বলুন তো ?

বলতে পারছি না।

কারণ আপনি বাবার খুব পছন্দের মানুষ। কী করে বললাম বলুন তো ?

বুঝতে পারছি না।

কাল রাতে খেতে বসে বাবা হঠাৎ বললেন, হাসানকে একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে বলি। আমি বললাম, বেশ তো বল। উনি তৎক্ষণাৎ বললেন— না থাক। বাবার সমস্যা কী জানেন ? তার সমসা হচ্ছে— তিনি যাদের পছন্দ করেন তাদের কখনো তা জানান না। তার পছন্দ এবং অপছন্দ দুটা ব্যাপারই খুব গোপন। আমি বোধহয় বকবক করে আপনার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি। চলুন বাবার ঘরে যাই।

হাসানকে দেখেই হিশামুদ্দিন বললেন, তোমার কী হয়েছে হাসান ?

হাসান হকচকিয়ে গেল। সে রোগীর ঘরে ঢুকেছে। রোগী তাকে দেখে বলছেন তোমার কী হয়েছে।

কিছু হয় নি স্যার।

তোমাকে মৃত মানুষদের মতো দেখাচ্ছে।

আমি ভালোই আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন ?

আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ভালোই আছি— কিন্তু আমার মেয়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভালো নেই। ডাক্তাররা যখন রোগীর সামনে অতিরিক্ত রকমের হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করে তখন বুঝতে হয়— সামথিং ইজ রং। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বস।

হাসান বসল। হিশামুদ্দিন সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন— আমার বাবা প্রসঙ্গে নানান সময় তোমাকে নানান কথা বলেছি। আমার কথা শুনে শুনে তার একটা ছবি নিশ্চয়ই তোমার মনে তৈরি হয়েছে। ছবিটা কেমন ?

স্যার ছবিটা খুবই সুন্দর। আপনার বাবাকে আমার অসাধারণ মানুষ বলে মনে হয়।

হিশামুদ্দিন শান্ত গলায় বললেন, তিনি খুবই সাধারণ মানুষ। ভণ্ড টাইপের মানুষ। মিথ্যাবাদী, চোর, স্বার্থপর, অলস... যে কটি খারাপ গুণ মানুষের থাকা সম্ভব সবকটি তার মধ্যে ছিল। খারাপ পাড়ার একটি মেয়েকে তিনি বিবাহ করেছিলেন— সেই ঘরে তার একটি ছেলে হয়েছিল। ওই মহিলা বাবাকে এক পর্যায়ে ছেড়ে চলে যান... আমি কী বলছি তুমি মন দিয়ে শুনছ তো ?

জ্বি স্যার শুনছি।

বাবা ওই মহিলার গর্ভজাত সন্তানকে নিজের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তাকে দু চোখে দেখতে পারতেন না। তার অন্য সন্তানরাও তাকে দেখতে পারত না। কেউ তার সাথে রাতে ঘুমোত না। সে ঘুমোত একা একা। সে জ্বরে ছটফট করলে কেউ এসে মাথায় হাত দিয়ে জ্বর দেখত না। বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সেই ছেলেটা সারাজীবন করেছে। তোমার বুদ্ধি কেমন হাসান?

আমার বুদ্ধি স্যার মোটামুটি পর্যায়ের।

মোটামুটি পর্যায়ের বুদ্ধি দিয়েও তুমি আশা করি বুঝতে পারছ সেই ছেলেটি কে। পারছ না?

জ্বি স্যার পারছি।

এখন বল তোমাকে এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন? তোমার সমস্যা কী?

তেমন কোনো সমস্যা নেই স্যার।

সমস্যা থাকলে বলতে পার। বিত্তবান মানুষরা নিজের সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও অন্যের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

হাসান কিছু বলল না, চুপ করে রইল। একবার তার ইচ্ছা করছিল বলে ফেলে— স্যার আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। বলতে লজ্জা লাগল। একজন অসুস্থ মানুষকে চাকরির কথা বলা যায় না। লিটনের কথা কি সে স্যারকে বলবে? নিজের কথা বলা না গেলেও অন্যের কথা নিশ্চয়ই বলা যায়।

আমার এক বন্ধুর জন্যে কি স্যার আপনি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন?

তোমার বন্ধু?

জ্বি স্যার। খুব ভালো ছেলে।

কী করে বুঝলে খুব ভালো ছেলে?

আমি তাকে স্কুলজীবন থেকে দেখছি। ও খুব কষ্টে আছে। বিয়ে করে খুব ঝামেলায় পড়েছে।

চাকুর বাকরি নেই বিয়ে করে ফেলল? ও তো বোকা। বোকাদের সমস্যার সমাধান করতে নেই। বোকাদের সমস্যা নিজের ঘাড়ে নিলে কী হয় জান হাসান?

জ্বি না।

তখন নিজের সমস্যার সঙ্গে বোকার সমস্যাও যুক্ত হয়।

হাসান চুপ করে গেল। হিশামুদ্দিন বললেন, তোমার বন্ধুর নাম কী?

লিটন।

ভালো নাম কী?

হামিদুর রহমান।

পড়াশোনা কী?

এম.এ.পাস করেছে।

কত টাকা বেতনে চাকরি হলে তোমার বোকা বন্ধুর সমস্যার সমাধান হয়?

মাসে হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই ওরা মহাখুশি হবে। একটা কিছু পেলেই হয় স্যার।

তুমি একটা কাগজে তার নাম-ঠিকানা লিখে মোতালেবের কাছে দিয়ে যাও।

স্যার থ্যাংক য়্যু।

হাসান লক্ষ করল হিশামুদ্দিন সাহেব হাসছেন। এই মানুষটাকে সে খুব কম হাসতে দেখেছে। উনি হাসছেন কেন?

হাসান!

জ্বি স্যার।

তুমি বরং আজ যাও। এখন আবার কেন জানি মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

স্যার আমি কাল এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

কাল এসে খোঁজ নিতে হবে না। তোমার সঙ্গে যেমন কথা আছে তেমনি আসবে বুধবার বিকেল তিনটায়।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

পরের বুধবার বিকাল তিনটায় এসে হাসান জানতে পারল, হিশামুদ্দিন সাহেব আজ দুপুরের আগে মারা গেছেন।

বাড়িভর্তি মানুষ। কম্পাউন্ডের ভেতরে এবং বাইরে প্রচুর মানুষ। হাসান গেট থেকেই বিদেয় হলো। একবার মুহূর্তের জন্যে তার ইচ্ছা হলো সে চিত্রলেখার সঙ্গে দেখা করে— সান্ত্বনার দুটা কথা বলে। পর মুহূর্তেই মনে হলো সান্ত্বনার কথা সে জানে না এবং চিত্রলেখার মতো মেয়েদের সান্ত্বনার দরকার নেই।

১৬

রেজিস্ট্রি করা চিঠি।

লিটন সই করে চিঠি নিল। রেজিস্ট্রি চিঠি তাকে কে পাঠাবে? সাধারণ চিঠিই আসে না আর রেজিস্ট্রি চিঠি। ইংরেজিতে টাইপ করে তার নাম লেখা।

হামিদুর রহমান। নিজের নাম অথচ অপরিচিত লাগছে। ভালো নামটা সে ভুলতে বসেছে। চিঠি এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। এটিও অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। জেনারেল ম্যানেজার মাহিটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। কে আছে সেখানে? বন্ধুবান্ধবদের কেউ। ভাগ্যবানদের একজন। বিদেশে চাকুরি করছে। তার সুখ ও আনন্দ পুরনো বন্ধুকে জানাতে চাচ্ছে। সে এই মেসের ঠিকানা জানল কী করে?

পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। লিটন বলল, কী ব্যাপার?

স্যার বকশিশ।

লিটন বিস্মিত হয়ে বলল, বকশিশ কেন? সে কি এতই হতভাগ্য যে বিদেশ থেকে একটা চিঠি আসার জন্যে বকশিশ দিতে হবে?

যান ভাই বকশিশ-টকশিশ নেই।

পিয়ন বিমর্ষমুখে চলে যাচ্ছে। টাকা থাকলে পাঁচটা টাকা দিয়ে দেয়া যেত। টাকা নেই।

লিটন খিচুড়ি বসিয়ে দিল। চালডালের খিচুড়ি। আনাজপাতি থাকলে দিয়ে দেয়া যেত। কিচ্ছু নেই। চিঠিটা বিছানায় পড়ে আছে। থাকুক পড়ে। বন্ধুর চিঠি পড়ার কোনো আগ্রহ এই মুহূর্তে সে অনুভব করছে না। তার মনটা খুব খারাপ। শম্পার শরীর ভালো না। গা দিয়ে গুটির মতো বের হয়েছে। সম্ভবত হাম। বড়দের হাম হওয়া খুব কষ্টের। বেচারি কষ্টের মধ্যে পড়েছে— অথচ সে কিছু করতে পারছে না। সে রোজই সন্ধ্যার পর যাচ্ছে। দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত থেকে চলে আসছে। তাকে ভদ্রতা করেও কেউ বলছে না— জামাই আজ থেকে যাও। শম্পাকে এখনো ডাক্তার পর্যন্ত দেখানো হয় নি। এমন কষ্টে মানুষ পড়ে?

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর লিটন চিঠি খুলে পড়ল। জন স্মিথ জুনিয়ার নামের এক ভদ্রলোক তাকে জানাচ্ছেন যে, মাহিটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সিঙ্গাপুর শাখার একজিকিউটিভ অফিসার প্রোডাকশান শাখায় তাকে নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। তিন বৎসর মেয়াদি এই নিয়োগ। পরবর্তী এক্সটেনশন কোম্পানি শর্তে আলোচনাসাপেক্ষ। মাসিক বেতন সাত হাজার সিঙ্গপুরি ডলার। ফ্রি ফার্নিশড কোয়ার্টার। ফ্রি মেডিকেল। তাকে অতি দ্রুত সিঙ্গাপুর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। ঢাকায় মতিঝিলে কোম্পানির একটা অস্থায়ী অফিসের ঠিকানা দেয়া হয়েছে। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করলে তারা তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

এর মানে কী? কেউ কি রসিকতা করছে? এপ্রিল ফুল জাতীয় কিছু? কিংবা কোনো দুষ্ট লোক টাকা কামানোর ফন্দি করছে। সব অভাবি যুবকদের এই জাতীয় চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে। মতিঝিল অফিসে ছুটে যাবে। সেই অফিসের একজন বলবে— আমরা সব খবরাখবর আনিয়ে দিচ্ছি তার খরচ বাবদ এক শ ডলার লাগবে। আমাদের অফিসে একটা ফরম ফিলাপ করতে হবে। ফরমের দাম তিন ডলার। সাত দিনে রমরমা ব্যবসার পর কোম্পানি ডুব মারবে।

আরেকটা ব্যাপার হতে পারে। হয়তো তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনো চিঠিই তার নামে আসে নি। পুরোটাই সে কল্পনায় দেখছে।

মতিঝিলের যে অফিসের ঠিকানা আছে সেখানে গিয়ে খোঁজ নেয়া যায়। কয়টা বাজে। অফিস কি বন্ধ হয়ে গেছে না খোলা? চারটা পর্যন্ত খোলা থাকলে অফিসে পৌঁছানো যাবে। কারণ তাকে যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। লিটন কাপড় পরল।

অফিস খোলাই ছিল। বয়স্ক একজন ভদ্রলোক তার ঘর বন্ধ করে চলে যাচ্ছিলেন— লিটন তার চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দিল। তিনি চিঠি খুলেই বললেন— ও আপনি। আপনার নামে ফ্যাক্স এসেছে আমাদের কাছে। আমাদের কাছ থেকে কী ধরনের অ্যাসিসট্যান্স চাচ্ছেন?

লিটন কী বলবে বুঝতে পারছে না। ভদ্রলোক বললেন, আপনার হাতে তো এখনো দিন পনের সময় আছে। এর মধ্যে গোছগাছ করে নিন।

লিটন অস্পষ্ট গলায় বলল, ও আচ্ছা। ’

আপনার টিকিট সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্‌সে— পি.টি.এ। আমরা আনিয়ে রাখব।

লিটন আবার বলল, জ্বি আচ্ছা। কেন সে জ্বি আচ্ছা বলছে তা নিজেও বুঝতে পারছে না।

কাল তো অফিস ছুটি আপনি পরশু সকালের দিকে চলে আসুন।

লিটন আবার বলল, জ্বি আচ্ছা।

আপনার ভাগ্য খুব ভালো। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। পৃথিবী জুড়ে এদের শাখা। লিটন ক্ষীণ গলায় বলল, চাকরিটা কি সত্যি পেয়েছি?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। লিটন কুণ্ঠিত মুখে বলল, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

পরশু আসুন। বিশ্বাস না হবার কী আছে। আপনার হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এইসব কোম্পানি যে শুধু শুধু চাকরি দিচ্ছে তা তো না। বাংলাদেশে তারা কোটি কোটি টাকার কাজ করছে। এইসব কাজের একটা শর্ত আছে— এ দেশের কিছু ছেলেমেয়েকে চাকরি দিতে হবে। এইসব শর্ত তারা মানে না। কালেভদ্রে মানে। আপনার স্ট্রং রিকমন্ডেশন— আপনি পেয়ে গেছেন।

পরশু আসব?

জ্বি পরশু আসুন। আপনার পাসপোর্ট আছে তো?

লিটনের পাসপোর্ট আছে। সেই পাসপোর্টে কি কাজ হবে? সেখানে মালয়েশিয়ার একটা মিথ্যা মিথ্যা ভিসা আছে।

পাসপোর্ট না থাকলে অসুবিধা নেই। চব্বিশ ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরে আপনি একা যাবেন না ফ্যামিলি নিয়ে যাবেন?

ফ্যামিলি নিয়ে যাব।

সব পার্টিকুলারস নিয়ে আসবেন। ফ্যাক্স করে দেব। কোনো সমস্যা হবে না।

জ্বি আচ্ছা।

লিটন রাত ন'টা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় হাঁটল। সব কেমন অদ্ভুত লাগছে। শম্পাকে কি ব্যাপারটা জানানো উচিত না? উঁহুঁ— উচিত হবে না। পরে দেখা যাবে মালয়েশিয়ার ভিসার মতো ফলস অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। পরশুর আগে কিছু জানা যাবে না। বেছে বেছে কালই কিনা ছুটি পড়ে গেল?

আচ্ছা পুরো ব্যাপারটা তো সত্যি হতেও পারে! সে কত অসংখ্য মানুষকে চাকরির কথা বলেছে তাদের কেউ একজন দয়াপরবশ হয়ে সুপারিশ করেছে। পুরোটাই ভাগ্য। কথায় আছে না— পাথরচাপা ভাগ্য। তারটাও তাই ছিল হঠাৎ পাথর সরে গেছে। হাসানের সঙ্গে কথা বললে হয়। ওকে চিঠিটা দেখানো যেতে পারে। না তাও ঠিক হবে না। হাসান মন খারাপ করবে। বেচারার মন খারাপ করিয়ে কোনো দরকার নেই।

আজ সারারাত রাস্তায় হাঁটলে কেমন হয়?

পকেটের চিঠিটার একটা ফটোকপি করিয়ে রাখা দরকার। যদি হারিয়ে যায়। একটা না কয়েকটা ফটোকপি করানো দরকার।

পুরো ব্যাপারটা সত্যি হলে সামনে বিরাট ঝামেলা। শম্পার পাসপোর্ট কাপড়চোপড় বানানো।

সিঙ্গাপুর দেশটা কেমন ? শীতকালে বরফ পড়ে ? বরফ পড়া দেখার তার খুব শখ ছিল এই শখটা বোধহয় এবার মিটবে।

লিটন চায়ের স্টলে ঢুকল। তার পকেটে একটি টাকাও নেই। না থাকুক— এক কাপ চা খেয়ে সে যদি বলে, ভাই ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি আপনাকে কাল টাকাটা দিয়ে যাব তাহলে দোকানদার নিশ্চয়ই তাকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেবে না। মানুষ এখনো এতটা নিচে নামে নি। মানুষের মনে মমতা, করুণা, দয়া এখনো আছে।

চা খেয়ে সে যাবে আজিমপুর গোরস্থানে। বাবার কবর জিয়ারত করবে। কতদিন হয়েছে যাওয়া হয় না। কবরের চিহ্ন এখন আর নিশ্চয়ই নেই। না থাকুক।

লিটন চায়ে চুমুক দিচ্ছে। এরা তো চা খুব ভালো বানায়। অপূর্ব লাগছে। আরেক কাপ চা কি খাবে ? এক কাপ চায়ের দাম বাকি রাখা আর দু কাপের দাম বাকি রাখা তো একই ব্যাপার।

১৭

কর্মহীন লোক নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। মতিনউদ্দিনের বেলায় এই কথাটি সর্বাংশে সত্য। তিনি নানা কাজে প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তাকে দেখে মনে হতে পারে— এমন কাজের একজন মানুষ নিজের সংসার কেন চালাতে পারছেন না। তার অনেক কর্মকাণ্ডের একটি হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয়ে নিয়ে প্রবন্ধ রচনা। তিনি তার প্রবন্ধগুলো দেশের সবক'টি দৈনিকে নিয়মিত পাঠান। এখন পর্যন্ত তার কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। তবে সম্পাদকের কাছে লেখা দুটি চিঠি ছাপা হয়েছে। একটি দৈনিক বাংলায় এবং একটি সংবাদে। তিনি পত্রিকার কাটিং ফাইল বের করে রেখেছেন।

আজো তিনি খুব ব্যস্ত। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ শুরু করেছেন। এটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয় তবে শিক্ষামূলক প্রবন্ধ, প্রবন্ধের নাম— 'নারী জাগরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা'।

শিরোনামটি তার খাতার ওপর লেখা। প্রবন্ধ শেষ হবার পর ঠিক করবেন কোন শিরোনামটা শেষ পর্যন্ত যাবে। বাকি তিনটি শিরোনাম হলো—

১. আমার চক্ষে নারী।

২. বেগম রোকেয়া থেকে মাদার তেরেসা।

৩. হে নারী।

এখন রাত বাজছে সাড় আটটা। টিভিতে বাংলা খবর শেষ হয়ে গেছে। 'নৃত্যের তালে তালে' নামের নাচের একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। মতিনউদ্দিন টিভির সামনেই বসে আছেন। তবে টিভি দেখছেন না বা শুনছেনও না। টিভির সাউন্ড অফ করে দেয়া আছে।

টিভির বাংলা সংবাদ মতিনউদ্দিন সাহেব সব সময় শোনেন। কর্মহীন লোকরা দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকতে ভালোবাসে এবং এটাকে তার প্রধান দায়িত্বের একটি বলে মনে করে। মতিনউদ্দিন সাহেব শুধু যে টিভির সংবাদ

শোনেন তা না, বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকাও শোনেন। আগে রেডিও পিকিঙের এক্সটারনাল সার্ভিস শুনতেন। ইদানীং শোনেন না, কারণ তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে খবর দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

বেছে বেছে আজকের দিনটাতেই মতিনউদ্দিন টিভির খবর শুনলেন না। নারী বিষয়ক প্রবন্ধে অতিরিক্ত মনোযোগ দেবার কারণে এই ঘটনাটা ঘটল। আজ টিভি শুনলে তিনি বড় রকমের বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। কারণ আজ এস.এস.সি.র রেজাল্ট হয়েছে। টিভিতে তার মেজো কন্যা নাদিয়া মেহজাবিন-এর নাম বলা হয়েছে। আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় থেকে নাদিয়া মেহজাবিন আটটি লেটার নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ছেলে ও মেয়ে সবার মধ্যে প্রথম হয়েছে।

রাত দশটায় সুরাইয়া স্বামীর ঘরে ঢুকলেন। মতিনউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, এখন ভাত খাব না। তোমরা খেয়ে নাও। আমি যখন লেখালেখির কোনো কাজে ব্যস্ত থাকি তখন আমাকে খাওয়াদাওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করবে না। এই কথাটা কতবার বলতে হবে ?

সুরাইয়া বললেন, আজ এস.এস.সি'র রেজাল্ট হয়েছে। আটটার বাংলা সংবাদে বলেছে।

মতিনউদ্দিন স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানির শব্দ শুনলেন। তাকিয়ে দেখলেন দরজা ধরে নাদিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সে ফোঁপাচ্ছে এবং তার চোখ দিয়ে সমানে পানি পড়ছে। মেয়েদের চরিত্রের এই দুর্বলতায় তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। মাত্র টিভিতে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করেছে। পাস-ফেল জানতে জানতে আরো দু'দিন— এর মধ্যেই নাকের জলে চোখের জলে একাকার। তার রাগ উঠে গেল। তিনি প্রবন্ধের স্বার্থে রাগ সামলাবার চেষ্টা করলেন। মাথায় রাগ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী জটিল প্রবন্ধ লেখা যায় না। মতিনউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন— গাধা মেয়ে কাঁদছ কেন ?

সুরাইয়া নিজেও কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন— তোমার মেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। আটটা লেটার পেয়েছে।

কী বললে ?

ওদের ক্লাসের হেডমিস্ট্রেস এসেছেন। মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। স্কুল থেকে দুজন টিচারও এসেছেন।

নাদিয়া ফার্স্ট হয়েছে ? কী বলছ এইসব! সে ফার্স্ট হবে কী জন্যে ?

সুরাইয়া এইবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে বললেন— আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি নিজে একটু নাদিয়ার হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বল। আমার মাথা যেন কেমন করছে।

উনাদের চা-টা দাও। আমি যাচ্ছি। ফলস নিউজ হতে পারে। হয়তো নাদিয়ার নামে নাম একটা মেয়ে ফার্স্ট হয়েছে বেকুব হেডমিসট্রেস মনে করেছে তোমার মেয়ে।

টিভিতে ওদের স্কুলেরও নাম বলেছে।

বাংলাদেশ টিভির নিউজের কোনো মূল্য আছে ? মূল্য থাকলে আমরা ব্যাটারি পুড়িয়ে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা শুনি ? পাঞ্জাবিটাতে ইস্ত্রি দিয়ে দুটা ডলা দিয়ে দাও—আমি দেখছি ব্যাপার কী ? অল্পতে অস্থির হয়ো না। অস্থির হবার মতো কিছু নাই।

বোঝাই যাচ্ছে ফলস নিউজ।

রাত এগারটার ভেতর মতিনউদ্দিন জেনে গেলেন ঘটনা সত্যি। মিষ্টি নিয়ে নাদিয়ার বড়ফুফু চলে এসেছেন। নাদিয়ার স্কুলের কিছু বান্ধবী এসেছে। আশপাশের বাসার কিছু মহিলা এসেছেন। সবকটা পত্রিকা অফিস থেকে লোক এসেছে। বাবা-মা দুপাশে মেয়ে মাঝখানে এইভাবে ছবি তোলা হবে। মতিনউদ্দিন রাজি হলেন না। তিনি বিনীত গলায় বললেন, ভাই আমি আমার মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে কিছুই জানি না। ওদের দিকে কোনোদিন লক্ষ করি নি। আজ যদি মেয়েকে সাথে নিয়ে ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপাতে দেই সেটা খুবই অন্যায় হবে। মেয়ে তার মাকে নিয়ে ছবি তুলুক। সেটাই হবে ঠিক এবং শোভন। মতিন সাহেব কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হলেন। মেয়ের জন্যে কোনো একটা উপহার কিনতে ইচ্ছে করছে। এত রাতে দোকানপাট সব বন্ধ থাকার কথা। তারপরেও চেষ্টা করে দেখা। কিছু কিছু দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। একটা ভালো হাতঘড়ি কি পাওয়া যবে? মেয়েটা ঘড়ি ছাড়া পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষ পর্যায়ে তিনি ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। পরীক্ষার জন্যে ঘড়িটা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই মেয়ে মুখফুটে তা বলে নি। ভালো একটা ঘড়ির কত দাম পড়বে কে জানে। তার কাছে এত টাকা নেই। টাকা যা ছিল সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ছ সাত শ'র বেশি হবে না। এই টাকায় ভালো ঘড়ি হবে না। একটা কলম কিনে দেয়া যায়। কলমটা নিশ্চয়ই সে খুব যত্ন করে রাখবে। তার ছেলেমেয়েরা যখন বড় হবে তখন তাদের সে কলমটা দেখিয়ে বলবে— আমার বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। যেদিন আমার এস.এস.সি'র রেজাল্ট হলো সেই রাতে বাবা কিনে নিয়ে এসেছেন।

শাড়ি কাপড়ের একটা দোকান খোলা পাওয়া গেল। মতিনউদ্দিন মেয়ের জন্যে একটা শাড়ি কিনে ফেললেন। সাড়ে ছয় শ টাকা দাম। হাফসিল্ক। শাড়ির রঙ গাঢ় কমলা। রঙটা মতিনউদ্দিনের খুব পছন্দ হলো। তিনি ইতস্তত করে দোকানিকে বললেন, আমার মেয়ে শ্যামলা এই শাড়িটাতে তাকে মানাবে তো?

দোকানি শাড়ি প্যাক করতে করতে বলল, একটা পেত্নীকে যদি এই শাড়ি পড়িয়ে দেন তাকে লাগবে রাজকুমারীর মতো।

আরো দশটা দোকান দেখেশুনে কিনতে পারতাম কিন্তু জিনিসটা আজই দরকার। আমার মেয়ের জন্য উপহার। ওর এস.এস.সি'র রেজাল্ট হয়েছে। ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। বিজ্ঞান গ্রুপ। লেটার পেয়েছে আটটা। কাল সব পত্রিকায় তার ছবি দেখবেন। নাম হলো নাদিয়া মেহজাবিন। মেহজাবিন শব্দের অর্থ হলো চাঁদকপালী। আরবিতে মে হচ্ছে চন্দ্র। জাবিন হলো কপাল। আসলেই আমার মেয়েটা চাঁদকপালী।

দোকানদার সত্যিকার অর্থেই বিস্মিত হলো।

আপনার মেয়ে?

জ্বি ভাইসাহেব, আমার মেজো কন্যা। নাদিয়া মেহজাবিন।

দোকানদার ড্রয়ার খুলে এক শ টাকা ফেরত দিল। শাড়ির দাম পড়ল সাড়ে পাঁচ শ।

মতিনউদ্দিন দোকানদারের ভদ্রতায় মোহিত হলেন। তার চোখে পানি এসে গেল।

ঘরে অনেকরকম খাবার ছিল। নাদিয়ার ফুফু হোটেল থেকে রোস্ট, পোলাও আনিয়েছেন। মতিনউদ্দিন কিছুই খেতে পারলেন না।— যাই খান ঘাসের মতো লাগে। তার খুবই ইচ্ছা ছিল মেয়ের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করেন। তাও করতে পারলেন না। মেয়ে তার সামনেই আসে না। নিজ থেকে মেয়েকে ডেকে গল্প করা তার স্বভাববিরুদ্ধ।

রাতে যথাসময়ে শুতে গেলেন। সুরমা বললেন, তিনি আজ নাদিয়ার সঙ্গে ঘুমোবেন। এটা তার মনঃকষ্টের কারণ হলো। তিনি ভেবেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলবেন— তা হলো না। না হলে কী আর করা।

মেয়ের শাড়ি কি পছন্দ হয়েছে?

হয়েছে বোধহয় কিছু তো বলল না।

নতুন শাড়ি পরে সালাম করল না। শুধু পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হলে হবে না আদব কায়দা তো শিখতে হবে। ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া কঠিন কিছু না— আদব কায়দায় দুরস্ত হওয়া কঠিন।

শাড়ি পরতে বলেছিলাম, তার নাকি লজ্জা লাগবে। পরে আসতে বলব?

না থাক। যন্ত্রণা ভালো লাগছে না। ঘুম পাচ্ছে।

মতিনউদ্দিন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তিনি নিশ্চিত আজ রাতে তার এক ফোঁটা ঘুম হবে না। বুকও কেমন যেন ধড়ফড় করছে। হাট অ্যাটার্ক ট্যাটাক হবে না তো। হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে থাকলেও কেউ কিছু টের পাবে না। এটা হচ্ছে কপাল। সংসার থেকেও সন্ন্যাসী। মতিনউদ্দিন তার প্রবন্ধ নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। মাথায় কিচ্ছু আসছে না। চিন্তা ভাবনা সব এলোমেলো হয়ে গেছে। নজরুলের সেই কবিতাটা যেন কী? বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। কবিতাটা ঠিক না। বেশিরভাগই নারী করে— পুরুষ করে সামান্যই। তাকে দিয়েই এর প্রমাণ। তিনি কিছুই করতে পারেন নি। মতিনউদ্দিনের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। তিনি বাতি জ্বালালেন— ঘরে আজ পানি রাখা হয় নি। ভুলে গেছে। পানির জন্যে যেতে হবে রান্নাঘরে। তিনি দরজা খুলে রান্নাঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। নাদিয়ার ঘরে বাতি জ্বলছে। মা-মেয়ের হাসি শোনা যাচ্ছে। এই হাসিতে তিনি যুক্ত হতে পারছেন না। আশ্চর্য। আচ্ছা তিতলীকে কি খবরটা দেয়া হয়েছে? তার শ্বশুরবাড়িতে কেউ কি একটা টেলিফোন করে নি। করে নি নিশ্চয়ই— করলে ওরা চলে আসত। খবর না দেয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে। তিতলীর শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভোরবেলা খবরের কাগজ পড়ে সংবাদ জানবে। এর আনন্দও তো কম না। মতিনউদ্দিন পরপর দু গ্লাস পানি খেলেন তার পিপাসা মিটল না। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যতই পানি খাচ্ছেন— পিপাসা ততই বাড়ছে। তিনি আরেক গ্লাস পানি হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। ঘুম যখন হবেই না— বারান্দায় বসে থাকা যাক। আবারো নাদিয়ার হাসি শোনা যাচ্ছে। মা-মেয়ে কী নিয়ে এত হাসাহাসি করছে? দরজায় টোকা দিয়ে তাদের কি বলবেন— এই তোমরা বাইরে চলে আস। সবাই মিলে একসঙ্গে গল্প করি। না থাক। তারা আসবে, মুখ গম্ভীর করে বসে থাকবে এরচে' মা-মেয়ে গল্প করুক। সুরাইয়ার জন্যে একটা শাড়ি কিনে আনলে হতো। কাগজে লিখে দিতেন— মাতা শ্রেষ্ঠাকে সামান্য উপহার। ইতি মতিনউদ্দিন। না সেটাও ঠিক হতো না। বাড়াবাড়ি হতো। তারচে' বরং মনে মনে নারী জাগরণ বিষয়ক প্রবন্ধটার

খসড়া করে ফেলা যাক। শুরুটা ইন্টারেস্টিং হওয়া দরকার। পড়তে গিয়ে পাঠক ভাববে গল্প পড়ছে। গল্পের লোভ দেখিয়ে তাকে জটিল প্রবন্ধে ঢুকিয়ে দেয়া হবে— শুরুটা এ রকম করলে কেমন হয়—

ঘুঘু ডাকা ছায়া ঢাকা ছোট্ট সুন্দর সবুজ গ্রাম।
গ্রামের নাম পায়রাবন্দ। সেই গ্রামের একটি
শিশু তার নাম রোকেয়া...

নাদিয়ার ঘর থেকে আবার হাসির শব্দ আসছে। মতিনউদ্দিন উঁচু গলায় বললেন, তোমরা একটু আস্তে হাসাহাসি কর, মানুষকে ঘুমোতে দেবে না।

হাসির শব্দ থেমে গেল। মতিন সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাসাহাসির করছিল করত। তিনি কেন ধমক দিলেন। সারাজীবন তিনি কি শুধু ভুলই করে যাবেন! তাঁর চোখে পানি এসে গেল। কেউ সেই পানি দেখল না।

শওকতের অভ্যাস হচ্ছে ভোরবেলা দুটা খবরের কাগজ নিয়ে চা খেতে বসা। নাশতাটা জরুরি না, খবরের কাগজ পড়াটা জরুরি। তিতলী সেই সময় তার সামনেই থাকে তবে সে নাশতা খায় না। সঙ্গ দেবার জন্যে যে বসে তাও না। নিজ থেকে একটি কথাও বলে না। শওকত কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় সেই জবাবও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মানুষের অভ্যস্ত ক্ষমতা অসাধারণ। শওকত মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

আজ শওকত খবরের কাগজ তিতলীর দিকে বাড়িয়ে দিল— বিস্মিত গলায় বলল, নাদিয়ার ছবি ছাপা হয়েছে।

তিতলী কিছু বলল না, সে তার চায়ের কাপে চা ঢালছে। তাকে কোনো প্রশ্ন করা হয় নি, কাজেই জবাব দেবার কিছু নেই।

শওকত বলল, কী ব্যাপার, তুমি এই খবর পেয়েছ?

পয়েছি।

কখন পেয়েছ?

কাল রাতে।

রতে মানে ক'টার সময়?

এগারটার সময়। নাদিয়া টেলিফোন করেছিল।

আমি তো তখন বাড়িতেই ছিলাম। আমাকে কিছু বল নি কেন?

বলার কী আছে?

এত বড় একটা খবর তুমি আমাকে জানাবে না?

এখন তো জানলেই।

তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে— তুমি নিজ থেকে আমাকে কিছু বলবে না?

তিতলী জবাব দিল না, চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। শওকত বিরক্ত মুখে বলল, তুমি যা করছ তা যে ছেলেমানুষি তা কি বুঝতে পারছ?

তিতলী এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। শওকত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি যা করছ তা

হচ্ছে হাস্যকর ছেলেমানুষি। যখন ছেলেমানুষিটা শুরু করেছিলে আমি তোমাকে বাধা দেই নি। আমার ধারণা ছিল বাধা দিলে এটা আরো বাড়বে। আমি ভেবেছি সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখছি হচ্ছে না।

এখন কী করবে ?

শোন তিতলী! আমার ধৈর্য অপরিসীম। আমি তোমাকে আরো সময় দেব। দু'বছর, তিন বছর, চার বছর... কোনো অসুবিধা নেই। আমি দেখতে চাই এক সময় তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ।

যদি কোনোদিনই ভুল বুঝতে না পারি ?

তুমি তো বোকা মেয়ে না। বুদ্ধিমতী মেয়ে— আমি নিশ্চিত তুমি ভুল বুঝতে পারবে। তখন আমরা জীবন শুরু করব। সে জীবন অবশ্যই আনন্দময় হবে।

আনন্দময় হলেই তো ভালো।

ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার কি এর মধ্যে দেখা হয়েছে ?

না।

টেলিফোনে কথা হয়েছে ?

না।

শোন তিতলী আমি চাচ্ছি ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হোক, কথা হোক।

কেন চাচ্ছ ?

আমার ধারণা ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার যদি দু-একবার দেখা হয়— তুমি তোমার ভুল দ্রুত বুঝতে পারবে। এক কাজ করা যাক—আমি ভদ্রলোককে বাসায় একদিন খেতে বলি।

কোনো প্রয়োজন নেই।

তোমার অস্বস্তি বোধ করার কিচ্ছু নেই। আমি তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবো।

তিতলী চুপ করে আছে। তার দৃষ্টি চায়ের কাপের দিকে।

শওকত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তিতলী ঠিক তার সামনে বসা। নতুন বউরা শ্বশুরবাড়িতে এসে শুরুর কিছু দিন ঘোমটা দিয়ে থাকে। তার মাথায়ও ঘোমটা। লালপাড়ের কালো শাড়িতে তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। দেবী প্রতিমার মতো মেয়েটি চোখমুখ শক্ত করে বসে আছে। শওকত নিশ্চিত জানে এই শক্তমুখ একদিন কোমল হবে। সেই একদিনটা কবে এটাই সে জানে না।

তিতলী!

জ্বি।

আমি আশপাশে থাকলে তোমার কি অসহ্য লাগে ?

না।

আমি আশপাশে থাকলে তোমার মুখ শক্ত হয়ে থাকে এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি। নাদিয়াকে কনগ্রাচুলেট করতে যাবে না ?

যাব।

আমি সঙ্গে গেলে কোনো অসুবিধা আছে ?

অসুবিধা নেই— তবে আমি একাই যেতে চাই।

ব্যাপারটা খুব অশোভন হবে না ? তুমি আমার সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করছ সেটা তো তোমাদের বাড়ির কেউ জানে না। সবাই জানে আমরা খুব সুখে আছি। আনন্দে আছি।

সেটা জানাই তো ভালো।

তাদের জন্যে ভালো তো বটেই। তাদের সেই ভালোতে যেন খুঁত না থাকে সেই চেষ্টা তো আমাদের করা উচিত। তোমার পক্ষ থেকে কিছু অভিনয় দরকার। কাজেই হাসিমুখে আমার সঙ্গে চল।

আচ্ছা।

আরেকটা কথা। তুমি তো জানই আমি পি.এইচডি করতে বাইরে যাচ্ছি। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ?

সেটা তোমার ইচ্ছা।

অর্থাৎ তোমার নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই।

না।

সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভালো। এখানে থাকতে পার বা ইচ্ছে করলে তোমার মা-বাবার সঙ্গে থাকতে পার।

আমি এখানেই থাকব।

বেশ তো থাকবে। যদি এর মধ্যে তোমার ইচ্ছা করে আমার কাছে যেতে— চিঠি দিলেই আমি টিকিট পাঠাব তুমি চলে আসবে।

আচ্ছা।

তোমার সব কথাই তো এ পর্যন্ত শুনে আসছি— এখন তুমি কি আমার একটা কথা শুনবে ? কথাটা হচ্ছে— চল আমার সঙ্গে দুজন মিলে কোনো সুন্দর জায়গা থেকে ঘুরে আসি। যেমন ধর নেপাল। সুন্দর দৃশ্যের পাশে থাকলে মন সুন্দর হয়। পুরনো অসুন্দর ধুয়ে মুছে যায়। যাবে ?

তুমি বললে যাব।

ভেরি গুড।

তোমার নাশতা খাওয়া তো হয়েছে আমি কি এখন উঠতে পারি ?

শওকত ক্লান্ত গলায় বলল, পার। তার মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে। সে অনেক চেষ্টা করেও মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে সমস্যাটা সামলাতে পারছে না। ভবিষ্যতেও পারবে কি না বুঝতে পারছে না।

হাসান নামের ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কি দেখা করা উচিত ? তার সমস্যা মেটানোর জন্য ভদ্রলোকের সাহায্য প্রার্থনা করাটা কি ঠিক হবে ? ভদ্রলোক কি সাহায্য করবেন ? মনে হয় করবেন। যে-কোনো বিবেকবান মানুষেরই সাহায্য করা উচিত।

তিতলীকে না জানিয়ে ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলে হয়। সহজ স্বাভাবিকভাবে সবাই মিলে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করা হবে। ক্ষতি কী?

তিতলী! তিতলী!

তিতলী এসে দাঁড়াল, কিছু বলল না। শওকত বলল, আচ্ছা যাও। এমনি ডেকেছিলাম। ও আচ্ছা শোন, নাদিয়ার ইন্টারভ্যুটা পড়েছ?

না।

পড় নি কেন? নাকি প্রতিজ্ঞা করেছ আমার কেনা খবরের কাগজও পড়বে না?

আমি কোনো প্রতিজ্ঞা করি নি।

পড়ে দেখ। ভালো লাগবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তোমার প্রিয় মানুষ কে? সে তোমার নাম বলেছে।

ও আচ্ছা।

তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে তিতলী!

থ্যাংক য়্যু।

তুমি কি আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখবে? খুব ছোট্ট অনুরোধ?

কী অনুরোধ?

হাসলে তোমাকে কেমন দেখায় আমি জানি না। একটু হাস আমি দেখি। এত বড় খুশির একটা খবর পেয়েছ এমনিতেই তো হাসা উচিত।

উচিত কাজ কি মানুষ সব সময় করতে পারে?

না, উচিত কাজ মানুষ সব সময় করতে পারে না। মানুষ বরং অনুচিত কাজটাই সব সময় করে। আমাকে বিয়ে করাটা ছিল খুবই অনুচিত কাজ সেই কাজটা তুমি করেছ। বিয়ের পর পুরনো সমস্যা ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক হওয়াটা ছিল উচিত কাজ— তুমি করছ উল্টোটা। দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস কথা বলি।

তিতলী বসল।

শওকত ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো। তুমি কি আমার কাছ থেকে মুক্তি চাও? চুপ করে থেকো না, বল হ্যাঁ বা না।

মুক্তি চাইলে পাব?

তিতলী তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পড়ছে না। শওকত চুপ করে রইল। তিতলীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। সম্ভবত জবাব তার জানা নেই।

১৮

ইংরেজিতে লেখা একটা ছোট্ট চিঠি। যার বঙ্গানুবাদ মোটামুটি এ রকম—

প্রিয় হাসান সাহেব,

আশা করি ভালো আছেন। আমার বাবা গত মাসের ৯ তারিখে মাইয়োকার্ড্রিয়েল ইনফেকশনে মারা গেছেন। তাঁর জীবনের অংশবিশেষ যা আপনি লিখেছেন তা আমাকে দিয়ে গেলে

বাধিত হব। আপনি আপনার জনৈক বন্ধুর জন্যে বাবার কাছে চাকুরি চেয়েছিলেন। তিনি সে ব্যবস্থা করে গেছেন। আশা করি ইতিমধ্যে আপনার বন্ধু সে খবর জানেন। আপনি ভালো আছেন তো?

বিনীতা

চিত্রলেখা

অফিস অফিস গন্ধওয়ালা চিঠি। অফিস বস ডিকটেট করেছেন— পি.এ. ডিকটেশন নিয়ে চিঠি টাইপ করেছে। ফাইনাল কপি বস পড়েছেন, দু-একটা বানান ঠিক করে নাম সই করেছেন। চিঠি চলে গেছে ডিসপাচ সেকশানে। চিঠিতে নাম্বার বসিয়ে ডিসপাচ ক্লার্ক চিঠি পোস্ট করে দিয়েছে। চিঠিতে আন্তরিক অংশ হচ্ছে গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা আপনি ভালো আছেন তো? এটাকেও আন্তরিক ধরার কোনো কারণ নেই। অফিসিয়েল চিঠিকে ব্যক্তিগত 'ফ্লেভার' দেয়ার এটা একটা টেকনিক।

হাসান চিঠি পেয়েছে বিকেলে। সন্ধ্যা মিলাবার পরপরই ফাইল হাতে হিশামুদ্দিন সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে উপস্থিত হলো। গেটের দুজন দারোয়ানই তাকে খুব ভালো করে চেনে— তারপরেও তারা এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন তাকে তারা এই প্রথম দেখেছে। হাসান বলল, ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করব। উনি আছেন না?

দারোয়ানের একজন গম্ভীর গলায় বলল, ম্যাডাম বাড়িতে কারো সঙ্গে দেখা করেন না। আপনি অফিসে যাবেন।

দারোয়ানরা দর্শনপ্রার্থীদের আটকে দিতে পারলে খুশি হয়। হাসান লক্ষ করল দারোয়ান দুজনেই মুখের তৃপ্তির ভাব।

উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ভেতরে খবর দিয়ে দেখুন। ইন্টারকম তো আছে।

আমাদের ওপর অর্ডার আছে কাউকে ঢুকতে না দেয়ার।

ও আচ্ছা। আমার কাছে ম্যাডামের কিছু জরুরি কাগজপত্র ছিল।

দারোয়ানদের একজন নিতান্ত অনিচ্ছায় ইন্টারকমের দিকে এগোচ্ছে। তার যেতে আসতে প্রচুর সময় লাগবে— হাসান সিগারেট ধরাল। সে অবাক হয়ে লক্ষ করল হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলার আগে বুকের ওপর সে যেমন চাপ অনুভব করত এখনো তাই করছে।

আপনি যান। সিগারেট ফেলে দিয়ে যান।

হাসান সিগারেট ফেলল। সিগারেট হাতে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না— এমন নির্দেশ কি আছে? দারোয়ানরা ক্ষমতাবানদের যেমন সম্মান দেখাতে ভালোবাসে তেমনি ক্ষমতাহীনদের অপমান করতেও ভালবাসে। গেটের সামনে চিত্রলেখা দাঁড়িয়ে থাকলে সে নিশ্চয়ই বলত না— সিগারেট ফেলে দিয়ে আসুন।

হাসান বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। কতক্ষণ হয়েছে? তার হাতে ঘড়ি নেই। বসার ঘরেও ঘড়ি নেই। সময় কতটা পার হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, মনে হয় অনেকক্ষণ হয়েছে। একা একা বসে থাকতে অদ্ভুত লাগছে। নীরব একটা বাড়ি। শব্দ নেই, হইচই

নেই। টিভি চলছে না, কেউ হাঁটাহাঁটি করছে না। এ রকম শব্দহীন ঘরে মানুষ বাস করে কী করে। বাড়িতে নানান রকম শব্দ হবে— শিশুরা চিৎকার করবে— দাপাদাপি করবে। তাদের হাসি এবং কান্নার শব্দ ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাবে...

সরি হাসান সাহেব দেরি করে ফেলেছি। দেরিটা ইচ্ছাকৃত না। নিন চা নিন।

চিত্রলেখা নিজেই হাতে করে চায়ের কাপ এনেছে। তার এই ভদ্রতা দীর্ঘ অপেক্ষা এবং গেটের সামনের অপমান ভুলে যাওয়া যায়।

আপনি এসেছেন শোনার পর হট শাওয়ার নিতে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। সারা দিন নানান জায়গায় ছোটাছুটি করেছি। গা ঘেমে ছিল। একা একা নিশ্চয়ই খুব বোর হচ্ছিলেন?

বোর হচ্ছিলাম না।

বাবার মৃত্যুর খবর জানতেন?

উনি যেদিন মারা গিয়েছিলেন আমি সেদিনই এসেছিলাম। উনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আসি নি— এমনিতেই এসেছিলাম। বাড়ির সামনে প্রচুর গাড়ি দেখলাম। খবর শুনলাম— তারপর ভাবলাম আমার কিছু করার নেই। চলে গিয়েছি।

আপনি মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না তাই না?

জ্বি না।

বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করতেন, উনাকে একবার শেষ দেখার ইচ্ছাও আপনার হয় নি?

জ্বি না। জীবিত অবস্থায় তাকে দেখেছি সেই স্মৃতিই আমি রাখতে চাই। মৃত মুখের স্মৃতি রাখতে চাই না।

এটা অবশ্য ভালোই বলেছেন। বাবার জীবনী লেখার কাগজগুলো কি এনেছেন?

জ্বি। ফাইলে সব গোছানো আছে। কিছু বানান ভুল থাকতে পারে। বাংলা বানানে আমি খুব কাঁচা।

এখানে ক'পৃষ্ঠা আছে?

পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো। স্যার যখন যা বলেছেন আমি লিখেছি। সাজাই নি। আপনি যদি বলেন— সাজিয়ে দেব।

চিত্রলেখা হাসছে। হাসান বুঝতে পারছে না মেয়েটার হাসির কারণ কী। বাবার মৃত্যুশোক এই মেয়ে সামলে উঠেছে। সামলে না উঠলেও তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই তার জীবনের ওপর এত বড় একটা ঝড় গেছে।

হাসান সাহেব।

জ্বি।

এই লেখাগুলো আপনি আমার সামনে বসে কুটি কুটি করে ছিঁড়ুন।

কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

চিত্রলেখা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাবা নিজেই আমাকে বলে গেছেন কাগজগুলো যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়। আপনাকে যা বলা হয়েছে— তা ঠিক না। ভুল বলা

হয়েছে। উইসফুল থিংকিঙের মতো উইসফুল পাস্ট বলে এটা ব্যাপার আছে। বাবা তাই করেছেন।

ও আচ্ছা।

তার বড় বোন পুষ্পের কথা আছে না ? যিনি হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি হঠাৎ মারা যান নি। বিষ খেয়েছিলেন। বিষ খাওয়া ছাড়া তার উপায়ও ছিল না। এই তরুণী মেয়েটিকে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে কুৎসিত নোংরামির ভেতরে দিয়ে যেতে হয়েছিল। বাবার উচিত ছিল তার নিজের সংগ্রামের গল্প বলা। কী করে তিনি ধাপে ধাপে এতদূর উঠেছেন। এত শক্তি পেয়েছেন কোথায় ? বাবা যে স্কুলে পড়তেন সেই স্কুলের একজন শিক্ষক নজিবুর রহমান তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। নিজে দরিদ্র মানুষ হয়েও বাবাকে কলেজে পড়ার খরচ দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়েছেন। এই অসাধারণ মানুষটির জন্যে বাবা কিছুই করেন নি। তিনি শেষ জীবনে খুব কষ্টে পড়েছিলেন, বাবা তাকে দেখতে পর্যন্ত যান নি।

চিত্রলেখা একটু থামতেই হাসান বলল, এইসব কথা বলতে আপনার বোধহয় খারাপ লাগছে। প্রসঙ্গটা থাক।

আমার বলতে খারাপ লাগছে না। বরং ভালো লাগছে। আমি মনে হয় বাবাকে একটু একটু বুঝতে পারছি। তার চরিত্রের একটা অদ্ভুত দিক কি জানেন ? জীবনে বড় হবার জন্যে তিনি যাদের সাহায্য নিয়েছেন পরবর্তী সময়ে তাদের পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। আবার কারো কারো প্রতি অকারণ মমতা পোষণ করেছেন। যেমন ধরুন আপনি। কারোর কথায় বা কারোর সুপারিশে বাবা কাউকে চাকরি দিয়েছেন বা চাকরির যোগাড় করেছেন এমন নজির নেই। কিন্তু আপনার ব্যাপারে ভিন্ন ব্যবস্থা হলো। তাৎক্ষণিকভাবে বাবা সব ঠিকঠাক করলেন। আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই খুব খুশি ?

জ্বি খুবই খুশি।

উনি কি সিঙ্গাপুর চলে গিয়েছেন ?

জ্বি।

আপনার প্রতি নিশ্চয়ই তিনি খুব কৃতজ্ঞ। তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গিটা কী একটু বলুন তো শুনি। তিনি কী করলেন ? আপনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন ?

ও আমার ভূমিকাটা জানে না। ওকে কিছু বলি নি।

কিছুই বলেন নি ?

জ্বি না।

বলেন নি কেন ?

বলতে ইচ্ছা করে নি।

চিত্রলেখা তাকিয়ে আছে। তার চোখে কৌতুক ঝিলমিল করছে। মনে হচ্ছে হাসানের এই ব্যাপারটায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

হাসান সাহেব।

জ্বি।

লোকচরিত্র বোঝার ব্যাপারে বাবার ক্ষমতা ছিল অসীম। আমার ধারণা আপনাকে উনি ঠিকই বুঝেছিলেন। আপনি কি জানেন বাবা আপনার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছিলেন ?

কী বললেন ?

চমকে উঠবেন না। এটাও বাবার পুরনো স্বভাব। কারো সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তিনি লোক লাগিয়ে দিতেন। আপনার ওপর বিরাট একটা ফাইল আছে। আপনি কোথায় যান, কী করেন মোটামুটি সবই সেই ফাইলে আছে।

হাসান হতভম্ব গলায় বলল, ও।

তিতলী নামের একটা মেয়ের সঙ্গে আপনার খুব ভাব ছিল তাই না ?

জ্বি।

উনাকে নিয়ে আপনি মাঝে মধ্যে বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরতেন।

এইসব কি ফাইলে আছে ?

জ্বি।

আপনার এক ভাই রকিব সম্পর্কে অনেক কিছু আছে।

কী আছে ?

থাক আপনার না জানলেও চলবে। আপনি বরং তিতলীর কথা বলুন। উনার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়।

জ্বি না।

দেখা করতে ইচ্ছে করে না ?

জ্বি না।

ভুল কথা বলছেন কেন ? আপনি তো মাঝে মাঝেই তিতলীদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেন।

ফাইলে লেখা ?

জ্বি। ভুল লেখা ?

জ্বি না, ভুল লেখা না।

আপনি তো এখনো বুড়িগঙ্গায় নৌকায় চড়ে একা একা ঘোরেন তাই না ?

জ্বি।

আপনার কি মনে হয় না— আপনার কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক।

হতে পারে।

আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ বকবক করলাম। কিছু মনে করবেন না। আসলে কথা বলার কেউ নেই। বাবার সব দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার হাতে। সামাল দিতে পাচ্ছি না। আপনার মতো একটা জীবন আমার হলে মন্দ হতো না। কাজকর্ম নেই। ঘুরে বেড়ানো— হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি। বিষণ্ন মনে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ।

চিত্রলেখা কিশোরীদের মতো হাসছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, সরি। ঠাট্টা করলাম, কিছু মনে করবেন না।

হাসান বলল, আজ উঠি ?

আচ্ছা। ভালো কথা, হাসান সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাবা আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দিতেন না ?

জ্বি।

আমিও আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দেব। মাঝে মাঝে এসে আমার বকবকানি শুনে যাবেন।

হাসান কিছু বলল না। চিত্রলেখা বলল, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন ?

বুঝতে পারছি না। সুমিদের বাসায় যেতে পারি।

আপনার ছাত্রী ?

জ্বি।

চিত্রলেখা হাসতে হাসতে বলল— এখন তো সে আপনার ছাত্রী না। এক সময় ছিল। আচ্ছা যান শুধু শুধু আপনাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছি...। আসুন আপনাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দি।

চিত্রলেখা হাসানের সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটছে। দারোয়ান দুজন চট করে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিল।

হাসান বলল, যাই।

চিত্রলেখা জবাব দিল না। তার বাবা হিশামুদ্দিন সাহেব এই ছেলেটিকে এত পছন্দ কেন করতেন তা সে বোঝার চেষ্টা করছে। হিশামুদ্দিন সাহেব হাসানের ফাইল এত যত্ন করে কেন তৈরি করেছেন। তার মাথায় অন্য কোনো পরিকল্পনা কি ছিল ?

বেল টিপতেই সুমি দরজা খুলে দিল। সহজ গলায় বলল, স্যার কেমন আছেন ? যেন সে স্যারের বেল টেপার জন্যেই বসার ঘরে চুপচাপ বসেছিল।

হাসান বলল, কেমন আছ সুমি ?

সুমি বলল, ভালো। স্ট্রং ডায়রিয়া হয়েছিল— এখন ভালো।

স্ট্রং ডায়রিয়ার জন্যে কি তোমাকে এমন রোগা রোগা লাগছে ?

না। বাবা চলে গেছেন তো খুব মন খারাপ। এই জন্যেই রোগা রোগা লাগছে। মন খারাপ হলে মানুষকে রোগা রোগা লাগে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ তাই। আপনারও নিশ্চয়ই মন খারাপ। আপনাকেও খুব রোগা রোগা লাগছে।

আমার মন অবশ্যি একটু খারাপ। তুমি ঠিকই ধরেছ।

স্যার বসুন। কী খাবেন বলুন, চা না কোক ?

বাসায় আর কেউ নেই ?

কাজের মেয়েটা আছে— রহমত চাচা আছে। মা গিয়েছে মেজোখালার বাসায়। আমারও যাবার কথা ছিল।

যাও নি কেন?

আপনি আসবেন তো— এই জন্যে যাই নি।

হাসান হেসে ফেলল। সুমির এই ব্যাপারটা খুব মজার। এমনভাবে কথা বলে যেন সে ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখছে। দু মাস পর আজ হাসান এসেছে। তাও আসার কথা ছিল না। বেবিট্যাক্সি দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ বেবিট্যাক্সির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বেবিট্যাক্সিওয়ালা স্ট্রার্টার হাতল ধরে অনেক টানাটানি করে হাল ছেড়ে দিল। হাসান বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে দেখে সুমিদের বাসা দুটো বাড়ির পরেই। বাসার আশপাশেই যখন আসা তখন সুমিকে দেখে যাওয়া যাক। এই ভেবে সুমিদের বাসায় আসা। অথচ মেয়েটা ভবিষ্যদ্বক্তা জেন ডিক্সনের মতো কথা বলছে।

স্যার।

হুঁ।

আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?

কে বলল করছি না। করছি তো।

উঁহুঁ। আপনি বিশ্বাস করছেন না। আপনার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি মনে মনে হাসছেন। কেউ যখন মনে মনে হাসে তখন তার চোখ হাসতে থাকে। মুখ থাকে খুব গম্ভীর।

হ্যাঁ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন।

সেটা কীভাবে?

ফুলিকে আমি বলব— আমার পড়ার টেবিলে ওপর থেকে নীল ভেলভেটের ডায়রিটা আনতে। ওই ডায়েরিতে আজকের তারিখে আমি লিখে রেখেছি— আজ হাসান স্যার আমাদের বাসায় আসবেন।

বল কী?

ডায়েরিটা আমি নিজেই আনতে পারতাম। আমি আনলে আপনি ভাবতেন আমি আপনার সামনে থেকে চলে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ডায়েরিতে এটা লিখে নিয়ে এসেছি। এই জন্যেই ফুলিকে দিয়ে আনাব।

সুমি গম্ভীরমুখে বসে আছে। পা দোলাচ্ছে। হাসান মনে মনে বলল, মেয়েটা খুব অন্যরকম। বিরাট একটা বাড়িতে একা একা বড় হয়ে মেয়েটা অন্যরকম হয়ে গেছে। যতটুকু ভালবাসা তার প্রয়োজন তার মা একা তাকে ততটুকু ভালবাসা দিতে পারছে না। মেয়েটা নিঃসঙ্গ। সঙ্গপ্রিয় মানুষের জন্যে নিঃসঙ্গতার শাস্তি কঠিন শাস্তি। এই শাস্তি মানুষকে বদলে দেয়।

স্যার।

বল।

আমার বাবার ধারণা আমার ই.এস.পি. ক্ষমতা আছে। ই.এস.পি. হচ্ছে এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন।

তুমি এই কঠিন বাক্যটা জান!

হ্যাঁ জানি। বাবা আমার সম্পর্কে কী বলে জানেন ?

না।

জানতে চান ?

হ্যাঁ জানতে চাই।

বাবা বলেন— আমি ইচ্ছা করলে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে পারি। বাবার কথা কিন্তু ঠিক না। আমি সবার ভবিষ্যৎ বলতে পারি না। যাদের খুব পছন্দ করি শুধু তাদেরটা বলতে পারি।

আমাকে কি তুমি খুব পছন্দ কর ?

হ্যাঁ।

কেন ?

সেটা আমি আপনাকে বলব না।

ফুলিকে ডেকে বল ডায়েরিটা আনতে। দেখি ডায়েরিতে তুমি কী লিখেছ ?

হাসান ডায়েরি দেখে সত্যিকার অর্থে একটা ধাক্কার মতো খেল। ডায়েরিতে গোটা গোটা হরফে লেখা— আজ হাসান স্যার আমাকে দেখতে আসবেন। তবে আমার জন্যে কিছু আনবেন না। খালি হাতে আসবেন।

হাসান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার তো দেখি আসলেই ই.এস.পি. আছে। তুমি আমার সম্পর্কে আর কী বলতে পার ?

অনেক কিছু বলতে পারি। আপনি কাকে বিয়ে করবেন— তাও বলতে পারি।

বলতে পারলে বল।

উঁহুঁ আমি বলব না।

বলবে না কেন ?

শুধু শুধু কেন বলব ? স্যার আপনি চা খাবেন, না কোক খাবেন ?

চা খাব।

আগে একটু কোক খেয়ে নিন না। তারপর চা খাবেন। আমি কোক দিয়ে খুব একটা মজার ড্রিংকস বানাতে পারি। বাবা শিখিয়েছেন। কী করতে হয় জানেন— কোকের গ্লাসে দুটা কালো কাঁচা মরিচ মাঝামাঝি চিরে দিয়ে দিতে হয়। তার সঙ্গে এক চামচ লেবুর রস এবং সামান্য বিট লবণ দিতে হয়। তারপর কোকের গ্লাসটা ডিপ ফ্রিজে দিয়ে খুব ঠাণ্ডা করতে হয়। সার্ভ করার আগে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া গ্লাসে দিয়ে দিতে হয়। না দিলেও চলে। আমি দেই নি। বাসায় গোলমরিচের গুঁড়া ছিল না, এই জন্যে দেই নি।

তুমি কি ড্রিংকস বানিয়ে রেখেছ ?

হুঁ।

বেশ তো তাহলে নিয়ে এস খাই।

বাবার ধারণা ড্রিংসটা খুব ভালো। আমার ভালো লাগে না। ঝাল তো এই জন্যে ভালো লাগে না। আপনার কি ঝাল পছন্দ ?

পছন্দ।

ঝাল কম খাবেন। ঝাল বেশি খেলে পেটে আলসার হবে।

আচ্ছা কমই খাব। তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে কেন?

সুমি পা দোলাতে দোলাতে বলল, চশমা নিয়েছি তো এই জন্যে অন্যরকম লাগছে। চশমা পরলে সবাইকে অন্যরকম লাগে। কাউকে বেশি অন্যরকম লাগে, আবার কাউকে কম অন্যরকম লাগে। আমাকে বেশি লাগছে।

হাসান কাঁচা মরিচের কোক খেল। চা খেল। সে ভেবেছিল মিনিট দশেক থেকে চলে যাবে। সে থাকল প্রায় দুই ঘণ্টা। নানা রকম সমস্যায় সে পর্যুদস্ত। বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার সময় কোনো সমস্যা মাথায় থাকে না। বরং মনে হয়— পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন নয়। বেঁচে থাকার আনন্দ আলাদা। শুধুমাত্র সেই আনন্দের জন্যেই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা যায়।

হাসান বলল, সুমি আজ উঠি?

সুমি বলল, আচ্ছা।

আবার আসবেন বাক্যটা বলল না। এই মেয়ে কখনো তা বলে না। কারণ কী? সে জানে আবার কবে স্যার আসবেন সেই জন্যেই কি? এই হাস্যকর যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না। জানে না বলেই তারা মনের আনন্দে বর্তমান পার করতে পারে।

হাসানের বড় মামা— মুকুল মামা ভবিষ্যৎ জেনে ফেলেছিলেন। ডাক্তারেরা তার পেট পরীক্ষা করে বললেন— স্টোমাক কান্সার মেটাসথিসিস হয়ে গেছে। শরীরে ক্যানসারের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গেছে। আয়ু আছে তিন মাস। ভবিষ্যৎ জানার পর মুকুল মামার জীবন বিষময় হয়ে গেল। মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন তিন মাস আগে থেকেই। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদেন—আমার জীবনটা রক্ষা কর। আমার জীবনটা রক্ষা কর। মুকুল মামার জন্যে ভবিষ্যৎ জেনে ফেলাটা সুখকর হয় নি। আনন্দময় কোনো ভবিষ্যৎ আগে ভাগে জেনে ফেললে কী হবে? সেই আনন্দ অনেকখানি কমে যাবে। মানুষকে সুখী থাকা উচিত বর্তমান নিয়ে। মানুষ তা পারে না। বর্তমানে সে দাঁড়িয়েই থাকতে পারে না। তার এক পা থাকে অতীতে আরেক পা ভবিষ্যতে। দু নৌকায় পা, সেই দু নৌকা আবার যাচ্ছে দুদিকে।

রাস্তায় নেমে হাসান রিকশা নিল। রাত বেশি হয় নি— ন'টা বাজে। এখনি বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বেকারদের রাত দশটার আগে বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ করে তিতলীদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে এই ইচ্ছা হয়। যখন হয় তখন আর কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছাটা হু-হু করে বাড়তে থাকে। তিতলীদের বাড়িতে যাবার জন্যে অজুহাত একটা আছে। ভালো অজুহাত। নাদিয়া এমন চমৎকার রেজাল্ট করেছে তাকে কনগ্রাচুলেট করা তার অবশ্যই কর্তব্য। যেদিন নাদিয়ার রেজাল্টের কথা জেনেছে সেদিনই সে নাদিয়ার জন্যে ভালো একটা কলম কিনেছে। কলমের বাক্সটা গিফট র‍্যাপে মুড়েছে। ছোট্ট একটা চিরকুট গিফট র‍্যাপে ঢোকাল।

সেখানে লেখা—

নাদিয়া,

ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়ে এতদিন শুধু পত্রিকায় দেখেছি। বাস্তবে এদের সত্যিসত্যি কোনো অস্তিত্ব আছে তা মনে হতো না। রেজাল্ট হবার পর তোমাকে বাস্তবের কেউ মনে হয় না। মনে হয় তুমি অন্য কোনো গ্রহের। তুমি আমার অভিনন্দন নাও।

ইতি

হাসান ভাইয়া

উপহারটা নাদিয়াকে এখনো দেয়া হয় নি। অনেকবারই সে তিতলীদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। শেষ পর্যন্ত গেট খুলে ভেতরে ঢোকে নি। হয়তো বাড়িতে গল্প করছে। হাসান সেই আনন্দময় মুহূর্তে প্রবেশ করামাত্র ছন্দপতন হবে। আজ বোধহয় যাওয়া যায়। তিতলী মার বাড়িতে এলেও এত রাত পর্যন্ত নিশ্চয়ই থাকবে না। নববিবাহিতা তরুণীরা মার বাড়িতে এত সময় নষ্ট করে না। এরা দ্রুত অতীত ভুলতে চেষ্টা করে। মেয়েরা তাদের শরীরে সন্তান ধারণ করে। সন্তান ধারণ করে বলেই হয়তো প্রকৃতি তাদের ভবিষ্যৎমুখী করে রাখে। অতীত তাদের কাছে পুরনো গল্পের বইয়ের মতো। যে গল্প একবার পাঠ করা হয়েছে বলে কৌতূহল মরে গেছে। দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা করে না। বইটি হারিয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।

হাসান তিতলীদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে যতটুকু মনের জোর দরকার এই মুহূর্তে ততটুকু মনের জোর তার নেই। কেন জানি মনে হচ্ছে তিতলী তার মার বাড়িতে। কারণ ঘরে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। বারান্দায়ও বাতি জ্বলছে। এতগুলো বাতি জ্বলার কথা না। বাইরে বারান্দার বাতি তো কখনোই জ্বালানো থাকে না। ঘটনা কী ঘটেছে হাসান তো অনুমান করার চেষ্টা করছে। তিতলী এসে কলিংবেল টিপেছে। নাদিয়া বাইরে বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলল। তারপর আপাকে দেখে এতই আনন্দিত হলো যে বাতি নেবাতে ভুলে গেল। তিতলী এ বাড়িতে এলে গেটের ভেতরে একটা গাড়ি থাকার কথা। গাড়ি অবশ্যি নেই। তিতলীর স্বামী এসে হয়তো তিতলীকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। রাত এগারটার দিকে আবার এসে নিয়ে যাবেন।

হাসান হাঁটা শুরু করল। আজ থাক আরেকদিন সে আসবে। নাদিয়ার উপহারটা মনে হয় দীর্ঘদিন পকেটে পকেটে ঘুরবে। গিফট র‍্যাপ কুঁচকে যাবে, ময়লা হয়ে যাবে উপহার আর দেয়া হবে না। সবচে' ভালো হত হঠাৎ যদি রাস্তায় নাদিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। উপহারটা তার হাতে দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলা যেত। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা শূন্য। নাদিয়া এমন মেয়ে যে কখনো ঘর থেকে বের হয় না। ঘর থেকে বের হলেই তার নাকি কেমন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। চার দেয়ালের ভেতরে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই নাকি তার শান্তি শান্তি লাগে। কী অদ্ভুত কথা!

বাসায় ফিরতে হাসানের ইচ্ছা করছে না। আজ বাসার পরিস্থিতি খুব খারাপ থাকার কথা। তারেক একদিনের অফিস ট্যুরের কথা বলে চিটাগাং গিয়েছিল। এক দিনের

জায়গায় সাতদিন কাটিয়ে আজ দুপুরে ফিরেছে। ট্যুরের ব্যাপারটা যে মিথ্যা রীনার কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। চারদিনের দিন অফিস থেকে তারেকের এক কলিগ এসেছিল খোঁজ নিতে—তারেকের অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে কিনা, তার কাছেই রীনা জেনেছে তারেক দুদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছে। রীনা খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে– দুইয়ে দুইয়ে চার করা তার জন্যে কোনো সমস্যাই না। হাসান এখনো জানে না ভাবি হিসাব মিলাতে বসেছে কি না। সব ঘটনা জানার পর রীনার প্রতিক্রিয়া কী হবে হাসান তাও বুঝতে পারছে না। হঠাৎ করে ধৈর্য হারালে সমস্যা হবে। তবে ভাবি সম্ভবত ধৈর্য হারাবে না।

তারেক দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। সন্ধ্যায় গোসল করে পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে। দুবার চা চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। তার চেহারা এবং কথাবার্তায় কোনোরকম উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং মুখটা হাসি হাসি। টগরের কথা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর টগর ঠিকই শব্দে কাশছে তারেক সেটা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করল। রীনাকে ডেকে বলল, টগরের বুকে কফ বসে গেছে। এক কাজ কর সরিষার তেলে রসুন দিয়ে তেলটা গরম করে বুকে মালিশ করে দাও। আর এক কাপ কুসুমগরম পানিতে এক চামচ মধু দিয়ে ওই পানিটা খাইয়ে দাও। কফ আরাম হবে। ঘরে মধু আছে ?

রীনা স্বাভাবিক গলায় বলল, না মধু নেই।

তারেক বলল, এক শিশি মধু ঘরে সব সময় রাখবে। মেডিসিন বক্সে যেমন নানান ধরনের ওষুধপত্র থাকে তেমনি এক শিশি মধু থাকা উচিত। কোরান শরীফে কয়েকবার মধুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাসানকে বল মধু নিয়ে আসুক।

হাসান বাসায় নেই।

আচ্ছা ঠিক আছে— কাগজটা পড়ে দি। আমি এনে দেব।

তারেক মধু এনে দিয়ে রাতের খাবার খেতে গেল। সে সাধারণত চুপচাপ খাওয়া শেষ করে। আজ রীনার সঙ্গে গল্প শুরু করল। রাজনৈতিক গল্প। তারেক বিএনপি সমর্থক ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর সে কিছুটা আওয়ামী লীগ ঘেঁসা হয়ে পড়েছে।

শেখ হাসিনা দেশ তো মনে হয় ভালোই চালাচ্ছে, কী বল ?

হুঁ।

সাহস আছে। রাজনীতিতে সাহসটা অনেক বড় জিনিস। কর্নেল ফারুক গং-কে কেমন জেলে ঢুকিয়ে দিল দেখলে ?

হুঁ।

ভালো কাজ করলে সাপোর্ট পাবে। তবে মূল সমস্যাটা কোথায় জান ?

না।

মূল সমস্যা মানুষের ভেতর না। মূল সমস্যা সিংহাসনে। সিংহাসনে কিছুদিন বসলেই মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীকে দেখ— লোকে যে তাঁকে এখনো ভালো বলে কেন বলে ? সিংহাসনে বসেন নি বলেই বলে। দু মাস সিংহাসনে বসতেন

দেখতে মানুষ গান্ধীজীর নাম শুনে থুতু দিত। ছাগল নিয়ে ঘুরেও লাভ হতো না। ঠিক বলছি না?

হুঁ।

ঘরে কি পান আছে?

আছে।

কাঁচা সুপারি আছে?

না।

কাল অফিস থেকে ফেরার সময় কাঁচা সুপারি নিয়ে আসব। কাঁচা সুপারি হার্টের জন্যে ভালো। কাঁচা সুপারিতে এলকলিয়েড বলে একটা জিনিস থাকে। নাইট্রোজেনঘটিত কম্পাউন্ড। এটা হার্টের জন্যে উপকারী। পেপারে পড়েছি।

ও আচ্ছা।

আমাদের গ্রামের মানুষদের মধ্যে হার্টের অসুখ নেই তার মূল কারণ ওরা কাঁচা সুপারি খায়।

ও।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তারেক নিজেই বিপুল উৎসাহে ছেলের বুকে তেল মালিশ করে দিল। কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। নিজে ঘুমোতে এল রাত এগারটার দিকে। পান খেয়ে তার মুখ লাল। হাতে সিগারেট। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শেষ সিগারেটটা খাবে। সুখী সুখী চেহারা। রীনা মশারি খাটাল। পানির গ্লাস, জগ এনে রাখল। ঘুমোতে যাবার আগে আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বাঁধতে সহজ গলায় বলল, চিটাগাঙের ওয়েদার কেমন?

তারেক বলল, ভালো।

বৃষ্টি হচ্ছে না?

একদিন হয়েছিল।

এই কদিন লাবণীর বাসাতেই ছিলে?

হ্যাঁ। আর বল কেন যন্ত্রণা— ওরা এপার্টমেন্ট দিয়েছে। কমপ্লিট হবার আগেই দিয়ে বসে আছে। ইলেকট্রিসিটির কানেকশান নেই। গ্যাসের কানেকশান নেই। দুটা বাথরুমের একটায় কোনো ফিটিংসই নেই। এই অবস্থার ফেলে রেখে আসতে পারি না।

আমাকে তুমি মিথ্যা কথা বলে গিয়েছ। বলেছ ট্যুরে যাচ্ছ।

তাই বলেছিলাম?

হ্যাঁ।

মিথ্যা না— ট্যুরেই গিয়েছিলাম। চিটাগাং অফিসের হিসাবপত্র অডিট হচ্ছে। ঢাকা থেকে অডিট টিম যাচ্ছে, আমি সেই অডিট টিমে আছি।

চুল বাঁধা শেষ করে রীনা স্বামীর দিকে ফিরল। সহজ গলায় বলল, আমি এর মধ্যে তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জানলাম তুমি দুদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছ।

ও এই ব্যাপার। আসলে হয়েছে কি— অডিটের ডেট হঠাৎ করে পিছিয়ে দিল। এদিকে মানসিকভাবে আমি তৈরি চিটাগাং যাব। তখন ভাবলাম যাই ঘুরেই আসি।

তুমি তো মিথ্যা কখনো বল না। আজ এমন সহজ ভঙ্গিতে মিথ্যা বলছ কেন? আমি তো কোনো রাগারাগিও করছি না হইচই করছি না। মিথ্যা বলার দরকার কী? তুমি কি লাবণী মেয়েটির প্রেমে পড়েছ?

আরে কী যে বল, প্রেমে পড়া পড়ির মধ্যে কী আছে। একটা অসহায় মেয়ে বিপদে পড়েছে তাকে সাহায্য করেছি। এর বেশি কিছু না।

এর বেশি কিছু না?

না।

দয়া করে তুমি আমাকে সত্যি কথা বল— এর বেশি তোমার কাছে কিচ্ছু চাচ্ছি না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কোনো সমস্যা তৈরি করব না। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি, আমি কী সমস্যা করব? আচ্ছা তুমি ছ'দিন ওই মেয়েটির বাড়িতেই ছিলে?

হ্যাঁ। ওর হলো টু বেডরুম এপার্টমেন্ট। আমি একটাতে ছিলাম, ওরা মা-মেয়ে একটাতে ছিল।

রাতে সে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসে নি?

এসেছে।

কী নিয়ে গল্প করলে? পলিটিক্স?

না— লাবণী তার জীবনের নানান গল্প করত, শুনতাম। খুবই দুঃখী মেয়ে।

মেয়েটির সঙ্গে তোমার শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয়েছে?

আরে ছিঃ ছিঃ এইসব কী বলছ?

হয়েছে কি না সেটা বল? গল্প করতে করতে হয়তো অনেক রাত হয়ে গেল। মেয়েটা ঠিক করল রাতটা তোমার সঙ্গেই থাকবে।

কী যে তুমি বল রীনা, আমি ফেরেশতার মতো মানুষ!

ইবলিশ শয়তানও এক সময় ফেরেশতা ছিল— তারপর সে শযতান হয়েছে।

এইখানে তুমি একটা ভুল করলে। অধিকাংশ মানুষ এই ভুলটা করে। ইবলিশ কিন্তু ফেরেশতা ছিল না। ইবলিশ আসলে ছিল জ্বিন।

জ্বিন ছিল না ফেরেশতা ছিল সেটা পরে দেখা যাবে— এখন বল, মেয়েটার সঙ্গে কি তোমার কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে?

রীনা পানি এনে দিল। তারেক কয়েক চুমুক পানি খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিল। রীনা বলল, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব কি দেবে, না দেবে না? হ্যাঁ বলবে কিংবা না বলবে। তুমি যা বলবে তাই আমি বিশ্বাস করব। সত্যি কথা বলার অনেক উপকারিতা আছে। তুমি তো বিরাট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছ— এখন তোমার উচিত সত্যি কথা বলা। এখন মিথ্যা কথা বললে ঝামেলা আরো বাড়বে। সবকিছু জট পাকিয়ে যাবে। এখন তোমার উচিত জট কমানো। তুমি কি মেয়েটার সঙ্গে ঘুমিয়েছ? আমি খুব ভদ্রভাবে তোমাকে প্রশ্নটা করলাম। আসলে কী বলতে চাচ্ছি তা নিশ্চয়ই বুঝছ? মেয়েটার সঙ্গে রাতে

ঘুমিয়েছ ?

হ্যাঁ।

মেয়েটি কি তোমাকে বিয়ে করতে চায় ?

চাইলেই বা উপায় কী ?

উপায় থাকবে না কেন ? বিয়ে তো আর কিছুই না এক ধরনের কন্ট্রাক্ট। আরবিতে নিকাহনাকার অর্থ হচ্ছে sex contact। তুমি পুরনো কন্ট্রাক্ট বাতিল করে নতুন কন্ট্রাক্ট করবে।

তুমি রেগে যাচ্ছ রীনা।

আমি মোটেই রাগি নি। তবে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে বাস করব না। আগামী পরশু আমি চলে যাব। কালকের দিনটা আমার যাবে গোছগাছ করতে। তোমার সংসার তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিয়ে যাব। তারপর তুমি আমাকে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করবে। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর এই মেয়েটিকে বিয়ে কোরো। চাকরিজীবী মেয়ে আছে তোমার জন্যে সুবিধাও হবে। তোমার একার রোজগারে সংসার চলছে না। দুজনের রোজগারে চলবে।

রীনা তুমি খুবই রেগে গেছ বুঝতে পারছি। রাগারই কথা।

আমি মোটেও রাগি নি। ব্যাপারটা জানার পর থেকেই আমি এটা নিয়ে ভাবছি। তোমাকে যে কথাগুলো বললাম তার প্রতিটি শব্দ নিয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবেছি। যাই হোক এখন ঘুমোতে চল।

রীনা বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠে এল। গত চার রাতে তার এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। আজ বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। শান্তিময় ঘুম।

১৯

রীনা খুব শান্ত ভঙ্গিতেই তার সুটকেসে কাপড় ভরল। কয়েকটা ব্যবহারি শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট। ব্যাস এই তো। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে নেই নেই করেও অনেক কিছু জমে গেছে। সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। থাকুক তার স্মৃতি হিসেবে কিছু জিনিসপত্র। সঙ্গে করে সামান্য হলেও কিছু টাকা-পয়সা নেয়া দরকার। সেটা নিতে ইচ্ছে করছে না। ছোট মামার দেয়া সাত শ ডলারের কিছুই নেই। রীনা ভেবেছিল একটা টাকাও সে খরচ করবে না। সব জমা করে রাখবে। অথচ কত দ্রুতই না সেই টাকাটা খরচ হলো। তারেকের অফিসের কিছু দেনা শোধ করা ছাড়া টাকাটা আর কোনো কাজে লাগে নি। তার হাত আজ পুরোপুরি খালি।

বউ হিসেবে যখন সে বাবার বাড়ি থেকে আসে তখনো খালি হাতে এসেছিল। বাবা কয়েকবার বলেছিলেন, মেয়েটার হাতে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দাও। টুকটাক খরচ আছে। ফট করে স্বামীর কাছে চাইতেও পারবে না লজ্জা লাগবে। বিয়েবাড়ির উত্তেজনায় শেষ পর্যন্ত তার হাতে টাকা দেয়ার ব্যাপারটা মনে রইল না। সে গাড়িতে উঠল একেবারে খালি হাতে। আজ বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময়ও খালি হাতে বিদায় নেয়া ভালো। যেভাবে এসেছি— সেভাবে যাচ্ছি। না তাও ঠিক না। সে স্বামীর কাছে এভাবে

আসে নি। তার দরিদ্র বাবা ধারদেনা করে অনেক গয়নাপাতি দিয়েছিলেন। এই নিয়ে বাড়িতে অনেক অশান্তিও হয়েছে। রীনার মা ঝাঁঝালো গলায় বলেছিলেন— এত যে ঋণ করলে শোধ দিবে কীভাবে ? টাকার গাছ পুঁতেছ ? রীনার বাবা হাসিমুখে বলেছিলেন, মেয়েটা ঝলমলে গয়না পরে স্বামীর কাছে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখতেও অনেক আনন্দ। তোমার এই মেয়ে সুখের সাগরে ডুবে থাকবে।

সুখের সাগরে ডুবে থাকার এই হলো নমুনা। নয় বছর স্বামীর সঙ্গে থেকে আজ সব ফেলে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

রীনা তার গলার হারটা সঙ্গে নিল। বাবার দেয়া গয়না একে একে বিক্রি করে সংসারের ক্ষুধা মেটাতে হয়েছে। হারটা রয়ে গেছে। হার বিক্রি করে নগদ কিছু টাকা হাতে নিতে হবে। মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু অর্থ! স্বার্থহীন বন্ধু। যে মানুষের চারদিকে শক্ত দেয়াল হয়ে মানুষকে রক্ষা করে। রীনার সে রকম বন্ধু নেই। আশ্রয় দেবার মতো আত্মীয়স্বজনও নেই। সে যার কাছেই উঠবে সে-ই ব্যস্ত হয় উঠবে তাকে তাড়িয়ে দিতে। তাকে উঠতে হবে স্কুল জীবনের বান্ধবীর বাসায়। তারা তাকে তাড়িয়ে দেবে না। স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব অন্যরকম ব্যাপার। এই বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কখনো কমে না। রীনার সঙ্গে তার স্কুলজীবনের বন্ধুদের কোনো যোগ নেই। কে কোথায় আছে সে জানেও না। একজন থাকে বারিধারায়। সুস্মিতা। তার সঙ্গে নিউমার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। সুস্মিতা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুস্মিতা বাড়ির নম্বর, টেলিফোন নম্বর সব একটা কাগজে লিখে দিয়েছিল। কাগজটা অনেকদিন ছিল টেবিলের ড্রয়ারে। তারপর উড়ে চলে গেল। সুস্মিতার ঠিকানা জানা থাকলে কাজ হতো।

বিকালের মধ্যে রীনা সব গুছিয়ে ফেলল। বিকেলে বাচ্চারা খাবে তার জন্যে নুডলস। রাতের জন্য পোলাও। দুজনই খুব পোলাও পছন্দ করে। রোজ খেতে বসে বলবে, মা 'পিলাউ'। টগর সব শব্দ উচ্চারণ করতে পারে শুধু পোলাও বলতে গিয়ে বলে পিলাউ। পোলাও থাকলে তার আর কিচ্ছু লাগবে না। তরকারি না হলে চলবে। কপ কপ করে 'পিলাউ' খাবে। সেই খাওয়া দেখার ভেতরও আনন্দ আছে। আজ রীনা এই আনন্দ পাবে না। টগর 'পিলাউ' খাবে একা একা। না, একা একা নিশ্চয়ই খাবে না— লায়লা থাকবে।

রীনা এক শ টাকার একটা নোট এবং কিছু ভাংটি টাকা সঙ্গে নিল। যেখানেই যাক রিকশা ভাড়া, বেবিট্যাক্সি ভাড়া তো দিতে হবে।

আলমিরা খুলে টগর এবং পলাশের জুতাজোড়া নিল। জন্মের এক মাস পর এলিফ্যান্ট রোডের এক দোকান থেকে রীনা নিজে এই দু জোড়া জুতা কিনেছিল। লাল ভেলেভেটের জুতা। এখনো ঝলমল করছে। জুতা জোড়া কেনার সময় সে বিস্মিত হয়ে ভাবছিল— জন্মের সময় মানুষের পা এতো ছোট থাকে ? রীনার অনেক দিনের শখ টগর এবং পলাশের যেদিন বিয়ে হবে সেদিন কাচের বাক্সে জুতাজোড়া রেখে সেই বাক্সটা মায়ের বিয়ের উপহার হিসেবে সে দেবে। প্রতীকী উপহার । চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া— দেখ একদিন তুমি এ রকম ছোট ছিলে— আজ বড় হয়েছ। তোমার সংসারে এ রকম ছোট একটা শিশু আসবে। চক্র কোনোদিন ভাঙবে না। চলতেই থাকবে।

এই জীবনে রীনার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নি। কে জানে এই ইচ্ছাটাও হয়তো পূর্ণ

হবে না। টগর-পলাশের বিয়ে হয়ে যাবে সে খবরও পাবে না। রীনার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেন চোখের পানি চোখেই শুকিয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় চোখের পানি ফেলতে নেই। চোখের পানি বাড়ির জন্যে ভয়াবহ অমঙ্গল নিয়ে আসে। রীনা চায় না, এই বাড়ির অমঙ্গল হোক। এ বাড়িতে টগর ও পলাশ থাকে। হাসান থাকে, লায়লা থাকে। তার শ্বশুর-শাশুড়ি থাকেন। এদের সবাইকে রীনা অসম্ভব পছন্দ করে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সবচে' বেশি পছন্দ করে তার শাশুড়ি মনোয়ারাকে। কেন করে সে নিজেও জানে না।

সব গোছানোর পর রীনা মনোয়ারার ঘরে উঁকি দিল। যাবার আগে একটু দেখা করা। তাকে কিছু বলে যাওয়া যাবে না। সেটা সম্ভব না।

রীনা শাশুড়ির ঘরের দরজা ফাঁক করল। মনোয়ারা বললেন, বউমা তোমার শ্বশুর কোথায় জান?

জানি না মা।

বারান্দায় গিয়ে উঁকি দাও— তোমার শ্বশুরকে দেখবে রাস্তার ওপাশে যে চায়ের স্টল আছে, বিসমিল্লাহ টি-স্টল, ওইখানে বসে আছে।

খবর দিয়ে আনব মা?

না খবর দিয়ে আনতে হবে না। কয়েকদিন ধরেই আমি ব্যাপারটা লক্ষ করছি। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। ঠিক এই সময় বুড়ো চায়ের স্টলে বসে থাকে কেন জানতে চাও?

কেন?

মেয়েস্কুল ছুটি হয়। মেয়েগুলো শরীর দোলাতে দোলাতে রাস্তা দিয়ে যায়। আর আমাদের বুড়ো এই দৃশ্য চোখ দিয়ে চাটে। বুঝলে কিছু?

রীনা চুপ করে রইল।

একটা বয়সের পর পুরুষ মানুষের এই রোগ হয়। চোখ দিয়ে চাটার রোগ। খুবই ভয়ঙ্কর রোগ। আল্লাহপাক এই বিষয়টা জানেন বলেই এই বয়সে চোখে ছানি ফেলে দেন। আমাদের বুড়োর চোখ পরিষ্কার, ছানি পড়ে নি। তার খুব সুবিধা হয়েছে। রোজ বিকেলে চা খেতে যাচ্ছে। জীবনে তাকে চা খেতে দেখলাম না, এখন চা খাওয়ার ধুম পড়েছে। ভেবেছে আমি কিছু টের পাই নি। কোনো ভরা বয়সের মেয়ে ঘরে এলে বুড়ো কী করে লক্ষ করেছ? তার মা ডাকার ধুম পড়ে যায়। মা মা বলে আদরের ঘটা। মা ডাকলে মাথায় পিঠে, পাছায় হাত বোলানোর সুযোগ হয়ে যায়—। সুযোগ আমি বার করছি। আজ বাসায় ফিরুক। সাপের পা তো কেউ দেখে নাই। তোমার শ্বশুর আজ সাপের পা দেখবে, শিয়ালের শিং দেখবে।

মা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

একা যাচ্ছ?

জ্বি।

একা যাবার দরকার নেই, বুড়ো শয়তানকে সাথে নিয়ে যাও। বুড়ো একদিনে অনেক মেয়ে দেখে ফেলেছে আর না দেখলেও চলবে। যাচ্ছ কোথায়?

আমার এক বান্ধবীর বাসায়।

শয়তানটাকে সাথে নিয়ে যাও। তুমি বন্ধুর বাসায় যেও। শয়তানটাকে রিকশায় বসিয়ে রাখবে। সে রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প করবে। এটাই তার শাস্তি। আর শোন মা তুমি দেরি করবে না। সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরবে। বাড়ির বউ সন্ধ্যার পর বাইরে থাকলে সংসারে অমঙ্গল হয়। বাড়ির বউকে দুটা সময়ে অবশ্যই ঘরে থাকতে হয়। সূর্য ওঠার সময় এবং সূর্য ডোবার সময়। এই কথাগুলো মনে রাখবা মা। তোমার ছেলে দুটাকে যখন বিয়ে দিবে তখন তাদের বউদেরও বলবে।

জ্বি আচ্ছা।

রীনা শাশুড়ির ঘর থেকে বেরোল। টগর-পলাশ বারান্দার দেয়ালে মহানন্দে রঙ পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকছে। দেয়ালে ছবি আঁকা নিষিদ্ধ কর্ম। এই নিষিদ্ধ কর্মের জন্যে দু ভাই অতীতে অনেক শাস্তি পেয়েছে। আজ পেল না। রীনা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। দু ভাই মাথা নিচু করে বসে আছে। ভয়ে কেউ মাথা তুলছে না। রীনার খুব শখ ছিল যাবার আগে ছেলে দুটির মুখ ভালোমতো দেখে যায়। সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। মাকে দেখে এরা দুজন মাথা আরো নিচু করে ফেলল। দেয়ালে দু মাথাওয়ালা একটা ভূত আঁকা রয়েছে। রীনা ভূতের দিকে তাকিয়ে আছে। রীনা নরম গলায় ডাকল, টগর। টগর মার গলায় বিপদের আভাস পেয়েছে। সে ছুটে দাদিমার ঘরে ঢুকে গেল, মুহূর্তের মধ্যেই তাকে অনুসরণ করল পলাশ। মার হাত থেকে মুক্তির এই একটিই উপায়।

ভাবি শোন।

বারান্দায় লায়লা দাঁড়িয়ে আছে। তার গলার স্বর ভারি। মনে হয় সে এতক্ষণ কাঁদছিল। চোখে কাজল লেপ্টে আছে।

কী ব্যাপার লায়লা?

তুমি একটু আমার ঘরে আস তো ভাবি।

রীনা লায়লার ঘরে ঢুকতেই লায়লা দরজা বন্ধ করে দিল। রীনা বলল, ব্যাপার কী বল তো?

লায়লা কান্না চাপতে চাপতে বলল, ভাবি তুমি বল আমি কি এতই ফেলনা? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

ব্যাপারটা কী?

আমি জানি আমার চেহারা ভালো না। রং ময়লা— তাই বলে আমার জন্যে ডিভোর্সড ছেলে খুঁজতে হবে?

কে খুঁজছে ডিভোর্সড ছেলে?

বড়বুবু একটা ছেলের সন্ধান এনেছেন। ডিভোর্সড। আগের ঘরের একটা ছেলে আছে তিন বছর বয়স। আমার চেহারা খারাপ বলে আমার ভাগ্যে বুঝি সেকেন্ডহ্যান্ড হাসব্যান্ড।

বিয়ে তো এখনো হয়ে যায় নি লায়লা।

না হোক বড়বুবু কেন সেকেন্ডহ্যান্ড হাসবেন্ডের খোঁজ আনবে। ভাবি তুমি তো জান সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসই আমি দু চোখে দেখতে পারি না। নিউমার্কেটে কত সুন্দর

সুন্দর সেকেন্ডহ্যান্ড সুয়েটার পাওয়া যায়। আমার বন্ধুরা সবাই কিনেছে। আমি কখনো কিনেছি?

লায়লা চুপ কর তো!

কেন আমি চুপ করব? ভাবি আমি কি মানুষ! আমাকে আগেভাগে কিছু না বলে মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমিও হাসিমুখে সেকেন্ডহ্যান্ডটার সাথে কথা বলেছি। গাধাটা আবার যাবার সময় বড়বুবুকে বলেছে মেয়ে পছন্দ হয়েছে। আরে গাধা তোর তো যে-কোনো মেয়েই পছন্দ হবে।

লায়লা শোন এখানে তোমার পছন্দটাই জরুরি। তুমি তোমার পছন্দ-অপছন্দটা কড়া করে বলবে। তুমি যে জীবন যাপন করবে সেটা তো তোমার জীবন। অন্যের জীবন তো না।

লায়লাকে শান্ত করে রীনা বের হয়ে এল। ভাগ্য ভালো সুটকেস হাতে বেরোতে তাকে কেউ দেখল না।

রীনা রিকশায় উঠেছে। ঢাকায় তার থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঢাকার বাইরে কোথাও চলে যেতে হবে। ময়মনসিংহ চলে গেলে কেমন হয়। রীনার বড়মামা ময়মনসিংহ জজকোর্টের পেশকার। কেউটখালিতে বাসা। বাসে ময়মনসিংহ যেতে আড়াই ঘণ্টার মতো লাগে। সে পৌঁছবে সন্ধ্যার পর পর। তখন কেউটখালিতে গিয়ে বড়মামাকে খুঁজে বের করতে হবে। বাসার ঠিকানা রীনার জানা নেই। যদি খুঁজে না পাওয়া যায়। যদি মামা এর মধ্যে বাসা বদল করে থাকেন? দুশ্চিন্তা হচ্ছে। রীনা দুশ্চিন্তাকে আমল দিল না। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে। মুখ শুকিয়ে পানির পিপাসা হচ্ছে। কোনো একটা দোকানের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে সে কি এক বোতল পানি কিনে নেবে? কত দাম এক বোতল পানির?

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাবেন?

রীনা বলল, কমলাপুর রেলস্টেশন।

বলেই মনে হলো সে ভুল করেছে। সে যাবে মহাখালি বাসস্টেশন। মহাখালি বাসস্টেশন থেকেই ময়মনসিংহের বাস ছাড়ে। শুধু শুধু কমলাপুর রেলস্টেশন বললে কেন? ভুলটাকে ঠিক করতে ইচ্ছা করছে না। যাক কমলাপুরেই যাক। ময়মনসিংহ যাবার কোনো একটা ট্রেন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর পাওয়া না গেলে একটা রাত রেলস্টেশনে কাটিয়ে দেয়া তেমন কঠিন হবে না। স্টেশনে সারা রাত গাড়ি আসা-যাওয়া করবে। অসুবিধা কী? জনতার মধ্যে আছে নির্জনতা।

২০

যে চেয়ারটায় হিশামুদ্দিন বসতেন সেই চেয়ারে চিত্রলেখা বসে আছে। প্রথম দিন অস্বস্তি লেগেছিল— এরপর আর লাগে নি। এমন ব্যস্ততায় তার দিন কাটছে যে অস্বস্তি লাগার সময়ও ছিল না। ব্যস্ত মানুষদের অস্বস্তি বোধ করার সময় থাকে না। চিত্রলেখার দিন কাটছে বাবার কর্মপদ্ধতির মূল সূত্রগুলো ধরতে। তাকে কেউ সাহায্য করছে না। যাদের

সাহায্য করার কথা তারা এক ধরনের নীরব অসহযোগিতা করছেন। অফিসের প্রধান প্রধান কর্তাব্যক্তিরা এগিয়ে আসছেন না। তাদের প্রশ্ন করেও তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না। এ রকম কেন হচ্ছে চিত্রলেখা বুঝতে পারছে না। তারা কি চান না সব আগের মতো চলুক?

চিত্রলেখার সামনে তিন কর্মকর্তা বসে আছেন, জিএম আবেদ আলি, এজিএম ফতেহ খান এবং প্রোডাকশান ম্যানেজার নূরুল আবসার। তাদের চা দেয়া হয়েছে। তারা বিমর্ষমুখে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। আবেদ আলি পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। চিত্রলেখা বলল, আপনি সিগারেট ধরাবেন না। সিগারেটের ধোঁয়া আমার পছন্দ না। বন্ধঘরে ধোঁয়া যেতে চায় না। অসহ্য লাগে।

আবেদ আলি সিগারেটের প্যাকেট সরিয়ে রাখলেন। তার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

চিত্রলেখা বলল, আমি যদি কারো চাকরি টার্মিনেট করতে চাই আমাকে কী করতে হবে বলুন তো?

আবেদ আলি কিছু বললেন না, ফতেহ খান বললেন, আপনি যা করবেন কোম্পানি আইন মোতাবেক করবেন। কোম্পানি আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতা মালিকদের দেয়া হয় নি। মালিক চেয়েছেন বলে চাকরি নেই এই ব্যবস্থা এখন নেই।

প্রাইভেট কোম্পানিতে কোনো একটা ব্যবস্থা তো থাকতেই হবে। সেই ব্যবস্থাটা জানতে চাচ্ছি।

ফতেহ খান বললেন, আপনাকে ল'ইয়ারের পরামর্শ নিতে হবে। কোম্পানির নিজস্ব ল'ইয়ার আছে তার কাছে জেনে নিন।

আপনারা কিছু জানাবেন না?

আমরা তেমন জানি না।

আপনি জানেন না সেটা বলুন। আমরা বলছেন কেন? আবেদ আলি সাহেব হয়তো জানেন, নূরুল আবসার সাহেবও হয়তো জানেন। অন্যদের দায়িত্ব নেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?

নূরুল আবসার বললেন, মিস চিত্রলেখা আপনাকে একটা কথা বলি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না, আপনি একসঙ্গে সবকিছু বুঝে ফেলতে চেষ্টা করছেন। আমাদের এই কোম্পানি অনেক বড় কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত তারা দীর্ঘদিন থেকে জড়িত। বছরের পর বছর কাজ করে আমরা যা শিখেছি আপনি এক সপ্তাহে তা শিখে ফেলতে চান, তা কী করে হবে! ধীরে চলার একটা নীতি আছে সেই নীতি মেনে চলাই ভালো।

আমাকে ধীরে চলতে বলছেন?

অবশ্যই ধীরে চলতে বলছি।

আপনাদের ধারণা আমি ধীরে চলছি না?

আমাদের ধারণা আপনি একসঙ্গে সব জেনে ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন। ছটফট করছেন।

আপনিও বললেন— আমাদের ধারণা। আপনি বলুন আমার ধারণা। নাকি আপনাদের তিন জনের ধ্যান-ধারণা সব এক রকম।

আমরা সব একজিকিউটিভ ডিসিশান মেকিঙে থাকি। আমাদের ধ্যান-ধারণা এক রকম হওয়ারই তো কথা।

গত মাসে কোম্পানি প্রায় এক কোটি টাকা লোকসান করেছে। কেন করেছে আবেদ আলি সাহেব আপনি বলুন ?

এক কোটি টাকা না— সত্তর হাজার পাউন্ড। একটা বিশেষ খাতে লোকসান হয়েছে। সেই লোকসান আমরা সামলে উঠব। ব্যবসায় লাভ-লোকসান থাকে। বিজনেস হচ্ছে এক ধরনের গ্যামলিং।

লাভ-লোকসান ব্যবসায় থাকবে তাই বলে ব্যবসা গ্যামলিং হবে কেন ? আমরা তো জুয়া খেলতে বসি নি।

আবেদ আলি ভুরু কুঁচকালেন। মনে মনে বললেন— ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল।

চিত্রলেখা বলল, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি— এত বড় একটা লোকসান হলো কেন ?

যথাসময়ে এলসি খোলা হয় নি। তারপর আমাদের কিছু ত্রুটি ছিল যার জন্যে পেনাল্টি দিতে হয়েছে।

কী ত্রুটি ?

ম্যাডাম বিষয়টা তো জটিল— চট করে বোঝাতে পারব না। সময় লাগবে।

সময় আপনাকে দিচ্ছি— আপনি বোঝাতে শুরু করুন। কাগজ-কলম লাগবে ?

আবেদ আলি বললেন, মিস চিত্রলেখা, বসের কন্যাকে প্রাইভেট পড়ানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে না। তারপরও আমি আপনাকে বোঝাব। তবে এখন না। এখন আমাকে যেতে হবে। আমার জন্যে লোকজন অপেক্ষা করছে। আপনাকে আরো একটা কথা বলি মিস চিত্রলেখা, যখন-তখন আপনি মিটিং ডাকবেন না। এতে সবারই কাজের ক্ষতি হয়। মিটিং যখন ডাকবেন— এজেন্ডা ঠিক করে ডাকবেন। এজেন্ডা জানা থাকলে আমাদের তৈরি হয়ে আসতে সুবিধা হয়।

আবেদ আলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অনুমতির অপেক্ষা করলেন না। শুধু ফতেহ খান বললেন, ম্যাডাম তাহলে যাই ? চিত্রলেখা বলল, আচ্ছা যান। তাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করা হলো তবে সে অপমান গায়ে মাখল না। সে বাবার চেয়ারে কিশোরী মেয়েদের মতো খানিকক্ষণ দোল খেল। তারপরই চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলল।

কিছু মজার মজার ফাইল এই ড্রয়ারে আছে। ফাইলগুলো বাড়িতে ছিল সে নিয়ে এসেছে। প্রতিদিনই সে খুব মন দিয়ে পড়ে। হিশামুদ্দিন সাহেব তার অফিসের প্রতিটা কর্মচারী সম্পর্কে আলাদা আলাদা নোট রেখে গেছেন। পড়তে পড়তে চিত্রলেখার প্রায় মনে হয়— বাবা যেন জানতেন একদিন চিত্রলেখা এই ফাইল পড়বে। পড়ে পড়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

ফাইল তৈরি করা ছাড়াও হিশামুদ্দিন সাহেব আরো একটা কাজ করে গেছেন। কোম্পানি পরিচালনা সম্পর্কে দীর্ঘ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। চিঠির মতো করে লেখা এই

নির্দেশনামা চিত্রলেখা বলতে গেলে প্রতিদিনই একবার করে পড়ছে।

মা চিত্রলেখা,

তোমার মাথায় বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার মাথায় তিন মণ ওজনের পাথর চেপে বসেছে? তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছ না?

যদি এ রকম মনে হয় তুমি পাথর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। আমি একটি কর্মকাণ্ড শুরু করেছি আমার মৃত্যুর পরেও তা চলতে থাকবে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা আমার কোনো কালেই ছিল না। এই পৃথিবীতে সবকিছুই সাময়িক।

অবশ্য পুরো ব্যাপারটা তুমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে দেখতে পার। আমার ধারণা তোমার সেই যোগ্যতা আছে। যদি তুমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও তাহলে তোমাকে আমার কিছু উপদেশ দেবার ইচ্ছা।

পুরনো কালে পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধবিগ্রহ চলত। দু দল যুদ্ধ করছে। সেনাপতিরা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এই সময় হঠাৎ যদি কোনো কারণে কোনো একদলে সেনাপতি নিহত হন তখন সেই দল সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। সৈনরা মনোবল হারিয়ে ফেলে অস্ত্র ফেলে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। এই ব্যাপারটা এখনো আছে। এখনো সেনাপতির মৃত্যু মানে যুদ্ধে পরাজয়। সৈন্যরা এখনো যুদ্ধ করে তাদের নিজেদের জন্যে না— যুদ্ধ করে তাদের সেনাপতির জন্যে।

সেনাপতিকে সৈন্যদের আস্থা অর্জন করতে হবে। এই কাজটা সবচে' কঠিন। তুমি তা পারবে। ভালোভাবেই পারবে।

কোম্পানি পরিচালনা শুরুতে তোমার কাছে জটিল মনে হবে— কাজটা কিন্তু জটিল নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়া এবং ঘোড়াটাকে দৌড়ানো শুরু করাটা জটিল, কিন্তু একবার যখন ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করে তখন জটিলতা কিছু থাকে না। শুধু দেখতে হয়— পথ ঠিক আছে কি না। পথে কোনো খান্দা-খন্দ পড়ল কি না। অবশ্য আরেকটা জিনিস দেখতে হয় তোমার শেষ সীমাটা কোথায়? গোলটা কী?

তুমি অবশ্যই কোমল হবে। সেই কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের নির্মমতাও তোমার মধ্যে থাকতে হবে। যেখানে নির্মম হওয়া দরকার সেখানে কখনো কোমল হবার চেষ্টা করবে না। দয়া, করুণা এইসব মানবিক গুণাবলি কোম্পানি পরিচালনার কাজে আসে না বরং কাজ শ্লথ করে দেয়। মনে কর কেউ একটা অন্যায় করল, কিংবা কারো কোনো কাজে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তুমি যদি তার শাস্তি না দাও তাহলে এই অন্যায়টি সে আবারো করবে।

সে ধরে নেবে যে সে ক্ষমা পেয়ে যাবে। শুধু সে না অন্যরাও তাই ভাববে। You have to be cruel, only to be kind . কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে তেমনি অন্যায়ের শাস্তিও থাকবে।

ক্ষমা অত্যন্ত মহৎ গুণ। কোম্পানি পরিচালনায় ক্ষমা একটা বড় ত্রুটি।

কোম্পানির কার্যপ্রণালীর প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমাকে জানতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলি— কোম্পানির অতি তুচ্ছ কাজ যে কজন করে তাদের একজন হলো রশীদ। রশীদ হলো সাইকেল পিয়ন। তার একটা সাইকেল আছে। হাতে হাতে চিঠি পাঠাতে হলে চিঠি এবং ঠিকানা দিয়ে রশীদকে বললেই সে চলে যাবে। তুমি কি জান রশীদ তার এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে করে ? তাকে তুমি ঠিকানা লিখে চিঠি দেবে এবং তা সে পৌঁছাবে না এটা কখনো হবে না।

একবার কী হয়েছে শোন— সে একটা চিঠি নিয়ে গেল। যার চিঠি সে বাসায় ছিল না। রশীদ বাসার সামনে রাত তিনটা পর্যন্ত বসে রইল। কোম্পানি ঠিকমতো তখনই চলবে যখন যার যা কাজ তা ঠিকমতো করা হবে।

তোমাকে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর একটি অপ্রিয় কাজ করতে হবে— কাজটা হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজার পদে নতুন কাউকে আনা। অবশ্যই তোমাকে আবেদ আলিকে অপসারণ করতে হবে। কাজটা আমিই করে যেতাম। তোমার জন্যে রেখে গেলাম। আবেদ আলি অত্যন্ত কর্মঠ। সে নিজের কাজ খুব ভালো জানে। তার সমস্যা হলো সে নিজেকে এখন অপরিহার্য বিবেচনা করছে। যখন এই কাজটা কেউ করে তখন নানান সমস্যা হতে থাকে। সে নিজের স্বার্থটাকে প্রাধান্য দেয়। কাজকর্মেও হেলাফেলা ভাব চলে আসে। সে তার প্রতি অনুগত একটা শ্রেণীও তৈরি করে নেয়। আবেদ আলি তাই করেছে।

আবেদ আলির চাকরির টার্মিনেশন লেটার আমি তৈরি করে রেখেছি। আইনগত কিছু জটিলতা আছে বলেই তৈরি করে যাওয়া। তুমি যদি কোম্পানির দায়িত্ব নাও তাহলে এই টার্মিনেশন লেটার সই করে তুমি তাকে দেবে। আর তুমি যদি দায়িত্ব না নাও তাহলে যেমন আছে তেমনি থাকবে। তোমার অনুপস্থিতিতে তার প্রয়োজন আছে...

চিত্রলেখা আবেদ আলির চাকরির টার্মিনেশন লেটারে নিজের নাম সই করল। তারিখ বসাল। ইন্টারকমে বলে দিল— সাইকেল পিয়ন রশীদকে যেন পাঠানো হয়।

রশীদ এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। বেঁটেখাটো মানুষ। মালিক শ্রেণীর কারো দিকে চোখ তুলে তাকানো বোধহয় তার অভ্যাস নেই। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

কেমন আছ রশীদ ?

ভালো।

এই ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়ে এসো।

জ্বি আচ্ছা।

তোমার সাইকেলটি ঠিক আছে ?

বেল নষ্ট।

বেল ঠিক করার ব্যবস্থা কর।

কেয়ারটেকার স্যারকে বলেছিলাম।

উনি ব্যবস্থা করেন নি ?

রশীদ চুপ করে রইল। সে কখনো তার ওপরওয়ালাদের বিষয়ে কোনো নালিশ করে না।

আচ্ছা আমি বলে দেব।

আমি চলে যাব ? চিঠি দিয়ে এসে আপনাকে রিপোর্ট করব ?

দরকার নেই। তুমি যাও।

চিত্রলেখা কেয়ারটেকারকে ডেকে পাঠাল। কেয়ারটেকারের নাম সালাম। সে ভীতমুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

কেমন আছেন সালাম সাহেব ?

জ্বি আপা ভালো। কাজকর্মে মন বসছে না আপা।

মন বসছে না কেন ?

স্যার নাই। কী কাজ করব কার জন্য করব ?

আমার জন্যে করবেন।

তা তো অবশ্যই।

আমাদের যে সাইকেল পিয়ন রশীদ তার সাইকেলের বেল নষ্ট। বেল ঠিক হচ্ছে না কেন ?

আমাকে তো আপা সে কিছু বলে নাই।

সে বলেছে। যেহেতু আপনার কাজকর্মে মন নাই আপনি শুনতে পান নি। বাবার মৃত্যুতে আপনি এতই ব্যথিত যে, কোনো কিছুই আপনি এখন মন দিয়ে শুনছেন না। আচ্ছা আপনি যান— আমাদের জিএম সাহেবকে একটু আসতে বলে দিন।

জ্বি আচ্ছা।

চিত্রলেখা ঘড়ি দেখল। তিনটা বাজে। অফিস আরো এক ঘণ্টা চলবে। সে অফিস থেকে ঠিক চারটায় বের হবে। আজ তার পরিকল্পনা হলো রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটা।

আবেদ আলি বিরক্তমুখে ঢুকলেন।

আমাকে ডেকেছেন ?

চিত্রলেখা বলল, আবেদ আলি সাহেব বসুন।

মিটিঙের মাঝখান থেকে উঠে এসেছি।

কীসের মিটিং?

এলসি খোলার দেরি এবং ইরেগুলারিটি বিষয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করছি।

ও আচ্ছা।

কী জন্যে ডেকেছিলেন?

একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গের জন্যে ডেকেছি। দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন, তারপর বলছি।

আবেদ আলি বসলেন। তার ভুরু কুঞ্চিত। চিত্রলেখা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক গলায় বলল, কোম্পানির বৃহত্তর স্বার্থে আমাকে একটি অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে। আপনার সার্ভিস আমাদের আর প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে— কোম্পানির স্বার্থ আপনি এখন আর আগের মতো দেখছেন না। সত্তর হাজার পাউন্ডের যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে— তার দায়-দায়িত্বও সম্পূর্ণ আপনার।

কী বলছেন?

যা সত্যি তা বলছি।

আমাকে ছাড়া আপনি তো সাত দিনও চলতে পারবেন না। আপনি তো সামান্য মানুষ আপনার বাবারও আমি ডানহাত ছিলাম।

আমার বাবা যেহেতু নেই; আমার বাবার ডানহাতেরও প্রয়োজন নেই তাই না? নিন এটা হচ্ছে আপনার জব টার্মিনেশন লেটার। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানেন, এই চিঠি বাবাই লিখে টাইপ করে রেখে গেছেন। আমি শুধু নাম সই করেছি। কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুর পরেও তাদের উপস্থিতির ব্যবস্থা রেখে যায়।

আবেদ আলি চিঠি পড়ছেন। তার হাত কাঁপছে। ব্যাপারটা তার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত।

আবেদ আলি সাহেব!

জ্বি।

আপনার দায়িত্ব আপনি এজিএম সাহেবকে বুঝিয়ে দেবেন।

ম্যাডাম ব্যাপারটা কি আরেকবার কনসিডার করা যায় না?

জ্বি না, যায় না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। আপনি এখন আসুন।

আপনি বিরাট সমস্যায় পড়বেন। হাতেপায়ে ধরে আবার আমাকেই আপনার আনতে হবে।

আনতে হলে আনব। এই মুহূর্তে আপনাকে আমাদের দরকার নেই।

চিত্রলেখা আরেক কাপ চায়ের কথা বলল। অফিসে বসার পর থেকে তার খুব ঘনঘন চা খাওয়া হচ্ছে। অভ্যাসটা কমাতে হবে। মাথা ধরেছে। মাথাধরা কমানোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওষুধ খেতে ইচ্ছা করছে না। খোলা বাতাসে বসা দরকার। এসি দেয়া বদ্ধঘরে এক সময় দম আটকে আসে। চিত্রলেখা এসি বন্ধ করল। জানালার পরদা সরাল। জানালা খুলল। দিনের আলো নিভে আসছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু

করেছে। মেঘ বলেছে যাব যাব? মেঘেরা কোথায় যেতে চায়? হিমালয়ের দিকে না অন্য কোথাও? মানুষের পাখা থাকলে ভালো হতো। মেঘদের সঙ্গে উড়ে বেড়াত। মেঘদের সঙ্গে বাস করলেই জানা যাবে মেঘেরা কোথায় যেতে চায়।

আসব?

চিত্রলেখা জানালা থেকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, আসুন। রশীদ তাহলে আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। বসুন।

হাসান বসল। সে হিশামুদ্দিন সাহেবের এই বিশাল অফিসে এই প্রথম এসেছে। তার চোখে বিস্ময়।

চা খাবেন?

জ্বি না।

খেয়ে দেখতে পারেন। এরা চা খুব ভালো বানায়। দার্জিলিঙের চা পাতা এবং বাংলাদেশের চা পাতা সমান সমান নিয়ে একটা মিকচার তৈরি হয়। সেই মিকচার দিয়ে চা বানানো হয়।

তাহলে দিতে বলুন।

আপনাকে ডেকেছি কী জন্যে জানেন?

জ্বি না।

আপনাকে ডেকেছি কারণ আজ বিকেলে আপনাকে নিয়ে ঘুরব। গাড়িতে করে না— হণ্টন।

বৃষ্টি আসছে তো!

আসুক। আমার একটা রেইনকোট আছে— আপনার জন্যে ছাতা আনিয়ে দিচ্ছি। বৃষ্টির সময় রেইনকোট পরে হাঁটা আমার খুব পুরনো অভ্যাস। নোট করছেন তো?

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, কী নোট করব?

কথাবার্তা যা বলছি এইসব— এই যে একটু আগে বললাম, আমার পুরনো অভ্যাস হচ্ছে বৃষ্টিতে রেইনকোট পরে হাঁটা। আমি তো আগে একবার আপনাকে বলেছি— বাবার মতো আমিও আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে পে করব। কাজেই আপনি যত বেশি সময় আমার সঙ্গে কাটাবেন ততই আপনার লাভ।

হাসান তাকিয়ে আছে। চিত্রলেখাকে কেমন যেন অস্থির লাগছে।

হাসান সাহেব!

জ্বি।

অকারণে আপনাকে ডেকে আনায় আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন?

জ্বি না।

বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। আমি মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করি। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।

আপনার এরকম অবস্থা যখনই হবে খবর দেবেন— আমি চলে আসব।

বৃষ্টি মনে হয় আসছে— তাই না?

জ্বি।

চিত্রলেখা মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টি দেখছে।

২১

তারেক মাগরেবের নামায শেষ করে বারান্দায় এসে বলল, লায়লা আমাকে চা দে।

চা তৈরিই ছিল। লায়লা চায়ের কাপ এনে সামনে রাখল। তারেক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, তোর অবস্থা কী?

লায়লা বিস্মিত গলায় বলল, আমার আবার কী অবস্থা?

পড়াশোনার অবস্থা।

পড়াশোনার অবস্থা খুবই খারাপ। এইবার পরীক্ষা দিলে পাস করতে পারব না।

তাহলে এ বছর ড্রপ দিয়ে পরের বছর দে।

ভাইয়া আর কিছু বলবে?

না। সিগারেটের প্যাকেট আর দেয়াশলাই এনে দে।

লায়লা সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই এনে দিল। তারেক বলল, টগর আর পলাশকে বই নিয়ে বসতে বল। আমি পড়া দেখিয়ে দেব।

তারেক চুকচুক করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। নামাযের সময় সে মাথায় টুপি পরেছিল, সেই টুপি এখনো খোলা হয় নি। টুপি মাথায় তাকে শান্ত সমাহিত মনে হচ্ছে। চা খেতে খেতে সে পা নাচাচ্ছে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যাকালীন এই চায়ের আসর তার ভালো লাগছে।

একমাসের ওপর হলো রীনা নেই। তার অনুপস্থিতিতে বড় ধরনের যে সমস্যার আশঙ্কা করা গিয়েছিল এখন মনে হচ্ছে সে আশঙ্কা অমূলক। সে না থাকায় বরং কিছু সুবিধা হয়েছে। তারেক ঘুমাচ্ছে একা। বেশ হাতপা ছড়িয়ে ঘুমাতে পারছে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেতে পারছে। কথা বলার কেউ নেই। টুথপেস্টের মুখ লাগানো হয় নি, ব্রাশটা বেসিনে পড়ে আছে কেন এই নিয়েও বলার কেউ নেই। রীনা মশারি না খাটিয়ে ঘুমাতে পারত না। তারেকের কাছে মশারি ছিল অসহনীয় যন্ত্রণা। এখন মশারি খাটাতে হচ্ছে না। ফুলস্পিডে ফ্যান ছেড়ে শুয়ে থাকলে মশারা কাছে ভিড়তে পারে না। মানুষের কাছে ফ্যানের বাতাসটা আরামদায়ক। মশাদের কাছে সেই বাতাস হলো টর্নেডো। প্রচণ্ড টর্নেডোর সময় মানুষ যেমন ডিনার খেতে বসে না, মশারাও তেমনি রক্ত খেতে আসে না। এই সহজ সূত্র সে রীনাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছে— রীনা বুঝতে চায় নি। এখন আর বোঝাবুঝির কিছু নেই।

মনোয়ারা ছেলের ওপর রাগ করে চলে গেছেন। এটা একটা দুঃখের ব্যাপার হয়েছে। তারেক তার মাকে খুবই পছন্দ করে। মার সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা না বললে তার দমবন্ধ লাগে। মা না থাকার একটা ভালো দিকও আছে। মার ঘরটাকে তারেক বর্তমানে নামাযঘর করে ফেলেছে। পাঁচ ওয়াক্তের জায়গায় এখন শুধু দু ওয়াক্ত করে নামায পড়া হচ্ছে। শুরু হিসেবে এটা খারাপ না।

রীনার অভাব লায়লা অনেকটা পূরণ করেছে। রান্নাবান্নার ব্যাপারটা দেখছে। টগর-পলাশকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার কাজও করছে। কলেজে যাচ্ছে খুব কম। মনে হয় এ বছর বি.এ. পরীক্ষা সে ড্রপই করবে। সংসারের জন্যে এটা ভালো। বি.এ. পরীক্ষার চেয়ে সংসার অনেক বড়।

টগর-পলাশের ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। 'মা নেই কেন ? কবে আসবে ?' এ জাতীয় কথা তারা তারেককে এখনো জিজ্ঞেস করে নি। তবে লায়লাকে এবং হাসানকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করছে। তারা কী জবাব দিচ্ছে কে জানে। সময় এবং সুযোগমতো একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। অবশ্যি জিজ্ঞেস না করলেও হয়। এরা ঝামেলা করছে না এটাই বড় কথা। এমন কি হতে পারে মা ঘরে না থাকায় তারা আনন্দিত ? হতে পারে। খাওয়া নিয়ে তাদের বকাঝকা কেউ করছে না, চড় থাপ্পড় মারছে না। দেয়ালে ছবি আঁকছে কেউ কিছু বলছে না। প্রায়ই স্কুল কামাই করছে। মা থাকলে সে উপায় ছিল না। স্কুলে যেতেই হতো।

তারেকের আজকাল প্রায়ই মনে হয় মানুষের সংসার না থাকাই ভালো। আর থাকলেও সে সংসার হবে সাময়িক ধরনের সংসার। সেই সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা সবই থাকবে। মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, কয়েকদিন থেকে চলে আসা। সব পুরুষরা থাকবে হোটেলে। সবার জন্যে আলাদা আলাদা ঘর। ঘরে এটাচড বাথ থাকবে, টিভি থাকবে। খাবারের সময় হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাবে। ছেলের জন্মদিন, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি এইসব উৎসবে সংসারে ফিরে যাওয়া। আবার ফিরে আসা।

রীনা চলে যাবার পর লাবণীর সঙ্গে তারেকের আর তেমন যোগাযোগ হয় নি। লাবণী একটা চিঠি লিখেছিল। কেমন আছেন, ভালো আছেন টাইপ চিঠি। চিঠির জবাব দেয়া হয় নি। তারেক রোজই একবার ভাবে চিঠির জবাব দেবে— শেষে আর দেয়া হয় না। রাতে ঘুম পেয়ে যায়। ইদানীং তার ঘুমও খুব বেড়েছে। ভাত খাবার পর থেকে হাই উঠতে থাকে।

দুই পুত্রকে নিয়ে তারেক পড়াতে বসল। বাচ্চা দুটি বিচ্ছু হয়েছে। যমজ বাচ্চারা বিচ্ছু ধরনের হয় এটি সনাতন সিদ্ধ ব্যাপার। এরা দুজন যমজ না হলেও বিচ্ছুর ওপরেও এক ডিগ্রি বিচ্ছু। হোমওয়ার্কের খাতায় ভূতের ছবি আঁকা। মাথা থেকে এইসব দুষ্টামি দূর করতে হবে। কঠিন হওয়া যাবে না। কাঠিন্য যে-কোনো সমস্যার বড় বাধা।

কেমন আছিস রে টগর ?

গুড আছি বাবা।

পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?

গুড হচ্ছে।

কথায় কথায় গুড বলছিস কেন ?

মিস বলেছে বাসায় সব সময় ইংরেজি বলতে হবে।

হোমওয়ার্কের খাতায় এটা কীসের ছবি ?

ভূতের ছবি।

ভূতের গলা এত লম্বা থাকে নাকি ?

এটা সাপভূত তো এজন্যে গলা লম্বা। সাপভূতদের গলা লম্বা হয়।

হোমওয়ার্কের খাতায় ছবি আঁকছিস কেন?

ছবি আঁকার খাতা শেষ হয়ে গেছে এই জন্যে।

মিস রাগ করবে।

মিস খুব এংরি হবে। রাগের ইংরেজি হলো এংরি।

এংরি বানান কী?

বানান জানি না।

পলাশ তুই জানিস?

জানি না।

গুড বানান জানিস?

জানি, কিন্তু বলব না।

বলবি না কেন?

তুমি তো আমাদের মিস না। মিস বানান জিজ্ঞেস করলে বলতে হয়।

আর কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে হয় না?

না।

তারেক সিগারেট ধরাল। এদের পড়শোনা করানো মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। একজন টিচার রেখে দিতে হবে। বাড়তি খরচ, তাতে অসুবিধা হবে না। সংসারে মানুষ কমে গেছে। লায়লার বিয়ে হলে আরো কমবে। তার বেতনও কিছু বাড়বে। খুব শিগগিরই প্রমোশন হবার কথা। পলাশ বলল, বাবা সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়।

কে বলেছে, মিস?

না, মা বলেছে।

মার প্রসঙ্গ চলে আসায় তারেক একটু শঙ্কিত বোধ করল। এই প্রসঙ্গ আলোচনায় না আসাই বোধহয় মঙ্গলজনক। টগর গম্ভীর গলায় বলল, যে সিগারেট খায় সে মারা যায়। আর সিগারেট খাবার সময় আশেপাশে যারা থাকে তারাও মারা যায়। তুমি সিগারেট খেলে আমরা মারা যাব।

কে বলেছে, তোদের মা না মিস?

মা বলেছে। সিগারেট যেমন খারাপ, চকলেটও খারাপ। চকলেট খেলে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। এক রকম পোকা এসে দাঁত খেয়ে ফেলে। দাঁতের ইংরেজি হলো টুথ।

তারেক সিগারেট ফেলে দিল। মার প্রসঙ্গ চলে এসেছে— এখন কি সেই বিষয়ে দু-একটা কথা বলা ঠিক হবে? না পুরো বিষয়টা নিয়ে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

টুথের বানান কী?

ট উ-কারে টু, থ— টুথ।

বাংলা বানান না ইংরেজি?

জানি তোমাকে বলব না।

তারেক ইতস্তত করে বলল, তোর মা যে আসছে না এ নিয়ে কী করা যায় বল তো?

টগর-পলাশ দুজনই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারেক বাচ্চাদের দিকে না তাকিয়ে বলল, তোর মা যে আসছে না, এ জন্যে নিশ্চয়ই তোদের মন খারাপ। তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

পলাশ বলল, দেখা হয় তো।

পলাশের এই কথা বলা মনে হয় ঠিক হয় নি। টগর চোখের ইশারায় তাকে চুপ করতে বলেছে। তারেক বিস্মিত হয়ে দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

মা'র সঙ্গে দেখা হয়?

হুঁ।

বাসায় আসে নাকি?

না স্কুলে যায়।

স্কুলে যায়?

একদিন মা তার বাসায় নিয়ে গেল।

বাসায় নিয়ে গেল মানে— বাসা ভাড়া করেছে? বাসা কোথায়?

জানি না।

বাসাটা কেমন?

সুন্দর।

সে একাই থাকে না আরো লোকজন থাকে?

জানি না।

জানিস না মানে কী? বাসায় আর কাউকে দেখিস নি?

উঁহুঁ।

তোদের মা যে তোদের দেখতে আসে, তোরা যে তার বাসায় গিয়েছিলি এটা এ বাড়ির আর কে জানে?

সবাই জানে। শুধু তুমি জান না।

মার বাসায় কীভাবে গিয়েছিলি— সে এসে নিয়ে গিয়েছিল?

চাচু নিয়ে গিয়েছে। আবার নিয়ে এসেছে।

হাসান নিয়ে গেছে?

হুঁ।

তারেক অ্যাশট্রেতে ফেলে দেয়া আধ-খাওয়া সিগারেট তুলে নিল। তার দুই পুত্র তার দিকে তাকিয়ে আছে। টগর বলল, ব্যাটম্যান মানে কী, তুমি জান বাবা?

তারেক অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, না।

ব্যাটম্যান মানে হলো বাদুরমানুষ। ব্যাট মানে বাদুর। ম্যান মানে মানুষ।

ও।

বাদুরমানুষ কিন্তু উড়তে পারে না। শুধু লাফ দিতে পারে। একটা বাড়ির ছাদ থেকে আরেকটা বাড়ির ছাদে যায়। আর ঘোস্ট মানে কী জান?

হুঁ।

ঘোস্ট মানে ভূত। ভূত কিন্তু পৃথিবীতে হয় না। শুধু কার্টুনে হয়। আমাদের মিস বলেছে। অদৃশ্য মানব কাকে বলে তুমি কি জান বাবা?

না।

অদৃশ্য মানবকে চোখে দেখা যায় না। অদৃশ মানব কিন্তু ভূত না। মানুষ।

হুঁ।

অদৃশ মানব চোখে দেখা যায় না, এই জন্যে এদের ছবিও আঁকা যায় না। কিন্তু পলাশ তো বোকা— এই জন্যে সে অদৃশ্য মানবের ছবি এঁকেছে। ছবি দেখবে বাবা?

তারেক 'হুঁ' বলল। কিন্তু উঠে চলে গেল। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না— সবাই মিলে কি তাকে বয়কট করেছে? হাসানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা দরকার: হাসানের সঙ্গে তার দেখা ইদানীং হচ্ছে না। হাসানের ব্যস্ততা খুব বেড়েছে। কোনো একটা কাজটাজ বোধহয় করছে। কী কাজ তা এখনো জিজ্ঞেস করা হয় নি। যে কাজই করুক খুব পরিশ্রমের কাজ নিশ্চয়ই। রোদে পুড়ে চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে। সস্তা সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছে। হাসান পাশ দিয়ে গেলে মনে হয় তামাকের একটা ফ্যাক্টরি হেঁটে চলে গেল। জর্দা দিয়ে পানও খাচ্ছে— দাঁত লাল— মুখ দিয়ে ভুরভুরে জর্দার গন্ধ আসে।

হাসান দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারেক ধাক্কা দিতেই উঠে এসে দরজা খুলল।

ঘুমোচ্ছিলি?

না। শুয়েছিলাম।

দশটা বাজতেই শুয়ে পড়লি, শরীর খারাপ?

জ্বর জ্বর লাগছে।

রোদে রোদে ঘুরলে জ্বর তো লাগবেই— ভাদ্র মাসের রোদে তাল পেকে যায়, মানুষ তো পাকবেই। ভাদ্র মাসে রাস্তাঘাটে মানুষ ঘোরে তাদের বেশির ভাগই পাকা মানুষ।

সিগারেট লাগবে ভাইয়া?

না সিগারেট লাগবে না। এক প্যাকেট কিনেছিলাম, সাতটা খেয়েছি। এখনো তেরটা বাকি আছে। এলাম তোর সাথে একটু গল্প-গুজব করি, বাতিটা জ্বালা।

হাসান অনিচ্ছার সঙ্গে বাতি জ্বালাল। তার জ্বর এসেছে। ভালো জ্বর। দুপুরে সে কিছু খায় নি। রাতেও খায় নি। ক্ষিধেয় নাড়ি পাক দিচ্ছে কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে কোনো খাবার সামনে আনলেই বমি হয়ে যাবে।

তারেক বসতে বসতে বলল. তোর ভাবি ঝোঁকের মাথায় ফট করে চলে গেল। এই

নিয়ে কারো সঙ্গে কথাও বলা হয় নি।

কথা বলার কী আছে ?

সেটাও ঠিক কথা বলার কী আছে ? লজ্জাজনক ব্যাপার।

তোমার জন্যে লজ্জাজনক তো বটেই। যা ঘটেছে তোমার জন্যেই ঘটেছে।

তোর ভাবি কোথায় আছে কিছু জানিস ?

শ্যামলীতে আছে। তার এক বান্ধবীর বাড়িতে।

ও আচ্ছা।

ঠিকানা চাও ?

না ঠিকানা দিয়ে কী করব ?

তুমি যদি মনে কর— ভাবির সঙ্গে কথা বলে তাকে ফিরিয়ে আনবে।

সেটা ঠিক না। ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কোনো কাজের কথা না। আমি তাকে চলে যেতে বলি নি— সে চলে গেছে। আমি যদি তাকে চলে যেতে বলতাম তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার ছিল। যদি আসার হয় নিজেই আসবে।

হাসান হাই তুলতে তুলতে বলল, ভাবি কঠিন জিনিস। নিজ থেকে আসবে না।

না এলে কী আর করা। বাচ্চাদের খানিক সমস্যা হবে— এই আর কী ? সমস্যা তো পৃথিবীতে থাকেই। সমস্যা নিয়েই আমাদের বাস করতে হয়।

তুমি কি তোমার অফিসের ওই মহিলাকে বিয়ে করবে ?

বিয়ের কথা আসছে কেন ?

বিয়ে হচ্ছে না ?

তারেক সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সহজ গলায় বলল, টগরের কাছে শুনলাম— ওদের মার সঙ্গে দেখা হয়— এটা ভালো। আর্লি স্টেজে মার ভালোবাসা দরকার। মায়ের ভালবাসা ভিটামিনের মতো কাজ করে । যাক— সময়ে-অসময়ে ভিটামিনটা পাচ্ছে।

হুঁ।

ও কি চাকরি-বাকরি কিছু করছে ?

জানি না। হয়তো করছে।

চাকরির বাজার খুবই টাইট— তবে মেয়েদের স্কোপ বেশি। বলিস ভালোমতো যোগাযোগ করতে। পত্রিকা দেখে এপ্লিকেশন করলে হবে না। সরাসরি উপস্থিত হতে হবে।

ভাইয়া আমার মাথা ধরেছে। কথা বলতে ভালো লাগছে না।

দে একটা সিগারেট খাই। সিগারেটটা শেষ করে চলে যাব।

নিজের ঘরে গিয়ে খাও।

তোর এখানে খেয়ে যাই।

ভাইয়া তুমি কি ভাবিকে টেলিফোন করতে চাও ? ভাবি যে বাড়িতে থাকে সেখানকার টেলিফোন নাম্বার আমার কাছে আছে।

টেলিফোন করে কী করব ?

কী করবে তা জানি না। টেলিফোন নাম্বার আছে তুমি চাইলে দিতে পারি।

আচ্ছা দে রেখে দেই। তোর এই অবস্থা কেন ? মনে হচ্ছে রোদে পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছিস। ব্যাপার কী ?

কোনো ব্যাপার না।

রোদে বেশি ঘুরবি না। চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে। সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে খুব খারাপ। স্কিনক্যানসার হয়।

হুঁ। ভাইয়া এই নাও ভাবির টেলিফোন নাম্বার। এখন চলে যাও। আমার প্রচণ্ড মাথাধরা— কথা বলতে ভালো লাগছে না।

হালকা ধরনের কথাবার্তা বললে বরং মাথা ধরাটা কমে। লাইট ডিসকাশন ওষুধের মতো কাজ করে।

ভাইয়া আমার বেলায় করে না। তাছাড়া আমাদের ডিসকাশন মোটেই লাইট হচ্ছে না।

তারেক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোর সঙ্গে আরেকটা জরুরি কথা ছিল— এখন মনে পড়ছে না।

মনে পড়লে বলবে।

যখন মনে পড়বে তখন দেখা যাবে তুই পাশে নেই। আর তোর সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন আর জরুরি কথাটা মনে পড়বে না। মানুষের জীবন মানেই এই জাতীয় জটিলতা।

হুঁ।

মানুষের মনে যে বয়সে নানান ধরনের শখ হয় সে বয়সে টাকা-পয়সা থাকে না। বুড়ো বয়সে যখন টাকা-পয়সা হয় তখন আর শখ থাকে না।

তোমার কী শখ ?

ব্যাংককে গিয়ে একবার একটা ম্যাসেজ নেয়ার শখ ছিল। এই বিষয়ে অনেক কথা শুনেছি। আমার পরিচিত কয়েকজন ম্যাসেজ নিয়েছে। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। বিরাট একটা কাচের ঘরের পেছনে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ইয়াং মেয়েরা সেগেগুজে বসে থাকে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নম্বর আছে। তোর একটা মেয়ে পছন্দ হলো— ধর তার নাম্বার তিন শ তের। তুই তিন শ তের নাম্বারে একটা কার্ড...।

ভাইয়া চুপ কর। তোমার কাছ থেকে এ সব শুনতে খুবই অস্বস্তি লাগছে। এইসব তুমি কী বলছ ?

কী বলছি মানে ? খারাপ কী বলছি ?

কী বলছ বুঝতে পারছ না ? তোমার জীবনের সবচে' বড় শখ একটা বেশ্যা মেয়ে তোমার গা দলাই মলাই করবে।

বেশ্যা মেয়ে বলছিস কেন ? ওরা সব কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়ে। স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলির মেয়ে। তাছাড়া এটাই যে আমার জীবনের সবচে' বড় শখ তাও না।

অনেকগুলো শখের মধ্যে একটা...।

ভাইয়া আমার খুব মাথা ধরেছে, তুমি এখন যাও।

শ্যাম্পেনের এত নামধাম শুনেছি। খেয়ে দেখার শখ ছিল— একটা বোতলের দামই শুনেছি দু-তিন হাজার টাকা...।

ভাইয়া প্লিজ আমি আরেকদিন তোমার শখের কথাগুলো শুনবো।

তুই এমন রেগে গেলি কেন ?

রাগি নি। আমি তো বললাম, আমার খুব মাথা ধরেছে।

কমলার মাকে বল এক বালতি গরম পানি করে দিতে। গরম পানি দিয়ে হট শাওয়ার নিলে শরীরটা হালকা হবে, ভালো ঘুম হবে।

আচ্ছা আমার যা করার করব তুমি যাও।

ফট করে রেগে গেলি। আশ্চর্য!

তারেক নিজের ঘরে ঢুকল। হাসানকে যে জরুরি কথাটা বলার ছিল সে কথাটা তখনি মনে পড়ল। তাকে গিয়ে সেই কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। অকারণে সে যেমন রেগে গেছে— দরজায় ধাক্কা দিলে সে হয়তো দরজাই খুলবে না। কথাটা হচ্ছে তার অফিসে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছে। মেয়েটার নাম চিত্রলেখা। সে হাসানকে খুঁজছে। খুব নাকি জরুরি। একবার না, মেয়েটা টেলিফোন করেছে দু'বার।

ঘুমোতে যাবার আগে তারেক একটা কাগজে বড় বড় করে লিখল— চিত্রলেখা। সকালবেলা এই কাগজটা দেখলেই তার মনে পড়বে। হাসানকে খবরটা দেয়া যাবে।

সবচে' ভালো হতো এখন দিতে পারলে।

রীনাকে টেলিফোন করার কোনো ইচ্ছা তারেকের ছিল না। অফিসে এসে রুমাল বের করার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখে রীনার টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজ। টেলিফোন করলে কে ধরবে ? রীনার বান্ধবী ? নাকি রীনাই ধরবে ? তারেক টেলিফোন করবে কী করবে না বুঝতে পারছে না। তারপরেও কী মনে করে করল। দুটা রিঙের ভেতর না ধরলে সে রেখে দেবে।

দুটা রিং বাজতেই রীনা ধরল। গম্ভীর গলায় বলল, হ্যালো কাকে চাচ্ছেন ?

তারেক বলল, কে রীনা ?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার ?

কোনো ব্যাপার না। কেমন আছ ?

ভালো আছি।

ও আচ্ছা এইটা জানার জন্যে। বাসার খবর ভালো— টগর পলাশ দুজনই ভালো আছে।

আচ্ছা।

হাসানের শরীরটা মনে হয় খারাপ। কাল রাতে জ্বরটর মনে হয় এসেছে ভাত খায় নি। রোদে রোদে ঘুরে চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলেছি রোদে কম ঘুরতে।

ভালো।

লায়লার বিয়ের কথা হচ্ছিল— বিয়েটা হয়ে যাবে মনে হয়। ছেলে ভালো। বয়স সামান্য বেশি। ডিভোর্সড।

ও।

রকিব এসেছিল। ও এর মধ্যে দু'মাসের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল। ঘুরেটুরে এসেছে। দু'মাসের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল আমি তো জানতামই না। তাজমহল দেখে এসেছে। জয়সলমীরও গিয়েছিল। উটের পিঠে চড়ে ছবি তুলেছে। আমার জন্যে জয়পুরী পাঞ্জাবি এনেছে। তোমার জন্যে একটা শাড়ি এনেছে। আমি হাসানকে বলব তোমাকে দিয়ে আসতে। ও তো তোমার বাসা চেনে।

আর কিছু বলবে ?

না।

চিটাগাঙের ওই মেয়ে— লাবণীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?

ও দুটা চিঠি দিয়েছিল। আগে জবাব দেই নি— কাল একটার জবাব দিয়েছি।

এর মধ্যে চিটাগাং যাও নি ?

না।

কবে যাবে ?— ঘুরে আসছ না কেন ? লাবণী আর তার মেয়েকে নিয়ে কক্সবাজার থেকে ঘুরে আস। সমুদ্র দেখিয়ে আন।

তারেক কিছু বলল না। রীনা বলল, টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। তারেক বলল, আচ্ছা পরে কথা হবে। তুমি ভালো থেকো।

আমি ভালোই থাকব। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা শোন, আমি টেলিফোন রেখে দিচ্ছি আমার অফিসের গাড়ি এসে গেছে। হর্ন দিচ্ছে।

অফিসের গাড়ি এসেছে মানে তুমি কি চাকরি করছ নাকি ?

সামান্য চাকরি করছি।

রিসিপশনিস্ট ? শোন, রিসিপশনিস্টের কাজে কোনো প্রসপেক্ট নেই— অন্য কোনো লাইনে ঢোকার চেষ্টা কর।

আমি এখন রাখলাম।

তারেকের একটু মন খারাপ লাগছে। অফিসের ব্যাপারটা আর ভালোমতো জানা হলো না। কোন অফিস— কত বেতন কিছুই জানা হলো না। অফিসের টেলিফোন নাম্বারটাও নিয়ে রাখলে হতো।

২২

রীনা ভালো আছে কি না তা সে এখনো বুঝতে পারছে না। দিনের বেলায় সে বেশ ভালোই তাকে। দিনটা শুরু হয় ব্যস্ততার ভেতর শেষও হয় ব্যস্ততার ভেতর। সন্ধ্যার পর থেকে কিছু করার থাকে না। বুকে হাঁপ ধরার মতো হয়। সে বসে থাকে টিভির সামানে। টিভিতে ক্রমাগত হিন্দি গানের নাচ হতে থাকে। নাচের মুদ্রা কুৎসিত। নাচের

সঙ্গে যে গান হয় সেই গানের সুর একই রকম। তারপরেও নাচ ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। কারণ গৃহকর্তা মনসুর সাহেব এই অনুষ্ঠানটাই দেখেন। রীনা এ বাড়িতে আছে আশ্রিতের মতো। একজন আশ্রিতের ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে না।

শ্যামলী রিং রোডের এই বাড়ি রীনার বান্ধবী আফরোজার। আফরোজা রীনার সঙ্গে এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। পাস করার পর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। দশ বছর পর আবার যোগাযোগ হয়েছে। কাকতলীয়ভাবেই হয়েছে। আফরোজা স্কুলে থাকতেও হড়বড় করে কথা বলত— এখনো হড়বড় করেই বলে। সে রীনাকে জড়িয়ে ধরে হড়বড় করে যে কথা বলল তা হচ্ছে— তুই পাগলির মতো এইসব কী বলছিস ? স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছিস। চাকরি খুঁজছিস। আমি তোর জন্যে চাকরি কোথায় পাব ? কাকে আমি চিনি ? তবে চাকরি দিতে না পারলেও তোকে থাকতে দিতে পারব। চলে আয় আমার বাড়িতে। রিং রোডে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। চার বেডরুমের ফ্ল্যাট। একটা গেস্টরুম খালি পড়ে থাকে। ওইখানে থাকবি।

রীনা বলল, তোর হাসবেন্ড কিছু বলবে না ?

কিছুই বলবে না। আমার হাসবেন্ড হচ্ছে টবের গাছের মতো। কথাবার্তা কিছুই বলে না। সন্ধ্যাবেলা টিভির সামনে বসে। মাঝখানে একবার ভাত খাওয়ার জন্যে ওঠে। বারটা বাজলে ঘুমোতে যায়।

উনি করেন কী ?

ব্যবসাপাতি করে। কী ব্যবসা তাও জানি না। ও কী করে না করে তা নিয়ে ভাবতে হবে না— তুই আয় তো। কাঁথা-বালিশ নিয়ে উঠে আয়।

রীনা রিং রোডে আফরোজার ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে উঠল। সুন্দর গোছানো ফ্ল্যাট। দামি হোটেলের মতো সব কিছু ঝকঝক করছে। যে গেস্টরুমে রীনাকে থাকতে দেয়া হয়েছে সেখানেও এসি আছে। মেঝেতে দামি কার্পেট। আফরোজা বলল, গরম লাগলে এসি ছাড়বি। কোনো রকম কিপ্টামি করবি না। নিজের বাড়ি মনে করে থাকবি। পরের বাড়িতে আছিস বলেই যে কিছু কর্ম করবি— চা বানাবি, রান্না করবি তাও না। তিনটা কাজের মানুষ। কাজ না করে করে ওদের হাতে পায়ে জং ধরে গেছে। রীনা বলল, তোর ছেলেপুলে কী ?

ছেলেপুলে কিছু নেই। আমার নাকি কী সব সমস্যা আছে। ও বলছিল টেসটিউব বেবি নিতে। শুনেই আমার ঘেন্না লাগল। টেস্টটিউব অদল বদল হয়ে যাবে— কার না কার দিয়ে দেবে। ছিঃ। তারপরও কোলকাতা গিয়ে দু'মাস ছিলাম। লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে— ডাক্তাররা খোঁচাখুঁচি করে যন্ত্রণার চূড়ান্ত করেছে। বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া আমি ভালোই আছি। পালক নেবার কথা মাঝে মাঝে ভাবি। দেখা যাক। আমার এত গরজ নেই।

আফরোজার স্বামীর নাম নুরউদ্দিন। থলথলে ধরনের শরীর। দেখেই মনে হয় এই মানুষটার জন্ম হয়েছে আরাম করার জন্যে। ফ্ল্যাটে যখন থাকে বেশিরভাগ সময় চেয়ারে পা তুলে বসেই থাকে। হয় খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকে নয়তো টিভির দিকে তাকিয়ে থাকে। হাঁটা চলা করতে মনে হয় কষ্ট হয়।

আফরোজা রীনাকে তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল— এ হচ্ছে স্কুল জীবনে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড— রীনা। রীনা আমাদের ফ্ল্যাটে কিছুদিন থাকবে। কতদিন এটা বোঝা যাচ্ছে না। মাসখানেকও হতে পারে— আবার বছরখানেকও হতে পারে। বুঝতে পারছ ?

নুরউদ্দিন বলল, হুঁ।

আফরোজা বলল, রীনার দিকে তাকিয়ে হুঁ বল। অন্য দিকে তাকিয়ে হুঁ বলছ কেন ? আরেকটা কথা শোন— তুমি তোমার পরিচিত সবাইকে বলে দেবে রীনার জন্যে যেন একটা চাকরির খোঁজ করে। ও বি.এ. পাস করেছে। সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে। অতি সুইট মেয়ে।

আচ্ছা।

বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওর সঙ্গে দুটা কথা বল। ভদ্রতাও তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে ? বেচারি মনে করবে কী ?

নুরউদ্দিন রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবি দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন।

আফরোজা বিরক্ত গলায় বলল, ভাবি ডাকছ কেন ? তুমি নাম ধরে ডাকবে। বয়সে তুমি আমার দশ বছরের বড়। রীনার চেয়েও দশ বছরের বড়। নাম ধরে ডাকবে কোনো অসুবিধা নেই।

আচ্ছা।

ওর নাম কী জান ?

না।

ওর নাম রীনা।

ও আচ্ছা রীনা।

তুমি রীনার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে।

আচ্ছা।

রীনা লক্ষ করল মানুষটা আসলেই টবের গাছের মতো। ফ্ল্যাটে যখন থাকে বসে বসেই সময় কাটিয়ে দেয়। নিজের কথা বলে না। অন্যের কথা শোনার আগ্রহও তার নেই। মাঝে মাঝে রীনার মনে হয়— আফরোজা যে তাকে ফ্ল্যাটবাড়িতে এনে তুলেছে সে তার নিজের গরজেই এনে তুলেছে। আফরোজার কথা বলার মানুষ দরকার। মুখ সেলাই করে দুজন মানুষ দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করতে পারে না। রীনার মাঝে মাঝেই মনে হয়— সংসারে ছেলেপুলে থাকাটা যে কত দরকার তা মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর জন্যে আল্লাহ্ এই সংসারটা তৈরি করেছেন।

তবে কথা না বললেও রীনার নুরউদ্দিনকে পছন্দ হয়েছে। পুরুষদের স্বভাবই হচ্ছে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে আশপাশের মেয়েদের শরীরেব ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়া। এই মানুষটি তা থেকে মুক্ত। তার ভদ্রতাবোধও ভালো। মানুষটা টিভি সেটের সামনে বসে থাকে খালি গায়ে। রীনা ঘরে এলে পাশে খুলে রাখা পাঞ্জাবিটা চট করে গায়ে দেয়। রীনা বলেছে— আপনার যদি খালি গায়ে থাকতে আরাম লাগে আপনি সেইভাবে থাকুন।

আমি কিছু মনে করব না। নুরউদ্দিন খালি গা হয় নি। তাছাড়া রীনাকে সে রীনা নামেও ডাকছে না। ভাবিই ডাকছে। এটিও রীনার পছন্দ হয়েছে। বান্ধবীর স্বামী তাকে নাম ধরে ডাকবে এটা ভাবতে তার ভালো লাগে না।

নুরউদ্দিনের যে ব্যাপারটা রীনার খারাপ লাগে তা হচ্ছে ভদ্রলোকের মদ্যপানের অভ্যাস আছে। সবদিন না— মাঝে মাঝে। প্রথম দিন মদ্যপানের দৃশ্য দেখে আতঙ্কে রীনার হাতপা নীল হয়ে যাবার উপক্রম হলো। মদ্যপানের ব্যাপাটা বড় বড় হোটেলে হয়, এবং অপরিচিত লোকরা মদ্যপান করে— এই ছিল তার ধারণা। পরিচত একজন মানুষ চেয়ারে পা তুলে মদ খাবে এই দৃশ্য রীনার কল্পনাতেও ছিল না। আফরোজা এই দৃশ্য দেখেও কিছু বলছে না এতেই রীনা খুব অবাক হচ্ছে। সে বলেই ফেলল, আফরোজা তুই কিছু বলছিস না ?

আফরোজা বলল, কী বলব ?

উনি যে ড্রিংক করছেন।

বদ অভ্যাস করে ফেলেছে, বলে কী হবে। শুরুতে বলেছি কাজ হয় নি— এখন আর বলি-টলি না। তাছাড়া কোনো সমস্যা করে না। নিজের মনে খায়। মদে ওর কিছু হয় না। টাল না হয়ে পুরো এক বোতল ভদকা সে খেতে পারে।

টাল না হয়ে মানে কী ?

টাল হলো— মাতাল। মদভর্তি চৌবাচ্চায় ওকে ডুবিয়ে দে ও চৌবাচ্চার সব মদ খেয়ে বের হয়ে এসে বলবে— ভাত দাও। ক্ষিধে হয়েছে।

কী আছে এর মধ্যে যে উনি এত আগ্রহ করে খাচ্ছেন ?

কিছুই নেই। তিতকুট একটা জিনিস, খেলে মাথা ঘোরে।

তুই খেয়ে দেখেছিস ?

হুঁ। একবার রাগ করে খেয়েছিলাম— অতি অতি অতি কুৎসিত। তুই একবার খেয়ে দেখিস।

সর্বনাশ !

সর্বনাশের আবার কী ? ছেলেরা খেতে পারলে আমাদের খেতে অসুবিধা কী।

মদ্যপানের পর নুরউদ্দিনের তেমন কোনো পরিবর্তন রীনার চোখে পড়ে নি। শুধু একটা পরিবর্তন হয়— টুকটাক দু-একটা কথা বলে। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। যেমন একদিন রীনা বলল, আপনি যে ঘন্টার পর ঘন্টা নাচ দেখেন আপনার ভালো লাগে ?

নুরউদ্দিন গ্লাসে হালকা চুমুক দিয়ে বলল, না। মনে হয় একদল ছেলেমেয়ে পিটি করছে।

ভালো লাগে না তো দেখেন কেন ?

কিছু করার নেই এইজন্যে দেখি। দেখিও ঠিক না, তাকিয়ে থাকা আর দেখা এক না।

গল্পের বইটই আপনি পড়েন না ?

কলেজ জীবনে দু-একটা পড়েছি। এখন আর পড়ি না।

পড়েন না কেন ?

সব বই তো একই রকম— একটা পড়লেই সব পড়া হয়। একটা ছেলে থাকবে, একটা মেয়ে থাকবে। তাদের প্রেম হবে। তারপর হয় তাদের বিয়ে হবে নয় বিয়ে হবে না। এই তো ব্যাপার।

আপনার বন্ধুবান্ধব খুব কম ?

হুঁ। বন্ধু কম, শত্রুও কম। যাদের বন্ধু বেশি তাদের শত্রুও বেশি। যাদের কোনো বন্ধু নেই, তাদের কোনো শত্রুও নেই।

রীনার চাকরি নুরউদ্দিনই যোগাড় করে দিল। এক কথায়— মাসে ছ হাজার টাকা বেতনের চাকরি তো সহজ ব্যাপার না। রীনার বিস্ময়ের সীমা রইল না। যে লোকটার প্রধান কাজ সন্ধ্যার পর থেকে টিভির সামনে বসে মদ্যপান করা সে এক কথায় চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে এটা রীনা ভাবে নি। হাসান বছরের পর বছর ঘুরে চাকুরি পায় নি। তার সে দশ দিনের মাথায় চাকরি পেয়ে গেল। থলথলে শরীরে খালি গায়ে মানুষটার ক্ষমতা অবশ্যই আছে।

চাকরি রীনার ভালো লাগছে। সুন্দর ছিমছাম অফিস। ভালো ব্যবসা হচ্ছে। অফিসের লোকজনদের মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। সবার ভেতরই ব্যস্ততা। রীনার বসকেও তার পছন্দ হয়েছে। স্মার্ট মানুষ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। টকটকে লাল গেঞ্জি গায়ে দিয়ে একদিন অফিসে এসেছিলেন। তাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসী যুবকের মতো লাগছিল। ভদ্রলোকের কথাবার্তা মার্জিত। অফিসের বসরা সব সময় গোমড়া মুখে থাকেন। ভদ্রলোকের মুখে গোমড়া না— কথায় কথায় রসিকতা করেন। রসিকতা যখন করেন— এমন গম্ভীর ভঙ্গিতে করেন যে প্রথম কিছুক্ষণ বোঝাই যায় না— রসিকতা।

প্রথম দিন রীনা তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। দরজায় পেতলের দুটা অক্ষর A.H. — আজিজুর হকের আদ্যক্ষর। নামের বদলে কেউ শুধু আদ্যক্ষর দরজায় লাগিয়ে রাখতে পারে রীনা ভাবে নি। সে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোক বললেন, রীনা কী খবর ?

রীনা বলল, জ্বি স্যার ভালো।

কাজ বুঝে নিয়েছেন ?

জ্বি।

আপনার কাজটা কী বলুন তো ?

রীনা হকচকিয়ে গেল। তাকে রিসিপশনে বসতে বলা হয়েছে। এর বেশিকিছু বলা হয় নি। ভদ্রলোককে সেটা বলা কি ঠিক হবে ? রীনা ইতস্তত করতে লাগল। হক সাহেব বললেন, ওরা আপনাকে কী করতে বলেছে, আমি জানি না। আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে রোজ একবার এসে আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ হাসিমুখে গল্প করা। অফিসের বেশিরভাগ মানুষ গোমড়া মুখে বসে থাকে। আমার অসহ্য লাগে।

রীনা খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ভদ্রলোকের এ জাতীয় কথা বলার মানে কী? মেয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে অফিস বসদের নানান ধরনের গল্প শোনা যায়। এর রকমই কি? উনি কি অন্য কিছু বলার চেষ্টা করছেন?

রীনা।

জ্বি।

আমার কথা শুনে মোটেই ঘাবড়াবেন না। রসিকতা করছি। তবে আমি সত্যি সত্যি হাসিমুখ দেখতে পছন্দ করি। নকল হাসিতেও আমার আপত্তি নেই। সত্যি কান্নার চেয়েও নকল হাসি আমার কাছে অনেক ভালো। ঠিকমতো কাজ শিখুন। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি— মেয়েরা যখন অফিসে কাজ করতে আসে তখন তারা হয় দারুণ কাজের হয়, নয়তো নিতান্তই অকাজের হয়। মাঝামাঝি কিছু মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না, শুধু পুরুষদের মধ্যেই দেখা যায়। আমি কর্মী মহিলা চাই। গল্পবাজ মহিলা না যাদের প্রধান কাজ ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে ঘষা। প্রথম দিনে অনেক কথা বলে ফেললাম— আর না।

রীনা প্রথম কাজ শুরু করেছিল রিসিপশনে— এখন তাকে দেয়া হয়েছে ফরেন করেসপনডেন্স ডেস্কে। যে বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে তাকে কাজ শিখতে হচ্ছে তিনি খিটখিটে এবং বদমেজাজি। কথায় কথায় তিনি রীনাকে ধমক দেন তবে প্রায় প্রতিদিনই বলেন— তোমার মাথা পরিষ্কার। অন্যরা যে কাজ এক বছরে শিখেছে তুমি তা শিখেছ এক মাসে।

এই জাতীয় কথা শুনতে আনন্দ লাগে। বুড়ো ভদ্রলোক রীনাকে শুধু যে আনন্দ দেবার জন্যে এই কথাগুলো বলছেন— তা যে না, রীনা নিজেও তা বুঝতে পারে। কাজ করতে তার ভালো লাগে। হক সাহেব তাকে ডেকে নিয়ে একদিন বললেন, আপনার কাজের খুব সুনাম শুনি। আপনি স্পোকেন ইংরেজি কেমন জানেন?

রীনা বলল, ভালো জানি না স্যার।

ভিসিআরে বেশি বেশি ইংরেজি ছবি দেখে স্পোকেন ইংলিশ বানিয়ে নিন। আপনাকে আমরা আমাদের লন্ডন অফিসে পাঠিয়ে দেব। দেশের বাইরে যেতে আপত্তি নেই তো?

জ্বি না স্যার।

আপনার পারিবারিক আনফরচুনেট অবস্থার কথা আমাকে বলা হয়েছে। পারিবারিক বিধিনিষেধ নেই তো?

জ্বি না।

ভালো করে ভেবে বলুন। সব ঠিকঠাক করে আপনার বাইরে যাবার ব্যবস্থা হলো হলো— তারপর আপনি বেঁকে বসলেন বা আপনার স্বামী বেঁকে বসলেন। এমন হবে না তো?

জ্বি না।

হুট করে কিছু বলতে হবে না। আপনি সপ্তাহখানিক ভাবুন। তারপর বলুন।

রীনা এক সপ্তাহ ভেবেছে। কখনো তার কাছে মনে হয়েছে— না সম্ভব না। দেশে সে আছে বলেই অন্তত সপ্তাহে একবার সে টগর-পলাশকে দেখতে পারছে। আবার কখনো মনে হয়েছে— সব ছেড়েছুড়ে দূরে চলে যেতে। একবার মনে হলো তারেক যদি শোনে সে লণ্ডন চলে যাচ্ছে তাহলে সে কী বলবে ? টেলিফোনে আলাপ করবে না সরাসরি তার অফিসে চলে যাবে ? অফিসে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? তারেক যদি ভাবে সে আসলে এসেছে ঘরে ফিরে যেতে ? ভাবলে ভাবুক। যদি সে সত্যি সত্যি লন্ডনে চলে যায়— যাবার আগে একবার দেখা করাও তো উচিত।

বুধবার দুপুরবেলা রীনা তারেকের অফিসে উপস্থিত হলো। তারেক লাঞ্চ সেরে পান চিবোচ্ছিল। রীনাকে দেখে বিস্মিত-অবাক কিছুই হলো না। স্বাভাবিক গলায় বলল, রীনা কী খবর ?

রীনা বলল, ভালো।

আজ আমার ব্যাডলাক, সকালে এসে দেখ ফ্যান নষ্ট। সকাল থেকে গরমে সিদ্ধ হচ্ছি। মিস্ত্রি আনতে লোক গেছে। এগারটার সময় গেছে— এখন দুটা। মিস্ত্রিও নেই, লোকও নেই। নো ম্যাংগো, নো গানিব্যাগ। আমও নেই ছালাও নেই।

রীনা বলল, তুমি কেমন আছ ?

ভালো।

বাসার খবর কী ?

বাসার খবরও ভালো। পলাশ গতকাল রেলিঙের ওপর পড়ে একটা দাঁত ভেঙে ফেলেছে। রক্তটক্ত কিছু বের হয় নি। কট করে দাঁতের একটা কণা ভেঙে গেল।

তোমার চাকরি কেমন চলছে ?

ভালো।

প্রথম প্রথম চাকরি খুব ভালো লাগে। কিছুদিন পর আর ভালো লাগে না। আমার তো রোজ সকালে অফিসে এসে একবার করে ইচ্ছা করে ফাইল টাইল সব জ্বালিয়ে দিয়ে হাঁটা ধরি।

কোন দিকে হাঁটা ধরতে ইচ্ছে করে, চিটাগাঙের দিকে ?

হাঁটা ধরতে ইচ্ছে করে এই পর্যন্তই। তুমি চা খাবে ?

না।

পান খাবে ? মিষ্টিজর্দা দেয়া পান আছে। দুপুরে খাবার পর একটা পান খেতে ভালো লাগে। পান হচ্ছে পিত্তনাশক এবং হজম সহায়ক।

রীনা অবাক হয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। কী আশ্চর্য— দু'মাস পর দেখা— মানুষটা কত সহজেই না কথা বলছে। যেন কিছু যায় আসে না। রীনা বলল, আমাদের অফিসের একটা ব্রাঞ্চ আছে লন্ডনে। আমাকে খুব সম্ভব সেখানে পাঠাবে।

কবে ?

জানি না কবে।

বেতন কত দেবে ? দেশে যে বেতন দেবে বাইরে সে বেতন দিলে তো হবে না। ফরেন কারেন্সিতে বেতন হওয়া উচিত।

উচিত হলে নিশ্চয়ই ফরেন কারেন্সিতে বেতন দেবে। তোমার ওই মেয়ের খবর কী ?

লাবণীর কথা বলছ ? ভালোই আছে। গত সপ্তাহে চিটাগাং গিয়েছিলাম— ওদের কক্সবাজার ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি। লাবণীর মেয়েটা আগে সমুদ্র দেখে নি। এই প্রথম দেখল। খুব খুশি।

তুমি এইভাবে ঘোরাফেরা করছ লোকজনের চোখে লাগছে— তুমি মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল না কেন ?

তারেক বিস্মিত হয়ে বলল, এক বউ থাকতে আরেক বউ ঘরে আনব কীভাবে ?

আইনে বাধা আছে ?

ইসলামি আইনে বাধা নেই— কিন্তু দেশে তো পুরোপুরি ইসলামী আইন নেই—

থাকলে তোমার সুবিধা হতো তাই না ?

তারেক সিগারেট ধরাল। রীনার কান্না পাচ্ছে। এখানে আসা তার উচিত হয় নি। মানুষটার সঙ্গে তার বাসায় চলে যেতে ইচ্ছা করছে। একবার যদি সে বলত— রীনা তুমি চল আমার সঙ্গে— সে নিশ্চয়ই যেত। রীনা ক্লান্ত গলায় বলল, যাই কেমন ?

দাঁড়াও পিয়নকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। রিকশা ঠিক করে দেবে। দুপুরবেলায় রিকশা-বেবিট্যাক্সি কিছুই পাওয়া যায় না।

রীনা বলল, রিকশা লাগবে না।

অফিস থেকে বের হয়ে রীনার ইচ্ছা করল আবার তারেকের সঙ্গে দুটা কথা বলতে ওকে খুব রোগা লাগছে। ওর কি ঘুম হচ্ছে না ?

২৩

আজ লায়লার বিয়ে।

দায়সারা টাইপ বিয়ে। বর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবে। কয়েকজন আত্মীয়স্বজন থাকবে। কাজি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। তারা কনে নিয়ে চলে যাবে। পাঁচ লাখ টাকা দেনমোহর। এক লাখ উসুল।

এটা কী রকম বিয়ে ? গায়ে হলুদ না, কিছু না। লায়লা ঠিক করে ফেলেছে দুপুরে সে পালিয়ে যাবে। কোথায় যাবে এখনো ঠিক করে নি। কল্যাণপুরে তার এক বন্ধবী থাকে। তাদের বাড়িতে ওঠা যায়। সেখানে টেলিফোন আছে। টেলিফোনে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

বিয়ের দিনটা অন্যরকম থাকে। অথচ তার বিয়ের দিন অন্য দিনগুলোর চেয়ে মোটেও আলাদা না। সবকিছু আগের মতো শুধু টগর-পলাশ স্কুলে যাচ্ছে না। তারা বারান্দায় মহা উৎসাহে ফুটবল খেলছে।

তারেকও অফিসে যায় নি। সে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে ছেলেদের খেলা দেখছে। তারেক বলল, লায়লা আমাকে চা দে।

লায়লা চা বানাতে গেল। কমলার মা বলল, বিয়ার দিন চুলার ধারে যাইয়েন না আফা। ঘরে গিয়া টাইট হইয়া বইয়া থাকেন। চা আমি বানাইতেছি।

লায়লা তাকে ধমক দিয়েছে— বেশি কথা বলবে না কমলার মা। এত কথা আমার ভালো লাগে না।

চা বানাতে গিয়ে লায়লার চোখে পানি এসে গেল। তার কত শখ ছিল অল্প বয়েসী, লম্বা পাতলা সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। যার সঙ্গে সে নানান ধরেনের আহ্লাদী করবে। আহ্লাদী করতে তার খুব ভালো লাগে। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার সঙ্গে সে আহ্লাদী কী করবে ? হেডমাস্টার চেহারার একজন মানুষ। আগে বিয়ে হয়েছে। সেই পক্ষের ছেলে আছে। কে জানে ছেলেও হয়তো বাবার বিয়েতে বরযাত্রী আসবে।

মানুষটার কথাবার্তাও গা জ্বালা ধরনের— শুনুন প্লেইন এন্ড সিম্পল বিয়ে হবে। কোনো অনুষ্ঠান না কিচ্ছু না। অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমি যেতে চাচ্ছি না।

তুই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে যাবি কিরে গাধা ? তোর একটুও চক্ষুলজ্জা নেই! দুদিন পরে পরে বিয়ে করছিস!

লায়লা তার বিয়ের খবর কাউকে জানায় নি। কোন লজ্জায় জানাবে ? সবাই হাসাহাসি করবে না! হয়তো বলবে— গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ? বিয়ের আগেই এত বড় ছেলে ?

ভাইয়া চা নাও।

তারেক চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বল, মা-বাবা কেউ তো এখনো আসছে না ? মা বোধহয় রাগ করেই বসে আছে। আমাকে গিয়ে রাগ ভাঙিয়ে আনতে হবে। বড়বুবুরই বা ব্যাপারটা কী ? সব ঠিকঠাক করে— তারই খোঁজ নেই।

লায়লা জবাব দিল না। তারেক বলল, চা ভালো বানিয়েছিস। একটু কড়া হয়েছে— আরেকটু কড়া হলে ভালো হতো।

রকিব কি তোর বিয়ের খবর জানে ?

আমি জানি না।

হাসানকে বলেছিলাম খবর দিতে। দিয়েছে হয়তো । লায়লা যা আমার জন্যে আরেক কাপ চা আন।

লায়লা চা আনতে গেল। সেখান থেকেই দেখল হাসান বের হচ্ছে। এই সকালে চা-টা না খেয়ে কোথায় যাচ্ছে। লায়লা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। হাসানকে ডাকবে না ডাকবে না করেও ডাকল, ভাইয়া শোন। যাচ্ছ কোথায় ?

রহমানদের বাড়িতে। তার দাদির অবস্থা নাকি খুব খারাপ। রাতে খবর পাঠিয়েছে যেতে পারি নি। চট করে দেখে আসি।

চা খাবে ?

চা হচ্ছে নাকি ? চা হলে দে। তোর মুখ এমন শুকনা লাগছে কেন ? রাতে ঘুম হয় নি ?

না।

বিয়ে নিয়ে টেনশান করছিস ?

তোমরা কেউ টেনশান করছ না, আমি শুধু শুধু টেনশান করব কেন ?

রাগ করেছিস নাকি ?

আমি রাগ করব কেন ? আমার রাগ করার কী আছে ? তুমি ভাইয়ার কাছে বোস আমি চা নিয়ে আসছি।

লায়লার চোখে আবার পানি আসছে। হাসানকে সরিয়ে দিতে না পারলে সে তার চোখের পানি দেখে ফেলবে। কী দরকার চোখে পানি দেখানোর।

লায়লা!

হুঁ।

আমি দেরি করব না। যাব আর আসব— যেতে-আসতে যা সময় লাগে। এই ধর দুঘণ্টা। তোর কিছু লাগবে ?

না আমার আবার কী লাগবে ?

হুট করে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল— এইজন্যে আর উৎসব হচ্ছে না। এটা নিয়ে মন খারাপ করবি না। উৎসব বড় ব্যাপার না। যার সঙ্গে সারা জীবন থাকবি সেই মানুষটা বড় ব্যাপার। ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হয়েছে।

ভালো।

এখন তুই খুব রেগে আছিস— তোর পছন্দ হবে সবচেয়ে বেশি। তুই আমাদের সামনেই ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আহ্লাদী করবি— দেখে রাগে আমার গা জ্বলে যাবে।

এই নাও তোমার চা।

লায়লা আজ সকালে কি তুই আয়নায় নিজেকে দেখেছিস ?

আয়নায় নিজেকে দেখার কী আছে।

তোকে আজ খুবই সুন্দর লাগছে। যা আয়নায় নিজেকে দেখে আয়।

ভাইয়া প্লিজ আহ্লাদী করবে না।

লায়লা তারেকের চায়ের কাপ নিয়ে বের হয়ে গেল। আসলেই আয়নার সমানে আজ দাঁড়ানো হয় নি। হাসান যখন বলেছে তখন একবার নিজেকে দেখতেই হয়। লায়লা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে, তখন চোখে পড়ল বাসার সামনে ট্যাক্সি থামল। ট্যাক্সি ভর্তি মানুষ। বড়বুবু সবাইকে নিয়ে চলে এসেছেন। পেছনে আরেকটা ট্যাক্সি সেখান থেকে মা-বাবা নামছেন। সবার মুখ হাসি হাসি। এ কী! উৎসব শুরু হয়ে গেল নাকি ? লায়লার বুকে সামান্য কাঁপন লাগল। ছোটবেলায় ঈদের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই যেমন মনে হত আজ ঈদ এবং বুকে কাঁপন লাগত তেমন কাঁপন।

টগর এবং পলাশ দাদিমা দাদিমা বলে বিকট চিৎকার করছে। বড়বুবু হাতে অনেকগুলো প্যাকেট নিয়ে নামছেন। কে জানে প্যাকেটগুলাতে কী আছে।

আম্বিয়া খাতুন আবারো একটা ভেলকি দেখিয়েছেন। হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছিলেন। এক সময় শ্বাস নেয়া স্তিমিত হয়ে গেল। সৈকান্দর আলী 'ও

আমার মারে' বলে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠতেই আম্বিয়া খাতুন ক্ষীণ গলায় বললেন— গাধাটা চিল্লায় কেন ? আম্বিয়া খাতুনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিয়মিত শ্বাস পড়তে লাগল। তিনি পানি খেতে চাইলেন। আত্মীয়স্বজনরা দল বেঁধে এসেছিলেন তারা চলে যেতে চাচ্ছিলেন, সেকান্দর আলি বললেন— এখন যাবেন না। মৃত্যুর আগে আগে হঠাৎ শরীরটা ভালো হয়ে যায়। তাই হচ্ছে। আপনারা চলে যাবেন, ঘটনা ঘটে যাবে। আপনাদের মনে থাকবে আফসোস— শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারলেন না। আত্মীয়স্বজন বেশিরভাগই থেকে গেলেন। সব অপেক্ষাই যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যুর অপেক্ষাও তাই।

হাসান যখন পৌঁছলো তখন লোকজনে বাড়ি গমগম করছে। উৎসব উৎসব ভাব। ছোট বাচ্চারা উঠোনে খেলছে। বয়স্করা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছেন। ট্রেভর্তি চা এসেছে। চা নেয়া হচ্ছে। সবার মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব। শুধু সেকান্দর আলি বিরসমুখে বসে আছেন। রাত্রি জাগরণের কারণে তার শরীর খারাপ করেছে। সামান্য হাঁপানির টানও উঠছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকলে হতো। সেটা ভালো দেখায় না। মার এখন তখন অবস্থা আর পুত্র এসি ঘরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে! তাঁর যেসব আত্মীয়স্বজন একটু পর পর তাকে বলছে 'সেকান্দর তুমি যাও শুয়ে একটু রেস্ট নাও, তোমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না'— তারাই তখন নানা কথা ছড়াবে। দরকার কী ?

হাসানকে দেখে সেকান্দর আলি বললেন, কী খবর হাসান ?

হাসান বলল, জ্বি চাচা ভালো।

মার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তোমাকে দেখতে চাচ্ছিলেন। এসেছ ভালো করেছ। যাও দেখা দিয়ে এস।

রহমান কোথায় ?

ওকে টঙ্গী পাঠিয়েছি। একজন কাউকে তো ব্যবসাপাতি দেখতে হবে।

জ্বি দেখতে তো হবেই।

শোন হাসান, তোমার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। গ্রামের দিকে যেতে হবে। স্কুলমাস্টারি। শিক্ষকতা পেশা হিসাবে খারাপ না। গ্রামে থাকবে ফ্রেশ আলোবাতাস, ফ্রেশ সবজি। সবাই শহর শহর করলে গ্রামগুলো চলবে কীভাবে ?

জায়গাটা কোথায় ?

আমাদের গ্রামের বাড়িতে। আমারই দেয়া আমার মায়ের নামে স্কুল-- আম্বিয়া খাতুন গার্লস হাইস্কুল।

ও আচ্ছা।

নদীর পাড়ে স্কুল। অতি মনোরম পরিবেশ। মেয়েদের হোস্টেল আছে। শিক্ষদের থাকার জায়গা আছে। বেতন যা দেয়া হয় খারাপ না। সরকারি ডিএ তো আছেই। আনম্যারিড কোনো শিক্ষক ওই স্কুলে দেয়া হয় না— তোমার বেলায় নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। গ্রামে যাবে ?

জ্বি ভেবে দেখি।

হ্যাঁ ভেবে দেখ। আর যদি যাবার সিদ্ধান্ত নাও তাহলে বিয়ে করে ফেল। বউ নিয়ে

থাকবে। সুখে থাকবে। তোমরা ঢাকা শহর ঢাকা শহর কর। কী আছে এই শহরে! পলিউশন। বেবিট্যাক্সির ধোঁয়া খেয়ে মানুষের গড় আয়ু কমেছে পাঁচ বছর। ঠিক না?

জ্বি।

আচ্ছা যাও মার সঙ্গে দেখা করে আস। একট কথা শোন— মা তোমার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?

জানি না চাচা।

বুঝলে হাসান, মার এই ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝি না। আমি অতি মাতৃভক্ত ছেলে। মা যা বলছে করেছি। স্কুল বানাতে বলেছে, বানিয়েছি। শীতের সময় আসে মা বলে, গ্রামের গরিব-দুঃখীকে শীতের কম্বল দে, পুরনো কম্বল দিবি না— নতুন কম্বল। দেই নতুন কম্বল। অমুক এতিমখানার ছেলেপুলেদের ঈদের কাপড় দে। এতিমখানায় কি ছেলেপুলে একটা-দুটা থাকে? শত শত ছেলেপুলে। উপায় কী— মাতৃআজ্ঞা; তাদের দেই কাপড়— অথচ দেখ আমাকে সহ্যই করতে পারেন না। আচ্ছা তুমি যাও দেখা করে আস। চাকরির ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নিলে আমাকে জানাবে।

জ্বি আচ্ছা।

হাসান ভেতরের দিকে রওনা হলো।

আম্বিয়া খাতুনকে আধশোয়া করে বসানো হয়েছে। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে চামচে করে তাঁকে স্যুপ খাইয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি তাকে দেখে খুবই বিরক্ত মুখে তাকাল। আম্বিয়া খাতুন বললেন, কী রে হাসান তোর সময় হলো শেষ পর্যন্ত?

কেমন আছেন দাদিমা?

ভালো আছি। দেখছিস না স্যুপ খাচ্ছি। তোর চাকরি-বাকরি কিছু হয়েছে?

জ্বি না।

যার যা ক্ষমতা আল্লাহ্‌পাক তাকে তাই দেন। যার ক্ষমতা চোর হবার তাকে তিনি চোর বানান। যার কিছুই করার ক্ষমতা নেই তাকে কিছুই বানান না— সে তোর মতো পথে পথে ঘোরে। বুঝেছিস?

জ্বি।

সেকান্দরকে বলেছি তোর চাকরির জন্যে।

দাদিমা আমার চাকরির জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না।

ব্যস্ত তোকে কে বলেছে? তোর চাকরি হলেই কী আর না হলেই কী? যা আমার সামনে থেকে। যাবার আগে সেকান্দরের সঙ্গে দেখা করে যাবি।

জ্বি আচ্ছা।

তোকে স্কুলের চাকরি গছিয়ে দিতে চাইবে। খবরদার নিবি না। কোনো মতে একটা চালাঘর তুলে দিয়েছে— না আছে ছাত্র না আছে কিছু। মাস্টাররা বেতন পায় না। বুঝেছিস?

জ্বি।

বিয়েটিয়ে করবি না ?

হাসান চুপ করে রইল।

না করাই ভালো। বউ তো আর তোর মতো বাতাস খেয়ে থাকবে না। তোকে না চল যেতে বললাম, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? আজকাল কি কানেও শুনতে পাস না ?

যে মেয়েটি স্যুপ খাওয়াচ্ছিল সে শুকনো গলায় বলল, আপনি এখন যান। উনাকে আর বিরক্ত করবেন না। স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছি।

হাসান বের হয়ে এল। এই বৃদ্ধার স্নেহের কোনো কারণ সে জানে না। কোনোদিন জানবেও না। ঘর থেকে বের হবার সময় হঠাৎ তার মনে হলো, এই বৃদ্ধার সঙ্গে আর দেখা হবে না। এ রকম মনে হবার কোনো কারণ নেই তবু মনে হলো। গুরুতর অসুস্থ যে কোনো মানুষের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এ রকম অনুভূতি হয়— যার আসলে তেমন গুরুত্বই নেই।

সেকান্দর সাহেব বললেন, হাসান চলে যাচ্ছ নাকি ?

জ্বি।

মা কী বলল ?

তেমন কিছু বলেন নি।

আচ্ছা ঠিক আছে। স্কুলের ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নিলে জানাবে। স্কুলের চাকরি খারাপ না। স্যাটিসফেকশান আছে। একটা ভালো কাজ করছ তার স্যাটিসফেকশন।

জ্বি।

সন্ধ্যার দিকে সময় পেলে একবার এসো। মার জন্যে খতমে শেফা পড়াচ্ছি। বাদ মাগরেব দোয়া হবে।

বাসায় একটা কাজ আছে চাচা।

কাজ থাকলে আসার দরকার নেই।

সেকান্দর আলি বিমর্ষমুখে সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে তিনি কোনো স্বাদ পেলেন না।

লায়লার বিয়ে হয়ে গেল।

তার মন খারাপ ভাবটা বিয়ের পর পুরোপুরি কেটে গেল। যতটা দায়সারা বিয়ে হবে বলে সে ভেবেছিল দেখা গেল বিয়েটা সে রকম দায়সারা হয় নি। ওরা বিয়ের শাড়িই এনেছে তিনটা। একটার চেয়ে আরেকটা সুন্দর। এর মধ্যে একটা নীল শাড়ি দেখে লায়লা মোহিত হয়ে গেল। সে ফিসফিস করে বলল, ভাবি নীল শাড়িটা কেমন লাগছে ?

বিয়ে উপলক্ষে রীনা এসেছে। সে বেশ স্বাভাবিকভাবেই আছে। টগর-পলাশ মাকে দেখে বেশ স্বাভাবিক আছে। তাদের মধ্যে বাড়তি কোনো আবেগ বা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে না।

রীনা বলল, শাড়িটা তো খুবই সুন্দর।

এখন বল শাড়ি কোনটা পরব ?

সবচে' সুন্দরটাই পর। নীলটা পর।

কিন্তু ভাবি লাল শাড়ি ছাড়া বিয়ে কেমন কেমন জানি লাগছে।

তাহলে থাক লালটাই পর। বিয়ে পড়ানো হোক— তারপর বদলে নীলটা পরলেই হবে।

গায়ে হলুদ হয় নি বলে লায়লার মনে যে খুঁতখুঁতানি ছিল সেটা দূর হয়েছে— রীনা দুপুরে এসেই গায় হলুদের ব্যবস্থা করেছে। লায়লা খুবই আপত্তি করছিল, কী ছাতার বিয়ে তার আবার গায়ে হলুদ! ভাবি তুমি বরং কিছু শুকনা মরিচ পিষে গায়ে ডলে দাও। গায়ে মরিচ হয়ে যাক!

রীনা ধমক দিয়েছে— ঝামেলা করবে না তো। এস বলছি।

লায়লা আর ঝমেলো করে নি। খুশি মনেই গিয়েছে।

বিয়ের শাড়ি পরানোর পর লায়লার খুব ইচ্ছা করতে লাগল কোনো একটা পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধে আসতে। ভুরুও প্লাক করা দরকার। ভুরু প্লাক সে নিজে নিজে করে। বিউটি পার্লারে ওরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে করবে। কিন্তু কথাটা সে বলবে কাকে ? বলতে লজ্জাও লাগবে। তার বান্ধীরা কেউ থাকলে বলত। কাউকেই আসতে বলা হয় নি। এখন মনে হচ্ছে আসতে বললে ভালো হতো। নীল শাড়িটা সবাইকে দেখাতে ইচ্ছা করছে।

বরযাত্রীদের কাজি নিয়ে আসার কথা। তারা আনতে ভুলে গেছেন। গাড়ি পাঠানো হয়েছে কাজি আনতে। লায়লা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। মাথার চুল বাঁধাটা নিয়ে তার মনটা খুঁতখুঁত করছে। আচ্ছা লজ্জার মাথা খেয়ে সে কি ভাবিকে বলে ফেলবে ? ভাবি আবার তাকে বেহায়া ভাববে না তো ? লায়লা ক্ষীণস্বরে ডাকল, ভাবি।

রীনা বলল, কী ব্যাপার বল ? লায়লা তোমাকে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। আয়নায় দেখেছ নিজেকে।

চুল বাঁধাটা মনে হয় ঠিক হয় নি ভাবি। কেমন ফুলে ফুলে আছে। রীনা বলল, লায়লা চল একটা কাজ করি। এখনো তো হাতে সময় আছে চল কোনো পার্লারে গিয়ে বেঁধে আসি।

যাব কী করে ভাবি ? বেবিট্যাক্সি করে ? বিয়ের শাড়ি পরে বেবিট্যাক্সি করে যাওয়া বিশ্রী দেখাবে না ?

বেবিট্যাক্সি করে যাব কেন ? তোমার বরের গাড়ি নিয়ে যাব। তোমার বরের গাড়ি তো তোমারই গাড়ি।

দেখ ভাবি তুমি যা ভালো বোঝ। কী ছাতার বিয়ে— এর জন্যে আবার পার্লারে গিয়ে চুল বাঁধা!

লায়ল তোমার গয়নাগুলো দেখেছ। একটা নীল পাথরের সেটও আছে। তোমার নীল শাড়ির সঙ্গে খুব মানাবে।

ওইসব তুমি দেখ ভাবি, আমার কিচ্ছু দেখতে ইচ্ছে করছে না।

দেখতে ইচ্ছা করছে না বললেও লায়লা পাথরের সেটটা আগেই দেখেছে। উফ! এত সুন্দর।

যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সেই মানুষটাকেও সে এক ফাঁকে দেখেছে। বাহ্! পায়জামা-পাঞ্জাবিতে খুব মানিয়েছে! আর আগে একবার দেখেছিল শার্ট-প্যান্ট পরা— তখন এত ভালো লাগে নি। আশ্চর্যের ব্যাপার— লোকটার ছেলের জন্যেও তার মায়া লাগছে। বাচ্চা একটা ছেলে— মার ভালবাসা পাচ্ছে না। ছেলেটাকে সে অবশ্যই আদর করবে। সে বেচারা তো কোনো দোষ করে নি। তাকে এরা কোথায় একা একা রেখে এসেছে কে জানে। মনে করে নিয়ে এলেই হতো। লোকে কী বলবে ? বলুক। লায়লা মানুষের কথার ধার ধারে না।

লায়লার বান্ধবীরাও শেষ পর্যন্ত বিয়েতে এসে যুক্ত হলো। বিউটি পার্লার থেকে লায়লা তাদের টেলিফোন করে দিয়েছিল। দু'জনের বাসায় টেলিফোন ছিল না। লায়লা চিঠি লিখে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য এই গাড়িটা তাদের ভাবতেও ভালো লাগছে। সে যখন ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে বলল, এই দু'জনকে আমার চিঠি দিয়ে আসতে পারবেন ? ড্রাইভার বলেছে, অবশ্যই পারব ম্যাডাম। ড্রাইভারের মুখে ম্যাডাম শব্দ শুনতে এত ভালো লাগল!

বর-কনে চলে যাবার পর মনোয়ারা রীনাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, শোন বউমা তুমি যে এসেছ আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি দশ রাকাত নফল নামায পড়ে তোমার জন্যে দোয়া করেছি। মা তুমি কি থাকবে না চলে যাবে ?

আমি চলে যাব। হাসানকে বলেছি ও পৌঁছে দেবে।

এক কাজ করলে কেমন হয় মা, আমি তারেককে ডাকি ও কানে ধরে তোমার সামনে দশবার উঠবোস করুক।

ছিঃ মা! কী বলছেন এসব!

ভুল বলছি না। ঠিকই বলছি। ও কানে ধরে উঠবোস করলে তোমার রাগটা একটু পড়বে।

মা এইসবের কোনো দরকার নেই।

তারেক যে কাণ্ড করেছে তারপরে তোমাকে আমি থাকতেও বলতে পারি না। বুড়ো মার একটা কথা তুমি রাখ। আজ রাতটা থাক কাল সকালে চলে যেও।

একটা রাত থাকলে কী হবে ?

গাধাটার সঙ্গে কথা বল। কথা বলে তোমার যদি মন গলে।

আচ্ছা ঠিক আছে মা আজ রাতটা থেকে যাচ্ছি।

একটু বস আমার সামনে। তোমার সঙ্গে গল্প করি। লায়লাকে কেমন মনে হলো মা— খুশি ?

হ্যাঁ, খুব খুশি।

একেবারে গাধা মেয়ে। শাড়ি-গয়না দেখে এলিয়ে পড়েছে। যে যা চায় আল্লাহ তাকে তাই দেন। ও শাড়ি-গয়না চেয়েছিল, আল্লাহ তাকে শাড়ি-গয়না দিয়েছেন। আমার একেকটা ছেলেমেয়ে হয়েছে একেক পদের।

তারেক শুয়ে পড়ছিল। রীনা ঘরে ঢুকতেই উঠে বসে সহজ স্বভাবিক গলায় বলল, এটা পান দাও তো।

যেন কিছুই হয় নি সব আগের মতো আছে। রীনা পান এনে দিল। তারেক হাই তুলতে তুলতে বলল, বাতি নিভিয়ে আস। তুমি ছিলে না মশারি তুলে ফেলেছিলাম। মশারি খাটিয়েছি।

ভালো।

মশা অবশ্যি নেই বললেই হয়। কয়েকদিন ঝড় হয়েছে তো বেশিরভাগ মশার পাখা ঝড়ে ছিঁড়ে গেছে ওরা উড়তে পারে না।

ভালো।

রীনা বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, লাবণী কেমন আছে?

ভালো আছে। ওর মেয়েটার নিউমোনিয়ার মতো হয়েছে। খুব টেনশানে আছি। নিউমোনিয়া খারাপ ধরনের অসুখ। চিকিৎসার চেয়ে যত্নটা বেশি লাগে। লাবণী অফিস নিয়ে ব্যস্ত, বাচ্চাটার যত্ন হচ্ছে কি না কে জানে।

ডাক্তার দেখছে না?

দেখেছে। রসিফিন দিচ্ছে। রসিফিন ভালো এন্টিবায়োটিক। নিউ জেনারেশন ড্রাগ। ঠিকমতো ওষুধ পড়ছে কিনা কে জানে।

তুমি চলে যাও। দেখে শুনে ওষুধ দেবে।

যাব। বৃহস্পতিবার নাইটকোচে চলে যাব। শুক্র-শনি ছুটি আছে। নাইট কোচগুলো ভালো করেছে। পাঁচ ঘণ্টা লাগে যেতে। গাড়িতে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে।

তারেক মশারির ভেতর থেকে বের হবার উপক্রম করল। রীনা বলল, যাচ্ছ কোথায়?

তারেক চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। আগুনের ফুলকি উঠছে-নামছে। রীনা তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। এই মানুষটাকে ছেড়ে সে কাল ভোরে চলে যাবে। কিন্তু তার কী প্রচণ্ড ইচ্ছাই না করেছে মানুষটার সঙ্গে থাকতে। একটা জীবন সুখে-দুখে পার করে দিতে।

রীনা চোখের জল সামলাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

২৪

আপনার নাম?

জ্বি আমার নাম হাসান। হাসানুজ্জামান।

আপনি কী করেন?

কিছু করি না— বেকার বলতে পারেন। সম্প্রতি অবশ্য একটা চাকরি পেয়েছি।

কী চাকরি?

স্কুল টিচারের চাকুরি। ঢাকার বাইরে।

আপনি ধূমপান করেন ?

জ্বি।

নিন একটা সিগারেট খান।

ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। হাসান সিগারেট নিল। তার অস্বস্তি বাড়ছে। তাকে থানায় ডেকে আনার কারণ স্পষ্ট হচ্ছে না। তারাও ভেঙে কিছু বলছেন না। ওসি সাহেবকে বেশ ভদ্র মনে হচ্ছে। পুলিশের চাকরি না করে এই ভদ্রলোক কোনো কলেজের শিক্ষকতাও করতে পারতেন। খাকি পোশাকে তাকে মানাচ্ছে না।

চা খাবেন ?

জ্বি না। আমাকে কেন ডেকেছেন দয়া করে বলবেন ?

আপনার ছোট ভাই আছে না— রকিব ?

জ্বি।

তার সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ নেই ?

যোগাযোগ থাকবে না কেন ? আছে তো। মাঝখানে বেশ কিছুদিনের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল।

শেষ কবে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

শেষ কবে দেখা হয়েছে হাসান মনে করতে পারল না। লায়লার বিয়েতে আসে নি এটা মনে আছে। তাকে খবর দেয়া হয়েছিল, সে নিজেই খবর দিয়ে এসেছে।

দিন তারিখ বলতে হবে না। মোটামুটি একটা সময় বললেই হবে।

শেষবার সে এসেছিল খুব সম্ভব দিন পনের আগে। কেন বলুন তো ?

এর মধ্যে সে কি কোনো খবর পাঠিয়েছে ?

জ্বি না। পাঠালেও আমি জানি না।

সে কি বাসায় আপনাদের কারো কাছে টাকা-পয়সা রাখতে দিয়েছে ?

জ্বি না।

এমনকি হতে পারে যে কারো কাছে রাখতে দিয়েছে আপনি তা জানেন না ? ব্যাপারটা গোপনে ঘটেছে।

আমি আসলে কিছু বুঝতে পারছি না। এই প্রশ্নগুলো আপনি কেন করছেন জানতে পারলে আমার উত্তর দিতে সুবিধা হতো।

চা দিতে বলি— এক কাপ চা খান। চা খেতে খেতে কথা বলি। দিতে বললো ?

বলুন।

ওসি সাহেব চা দিতে বললেন। হাসান খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। রকিব কি কোনো ঝামেলায় পড়েছে ? ঝামেলাটা কোন ধরনের ? বড় ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোনো কারণ নই। রকিব রগচটা কিন্তু ভালো ছেলে।

চা নিন হাসান সাহেব।

হাসান চা নিল। ওসি সাহেব বললেন, আমি বেশি কিছুদিন আগে একজন

এস.আইকে পাঠিয়েছিলাম। ও আপনার বাবার সঙ্গে রকিব সম্পর্কে কথা বলেছিল। এক ধরনের সাবধানবাণী বলতে পারেন। উনি কি ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করেন নি?

আমাকে কিছু বলেন নি। মনে হয় অন্য কারো সঙ্গে বলেন নি। বাবা কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। সমস্যার কথা একেবারেই বলেন না।

আপনার ছোট ভাই রকিব বাজে ধরনের সমস্যায় জড়িত ছিল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মানি এক্সটরশন?

কী বললেন?

বিত্তবান লোকজন আটকে রেখে টাকা চেয়ে পাঠানো।

কী বলছেন এসব?

তার বিরুদ্ধে একটা হত্যা মামলাও আছে।

আপনাদের নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে।

জ্বি না ভুল হচ্ছে না।

আমার মনে হয় শত্রুতাবশত তার সম্পর্কে এই জাতীয় কথা বলা হচ্ছে। সে ছাত্র রাজনীতি করে— তাকে বিপদে ফেলার জন্য এইসব হয়তো ছড়াচ্ছে। সে খুবই ভালো ছেলে। পড়াশোনায় ভালো। চিকেন পক্স নিয়ে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছিল— তারপরেও চারটা লেটার নিয়ে এস.এস.সি. পাস করেছিল।

বুঝলেন হাসান সাহেব— দেশের পরিবেশ এখন এমন রাতারাতি একজন ভালো মানুষ নষ্টমানুষ হয়ে যায়।

নষ্ট হবার একটা সীমা থাকে। সীমার নিচে নষ্টও হওয়া সম্ভব না। আপনি কী করে বললেন রকিব হত্যা মামলার আসামি?

আপনার চা কি শেষ হয়েছে?

জ্বি।

চলুন আমার সঙ্গে।

কোথায় যাব?

আপনি একটা ডেডবডি আইডেনটিফাই করবেন।

হাসান হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল। খাকি পোশাক পরা এই মানুষটা এইসব কী বলছে। সে ডেডবডি আইডেনটিফাই করবে কেন? কার ডেডবডি?

হাসান সাহেব!

জ্বি।

বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেয়া ডেডবডি। চেনার অবস্থা না পচেগলে গিয়েছে। নিকট আত্মীয়স্বজনরা মাথর চুল দেখে জামাকাপড় দেখে হয়তো আইডেনটিফাই করতে পারবেন। এই জন্যই আপনাকে আনা।

আপনার কী করে ধারণা হলো এটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি?

আপনার ভাইয়ের একজন সহযোগীকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তার স্বীকারোক্তি

থেকে জেনেছি। সে বলছে রকিবকে ছুরি দিয়ে জবাই করা হয়— তারপর ডেডবডি ইটসহ্ বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়।

হাসানের মনে হলো— খাকি পোশাক পরা এই মানুষটা আসলে মানুষ না, পিশাচ। এর হৃদয় বলে কিছু নেই। সে নির্বিকারভাবে কথাগুলো বলছে। তার মন বলে কিছু নেই? তার কি বাসায় ভাইবোন নেই? ছেলেমেয়ে নেই? সে কি স্ত্রীর সঙ্গে বসে টিভিতে নাটক দেখে না? ঘন বর্ষায় কি তার বাড়িতে খিচুড়ি ইলিশ মাছ রান্না হয় না?

হাসান সাহেব!

জ্বি।

নিন আরেকটা সিগারেট নিন।

জ্বি না সিগারেট নেব না।

তাহলে চলুন।

কোথায় যাব?

মেডিকেল কলেজে। ডেডবডি মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। আপনি আইডেনটিফাই করার পর সুরতহাল হবে। যদিও সুরতহাল অর্থহীন। তবুও নিয়ম রক্ষার জন্যে করতে হবে।

আপনি যে ডেডবডি আমাকে দেখাতে যাচ্ছেন সেটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি না। আপনরা মস্তবড় ভুল করছেন।

ভুল হতেও পারে। ভুল হচ্ছে কি না তা জানার জন্যই আপনাকে নিয়ে যাওয়া।

লাশের পাশে একজন ডোম দাঁড়িয়ে। তার নাক গামছা দিয়ে বাঁধা। তার হাতে একটা লাঠি। সে লাঠি দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখাচ্ছে।

ওসি সাহেব বললেন, দেখলেন!

হাসান জবাব দিল না।

দাঁতগুলো দেখুন। ওপরের প্রথম দাঁতটা ভাঙা। হাতের রিস্টওয়াচটা দেখুন।

হাসান বলল, এটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি না।

ও আচ্ছা ঠিক আছে— চলুন যাই।

ঘর থেকে বের হয়েই হাসান বলল, আমার মাথা ঘুরছে শরীর কেমন যেন করছে। আমি বমি করব।

বারান্দায় গিয়ে বমি করুন। কোনো অসুবিধা নেই। আমি পানি এনে দিচ্ছি।

হাসান মুখ ভর্তি করে বমি করল। তার মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরটা পুরোপুরি মুখ দিয়ে বের হয়ে যাবে। সে হয়ে যাবে উল্টো মানুষ। শরীরের বাইরের অংশ চলে যাবে ভেতরে। ভেতরের অংশ চলে আসবে বাইরে।

হাসান সাহেব।

জ্বি।

এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন ?

জ্বি।

নিন পানি দিয়ে মুখ ধোন। একটা পান খান।

আমি কি চলে যেতে পারি ?

জ্বি পারেন। চলুন আমি আপনাকে একটা রিকশা করে দি। পুলিশের গাড়ি করে পাঠাতে পারতাম সেটা ঠিক হবে না। প্রতিবেশীরা নানান কথা বলতে পারে।

আপনাকে রিকশা করে দিতে হবে না। ধন্যবাদ।

ওসি সাহেব বললেন, কুৎসিত একটা দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি— সামান্য ভদ্রতা আমাকে করতে দিন।

ওসি সাহেব!

জ্বি।

ডেডবডিটা আমার ছোট ভাইয়ের।

আমি জানি।

আমি কাউকে বলতে চাচ্ছি না। কাউকে না। বাবা-মা কাউকে না। তাতে কোনো অসুবিধা আছে ?

অসুবিধা নেই।

সবাই জানবে একটা ছেলে ছিল, হারিয়ে গেছে। কত মানুষ তো হারিয়ে যয়।

তা যায়।

আমার ভাইয়ের কি জানাজা হবে ? কবর হবে ?

হ্যাঁ হবে। আপনি কাঁদবেন না।

ওসি সাহেব আপনার নামটা কি জানতে পারি ?

কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে আমার নামও রকিব। হাসান সাহেব কাঁদবেন না প্লিজ। আর ভাই শুনুন— আই অ্যাম সরি।

জ্বরে হাসানের গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাড়িতে কেউ নেই। তারেক গিয়েছে চিটাগাং। রীনা এসে টগর-পলাশকে নিয়ে গেছে। লায়লা তার শ্বশুরবাড়িতে। হাসানের মা তার বড় মেয়ের বাড়িতে। শুধু হাসানের বাবা আশরাফুজ্জামান সাহেব আছেন। তবে এই মুহূর্তে তিনি বাড়িতে নেই। চায়ের স্টলে বসে আছেন। গরম গরম জিলাপি ভাজা হচ্ছে। তিনি জিলাপি খাচ্ছেন। রসে তার মুখ মাখামাখি। এত ভালো জিলাপি তিনি অনেক দিন পর খাচ্ছেন। মাখনের মতো মোলায়েম হয়েছে। মুখে দেয়ামাত্র গলে যাচ্ছে।

কমলার মা গোঙানির শব্দ শুনে হাসানের দরজার সামানে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ভীত গলায় ডাকল, ভাইজান ?

হাসান চোখ মেলল। তার চোখ টকটকে লাল। হাসান ভারি গলায় বলল, কে ?

কমলার মা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভাইজান আমি।

হাসান আবারো বলল, কে?

ভাইজান আমি কমলার মা। আপনের কী হইছে ভাইজান?

মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কমলার মা।

খুব বেশি?

হ্যাঁ খুব বেশি।

হাসান চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে জেগে আছে অথচ সেই বিশ্রী স্বপ্নটা আবার শুরু হয়েছে। একদল হাঁস যাচ্ছে। সে হাঁটছে হাঁসের সঙ্গে। হাঁসরা শামুক গুগলি জাতীয় খাবার খাচ্ছে। ঝিনুকের খোল খুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। একটা হাঁস তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। হাঁসটার চোখ মানুষের চোখের মতো বড় বড়।

জেগে থেকেই সে এই স্বপ্নটা দেখছে কেন? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? এই দুঃস্বপ্নের কথা সে তিতলী ছাড়া আর কাউকে বলে নি।

স্বপ্নের কথা শুনে তিতলী বলেছিল খিচুড়ি দিয়ে ভুনা হাঁসের মাংস খেলে তোমার হাঁসের স্বপ্ন দেখার এই রোগ সেরে যাবে। শীতকাল আসুক আমি নিজে তোমাকে ভুনা হাঁসের মাংস খাওয়াব। তুমি কি জান আমি খুব ভালো রাঁধুনি?

না জানি না।

আমার অনেক কিছুই তুমি জান না। একেক করে জানবে আর মুগ্ধ হবে। এই পৃথিবীতে মটরশুঁটি দিয়ে কই মাছের ঝোল আমার চেয়ে ভালো কেউ রাঁধতে পারে না। শীতকাল আসুক তোমাকে মরটরশুঁটি আর কই মাছের ঝোল খাওয়াব।

আচ্ছা।

মাছের ঝোল রান্নার গোপন কৌশল কি তুমি জান?

জানি না।

জানতে চাও?

না।

জানতে না চাইলেও বলব। মাছের ঝোল রান্নার আসল কৌশল হলো— অনেকক্ষণ নাড়াতে নাড়তে হাত ব্যথা হয়ে যাবে তবু চামচ নাড়ানো বন্ধ করবে না। বুঝেছ?

হুঁ।

শীতকাল আসতে কত দেরি? এখন কোন কাল? বর্ষা শেষ হয়ে গেছে না?

হাসান চোখ মেলল।

কমলার মা বলল, ভাইজান মাথাত পানি ঢালমু?

হাসান বলল, না।

যন্ত্রণা কি আরো বাড়ছে ভাইজান?

হুঁ।

মাথা বিষের বড়ি খাইবেন?

না। তুমি এখন যাও।

হাসান চোখ বন্ধ করছে না। চোখ বন্ধ করলেই হাঁসের পাল চলে আসবে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে। কে এসেছে চুড়ি পরে? তিতলী না তো? হাসান জানে কেউ নেই তারপরেও বলল, কে তিতলী! আশ্চর্য ব্যাপার। মাথার ভেতরে তিতলী কথা বলে উঠল।

হুঁ।

কেমন আছ?

ভালো।

তোমাকে অনেক দিন থেকে মনে মনে খুঁজছি।

কেন?

ওই যে একটা গান করেছিলে বুড়িগঙ্গায় ওই গানের লাইনগুলো কী?

আমি তো গান করি নি।

তিতলী শোন!

শুনছি।

আমি খুব একটা অন্যায় করেছি। তোমাকে বলা হয় নি।

বল।

নাদিয়া এত ভালো রেজাল্ট করেছে, ওকে কনগ্রাচুলেশনস জানানো হয় নি। আমি ওর জন্যে একটা গিফট কিনে রেখেছিলাম। সেই গিফটটাও তাকে দেয়া হয় নি।

একদিন বাসায় গিয়ে ওকে দিয়ে এসো।

তুমি রাগ করবে না তো?

আমি রাগ করব কেন?

তিতলী!

বল শুনছি।

হাঁসের স্বপ্নটা আমি এখনো দেখি।

ও আচ্ছা

স্বপ্নটা দেখার সময় মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়।

ও আচ্ছা।

তিতলী আমার মনটা সারাক্ষণ খুব খারাপ থাকে।

ও আচ্ছা।

তুমি কি জান আমি এখানে, মাঝে মাঝে তোমাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি?

ও আচ্ছা।

কয়েকদিন আগে তোমাদের কলেজে গিয়েছিলাম। মনের ভুলে চলে গিয়েছি।

ও আচ্ছা।

এখন আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

ও আচ্ছা।

আশরাফুজ্জামান বাড়িতে ফিরলেন রাত ন'টায়। তিনি ছেলেকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কী হয়েছে হাসানের? তিনি ভীত গলায় বললেন, তোর কী হয়েছে রে? তোর চোখ এত লাল কেন?

হাসান লাল চোখে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না।

২৫

তিতলী লক্ষ করল শওকতের বাঁ গাল খানিকটা ফোলা। সে কিছুক্ষণ পরপর গালে হাত দিচ্ছে। তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। বেশি রকম চিন্তিত হলে শওকত মাথার চুল টানে। এখন মাথার চুলও টানছে। চুল এলোমেলো হয়ে আছে। চিন্তিত হাবার মতো কোনো কারণ ঘটেছে? পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। ট্রাভেলার্স চেকভর্তি মানিব্যাগ খোয়া গেছে? তিতলী বসে আছে। কাঠমুণ্ডু এয়ারপোর্টে সে কৌতূহল নিয়ে শওকতকে লক্ষ করছে। সমস্যায় সে যে পড়েছে তা তাকে দেখে বোঝা যায়। মানুষটার একটা বড় গুণ হচ্ছে যত সমস্যাতেই পড়ুক সে ধৈর্য হারায় না। খুব বেশি হলে মাথার চুল টানে। চুল টানারও কি কোনো বিশেষ ভঙ্গি আছে? টেনশান বেশি হলে মাথার সামনের চুল টানা। টেনশান কম হলে পেছনের চুল টানা জাতীয় কিছু। তিতলী এমনভাবে মানুষটাকে লক্ষ করে নি। প্রয়োজন বোধ করে নি। এখনো প্রয়োজন বোধ করছে না।

শওকত বড় একটা পেপার গ্লাস নিয়ে তিতলীর দিকে আসছে। তার ভুরু কুঁচকে আছে। চিন্তা মনে হয় আরো বেড়েছে।

তিতলী নাও পেপসি খাও।

তিতলী গ্লাস হাতে নিল। তার পেপসি খেতে ইচ্ছে করছে না— মানুষটা এত আগ্রহ করে এনেছে, না খেলে ভালো দেখায় না। একবারের জন্য হলেও গ্লাসটা ঠোঁট ছোঁয়ানো দরকার। তারপর হাতে নিয়ে বসে থাকলেই হবে।

তিতলী বলল, কোনো সমস্যা হয়েছে?

না। তেমন কিছু না। আমার সুটকেসটা আসে নি। ওরা বলছে এক ঘণ্টা পর রয়েল নেপাল এয়ারলাইন্‌সের একটা প্লেন আসবে। সুটকেসটা নাকি সেখানে। অপেক্ষা করা ছাড়া পথ দেখছি না। তোমার বোধহয় চুপচাপ বসে থাকতে খারাপ লাগছে।

খারাপ লাগছে না। তোমার গাল ফোলা। কী হয়েছে?

হঠাৎ করে দাঁত ব্যথা শুরু হয়েছে।

বেশি?

হ্যাঁ বেশি। হোটেলে গিয়ে পেইনকিলার টিলার খেতে হবে।

আমার কাছে প্যারাসিটামল আছে।

প্যারাসিটামলের স্টেজ পার হয়ে গেছে। তুমি বস, আমি হোটেলের খোঁজ নিই। গল্পের বইটই কিছু এনেছ? বসে বসে পড়।

গল্পের বই লাগবে না।

শওকত চিন্তিতমুখে হোটেল ইনকোয়োরির দিকে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট থেকে তাকে

নিয়ে যাবার জন্যে বাংলাদেশ এম্বেসির এক ভদ্রলোকের আসার কথা। হোটেল বুকিং তারই করে রাখার কথা। তিনি আসেন নি। এম্বেসিতে টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। চারটা বাজে। অফিস আওয়ার্স শেষ। হোটেল রিজার্ভেশনের সমস্যা হয়তো হবে না। এখন টুরিস্ট সিজন না। ভরা বর্ষায় কেউ নেপাল বেড়াতে আসে না। হোটেলের চেয়েও বেশি জরুরি— একজন ডাক্তার খুঁজে পাওয়া। দাঁতের ব্যথা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মাথা দপদপ করছে। নেপাল এয়ারলাইন্সে সুটকেস পাওয়া না গেলে রেডিমেড শার্ট-প্যান্ট থেকে শুরু করে টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সবই কিনতে হবে।

নেপাল এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট দু ঘণ্টা দেরি করে এল। সেখানে সুটকেস নেই। শওকতের গাল আরো ফুলেছে। মনে হচ্ছে জ্বর এসে গেছে। বাইরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। পাহাড়ি অঞ্চল বলেই কি বৃষ্টির ফোঁটা এত বড়?

এম্বেসির ভদ্রলোকের নাম সোবাহান। তিনি শেষ পর্যন্ত এসেছেন। ভদ্রলোক বিমানের টাইমিঙে গণ্ডগোল করেছেন। তবে ভদ্রলোক করিতকর্মা। নগরকোটে হোটেল বুকিং নিয়ে রেখেছেন। কাঠমণ্ডুতে নাকি দেখার কিছু নেই। ভদ্রলোকের মতে হিমালয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় নগরকোটে হওয়া উচিত। ভদ্রলোক এয়ারপোর্ট থেকেই শওকতের সুটকেস খুঁজে বের করলেন। পরের দিন বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে সুটকেস আসবে এটা নিশ্চিত করলেন। ডেনটিস্টের সঙ্গেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। বিদেশের এম্বেসিতে যাঁরা কাজ করেন তারা ঘুমানো এবং শপিং করা ছাড়া অন্য কিছুই পারেন না বলে যে ধারণা দেশে প্রচলিত তা সম্ভবত সত্যি নয়।

ভদ্রলোক শওকতকে শার্ট-প্যান্ট কিনতে দিলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন, কাল তো সুটকেস চলেই আসছে— শুধু শুধু ডলার খরচ করবেন কেন? একটা রাতেরই তো কারবার। ভাবির শাড়ি প্যাঁচ দিয়ে লুঙ্গির মতো পরে শুয়ে থাকবেন। দুপুরের মধ্যে আমি সুটকেস পৌঁছে দেব। পরদিন রওনা করবেন পোখরা।

শওকত বলল, কোথায় যাব?

পোখরা। সেখানে খুব সুন্দর তিনটা হ্রদ আছে— ফিওয়া, বেগনাস এবং রুপা। লেকগুলোর উৎস হলো অন্নপূর্ণা রেঞ্জের তুষার গলা পানি। ফিওয়া হ্রদের পাশে লেকভিউ হোটেল। একটা রুম নিয়ে রেখেছি। এসি রুম, আপনাদের পছন্দ হবে।

যাব কীভাবে?

বাইরোডে যাবেন। ট্যাক্সি নিয়ে যাবেন। প্লেনেও যাওয়া যায়। ওয়ান ওয়ে টিকিট ফোর্টি নাইন ডলার। প্লেনে যাওয়া অর্থহীন। পোখরা যাবার দুপাশের দৃশ্য না দেখলে মানবজন্ম বৃথা।

কাঠমণ্ডুতে কিছু দেখার নেই?

মন্দির ফন্দির আছ— চাইলে একদিন দেখিয়ে আনব। ইউরোপ আমেরিকার ট্যুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে নিয়ে খুব আগ্রহ করে পটাপট মন্দিরের ছবি তোলে। মন্দির দেখার জন্যে নেপালে আসার দরকার কী? নেপালে এসেছেন হিমালয় দেখবেন। প্রাণভরে হিমালয় দেখুন। তবে...।

তবে কী?

বর্ষাকাল তো। হিমালয় দেখতে পারবেন কি না, সেটা হলো কথা। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কিচ্ছু দেখা যায় না। আপনাদের ভাগ্য ভালো হলে ইনশাল্লাহ দেখবেন।

তারা নগরকোটে পৌঁছল রাত আটটার দিকে। বৃষ্টি তখনো ঝরছে। মুষলধারে না হলেও ঝিরঝির করে পড়ছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। রাস্তায় আলো নেই। একপাশে গভীর গিরিখাদ। স্টিয়ারিঙের হাত শক্ত না হলে ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে। বৃষ্টিভেজা রাস্তাও খুব পিছল। মাঝে মাঝেই গাড়ি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে যাচ্ছে। অল্পবয়েসী ড্রাইভার জয় পশুপতিনাথজী বলে গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে।

শওকত বলল, রাস্তা তো ভয়াবহ। তিতলী তোমার ভয় লাগছে ?

তিতলী বলল, না।

তাহলে তোমাকে 'সাহসী তরুণী' টাইটেল দেয়া যায়। ভয়ের চোটে আমার দাঁত ব্যথা সাময়িকভাবে চলে গেছে। আমার ধারণা হোটেলে পৌঁছার পর ভয় কেটে যাবে, দাঁত ব্যথা আবার শুরু হবে।

সেক্ষেত্রে হোটেলে না পৌঁছে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ভালো।

শওকত শব্দ করে হাসল। তিতলীর মনে হল— মানুষটার হাসি খুব সুন্দর। হাসান ভাইয়ের হাসিও সুন্দর, তবে হাসান ভাই এত শব্দ করে হাসত না। তিতলীর অস্বস্তি লাগছে। তুলনামূলক চিন্তা সে কেন করছে। এর মধ্যে তুলনার কী আছে ?

বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি থেমেছে। ড্রাইভার জয় জয় পশুপতিনাথজী বলে দু'হাত একত্র করে স্টিয়ারিংকে নমস্কারের মতো করেছে। তিতলী ভীত গলায় বলল, কী হয়েছে ? ড্রাইভার হাসিমুখে বলল, বহেনজি আ গয়া।

এত অন্ধকার কেন ?

নেপালি ড্রাইভার বাংলা বাক্য বুঝল। জবাব দিল ইংরেজিতে— নো ইলেকট্রিসিটি। পাওয়ার ফেইলিউর।

অন্ধকারে এতক্ষণ চোখে পড়ে নি— এখন দেখা যাচ্ছে— দক্ষিণে বিশাল দোতলা হোটেল। ভূতের বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ইলেকট্রিসিটি না থাকলে এত বড় হোটেলে চার্জলাইট জ্বলবে, বাতি জ্বলবে— পুরোপুরি অন্ধকার খাঁখাঁ করছে। বৃষ্টি সূচের মতো গায়ে বিঁধছে। তিতলীর শরীর কাঁপছে। এত ঠাণ্ডা বৃষ্টি এর আগে তার গায়ে পড়ে নি। পাহাড়ি বৃষ্টি কি এত ঠাণ্ডা হয় ? বৃষ্টির এই নমুনা জানলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লিখতেন না, এস কর স্নান নবধারা জলে।

তিতলী হোটেলের লবিতে পা দেয়ামাত্র ইলেকট্রিসিটি চলে এল। চারদিক ঝলমল করে উঠল। হোটেল দেখে তিতলী মুগ্ধ। শোবার ঘরগুলো বড় বড়। ঘরে কাঠের পুরনো ধরনের আসবাব। ডেসিং টেবিলের আয়নাটা সুন্দর। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হোটেলের আয়না সচরাচর ভালো হয় না। বাথরুমও ঝকঝক করছে।

তিতলী খুশি খুশি গলায় বলল, হোটেলটা তো খুব সুন্দর।

শওকত বলল, হোটেলটা খুব সুন্দর না। মাঝারি ধরনের। তুমি কখনো ভালো হোটেলে থাক নি বলে তোমার কাছে এত সুন্দর লাগছে। তোমার কি ক্ষিধে লাগছে?

হুঁ।

তাহলে তুমি এক কাজ কর খেয়ে এস। ডাইনিং হলে চলে যাও। রাত বেশি হলে ডিনার পাবে না।

তুমি খাবে না?

আমার দাঁতের যে অবস্থা! পানি ছাড়া কিছু খেতে পারব না। তাছাড়া খেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকব।

আমি একা একা খেতে যাব?

হ্যাঁ যাবে। আমরা যে বিচিত্র জীবন শুরু করেছি সেখানে দোকার ব্যাপার তো নেই— তাই না? এক কাজ কর— ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নাও কিংবা গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপর খেতে যাও। মেনু দেখে দেখে অর্ডার দেবে সমস্যা কিছু নেই। পারবে না?

পারব।

গুড।

শওকত বিছানায় গা এলিয়ে দিল। শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। গা কেমন ঘিনঘিন করছে। বাসি কাপড় ছাড়া হয় নি। ছাড়ার উপায়ও নেই। একসেট কাপড় হলেও কেনা দরকার ছিল। গরম পানিতে গোসল সেরে হোটেলের গামছা গায়ে জুড়িয়ে শুয়ে থাকলে হয়। ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে একজন তরুণীর সামনে ব্যাপারটা শোভন হবে না। এই তরুণী তার স্ত্রী এটিও খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ভিক্টোরিয়ান যুগের গল্প-উপন্যাসে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন স্বামী-স্ত্রী হয়তো থাকে। এ যুগে কি থাকে? তিতলী যা করছে তা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা থেকে করছে। আর সে নিজে যা করছে তাও কি অসুস্থতা নয়? অন্যের অসুখকে প্রশ্রয় দেয়াও তো এক ধরনের অসুখ। সে যা ভেবেছিল তা হচ্ছে না— সময়ের সঙ্গে তিতলী সহজ হচ্ছে না বরং উল্টোটা হচ্ছে— অস্বাভাবিক সম্পর্কই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এক সময় আরো স্বাভাবিক মনে হবে। ভুল হচ্ছে, মস্ত বড় ভুল। ভুলের ছোট্ট চারা রোপণ করা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চারা ডালপালা মেলে মহীরুহ হয়ে গেছে। এই মহীরুহ এখন আর খুব সহজে টান দিয়ে উপড়ে ফেলা যাবে না। বড় করাত দিয়ে গাছটা কাটতে হবে। সেই করাত দুজনের করাত। করাতের এক মাথা থাকবে তার হাতে অন্য মাথা থাকবে তিতলীর হাতে। তিতলী কি সেই করাতের একমাথা ধরবে? মনে হয় না।

শওকতের জ্বর বাড়ছে। মনে হচ্ছে এন্টিবায়োটিকগুলো কাজ করছে না। ঠাণ্ডাও বোধহয় লেগেছে— বুকের ভেতর ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। সামান্য কাশি। নিউমোনিয়া না তো? বড় ধরনের অসুখ বাঁধিয়ে ফেললে তিতলী সমস্যায় পড়বে। বিদেশে অসুস্থ মানুষ মানে নানান যন্ত্রণা। তিতলী নামের এই মেয়েটিকে এ জাতীয় যন্ত্রণায় ফেলার কোনো অর্থ হয় না। মেয়েটা কে? কেউ না। খুব রূপবতী একটা মেয়ে যে বাস করছে ভয়ঙ্কর এক ঘোরের জগতে। ঘোর কাটছে না। সম্ভবত কাটবেও না।

তিতলী ?

হুঁ।

ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিতে বল। পানি খাব।

কাকে বলব ?

রুম সার্ভিসকে বলতে হবে। আচ্ছা টেলিফোনটা আমার কাছে দাও— আমি বলছি।

তোমার জ্বর কি বেড়েছে ?

তাই মনে হচ্ছে।

মাথায় পানি ঢালতে হবে ?

না। তুমি বসে আছ কেন ? খেতে যাও।

তিতলী চলে গেল। শওকত ভেবেছিল তিতলী গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে। এই ভদ্রতা সাধারণ ভদ্রতা। তিতলীর কাছ থেকে এই সামান্য ভদ্রতাটুকু কি আশা করা যায় না ?

নতুন জায়গায় তিতলীর ঘুম হয় না। নগরকোটের হোটেলে তার খুব ভালো ঘুম হলো। দীর্ঘ ঘুম এবং খুব আরামের ঘুম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। হোটেলের ভেতরে তখনো অন্ধকার। শওকত চাদর মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মাথা বালিশ থেকে সরে গেছে। বাচ্চাদের এই অভ্যাস শওকতের আছে। মাথার নিচে বালিশ থাকে না। তিতলীর একবার ইচ্ছা করল শওকতের মাথাটা বালিশে তুলে দেয়। তারপরই মনে হলো থাক।

সে বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধোল। কলটা ছাড়ল খুব সাবধানে। অসুস্থ মানুষ— ঘুম যেন না ভাঙে।

তিতলী ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এল। সেখান থেকে চলে এল হোটেলের বাগানে। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। যে বিস্ময়কর দৃশ্য তার সামনে ছিল তার জন্যে তার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। দিগন্তজুড়ে হিমালয় পর্বতমালা। বরফের চাদরে তার গা ঢাকা। প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণে সেই চাদরে সোনালি আভা লাগতে শুরু করেছে। এ কী অপরূপ দৃশ্য! তিতলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন কুয়াশা তাকে ঢেকে ফেলল। বর্ষাকালে এত কুয়াশা এল কোত্থেকে ? হঠাৎ তার মনে হল— এটা মেঘ না তো ? জলভরা একখণ্ড মেঘ কি তাকে জড়িয়ে ধরেছে ? অবশ্যই তাই। এম্বেসির সোবাহান সাহেব এ জাতীয় কথাই তো বলেছিলেন। নগরকোট এত উঁচুতে যে গায়ের ওপর দিয়ে মেঘ চলে যায়। হাতের মুঠোয় মেঘ ধরা যায়: এই তো সেই মেঘ। আকাশের মেঘ হাত দিয়ে ছোঁয়া যাচ্ছে! চোখের সামনে হিমালয়ের রঙ বদলে যাচ্ছে— প্রকৃতি এত সুন্দর হয় ? তিতলীর রীতিমতো কান্না পেয়ে গেল। এত সুন্দর কখনো একা দেখা যায় না। শওকতকে এনে দেখাতে হবে। ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বাগানে চেয়ার-টেবিল পাতা আছে। হোটেলের গেস্টরা চেয়ারে বসে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদের সামনে পটভর্তি চা। তিতলীরাও তাই করবে। দুজন বসে চা খাবে তারপর হঠাৎ একসময় বিশাল একখণ্ড মেঘের ভেতর তারা ডুবে যাবে।

তিতলী শওকতের গায়ে হাত রেখে কোমল স্বরে ডাকল— এই ওঠ তো। ওঠ।

শওকত চোখ মেলল। অদ্ভুত একটা দৃশ্য সে দেখছে— তিতলী তার গা ঘেঁসে বসে আছে। তিতলীর একটা হাত তার পিঠে। এটি কি কোনো স্বপ্নদৃশ্য ? না স্বপ্নদৃশ্য নয়। তিতলীর গা থেকে বাসি ফুলের গন্ধ আসছে। স্বপ্নদৃশ্যে গন্ধ থাকে না।

চট করে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নাও।

কেন ?

বাইরে যে কী সুন্দর! আমি এতক্ষণ মেঘের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি। এই দেখ তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। শুয়ে আছ কেন ওঠ।

শওকত হাত বাড়িয়ে তিতলীর হাত ধরল। তিতলী হাত সরিয়ে নিল না। শওকত তাকে কাছে টানল। তিতলী কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল— তারপর হঠাৎ নিজেকে ছেড়ে দিল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কী করছ দরজা খোলা! শওকত বলল, থাকুক খোলা।

তিতলী বলল, তোমার গায়ে জ্বর নেই ?

না নেই।

তিতলী বলল, আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে। তুমি কি এক সেকেন্ডের জন্য আমাকে ছাড়বে ?

এক সেকেন্ডে কী করবে ?

দরজা লাগিয়ে দেব।

দরজা লাগাতে হবে না।

কী আশ্চর্য! বারান্দা দিয়ে বেয়ারারা আসা-যাওয়া করছে।

ওরা হাইলি ট্রেন্ড। হোটেলের খোলা দরজা দিয়ে এরা কখনো ভেতরে তাকাবে না।

আমরা হিমালয় দেখব না ?

হিমালয় পালিয়ে যাচ্ছে না।

আমিও তো পালিয়ে যাচ্ছি না। ছিঃ ছিঃ তুমি তো আমাকে নগ্ন করে ফেলছ। আমি কিন্তু এখন ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বিছানা থেকে ফেলে দেব।

ফেলে দাও।

ধাক্কা দিতে গিয়ে তিতলী ধাক্কা দিতে পারল না। তার শরীর জেগে উঠেছে। সে গভীর মমতা ও ভালবাসায় শওকতকে জড়িয়ে ধরল। হিমালয় সূর্যকিরণ মেখে তার রঙ বদলাচ্ছে। ফেরারি মেঘমালার দু-একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে হোটেলের চারপাশে। তিতলীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে কোনো একটা দুষ্ট প্রকৃতির মেঘ বোধহয় খোলা দরজা দিয়ে তাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা ডুবে গেছে মেঘের দিঘিতে।

২৬

তারেক অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। কোনো কথাটথা না। চুপচাপ বসে থাকা।

হাসান চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার বিছানার চাদরটা ধবধবে সাদা। গায়ে যে চাদরটা আছে তার রঙও সাদা। সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। বাইরে বেশ গরম। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু হাসানের মনে হয় শীত লাগছে।

তারেক বলল, তোর মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমেছে?

হাসান নিচু গলায় বলল, হুঁ।

হুঁ বলার ধরন থেকেই বোঝা যায় মাথার যন্ত্রণা আসলে কমে নি। কড়া পেইনকিলার ব্যথাটাকে ভোঁতা করে দিয়েছে।

তুই যে এত বড় অসুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতি বুঝতেই পারি নি। আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে।

অসুখ-বিসুখ তো পৃথিবীতে আছেই।

তাও ঠিক।

তারেক আবার চুপ করে গেল। হাসান বলল, শুধু শুধু বসে আছ কেন? চলে যাও।

কোথায় যাব?

তোমার ঘরে যাও। অফিস থেকে এসেছ বিশ্রাম কর।

তোর কি কিছু খেতেটেতে ইচ্ছা করে?

না।

খেতে ইচ্ছে হলে বল। লজ্জা করবি না।

হাসান হাসল। একবার ভাবল বলে, আঙুর খেতে ইচ্ছে করছে। আঙুর নিয়ে এসো। বলা ঠিক হবে না। ভাইজান সত্যি আধকেজি আঙুর নিয়ে আসবে।

হাসান!

জ্বি ভাইজান।

আমার মনটা খুবই খারাপ হয়েছে।

তুমি ঘরে যাও তো। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

আমার যদি ক্ষমতা থাকত— অবশ্যই তোকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাতাম। ঘরবাড়ি জমিজমা থাকলে অবশ্যই বিক্রি করতাম। কিছুই নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ডে ষোল সতের হাজার টাকা আছে। আমি অবশ্য হাল ছাড়ি নি। দেখি কী করা যায়। লায়লার স্বামীর কাছে টাকা ধার চাইব?

কারো কাছে কিচ্ছু চাইতে হবে না।

সে তো বাইরের কেউ না। এখন তো আমাদেরই একজন। টাকা তো আমি মেরেও দিচ্ছি না। মাসে মাসে শোধ দেব। মাসে তিন হাজার টাকা করে শোধ দিলেও বছরে হয় ছত্রিশ হাজার...

ভাইজান আমার আঙুর খেতে ইচ্ছে করছে।

কোনো ব্যাপারই না। এনে দিচ্ছি। কোনটা খাবি— সাদাটা না কালোটা ? আচ্ছা যা দু পদেরই আনব। ভিটামিন সি ছাড়া আঙুরের অবশ্য ফুটভ্যালু কিছু নেই। তোর যখন খেতে ইচ্ছে করছে খা।

তারেক উঠে দাঁড়াল। হাসান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কেউ একজন পাশে এসে বসলেই তার খারাপ লাগে। পুরোপুরি একা সময়টা কাটাতে পারলে ভালো লাগত। কেউ কাছে আসবে না। চিঠি লিখবে। সেই চিঠিগুলো থাকবে বালিশের নিচে। যখন মাথার যন্ত্রণা একটু কমবে তখন সে চিঠি খুলে পড়বে। মানুষের সঙ্গের চেয়ে তাদের চিঠি পড়াটা এখন বোধহয় আনন্দময় হবে।

লিটনের একটা চিঠি পরশুদিন পেয়েছে। চিঠিটা বালিশের নিচে ছিল। আজ সকালে পড়েছে। কয়েকদিন পর হয়তো আবারো পড়বে। লিটন লিখেছে—

হাসান,

তোকে চিঠি লিখতে অনেক দেরি করে ফেললাম। আসলে কী ব্যস্ততায় যে সময় কাটছে। আমাকে না দেখলে তুই আমার ব্যস্ততা বুঝতে পারবি না। আমি ভোর আটটায় চলে যাই। ফিরি সন্ধ্যার পর। গ্রোসারি করা, ঘর-সংসার দেখা, রান্না করা— সব তোর ভাবির একা করতে হয়। সেই বেচারিরও নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। আমাদের এপার্টমেন্টটা উনত্রিশ তলায়। আর লন্ড্রিঘর হচ্ছে এক তলায়। কাপড় ধুতে হলেও নিচে নামতে হয়। এত উঁচুতে থাকতে শুরুতে খুব অস্বস্তি লাগত। মনে হত জোরে বাতাস এলেই বিল্ডিংটা বুঝি ভেঙে পড়বে। এখন অবশ্য সয়ে গেছে।

শম্পা সারাদিন কী করে জানিস ? শুধু ঘর গোছায়। রাজ্যের জিনিস কিনে ঘর ভর্তি করে ফেলেছে। তার যে এমন খরুচে হাত তা জানতাম না। তার শখের জিনিস কী জানিস— স্টাফড এনিমেল। ঘরটাকে সে একটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলেছে। আমি একদিন তার ওপর সামান্য রাগই করলাম— সে কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড করেছে। তার অভিমান ভাঙাবার জন্যে শেষে আমি নিজেই একটা বিশাল হাতি কিনে দিয়েছি। দাম কত নিয়েছে শুনলে তুই ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবি সাত শ' সিঙ্গাপুরি ডলার। শম্পার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও খরুচে হাত হয়ে যাচ্ছে। এক সময় কী যে কষ্ট করেছি ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। আমার খুব ইচ্ছা তোকে এনে কিছু দিন আমাদের সংসারে রাখি। আরেকটু গুছিয়ে বসেই তোর জন্যে টিকিট পাঠাব।

ইতি লিটন

পুনশ্চ : হাসান তুই কি একটা কাজ করবি ? খুব সুন্দর কিছু বাংলা নাম পাঠাবি ? কুড়িটা ছেলের নাম এবং কুড়িটা মেয়ের নাম। কী জন্যে নাম পাঠাতে বলছি বুঝতেই পারছিস। বিদেশে

শিশুপালন খুবই যন্ত্রণা হবে। কী আর করা। আমরা খুবই খুশি। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

হাসানকে রোজই একবার লায়লা দেখতে আসে। এই মেয়েটাকে হাসানের ভালো লাগে। লায়লা ঘরে ঢোকে কাঁদো কাঁদো মুখে।

ভাইয়া আজ তোমার অবস্থা কী ? বলে বিছানায় বসে। কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ থেকে কাঁদো কাঁদো ভাবটা চলে যায়। সে মনের আনন্দে তার সংসারের গল্প শুরু করে। গল্প করার সময় আনন্দে সে ঝলমল করতে থাকে। হাসানের সব সময় মনে হয় এই আনন্দের পাশে দীর্ঘ সময় থাকলে তার মাথার অসুখটা কমে যাবে।

ভাইয়া শোন— বাবু কী রকম যে দুষ্টু তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। ওর বাবার অবশ্য ধারণা আগে এত দুষ্টু ছিল না। আমি নাকি লাই দিয়ে দিয়ে তাকে দুষ্টু বানাচ্ছি। এত ছোট একটা বাচ্চা আমি তো আদর করবই। মুখে ভাত তুলে না দিলে সে খায় না। বেচারা ছেলেমানুষ না। ও কী বলে জান ? ও বলে রাত্রি তুমি বাবুকে যতটা ভালবাস আমাকে তার দশ ভাগের এক ভাগও বাস না। বুঝলে ভাইয়া ও আমাকে লায়লা ডাকে না। লায়লার অর্থ রাত। সেই জন্যে ডাকে রাত্রি। লজ্জার ব্যাপার না ? এখন কী করব বল ? আদর করে ডাকে আমি তো না বলতে পারি না। পরশুদিন আবার বলল, চল সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসি। ছেলের স্কুল কামাই করে আমি সিঙ্গাপুর যাব। আমার এত শখ নেই। ও তা শুনবে না। ওর স্বভাব হচ্ছে একবার কোনো একটা কথা মুখ দিয়ে বলে ফেললে সেটা করতেই হবে। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। এদিকে আমার ড্রাইভার কী করেছে জান ? গত মঙ্গলবারের কথা। আমাকে বলল, চাকা পাংচার হয়েছে ঠিক করতে হবে। আমি একশ টাকা দিলাম সে আর টাকা ফেরত দেয় না। বৃহস্পতিবার তাকে ডেকে বললাম চাকা পাংচার সারাই করতে কুড়ি টাকা লাগে। বাকি আশি টাকা কোথায় ? সে বলল, ম্যাডাম পকেটমার হয়ে গেছে। ওই আশি টাকা তো গেছেই আমার নিজেরও দু শ টাকা গেছে। এখন সে এডভান্স বেতন চায়। আমার অবস্থা দেখেছ ?

তোর তো কঠিন অবস্থা।

কঠিন অবস্থা তো বটেই। কাউকে যে তুমি বিশ্বাস করবে সে উপায় নেই। সবার দিকে চোখ রাখতে হয়। আমি তো আর মাছি না যে আমার পঞ্চাশ হাজার চোখ আছে। আমি একা কদিক সামলাব ?

তা তো ঠিকই।

সন্ধ্যা হতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমোতে পারি না। ওর অভ্যাস হচ্ছে রাতে ছবি দেখা। আমাদের একটা LD প্লেয়ার আছে। LD নিয়ে আসে। রোজ ছবি দেখে। LD কী জান ভাইয়া ?

না।

LD হলো লেজার ডিস্ক। পুরো সিনেমাটা একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো রেকর্ডে থাকে। কী সুন্দর ছবি যে আসে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না। একদিন

আমাদের বাসায় নিয়ে দেখাব। সরি বাসা বলে ফেলাম। বলা উচিত ছিল বাড়ি। বাসা তো না, আমরা তো আর ভাড়া বাড়িতে থাকি না যে বাসা। তাই না ভাইয়া? তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?

না চোখ বন্ধ করে আছি।

ঠিক আছে তুমি রেস্ট নাও। আর শোন ভাইয়া, বেশি চিন্তা করবে না। আমি রোজ এসে দেখে যাব। ও বলছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে। মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি মিরাকলের মতো কাজ করে। ওর এক আত্মীয়ের তোমার মতো ব্রেইন টিউমার ধরা পড়েছিল। ডাক্তাররা সব জবাব দিয়ে দিয়েছে। তখন সে হোমিওপ্যাথি শুরু করে আস্তে আস্তে টিউমার মিলিয়ে যায়। যে ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিলেন তিনি আবার ইন্ডিয়া চলে গেলেন। আমি ওকে বলেছি— ইন্ডিয়াতেই যাক আর বিলাতেই যাক তুমি সেই ডাক্তারের খোঁজ বের করবে।

দেখ খুঁজে।

ভাইয়া আজ যাই?

আচ্ছা।

হাসানের অসুখের খবর সে কাউকে দেয় নি। তারপরেও কেমন করে জানি সবাই জেনে গেছে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ উপস্থিত হচ্ছে। হাসানকে বিস্মিত করে একদিন সুমি এসে উপস্থিত। তার গায়ে ধবধবে সাদা ফ্রক। হাতে অনেকগুলো গোলাপ। কী সুন্দরই না হয়েছে মেয়েটা! মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

স্যার কেমন আছেন?

ভালো।

আপনাকে দেখতে এসেছি।

থ্যাংক য়্যু। খবর পেলে কোথায়?

সুমি মুখ টিপে হেসেছে। খবর কোথায় পেয়েছে সে বলবে না।

এত বড় অসুখ কী করে বাঁধালেন?

বুঝতে পারছি না সুমি। অসুখের কথা থাক। তুমি কেমন আছ বল?

ভালো আছি।

তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ?

হুঁ।

তোমার যে ই.এস.পি. ক্ষমতা ছিল এখনো কি আছে? ভবিষ্যৎ বলতে পারতে। এখনো কি পার?

হুঁ।

আচ্ছা বল দেখি আমি আর কত দিন বাঁচব?

সুমি হাতের ফুলগুলো নাড়াচাড়া করছে। কিছু বলছে না। কিন্তু তার মুখ বিষণ্ন নয়।

স্যার আপনার জন্যে একটা মজার জিনিস এনেছি।

মাজার জিনিসটা কী?

এক ধরনের ক্যান্ডি। মুখে দিয়ে রাখবেন— এক সময় মুখের ভেতর পটপট শব্দ হতে থাকেব।

সে কী ?

বাবা বাইরে থেকে নিয়ে এসেছেন। মুখে দিয়ে দেখুন।

হাসান ক্যান্ডি মুখে দিয়েছে। এক সময় মুখের ভেতর সত্যি সত্যি পটপট শব্দ হওয়া শুরু করল। হাসান থু করে ক্যান্ডি ফেলে দিল। সুমি হাসছে খিলখিল করে। হাসান মুগ্ধ হয়ে হাসির শব্দ শুনছে।

শীতের মাঝামাঝি সময়ে হাসানের অবস্থা খুব খারাপ হলো। তাকে ভর্তি করা হলো হাসপাতালে। হাসপাতালটাই হয়ে গেল তার ঘরবাড়ি। কেবিনে স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। বিবর্ণ দেয়াল। ফেনাইলের গন্ধমাখা মেঝেতে তার জীবন আটকে গেল। মানুষের সঙ্গ তার অসহ্য বোধ হতে শুরু করল। কেবিনের জানালা খুলে আকাশ দেখতে তার ভালো লাগে না। তার ভালো লাগে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজেকে ছোট্ট করে শুয়ে থাকতে। নিজের মনে কথা বলতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নিজের মনে কথা বলে। একেক সময় একেকজন এসে তার মাথায় উপস্থিত হয়। একদিন যেমন এলেন আম্বিয়া খাতুন।

কী রে হাসান আমার মৃত্যু সংবাদ শুনেও তুই দেখতে এলি না। তুই এত বড় পাষণ্ড! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

দাদিমা আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি।

অসুখ হবে না— রোদের মধ্যে টো টো করে ঘোর। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। অসুখ হয়েছে ভালো হয়েছে।

আপনি এমন রেগে আছেন কেন দাদিমা ?

জোয়ান ছেলে অসুখ বাঁধিয়ে বিছানায় পড়ে আছিস রাগব না ? আমি খুবই রাগ করেছি। দরজা-জানালা বন্ধ করে পড়ে আছিস কেন ? মরার আগেই তুই দেখি ঘরটাকে কবর বানিয়ে ফেলেছিস। জানালা খোল।

জানালা খুলতে ইচ্ছা করে না দাদিমা।

ইচ্ছা না করলেও খুলতে হবে। দাঁড়া আমি খুলে দিচ্ছি।

আম্বিয়া খাতুন অনেক চেষ্টা করলেন। জানালা খুলতে পারলেন না। বৃদ্ধার প্রাণান্ত চেষ্টা দেখে হাসান নিজের মনে খুব হাসল। হাসান যতই হাসছে বৃদ্ধা ততই রাগছেন।

হাসানকে খুব অবাক করে দিয়ে হাসপাতালের কেবিনে উপস্থিত হলো চিত্রলেখা। তার উপস্থিতি কল্পনায় নয়, বাস্তবে। চিত্রলেখা আগের চেয়ে রোগা হয়েছে। গায়ের রঙও খানিক কমেছে। কিন্তু সে আরো সুন্দর হয়েছে।

চিত্রলেখা হাসিমুখে বলল, আপনার অসুখের খবর আমি অনেক আগেই পেয়েছি— আসতে দেরি করলাম।

এই প্রথম হাসান লক্ষ করল কেউ একজন হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে এসে হেসে হেসে কথা বলছে। যেন হাসানের অসুস্থতা কোনো ব্যাপারই না।

দাড়িগোঁফ গজিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। শেভ করেন না কেন ?

রোজ করি না। দু-এক দিন পর পর করি।

রোজ শেভ করবেন। সকালবেলা শেভ করে আয়না দিয়ে চুল আঁচড়ে— আয়নার দিকে তাকিয়ে বলবেন, হ্যালো ইয়াংম্যান।

আচ্ছা বলব। আপনি আমাকে দেখতে আসবেন আমি ভাবি নি।

অন্যেরা ভাবতে পারে না— এমন সব কাণ্ডকারখানা আমি প্রায়ই করি। শুনুন হাসান সাহেব, আপনি বোধহয় জানেন যে আমি একজন ডাক্তার।

জ্বি জানি।

আপনার অসুখ সম্পর্কে যা খোঁজখবর নেবার আমি নিয়েছি। ডাক্তারদের ডায়াগনোসিস দেখেছি। ডায়াগনোসিস ভালো করেছেন। মনে হচ্ছে টিউমারটা শেকড় বসিয়ে দিয়েছে।

তার মানে কি এই যে আমার সময় শেষ ?

হ্যাঁ, মানে মোটামুটি তাই। তবে শুনুন হাসান সাহেব— অপারেশন এবং রেডিওথেরাপির সুযোগ আছে। অপারেশনটা খুবই জটিল। তবে জনস হবকিন্সে দুজন সার্জন আছে যাঁদের হাত জাদুকরী হাত। তারপরেও রিকোভারির সম্ভাবনা কম। থার্টি পার্সেন্ট। তবে থার্টি পার্সেন্ট সম্ভাবনাও এক অর্থে অনেক সম্ভাবনা। তাই না।

জ্বি।

আমি সেই সম্ভাবনাটা যাচাই করতে চাই। আপনাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং সম্ভাবনাটুকু পরীক্ষা করার আমার ইচ্ছা। আপত্তি আছে ?

আপনি এটা করতে চাচ্ছেন কেন ?

দুটা কারণ আছে। প্রথমটা আপনাকে বলা যাবে। দ্বিতীয়টা বলা যাবে না। প্রথম কারণ হলো, আমার বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন— আপনার কোনো সমস্যা হলে দেখতে।

ও আচ্ছা।

চিত্রলেখার দ্বিতীয় কারণটা অনেক জোরালো। হাসান নামের অতি দুর্বল এই মানুষটাকে হিশামুদ্দিন সাহেবের চেয়েও অনেক বেশি পছন্দ তার নিজের। অহঙ্কারী মেয়েরা নিজের পছন্দের কথা সব সময় লুকিয়ে রাখে।

হাসান সাহেব।

জ্বি।

আমি যদি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আপনার আপত্তি আছে ?

জ্বি না।

থ্যাংক য়্যু।

চিত্রলেখা হঠাৎ লক্ষ করল তার চোখে পানি চলে আসছে। সে জানালার কাছে সরে গেল। জানালা বন্ধ কেন ? জানালা খুলে দি কেমন ?

জ্বি আচ্ছা।

চিত্রলেখা জানালা খুলে দিয়েছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা মেঘের স্তূপ ভেসে ভেসে আসছে। খুব সাবধানে চিত্রলেখা তার চোখ মুছল। তার কাছে মনে হলো— মেঘের সঙ্গে মানুষের খুব মিল। মানুষ যেমন কাঁদে মেঘও কাঁদে। বৃষ্টি হচ্ছে মেঘের অশ্রু। চিত্রলেখা মুগ্ধ হয়ে মেঘের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে।

লেখকরা কল্পনা করতে খুব ভালোবাসেন। আমার কল্পনা করতে ভালো লাগছে— হাসপাতালের জানালা থেকে যে মেঘটা দেখা যাচ্ছে সেই মেঘই এক সময় ঢেকে দিয়েছিল তিতলী এবং শওকতকে।

মানুষের কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল খুব একটা হয় না। কল্পনা করতে ভালো লাগে। হাসানের অসুখ সেরে গেছে। সে শুরু করেছে আনন্দময় একটা জীবন। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরতে গিয়েছে। নদীতে খুব ঢেউ উঠেছে। চিত্রলেখা ভয় পেয়ে বলছে, এ কোথায় নিয়ে এলে ? আমি তো সাঁতার জানি না। নৌকা এমন দুলছে কেন ?' নৌকার মাঝি হাসিমুখে বলছে, টাইট হইয়া বহেন আফা, আমি আছি কোনো চিন্তা নেই।

খুব সহজে কল্পনা করা যায়, তারেক ঘর গোছাতে গিয়ে হঠাৎ ড্রয়ারে খুঁজে পেয়েছে রীনার লেখা চিঠি— চিঠিটা খুব ছোট্ট। রীনা লিখেছে, "তুমি কোনোদিন জানবে না, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি।" চিঠি পড়েই তারেক বের হলো। যে করেই হোক রাগ ভাঙিয়ে রীনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাস্তব কখনো গল্পের মতো হয় না। বাস্তবের রীনা ফিরে আসে না। বাস্তবের হাসানদের সঙ্গে কখনো বুড়িগঙ্গার জলের ওপর চিত্রলেখার দেখা হয় না। তবে বাস্তবেও সুন্দর সুন্দর কিছু ব্যাপার ঘটে। যেমন— লিটনের ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়। লিটন তার বন্ধু হাসানের পাঠানো দুটো নাম থেকে একটি নাম তার মেয়ের জন্যে রাখে। দুটি নামের কোনোটাই তার পছন্দ না— তিতলী, চিত্রলেখা। তারপরেও সে মৃত বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মেয়ের নাম রাখল— চিত্রলেখা।

জীবন বয়ে চলবে। আবার এক নতুন গল্প শুরু হবে নতুন চিত্রলেখাকে নিয়ে। কোনো এক লেখক লিখবেন নতুন গল্প, আশা ও আনন্দের অপূর্ব কোনো সঙ্গীত।